তফসীরে
মা'আরেফুল
কোরআন
অষ্টম খণ্ড

তফসীরে

মা'আরেফুল কোরআন

অষ্টম খণ্ড

[সূরা মুহাম্মদ থেকে সূরা নাস]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (অষ্টম খণ্ড)
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২৪
ইফা প্রকাশনা : ৬৯২/৮
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0045-1
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৫
নবম সংস্করণ (রাজস্ব)
নভেম্বর ২০১২
অগ্রহায়ণ ১৪১৯
মুহররম ১৪৩৩
মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল
প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮
প্রচ্ছদ শিল্পী : জসিম উদ্দিন
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ আইউব আলী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
মূল্য : ৫৫০.০০ টাকা মাত্র

TAFSIR-E-MA'REFUL QURAN (VOL. VIII.) : Bangla version by Mawlana Muhiuddin Khan of Tafsir-e-Ma'reful Quran, an Urdu Commentary of Al-Quran by Mufti Muhammad Shafi (R) and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

E-mail : directorpubif@yahoo.com.
Website : islamicfoundationbd@yahoo.com.

Price : Tk. 550.00; US Dollar : 32.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত, বিশুদ্ধতম ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত, এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠক-চাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর নবম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন !

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন'। উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।

তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতিপূর্বে রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদগ্ধতার সাথে পেশ করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত। গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

বর্তমান সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণী (ফারুক) নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সহৃদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর নবম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক দিন। আমীন !

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদকের আরয

আল-হামদুলিল্লাহ ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। তাঁর অশেষ রহমতে 'তফসীরে' মা'আরেফুল কোরআন অষ্টম এবং শেষ খণ্ডটিরও মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হলো।

সর্বাধুনিক এবং সমকালীন এই সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থখানি অনূদিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় ঘটনা। অবিশ্বাস্য স্বল্প সময়ে এ বিরাট কলেবর তফসীর গ্রন্থখানির অনুবাদ ও মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ এবং মূল গ্রন্থকার হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর নিষ্ঠাপূর্ণ দোয়ারই ফলশ্রুতি বলতে হয়। এ ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার কথাও স্মরণীয়। এতদসঙ্গে বিপুল সংখ্যক উৎসাহী পাঠকের তাকিদ ও উৎসাহ প্রদান কাজটি ত্বরান্বিত করার পথে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

আমার আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ্ তা'আলা এ বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই এ কাজের যোগ্য প্রতিফল দান করুন।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ১৯৮১ সনে আমি না-দান গোনাহ্গারকে আট খণ্ডে সমাপ্ত এ যুগের সর্ববৃহৎ তফসীরগ্রন্থ মা'আরেফুল-কোরআন বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। নিজের অক্ষমতার কথা বিবেচনা করে প্রথমে আমি এ গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে ছিলাম যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত। এদিকে হিজরি পঞ্চদশ শতকের আগমনে আলমে-ইসলামের সর্বত্র যে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্লাবন সৃষ্টি হয়েছে, বাংলার ঈমানদীপ্ত জনগণের অন্তরেও সে প্লাবনের ঢেউ এসে নতুন এক উদ্দীপনাময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। সে পরিবেশের প্রভাবেই নবজাগরণের এ আবেগ-ঝরা দিনগুলোতে জাতির সামনে কিছু দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আমিও উদ্বেলিত হয়েছিলাম। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তদানীন্তন সচিব জনাব সাদেক উদ্দীন এবং প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখের উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমি কাজ শুরু করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমতই শেষ পর্যন্ত এ মহৎ লক্ষ্য অর্জনের পথ সহজতর করে দিয়েছে।

যুগে যুগে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর মহান কিতাবের খেদমত করার জন্য একদল নিষ্ঠাবান বান্দার শ্রম কবূল করেছেন। আমার ন্যায় একজন গোনাহ্গারকেও

যে তিনি তাঁর কিতাবের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন, এ দুর্লভ-সৌভাগ্যের শুকুর আমি কোন্ ভাষায় আদায় করবো !

জনাব শামসুল আলমের পরবর্তী মহাপরিচালক জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া এবং তার পর বর্তমান মহাপরিচালক জনাব আবদুস সোবহানও 'মা'আরেফুল কোরআন'-এর প্রকাশনা দ্রুত সমাপ্ত করার ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। ঢাকা মাদরাসায়ে-আলীয়ার শায়খুল হাদীস জনাব মাওলানা ওবায়দুল হক জালালাবাদী এবং শ্রীপুর-ভাংনাহাটী আলীয়া মাদরাসার মোহাদ্দেছ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আযীয সাহেব আগা-গোড়া সবগুলি খণ্ডের কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। এ ছাড়া আমি আরো যাঁদের তরফ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি, প্রতিটি খণ্ডের ভূমিকাতেই তাঁদের কথা উল্লেখ করেছি।

এ বিরাট তফসীরগ্রন্থটি দ্রুত অনুবাদ ও মুদ্রণের ফলে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সুধী পাঠকগণের কেউ কেউ পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পর্কে নিজ নিজ অভিমত এবং কিছু ভুল-ত্রুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আবারো সবিনয় আরজ পেশ করছি, এ শেষ খণ্ডটিতেও যদি কোথাও কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তা আমাদিগকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে খণ্ডটি আরো নির্ভুল করে প্রকাশ করার ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।

রাব্বুল আলামীন ! তুমিই তোমার এ না-দান গোনাহ্গার বান্দাকে এ বিরাট কাজ সমাপ্ত করার তওফীক দান করেছ। এ জন্য শুকুর আদায় করার শক্তি দাও। বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের জন্য এ তফসীরখানি কবূল কর ! আমীন ! ইয়া রাব্বাল আলামীন !!

বিনীত খাদেম
মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা

দ্বিতীয় সংস্করণের আরয

আল্লাহ্ পাকের খাস রহমতে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন এদেশের সুধী পাঠকগণের কাছে কতটুকু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তা এ বিরাট গ্রন্থটির সব কয়টি খণ্ডের ২/৩টি সংস্করণের মাধ্যমেই অনুমান করা যেতে পারে। বলতে কি যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলিম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-র আন্তরিক নিষ্ঠার ফলশ্রুতিই বোধ হয় তাঁর লিখিত তফসীরখানির এমন অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক যুগেই যুগ-চাহিদা পূরণে সক্ষম কিছু ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে থাকেন। এ যুগের বিভিন্ন সমস্যার কোরআন ও সুন্নাহ্ সম্মত সহীহ্ সমাধান পেশ করার জন্য বোধ হয় আল্লাহ্ পাক এ উপমহাদেশের পরিমণ্ডলে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-কে মনোনীত করেছিলেন। তাঁর লিখিত মা'আরেফুল-কোরআন এবং অন্যান্য কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

এ তফসীরের প্রতিটি সংস্করণই সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। উক্ত খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণেও ব্যাপক সংশোধন করা হয়েছে। পাঠকগণের খেদমতে আরয, দোয়া করুন সবগুলো খণ্ডেরই সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করার তওফীক আল্লাহ্ পাক যেন দান করেন।

বিনীত
মুহিউদ্দীন খান

সূচীপত্র

তফসীরে

মা'আরেফুল-কোরআন

অষ্টম খণ্ড

سورة محمد

সূরা মুহাম্মদ

মদীনায় অবতীর্ণ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝١ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝٢ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝٣

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে।

(১) যারা কুফর করে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। (২) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। (৩) এটা এ কারণে যে, যারা কাফির, তারা বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা (নিজেরাও) কুফর করে এবং (অপরকেও) আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে, (যেমন কাফির সরদারদের অবস্থা ছিল, তারা ইসলামের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্য জান ও মাল সবকিছু দ্বারা প্রচেষ্টা চালাত), আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। (অর্থাৎ যেসব কর্মকে তারা ফলপ্রসূ মনে করে, ঈমান না থাকার কারণে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়, বরং উহার মধ্যে কিছু কিছু কর্ম উল্টা তাদের শাস্তির কারণ হবে ; যেমন, আল্লাহর পথে

বাধা সৃষ্টি করার কাজে অর্থকড়ি ব্যয় করা। আল্লাহ্ বলেন : فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة الخ পক্ষান্তরে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং (তাদের বিশ্বাসের বিবরণ এই যে) তারা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সা) -এর প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, (যা মেনে চলাও জরুরী)। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোনাহ্‌সমূহ মার্জনা করবেন এবং (উভয় জাহানে) তাদের অবস্থা ভাল রাখবেন (ইহকালে এভাবে যে, তাদের সৎকর্ম করার তওফীক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং পরকালে এভাবে যে, তারা আযাব থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে)। এটা (অর্থাৎ মু'মিনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কাফিরদের দুর্গতি) এ কারণে যে, কাফিররা ভ্রান্ত পথের অনুসরণ করে এবং ঈমানদাররা শুদ্ধ পথের অনুসরণ করে, যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। (ভ্রান্ত পথের পরিণাম যে ব্যর্থতা এবং শুদ্ধ পথের পরিণাম যে সাফল্য, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই কাফিররা ব্যর্থ মনোরথ হবে এবং মু'মিনগণ সফলকাম হবেন। ইসলাম যে শুদ্ধপথ, এ সম্পর্কে সন্দেহ হলে من ربهم বলে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রমাণ এই যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত। পয়গম্বরের মো'জেযাসমূহ বিশেষ করে কোরআনের অলৌকিকতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত)। আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে (অর্থাৎ উপরোক্ত অবস্থা বর্ণনা করার মতই) মানুষের (উপকার ও হিদায়তের) জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন, (যাতে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন—উভয় পন্থায় তাদেরকে হিদায়ত করা যায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুহাম্মদের অপর নাম সূরা কিতালও। কেননা, এতে 'কিতাল' তথা জিহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি, এর একটি আয়াত كاين من قرية সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত। কেননা, এই আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন এবং মক্কার জনবসতি ও বায়তুল্লাহ্‌র দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন : হে মক্কা নগরী, জগতের সমস্ত নগরের মধ্যে তুমিই আমার কাছে প্রিয়। যদি মক্কার অধিবাসীরা আমাকে এখান থেকে বহিষ্কার না করত, তবে আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। তফসীরবিদগণের পরিভাষায় যে আয়াত হিজরতের সফরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত গণ্য করা হয়। মোটকথা এই যে, এই সূরা মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং মদীনায় পৌঁছেই কাফিরদের সাথে জিহাদ ও যুদ্ধের বিধানাবলী নাযিল হয়েছে।

صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ—এখানে سَبِيلِ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র পথ) বলে ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ বলে কাফিরদের ঐ সকল কর্ম বোঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে সৎ কর্ম, যেমন ফকীর-মিসকীনকে সাহায্য ও সহায়তা করা, প্রতিবেশীর সমর্থন ও হিফাযত করা, দানশীলতা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব কর্ম যদিও প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম, কিন্তু ঈমানসহ হলেই পরকালে এগুলো দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। কাফিরদের এ ধরনের সৎ কর্ম পরকালে তাদের জন্য মোটেই উপকারী হবে না। তবে তাদের সৎ কর্মের বিনিময়ে ইহকালেই তাদেরকে আরাম ও সুখ দান করা হয়।

وَ اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ—যদিও পূর্ববর্তী বাক্যেও ঈমান ও সৎ কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বাক্যে একথা স্পষ্টভাবে পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্য ব্যক্ত করা যে, শেষনবী মুহাম্মদ (সা)-এর সমস্ত শিক্ষা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার উপরই ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ—بَال শব্দটি কখনও অবস্থার অর্থে এবং কখনও অন্তরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থ নেওয়া যায়। প্রথম অর্থে আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অবস্থাকে অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্মকে ভাল করে দেন। দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরকে ঠিক করে দেন। এর সারমর্মও সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া। কেননা, কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া অন্তর ঠিক করে দেওয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۛ

(৪) অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সংবরণ করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'মিনরা সংস্কারকামী এবং কাফিররা অনর্থকামী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুফর ও কাফিরদের অনর্থ দূর করার জন্য আলোচ্য আয়াতে জিহাদের বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে)। অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর, তখন তাদের গর্দান মার, অবশেষে যখন তাদের খুব রক্তপাত ঘটিয়ে নাও, (এর অর্থ কাফিরদের শৌর্যবীর্য নিঃশেষ হয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধ বন্ধ করা হলে মুসলমানদের ক্ষতি অথবা কাফিরদের প্রবল হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকা) তখন (কাফিরদেরকে বন্দী করে) খুব শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর (তোমরা উভয় কাজ করতে পার) হয় তাদেরকে মুক্তিপণ না নিয়ে মুক্ত করে দেবে, না হয় মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেবে। (এই যুদ্ধ ও বন্দী করার নির্দেশ তখন পর্যন্ত) যে পর্যন্ত না (শত্রু) যোদ্ধারা অস্ত্র সংবরণ করে। (অর্থাৎ হয় তারা ইসলাম কবূল করবে, না হয় মুসলমানদের যিম্মী হয়ে বসবাস করতে রাযী হবে। এরূপ করলে যুদ্ধ ও বন্দী কোন কিছুই করা জায়েয হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক. যুদ্ধের মাধ্যমে কাফিরদের শৌর্যবীর্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করতে হবে। দুই. অতঃপর এই যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদেরকে দু'রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত কৃপাবশত তাদেরকে কোন রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। মুক্তিপণ এরূপও হতে পারে যে, আমাদের কিছু-সংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দী থাকলে তাদের বিনিময়ে কাফির বন্দীদেরকে মুক্ত করা এবং এরূপও হতে পারে যে, কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। এই বিধান পূর্ব-বর্ণিত সূরা আনফালের বিধানের বাহ্যত খেলাফ। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তিবাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল—যদি এই আযাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা, তারা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সার কথা এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও নিষিদ্ধ করেছিল। কাজেই মুক্তি-পণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া আরও উত্তমরূপে নিষিদ্ধ ছিল। সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদ বলেন যে, সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হাসান, আতা (র), অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের উক্তি তাই। সওরী, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (র) প্রমুখ ফিকহবিদ ইমামের মাযহাবও তাই। হযরত ইবনে

আব্বাস (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তখন কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সূরা মুহাম্মদে কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়ার অনুমতি দান করা হয়। তফসীরে মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ্ এ কথাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, এ উক্তিই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। কেননা, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) একে কার্যে পরিণত করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও একে কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাই এই আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। কারণ এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। বদর যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর রসূলুল্লাহ্ (সা) ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে মুক্ত করেছিলেন।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কার আশি জন কাফির রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অতর্কিতে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তানয়ীম পাহাড় থেকে নিচে অবতরণ করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতহের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ

اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ○

এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র প্রসিদ্ধ মাযহাব এই যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া জায়েয নয়। এ কারণেই হানাফী আলিমগণ সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াতকে ইমাম আযমের মতে রহিত ও সূরা আনফালের আয়াতকে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরে মাযহারী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সূরা আনফালের আয়াত পূর্বে এবং সূরা মুহাম্মদের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সূরা মুহাম্মদের আয়াতই রহিতকারী এবং সূরা আনফালের আয়াত রহিত। ইমাম আযমের পছন্দনীয় মাযহাবও অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের অনুরূপ মুক্ত করা জায়েয বলে তফসীরে মাযহারী বর্ণনা করেছে। যদি এতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে, তফসীরে মাযহারীর মতে এটাই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় মাযহাব। হানাফী আলিমগণের মধ্যে আল্লামা ইবনে হুমাম (র) 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থে এই মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেন ঃ কুদূরী ও হিদায়ার বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযমের মতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করা যায় না। এটা ইমাম আযম থেকে বর্ণিত এক রিওয়ায়েত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই অপর এক রিওয়ায়েত 'সিয়ারে কবীরে' জমহুরের উক্তির অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, মুক্ত করা জায়েয। উভয় রিওয়ায়েতের মধ্যে শেষোক্ত রিওয়ায়েতই অধিক স্পষ্ট। ইমাম তাহাভী (র) 'মা-'আনিউল আসারে' একেই ইমাম আযমের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা এই যে, সূরা মুহাম্মদ ও সূরা আনফালের উভয় আয়াত অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্‌হবিদের মতে রহিত নয়। মুসলমানদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনকর্তা এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরতুবী রসূলুল্লাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনও হত্যা করা হয়েছে, কখনও গোলাম করা হয়েছে, কখনও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং কখনও মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া এই উভয় ব্যবস্থাই মুক্তিপণ নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা উভয় ব্যবস্থাই প্রমাণিত আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, এ ব্যাপারে যে সব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তদ্রূপ নয়; বরং সবগুলো অকাট্য আয়াত। কোন আয়াতই রহিত নয়। কেননা, কাফিররা যখন বন্দী হয়ে আমাদের হাতে আসবে, তখন মুসলিম শাসনকর্তা চারটি ধারার মধ্য থেকে যে কোনটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করলে বন্দীদেরকে হত্যা করবেন, উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাদেরকে গোলাম ও বাঁদী করে নেবেন, মুক্তিপণ নেওয়া উপযুক্ত মনে করলে অর্থকড়ি নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে ছেড়ে দেবেন অথবা কোনরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেবেন। এরপর কুরতুবী লিখেন ঃ

وهذا القول يروىٰ من اهل المدينة والشافعى وابى عبيد
وحكاه الطحاوى مذهبا عن ابى حنيفة والمشهور ما قدمناه -

অর্থাৎ মদীনার আলিমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী ও আবূ ওবায়েদ (র)-এর উক্তি। ইমাম তাহাভী, ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মাযহাব এর বিপক্ষে।

যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসনকর্তার চারটি ক্ষমতা ঃ উপরোক্ত বক্তব্য থেকে ফুটে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকে গোলাম বানাতে পারবেন। এই প্রশ্নে উম্মতের সবাই একমত। মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ।

ইসলামে দাসত্বের আলোচনা ঃ এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে তো ফিক্‌হবিদগণের মধ্যে কিছু না কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু হত্যা করা ও গোলাম বানানোর বৈধতার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করা উভয় ব্যবস্থাই জায়েয। এমতাবস্থায় কোরআন পাকে এই ব্যবস্থাদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়নি কেন? শুধু মুক্ত করে দেওয়ার দুই ব্যবস্থাই কেন উল্লেখ করা হল? ইমাম রাযী (র) তফসীরে কবীরে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এখানে কেবল এমন দুইটি ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা সর্বত্র ও সর্বদা বৈধ। দাসে পরিণত

করার কথা উল্লেখ না করার কারণ এই যে, আরবের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি নেই এবং পঙ্গু ইত্যাদি লোকের হত্যাও জায়েয নয়। এতদ্ব্যতীত হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে।—(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৮)

দ্বিতীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা সুবিদিত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল। সবাই জানত যে, এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। এর বিপরীতে মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি বদর যুদ্ধের সময় রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। এখন এস্থলে মুক্ত ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাই এরই দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তিপণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। যেসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই বৈধ ছিল সেগুলোকে এস্থলে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব আয়াতদৃষ্টে একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিতই হয়ে যেত, তবে কোরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হত। যদি আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজ্ঞার স্থলাভিষিক্ত হত তবে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পর কোরআন ও হাদীসের অকৃত্রিম ভক্ত সাহাবায়ে কিরাম অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিণত করার কথা এত অধিক পরিমাণে ও পরম্পরা সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববৃহৎ সংরক্ষক হয়ে দাসত্বের অনুমতি কিরূপে দিল? প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বৈধকৃত দাসত্বকে জগতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করে নেওয়ার কারণেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে যেসব অধিকার দান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টির স্বরূপ ও প্রাণ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় যে, অনেক অবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ মসিও গোস্তাও লিবান তদীয় 'আরবের তমদ্দুন' গ্রন্থে লিখেন ঃ

"বিগত ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে লিখিত আমেরিকান ঐতিহ্য পাঠে অভ্যস্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি 'দাস' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তবে তার মানসপটে এমন মিসকীনদের চিত্র ভেসে উঠে, যাদেরকে শিকল দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে, গলায় বেড়ী পরানো হয়েছে এবং বেত মেরে মেরে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের খোরাক প্রাণটা কোনরূপ দেহে আটকে রাখার জন্যও যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য অন্ধকারময় কক্ষ ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না। আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই চিত্র কতটুকু সঠিক এবং ইংরেজরা কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকায় যা কিছু করেছে তা এই চিত্রের অনুরূপ কি না।' - - - কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলমানদের কাছে দাসের যে চিত্র তা খৃস্টানদের চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (ফরীদ ওয়াজদী প্রণীত দায়েরা মা'আরেফুল কোরআন থেকে উদ্ধৃত। (৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯)

প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক অবস্থায় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার চাইতে উত্তম কোন পথ থাকে না। কেননা দাসে পরিণত না করা হলে যৌক্তিক দিক দিয়ে তিন অবস্থাই সম্ভবপর—হয় হত্যা করা হবে, না হয় মুক্ত ছেড়ে দেওয়া হবে, না হয় যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই তিন অবস্থা উপযোগিতার পরিপন্থী হয়। কোন কোন বন্দী উৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে, এ কারণে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুক্ত ছেড়ে দিলে মাঝে মাঝে এমন আশংকা থাকে যে, স্বদেশে পৌঁছে সে মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে যাবে। এখন দুই অবস্থাই অবশিষ্ট থাকে—হয় তাকে যাবজ্জীবন বন্দী রেখে আজকালকার মত কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবাধিকারের পুরোপুরি দেখা-শোনা করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা কোন্‌টি? বিশেষত দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরও সহজ। দাসদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে রসূলে করীম (সা) নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

اخو ا نكم جعلهم ا لله تحت ايديكم فمن كا ن اخو ه تحت يد يه فليطعمه
ما يا كل و ليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فا ن كلفه يغلبه فليعنه-

তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব যার ভাই তার অধীনস্থ হয় সে যেন তাকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায়, যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয়, যা তার জন্য অসহনীয়। যদি এমন কাজের ভার দেয়, তবে যেন সে তাকে সাহায্য করে।—(বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে তা স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি। সেমতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি ; বরং প্রভুদেরকে اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ আয়াতের মাধ্যমে জোর তাকীদও করেছে। এমনকি তারা স্বাধীন ও মুক্ত নারীদেরকেও বিবাহ করতে পারে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদের অংশ স্বাধীন মুজাহিদের সমান। শত্রুকে প্রাণের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উক্তিও তেমনি ধর্তব্য, যেমন স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের উক্তি। কোরআন ও হাদীসে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশাবলী এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রে সন্নিবেশিত করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যেতে পারে। হযরত আলী (রা) বলেন, দু'জাহানের নেতা হযরত রসূলে মকবুল (সা)-এর পবিত্র মুখে যে বাক্যাবলী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছিল এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল এই ঃ الصّلوٰ ة الصّلوٰ ة اتقوا الله فيما ملكت ايما نكم—অর্থাৎ নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ, নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তোমাদের অধীনস্থ দাসদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।—(আবু দাউদ)

ইসলাম দাসদেরকে শিক্ষাদীক্ষা অর্জনেরও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই জ্ঞান-গরিমায় যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা সবাই দাসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। এরপর এই নামেমাত্র দাসত্বকেও পর্যায়ক্রমে বিলীন করা অথবা হ্রাস করার জন্য দাসদেরকে মুক্ত করার ফযীলত কোরআন ও হাদীসে ভূরি ভূরি বর্ণিত হয়েছে, যাতে মনে হয় যেন অন্য কোন সৎকর্ম এর সমকক্ষ হতে পারে না। ফিকহের বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মুক্ত করার জন্য বাহানা তালাশ করা হয়েছে। রোযার কাফ্ফারা, হত্যার কাফ্ফারা, জিহারের কাফ্ফারা ও কসমের কাফ্ফারার মধ্যে দাস মুক্ত করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যায়ভাবে চপেটাঘাত করে, তবে এর কাফ্ফারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করে দেওয়া।—(মুসলিম) সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস ছিল তাঁরা অকাতরে প্রচুর সংখ্যক দাস মুক্ত করতেন। 'আন্নাজমুল ওয়াহ্হাজ'-এর গ্রন্থকার কোন কোন সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

হযরত আয়েশা (রা)—৬৯, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম—১০০, হযরত ওসমান গনী (রা)—২০, হযরত আব্বাস (রা)—৭০, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)—১০০০, হযরত যুল কা'লা হিমইয়ারী (রা)—৮০০০ (মাত্র এক দিনে), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)—৩০,০০০।—(ফতহুল আল্লাম, টীকা বুলুগুল মারাম, নবাব সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃঃ) এ থেকে জানা যায় যে, মাত্র সাতজন সাহাবী ৩৯,২৫৯ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, অন্য আরও হাজারো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশী হবে। মোট কথা ইসলাম দাসত্বের ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী সংস্কার সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসত্বকে অন্যান্য জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এসব সংস্কার সাধনের পর যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারে। এরূপ করা মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব নয়। বরং কোরআন ও হাদীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই উত্তম বোঝা যায়। দাসে পরিণত করার এই অনুমতিও ততক্ষণ, যতক্ষণ শত্রুপক্ষের সাথে এর বিপরীত কোন চুক্তি না থাকে। যদি শত্রুপক্ষের সাথে চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করব না, তবে এই চুক্তি মেনে চলা অপরিহার্য হবে। বর্তমান যুগে বিশ্বের অনেক দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। কাজেই যেসব মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাদের জন্য চুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোন বন্দীকে দাসে পরিণত করা বৈধ নয়।

ذٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ
بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝
سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا
مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكٰفِرِيْنَ
اَمْثَالُهَا ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ
لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝

(৪-ক) একথা শুনলে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে শোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়, আল্লাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৬) অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (৭) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। (৮) আর যারা কাফির, তাদের জন্য আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দেবেন। (৯) এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফিরদের অবস্থা এরূপই হবে। (১১) এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের হিতৈষী বন্ধু এবং কাফিরদের কোন হিতৈষী বন্ধু নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(জিহাদের) এই নির্দেশ (যা বর্ণিত হয়েছে) পালন কর। (কোন কোন অবস্থায় কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আল্লাহ্ জিহাদ প্রবর্তন করেছেন। এটা

বিশেষ তাৎপর্যের কারণে। নতুবা) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে (নিজেই নৈসর্গিক ও মর্ত্যের আযাব দ্বারা) তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন (যেমন পূর্ববর্তী উম্মতদের কাছ থেকে এমনি ধরনের প্রতিশোধ নিয়েছেন। কারও উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে, কাউকে ঝড়ঝঞ্ঝা আক্রমণ করেছে এবং কাউকে নিমজ্জিত করা হয়েছে। এরূপ হলে তোমাদেরকে জিহাদ করতে হতো না)। কিন্তু (তোমাদেরকে জিহাদ করার নির্দেশ এই জন্য দিয়েছেন যে) তিনি তোমাদের একককে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (মুসলমানদের পরীক্ষা এই যে, কে আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীতে নিজের জীবনকে মূল্যবান মনে করে তা দেখা এবং কাফিরদের পরীক্ষা এই যে, জিহাদ ও হত্যার দৃশ্য দেখে কে হুঁশিয়ার হয়ে কে সত্যকে কবূল করে, তা দেখা। জিহাদে যেমন কাফিরদেরকে হত্যা করা সাফল্য, তেমনি কাফির-দের হাতে নিহত হওয়াও ব্যর্থতা নয়। কেননা) যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্মকে (জিহাদের এই কর্মসহ) কখনও বিনষ্ট করবেন না। (বাহ্যত মনে করা যায় যে, যখন তারা কাফিরদের বিপক্ষে জয়লাভ করতে পারল না এবং নিজেরাই নিহত হল, তখন যেন তাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে গেল। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা তাদের কর্মের অপর একটি ফল অর্জিত হয়, যা বাহ্যিক সফলতার চাইতে বহুগুণে উত্তম। তা এই যে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (মনযিলে) মকসূদ পর্যন্ত (যা পরে বর্ণিত হবে) পৌঁছে দেবেন এবং তাদের অবস্থা (কবর, হাশর-পুলসিরাত ও পরকালের সব জায়গায়) ভাল রাখবেন। (কোথাও কোন ক্ষতি ও অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না) এবং (এই মনযিলে মকসূদ পর্যন্ত পৌঁছা এই যে) তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন যা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। (ফলে প্রত্যেক জান্নাতী নিজ নিজ বাসস্থানে কোনরূপ খোঁজাখুঁজি ছাড়াই নির্বিবাদে পৌঁছে যাবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদে বাহ্যিক পরাজয় অর্থাৎ নিজে নিহত হওয়াও বিরাট সাফল্য। অতঃপর জিহাদের পার্থিব উপকারিতা ও ফযীলত বর্ণনা করে তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছেঃ) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে (অর্থাৎ তার দীন প্রচারে) সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন (এর পরিণতি দুনিয়াতেও শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করা—প্রথমেই হোক কিংবা কিছুদিন পর পরিণামে হোক। কোন কোন মু'মিনের নিহত হওয়া কিংবা কোন যুদ্ধে সাময়িক পরাজয় বরণ করা এর পরিপন্থী নয়) এবং (শত্রুর মুকাবিলায়) তোমাদের পা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখবেন—(প্রথমেই হোক কিংবা সাময়িক পরাজয়ের পরে হোক আল্লাহ্ তাদেরকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রেখে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। দুনিয়াতে বারবার এরূপ প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এ হচ্ছে মুসলমানদের অবস্থার বর্ণনা) আর যারা কাফির তাদের জন্য (দুনিয়াতে মু'মিনদের মুকাবিলা করার সময়) দুর্ভোগ (ও পরাজয়) রয়েছে এবং (পরকালে) তাদের কর্মসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা নিস্ফল করে দেবেন (যেমন সূরার প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা কাফিররা উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং) এটা (অর্থাৎ কাফিরদের ক্ষতি ও কর্মসমূহের নিস্ফল হওয়া) এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা পছন্দ করে না (বিশ্বাস-গতভাবেও এবং কর্মগতভাবেও) অতএব, আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহকে (প্রথম থেকেই) বরবাদ করে দিয়েছেন। (কেননা কুফর সর্বোচ্চ বিদ্রোহ। এর পরিণতি তাই। তারা যে আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করে না) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি, অতঃপর দেখেনি যে,

তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন (তাদের জনশূন্য প্রাসাদ ও বাসস্থান দেখেই তা বোঝা যায়। অতএব, তাদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। তারা কুফর থেকে বিরত না হলে) এ কাফিরদের জন্যও অনুরূপ শাস্তি রয়েছে। (অতঃপর উভয় পক্ষের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে)। এটা (অর্থাৎ মুসলমানদের সাফল্য ও কাফিরদের ধ্বংস) এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের অভিভাবক এবং কাফিরদের (এরূপ) কোন অভিভাবক নেই (যে আল্লাহ্র মুকাবিলায় তাদের কার্যোদ্ধার করতে পারে। ফলে তারা উভয় জাহানে অকৃতকার্য থাকে। মুসলমানরা কোন সময় দুনিয়াতে সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও পরিণামে সফল হবে। পরকালের সফল তো সুস্পষ্টই। অতএব, মুসলমান সর্বদা সফলকাম এবং কাফির সর্বদা ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে থাকে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জিহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি রহস্য : وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের সিদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে একটি রহমত। কেননা জিহাদকে আসমানী আযাবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ কুফর, শিরক ও আল্লাহ্-দ্রোহিতার শাস্তি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আসমান ও যমীনের আযাব দ্বারা দেওয়া হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও এরূপ হতে পারত, কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীনের কল্যাণে এই উম্মতকে এ ধরনের আযাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর স্থলে জিহাদ সিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক আযাবের তুলনায় অনেক নমনীয়তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। প্রথম এই যে, ব্যাপক আযাবে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জিহাদে নারী ও শিশুরা তো নিরাপদ থাকেই, পরন্তু পুরুষও তারাই আক্রান্ত হয়, যারা আল্লাহ্র ধর্মের হিফাযতকারীদের মুকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। তাদের মধ্যেও সবাই নিহত হয় না; বরং অনেকের ইসলাম ও ঈমানের তওফীক হয়ে যায়। জিহাদের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের অর্থাৎ মুসলমান ও কাফিরের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে আল্লাহ্র নির্দেশে নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় এবং কে অবাধ্যতা ও কুফরে অটল থাকে কিংবা ইসলামের উজ্জ্বল প্রমাণাদি দেখে ইসলাম কবুল করে।

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ—সূরার প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, যারা কুফর ও শিরক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেবেন; অর্থাৎ তারা যেসব সদকা-খয়রাত ও জনহিতকর কাজ করে, শিরক ও কুফরের কারণে সেগুলোর কোন সওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় তাঁদের কর্ম বিনষ্ট হয় না; অর্থাৎ তারা কিছু গোনাহ্ করলেও সেই গোনাহের কারণে তাদের সৎকর্ম হ্রাস পায় না। বরং অনেক সময় তাদের সৎকর্ম তাদের গোনাহ্র কাফফারা হয়ে যায়।

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ এতে শহীদের দু'টি নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। এক. আল্লাহ্ তাকে হিদায়ত করবেন, দুই. তার সমস্ত অবস্থা ভাল করে দেবেন। অবস্থা বলতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এই যে, যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের সওয়াবের অধিকারী হবে। আখিরাতে এই যে, সে কবরের আযাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু লোকের হক তার যিম্মায় থেকে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা হকদারদেরকে তার প্রতি রাযী করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। (মাযহারী) শহীদ হওয়ার পর হিদায়ত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে 'মনযিলে মকসূদ' অর্থাৎ জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন; যেমন কোরআনে জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে পৌঁছে একথা বলবে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ—এ হচ্ছে একটি তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌঁছানো হবে না; বরং তাদের অন্তরে আপনা-আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নিয়ামত তথা হুর ও গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যেই বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ, জান্নাত ছিল একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেওয়ার মধ্যে ও সেখানকার বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন: সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চাইতেও বেশী জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা হবে। (মাযহারী) কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জান্নাতে তার স্থান বলে দেবে এবং সেখানকার স্ত্রীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

وَلِلْكَافِرِيْنَ اَمْثَالُهَا—এখানে মক্কার কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করার উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেমন আযাব এসেছে, তেমনি তোমাদের উপরও আসতে পারে। কাজেই তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না।

مَوْلٰى—وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অভিভাবক। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর আরেক অর্থ মালিক

কোরআনের অন্যত্র কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ

এতে আল্লাহ্ তা'আলাকে কাফিরদেরও মাওলা বলা হয়েছে। কারণ, এখানে মাওলা শব্দের অর্থ মালিক। আল্লাহ্ তা'আলা সবারই মালিক। মু'মিন-কাফির কেউ এই মালিকানার বাইরে নয়।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ۝ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ۝ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝

(১২) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফির, তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। (১৩) যে জনপদ আপনাকে বহিষ্কার করেছে, তদপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (১৪) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৫) পরহিযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপ : তাতে আছে নিষ্কলুষ পানির নহর, দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায়

তাদের জন্য আছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহিযগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। আর যারা কাফির, তারা (দুনিয়াতে) ভোগবিলাসে মত্ত আছে এবং (পরকাল বিস্মৃত হয়ে) চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। চতুষ্পদ জন্তুরা চিন্তা করে না যে, তাদেরকে কেন পানাহার করানো হচ্ছে এবং তাদের যিম্মায় এর বিনিময়ে কি প্রাপ্য আছে? তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। (উপরে কাফিরদের ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। এতে আপনার শত্রুদের ধোঁকা খাওয়া উচিত নয় এবং তাদের উদাসীনতা দেখে আপনারও দুঃখিত হওয়া সমীচীন নয়। ভোগবিলাসই তাদের বিরোধিতার কারণ। এমনকি, তারা আপনাকে অতিষ্ঠ করে মক্কায়ও বসবাস করতে দেয়নি। কেননা) আপনার যে জনপদ আপনাকে বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করেছে, তদপেক্ষা অনেক শক্তিশালী বহু জনপদকে আমি (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করে দিয়েছি, অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (এমতাবস্থায় এরা কি? এদের অহংকার করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলেই এদেরকে নির্মূল করতে পারেন। আপনি এদের ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাস দেখে দুঃখিত হবেন না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট সময়ে এদেরকেও শাস্তি দেবেন)। যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট (ও প্রামাণ্য) পথ অনুসরণ করে, সে কি তাদের সমান হতে পারে, যাদের কাছে তাদের কুকর্ম শোভনীয় মনে হয় এবং যারা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে? (অর্থাৎ উভয় দলের কাজকর্মে যখন তফাৎ আছে, তখন পরিণতিতেও তফাৎ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে সত্যপন্থী সে সওয়াবের এবং যে মিথ্যাপন্থী সে আযাব ও শাস্তির যোগ্য। এই সওয়াব ও শাস্তির বর্ণনা এই যে) পরহিযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়, তার অবস্থা নিম্নরূপ : তাতে আছে নিষ্কলুষ পানির অনেক নহর (এই পানির গন্ধ ও স্বাদে কোন পরিবর্তন হবে না) দুধের অনেক নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের অনেক নহর এবং পরিশোধিত মধুর অনেক নহর। তথায় তাদের জন্য আছে রকমারি ফলমূল এবং (তাতে প্রবেশের পূর্বে) তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (গোনাহের) ক্ষমা। তারা কি তাদের সমান যারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, অতঃপর তা তাদের নাড়ীভুঁড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ কোন কোন সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। দুনিয়ার দুধও তেমনি বাসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শরাব বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে। তবে কোন কোন উপকারের কারণে পান করা হয়, যেমন তামাক কড়া হওয়া সত্ত্বেও খাওয়া হয় এবং খেতে

খেতে অভ্যাস হয়ে যায়। জান্নাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সবই পরিবর্তন ও বিস্বাদ থেকে মুক্ত। জান্নাত অন্যান্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু থেকেও মুক্ত, একথা সূরা সাফ্ফাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে : لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ এমনিভাবে দুনিয়ার মধুর মধ্যে মোম ও আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের মধু পরিশোধিত হবে। বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, জান্নাতে আক্ষরিক অর্থেই পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চার প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রূপক অর্থ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে, জান্নাতের বস্তুসমূহকে দুনিয়ার বস্তুসমূহের অনুরূপ মনে করা যায় না। সেখানকার প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ ও আনন্দ ভিন্নরূপ হবে, যার নযীর পৃথিবীতে নেই।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٨﴾

(১৬) তাদের মধ্যে কতক আপনার দিকে কান পাতে, অতঃপর যখন আপনার কাছ থেকে বাইরে যায়, তখন যারা শিক্ষিত, তাদেরকে বলে : এইমাত্র তিনি কি বললেন? এদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৭) যারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের সৎপথপ্রাপ্তি আরও বেড়ে যায় এবং আল্লাহ্ তাদেরকে তাকওয়া দান করেন। (১৮) তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, কিয়ামত অকস্মাৎ তাদের কাছে এসে পড়ুক। বস্তুত কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে নবী (সা)] তাদের মধ্যে কতক (অর্থাৎ মুনাফিক সম্প্রদায় আপনার প্রচার ও শিক্ষাদানের সময় বাহ্যত) আপনার দিকে কান পাতে (কিন্তু আন্তরিকভাবে মোটেও মনোযোগী হয় না)। অতঃপর যখন তারা আপনার কাছ থেকে (উঠে মজলিস ত্যাগ করে)

বাইরে যায়, তখন অন্যান্য শিক্ষিত (সাহাবী)-দেরকে বলে ঃ এইমাত্র (প্রথম আমরা মজলিসে ছিলাম, তখন) তিনি কি বলেছিলেন? (তাদের একথা বলাও ছিল এক প্রকার বিদ্রূপ বিশেষ। এতে করে একথা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা আপনার কথা-বার্তাকে ভ্রুক্ষেপযোগ্যই মনে করি না। এটাও এক প্রকার কপটতাই ছিল)। এরাই তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন (ফলে তারা হিদায়েত থেকে দূরে সরে পড়েছে)। এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (তাদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে) যারা সৎপথে আছে (অর্থাৎ মুসলমান হয়ে গেছে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (নির্দেশাবলী শ্রবণ করার সময়) আরও বেশী হিদায়েত করেন (ফলে তারা নতুন নির্দেশাবলীতেও বিশ্বাস করে অর্থাৎ তাদের ঈমান আমার বিষয়বস্তু বেড়ে যায় অথবা তাদের ঈমানকে আরও বেশী শক্তিশালী করে দেন। এটাই সৎকর্মের বৈশিষ্ট্য) এবং তাদেরকে তাকওয়ার তওফীক দান করেন। (অতঃপর মুনাফিক-দের উদ্দেশ্যে এ মর্মে শাস্তির খবর বর্ণিত হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলী শুনেও প্রভা-বান্বিত হয় না। এতে বোঝা যায় যে) তারা এ বিষয়েরই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত অকস্মাৎ তাদের উপর এসে পড়ুক। (একথা শাসানির ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও যে হিদায়ত অর্জন করছে না, তবে কি তারা কিয়ামতে হিদায়ত হাসিল করবে?) অতএব (মনে রেখ, কিয়ামত নিকটবর্তীই। সেমতে) তার কয়েকটি লক্ষণ তো এসেই গেছে। (সেমতে হাদীসদৃষ্টে স্বয়ং শেষ নবীর আগমন এবং নবুওয়তও কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম। চন্দ্র বিখণ্ডিত করার ঘটনাটি যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মো'জেযা, তেমনি কিয়ামতের লক্ষণও। এসব লক্ষণ কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ঈমান আনা ও হিদায়ত লাভ করার ব্যাপারে কিয়ামতের অপেক্ষা করা নিরেট মূর্খতা। কেননা, সে সময়টি বোঝার ও আমল করার সময় হবে না। বলা হয়েছে ঃ) যখন কিয়ামত এসে পড়বে, তখন তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে? (অর্থাৎ তখন উপদেশ উপকারী হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اشراط শব্দের অর্থ আলামত, লক্ষণ। খাতামুন্নাবীয়্যিন (সা)-এর আবির্ভাবই কিয়ামতের প্রাথমিক লক্ষণ। কেননা, খতমে-নবুওয়তও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। এমনিভাবে চন্দ্র বিখণ্ডিত করার মো'জেযাকে কোরআনে اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাও কিয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। এসব প্রাথমিক আলামত কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য আলামত সহীহ্ হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে শুনেছেন—নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কিয়ামতের আলামত ঃ জ্ঞানচর্চা উঠে যাবে। অজ্ঞানতা বেড়ে যাবে। ব্যভিচারের প্রসার হবে। মদ্যপান বেড়ে যাবে। পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে; এমনকি, পঞ্চাশ

জন নারীর ভরণ-পোষণ একজন পুরুষ করবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, ইলম হ্রাস পাবে এবং মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে।—(বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন যুদ্ধলব্ধ মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে এবং আমানতকে যুদ্ধলব্ধ মাল সাব্যস্ত করা হবে (অর্থাৎ হালাল মনে করে খেয়ে ফেলবে) যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে (অর্থাৎ আদায় করতে কুণ্ঠিত হবে) ইল্‌মে-দীন পার্থিব স্বার্থের জন্য অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বন্ধুকে নিকটে রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হট্টগোল শুরু হবে, পাপাচারী ব্যক্তি কওমের নেতা হয়ে যাবে, হীনতম ব্যক্তি জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের ভয়ে দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে, গায়িকা নারীদের গানবাদ্য ব্যাপক হয়ে যাবে, বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদ্যপান করা হবে এবং উম্মতের সর্বশেষ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে, তখন তোমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অপেক্ষা করো ঃ একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে পুঁতে যাওয়ার, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণের এবং কিয়ামতের অন্যান্য আলামতের, যেগুলো একের পর এক এভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন মুতির মালা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একটি একটি করে মাটিতে খসে পড়ে।

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ۝۱۹

---

(১৯) জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আপ-নার ত্রুটির জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন আপনি আল্লাহ্র অনুগত ও অবাধ্য উভয় শ্রেণীর অবস্থা ও পরিণতি শুনলেন, তখন) আপনি (উত্তমরূপে) জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। (এতে ধর্মের যাবতীয় মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা এসে গেছে। কেননা, জেনে রাখুন, বলে পুরো-পুরি জেনে রাখা বোঝানো হয়েছে। পুরোপুরি জেনে রাখার জন্য আল্লাহ্র বিধানাবলী পুরোপুরি আমলে আনা অপরিহার্য। মোটকথা এই যে, সমস্ত বিধান সর্বক্ষণ পালন করুন। যদি কোন সময় ত্রুটি হয়ে যায় তা আপনার নিষ্পাপতার কারণে গোনাহ্ নয়; বরং শুধু উত্তমকে বর্জন করার শামিল হবে। কিন্তু আপনার উচ্চমর্যাদার দিক দিয়ে দৃশ্যত ত্রুটি। তাই) আপনি (এই বাহ্যিক) ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সব মু'মিন পুরুষ ও নারীর জন্যও (ক্ষমার দোয়া করতে থাকুন। একথাও স্মর্তব্য যে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থানের (অর্থাৎ সব অবস্থা ও কাজকর্মের) খবর রাখেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানও একথা জানে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি একথা জানবেন না কেন ? এমতাবস্থায় এই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দানের অর্থ হয় এর উপর দৃঢ় ও অটল থাকা, না হয় তদনুযায়ী আমল করা। কুরতুবী বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে কেউ ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন ঃ তুমি কি কোরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ এতে ইলমের পর আমলের নির্দেশ রয়েছে। অন্যত্র আছে اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ আরও বলা হয়েছে ঃ سَابِقُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَاعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ এরপর বলা হয়েছে فَاحْذَرُوهُمْ এসব জায়গায় প্রথমে ইলম অতঃপর তদনুযায়ী আমল করার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও রসূলুল্লাহ্ (সা) যদিও পূর্ব থেকে একথা জনতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য তদনুযায়ী আমল করা। এ কারণেই এরপর وَاسْتَغْفِرْ অর্থাৎ ইস্তিগফারের আদেশ দান করা হয়েছে। পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যদিও এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও স্থল বিশেষে ইজতিহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। শরীয়তের আইনে ইজতিহাদী ভুল গোনাহ্ নয়; বরং এই ভুলেরও সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গম্বর-গণকে এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরি-প্রেক্ষিতে এই ভুলকে ذنب তথা গোনাহ্ শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়, যেমন সূরা আবাসায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ কঠোর সতর্কবাণী এই ইজতিহাদী ভুলেরই একটি দৃষ্টান্ত। সূরা আবাসায় এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে যে, সেই ইজতিহাদী ভুল যদিও গোনাহ্ ছিল না; বরং এরও এক সওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভুলকে পছন্দ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াতে এমনি ধরনের গোনাহ্ বোঝানো যেতে পারে।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা বেশী পরিমাণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ কর এবং ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা

কর। ইবলীস বলে ঃ আমি মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, প্রত্যুত্তরে তারা আমাকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করে ধ্বংস করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা সৎ কাজ মনে করে সম্পন্ন করে (যেমন সাধারণ বিদ'আতসমূহের অবস্থা তদ্রূপই)। এতেকরে তাদের তওবা করারও তওফীক হয় না।

مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰكُمْ — مُتَقَلَّب-এর শাব্দিক অর্থ ওলটপালট হওয়া এবং مثوى শব্দের অর্থ অবস্থানস্থল। তফসীরবিদগণ এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর অর্থই এখানে উদ্দিষ্ট। কেননা, প্রত্যেক মানুষের উপর দ্বিবিধ অবস্থা আসে। এক. যে অবস্থার সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয় এবং দুই. যে অবস্থাকে সে স্থায়ী বৃত্তি মনে করে। এমনিভাবে কোন কোন গৃহে মানুষ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কোন কোন গৃহে স্থায়ীভাবে। আয়াতে অস্থায়ীকে متقلب শব্দ দ্বারা এবং স্থায়ীকে مثوى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষের যাবতীয় অবস্থার খবর রাখেন।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِسْرَارَهُمْ ۝ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَآ أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا
رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۝ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم
بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۝
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّٰبِرِينَ
وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ ۝

(২০) যারা মু'মিন, তারা বলেঃ একটি সূরা নাযিল হয় না কেন ? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য। (২১) তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহ্র প্রতি প্রদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। (২২) ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (২৩) এদের প্রতিই আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (২৪) তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ ? (২৫) নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্য তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। (২৬) এটা এজন্য যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাব, অপছন্দ করেঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ্ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন। (২৭) ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে ? (২৮) এটা এজন্য যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। (২৯) যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না ? (৩০) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন। (৩১) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব

যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থাসমূহ যাচাই করি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা মু'মিন, তারা (তো সর্বদা উৎসুক থাকে যে, আরও কালাম নাযিল হোক, যাতে ঈমান তাজা হয় এবং নতুন নতুন নির্দেশ আসলে তারও সওয়াব হাসিল করা যায়; আর সাবেক নির্দেশের তাকীদ আসলে আরও দৃঢ়তা অর্জিত হয়। এই ঔৎসুক্যের কারণে) বলে, কোন (নতুন) সূরা নাযিল হয় না কেন? (নাযিল হলে আমাদের আশা পূর্ণ হত)। অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন (বিষয়বস্তুর) সূরা নাযিল হয় এবং (ঘটনাক্রমে) তাতে জিহাদেরও (পরিষ্কার) উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যু ভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত (ভয়ানক দৃষ্টিতে) তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। (এরূপ তাকানোর কারণ ভয় ও কাপুরুষতা। কারণ, এখন ঈমানের দাবী সপ্রমাণের জন্য তাদের জিহাদে যেতে হবে। তারা যে এভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে,) অতএব (আসল কথা এই যে) সত্বরই তাদের দুর্ভোগ আসবে। (দুনিয়াতেও কোন বিপদে গ্রেফতার হবে, নতুবা পরকালে তো অবশ্যই হবে। অবসর সময়ে যদিও তারা আনুগত্য ও খোশামোদের অনেক কথাবার্তা বলে, কিন্তু) তাদের আনুগত্য ও মিষ্টবাক্য (অর্থাৎ মিষ্টবাক্যের স্বরূপ) জানা আছে। (জিহাদের নির্দেশ নাযিল হওয়ার সময় তাদের অবস্থা দেখে এখন সবার কাছেই তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে)। অতঃপর (জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর) যখন জিহাদের প্রস্তুতি হয়েই যায়, তখন (ও) যদি তারা (ঈমানের দাবীতে) আল্লাহ্র কাছে সাচ্চা থাকে (অর্থাৎ ঈমানের দাবী অনুযায়ী সাধারণভাবে সব নির্দেশ এবং বিশেষভাবে জিহাদের নির্দেশ পালন করে এবং খাঁটি মনে জিহাদ করে) তবে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। (অর্থাৎ প্রথমে মুনাফিক থাকলে শেষেও যদি তওবা করত, তবু তাদের ঈমান গ্রহণীয় হত। অতঃপর জিহাদের তাকীদ এবং যারা জিহাদে যোগদান না করে গৃহে রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ তোমরা যে জিহাদকে পছন্দ কর না, তাতে তো একটি পার্থিব ক্ষতিও আছে। সেমতে) যদি তোমরা এমনিভাবে সবাই জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ, তবে সম্ভবত তোমরা (অর্থাৎ সব মানুষ) পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (অর্থাৎ জিহাদের বড় উপকারিতা হচ্ছে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। যদি জিহাদ ত্যাগ করা হয়, তবে অনর্থকারীদের বিজয় হবে এবং সব মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা থাকবে না। এরূপ ব্যবস্থা না থাকার কারণে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অধিকার হরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। সুতরাং যে জিহাদে পার্থিব উপকারও আছে, তা থেকে পশ্চাতে সরে যাওয়া আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার। অতঃপর মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে) এদেরকেই আল্লাহ্ তা'আলা রহমত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন (তাই বিধানাবলী পালন করার তওফীক নেই) অতঃপর (রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার ফলস্বরূপ) তাদেরকে (কবুলের নিয়তে বিধানাবলী শ্রবণ করা থেকে) বধির করে দিয়েছেন এবং (সৎপথ দেখার ব্যাপারে তাদের (অন্তর) দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিয়েছেন। (এরপর বলা হয়েছে যে, কোরআনে

জিহাদ ও অন্যান্য বিধিবিধানের অপরিহার্যতা, কোরআনের সত্যতার প্রমাণাদি, বিধানাবলীর পারলৌকিক ও ইহলৌকিক উপকারিতা এবং বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা যে এদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, তবে) তারা কি কোরআন (—এর অলৌকিকতা ও বিষয়বস্তু) সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না ? ফলে তারা জানতে পারে না) না (চিন্তা করে, কিন্তু) তাদের অন্তরে (অদৃশ্য তালা লেগে আছে ? (এতদুভয়ের মধ্যে একটি অবশ্যই হয়েছে এবং উভয়টিও হতে পারে। বাস্তবে এ স্থলে উভয়টিই হয়েছে। প্রথমত তারা অস্বীকারের কারণে কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করেনি এরপর এর শাস্তিস্বরূপ অন্তরে তালা লেগে গেছে। একে ختم طبع অর্থাৎ মোহর মারাও বলা হয়েছে। এর প্রমাণ এই আয়াত ঃ

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ —এই সমষ্টি ফল হচ্ছে

فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ—অতঃপর চিন্তা না করার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ যারা সোজা পথ

(কোরআনের অলৌকিকতার মত যুক্তিগত প্রমাণাদি দ্বারা এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীর মত ইতিহাসগত প্রমাণাদি দ্বারা) ব্যক্ত হওয়ার পর (সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয় (যে, ঈমান আনার ফলে অমুক অমুক বর্তমান অথবা ভবিষ্যত প্রত্যাশিত উপকারিতা ফওত হয়ে যাবে। মোটকথা, চিন্তা না করার কারণ হচ্ছে হঠকারিতা। কারণ হিদায়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও তারা উল্টো দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই হঠকারিতার পর শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর কর্মকে শোভন করে দেখিয়েছে। এর ফলে তারা চিন্তা করে না এবং চিন্তা না করার কারণে অন্তরে মোহর লেগেছে)। এটা (অর্থাৎ হিদায়ত সামনে এসে যাওয়া সত্ত্বেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও দূরে সরে পড়া) এজন্য যে, তারা তাদেরকে—যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানাবলীকে (হিংসাবশত) অপছন্দ করে [অর্থাৎ ইহুদী সরদারগণ। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি হিংসা পোষণ করত এবং সত্য জানা সত্ত্বেও অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করত। মোটকথা, মুনাফিকরা ইহুদী সরদারদেরকে] বলে ঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মেনে নেব। (অর্থাৎ তোমরা আমাদেরকে মুহাম্মদের অনুসরণ করতে নিষেধ কর। এর দু'টি অংশ আছে ঃ এক. বাহ্যিক অনুসরণ না করা এবং দুই. আন্তরিক অনুসরণ না করা। প্রথম অংশের ব্যাপারে তো আমরা উপকারিতাবশত তোমাদের কথা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে মেনে নেব। কেননা, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের সাথে ; যেমন বলা হয়েছে ঃ اِنَّا مَعَكُمْ উদ্দেশ্য এই যে, সত্য থেকে মুখ ফিরানোর কারণ জাতিগত বিদ্বেষ এবং অন্ধ অনুকরণ। যদিও এ ধরনের কথাবার্তা মুনাফিকরা গোপনে বলে ; কিন্তু) আল্লাহ্ তাদের গোপন কথাবার্তা (সম্যক) অবগত

জানেন। (ওহীর মাধ্যমে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করে দেন। অতঃপর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হচ্ছে, যা أَوْلَىٰ لَهُمْ এর তফসীর হিসেবে হতে পারে; অর্থাৎ তারা যে এমন কাণ্ড করছে) তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ হরণ করবে? এটা (অর্থাৎ এই শাস্তি) এ কারণে (হবে) যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি (অর্থাৎ সন্তুষ্টি সৃষ্টিকারী আমলসমূহ)-কে ঘৃণা করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (সৎ) কর্মসমূহকে (প্রথম থেকেই) ব্যর্থ করে দিয়েছেন। (সুতরাং তারা এই শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে। কারও কোন মকবুল আমল থাকলে তার বরকতে শাস্তি কিছু না কিছু হ্রাস পায়। অতঃপর وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ -এর তফসীর হিসাবে বলা হচ্ছে:) যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ আছে, (এবং তারা তা গোপন করতে চায়) তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করবেন না? (অর্থাৎ তারা এটা কিরূপে মনে করতে পারে, যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা যে আলিমুল গায়ব, তা প্রমাণিত ও স্বীকৃত?) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম, ফলে আপনি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতেন)। পূর্ণ পরিচয়ের অর্থ এই যে, তাদের চেহারার আকার-আকৃতি বলে দিতাম। যদিও রহস্যবশত আমি এরূপ বলিনি, কিন্তু) আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে এখনও তাদেরকে চিনতে পারবেন। (কেননা, তাদের কথাবার্তা সত্যের উপর ভিত্তিশীল নয়। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সত্য ও মিথ্যাকে চিনার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন। ফলে সত্য ও মিথ্যার প্রভাব অন্তরে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিফলিত হত। এক হাদীসে আছে, সত্য প্রশান্তি দান করে এবং মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টি করে। অতঃপর মু'মিন ও মুনাফিক সবাইকে একত্রে সম্বোধন করে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে:) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সবার কর্মসমূহের খবর রাখেন। (সুতরাং মুসলমানদেরকে তাদের আন্তরিকতার প্রতিদান এবং মুনাফিকদেরকে তাদের কপটতা ও প্রতারণার শাস্তি দেবেন। অতঃপর জিহাদ ইত্যাদির ন্যায় কঠিন বিধানাবলীর একটি রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে যেমন, উপরে فَهَلْ عَسَيْتُمْ الخ আয়াতে একটি রহস্য বর্ণিত হয়েছিল)। আমি (কঠিন বিধানাবলীর নির্দেশ দিয়ে) অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে আমি (বাহ্যতও) তাদেরকে জেনে ও পৃথক করে) নিই; যারা জিহাদ করে এবং যারা জিহাদে দৃঢ়পদ থাকে এবং যাতে তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিই। (যাতে জিহাদের নির্দেশের মধ্যে অন্য নির্দেশাবলীও এবং মোজাহাদা ও সবরের অবস্থার মধ্যে অন্যান্য অবস্থাও দাখিল হয়ে যায়, সেজন্য এই বাক্য সংযুক্ত করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ ! — مُحْكَمَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ মজবুত ও অনড়। এই আভিধানিক অর্থে কোরআনের প্রত্যেক সূরাই مُحْكَمَةٌ কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় مُحْكَمٌ শব্দটি مَنْسُوْخٌ তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে সূরার সাথে 'মোহ্কামাহ্' সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, সূরা মনসূখ ও রহিত না হলেই আমলের সাধ পূর্ণ হতে পারে। কাতাদাহ (র) বলেন : যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জিহাদের বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব 'মোহ্কামাহ্' তথা অরহিত। এখানে আসল উদ্দেশ্য জিহাদের নির্দেশ ও তা বাস্তবায়ন। তাই সূরার সাথে মোহকামাহ্ শব্দ যুক্ত করে জিহাদের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আসছে।—(কুরতুবী)

أَوْلَىٰ لَهُمْ ! আসমায়ীর উক্তি অনুযায়ী এর অর্থ قَارَبَهُ مَا يُهْلِكُهُ অর্থাৎ তার ধ্বংসের কারণসমূহ আসন্ন।—(কুরতুবী)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ

আভিধানিক দিক দিয়ে تَوَلِّي শব্দের দুই অর্থ সম্ভবপর। এক. মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও দুই. কোন দলের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করা। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ প্রথম অর্থ নিয়েছেন, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে। আবূ হাইয়ান (র) বাহ্রে-মুহীতে এই অর্থকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা শরীয়তের বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও —জিহাদের বিধানও এর অন্তর্ভুক্ত, তবে এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, তোমরা মূর্খতা যুগের প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যাবে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। মূর্খতা যুগের প্রত্যেকটি কাজে এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করা হত। এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর হামলা দিত এবং হত্যা ও লুটতরাজ করত। সন্তানদেরকে স্বহস্তে জীবন্ত কবরস্থ করত। ইসলাম মূর্খতা যুগের এসব কুপ্রথা মেটানোর জন্য জিহাদের নির্দেশ জারি করেছে। এটা যদিও বাহ্যত রক্তপাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সারমর্ম হচ্ছে পচা, গলিত অঙ্গকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, যাতে অবশিষ্ট দেহ নিরাময় ও সুস্থ থাকে। জিহাদের মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্মানিত ও সুসংহত হয়। রূহুল মা'আনী, কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে تَوَلِّي শব্দের অর্থ 'রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভ করা' নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে অর্থাৎ দেশ ও জাতির শাসনক্ষমতা লাভ করলে এর পরিণতি এ ছাড়া কিছুই হবে না যে, তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

আত্মীয়তা বজায় রাখার কঠোর তাকীদ ঃ ارحام শব্দটি رحم -এর বহুবচন। এর অর্থ জননীর গর্ভাশয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি সেখান থেকেই সূচিত হয়, তাই বাকপদ্ধতিতে رحم শব্দটি আত্মীয়তা ও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে তফসীরে রূহুল মা'আনীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, ارحام ও ذوى الارحام শব্দ কোন্ কোন্ আত্মীয়তাতে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্য খুবই তাকীদ করেছে। বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও অন্য দুজন সাহাবী থেকে এই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ছিন্ন করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, আত্মীয় ও সম্পর্কশীলদের সাথে কথায়, কর্মে ও অর্থ ব্যয়ে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর নির্দেশ আছে। উপরোক্ত হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আলোচ্য আয়াতের বরাতও দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে কোরআনের এই আয়াতটি দেখে নাও। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব গোনাহের শাস্তি ইহকালেও দেন এবং পরকালেও দেন, সেগুলোর মধ্যে নিপীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোন গোনাহ্ নেই।—(আবূ দাউদ-তিরমিযী) হযরত সওবানের বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আয়ু বৃদ্ধি ও রুযী-রোযগারে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়দের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করে। সহীহ্ হাদীসসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপর পক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সদ্ব্যবহার করা উচিত। সহীহ্ বুখারীতে আছে ঃ

ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها

অর্থাৎ সে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী নয়, যে কেবল প্রতিদানের সমান সদ্ব্যবহার করে; বরং সেই সদ্ব্যবহারকারী, যে অপর পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখে।—(ইবনে কাসীর)

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ—অর্থাৎ যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন। অর্থাৎ তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখেন। হযরত ফারুকে আযম (রা) এই আয়াতদৃষ্টেই উম্মুল ওলাদের বিক্রয় অবৈধ সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ যে মালিকানাধীন বাঁদীর গর্ভ থেকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে বিক্রয় করলে সন্তানের সাথে তার সম্পর্কের ছিন্ন হবে, যা অভিসম্পাতের কারণ। তাই এরূপ বাঁদী বিক্রয় করা হারাম।—(হাকেম)

কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাতের বিধান এবং এজিদকে অভিসম্পাত করার ব্যাপারে আলোচনা ঃ হযরত ইমাম আহমদ (র)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ পিতাকে এজিদের প্রতি অভিসম্পাত করার অনুমতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তির প্রতি কেন অভিসম্পাত করা হবে না, যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে অভিসম্পাত করেছেন ?

তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করে বললেন ঃ এজিদের চাইতে অধিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী আর কে হবে, যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্ক ও আত্মীয়তার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেনি? কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করা বৈধ নয়, যে পর্যন্ত তার কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করা নিশ্চিতরূপে জানা না যায়। হ্যাঁ, সাধারণ বিশেষণ-সহ অভিসম্পাত করা জায়েয, যেমন মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত, দুষ্কৃতকারীর প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত ইত্যাদি।—(রাহুল মা'আনী, খণ্ড ২৬, পৃষ্ঠা ৭২)

أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا—অন্তরে তালা লেগে যাওয়ার অর্থ তাই, যা অন্যান্য আয়াতে خَتْم ও طَبْع অর্থাৎ মোহর লেগে যাওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্তর এমন কঠোর ও চেতনাহীন হয়ে যাওয়া যে, ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে। এর কারণেই মানুষ সাধারণত বিরামহীনভাবে গোনাহে লিপ্ত থাকে। (নাউযুবিল্লাহ্ মিনহু)

الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ—এতে শয়তানকে দু'টি কাজের কর্তা বলা হয়েছে। এক. تسويل—এর অর্থ সুশোভিত করা, অর্থাৎ মন্দ বিষয় অথবা মন্দ কর্মকে কারও দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেওয়া। দুই. املاء এর অর্থ অবকাশ দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান প্রথমে তো তাদের মন্দ কর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে ভাল ও শোভন করে দেখিয়েছে, এরপর তাদেরকে এমন দীর্ঘ আশায় জড়িত করে দিয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার নয়।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ

اضغان শব্দটি ضغن-এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন শত্রুতা ও বিদ্বেষ। মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত এবং বাহ্যত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত, কিন্তু অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনকে আলিমুল গায়েব জানা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কেন নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরের গোপন ভেদ ও বিদ্বেষকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন? ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বারাআতে তাদের ক্রিয়া-কর্মের পরিচয় বলে দিয়েছেন, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, কারা মুনাফিক। এ কারণেই সূরা বারা-আতকে সূরা ফাযিহা অর্থাৎ অপমানকারী সূরাও বলা হয়। কেননা এই সূরা মুনাফিকদের বিশেষ বিশেষ আলামত প্রকাশ করে দিয়েছে।

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ—অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে নির্দিষ্ট করে মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারি এবং তাদের এমন আকার-আকৃতি বলে দিতে পারি, যদ্দ্বারা আপনি প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে

لو অব্যয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিহ্নিত করে আপনাকে বলে দিতাম ঃ কিন্তু রহস্য ও উপযোগিতাবশত আমার সহনশীলতা গুণের কারণে তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করা পছন্দ করিনি, যাতে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে বোঝাতে হবে এবং অন্তরগত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছি যে, আপনি মুনাফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি দ্বারা চিনে নিতে পারবেন।—(ইবনে কাসীর)

হযরত ওসমান গনী (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয় অন্তরে গোপন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা দ্বারা তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ কথাবার্তার সময় তার মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যায়, যার ফলে তার মনের ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনি এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোন বিষয় গোপন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সত্তার উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন। বিষয়টি ভাল হলে তা প্রকাশ না হয়ে পারে না এবং মন্দ হলেও প্রকাশ না হয়ে পারে না। কোন কোন হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেওয়া হয়েছিল। মসনদে আহমদে ওকবা ইবনে আমরের হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এক খোতবায় ছত্রিশ জন মুনাফিকের নাম বলে বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ—আল্লাহ্ তা'আলা তো সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্বব্যাপী জ্ঞান রাখেন। এখানে জানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ যে বিষয়টি আল্লাহ্র জ্ঞানে পূর্ব থেকেই ছিল, তার বাস্তবভিত্তিক ও ঘটনাভিত্তিক জ্ঞান হয়ে যাওয়া।—(ইবনে কাসীর)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ
مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ
اَعْمَالَهُمْ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۝ فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْۤا

إِلَى السَّلْمِ ۖ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۖ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ

أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ

يُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ ۚ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

(৩২) নিশ্চয় যারা কাফির এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্য সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর রসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং তিনি ব্যর্থ করে দিবেন তাদের কর্মসমূহকে। (৩৩) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রসূল (সা)-এর আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (৩৪) নিশ্চয় যারা কাফির এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে অতঃপর কাফির অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ্ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (৩৫) অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহবান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহ্ই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না। (৩৬) পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না। (৩৭) তিনি তোমাদের কাছে ধনসম্পদ চাইলে অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। (৩৮) শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আহবান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় যারা কাফির এবং (অন্য মানুষকেও) আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ সত্যধর্ম) থেকে

ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্য সৎ (অর্থাৎ ধর্মের) পথ (যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মুশরিক-দের জন্য ও ইতিহাসগত প্রমাণাদির মাধ্যমে কিতাবধারীদের জন্য) ব্যক্ত হওয়ার পর রসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্র (অর্থাৎ আল্লাহ্র ধর্মের) কোনই ক্ষতি করতে পারবে না (বরং এই ধর্ম সর্বাবস্থায় পূর্ণতা লাভ করবে। সেমতে তাই হয়েছে) এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রচেষ্টাকে (যা সত্য ধর্ম মিটানোর জন্য তারা করছে) নস্যাৎ করে দেবেন। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং [যেহেতু রসূল (সা) আল্লাহ্রই বিধান বর্ণনা করেন—বিশেষ করে ওহীর মাধ্যমে বর্ণিত বিধান হোক অথবা ওহী বর্ণিত সামগ্রিক বিধির আওতাভুক্ত বিধান হোক—তাই] রসূল (সা)-এর (ও) আনুগত্য কর এবং (কাফির-দের ন্যায় আল্লাহ্ ও রসূলের বিরোধিতা করে) নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (এর বিবরণ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে আসবে)। নিশ্চয় যারা কাফির এবং আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে, অতঃপর কাফির অবস্থায়ই মারা যায়, আল্লাহ্ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (ক্ষমা না করার জন্য কুফরের সাথে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা শর্ত নয়; বরং শুধু মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকারই এটা প্রতিক্রিয়া। কিন্তু অধিক ভৎর্সনার জন্য এই বাস্তব কথাটি সংযুক্ত করা হয়েছে যে, তখনকার কাফির সরদারদের মধ্যে এই দোষটিও বিদ্যমান ছিল। যখন জানা গেল যে, মুসলমানরা আল্লাহ্র প্রিয় এবং কাফিররা অপ্রিয়, তখন হে মুসলমানগণ) তোমরা (কাফিরদের মুকাবিলায়) হীনবল হয়ো না এবং (হীনবল হয়ে তাদেরকে) সন্ধির আহ্বান জানিও না, তোমরাই প্রবল হবে (এবং তারা পরাভূত হবে। কেননা, তোমরা প্রিয় ও তারা অপ্রিয়)। আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন (এটা তোমাদের পার্থিব সাফল্য এবং পরকালে এই সাফল্য হবে যে) তিনি তোমাদের কর্মকে (অর্থাৎ কর্মের সওয়াবকে) হ্রাস করবেন না। (এটা হচ্ছে জিহাদের উৎসাহ প্রদান। অতঃপর দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা উল্লেখ করে জিহাদের উৎসাহ এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ভূমিকা প্রদান করা হচ্ছে) পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা। (এতে যদি নিজের উপকারের জন্য জান ও মালকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও, তবে এই উপকারই কয়দিনের এবং এর সারমর্মই কি ?) যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, (এতে জান ও মালের বিনিময়ে জিহাদও এসে গেছে) তবে আল্লাহ্ নিজের কাছ থেকে তোমাদের উপকার করবেন এভাবে যে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং (তোমাদের কাছে কোন উপকার প্রত্যাশা করবেন না। সেমতে) তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ (ও যা প্রাণের তুলনায় সহজ নিজের উপকারের জন্য) চাইবেন না, (যা দেওয়া সহজ তাই যখন চাইবেন না, তখন যা দেওয়া কঠিন তা কিরূপে চাইবেন? বলা বাহুল্য, আমাদের জান ও মাল খরচ করলে আল্লাহ্ তা'আলার কোন উপকার হয় না এবং তা সম্ভবও নয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন : وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ সেমতে) যদি (পরীক্ষাস্বরূপ) তিনি তোমাদের কাছে ধনসম্পদ চান, অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করেন (অর্থাৎ সমুদয় ধনসম্পদ চান), তবে তোমরা (অর্থাৎ তোমা-দের অধিকাংশ লোক) কার্পণ্য করবে (অর্থাৎ দিতে চাইবে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা

তোমাদের অনীহা প্রকাশ করে দেবেন। তাই এই সম্ভবপর বিষয়টিকেও বাস্তবায়িত করা হয়নি)। হ্যাঁ, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে (যার উপকার নিশ্চিতরূপে তোমরাই পাবে—স্বল্প পরিমাণ ধনসম্পদ) ব্যয় করার আহবান জানানো হয় (অবশিষ্ট বিপুল ধনসম্পদ তোমাদের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হয়) অতঃপর (এর জন্যও) তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করে, তারা (প্রকৃতপক্ষে নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করে। অর্থাৎ নিজেদেরকেই এর চিরস্থায়ী উপকার থেকে বঞ্চিত রাখে) আল্লাহ্‌ কারও মুখাপেক্ষী নন (যে তাঁর ক্ষতির আশংকা থাকতে পারে) এবং তোমরা সবাই (তাঁর) মুখাপেক্ষী। (তোমাদের এই মুখাপেক্ষিতার কারণেই তোমাদেরকে ব্যয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, পরকালে তোমাদের সওয়াব দরকার হবে। এসব কর্মই সওয়াব লাভের উপায়)। যদি তোমরা (আমার বিধানাবলী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত (অবাধ্য) হবে না (বরং অত্যন্ত অনুগত হবে। এই কাজ তাদের দ্বারা করানো হবে এবং এভাবে সেই রহস্যপূর্ণতা লাভ করবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ — আলোচ্য আয়াতও মুনাফিক এবং ইহুদী বনী কোরায়যা ও বনী নুসায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: এই আয়াত সেসব মুনাফিকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় কোরাইশ-কাফিরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বারজন লোক সমগ্র কোরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক গোটা কাফির বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত।

وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ — এখানে 'কর্ম বিনষ্ট' করার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না; বরং ব্যর্থ করে দেবেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই লিখিত হয়েছে। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কুফর ও নিফাকের কারণে তাদের সৎকর্মসমূহ যেমন সদকা, খয়রাত ইত্যাদি সব নিষ্ফল হয়ে যাবে — গ্রহণযোগ্য হবে না।

لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ — কোরআন পাক এ স্থলে حبط এর পরিবর্তে ابطال উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার কুফরের কারণে প্রকাশ পায়, যা উপরের আয়াতে حبط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আসল কাফিরের কোন আমল কুফরের কারণে গ্রহণযোগ্যই হয় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়, তার ইসলামকালীন সৎকর্ম যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল; কিন্তু তার কুফর ও ধর্মত্যাগ সেসব কর্মকেও নিষ্ফল করে দেয়।

আমল বাতিল করার দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোন কোন সৎ কর্মের জন্য অন্য সৎ কর্ম করা শর্ত। যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করে না, সে তার সৎ কর্মও বিনষ্ট করে দেয়। উদাহরণত প্রত্যেক সৎকর্ম কবূল হওয়ার শর্ত এই যে, তা খাঁটিভাবে আল্লাহ্র জন্য হতে হবে, তাতে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব এবং নাম-যশের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। কোরআন পাকে বলা হয়েছে : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ অন্যত্র বলা হয়েছে : أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ অতএব যে সৎকর্ম রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আল্লাহ্র কাছে বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে সদকা-খয়রাত সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে :

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى —অর্থাৎ অনুগ্রহের বড়াই করে অথবা গরীবকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা-খয়রাতকে বাতিল করো না। এতে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহের বড়াই করলে অথবা গরীবকে কষ্ট দিলে সদকা বাতিল হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ তাই হতে পারে, যা তিনি এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সৎ কর্মসমূহকে গোনাহের মাধ্যমে বাতিল করো না। যেমন ইবনে জুরায়েজ বলেন : بالرياء والسمعة মুকাতিল প্রমুখ বলেন : بالمن —কেননা আহলে সুন্নত দলের ঐকমত্যে কুফর ও শিরক ছাড়া কোন কবীরা গোনাহ্ও এমন নেই, যা মু'মিনদের সৎ কর্ম বাতিল করে দেয়। উদাহরণত কেউ চুরি করল এবং সে নিয়মিত নামাযী ও রোযাদার। এমতাবস্থায় তাকে বলা হবে না যে, তোমার নামায রোযা বাতিল হয়ে গেছে—এগুলোর কাযা কর। অতএব, সেসব গোনাহ্ দ্বারাই সৎ কর্ম বাতিল হয়, যেগুলো না করা সৎ কর্ম কবূল হওয়ার জন্য শর্ত, যেমন রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা। এরূপ উদ্দেশ্যে না করা প্রত্যেক সৎ কর্ম কবূল হওয়ার জন্য শর্ত। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ সৎ কর্মের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া হবে এবং স্বয়ং সৎ কর্ম বিনষ্ট হওয়া হবে না। এমতাবস্থায় এটা সকল গোনাহ্র ক্ষেত্রেই শর্ত হবে। যার আমলে গোনাহ্র প্রাধান্য থাকবে, তার অল্প সৎ কর্মেও আযাব থেকে রক্ষা করার মত বরকত থাকবে না, বরং সে নিয়মানুযায়ী গোনাহ্র শাস্তি ভোগ করবে, কিন্তু পরিমাণে ঈমানের বরকতে শাস্তি ভোগার পর মুক্তি পাবে।

আমল বাতিল করার তৃতীয় প্রকার এই যে, কোন সৎ কর্ম শুরু করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। উদাহরণত নফল নামায অথবা রোযা শুরু করে বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। এটাও আলোচ্য আয়াতের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত এবং নাজায়েয। ইমাম আবু হানীফা (র)-র মযহাব তাই। তিনি বলেন : যে সৎ কর্ম প্রথমে ফরয অথবা ওয়াজিব ছিল না, কিন্তু কেউ তা শুরু করে দিলে সেই সৎকর্ম পূর্ণ করা আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে ফরয হয়ে যাবে। কেউ এরূপ আমল শুরু করে বিনা ওযরে ছেড়ে দিলে অথবা

ইচ্ছাকৃতভাবে ফাসেদ করে দিলে সে গোনাহ্গার হবে এবং কাযা করাও ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র)-র মতে গোনাহ্গারও হবে না এবং কাযাও করতে হবে না। কারণ, প্রথমে যখন এই আমল ফরয অথবা ওয়াজিব ছিল না, তখন পরেও ফরয ও ওয়াজিব হবে না। কিন্তু হানাফীদের মতে আয়াতের ভাষা ব্যাপক। এতে ফরয, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি সব আমল বিদ্যমান। তফসীরে মাযহারীতে এ স্থানে অনেক হাদীস বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ

এমন শব্দের মাধ্যমেই একটি নির্দেশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুনরুল্লেখের এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে কাফিরদের পার্থিব ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে এবং এই আয়াতে পারলৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই উদ্ধৃত করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফিরদের বর্ণনা ছিল, যাদের মধ্যে তারাও শামিল ছিল, যারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা কাফির অবস্থায় যেমন সৎকর্ম করেছিল, তা সবই নিষ্ফল হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পরও সেগুলোর সওয়াব পাবে না। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে এমন কাফিরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরককে আঁকড়ে রেখেছিল। তাদের বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ—এ আয়াতে কাফিরদেরকে সন্ধির আহবান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে : وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا—অর্থাৎ কাফিররা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়। এ থেকে সন্ধি করার অনুমতি বোঝা যায়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব হলে তোমরা সন্ধি করতে পার। পক্ষান্তরে এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু খাঁটি কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করাও জায়েয, যদি এতে মুসলমানদের উপযোগিতা দেখা যায় এবং কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর কারণ না হয়। এ আয়াতের শুরুতে فَلَا تَهِنُوا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাপুরুষতা ও জিহাদ থেকে পলায়নের মনোভাব নিয়ে যে সন্ধি করা হয়, তাই নিষিদ্ধ। কাজেই এতেও কোন বিরোধ নেই। কারণ, وَإِنْ

جَنَحُوا আয়াতের বিধানও তখনই হবে, যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সন্ধি করা না হয়, বরং মুসলমানদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়।

وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান হ্রাস করবেন না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট ভোগ কর, তার বিরাট প্রতিদান পরকালে পাবে। অতএব কষ্ট করলেও মু'মিন অকৃতকার্য নয়।

إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا—সংসারআসক্তিই মানুষের জন্য জিহাদে বাধা-দানকারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি আসক্তি, পরিবার-পরিজনের আসক্তি এবং টাকা-কড়ির আসক্তি সবই দাখিল। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাতত বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মহব্বতকে পরকালের স্থায়ী অক্ষয় নিয়ামতের মহব্বতের উপর প্রাধান্য দিও না।

وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ—আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কোরআনেই যাকাত ও সদকার বিধান এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। স্বয়ং এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার তাকীদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহ্যত উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন : لَا يَسْأَلْكُم এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোন উপকারের জন্য চান না, বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য চান। এই আয়াতেও

يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ শব্দ দ্বারা এই উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার জন্য বলার কারণ এই যে, পরকালে তোমরা সওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং সেখানে তোমা-দেরকে এর প্রতিদান দেওয়া হবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বক্তব্যই পেশ করা হয়েছে। এর নজীর হচ্ছে এই আয়াত : مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ—অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন : আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্য কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমার এর

প্রয়োজনও নেই। কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, لَا يَسْئَلْكُمْ বলে সমস্ত ধনসম্পদ চাওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা ইবনে উয়ায়নার উক্তি।—(কুরতুবী) পরবর্তী আয়াত এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ اِنْ يَسْئَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ يُحْفِ শব্দটি احفا থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাড়াবাড়ি করা এবং কোন কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। এই আয়াতের মর্ম সবার মতে এই যে, আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং এই আদেশ পালন তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হত। এমনকি, আদায় করার সময় মনের এই অপ্রিয় ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ত। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে لَا يَسْئَلْكُمْ বলে তাই বোঝানো হয়েছে, যা দ্বিতীয় আয়াতে فَيُحْفِكُمْ সংযুক্ত করে বোঝানো হয়েছে। উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি যাকাত, ওশর ইত্যাদি যেসব আর্থিক ফরয কাজ আরোপ করেছেন, প্রথমত সেগুলো স্বয়ং তোমাদেরই উপকারার্থে করেছেন—আল্লাহ্ তা'আলার কোন উপকার নেই। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলা এসব ফরয কাজের ক্ষেত্রে করুণাবশত অল্প পরিমাণ অংশই ফরয করেছেন। ফলে একে বোঝা মনে করা উচিত নয়। যাকাতে মজুদ অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ, উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক অথবা ২০ ভাগের এক, ১০০ ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল মাত্র। অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চান নি। সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তা স্বভাবতই অপ্রিয় ও বোঝা মনে হতে পারত। তাই এই অল্প পরিমাণ অংশ সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ—اَضْغَانَ শব্দটি ضِغْن এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন বিদ্বেষ ও গোপন অপ্রিয়তা। এ স্থলেও গোপন অপ্রিয়তা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করে দেওয়া মানুষের কাছে স্বভাবতই অপ্রিয় ঠেকে, যা সে প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার সময় টালবাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়েই পড়ে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধনসম্পদ চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয় ভাব তোমাদের অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধনসম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা শুরু করেছ। শেষ আয়াতে একথাই এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ—অর্থাৎ তোমাদেরকে

তোমাদের ধনসম্পদের কিছু অংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার দাওয়াত দেওয়া হলে তোমাদের কেউ কেউ এতে কৃপণতা করে। এরপর বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ —অর্থাৎ যে ব্যক্তি এতেও কৃপণতা করে, সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করে না; বরং এর মাধ্যমে সে নিজেরই ক্ষতি করে। কারণ, এতে করে সে পরকালের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় এবং ফরয তরক করার শাস্তির যোগ্য হয়। অতঃপর এই কথাটিই আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ —অর্থাৎ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা মানে স্বয়ং তোমাদের অভাব দূর করা। وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের অভাবমুক্ততাকে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তোমাদের ধনসম্পদে আল্লাহ্ তা'আলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনি তো স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেরও মুখাপেক্ষী নন। যদি তোমরা সবাই আমার বিধানাবলী পরিত্যাগ করে বস, তবে যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকী রাখতে চাইব, ততদিন সত্য ধর্মের হিফাযত এবং বিধানাবলী পালন করার জন্য অন্য জাতি সৃষ্টি করব। তারা তোমাদের মত বিধানাবলীর প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না; বরং আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ 'অন্য জাতি বলে অনারব জাতি বোঝানো হয়েছে।' হযরত ইকরামা বলেন ঃ এখানে পারসিক ও রোমক জাতি বোঝানো হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামের সামনে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তখন তাঁরা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্। (সা) তাঁরা কোন্ জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর তাঁরা আমাদের মত শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি বিমুখ হবে না? রসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিসে উপস্থিত হযরত সালমান ফারসী (রা)-র উরুতে হাত মেরে বললেন ঃ সে এবং তাঁর জাতি। যদি সত্য ধর্ম সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকত, (যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না) তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্য ধর্ম হাসিল করত এবং তা মেনে চলত।—(তিরমিযী, হাকেম, মাযহারী)

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী ইমাম আবূ হানীফা (র)-র প্রশংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবূ হানীফা (র) ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন।—(তফসীরে-মাযহারীর প্রান্ত-টীকা)

سورة الفتح

সূরা ফাতহ্

মদীনায় অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ① لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ② وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ③

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে।

(১) নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট (২) যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি (হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে) আপনাকে একটি প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির এই ফায়দা হয়েছে যে, এটা একটা আকাঙ্ক্ষিত বিজয় তথা মক্কা বিজয়ের কারণ হয়ে গেছে। এদিক দিয়ে সন্ধিটিই বিজয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে। মক্কা বিজয়কে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলার কারণ এই যে, ইসলামী শরীয়তে বিজয়ের উদ্দেশ্য রাজ্য করতলগত হওয়া নয়; বরং ইসলামকে প্রবল করা উদ্দেশ্য। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য বহুলাংশে হাসিল হয়ে যায়। কেননা, আরবের গোত্রসমূহ এই অপেক্ষায় ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর স্বগোত্রের মুকাবিলায় বিজয়ী হলে আমরাও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেব। মক্কা বিজিত হলে পর চতুর্দিক থেকে আরবের গোত্রসমূহ আগমন করতে থাকে এবং নিজে অথবা প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। (বুখারী) মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ের লক্ষণাদি ফুটে উঠে, তাই একে প্রকাশ্য বিজয় বলা হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল এই বিজয়ের কারণ ও উপায়। কারণ, মক্কাবাসী-দের সাথে প্রায়ই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণে মুসলমানরা নিজেদের শক্তি ও সমরোপকরণ বৃদ্ধি করার অবকাশ পেত না। হুদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার ফলে মুসলমানরা নির্বিঘ্নে তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের

সংখ্যা বেড়ে যায়। খায়বর বিজয়ের ফলে সমরোপকরণের দিক দিয়ে তারা অপরের উপর চাপ সৃষ্টি করার মত শক্তিশালী হয়ে যায়। এরপর কোরাইশদের পক্ষ থেকে যখন চুক্তি ভঙ্গ করা হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) দশ হাজার সাহাবী সমভিব্যাহারে মুকাবিলার জন্য রওনা হলেন। মক্কাবাসীরা এতই ভীত হয়ে পড়ল যে, বেশি যুদ্ধও করতে হল না এবং তারা আনুগত্য স্বীকার করে নিল। যুদ্ধ যা হল, তা এতই সামান্য ও সীমাবদ্ধ ছিল যে, মক্কা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না সন্ধির মাধ্যমে —এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। মোটকথা, এভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধি বিজয়ের কারণ হয়ে গেছে। তাই রূপক অর্থে এই সন্ধিকেই বিজয় বলে দেওয়া হয়েছে, যাতে মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও আছে। অতঃপর এই বিজয়ের ধর্মীয় ও ইহলৌকিক ফলাফল ও বরকত বর্ণিত হচ্ছে যে, এই বিজয় এ কারণে হয়েছে) যাতে দীন প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে (আপনার প্রচেষ্টার ফলে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে, এর ফলে আপনার সওয়াব অনেক বেড়ে যায় এবং অধিক সওয়াব ও নৈকট্যের বরকতে) আল্লাহ্ আপনার সব অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ (যেমন নবুওয়ত দান, কোরআন দান, জ্ঞান দান ও কর্মের সওয়াব দান) পূর্ণ করেন, (এভাবে যে, আপনার সওয়াব ও নৈকট্য আরও বৃদ্ধি পাবে। এই দুইটি নিয়ামত পরকাল সম্পর্কিত। আরও দুইটি নিয়ামত ইহলৌকিক আছে। তা এই যে) আপনাকে (নির্বিঘ্নে ধর্মের) সরল পথে পরিচালিত করেন (আপনি সরল পথে চলেন —এটা যদিও পূর্ব থেকে নিশ্চিত ; কিন্তু এতে কাফিরদের পক্ষ থেকে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হত। এখন এই বাধা থাকবে না)। এবং (অপর ইহলৌকিক নিয়ামত এই যে) আল্লাহ্ আপনাকে এমন বিজয় দান করেন, যাতে শক্তিই শক্তি থাকে। [অর্থাৎ যার পর আপনাকে কারো সামনে মাথা নত করতে না হয়। সেমতে তাই হয়েছে। সমস্ত আরব উপদ্বীপ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর করতলগত হয়ে যায়]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে সূরা ফাত্হ ষষ্ঠ হিজরীতে অবতীর্ণ হয়, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে-কিরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মোকাররমা তশরীফ নিয়ে যান এবং হেরেমের সন্নিকটে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। মক্কার কাফিররা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর এই ওমরার কাযা করবেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই বিশেষত, হযরত ফারূকে আযম (রা), এ ধরনের সন্ধি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র ইঙ্গিতে এই সন্ধিকে পরিণামে মুসলমানদের জন্য সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। সন্ধির বিবরণ পরে বর্ণিত হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ওমরার ইহ্রাম খুলে হুদায়বিয়া থেকে ফেরত রওনা হলেন, তখন পথিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন সত্য এবং অবশ্যই বাস্তব রূপ লাভ করবে। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সময় এই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করে। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেন ঃ তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে থাক, কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। হযরত জাবের বলেন ঃ আমি হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি। হযরত বারা ইবনে আযেব বলেন ঃ তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয়, কিন্তু আমরা হুদায়-বিয়ার ঘটনায় 'বয়াতে-রিযওয়ান'কেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বৃক্ষের নীচে উপস্থিত চৌদ্দশ সাহাবীর কাছ থেকে জিহাদের শপথ নিয়েছিলেন। এ সূরায় বয়াতের আলোচনাও করা হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)

যখন জানা গেল যে, আলোচ্য সূরাটি হুদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই ঘটনার অনেক অংশ এই সূরায় উল্লিখিতও হয়েছে, তখন প্রথমে সম্পূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়। তফসীরে ইবনে কাসীরে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে আরও বেশী বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং চৌদ্দ পৃষ্ঠায় এই কাহিনী আদ্যোপান্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনীতে অনেক মো'জেযা, উপদেশ, শিক্ষণীয়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয় বিধৃত হয়েছে। এখানে কাহিনীর কেবল সেসব অংশ লিখিত হচ্ছে, যেগুলো সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা যে-গুলোর সাথে সূরার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে এই কাহিনী সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তফসীর বোঝা খুবই সহজ হয়ে যাবে।

হুদায়বিয়ার ঘটনা ঃ হুদায়বিয়া মক্কার বাইরে হেরেমের সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে 'শমীসা' বলা হয়। ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে।

প্রথম অংশ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন ঃ আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে জরীর, বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় স্বপ্ন দেখলেন, তিনি সাহাবায়ে-কিরামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করছেন এবং ইহ্রামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহ্র চাবি তাঁর হস্তগত হয়েছে। এটা সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটা অংশ। পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই স্বপ্নটি যে বাস্তব রূপ লাভ করবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এই ঘটনার কোন সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নটি মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শোনালেন, তখন তাঁরা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে-কিরামের প্রস্তুতি দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা স্বপ্নে কোন বিশেষ সাল অথবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এই মুহূর্তেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল।—(বয়ানুল কোরআন)

দ্বিতীয় অংশ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহাবায়ে-কিরাম ও মরুবাসী মুসলমানদের সাথে চলার জন্য ডাকা এবং কারো কারো অস্বীকার করা ঃ ইবনে সা'দ প্রমুখ বর্ণনা করেন, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কিরাম ওমরা পালনের ইচ্ছা করলেন, তখন আশংকা দেখা দিল যে, মক্কার কোরাইশরা সম্ভবত বাধা দিতে পারে এবং প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তাই তিনি মদীনার নিকটবর্তী গ্রামবাসীদেরকে সাথে চলার জন্য দাওয়াত দিলেন। অনেক

গ্রামবাসী সাথে চলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং বলল : মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সহচরগণ আমাদেরকে শক্তিশালী কোরাইশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করতে চায়। তাদের পরিণাম এটাই হবে যে, তারা এই সফর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না।—(মাযহারী)

তৃতীয় অংশ মক্কাভিমুখে যাত্রা : ইমাম আহমদ, বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গোসল করে নতুন পোশাক পরিধান করলেন এবং স্বীয় উষ্ট্রী ক্বাসওয়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হলেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমাকে সঙ্গে নিলেন এবং তাঁর সাথে মুহাজির, আনসার ও গ্রামবাসী মুসলমানদের একটি বিরাট দল রওয়ানা হল। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে তাদের সংখ্যা চৌদ্দশ বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্নের কারণে এই মুহূর্তেই মক্কা বিজিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের কারো মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। অথচ তরবারি ব্যতীত তাদের কাছে অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। তিনি সাহাবায়ে-কিরামসহ যিলকদ মাসের শুরুতে সোমবার দিন রওয়ানা হন এবং যুলহুলায়ফায় পৌঁছে ইহ্‌রাম বাঁধেন।—(মাযহারী)

চতুর্থ অংশ মক্কাবাসীদের মুকাবিলার প্রস্তুতি : রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বড় দল নিয়ে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেছেন—এই খবর যখন মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছল, তখন তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হল এবং বলল : মুহাম্মদ (সা) সহচরগণসহ ওমরার জন্য আগমন করছেন। যদি আমরা তাকে নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করতে দিই, তবে সমগ্র আরবে এ কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, সে আমাদেরকে পরাজিত করে মক্কায় পৌঁছে গেছে। অথচ আমাদের ও তার মধ্যে একাধিক যুদ্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর তারা শপথ করে বলল : আমরা কখনো এরূপ হতে দেব না। সেমতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বাধা দেওয়ার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি দল মক্কার বাইরে 'কুরাউল-গামীম' নামক স্থানে প্রেরণ করা হল। তারা আশেপাশের গ্রামবাসীদেরকেও দলে ভিড়িয়ে নিল এবং তায়েফের বনী সকীফ গোত্রও তাদের সহযোগী হয়ে গেল। তারা বালদাহ্ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। অতঃপর তারা সবাই পরস্পরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কা প্রবেশে বাধা দেওয়ার এবং তাঁর মুকাবিলায় যুদ্ধ করার শপথ করল।

সংবাদ পৌঁছানোর একটি অভাবনীয় সরল পদ্ধতি : তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে যে, বালদাহ্ থেকে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পৌঁছার স্থান পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাহাড়ের শৃঙ্গে কিছু লোক মোতায়েন করে দেয়—যাতে মুসলমানদের সম্পূর্ণ গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তাদের নিকটবর্তী পাহাড়ওয়ালা উচ্চস্বরে দ্বিতীয় পাহাড়ওয়ালা পর্যন্ত, সে তৃতীয় পর্যন্ত এবং সে চতুর্থ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গতিবিধি সম্পর্কে বালদাহে অবস্থানকারীরা অবহিত হয়ে যেত।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংবাদ প্রেরক : মক্কাবাসীদের অবস্থা গোপনে পর্যবেক্ষণ করে সংবাদ প্রেরণের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশর ইবনে সুফিয়ানকে আগেই মক্কা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে মক্কাবাসীদের উপরোক্ত সামরিক প্রস্তুতি ও পূর্ণ শক্তিতে বাধা দানের সংকল্পের কথা অবহিত করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : কোরাইশদের জন্য আক্ষেপ, কয়েকটি যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও তাদের রণোন্মাদনা এতটুকু দমেনি।

আমাকে ও আরবের অন্যান্য গোত্রকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরা সরে বসে থাকলেই পারত। যদি আরব গোত্রসমূহ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যেত তবে তাদের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই হাসিল হয়ে যেত। পক্ষান্তরে যদি আমি বিজয়ী হতাম, তবে হয় তারাও মুসলমান হয়ে যেত, না হয় যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকলেও তখন সবল ও সতেজ অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারত। জানি না, কোরাইশরা কি মনে করছে। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আমাকে যে নির্দেশসহ প্রেরণ করেছেন, তার জন্য আমি একাকী হলেও চিরকাল ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকব।

পঞ্চম অংশ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উষ্ট্রীর পথিমধ্যে বসে যাওয়া ঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) সবাইকে একত্র করে ভাষণ দিলেন এবং পরামর্শ চাইলেন যে, এখন আমাদেরকে এখান থেকেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দেওয়া উচিত, না আমরা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হব এবং কেউ বাধা দিলে তার সাথে যুদ্ধ করব? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বললেন ঃ আপনি বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন, কারও সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হন নি। কাজেই আপনি উদ্দেশ্যে অটল থাকুন। হ্যাঁ, যদি কেউ আমাদেরকে মক্কা গমনে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব। এরপর হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা বনী ইসরাঈলের মত নই যে, আপনাকে বলে দেব ঃ اَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا (আপনি ও আপনার পালনকর্তা যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা তো এখানেই বসলাম)। বরং আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব। রসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে বললেন ঃ ব্যস, এখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হও। যখন তিনি মক্কার নিকট পৌঁছলেন এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তিনি সৈন্যদেরকে কিবলামুখী সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ওব্বাদ ইবনে বিশরকে একদল সৈন্যের আমীর নিযুক্ত করে সম্মুখে প্রেরণ করলেন। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বাহিনীর বিপরীত দিকে সৈন্য সমাবেশ করলেন। এমতাবস্থায় যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। হযরত বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) সকলকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তার সিপাহীরা এই দৃশ্য দেখতে লাগল। পরে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ বলল ঃ আমরা চমৎকার সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছি। তারা যখন নামাযরত ছিল, তখনই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। যাক, অপেক্ষা কর তাদের আরও নামায আসবে। কিন্তু ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আ) 'সালাতুল-খওফ' তথা আপদকালীন নামাযের বিধান নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শত্রুদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়ে নামাযের সময় সৈন্যদেরকে দুইভাগে ভাগ করার পদ্ধতি বলে দিলেন। ফলে তাঁরা শত্রু পক্ষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে যান।

ষষ্ঠ অংশ ঃ হুদায়বিয়ায় একটি মো'জেযা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুদায়বিয়ার নিকটবর্তী হন, তখন তাঁর উষ্ট্রীর সামনের পা পিছলে যায় এবং উষ্ট্রী বসে পড়ে। সাহাবায়ে কিরাম

চেষ্টা করেও উষ্ট্রীকে উঠাতে পারলেন না। তখন সবাই বলতে লাগলেন : কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : কাসওয়ার কোন কসুর নেই। তাঁর এরূপ অভ্যাস কখনও ছিল না। তাকে তো সেই আল্লাহ্ বাধা দিচ্ছেন, যিনি 'আসহাবে-ফীল' তথা হস্তী-বাহিনীকে বাধা দিয়েছিলেন। [রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্ভবত তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বপ্নে দেখা ঘটনা বাস্তবায়িত হওয়ার সময় এটা নয়]। তিনি বললেন : যার হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আজিকার দিনে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক যে কোন কথা কোরাইশরা আমাকে বলবে, আমি অবশ্যই তা মেনে নেব। এরপর তিনি উষ্ট্রীকে একটি আওয়াজ দিতেই উষ্ট্রী উঠে দাঁড়াল। রসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইবনে ওয়ালীদের দিক থেকে সরে গিয়ে হুদায়বিয়ার অপর প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানে পানি খুবই কম ছিল। পানির জায়গা খালিদ ইবনে ওয়ালীদ করায়ত্ত করে নিয়েছিল। মুসলমানদের অংশে একটি মাত্র কূপ ছিল, যাতে অল্প অল্প পানি চুয়ে চুয়ে কূপে পড়ত। সেমতে এই কূপের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি মো'জেযা প্রকাশ পেল, তিনি কূপের মধ্যে কুলি করলেন এবং একটি তীর কূপের ভিতরে গেড়ে দিতে বললেন। ফলে কূপের পানি ফুলে ফেঁপে কূপের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অতঃপর পানির কোন অভাব রইল না।

সপ্তম অংশ : প্রতিনিধিদলের মধ্যস্থতায় মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা : অতঃপর প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু হল। প্রথমে বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা সঙ্গীগণসহ আগমন করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে বলল : কোরাইশরা পূর্ণ শক্তি সহকারে মুকাবিলা করার জন্য এসে গেছে এবং পানির জায়গা দখল করে নিয়েছে। তারা কিছুতেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। রসূলে করীম (সা) বললেন : আমরা কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। তবে কেউ যদি আমাদেরকে ওমরা পালন করতে বাধা দেয়, তবে আমরা যুদ্ধ করব। অতঃপর তিনি ইতিপূর্বে বিশরকে যা বলেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন : কোরাইশদেরকে কয়েকটি যুদ্ধ দুর্বল করে দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আমাদের সাথে সন্ধি করে নিতে পারে, যাতে তারা নির্বিঘ্নে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পায়। এরপর আমাদেরকে অবশিষ্ট আরবদের মুকাবিলায় ছেড়ে দিতে পারে। যদি তারা বিজয়ী হয়, তবে কোরাইশদের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই পূর্ণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে তারা হয় মুসলমান হয়ে যাবে, না হয় আমাদের বিরুদ্ধে নব বলে যুদ্ধ করবে। কোরাইশরা যদি এতে সম্মত না হয়, তবে আল্লাহ্র কসম, আমি একাকী হলেও ইসলামের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাব। কোরাইশদেরকে এই পয়গাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বুদায়েল ফিরে গেল। সেখানে পৌঁছার পর কিছু লোক তার কথা শুনতেই চাইল না। তারা যুদ্ধের নেশায় মত্ত হয়ে রইল। অতঃপর গোত্র-সরদার ওরওয়া ইবনে মসউদ বলল : বুদায়েল কি বলতে চায়, তা শুনা দরকার। কথাবার্তা শুনে ওরওয়া কোরাইশ সরদারদেরকে বলল : মুহাম্মদ যা প্রস্তাব দিয়েছে, তা সঠিক। এটা মেনে নাও এবং আমাকে তার সাথে কথা বলার অনুমতি দাও। সেমতে দ্বিতীয়বার ওরওয়া ইবনে মসউদ আলাপ-আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করল : আপনি যদি স্বগোত্র কোরাইশকে নিশ্চিহ্নই করে দেন, তবে এটা কি করে ভাল কথা হবে? দুনিয়াতে আপনি কি কখনো শুনেছেন যে, কোন

ব্যক্তি তার স্বজাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে ? অতঃপর সাহাবায়ে কিরামের সাথে তার নরম গরম কথাবার্তা হতে থাকে। ইতিমধ্যেই সে সাহাবায়ে কিরামের এই আত্মোৎসর্গমূলক অবস্থা প্রত্যক্ষ করল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থুথু ফেললে তারা তা হাতে নিয়ে নিজ নিজ মুখ-মণ্ডলে মালিশ করে। তিনি ওযূ করলে সাহাবায়ে কিরাম ওযূর পানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুখমণ্ডলে মালিশ করে। তিনি কথা বললে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়। ওরওয়া ফিরে গিয়ে কোরাইশ সরদারদের কাছে বর্ণনা করল ঃ আমি কায়সার ও কিসরার ন্যায় বড় বড় রাজকীয় দরবারে গমন করেছি এবং নাজ্জাশীর কাছে গিয়েছি কিন্তু আল্লাহ্র কসম, আমি এমন কোন রাজা-বাদশাহ্ দেখিনি, যার জাতি তার প্রতি এতটুকু আত্মোৎসর্গকারী, যতটুকু মুহাম্মদের প্রতি তাঁর সহচরগণ আত্মোৎসর্গকারী। মুহাম্মদের কথা সঠিক। আমার অভিমত এই যে, তোমরা তার প্রস্তাব মেনে নাও। কিন্তু কোরাইশরা বলে দিল ঃ আমরা তার প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না। তাকে এ বছর ফিরে যেতে হবে এবং পরবর্তী বছর এসে ওমরা পালন করতে পারবে। আমরা এছাড়া অন্য কিছু মানি না। যখন ওরওয়ার কথায় কর্ণপাত করা হল না, তখন সে তার দল নিয়ে চলে গেল। এরপর জনৈক গ্রাম্য সরদার জলীস ইবনে আলকামা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আগমন করল। সাহাবায়ে কিরামকে ইহ্রাম অবস্থায় কুরবানীর জন্তসহ দেখে সে-ও ফিরে গিয়ে স্বজাতিকে বোঝাতে চাইল যে, তারা বায়তুল্লাহ্য় ওমরা পালন করতে এসেছে। তাদেরকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যখন কেউ তার কথা শুনল না, তখন সে-ও তার দল নিয়ে চলে গেল। অতঃপর একজন চতুর্থ ব্যক্তি আলাপ-আলোচনার জন্য আগমন করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকেও সেই কথাই বললেন, যা ইতিপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়াকে বলেছিলেন। সে ফিরে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জওয়াব কোরাইশদেরকে শুনিয়ে দিল।

অষ্টম অংশ ঃ হযরত ওসমান (রা)-কে পয়গামসহ প্রেরণ করা ঃ ইমাম বায়হাকী হযরত ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুদায়বিয়ায় পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন কোরাইশরা ঘাবড়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছে নিজের কোন লোক পাঠিয়ে এ কথা বলে দিতে চাইলেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে নয়, ওমরাহ্ পালন করতে এসেছি। অতএব আমাদের বাধা দিও না। এ কাজের জন্য তিনি হযরত ওমর (রা)-কে ডাকলেন। তিনি বললেন ঃ কোরাইশরা আমার ঘোর শত্রু। কারণ, তারা আমার কঠোর-তার বিষয়ে অবগত আছে। এছাড়া আমার গোত্রের এমন কোন লোক মক্কায় নেই, যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। তাই আমি আপনার কাছে এমন একজন লোকের নাম প্রস্তাব করছি, যিনি মক্কায় গোত্রগত কারণে বিশেষ শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি হলেন হযরত ওসমান ইবনে আফফান। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওসমান (রা)-কে এ কাজের আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে আরও বলে দিলেন যে, যেসব মুসলমান দুর্বল পুরুষ ও নারী মক্কা থেকে হিজরত করতে সক্ষম হয়নি এবং বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন আছে, তাদের কাছে যেয়ে সান্ত্বনা দেবে যে, তোমরা অস্থির হয়ো না। ইনশাআল্লাহ্ মক্কা বিজিত হয়ে তোমাদের বিপ-দাপদ দূর হওয়ার সময় নিকটবর্তী। হযরত ওসমান (রা) প্রথমে বালদাহে অবস্থানকারী কোরাইশ বাহিনীর কাছে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে সেই পয়গাম শুনিয়ে দিলেন, যা ইতিপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়া ইবনে মসউদকে শুনানো হয়েছিল। তারা বলল ঃ আমরা পয়গাম

শুনলাম। আপনি ফিরে গিয়ে বলে দিন যে, এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাদের জওয়াব শুনে হযরত ওসমান (রা) যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে আবান ইবনে সাঈদের সাথে দেখা হল। আবান তাঁকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হল এবং নিজ আশ্রয়ে নিয়ে বলল ঃ আপনি মক্কায় পয়গাম নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না। অতঃপর নিজের অশ্বে হযরত ওসমান (রা)-কে আরোহণ করিয়ে মক্কায় প্রবেশ করল। আবানের গোত্র বনূ সাঈদ মক্কায় অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। হযরত ওসমান (রা) এক একজন সরদারের কাছে পৌঁছলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পয়গাম পৌঁছালেন। কিন্তু সবাই তা প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর হযরত ওসমান (রা) দুর্বল ও অক্ষম মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পয়গাম পৌঁছালেন। তারা খুবই আনন্দিত হল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম বলল। পয়গাম পৌঁছানোর কাজ সমাপ্ত হলে মক্কাবাসীরা হযরত ওসমান (রা)-কে বলল ঃ আপনি ইচ্ছা করলে তওয়াফ করতে পারেন। হযরত ওসমান (রা) বললেন ঃ আমি তও-য়াফ করতে পারি না, যে পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা) তওয়াফ না করেন। হযরত ওসমান (রা) মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেন এবং কোরাইশদের রাযী করাবার প্রচেষ্টা চালান।

নবম অংশ ঃ মক্কাবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং মক্কাবাসীদের সত্তর-জনের গ্রেফতারী ঃ ইতিমধ্যে কোরাইশরা তাদের পঞ্চাশজন লোককে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকটে পৌঁছে সুযোগ বুঝে তাঁকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করল। তারা সুযোগের অপে-ক্ষায়ই ছিল, এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হিফাযত ও দেখাশুনায় নিযুক্ত হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে উপস্থিত করলেন। অপরদিকে হযরত ওসমান (রা) মক্কায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে আরও প্রায় দশজন মুসলমান মক্কা পৌঁছেছিলেন। কোরাইশরা তাদের পঞ্চাশজনের গ্রেফতারীর সংবাদ শুনে হযরত ওসমানসহ সব মুসলমানকে আটক করল। এতদ্ব্যতীত কোরাইশদের একদল সৈন্য মুসল-মান সৈন্যবাহিনীর দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের প্রতি তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করল। এতে একজন সাহাবী ইবনে যনীম শহীদ হলেন। মুসলমানরা কোরাইশদের দশজন অশ্বারোহীকে গ্রেফতার করে নিল। অপরপক্ষে হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে বলেও গুজব ছড়িয়ে পড়ল।

দশম অংশ ঃ বায়'আতে-রিযওয়ানের ঘটনা ঃ হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে একটি বৃক্ষের নীচে একত্র করলেন, যাতে সবাই জিহাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে বায়'আত করেন। সকলেই তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। এই সূরায় এই বায়'আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে এই বায়'আতে অংশগ্রহণকারীদের অসাধারণ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওসমান (রা) রসূ-লুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশে মক্কা গমন করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের এক হাতের উপর অপর হাত রেখে বললেন ঃ এটা ওসমানের বায়'আত। তিনি নিজের হাতকেই ওসমানের হাত গণ্য করে বায়'আত করলেন। এই বিশেষ ফযীলত হযরত ওসমানেরই বৈশিষ্ট্য।

একাদশ অংশ ঃ হুদায়বিয়ার ঘটনা ঃ অপরদিকে মক্কাবাসীদের মনে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি ভয়ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা স্বয়ং সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী

হয়ে সোহায়েল ইবনে আমর, হোয়ায়তাব ইবনে আবদুল ওযযা ও মুকরিম ইবনে হিফসকে ওযর পেশ করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট প্রেরণ করল। তাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন পরে মুসলমান হয়েছিল। সোহায়েল ইবনে আমর এসে আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। হযরত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা সম্পর্কিত যে সংবাদ আপনার কাছে পৌঁছেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনি আমাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিন। আমরাও তাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। রসূলুল্লাহ্ (সা) কাফির বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। মসনদে আহমদ ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই সূরার هُوَ الَّذِىْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ আয়াতটি এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর সোহায়েল ও তার সঙ্গীরা ফিরে গিয়ে বায়'আতে রিযওয়ানে সাহাবায়ে কিরামের প্রাণচাঞ্চল্য ও আত্মনিবেদনের অভূতপূর্ব অবস্থা কোরাইশদের সামনে বর্ণনা করল। দূতদের মুখে এসব অবস্থা শুনে শীর্ষস্থানীয় কোরাইশ নেতৃবৃন্দ পরস্পরে বলল ঃ এখন মুহাম্মদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করে নেওয়াই আমাদের পক্ষে উত্তম যে, তিনি এ বছর ফিরে যাবেন, যাতে সমগ্র আরবে একথা খ্যাত না হয়ে পড়ে যে, আমাদের বাধাদান সত্ত্বেও তারা জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেছে এবং পরবর্তী বছর ওমরা করার জন্য আগমন করবেন ও তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। সেমতে এই সোহায়েল ইবনে আমরই এই পয়গাম নিয়ে পুনরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে উপস্থিত হল। তিনি সোহায়েলকে দেখা মাত্রই বললেন ঃ মনে হয় মক্কাবাসীরা সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়েছে। তাই সোহায়েলকে আবার প্রেরণ করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বসে গেলেন এবং ওব্বাদ ইবনে বিশর ও মাসলামা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। সোহায়েল উপস্থিত হয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর সামনে বসে গেল এবং কোরাইশদের পয়গাম পৌঁছে দিল। সাহাবায়ে কিরাম তখন ওমরা না করে ইহ্রাম খুলে ফেলতে সম্মত ছিলেন না। তাঁরা সোহায়েলের সাথে কঠোর ভাষায় কথাবার্তা বললেন। সোহায়েলের স্বর কখনও উচ্চ এবং কখনও নম্র হল। ওব্বাদ সোহায়েলকে শাসিয়ে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে উচ্চস্বরে কথা বলো না। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরাইশদের শর্ত মেনে সন্ধি করতে সম্মত হলেন। সোহায়েল বলল ঃ আসুন, আমি নিজের ও আপনার মধ্যকার সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করি। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন ঃ লিখ, বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। সোহায়েল এখান থেকেই বিতর্ক শুরু করে বলল ঃ 'রাহমান' ও 'রাহীম' শব্দ আমাদের বাকপদ্ধতিতে নেই। আপনি এখানে সেই শব্দই লিখেন, যা পূর্বে লিখতেন, অর্থাৎ 'বিইসমিকা আল্লাহুমা'। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাও মেনে নিলেন এবং হযরত আলীকে তদ্রূপই লিখতে বললেন। এরপর তিনি হযরত আলী (রা)-কে বললেন ঃ লিখ এই অঙ্গীকারনামা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পাদন করছেন। সোহায়েল এতেও আপত্তি জানিয়ে বলল ঃ যদি আমরা আপনাকে আল্লাহ্র রসূল স্বীকারই করতাম, তবে কখনও বায়তুল্লাহ্ থেকে বাধা দান করতাম না। সন্ধিপত্রে কোন এক পক্ষের বিশ্বাসের বিপরীত কোন শব্দ থাকা উচিত নয়। আপনি শুধু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করান। রসূলুল্লাহ্

(সা) তাও মেনে নিয়ে হযরত আলী (রা)-কে বললেন ঃ যা লিখেছ, তা কেটে ফেল এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখ। হযরত আলী আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও আরয করলেন ঃ আমি আপনার নাম কেটে দিতে পারব না। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে ওসায়দ ইবনে হুযায়র ও সাদ ইবনে ওবাদা দৌড়ে এসে হযরত আলী (রা)-র হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন ঃ কাটবেন না এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত আর কিছুই লিখবেন না। যদি তারা না মানে, তবে আমাদের ও তাদের মধ্যে তরবারিই ফয়সালা করবে। চতুর্দিক থেকে আরও কিছু আওয়াজ উচ্চারিত হল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সন্ধিপত্রটি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং নিরক্ষর হওয়া ও লেখার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও স্বহস্তে এ কথাগুলো লিখে দিলেন ঃ

هذا ما قضى محمد بن عبد الله و سهيل بن عمرو اهلها على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض -

অর্থাৎ এই চুক্তি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ও সোহায়েল ইবনে আমর দশ বছর পর্যন্ত 'যুদ্ধ নয়' সম্পর্কে সম্পাদন করছেন। এই সময়ের মধ্যে সবাই নিরাপদ থাকবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমাদের একটি শর্ত এই যে, আপাতত আমাদেরকে তওয়াফ করতে দিতে হবে। সোহায়েল বলল ঃ আল্লাহ্র কসম, এটা হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা) তাও মেনে নিলেন। এরপর সোহায়েল নিজের একটি শর্ত এই মর্মে লিপিবদ্ধ করল যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে আপনার কাছে আগমন করবে, তাকে আপনি ফেরত দেবেন যদিও সে আপনার ধর্মাবলম্বী হয়। এতে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ধ্বনি উত্থিত হল। তারা বলল ঃ সোবহানাল্লাহ্। আমরা আমাদের মুসলমান ভাইকে মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দেব—এটা কিরূপে সম্ভবপর? কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) এই শর্তও মেনে নিলেন এবং বললেন ঃ আমাদের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কাছে যায়, তবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তার জন্য আমরা চিন্তা করব কেন? তাদের কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে আগমন করলে আমরা যদি তাকে ফিরিয়েও দেই, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সহজ পথ বের করে দেবেন। হযরত বারা (রা) এই সন্ধির সারমর্মে তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন ঃ এক. তাদের কোন লোক আমাদের কাছে আসলে আমরা তাকে ফিরিয়ে দেব। দুই. আমাদের কোন লোক তাদের কাছে চলে গেলে তারা ফেরত দেবে না। এবং তিন. আমরা আগামী বছর ওমরার জন্য আগমন করব, তিনদিন মক্কায় অবস্থান করব এবং অধিক অস্ত্র নিয়ে আসব না। পরিশেষে লেখা হল এই অঙ্গীকারনামা মক্কাবাসী ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্র মধ্যে একটি সংরক্ষিত দলীল। কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। অবশিষ্ট আরববাসিগণ স্বাধীন। যার মনে চাইবে মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে এবং যার মনে চাইবে কোরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে। একথা শুনে খোযায়া গোত্র

লাফিয়ে উঠল এবং বলল ঃ আমরা মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি, আর বনূ বকর সামনে অগ্রসর হয়ে বলল ঃ আমরা কোরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি।

সন্ধির শর্তাবলীর কারণে সাহাবায়ে কিরামের অসন্তুষ্টি ও মর্মবেদনা ঃ যখন সন্ধির উপরোক্ত শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়ে গেল, তখন হযরত ওমর (রা) স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আল্লাহ্‌র সত্য নবী নন? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আমি সত্য নবী। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কি মিথ্যায় পতিত নয়? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। হযরত ওমর (রা) আরয করলেন ঃ আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ জান্নাতে এবং তাদের নিহত ব্যক্তিগণ জাহান্নামে নয় কি? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। এরপর হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ তবে আমরা কেন ওমরা না করে ফিরে যাবার অপমানকে কবূল করে নেব? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রসূল হয়ে কখনও তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করব না। আল্লাহ্ আমাকে বিপথগামী করবেন না। তিনি আমার সাহায্যকারী। হযরত ওমর (রা) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি একথা বলেন নি যে, আমরা বায়তুল্লাহ্‌র কাছে যাব এবং তওয়াফ করব? তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে একথা বলেছিলাম; কিন্তু আমি কি একথাও বলেছিলাম যে, এ কাজ এ বছরই হবে? হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ না, আপনি এরূপ বলেন নি। তিনি বললেন ঃ মনে রেখ, আমি যা বলেছি, তা অবশ্যই হবে। তুমি বায়-তুল্লাহ্‌র কাছে যাবে এবং তওয়াফ করবে।

হযরত ওমর (রা) চুপ হয়ে গেলেন, কিন্তু মনের ক্ষোভ দমিত হচ্ছিল না। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে গেলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ আরে ভাই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রসূল, তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবেন না। আল্লাহ্ তাঁর সাহায্যকারী। কাজেই তুমি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে আঁকড়ে থাক। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি সত্যের উপর আছেন। মোটকথা, সন্ধির শর্তাবলীর কারণে হযরত ফারূকে-আযমের দুঃখ ও মর্মবেদনার অন্ত ছিল না। তিনি নিজে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এই একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া আমার মনে কোন সময় সন্দেহ দেখা দেয়নি। (বুখারী) হযরত আবূ ওবায়দা (রা) তাকে বোঝালেন এবং বললেন ঃ শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। ফারূকে আযম (রা) বললেন ঃ আমি শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ আমি যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলাম, তখন থেকে সর্বদা সদকা-খয়রাত করেছি, রোযা রেখেছি এবং ক্রীতদাস মুক্ত করেছি, যাতে আমার এই ত্রুটি মাফ হয়ে যায়।

আরও একটি দুর্ঘটনা ঃ চুক্তি পালনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অপূর্ব কর্মতৎপরতা ঃ যে সময়ে সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়েছিল এবং সাহাবায়ে কিরামের অসন্তুষ্টি প্রকাশ অব্যাহত ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে কোরাইশ পক্ষের স্বাক্ষরকারী সোহায়েল ইবনে আমরের পুত্র আবূ জন্দল হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে ইতিপূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং পিতা সোহায়েল তাকে মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, তার উপর অকথ্য নির্যাতনও চালানো হত।

সে কোনরূপে পলায়ন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছে গেল এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল। কয়েকজন মুসলমান অগ্রসর হয়ে তাকে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে নিল। কিন্তু সোহায়েল এই বলে চিৎকার করে উঠল যে, এটাই চুক্তির প্রথম বরখেলাফ কাজ হচ্ছে। আবূ জন্দলকে প্রত্যর্পণ করা না হলে আমি চুক্তির কোন শর্ত মেনে নিতে রাযী নই। রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিসূত্রে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই আবূ জন্দলকে ডেকে বললেন ঃ আবূ জন্দল, তুমি আরও কিছুদিন সবর কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য এবং অন্যান্য অক্ষম মুসলমানের জন্য শীঘ্রই মুক্তি ও নিষ্কৃতির কোন ব্যবস্থা করে দেবেন। আবূ জন্দলের এই ঘটনা মুসলমানদের আহত অন্তরে আরও বেশি নিমক ছিটিয়ে দিল। তারা তো এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল যে, মক্কা এই মুহূর্তেই বিজিত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানকার অবস্থা দেখে তাদের দুঃখ ও মর্মবেদনার সীমা রইল না। তারা ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধি-পত্র চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। সন্ধিপত্রে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আবূ বকর, ওমর, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবদুল্লাহ্ ইবনে সোহায়েল ইবনে ওসর, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আলী ইবনে আবী তালেব প্রমুখ স্বাক্ষর করলেন এবং কোরাইশদের পক্ষ থেকে সোহায়েল ও তার সঙ্গীরা স্বাক্ষর করল।

ইহ্‌রাম খোলা ও কুরবানী করা ঃ চুক্তি সম্পাদন সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এখন আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। কাজেই সঙ্গে কুর-বানীর যেসব জন্তু আছে, সেগুলো কুরবানী করে ফেল এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ইহ্‌রাম খুলে ফেল। উপর্যুপরি দুঃখ ও বেদনার কারণে সাহাবায়ে কিরাম যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই আদেশ সত্ত্বেও তারা স্ব-স্ব স্থান ত্যাগ করলেন না। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) দুঃখিত হলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার কাছে পৌঁছে এই দুঃখ প্রকাশ করলেন। উম্মুল মু'মিনীন তাকে অত্যন্ত সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়ে বললেন ঃ আপনি সহচরদেরকে কিছু বলবেন না। সন্ধির এক তরফা শর্তাবলী এবং ওমরা ব্যতীত ফিরে যাওয়ার কারণে এই মুহূর্তে তাঁরা ভীষণ মর্মবেদনা অনুভব করছে। আপনি সবার সামনে নাপিত ডেকে মাথা মুণ্ডান এবং নিজের জন্তু কুরবানী করুন। পরামর্শ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) তাই করলেন। এই দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে কিরাম সবাই নিজ নিজ স্থান থেকে উঠলেন এবং একে অপরের মাথা মুণ্ডালেন ও কুরবানী করলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) সবার জন্য দোয়া করলেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ায় উনিশ দিন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে কুড়ি দিন অবস্থান করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি প্রথমে মাররে যাহ্‌রান অতঃপর আসফানে পৌঁছেন। এখানে পৌঁছার পর সব মুসলমানের পাথেয় প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। আহার্য বস্তু সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি দস্তরখান বিছালেন এবং সবাইকে আদেশ দিলেন—যার কাছে যা আছে এখানে রেখে দাও। ফলে অবশিষ্ট সমস্ত আহার্য বস্তু দস্তরখানে একত্র হয়ে গেল। চৌদ্দশ লোকের সমাবেশ ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) দোয়া করলেন এবং সবাইকে খাওয়া শুরু করার আদেশ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বর্ণনা করেন চৌদ্দশ লোক এই খাদ্য খুব পেট ভরে আহার করল এবং নিজ নিজ পাত্রে ভরে নিল। এরপরও পূর্বের ন্যায় আহার্য বস্তু অবশিষ্ট ছিল। এই সফরের এটা ছিল দ্বিতীয় মো'জেযা। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই দৃশ্য দেখে খুবই প্রীত হলেন।

সাহাবায়ে কিরামের ঈমান ও আনুগত্যের আরও একটি পরীক্ষা : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সন্ধির শর্তাবলী ওমরা ব্যতিরেকে ও যুদ্ধে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন ব্যতিরেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে দুঃসহ ছিল। অনন্য সাধারণ ঈমানের বলেই তাঁরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রসূল (সা)-এর আনুগত্যে অটল ও অনড় থাকতে পেরেছিলেন। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) 'কুরা গামীম' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন আলোচ্য 'সূরা ফাত্হ' অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেওয়ায় হযরত ওমর (রা) আবার প্রশ্ন করে বসলেন : ইয়া রসূলাল্লাহ্। এটা কি বিজয় ? তিনি বললেন : যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। এই ভাষ্যের সামনেও সাহাবায়ে কিরাম মাথা নত করে নিলেন এবং গোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় মেনে নিলেন।

হুদায়বিয়া সন্ধির ফলাফল ও কল্যাণের বিকাশ : এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া এই প্রকাশ পায় যে, কোরাইশ ও তাদের অনেক অনুসারীর সামনে তাদের অন্যায় জেদ ও হঠকারিতা ফুটে ওঠে এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা এবং ওরওয়া ইবনে মসঊদ আপন আপন দল নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কিরা-মের নজীরবিহীন আত্মনিবেদন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি তাদের অনুপম অনুরাগ, সম্ভ্রম ও আনুগত্য দেখে কোরাইশরা ভীত হয়ে যায় এবং সন্ধি করতে সম্মত হয়। অথচ তাদের জন্য মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এর চাইতে উত্তম সুযোগ আর ছিল না। কেননা, তারা নিজেদের বাড়ী ঘরে ছিল এবং মুসলমানগণ ছিলেন প্রবাসী। পানির জায়গাগুলো তাদের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ ছিলেন ঘাস পানিবিহীন প্রান্তরে। তাদের পূর্ণ রণশক্তি ছিল। মুসলমানদের কাছে তেমন অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। তাদের দলের অনেক লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সাক্ষাৎ ও মেলা-মেশার সুযোগ পায়। ফলে অনেকের অন্তরে ইসলাম ও ঈমান আসন করে নেয় এবং পরে তারা মুসলমান হয়ে যায়। তৃতীয়ত সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের কারণে পথঘাট নিরাপদ হয়ে যায় এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারিত হয়। আরব গোত্রসমূহের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহা-বায়ে কিরাম আরবের কোণে কোণে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। বিভিন্ন রাজা বাদ-শাহ্র নামে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় বাদশাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব কার্যক্রমের ফল এই দাঁড়ায় যে, হুদায়বিয়ার ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যাপক দাওয়াত ও ওমরার জন্য বের হওয়ার তাকীদ সত্ত্বেও যেখানে দেড় হাজারের বেশি মুসলমান সঙ্গে ছিল না, সেখানে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এই সময়েই সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজিত হয়, যার ফলে বিপুল পরিমাণে সমরোপকরণ হস্তগত হয় এবং মুসলমানদের সমর শক্তি সুসংহত হয়। সন্ধির পর দুই বছর অতিক্রান্ত না হতেই মুসলমানদের সংখ্যা এত বেড়ে যায়, যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এরই ফলস্বরূপ কোরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের দরুন যখন

৭—

রসূলুল্লাহ্ (সা) গোপনে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন, তখন সন্ধির মাত্র বিশ-একুশ মাস পরে তাঁর সাথে মক্কা গমনকারী আত্মনিবেদিত মুসলমান সিপাহীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সংবাদ পেয়ে কোরাইশরা উদ্বিগ্ন হয়ে চুক্তি নবায়নের জন্য তড়িঘড়ি আবূ সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তি নবায়ন করলেন না এবং অবশেষে আল্লাহ্র দশ হাজার লশকর সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কোরাইশরা এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, মক্কায় তেমন কোন যুদ্ধের প্রয়োজনই হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দূরদর্শী রাজনীতিও কিছুটা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেছিল। তিনি মক্কায় ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এভাবে সব মানুষ নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এ কারণেই মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না যুদ্ধের মাধ্যমে—এ বিষয়ে ফিক্হশাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোট কথা, অতি সহজেই মক্কা বিজিত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। সাহাবায়ে কিরাম নিশ্চিন্তে বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করেন, মাথা মুণ্ডান ও চুল কাটেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে নিয়ে বায়তুল্লায় প্রবেশ করেন। বায়তুল্লাহ্র চাবি তাঁর হস্তগত হয়। এ সময় তিনি বিশেষভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ এই ঘটনাই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। এরপর বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওমর (রা)-কে বলেন ঃ এই ঘটনাই আমি তোমাকে বলেছিলাম। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ নিঃসন্দেহ কোন বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধির চাইতে উত্তম ও মহান নয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তো পূর্ব থেকেই একথা বলতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর মধ্যকার এই মীমাংসিত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা স্বপ্নের দ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের দ্রুততা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দ্রুততা অবলম্বন করেন না, বরং তাঁর প্রত্যেক কাজ যথার্থ সময়েই সম্পন্ন হয়। তাই 'সূরা ফাত্হে' আল্লাহ্ তা'আলা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ জানার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ বোঝা সহজ হবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ এখানে প্রথমোক্ত لام-কে কারণ বর্ণনার জন্য ধরা হলে এর সারমর্ম এই হবে যে, আয়াতে বর্ণিত তিনটি অবস্থা অর্জিত হওয়ার জন্য আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করা হয়েছে। তিনটি অবস্থা এই ঃ এক. আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ গোনাহ্ মাফ করা। সূরা মুহাম্মদে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র। তাঁদের বেলায় কোরআনে যেখানে সেখানে ذنب অথবা عصيان (গোনাহ্) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত কাজ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। নবুয়তের উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে অনুত্তম কাজ করাও একটি ত্রুটি যাকে কোরআনে শাসানোর ভঙ্গিতে ذنب তথা গোনাহ্ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত

করা হয়েছে। ما تقدم বলে নবুয়তের পূর্ববর্তী ত্রুটি এবং ما تاخر বলে নবুয়ত লাভের পরবর্তী ত্রুটি বোঝানো হয়েছে। —(মাযহারী) প্রকাশ্য বিজয় এই ক্ষমার কারণ এজন্য যে, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলে দলে দলে লোক ইসলামে দাখিল হবে। ইসলামী দাও-য়াতের ব্যাপক আকার লাভ করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবনের মহান লক্ষ্যকে সমুন্নত করবে এবং তাঁর সওয়াব ও প্রতিদানকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, সওয়াব ও প্রতিদান বেড়ে যাওয়া ত্রুটি মার্জনার কারণ হয়ে থাকে। —(বয়ানুল- কোরআন)

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا—এটা প্রকাশ্য বিজয়ের দ্বিতীয় কল্যাণ। এখানে প্রশ্ন হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তো পূর্ব থেকেই 'সিরাতে-মুস্তাকীম' তথা সরল পথে ছিলেন এবং শুধু তিনিই নন বরং বিশ্ববাসীকে এই সরল পথের দাওয়াত দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। অতএব, হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে সরল পথ পরিচালনা করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াব সূরা ফাতিহার তফসীরে 'হিদায়ত' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ 'হিদায়ত' একটি ব্যাপক শব্দ। এর অসংখ্য স্তর আছে। কারণ, হিদায়তের অর্থ অভীষ্ট মনযিলের পথ দেখানো অথবা সেখানে পৌঁছানো। প্রত্যেক মানুষের আসল অভীষ্ট মনযিল হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টির অসংখ্য ও অগণিত স্তর আছে। এক স্তর অর্জিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অর্জনের আবশ্যকতা বাকী থাকে। কোন বৃহত্তম ওলী এমনকি নবী-রসূলও এই আবশ্যকতা থেকে মুক্ত হতে পারেন না। এ কারণেই নামাযের প্রত্যেক রাক'আতে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ বলে দোয়া করার শিক্ষা যেমন উম্মতকে দেওয়া হয়েছে, তেমনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীমের হিদায়ত তথা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্তরসমূহে উন্নতি লাভ করা। এই প্রকাশ্য বিজয়ের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টিরই একটি অত্যুচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করেছেন, যাকে يَهْدِيَكَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا—এটা প্রকাশ্য বিজয়ের তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার যে সাহায্য ও সমর্থন আপনি চিরকাল লাভ করে এসেছেন, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলস্বরূপ তার একটি মহান স্তর আপনাকে দান করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِيٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۚ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا

حَكِيْمًا ۝ لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝ وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۗ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ۝ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

(৪) তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫) ঈমান এজন্য বেড়ে যায়, যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে তিনি তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই আল্লাহ্‌র কাছে মহা-সাফল্য। (৬) এবং যাতে তিনি কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদিনী নারীদেরকে শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। তাদের জন্য মন্দ পরিণাম। আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল অত্যন্ত মন্দ। (৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি মুসলমানদের অন্তরে সহনশীলতা সৃষ্টি করেছেন, (যার প্রতিক্রিয়া দু'টি— এক. জিহাদের বায়'আতের সময় এগিয়ে যাওয়া, সংকল্প ও সাহসিকতা ; যেমন বায়'আতে রিযওয়ানের ঘটনায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দুই. কাফিরদের অন্যায় হঠকারিতার সময় নিজেদের জোশ ও ক্রোধকে বশে রাখা। হুদায়বিয়ার ঘটনার দশম অংশে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ আয়াতেও বর্ণিত হবে)। যাতে তাদের আগেকার ঈমানের সাথে তাদের ঈমান আরও বেড়ে যায়। কেননা, আসলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আনুগত্য ঈমানের নূর বৃদ্ধি পাওয়ার একটি উপায়। এই ঘটনায়

প্রত্যেক দিক দিয়ে রসূল (সা)-এর পূর্ণ আনুগত্যের পরীক্ষা হয়েছে। রসূল (সা) যখন জিহাদের ডাক দিলেন এবং বায়'আত নিলেন তখন সবাই হৃষ্টচিত্তে এগিয়ে এসে বায়'আত করল এবং জিহাদের জন্য তৈরী হল। এরপর যখন রহস্য ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূল (সা) জিহাদ করতে নিষেধ করলেন, তখন সকল সাহাবী জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ও অস্থির হওয়া সত্ত্বেও রসূল (সা)-এর আনুগত্যে মাথানত করে দিলেন এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ (যেমন ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টি জীব) আল্লাহ্‌রই। তাই কাফিরদেরকে পরাজিত করা ও ইসলামকে সমুন্নত করার জন্য তোমাদের জিহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা মুখাপেক্ষী নন। তিনি ইচ্ছা করলে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করতে পারেন; যেমন বদর, আহযাব ও হুনায়নের যুদ্ধে তা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এই বাহিনী প্রেরণ করাও মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করার জন্য; নতুবা একজন ফেরেশতাই সবাইকে খতম করার জন্য যথেষ্ট। অতএব কাফিরদের সংখ্যাধিক্য দেখে জিহাদে যেতে তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয় এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে জিহাদ বর্জন করার আদেশ হলে তাতেও ইতস্তত করা সমীচীন নয়। জিহাদকরণ ও জিহাদ বর্জনের ফলাফল ও পরিণাম আল্লাহ্ তা'আলাই বেশী জানেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা (উপযোগিতা সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, [জিহাদকরণ উপযোগী হলে তার নির্দেশ দেন। তাই উভয় অবস্থায় মুসলমানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে রসূল (সা)-এর আদেশের অনুগত রাখা উচিত। এটা ঈমান বৃদ্ধির কারণ। অতঃপর ঈমান বৃদ্ধির ফলাফল বর্ণনা করা হচ্ছে :] এবং যাতে আল্লাহ্ (এই আনুগত্যের বদৌলতে) মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। এবং যাতে (এই আনুগত্যের বদৌলতে) তাদের পাপ মোচন করেন [কেননা পাপ কর্ম থেকে তওবা এবং সৎ কর্ম সম্পাদন সবই রসূল (সা)-এর আনুগত্যের মধ্যে দাখিল, যা সমস্ত পাপ মোচনকারী] এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) আল্লাহ্‌র কাছে মহা সাফল্য। (এই আয়াতে প্রথম মু'মিনদের অন্তরে শান্তি ও সহনশীলতা নাযিল করার নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এই নিয়ামত রসূল (সা)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে এবং রসূল (সা)-এর আনুগত্য জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ হয়েছে। সুতরাং এসব বিষয় মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করারই ফল। অতঃপর এই প্রশান্তির ফল হিসাবেই মুনাফিকদের এ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং এই বঞ্চিত হওয়ার কারণে আযাবে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ এই প্রশান্তি মুসলমানদের অন্তরে নাযিল করেছেন এবং কাফিরদের অন্তরে নাযিল করেন নি] যাতে আল্লাহ্ তা'আলা কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীদেরকে (তাদের কুফরের কারণে) শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি কুধারণা পোষণ করে। (এখানে পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে তাদের কুধারণা বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে ওমরা করার জন্য মক্কার দিকে যাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তারা অস্বীকার করে পরস্পরে একথা বলেছিল : তারা আমাদেরকে মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধে জড়িত করতে চায়। তাদেরকে যেতে দাও। তারা জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। এ ধরনের উক্তি মুনাফিকদেরই হতে পারে। ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে সমস্ত কুফরী ও শিরকী বিশ্বাস এই কুধারণার অন্তর্ভুক্ত। অতএব, সব কাফির ও মুশরিকের জন্য এই শাস্তির সংবাদ যে, দুনিয়াতে) তারা বিপর্যয়ে

পতিত হবে। (সেমতে কিছুদিন পরেই তারা নিহত ও বন্দী হয়েছে। মুনাফিকদের সারা জীবন আক্ষেপ ও পরিতাপের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। কারণ, মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল)। এবং (পরকালে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখবেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। এটা খুবই মন্দ ঠিকানা। (অতঃপর এই শাস্তির এ বলে আরো দৃঢ় করা হচ্ছে যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী (অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিমান। ইচ্ছা করলে যে কোন একটি বাহিনী দ্বারা সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেন। কারণ তারা এরই উপযুক্ত। কিন্তু যেহেতু তিনি) প্রজ্ঞাময় (তাই উপযোগিতার কারণে শাস্তিদানের ব্যাপারে অবকাশ দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার প্রথম তিন আয়াতে এই প্রকাশ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সফর সঙ্গী কয়েকজন সাহাবী আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এসব নিয়ামত তো আপনার জন্য। এগুলো আপনার জন্য মোবারক হোক; কিন্তু আমাদের জন্য কি? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে সরাসরি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত যেহেতু ঈমান ও রসূল (সা)-এর আনুগত্যের কারণ হয়েছে, তাই এগুলো সব মু'মিনও শামিল। কারণ, যে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের পূর্ণতা লাভ করবে, সেই এসব নিয়ামতের যোগ্য পাত্র হবে।

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

(৮) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারী রূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে, (৯) যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর। (১০) যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহ্র কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব যে শপথ ভঙ্গ করে, অতি অবশ্যই সে তা

নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ্ সত্বরই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ!) আমি আপনাকে (কিয়ামতের দিন উম্মতের ক্রিয়াকর্মের) সাক্ষ্য-দাতা রূপে (সাধারণত) এবং (দুনিয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে) সুসংবাদদাতা রূপে এবং (কাফিরদেরকে) ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি, (হে মুসলমানগণ! আমি তাঁকে এ কারণে রসূল করে প্রেরণ করেছি) যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে (ধর্মের কাজে) সাহায্য ও সম্মান কর (বিশ্বাসগতভাবেও অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বগুণে গুণান্বিত এবং সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে পবিত্র মনে করে এবং কার্য-গতভাবেও অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করে)। এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা (ও মহিমা) ঘোষণা কর। (এই পবিত্রতা ঘোষণার তফসীর নামায হলে সকাল-সন্ধ্যার ফরয নামায বোঝানো হয়েছে। নতুবা সাধারণ যিকর যদিও তা মুস্তাহাব হয়—বোঝানো হয়েছে। অতঃপর কতিপয় বিশেষ হক সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ) যারা আপনার কাছে (হুদায়বিয়ার দিবসে এ বিষয়ে) শপথ করছে (অর্থাৎ অঙ্গীকার করেছে) যে, জিহাদ থেকে পলায়ন করবে না, তারা বাস্তবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শপথ করছে। (কেননা, উদ্দেশ্য আপনার কাছে এ বিষয়ে শপথ করা যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান তারা প্রতিপালন করবে। অতএব যেন) আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতঃপর (শপথ করার পর) যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে (অর্থাৎ আনুগত্যের পরিবর্তে বিরুদ্ধাচরণ করবে), তার অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি তার উপরই বর্তাবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, সত্বরই আল্লাহ্ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর উম্মতকে বিশেষ করে বায়'আতে রিয-ওয়ানে অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এসব নিয়ামত দানকারী ছিলেন আল্লাহ্ এবং দানের মাধ্যম ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সা)। তাই এর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ও রসূলের হক এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে তাঁর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

نذ یر و مبشر, شا هد

شا هد শব্দের অর্থ সাক্ষী। এর উদ্দেশ্য তাই, যা সূরা নিসার فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا আয়াতের তফসীরে দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি আল্লাহ্র পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর কেউ আনুগত্য করেছে

এবং কেউ নাফরমানী করেছে। এমনিভাবে নবী করীম (সা)-ও তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন। সূরা নিসার আয়াতের তফসীরে কুরতুবী লিখেন ঃ পয়গম্বরগণের এই সাক্ষ্য নিজ নিজ যমানার লোকদের সম্পর্কে হবে যে, তাঁদের দাওয়াত কে কবুল করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাক্ষ্য তাঁর আমলের লোকদের সম্পর্কে হবে। কেউ কেউ বলেন, এই সাক্ষ্য সমস্ত উম্মতের পুণ্য ও পাপ কাজ সম্পর্কে হবে। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সকাল-সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে পেশ করা হয়। কাজেই তিনি সমস্ত উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন।—(কুরতুবী)

بَشِير শব্দের অর্থ সুসংবাদদাতা এবং نَذِير শব্দের অর্থ সতর্ককারী। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মতের আনুগত্যশীল মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন এবং কাফির পাপাচারীদেরকে আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করবেন। অতঃপর রসূল প্রেরণের লক্ষ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ঈমানের সাথে আরও তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঈমানদারদের মধ্যে থাকা বিধেয়—
تُعَزِّرُوهُ—تُوَقِّرُوهُ এবং تُسَبِّحُوهُ

تُعَزِّرُوهُ—শব্দটি تَعْزِير ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাহায্য করা। দণ্ডকেও এ কারণে تَعْزِير বলা হয় যে, অপরাধীকে দণ্ড দিলে প্রকৃতপক্ষে তাকে সাহায্য করা হয়। —(মুফরাদাতুল-কোরআন)

تُوَقِّرُوهُ—শব্দটি تَوْقِير ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সম্মান করা। تُسَبِّحُوهُ শব্দটি تَسْبِيح ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করা। সর্বশেষ শব্দটি নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্র জন্যই হতে পারে। তাই এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বোঝানোর সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারাও আল্লাহ্কেই বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ্কে অর্থাৎ তাঁর দীনকে ও রসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কেউ কেউ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রসূলকে বুঝিয়ে এরূপ অর্থ করেন যে, রসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর। কিন্তু কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, এতে সর্বনামসমূহের বিভিন্নতা জরুরী হয়ে পড়ে, যা অলংকারশাস্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ। এরপর হুদায়বিয়ার ঘটনার দশম অংশে বর্ণিত বায়'আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে বায়'আত করেছে, তারা যেন স্বয়ং আল্লাহ্র হাতে বায়'আত করেছে। কারণ, এই বায়'আতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র আদেশ পালন করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। কাজেই তারা যখন রসূলের হাতে হাত রেখে বায়'আত করল, তখন যেন আল্লাহ্র হাতেই বায়'আত করল। আল্লাহ্র হাতের স্বরূপ কারও জানা নেই এবং জানার চেষ্টা করাও দুরস্ত নয়।

বায়'আতের আসল শর্ত কোন বিশেষ কাজের জন্য শপথ গ্রহণ করা। একজন অপর-জনের হাতের উপর হাত রেখে শপথবাণী উচ্চারণ করা বায়'আতের প্রাচীন ও মসনূন তরীকা। তবে হাতের উপর হাত রাখা শর্ত বা জরুরী নয়। যে কাজের অঙ্গীকার করা হয়, তা পূর্ণ করা আইনত ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বায়'আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। এতে আল্লাহ্ ও রসূলের কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ্ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا
فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ قُلْ
فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ
بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝ بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ
لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ
فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًۢا بُوْرًا ۝
وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ۝
وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۭ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

---

(১১) মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, তারা আপনাকে বলবে : আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুন : আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয় পরিপূর্ণ জ্ঞাত। (১২) বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসূল ও মু'মিনগণ তাদের বাড়ী-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের জন্য খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। (১৩) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব

কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। (১৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেসব মরুবাসী (হুদায়বিয়া সফর থেকে) পশ্চাতে রয়ে গেছে, (সফরে শরীক হয়নি) তারা সত্বরই (যখন আপনি মদীনায় পৌঁছবেন) আপনাকে (মিছামিছি) বলবে (আমরা আপনার সাথে যাইনি কারণ) আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব আমাদের জন্য (এই ত্রুটি) মার্জনার দোয়া করুন। (এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে বলেন ঃ) তারা মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। [অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যখন আপনার কাছে এই ওযর পেশ করে, তখন] আপনি বলে দিন (প্রথমত এই ওযর সত্য হলেও আল্লাহ্ ও রসূলের অকাট্য নির্দেশের মুকাবিলায় তুচ্ছ ও বাতিল গণ্য হত। কেননা, আমি জিজ্ঞাসা করি,) আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার করার ইচ্ছা করলে কে তাঁর সামনে তোমাদের জন্য (উপকার ক্ষতি ইত্যাদি) কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে? (অর্থাৎ তোমাদের সত্তা অথবা তোমাদের ধন-দৌলত ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে যে উপকার অথবা ক্ষতি তকদীরে অবধারিত হয়ে গেছে, তার খেলাফ করার ক্ষমতা কারও নেই। তবে শরীয়ত অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের আশংকার ওযর কবূল করে অনুমতি দিয়েছে, যদি সেই ওযর বাস্তবে সত্য হয়। আলোচ্য প্রশ্নে শরীয়ত বাড়ী-ঘরের ব্যস্ততাকে গ্রহণযোগ্য ওযর সাব্যস্ত করেনি যদিও তা বাস্তবসম্মত হয়। দ্বিতীয়ত, তোমাদের পেশকৃত এই ওযর সত্যও নয়। তোমরা মনে কর যে, আমি এই মিথ্যা সম্পর্কে অবগত নই, কিন্তু সত্য এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা (যিনি) তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত (তিনি আমাকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেছেন যে, তোমাদের অনুপস্থিতির কারণ তা নয়, যা তোমরা বর্ণনা করছ) বরং (আসল কারণ এই যে,) তোমরা মনে করেছ যে, রসূল ও মু'মিনগণ কখনও তাঁদের বাড়ী-ঘরে ফিরে আসতে পারবেন না (মুশরিকদের হাতে সবাই প্রাণ হারাবে) এবং এই ধারণা তোমাদের মনেও খুব সুখকর ছিল (আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি শত্রুতার কারণে এটা তোমাদের আন্তরিক কামনাও ছিল)। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা (এসব কুফরী ধারণার কারণে) এক ধ্বংসমুখী সম্প্রদায় ছিলে। (এসব শাস্তির খবর শুনে তোমরা এখনও ঈমানদার হয়ে গেলে ভাল, নতুবা) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। (মু'মিন ও অবিশ্বাসীদের জন্য এই আইন রচনার কারণে আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। (কাফির যদিও শাস্তির যোগ্য হয়, কিন্তু) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (কাজেই সেও খাঁটি মনে বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকেও ক্ষমা করে দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত বিষয়বস্তু সেসব মরুবাসীর সাথে সম্পৃক্ত, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)

হুদায়বিয়ার সফরে সঙ্গে চলার আদেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা নানা তালবাহানার আশ্রয় নেয়। হুদায়বিয়ার ঘটনার প্রথম অংশে একথা বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে তওবা করে এবং খাঁটি ঈমানদার হয়ে যায়।

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

(১৫) তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে ঃ আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহ্‌র কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন ঃ তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে ঃ বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। পরন্তু তারা সামান্যই বুঝে। (১৬) গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন ঃ আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেবেন। আর যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। (১৭) অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য ও রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নেই এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা সত্বরই যখন (খায়বরের) যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা (হুদায়বিয়ার সফর থেকে) পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে ঃ আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যাবার অনুমতি দাও। (এই আবেদনের কারণ ছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করা। লক্ষণাদি দৃষ্টে এই সম্পদ লাভের বিষয় তাদের জানা ছিল এবং তারা তা প্রত্যাশাও করত। কিন্তু হুদায়বিয়ার সফরে কষ্ট ও ধ্বংসই অধিক প্রত্যাশিত ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ) তারা আল্লাহ্র আদেশ পরিবর্তন করতে চায়। (অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ ছিল এই যে, এই যুদ্ধে তারাই যাবে, যারা হুদায়বিয়া ও বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের ব্যতীত অন্য কেউ যাবে না ; বিশেষত তারা যাবে না, যারা হুদায়বিয়ার সফরে অংশ-গ্রহণ করেনি এবং নানা তালবাহানার আশ্রয় নিয়েছে)। অতএব, আপনি বলে দিন, তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে যেতে পারবে না। (অর্থাৎ তোমাদের আবেদন আমরা মঞ্জুর করতে পারি না। কারণ, এতে আল্লাহ্র আদেশ পরিবর্তন করার গোনাহ্ আছে। কেননা,) আল্লাহ্ প্রথম থেকেই এই কথা বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ [হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পথেই আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন যে, খায়বর যুদ্ধে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের ব্যতীত কেউ যাবে না। বাহ্যত এই আদেশ কোরআনে উল্লিখিত নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই আদেশ অপঠিত ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা) লাভ করেছিলেন। এরূপ অপঠিত ওহী হাদীসের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। একথাও সম্ভবপর যে, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে অবতীর্ণ সূরা ফাত্হের اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا আয়াতে খায়বরের বিজয় বোঝানো হয়েছে। সেমতে এই আয়াত ইঙ্গিত করেছে যে, খায়বরের বিজয় হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ-কারিগণই লাভ করবে। আপনার এই কথা শুনে উত্তরে] তখন তারা বলবে ঃ [বাহ্যত এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখের উপর বলা উদ্দেশ্য নয় ; বরং তারা অন্যদেরকে বলবে যে, আমাদেরকে সাথে না নেওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্র আদেশ নয়] বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। (তাই আমাদের অংশগ্রহণ তোমাদের মনঃপূত নয়। অথচ মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষের কোন নামগন্ধও নেই।) বরং তারা অল্পই বুঝে। (পুরাপুরি বুঝলে আল্লাহ্র এই আদেশের রহস্য অনায়াসেই বুঝতে পারত যে, হুদায়বিয়ায় মুসলমানরা একটি বৃহত্তর আশংকার সম্মুখীন হয়েছে এবং অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আর মুনা-ফিকরা তাদের পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এটাই বিশেষভাবে মুসলমানদের খায়বর যুদ্ধে যাওয়ার এবং মুনাফিকদের বঞ্চিত হওয়ার কারণ। এ পর্যন্ত খায়বর সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণিত হল। অতঃপর অপর একটি ঘটনা ইরশাদ হচ্ছে ঃ). আপনি পশ্চাতে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে (আরও) বলে দিন, (এক খায়বর যুদ্ধে না গেলে তাতে কি হল, সওয়াব হাসিল করার আরও অনেক সুযোগ ভবিষ্যতে আসবে। সেমতে) সত্বরই তোমরা এমন লোকদের প্রতি (যুদ্ধ করার জন্য) আহূত হবে, যারা কঠোর যোদ্ধা (এখানে পারস্য ও রোমের সাথে যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে)। [দুররে মনসুর] কেননা, তাদের সেনাবাহিনী ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, (ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য ও জিযিয়া দানে স্বীকৃত

হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এ কাজের জন্য আহূত হবে) অতএব (তখন) যদি তোমরা আনুগত্য কর (এবং তাদের সাথে জিহাদ কর) তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর যদি তোমরা তখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, যেমন ইতিপূর্বে (হুদায়বিয়া) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে, তবে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। (তবে জিহাদে অক্ষম ব্যক্তিগণ এর আওতা বহির্ভূত। সেমতে) অন্ধের জন্য কোন গোনাহ্ নেই, খঞ্জের জন্য কোন গোনাহ্ নেই এবং রুগ্নের জন্য কোন গোনাহ্ নেই। (উপরে জিহাদকারীদের জন্য জান্নাত ও নিয়ামতের যে ওয়াদা এবং জিহাদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের জন্য যে শাস্তির খবর উচ্চারিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে তাদের জন্যই নয় বরং) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর আনুগত্য করবে, তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত এবং যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর যুদ্ধে গমন করার ইচ্ছা করলেন, তখন শুধু তাঁদেরকে সঙ্গে নিলেন, যাঁরা হুদায়বিয়ার সফর ও বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল (সা)-কে খায়বর বিজয় ও সেখানে প্রভূত গনীমতের মাল লাভের ওয়াদা দিয়েছিলেন। তখন যেসব মরুবাসী ইতিপূর্বে হুদায়বিয়ার সফরে আহূত হওয়া সত্ত্বেও ওযর পেশ করে অংশগ্রহণে বিরত ছিল, তারাও খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল; হয় এ কারণে যে, তারা লক্ষণাদি দৃষ্টে জানতে পেরেছিল যে, খায়বর বিজিত হবে এবং অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে। না হয় এ কারণে যে, মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্র ব্যবহার ও হুদায়বিয়ার সন্ধির বিভিন্ন কল্যাণ দেখে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কারণে তারা অনুতপ্ত হয়েছিল এবং এখন জিহাদে শরীক হওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের জওয়াবে কোরআন বলেছে: يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ তারা আল্লাহ্র কালাম অর্থাৎ তাঁর আদেশ পরিবর্তন করতে চায়। এই আদেশের অর্থ খায়বর যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিশেষ করে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্য। এরপর كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ বাক্যেও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের এই বিশেষত্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের কোথাও এই বিশেষত্বের উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় এই বিশেষত্বের ওয়াদাকে 'আল্লাহ্র কালাম' ও 'আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন' বলা কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে?

ওহী শুধু কোরআনে সীমাবদ্ধ নয়, কোরআন ছাড়াও ওহীর মাধ্যমে আদেশ এসেছে এবং রসূলের হাদীসও আল্লাহ্র কালামের হুকুম রাখে: আলিমগণ বলেন: হুদায়বিয়ায়

অংশগ্রহণকারীদের বিশেষত্ব সম্পর্কিত উল্লিখিত ওয়াদা কোরআন পাকের কোথাও স্পষ্ট-ভাবে উল্লেখ করা হয়নি ; বরং এই বিশেষত্বের ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা 'ওহী গায়র-মতলু' অর্থাৎ অপঠিত ওহীর মাধ্যমে হুদায়বিয়ার সফরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিয়েছিলেন। এ স্থলে একেই 'আল্লাহ্র কালাম' ও 'আল্লাহ্ ইতিপূর্বে বলে দিয়েছেন' বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, কোরআনের বিধানাবলী ছাড়া যেসব বিধান সহীহ্ হাদীস-সমূহে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও এই আয়াত অনুযায়ী 'আল্লাহ্র কালাম'-ও আল্লাহ্র উক্তির মধ্যে দাখিল। যেসব ধর্মভ্রষ্ট লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীসকে ধর্মীয় প্রমাণ বলেই স্বীকার করে না, এসব আয়াত তাদের ধর্মভ্রষ্টতা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখানে আরও একটি আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, হুদায়বিয়া সফরের শুরুতে অবতীর্ণ এই সূরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে যে وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا—তফসীরবিদগণের ঐক-মত্যে এখানে 'নিকটবর্তী বিজয়' বলে খায়বর বিজয় বোঝানো হয়েছে। এভাবে কোরআন খায়বর বিজয় ও তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের পাওয়ার কথা এসে গেছে। এটাই 'আল্লাহ্র কালাম' ও 'আল্লাহ্র উক্তি'র' অর্থ হতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, এই আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা তো আছে, কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীরাই বিশেষভাবে পাবে, অন্যেরা পাবে না। এই বৈশিষ্ট্যের কথা নিঃসন্দেহে হাদীস দ্বারাই জানা গেছে। অতএব, 'আল্লাহ্র কালাম' ও আল্লাহ্র উক্তি বলে এখানে হাদীসই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, 'আল্লাহ্র কালাম' বলে সূরা তওবার এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে :

فَاسْتَأْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ـ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ـ

তাদের এই উক্তি শুদ্ধ নয়। কারণ, এই আয়াতগুলো তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যার সমকাল খায়বর যুদ্ধের পর নবম হিজরী।—(কুরতুবী)

قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا—এতে হুদায়বিয়া থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদেরকে তাকীদ সহকারে বলা হয়েছে : তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। এই উক্তি বিশেষভাবে খায়বর যুদ্ধের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। ভবিষ্যতে অন্য কোন জিহাদেও শরীক হতে পারবে না—আয়াত থেকে এটা জরুরী নয়। এ কারণেই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্য থেকে মুযায়না ও জোহায়না গোত্রদ্বয় পরবর্তীকালে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।—(রূহুল মা'আনী)

হুদায়বিয়ার সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ পরে তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল : হুদায়বিয়ার সফর থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল,

তাদের সবাইকে খায়বরের জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল অথচ তাদের মধ্যে সবাই মুনাফিক ছিল না। কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। কেউ কেউ যদিও তখন মুনাফিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সাচ্চা ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তাই এ ধরনের লোকদের সন্তুষ্টির জন্য পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী খায়বর যুদ্ধ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা খাঁটি মুসলমান এবং মনেপ্রাণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যও ভবিষ্যতে আরও সুযোগ-সুবিধা আসবে। এসব সুযোগের কথা কোরআন পাক একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে

বর্ণনা করেছে, যা রসূল করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর প্রকাশ পাবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ অর্থাৎ এক সময় আসবে, যখন তোমাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া হবে। এই জিহাদ একটি শক্তিশালী যোদ্ধা জাতির সাথে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই জিহাদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়নি। কেননা, প্রথমত, এরপর তিনি কোন যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন বলে প্রমাণে নেই; দ্বিতীয়ত, এরপর এমন কোন বীরযোদ্ধা জাতির সাথে মুকাবিলাও হয়নি, যাদের বীরত্বের উল্লেখ কোরআন পাক করছে। তাবুক যুদ্ধে যদিও যোদ্ধা জাতির সাথে মুকাবিলা ছিল; কিন্তু এই যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং এতে কোন যুদ্ধও সংঘটিত হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণই হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম বিনাযুদ্ধে তাবুক থেকে ফিরে আসেন। হুনায়ন যুদ্ধেও মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং তখন কোন সশস্ত্র ও বীরযোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে মুকাবিলাও ছিল না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আয়াতে পারস্য ও রোম অর্থাৎ কিসরা ও কায়সারের জাতিসমূহ বোঝানো হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর আমলে জিহাদ হয়েছে।—(কুরতুবী)

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন ঃ আমরা কোরআনের এই আয়াত পাঠ করতাম; কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, এখানে কোন্ জাতিকে বোঝানো হয়েছে। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত কালে তিনি আমাদেরকে বনী হুনায়ফা ও মোসায়লামা কাযযাবের জাতির বিরুদ্ধে জিহাদ করার দাওয়াত দেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই আয়াতে এই জাতিকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই। পরবর্তীকালের শক্তিশালী সকল প্রতিপক্ষই এর মধ্যে দাখিল থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযম (রা)-এর খিলাফত যে সত্যের অনুকূলে ছিল, এ আয়াত তার প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে স্বয়ং কোরআন তাঁদের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করেছে।

حَتّٰى يُسْلِمُوْا হযরত উবাই এর কিরাআতে —تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ

বলা হয়েছে। তদনুযায়ী কুরতুবী اَوْ অব্যয়কে حَتّٰى এর অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ সেই জাতির সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা আনুগত্যশীল হয়ে যায়, ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ—হযরত ইবনে-আব্বাস (রা) বলেন, উপরের আয়াতে যখন জিহাদে অংশগ্রহণে পশ্চাতপদদের জন্য শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে, তখন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কতক বিকলাঙ্গ লোক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা জিহাদে অংশ-গ্রহণ করার যোগ্য নয়। ফলে তারাও নাকি এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্নকে জিহাদের আদেশের আওতা-বহির্ভূত করে দেওয়া হয়েছে।—(কুরতুবী)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾ وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾

(১৮) আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ্ অবগত ছিলেন, যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (১৯) এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী; প্রজ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ

করে দিয়েছেন—যাতে এটা মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (২১) আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ্ তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চিতই আল্লাহ্ (আপনার সফরসঙ্গী) মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তাঁরা আপনার কাছে বৃক্ষের নীচে (জিহাদে দৃঢ়পদ থাকার) শপথ করছিল। তাদের অন্তরে যা কিছু (আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার সংকল্প) ছিল, আল্লাহ্ তাও অবগত ছিলেন। (তখন) আল্লাহ্ তাদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে দেন। (ফলে আল্লাহ্র আদেশ পালনে তারা মোটেই ইতস্তত করেনি। এগুলো ছিল ইন্দ্রিয় বহির্ভূত নিয়ামত। এর সাথে কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়ামতও তাদেরকে দেওয়া হয়। সেমতে) তাদেরকে বিজয় দান করেন (অর্থাৎ খায়বর বিজয়) এবং (এই বিজয়ে) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদও (দিলেন) যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (স্বীয় কুদরত ও রহস্য বলে যখন যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। এই খায়বর বিজয়ই শেষ নয়; বরং) আল্লাহ্ তোমাদেরকে (আরও) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন, যা তোমরা লাভ করবে। অতএব (সেসব সম্পদের মধ্য থেকে) এটা তোমাদেরকে তাৎক্ষণিক দান করেছেন এবং (এই দানের জন্য খায়বরবাসী ও তাদের মিত্র) লোকদের হাত তোমাদের থেকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন, (অর্থাৎ সবার অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফলে তারা আর বেশী হাত বাড়ানোর সাহস পায়নি। এতে করে তোমাদের পার্থিব উপকারও উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তোমরা আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কর) এবং (ধর্মীয় উপকারও ছিল) যাতে এটা (অর্থাৎ এই ঘটনা) মু'মিনদের জন্য (অন্যান্য ওয়াদা সত্য হওয়ার) এক নিদর্শন হয় (অর্থাৎ আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য হওয়ার ব্যাপারে ঈমান আরও মজবুত হয়) এবং যাতে (এই নিদর্শনের মাধ্যমে) তোমাদেরকে (ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেক কাজে) সরল পথে পরিচালিত করেন (মানে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্র উপর ভরসার পথে। উদ্দেশ্য এই যে, চিরদিনের জন্য এই ঘটনা চিন্তা করে যাতে আল্লাহ্র প্রতি আস্থা রাখ। এভাবে ধর্মীয় উপকার দু'টি হয়ে যায়। এক. জ্ঞানগত ও বিশ্বাসগত উপকার, যা لتكون বলে বর্ণিত হয়েছে এবং দুই. কর্মগত ও চরিত্রগত উপকার, যা يهديكم বলে ব্যক্ত করা হয়েছে)। এবং আরও একটি বিজয় (প্রতিশ্রুত) রয়েছে, যা (এ পর্যন্ত) তোমাদের অধিকারে আসেনি (অর্থাৎ মক্কা বিজয়। যা তখন পর্যন্ত বাস্তব রূপ লাভ করেনি) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা বেষ্টন করে আছেন (যখন ইচ্ছা করবেন, তোমাদেরকে দান করবেন) এবং (এরই কি বিশেষত্ব) আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বায়আতে রিযওয়ান—لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

হুদায়বিয়ার শপথ বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বেও اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতও তারই তাকীদ। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই একে 'বায়আতে রিযওয়ান' তথা সন্তুষ্টির শপথও বলা হয়। এর উদ্দেশ্য শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করা এবং তাদেরকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর তাকীদ করা। বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার দিনে আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ'। রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন: اَنْتُمْ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ অর্থাৎ তোমরা ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সহীহ্ মুসলিমে উম্মে বাশার থেকে বর্ণিত আছে: لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ —অর্থাৎ যারা এই বৃক্ষের নীচে শপথ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।—(মাযহারী) তাই এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অনুরূপ হয়ে গেছে। তাঁদের সম্পর্কে যেমন কোরআনে ও হাদীসে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ বর্ণিত রয়েছে, তেমনি হুদায়বিয়ার শপথে অংশগ্রহণকারীদের জন্যও এরূপ সুসংবাদ উল্লিখিত আছে।

এসব সুসংবাদ ব্যক্ত করে যে, তাঁদের সবার খাতেমা অর্থাৎ জীবনাবসান ঈমান ও পছন্দনীয় সৎকর্মের উপরে হবে। কেননা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির এই ঘোষণা এ বিষয়েরই নিশ্চয়তা দেয়।

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি দোষারোপ এবং তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করা এই আয়াতের পরিপন্থী: তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে: আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে ক্ষমা ও সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন, যদি তাঁদের তরফ থেকে কোন ভুলত্রুটি অথবা গোনাহ্ হয়েও যায়, তবে এই আয়াত তাঁদের ক্ষমা ঘোষণা করছে। এমতাবস্থায় তাঁদের যে সব কর্মকাণ্ড প্রশংসার্হ ও উত্তম নয়, সেগুলোকে আলোচনা ও বিতর্কের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা দুর্ভাগ্যজনক এবং এই আয়াতের পরিপন্থী। রাফেযী সম্প্রদায় হযরত আবু বকর, ওমর ও অন্যান্য সাহাবীর প্রতি কুফর-নিফাকের দোষ আরোপ করে। আলোচ্য আয়াত তাদের উক্তি সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করে।

রিযওয়ান বৃক্ষ: আয়াতে যে বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সেটা ছিল একটা বাবুল বৃক্ষ। কথিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর কিছু লোক সেখানে গমন করত এবং এই বৃক্ষের নীচে নামায আদায় করত। হযরত ফারুকে আযম (রা) দেখলেন যে, ভবিষ্যতে অজ্ঞ লোকেরা পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় এই বৃক্ষের পূজা শুরু করে দিতে পারে। এই আশংকায়

তিনি বৃক্ষটি কাটিয়ে দেন। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত তারেক ইবনে আবদুর রহমান বলেন: আমি একবার হজ্বে যাওয়ার পথে এক জায়গায় কিছু সংখ্যক লোককে একত্রিত হয়ে নামায পড়তে দেখলাম। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম: এটা কোন্ মসজিদ? তারা বলল: এটা সেই বৃক্ষ, যার নীচে রসূলুল্লাহ্ (সা) রিযওয়ানের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আমি অতঃপর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিবের কাছে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বিবৃত করলাম। তিনি বললেন: আমার পিতা বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন: আমরা যখন পরবর্তী বছর মক্কায় উপস্থিত হই, তখন অনেক খোঁজাখুঁজির পরও বৃক্ষটির সন্ধান পাইনি। অতঃপর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব বললেন: রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যেসব সাহাবী এই বায়'আতে শরীক ছিলেন, তাঁরা তো এই বৃক্ষের সন্ধান পাননি, আর তুমি তা জেনে ফেলেছ। আশ্চর্যের বিষয় বটে। তুমি কি তাঁদের চাইতে অধিক জ্ঞাত?—(রূহুল মা'আনী)

এ থেকে জানা গেল যে, পরবর্তীকালে লোকেরা নিছক অনুমানের মাধ্যমে কোন একটি বৃক্ষ নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল এবং তার নীচে জড়ো হয়ে নামায পড়া শুরু করেছিল। হযরত ফারুকে আযম (রা) একথাও জানতেন যে, এটা সেই বৃক্ষ নয়। তাই অবান্তর নয় যে, তিনি শিরকের আশংকা বোধ করে সেই বৃক্ষটিও কর্তন করিয়ে দেন।

খায়বর বিজয়: খায়বর প্রকৃতপক্ষে বহু জনপদ, দুর্গ ও বাগ-বাগিচা সমন্বিত একটি বিস্তৃত এলাকার নাম।—(মাযহারী)

وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا—এই আসন্ন বিজয়ের অর্থ সর্বসম্মতভাবে খায়বর বিজয়। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এই বিজয় বাস্তব রূপ লাভ করে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় দশ দিন এবং অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিশ দিন অবস্থান করেন। এরপর খায়বরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান। ইবনে-ইসহাকের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যিলহজ্জ মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বর সফর করেন। সফর মাসে খায়বর বিজিত হয়। ওয়াকেদীর মাগাযী গ্রন্থে তাই বর্ণিত হয়েছে। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানীর মতে এ উক্তিটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।—(মাযহারী)

মোটকথা, প্রমাণিত হল যে, খায়বর বিজয়ের ঘটনা হুদায়বিয়ার সফরের বেশ কিছু দিন পরে সংঘটিত হয়। সূরা ফাত্হ যে হুদায়বিয়ার সফরকালে অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। হ্যাঁ, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূরা তখনই নাযিল হয়েছিল, না কিছু সংখ্যক আয়াত পরে নাযিল হয়েছে। প্রথমোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াত-সমূহে খায়বরের আলোচনা ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে হয়েছে এবং ঘটনাটি যে অকাট্য ও নিশ্চিত—একথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ পরে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا—এতে খায়বর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বোঝানো হয়েছে, যদ্দ্বারা মুসলমানদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়।

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ—এখানে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ইসলামী বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে, সেগুলো বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র নির্দেশে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত সম্পদ সবার জন্য ব্যাপক। এ থেকেই জানা যায় যে, বিশেষত্বের আদেশ এসব আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি; বরং তা পৃথক ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা কর্মে পরিণত করেন এবং সাহাবায়ে কিরামের কাছে ব্যক্ত করেন।

وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ—আয়াতে খায়বরবাসী কাফির সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এই জিহাদে অধিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেন নি। ইমাম বগভী বলেন ঃ গাতফান গোত্র খায়বরের ইহুদীদের মিত্র ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক খায়বর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তারা ইহুদীদের সাহায্যার্থে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা চিন্তা করতে লাগল, যদি আমরা খায়বরে চলে যাই, তবে মুসলমানদের কোন লশকর আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়ীঘরে চড়াও হতে পারে। এই ভেবে তাদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। —(মাযহারী)

وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا—সরল পথের আদর্শ এবং হিদায়ত তো তাদের পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল। কিন্তু পূর্বেও বলা হয়েছে যে, হিদায়তের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এখানে সেই স্তর বোঝানো হয়েছে, যা অর্জিত ছিল না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং ঈমানী শক্তির বৃদ্ধি।

وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনও তাদের ক্ষমতাধীন নয়। এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয় রয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতে মক্কা বিজয়কেই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপক হেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا

وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ
عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ
وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ
مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا
لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٢٥﴾ اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ
سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى
وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٦﴾

(২২) যদি কাফিররা তোমাদের মুকাবিলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। (২৩) এটাই আল্লাহ্‌র রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না। (২৪) তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (২৫) তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কুরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌঁছতে। যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সব কিছু চুকিয়ে দেওয়া হত ; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম। (২৬) কেননা, কাফিররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ্

তাঁর রসূল ও মু'মিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য সংযমের বাক্য অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুত তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যেহেতু কাফিরদের পরাজিত হওয়ার সঙ্গত কারণ বিদ্যমান ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে, সেহেতু) যদি এই সন্ধি না হত, বরং) কাফিররা তোমাদের মুকাবিলা করত, তবে (সেসব কারণবশত) অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত; অতঃপর তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। আল্লাহ্ (কাফিরদের জন্য) এই রীতিই করে রেখেছেন, যা পূর্ব থেকে চালু আছে (যে, মুকাবিলায় সত্যপন্থীরা জয়ী ও মিথ্যাপন্থীরা পরাজিত হয়। কখনও কোন রহস্য ও উপযোগিতার কারণে এতে বিলম্ব হওয়া এর পরিপন্থী নয়)। আপনি আল্লাহ্র রীতিতে (কোন ব্যক্তির তরফ থেকে) কোন পরিবর্তন পাবেন না (যে, আল্লাহ্ কোন কাজ করতে চাইবেন এবং কেউ তা হতে দেবে না)। তিনিই তাদের হাতকে তোমাদের থেকে (অর্থাৎ তোমাদেরকে হত্যা করা থেকে) এবং তোমাদের হাতকে তাদের (হত্যা) থেকে মক্কায় (অর্থাৎ মক্কার অদূরে হুদায়বিয়ায়) নিবারিত করেছেন তোমাদেরকে তাদের উপর জয়ী করার পর। [এখানে সূরার শুরুতে উল্লিখিত হুদায়বিয়ার কাহিনীর অষ্টম অংশে বর্ণিত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম কোরাইশদের পঞ্চাশ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিলেন। এছাড়া আরও কিছু লোক গ্রেফতার হয়ে মুসলমানদের অধিকারে চলে এসেছিল। তখন মুসলমানরা যদি তাদেরকে হত্যা করত, তবে অপরদিকে মক্কায় আটক হযরত ওসমান গনি (রা) ও কিছুসংখ্যক মুসলমানকেও কাফিররা হত্যা করে দিত। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া। যদিও উল্লিখিত প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একথাও বলে দিয়েছেন যে, যুদ্ধ হলেও বিজয় মুসলমানের হত, তথাপি আল্লাহ্র জ্ঞানে তখন যুদ্ধ না হওয়ার মধ্যেই মুসলমানদের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত ছিল। তাই একদিকে কাফির বন্দীদেরকে হত্যা না করার বিষয়টি মুসলমানদের অন্তরে জাগরিত করে দিলেন। এখানে মুসলমানদের হাত তাদের হত্যা থেকে নিবারিত করলেন। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা কোরাইশদের অন্তরে মুসলমানদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা সন্ধির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সোহায়েলকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পাঠিয়ে দিল। এভাবে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধ না হওয়ার বিমুখী ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন]। তোমরা যা করছিলে, আল্লাহ্ (তখন) তা দেখছিলেন (এবং তিনি তোমাদের কাজের পরিণতি জানতেন। তাই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার মত কোন কাজ হতে দেন নি। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যুদ্ধ হলে কাফিররা কিভাবে এবং কেন পরাজিত হত) তারাই তো কুফরী করেছে এবং তোমাদেরকে (ওমরা করার জন্য) মসজিদে-হারামে উপস্থিতি থেকে বাধা দিয়েছে। (এখানে মসজিদে-হারাম এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সাঈর দূরত্ব এ উভয়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তওয়াফ যেহেতু আমল ও সর্বপ্রথম এবং তা মসজিদে-হারামে সম্পন্ন হয়, তাই শুধু মসজিদে-হারাম থেকে বাধা দেওয়ার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে) এবং (হুদায়বিয়ায়) অবস্থানরত কুরবানীর জন্তুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে বাধা দিয়েছে। জন্তু কুরবানীর

পূরণ হচ্ছে কিনা। তারা অতভালোকে কিনা পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়নি। তাদের এহেন অপরাধ এবং পবিত্র হেরেমে বসে এহেন জুলুম করার দাবী ছিল এই যে, মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আদেশ দিয়ে তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দেওয়া হোক। কিন্তু কোন কোন রহস্য এই দাবী পূরণের পথে অন্তরায় হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি রহস্য ছিল এই যে, তখন মক্কায় অনেক মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দী ও নির্যাতিত ছিল। হুদায়বিয়ার কাহিনীর দশম অংশে তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আবু জন্দলের ফরিয়াদের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। তখন যুদ্ধ শুরু হলে সেতে অজ্ঞাতসারে এসব মুসলমানও ক্ষতিগ্রস্ত হত এবং স্বয়ং মুসলমানদের হাতেই তাদের নিহত হওয়ার আশংকা ছিল। ফলে সাধারণ মুসলমানগণ তাতে দুঃখিত ও অনুতপ্ত হত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিলেন। পরবর্তী আয়াতে এই বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে)। যদি (মক্কায় তখন) অনেক মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরাও দুঃখিত, অনুতপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হতে, তবে সব কিস্সা চুকিয়ে দেওয়া হত; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। (সেমতে যুদ্ধ না হওয়ার ফলে সেই মুসলমানগণ বেঁচে গেছে এবং তোমরা তাদেরকে হত্যা করার পরিতাপ থেকে মুক্ত রয়ে গেছ। তবে) যদি তারা (অর্থাৎ আটক মুসলমানরা মক্কা থেকে কোথাও) সরে যেত, তবে (মক্কাবাসীদের মধ্যে) যারা কাফির, আমি তাদেরকে (মুসলমানদের হাতে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম। (এই কাফিরদের পর্যুদস্ত ও নিহত হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল) কেননা, কাফিররা তাদের অন্তরে জেদ পোষণ করত—মূর্খতা যুগের জেদ। (এই জেদ বলে বিসমিল্লাহ্ ও রসূল শব্দ লেখার বেলায় তাদের বাধাদানকে বোঝানো হয়েছে। উপরে হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রের বর্ণনায় একথা উল্লিখিত হয়েছে) অতএব (এর ফলে মুসলমানদের উত্তেজিত হয়ে তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়াই সঙ্গত ছিল, কিন্তু) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল ও মু'মিনদের নিজের পক্ষ থেকে সহনশীলতা দান করলেন। (ফলে তাঁরা উপরোক্ত বাক্য লিপিবদ্ধ করতে পীড়াপীড়ি করলেন না এবং সন্ধি হয়ে গেল) এবং (তখন) আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাকওয়ার বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখলেন। তাকওয়ার বাক্য বলে কালেমায়ে-তাইয়্যেবা অর্থাৎ তওহীদ ও রিসালতের স্বীকারোক্তি বোঝানো হয়েছে। তার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ এই যে, তওহীদ ও রিসালতে বিশ্বাস করার ফল হচ্ছে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য। মানসিক উত্তেজনার বিপরীতে মুসলমানরা যে সংযম ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল, তার একমাত্র কারণ ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদেশ। এহেন কঠিন উত্তেজনাকর মুহূর্তে রসূল (সা)-এর আনুগত্যকেই তাকওয়ার বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা বলা হয়েছে। বস্তুত তারাই (মুসলমানরাই) এর (অর্থাৎ তাকওয়ার বাক্যের দুনিয়াতেও) অধিক যোগ্য। (কারণ, তাদের অন্তরে সত্যের অন্বেষা রয়েছে। এই অন্বেষাই ঈমান পর্যন্ত পৌঁছায়) এবং (পরকালেও) এর (সওয়াবের) উপযুক্ত। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بِبَطْنِ مَكَّةَ —এর আসল অর্থ মক্কা শহরই, কিন্তু এখানে হুদায়বিয়ার স্থান

বোঝানো হয়েছে। মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ার কারণে হুদায়বিয়াকেই 'বাতনে মক্কা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের আলিমগণ হুদায়বিয়ার কিছু অংশকে হেরেমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই আয়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

এ থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর মক্কা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কুরবানী করে ইহরাম থেকে হালাল হওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য। এতে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এই কুরবানী বাধাপ্রাপ্তির স্থানেই হতে পারে, না অন্যান্য কুরবানীর ন্যায় এর জন্যও হেরেমের অভ্যন্তরে হওয়া শর্ত ? হানাফীদের মতে এর জন্যই হেরেমের সীমানা শর্ত। আলোচ্য আয়াত তাদের প্রমাণ। এখানে এই কুরবানীর জন্য কোরআন একটি বিশেষ স্থান সাব্যস্ত করেছে, যেখানে পৌঁছতে কাফিররা মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। এখানে কথা থাকে এই যে, খোদ হানাফী আলিমগণ একথাও বলেন যে, হুদায়বিয়ার কতক অংশ হেরেমের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় হেরেমে প্রবেশে বাধাদান কিরূপে প্রমাণিত হয় ? জওয়াব এই যে, যদিও এই কুরবানী হেরেমের যে কোন অংশে করে দেওয়া যথেষ্ট ; কিন্তু মিনার অভ্যন্তরে 'মানহার' (কোরবানগাহ্) নামে যে বিশেষ স্থান রয়েছে, সেখানে কুরবানী করা উত্তম। কাফিররা তখন মুসলমানদেরকে এই উত্তম স্থানে জন্তু নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল।

فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ—مَعَرَّةٌ শব্দের অর্থ কেউ কেউ গোনাহ্ বর্ণনা করেছেন, কেউ সাধারণ ক্ষতি এবং কেউ দোষ বর্ণনা করেছেন। এ স্থলে শেষোক্ত অর্থই বাহ্যত সঙ্গত। কারণ, যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত এবং অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের হাতে মক্কায় আটক মুসলমানগণ নিহত হত, তবে এটা একটা দোষ ও লজ্জাকর ব্যাপার হত। কাফিররা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিত যে, তোমরা তোমাদের দীনী ভাইদেরকে হত্যা করেছ। এ ছাড়া এটা ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল। নিহত মুসলমানদের ক্ষতি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। হত্যাকারী মুসলমানগণও অনুতাপ ও আক্ষেপের অনলে দগ্ধ হত।

সাহাবায়ে কিরামকে দোষত্রুটি থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ অজ্ঞাতসারে এক মুসলমানের হাতে অন্য মুসলমান মারা যাওয়া গোনাহ্ তো নয় ; কিন্তু দোষ, লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপের কারণ অবশ্যই। ভুলবশত হত্যার কারণে রক্তপণ ইত্যাদি দেওয়ারও বিধান আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল (সা)-এর সাহাবীদেরকে এ থেকেও নিরাপদ রেখেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম যদিও পয়গম্বরগণের ন্যায় নিষ্পাপ নন, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদেরকে ভুলভ্রান্তি ও দোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটাই তাঁদের সাথে আল্লাহ্র ব্যবহার।

لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্তরে সংযম সৃষ্টি করে যুদ্ধ না হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ আল্লাহ্

জানতেন যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি এবং মক্কায় আটক মুসলমানদের প্রতি রহমত করার জন্য এসব আয়োজন করা হয়েছে।

تَزَيَّلُ—لَوْ تَزَيَّلُوْا শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কায় আটক মুসলমানগণ যদি কাফিরদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হত এবং মুসলমানগণ তাদেরকে চিনে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিতে পারত, তবে এই মুহূর্তেই কাফিরদেরকে মুসলমানদের হাতে শাস্তি প্রদান করা হত। কিন্তু মুশকিল এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ ও নারী কাফিরদের মধ্যেই মিশ্রিত ছিল। যুদ্ধ হলে তাদেরকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধই মওকুফ করে দিলেন।

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا—'কলেমায়ে-তাকওয়া' বলে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের-কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তওহীদ ও রিসালতের কলেমা। এই কলেমাই তাকওয়ার ভিত্তি। তাই একে কলেমায়ে-তাকওয়া বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামকে এই কলেমার অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সেসব লোকের লাঞ্ছনা প্রকাশ করে দিয়েছেন, যারা তাঁদের প্রতি কুফর ও নিফাকের দোষ আরোপ করে। আল্লাহ্ তো তাঁদেরকে কলেমায়ে ইসলামের অধিক যোগ্য বলেন আর এই হতভাগারা তাঁদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٢٨﴾ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُ فَاٰزَرَهُ

فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ
وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

(২৭) আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এ ছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়। (২৮) তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়ত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট। (২৯) মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপই এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে —চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে—যাতে আল্লাহ্ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যা বাস্তবের অনুরূপ। ইন্শাআল্লাহ্ তোমরা অবশ্যই মসজিদে-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, তোমাদের কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কর্তন করবে। (সেমতে পরবর্তী বছর তাই হয়েছে। এ বছর এরূপ না হওয়ার কারণ এই যে) আল্লাহ্ সেসব বিষয় (ও রহস্য) জানেন, যা তোমরা জান না। (তন্মধ্যে একটি রহস্য এই যে) এর (অর্থাৎ এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার) আগে তোমাদেরকে (খায়বরের) একটি আসন্ন বিজয় দিয়েছেন (যাতে তদ্দ্বারা মুসলমানদের শক্তি ও সাজসরঞ্জাম অর্জিত হয়ে যায় এবং তারা নিশ্চিন্তে ওমরা পালন করতে পারে। বাস্তব তাই হয়েছে) তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়ত (অর্থাৎ কোরআন) ও সত্য দীন (ইসলাম) সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে (অর্থাৎ ইসলামকে) অন্য সব ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। (এই জয় প্রমাণ ও দলীলের দিক দিয়ে তো চিরকাল অক্ষয় থাকবে এবং শান-শওকত ও রাজত্বের দিক দিয়েও একটি শর্ত সহকারে প্রাধান্য থাকবে। শর্তটি এই যে, এই ধর্মাবলম্বীরা অর্থাৎ মুসলমানরা যদি যোগ্যতাসম্পন্ন হয়। এই শর্তের অনুপস্থিতিতে বাহ্যিক জয়ের ওয়াদা নেই। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এই শর্ত বিদ্যমান ছিল। তাঁদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পরবর্তী আয়াতে এই যোগ্যতার উল্লেখ আছে। তাই এই আয়াত একদিকে যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালতের সুসংবাদ আছে, তেমনি অপরদিকে সাহাবায়ে কিরামের

অন্য বিজয় লাভেরও সুসংবাদ আছে। বাস্তবে তাই প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত না হতেই ইসলাম ও কোরআন বিজয়ীবেশে বিশ্বের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। মূর্খতা যুগের জেদ পোষণকারীরা যদি আপনার নামের সাথে 'রসূল' শব্দ সংযুক্ত করে লিখতে অসম্মত হয়, তবে আপনি দুঃখ করবেন না। কেননা, আপনার রিসালতের) সাক্ষ্যদাতা হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট। (তিনি আপনার রিসালতকে সুস্পষ্ট যুক্তি ও প্রকাশ্য মো'জেযার মাধ্যমে সপ্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে) মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল। [এখানে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'—এই পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মূর্খতা যুগের জেদ পোষণকারীরা আপনার নামের সাথে 'রসূলুল্লাহ্' লিখতে পছন্দ না করলে তাতে কি আসে যায়, আল্লাহ্ এই বাক্য আপনার নামের সাথে লিখে দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসারী সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী ও সুসংবাদ উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ] যারা সংসর্গপ্রাপ্ত, (এতে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন সংসর্গপ্রাপ্ত সকল সাহাবীই দাখিল আছেন। যারা হুদায়বিয়ায় তাঁর সহচর ছিলেন, তাঁরা বিশেষভাবে এই আয়াতের উদ্দেশ্য। মতলব এই যে, সকল সাহাবায়ে কিরামই এসব গুণে গুণান্বিত)। তাঁরা কাফিরদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর (এবং) নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। (হে পাঠক) তুমি তাদেরকে দেখবে যে, কখনও রুকূ করছে, কখনও সিজদা করছে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করছে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন প্রস্ফুটিত। (এই চিহ্ন দ্বারা খুশু-খুযু তথা বিনয় ও নম্রতার উজ্জ্বল আভা বোঝানো হয়েছে, যা মু'মিন ও পরহিযগার লোকদের চেহারায় প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়।) এগুলো (অর্থাৎ তাদের এই গুণাবলী) তওরাতে আছে এবং ইঞ্জিলে তাদের এই গুণ (উল্লিখিত) রয়েছে, যেমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর (মৃত্তিকা, পানি, বায়ু ইত্যাদি থেকে খাদ্য লাভ করে) তা শক্ত ও মজবুত হয়, অতঃপর আরও মোটা হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায়, (সবুজ ও সতেজ হওয়ার কারণে) চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে (এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে প্রথমে দুর্বলতা ছিল। এরপর প্রত্যহ শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে এই ক্রমোন্নতি এজন্য দান করেছেন) যাতে (তাদের এ অবস্থা দ্বারা) কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ্ (পরকালে) তাদেরকে (গোনাহের) ক্ষমা এবং (ইবাদতের কারণে) মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হুদায়বিয়ায় সন্ধি চূড়ান্ত হয়ে গেলে একথা স্থির হয়ে যায় যে, এখন মক্কায় প্রবেশ এবং ওমরা পালন ব্যতিরেকেই মদীনায় ফিরে যেতে হবে। বলা বাহুল্য, সাহাবায়ে কিরাম ওমরা পালনের সংকল্প রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে করেছিলেন, যা এক প্রকার ওহী ছিল। এখন বাহ্যত এর বিপরীত হতে দেখে কারও কারও অন্তরে এই সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল যে, (নাউযুবিল্লাহ্) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন সত্য হল না। অপরদিকে কাফির-মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করল যে, তোমাদের রসূলের স্বপ্ন সত্য

নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ —আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। —(বায়হাকী)

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ—صدق শব্দটি كذب-এর বিপরীতে কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। যে কথা বাস্তবের অনুরূপ, তাকে صدق এবং যে কথা অনুরূপ নয়, তাকে كذب বলা হয়। মাঝে মাঝে কাজকর্মের জন্যও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। তখন এর অর্থ হয় কোন কাজকে বাস্তবায়িত করা। যেমন কোরআনে আছে : رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ অর্থাৎ তারা তাদের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে।

এ সময় صدق শব্দের দু'টি مفعول থাকে; যেমন আলোচ্য আয়াতে প্রথম مفعول হচ্ছে رسوله এবং দ্বিতীয় مفعول হচ্ছে رؤيا—আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে স্বপ্নের ব্যাপারে সাচ্চা দেখিয়েছেন।—(বায়যাভী) যদিও এই সাচ্চা দেখানোর ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ছিল; কিন্তু একে অতীত শব্দবাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অকাট্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে : لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ —অর্থাৎ মসজিদে-হারামে প্রবেশ সংক্রান্ত আপনার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ বছর নয়—এ বছরের পরে। স্বপ্নে মসজিদে-হারামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। পরম ঔৎসুক্যবশত সাহাবায়ে কিরাম এ বছরই সফরের সংকল্প করে ফেলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এতে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট রহস্য নিহিত ছিল, যা হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। সেমতে সিদ্দীকে আকবর (রা) প্রথমেই হযরত ওমর (রা)-এর জওয়াবে বলেছিলেন : আপনার সন্দেহ করা উচিত নয়, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্নে কোন সময় ও বছর নির্দিষ্ট ছিল না। এখন না হলে পরে হবে।—(কুরতুবী)

ভবিষ্যৎ কাজের জন্য 'ইনশাআল্লাহ্' বলার তাকীদ : এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদে-হারামে প্রবেশের সাথে—যা ভবিষ্যতে হওয়ার ছিল—'ইনশাআল্লাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ্ নিজের চাওয়া সম্পর্কে নিজেই জ্ঞাত। তাঁর এরূপ বলার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু স্বীয় রসূল ও বান্দাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ স্থানে আল্লাহ্ তা'আলাও 'ইনশা-আল্লাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন।—(কুরতুবী)

مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ — সহীহ্ বুখারীতে আছে, পরবর্তী বছর কাযা ওমরায় হযরত মুয়াবিয়া (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র কেশ কাঁচি দ্বারা কর্তন করেছিলেন।

এটা কাযা ওমরারই ঘটনা। কেননা, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (সা) মস্তক মুণ্ডিত করেছিলেন। —(কুরতুবী)

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا —অর্থাৎ এ বছরই তোমাদেরকে মসজিদে-হারামে প্রবেশ এবং ওমরাহ করিয়ে দিতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম ছিলেন। পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে বড় বড় রহস্য নিহিত ছিল, যা আল্লাহ্ জানতেন—তোমরা জানতে না। তন্মধ্যে এক রহস্য এটাও ছিল যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল খায়বর বিজিত হয়ে মুসলমানদের শক্তি ও সাজসরঞ্জাম বর্ধিত হোক এবং তারা পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি সহকারে ওমরা পালন করুক। এ কারণেই বলা হয়েছে : فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا —অর্থাৎ স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করার আগে খায়বরের আসন্ন বিজয় মুসলমানগণ লাভ করুক। কেউ কেউ বলেন, এই আসন্ন বিজয় বলে খোদ হুদায়বিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটাতে মক্কা বিজয় ও অন্যান্য সব বিজয়ের ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে সকল সাহাবীই একে বৃহত্তম বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ বছর তোমাদের সফরের সংকল্প করার পর ওমরা পালনে ব্যর্থতা ও সন্ধি সম্পাদনের মধ্যে যেসব রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা তোমাদের জানা ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সব জানতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই স্বপ্নের ঘটনার আগে হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা আসন্ন বিজয় দান করবেন। এই আসন্ন বিজয়ের ফলাফল সবাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, হুদায়বিয়ার সফরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশী ছিল না। সন্ধির পর তাদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয়ে গেল। —(কুরতুবী)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ —পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিজয়, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা এবং বিশেষভাবে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবী ও সাধারণভাবে সকল সাহাবীর গুণাবলী ও সুসংবাদ উল্লিখিত হয়েছে। এখন সূরার উপসংহারে সেসব বিষয়বস্তুর সারমর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে। এসব নিয়ামত ও সুসংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আনুগত্য ও সত্যায়নের কারণেই প্রদত্ত হয়েছে। তাই এই সত্যায়ন ও আনুগত্যের উপর জোর দেওয়ার জন্য, রিসালত অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের অন্তরে যেসব সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, সেগুলো দূরীকরণের জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে রিসালত সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং জগতের সব ধর্মের উপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দীনকে জয়যুক্ত করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ —সমগ্র কোরআনে শেষ নবী (সা)-র নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে সাধারণত গুণাবলী ও পদবীর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে :

বিশেষত আহ্বানের স্থলে يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ - يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এর বিপরীতে অপরাপর পয়গম্বরকে নাম সহকারে আহ্বান করা হয়েছে। যেমন يَا إِبْرَاهِيمُ - يَا مُوسَى - يَا عِيسَى সমগ্র কোরআনে মাত্র চার জায়গায় তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করার মধ্যে উপযোগিতা এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে হযরত আলী (রা) যখন তাঁর নাম 'মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্' লিপিবদ্ধ করেন, তখন কাফিররা এটা মিটিয়ে 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্' লিপিবদ্ধ করতে পীড়াপীড়ি করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র আদেশে তাই মেনে নেন। পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলা এ স্থলে বিশেষভাবে তাঁর নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ্' শব্দ কোরআনে উল্লেখ করে একে চিরস্থায়ী করে দিলেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত লিখিত ও পঠিত হবে।

وَالَّذِينَ مَعَهُ—এখান থেকে সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে। যদিও এতে সর্বপ্রথম হুদায়বিয়া ও বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার দরুন সকল সাহাবীই এতে দাখিল আছেন। কেননা, সবাই তাঁর সহচর ও সঙ্গী ছিলেন।

সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি ঃ এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও তাঁর দীনকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার কথা বর্ণনা করে সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে একদিকে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় গৃহীত তাঁদের কঠোর পরীক্ষার পুরস্কার আছে। কেননা, মুসলমানদের বিশ্বাস ও মনোবাসনার বিরুদ্ধে সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার ফলে ওমরা পালনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁদের এতটুকু পদস্খলন হয়নি বরং তাঁরা নজিরবিহীন আনুগত্য ও ঈমানী পরিচয় দিয়েছেন। অপরদিকে সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বিস্তারিত বর্ণনা করার ফলে এ কথাও জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পর কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী-রসূল প্রেরিত হবেন না। তিনি উম্মতের জন্য কোরআনের সাথে সাহাবীদেরকে নমুনা হিসাবে রেখে যাবেন এবং তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দেবেন। তাই কোরআনও তাঁদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে তাঁদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ স্থলে সাহাবায়ে কিরামের সর্বপ্রথম যে গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, তাঁরা কাফিরদের মুকাবিলায় বজ্র-কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। কাফিরদের মুকাবিলায় তাঁদের কঠোরতা সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা ইসলামের জন্য বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার ঘটনায় বিশেষভাবে এর বিকাশ ঘটেছে। সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক সহানুভূতি ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তখন প্রকাশ পেয়েছে, যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আনসাররা তাঁদের সম্পত্তিতে মুহাজিরদেরকে অংশীদার করার আহ্বান জানায়। কোরআন

সাহাবায়ে কিরামের এই গুণটি সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছে। কেননা, এর সারমর্ম এই যে, তাঁদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ভালবাসা অথবা হিংসাপরায়ণতা কোন কিছুই নিজের জন্য নয়; বরং সব আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের জন্য হয়ে থাকে। এটাই পূর্ণ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আছে: من احب لله و ا بغض لله فقد استكمل ايما نه অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ভালবাসা ও শত্রুতা উভয়কে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়, সে তার ঈমানকে পূর্ণতা দান করে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম কাফিরদের মুকাবিলায় কঠোর ছিলেন—এ কথার অর্থ এরূপ নয় যে, তাঁরা কোন সময় কোন কাফিরের প্রতি দয়া করেন না; বরং অর্থ এই যে, যে স্থলে আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে কাফিরদের প্রতি কঠোরতা করার আদেশ হয়, সেই স্থলে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক এ কাজে অন্তরায় হয় না। পক্ষান্তরে দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে তো স্বয়ং কোরআনের ফয়সালা এই যে:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ —— اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ —অর্থাৎ যেসব কাফির মুসলমানদের বিপক্ষে কার্যত যুদ্ধরত নয়, তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেন না। রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের অসংখ্য ঘটনা এমন পাওয়া যায়, যেগুলোতে দুর্বল, অক্ষম অথবা অভাবগ্রস্ত কাফিরদের সাথে দয়া-দাক্ষিণ্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপক আদেশ রয়েছে। এমনকি, রণাঙ্গনেও ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম ইসলামে বৈধ নয়।

সাহাবায়ে কিরামের দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সাধারণত রুকু-সিজদা ও নামাযে মশগুল থাকেন। তাঁদেরকে অধিকাংশ সময় এ কাজেই লিপ্ত পাওয়া যায়। প্রথম গুণটি পূর্ণ ঈমানের আলামত এবং দ্বিতীয় গুণটি পূর্ণ আমলের পরিচায়ক। কারণ, আমলসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামায। سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

অর্থাৎ নামায তাঁদের জীবনের এমন ব্রত হয়ে গেছে যে, নামায ও সিজদার বিশেষ চিহ্ন তাঁদের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়। এখানে সিজদার চিহ্ন বলে সেই নূরের আভা বোঝানো হয়েছে, যা দীনতা এবং বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে প্রত্যেক ইবাদতকারীর মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষ করা হয়। কপালে সিজদার কাল দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষত তাহাজ্জুদ নামাযের ফলে উপরোক্ত চিহ্ন খুব বেশী ফুটে উঠে। ইবনে মাজার এক রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: من كثر صلوته با لليل حسن و جهه بالنها ر অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাত্রে বেশী নামায পড়ে, দিনের বেলায় তার চেহারা সুন্দর আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন: এর অর্থ নামাযীদের মুখমণ্ডলের সেই নূর, যা কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে।

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ

উপরে সাহাবায়ে কিরামের সিজদা ও নামাযের যে আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই দৃষ্টান্তই তওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, ইঞ্জিলে তাঁদের আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে। তা এই যে, তাঁরা এমন, যেমন কোন কৃষক মাটিতে বীজ বপন করে। প্রথমে এই বীজ একটি ক্ষুদ্র সূচের আকারে নির্গত হয়। এরপর তা থেকে ডালপালা অঙ্কুরিত হয়। অতঃপর তা আরও মজবুত ও শক্ত হয় এবং অবশেষে শক্ত কাণ্ড হয়ে যায়। এমনিভাবে নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ শুরুতে খুবই নগণ্য সংখ্যক ছিলেন। এক সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত মাত্র তিনজন মুসলমান ছিলেন—পুরুষদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা), নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা) ও বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা)। এরপর আস্তে আস্তে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমন কি, বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে হজ্জে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে ঃ এক. فِي التَّوْرٰىةِ এ পাঠবিরতি করা এবং মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা। এরপর مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ—এ পাঠবিরতি না করা তখন অর্থ এই হবে যে, সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টান্ত সেই চারাগাছের ন্যায়, যা শুরুতে খুবই দুর্বল হয়। এরপর আস্তে আস্তে শক্ত কাণ্ড-বিশিষ্ট হয়ে যায়।

দুই. فِي التَّوْرٰىةِ এ পাঠবিরতি না করা, বরং فِي الْاِنْجِيْلِ এ পাঠবিরতি করা। অর্থ এই হবে যে, মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতেও রয়েছে, ইঞ্জীলেও রয়েছে। অতঃপর كَزَرْعٍ-কে একটি আলাদা দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা। তিন. فِي التَّوْرٰىةِ এ বাক্য না করা এবং فِي الْاِنْجِيْلِ এও শেষ না করা। অতঃপর ذٰلِكَ-কে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত করা। এর অর্থ এই যে, তওরাত ও ইঞ্জীল উভয়ের মধ্যে সাহাবীগণের দৃষ্টান্ত চারাগাছের ন্যায়। বর্তমান যুগে তওরাত ও ইঞ্জীল আসল আকারে বিদ্যমান থাকলে সেগুলো দেখলেই কোরআনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলোতে বহু বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাই কোন নিশ্চিত ফয়সালা সম্ভবপর নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথম সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে, প্রথম দৃষ্টান্ত তওরাতে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে আছে। ইমাম বগভী (র) বলেন ঃ ইঞ্জীলে

সাহাবায়ে কিরামের এই দৃষ্টান্ত আছে যে, তাঁরা শুরুতে নগণ্য সংখ্যক হবেন, এরপর তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তি অর্জিত হবে। হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন : সাহাবায়ে কিরামের এই দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে লিখিত আছে যে, এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হবে, যারা চারাগাছের অনুরূপ বেড়ে যাবে। তারা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। (মাযহারী) বর্তমান যুগের তওরাত ও ইঞ্জীলেও অসংখ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে :

> খোদাওন্দ সিনা থেকে আগমন করলেন এবং শায়ীর থেকে তাদের কাছে যাহির হলেন। তিনি ফারান পর্বত থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দশ হাজার পবিত্র লোক তাঁর সাথে আসলেন। তাঁর হাতে তাদের জন্য একটি অগ্নিদীপ্ত শরীয়ত ছিল। তিনি নিজের লোকদেরকে খুব ভালবাসেন। তাঁর সব পবিত্র লোক তোমার হাতে আছে এবং তোমার চরণের কাছে উপবিষ্ট আছে। তারা তোমার কথা মানবে। —(তওরাত : বাবে এস্তেরা)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাঁরা ফারান থেকে উদিত দীপ্তিময় মহাপুরুষের সাথে 'খলীলুল্লাহ্' শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর হাতে অগ্নিদীপ্ত শরীয়ত থাকবে বলে أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ —এর প্রতি ইঙ্গিত বোঝা যায়। তিনি নিজের লোকদেরকে ভালবাসবেন—কথা থেকে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ এর বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। ইযহারুল-হক, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়ে এর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গ্রন্থটি মওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানভী (র) খৃস্টান মতবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার জন্য ফিন্ডার নামক পাদ্রীর জওয়াবে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ইঞ্জীলে বর্ণিত দৃষ্টান্ত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : সে তাদের সামনে আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে বলল, আকাশের রাজত্ব সরিষার দানার মত, যাকে কেউ ক্ষেতে বপন করে। এটা ক্ষুদ্রতম বীজ হলেও যখন বেড়ে যায়, তখন সব সবজির চাইতে বড় এমন এক বৃক্ষ হয়ে যায়, যার ডালে পাখী এসে বাসা বাঁধে। (ইঞ্জীল : মাত্তা) ইঞ্জীল মরকাসের ভাষা কোরআনের ভাষার অধিক নিকটবর্তী। তাতে আছে : সে বলল, আল্লাহ্র রাজত্ব এমন, যেমন কোন ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে এবং রাত্রিতে নিদ্রা যায় ও দিনে জাগ্রত থাকে। বীজটি এমনভাবে অংকুরিত হয় ও বেড়ে যায় যে, মনে হয় মাটি নিজেই বুঝি ফলদান করে। প্রথমে পাতা, এরপর শীষ, এরপর শীষে তৈরী দানা। অবশেষে যখন শস্য পেকে যায়, তখন সে অনতিবিলম্বে কাঁচি লাগায়। কেননা, কাটার সময় এসে গেছে।—(ইযহারুল-হক, ৩য় খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) আকাশের রাজত্ব বলে যে শেষ নবীর অভ্যুদয় বোঝানো হয়েছে, তা তওরাতের একাধিক জায়গা থেকে বোঝা যায়।

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে উল্লিখিত গুণে

গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর শক্তি এবং সংখ্যাল্পতার পর সংখ্যাধিক্য দান করেছেন, যাতে এগুলো দেখে কাফিরদের অন্তর্জ্বালা হয় এবং তারা হিংসার অনলে দগ্ধ হয়। হযরত আবূ ওরওয়া যুবায়রী (র) বলেন ঃ একবার আমরা ইমাম মালিক (র)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি কোন একজন সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রাখল। তখন ইমাম মালিক (র) উপরোক্ত আয়াতটি পূর্ণ তিলাওয়াত করে যখন لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন বললেন ঃ যার অন্তরে কোন একজন সাহাবীর প্রতি ক্রোধ আছে, সে এই আয়াতের শাস্তি লাভ করবে।—(কুরতুবী) ইমাম মালিক (র) একথা বলেন নি যে, সে কাফির হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, সে-ও এই শাস্তি লাভ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, তার কাজটি কাফিরদের কাজের অনুরূপ হবে।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

مِنْهُمْ-এর مِنْ— অব্যয়টি এখানে সবার মতে বর্ণনামূলক। অর্থ এই যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। এ থেকে প্রথমত জানা গেল যে, সব সাহাবায়ে কিরামই বিশ্বাস স্থাপন করতেন ও সৎকর্ম করতেন। দ্বিতীয়ত, তাঁদের সবাইকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এই বর্ণনামূলক مِنْ-এর ব্যবহার কোরআনে প্রচুর, যেমন فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ এখানে مِنَ الْاَوْثَانِ বলে رِجْس-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে مِنْهُمْ বলে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ স্থলে مِنْ-কে 'কতক'-এর অর্থে ধরেছে এবং আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী যাঁরা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাঁদেরকে এই ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এটা পূর্বাপর বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী আয়াত-সমূহের পরিষ্কার পরিপন্থী। কেননা, যে সব সাহাবী হুদায়বিয়ার সফর ও বায়'আতে-রিযওয়ানে শরীক ছিলেন, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং আয়াতের প্রথম উদ্দিষ্ট। তাঁদের সবার সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সন্তুষ্টির এই ঘোষণা করে বলেছেন ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ—সন্তুষ্টির এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তাঁরা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও সৎ কর্মের উপর কায়েম থাকেন। কারণ, আল্লাহ্ আলিম ও খবীর তথা সর্বজ্ঞ। যদি কারও সম্পর্কে তাঁর জানা থাকে যে, সে ঈমান থেকে কোন-না-কোন সময় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে তার প্রতি আল্লাহ্ স্বীয়

সন্তুষ্টি ঘোষণা করতে পারেন না। ইবনে আবদুল বার (র) ইস্তিয়াবের ভূমিকায় এই আয়াত উদ্ধৃত করে লিখেন : و من رضى الله عنه لم يسخط عليه ابدا অর্থাৎ আল্লাহ্ যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তার প্রতি এরপর কখনও অসন্তুষ্ট হন না। এই আয়াতের ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : বায়'আতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ জাহান্নামে যাবে না। অতএব, তাঁদের জন্যই যখন মুখ্যত এই ওয়াদা করা হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে কারও কারও বেলায় ব্যতিক্রম হওয়া নিশ্চিতই বাতিল। এ কারণেই সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কিরাম সবাই আদিল ও সিকাহ্।

সাহাবায়ে কিরাম সবাই জান্নাতী, তাঁদের পাপ মার্জনীয় এবং তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা গোনাহ্ : কোরআন পাকের অনেক আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তন্মধ্যে কতিপয় আয়াত এই সূরাতেই উল্লিখিত হয়েছে :

الزمهم كلمة التقوى و كانوا احق بها এবং لقد رضى الله عن المؤمنين

এছাড়া আরও অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্তু রয়েছে :

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ - وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ -

সূরা হাদীদে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

অর্থাৎ তাঁদের সবাইকে আল্লাহ্ 'হুসনা' তথা উত্তম পরিণতির ওয়াদা দিয়েছেন। এরপর সূরা আম্বিয়ায় হুসনা' সম্পর্কে বলা হয়েছে : اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ

مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই হুসনার ফয়সালা হয়ে গেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم অর্থাৎ সমগ্র সময়কালের মধ্যে আমার সময়কাল উত্তম। এরপর সেই সময়কালের লোক উত্তম, যাদের সময়কাল আমার সময়কালের সংলগ্ন, এরপর তারা যারা তাদের সংলগ্ন। আরও এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বলো না। কেননা, (ঈমানী শক্তির কারণে তাঁদের অবস্থা এই যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে, তবে তা তাঁদের ব্যয় করা এক মুদের সমানও হতে পারে না এমনকি অর্ধ মুদেরও

না। মুদ আরবের একটি ওজনের নাম, যা আমাদের অর্ধ সেরের কাছাকাছি।—(বুখারী)
হযরত জাবের (রা)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সারা জাহানের মধ্য থেকে আমার সাহাবীগণকে পছন্দ করেছেন। এরপর আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে চারজনকে আমার জন্য পছন্দ করেছেন—আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা)।—(বাযযার) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

الله الله فى اصحابى لا تتخذ وهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان ياخذه -

আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্কে ভয় কর। আমার পর তাঁদেরকে নিন্দা ও দোষারোপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার কারণে তাঁদেরকে ভালবাসে এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। যে তাঁদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয় এবং যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়। যে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়, তাকে অচিরেই আল্লাহ্ আযাবে গ্রেফতার করবেন।—(তিরমিযী)

আয়াত ও হাদীস এ সম্পর্কে অনেক। 'মকামে-সাহাবা' নামক গ্রন্থে আমি এগুলো সন্নিবেশ করেছি। সব সাহাবীই যে আদিল ও সিকাহ্—এ সম্পর্কে সমগ্র উম্মত একমত। সাহাবায়ে-কিরামের পারস্পরিক মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা, সমালোচনা ও ঘাঁটাঘাঁটি করা অথবা চুপ থাকার বিষয়টিও এই গ্রন্থে বিস্তারিত লিখিত হয়েছে। প্রয়োজন মাফিক তার কিছু অংশ সূরা মুহাম্মদের তফসীরে স্থান পেয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

سورة الحجرات

সূরা হুজুরাত

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ১৮, রুকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝١ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَا
تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝٢ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ
اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٣ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝٤ وَلَوْ اَنَّهُمْ
صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে।

(১) মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ ও রসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন। (২) মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কন্ঠস্বরের উপর তোমাদের কন্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেইরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। (৩) যারা আল্লাহ্‌র রসূলের সামনে নিজেদের কন্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৪) যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচুস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ। (৫) যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে

আসা পর্যন্ত সবর করত, তবে তা-ই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সূরার যোগসূত্র ও শানে-নুযূল ঃ পূর্ববর্তী দুই সূরায় জিহাদের বিধান ছিল, যদ্দ্বারা বিশ্বজগতের সংশোধন উদ্দেশ্য। আলোচ্য সূরায় আত্মসংশোধনের বিধান ও শিষ্টাচার নীতি ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষত সামাজিকতা সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের ঘটনা এই যে, একবার বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা কাকে নিযুক্ত করা হবে——তখন এ বিষয়েই আলোচনা চলছিল। হযরত আবু বকর (রা) কা'কা' ইবনে হাকিমের নাম প্রস্তাব করলেন এবং হযরত ওমর (রা) আকরা' ইবনে হাবেসের নাম পেশ করলেন। এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর মধ্যে মজলিসেই কথাবার্তা হল এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।—(বুখারী)

মু'মিনগণ। তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের (অনুমতির) আগে (কোন কথা কিংবা কাজে) অগ্রণী হয়ো না। [অর্থাৎ যে পর্যন্ত শক্তিশালী ইঙ্গিতে অথবা স্পষ্ট ভাষায় কথাবার্তার অনুমতি না হয়, কথাবার্তা বলো না ; যেমন উপরোক্ত ঘটনায় অপেক্ষা করা উচিত ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে কিছু বলুন অথবা উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। এরূপ অপেক্ষা না করেই নিজের পক্ষ থেকে কথাবার্তা শুরু করে দেওয়া সমীচীন ছিল না]। আল্লা-হ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তোমাদের সব কথাবার্তা) শুনেন (এবং তোমাদের ক্রিয়া-কর্ম) জানেন। মু'মিনগণ, তোমরা পয়গম্বরের কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা পরস্পরে যেমন খোলাখুলি কথাবার্তা বল, পয়গম্বরের সাথে সেরূপ খোলাখুলি কথাবার্তা বলো না। (অর্থাৎ পরস্পরে কথা বলার সময় তাঁর সামনে উঁচুস্বরে কথা বলো না এবং স্বয়ং তাঁর সাথে কথা বলার সময় সমান স্বরে বলো না)। এতে তোমাদের কর্ম তোমাদের অজ্ঞাতসারে নিস্ফল হয়ে যাবে। [উদ্দেশ্য এই যে, দৃশ্যত নির্ভীক ও বেপরোয়া হয়ে কথা বলা এবং পরস্পরে খোলাখুলি কথা বলার অনুরূপ উঁচুস্বরে কথা বলা এক প্রকার ধৃষ্টতা। অনুসারী ও খাদিমের পক্ষ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা অপছন্দ-নীয় ও কষ্টদায়ক হতে পারে। আল্লাহ্র রসূলকে কষ্ট দেওয়া যাবতীয় সৎকর্মকে বরবাদ করে দেওয়ার নামান্তর। তবে মাঝে মাঝে মানসিক প্রফুল্লতার সময় এরূপ ব্যবহার অসহনীয় হয় না। তখন রসূলের জন্য কষ্টদায়ক না হওয়ার কারণে এ ধরনের কথাবার্তা সৎকর্ম বরবাদ হওয়ার কারণ হবে না। কিন্তু এ ধরনের কথাবার্তা কখন অসহনীয় ও কষ্টদায়ক হবে না, তা জানা বক্তার পক্ষে সহজ নয়। বক্তা হয়ত এরূপ মনে করে কথা বলবে যে, এই কথায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট হবে না ; কিন্তু বাস্তবে তা দ্বারা কষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তার কথা তার সৎ কর্মকে বরবাদ করে দেবে ; যদিও সে ধারণাও করতে পারবে না যে, তার এই কথা দ্বারা তার কতটুকু ক্ষতি হয়ে গেছে। তাই কণ্ঠস্বর উঁচু করতে

এবং জোরে কথা বলতে সর্বাবস্থায় নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এ ধরনের কিছু সংখ্যক কথাবার্তা যদিও কর্ম বরবাদ হওয়ার কারণ নয়; কিন্তু তা নির্দিষ্ট করা কঠিন। তাই যাবতীয় খোলাখুলি কথাবার্তাই বর্জন করা বিধেয়। এ পর্যন্ত উঁচুস্বরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর কণ্ঠস্বর নীচু করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে ঃ]

নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তাদের অন্তরে তাকওয়ার পরিপন্থী কোন বিষয় আসেই না ঃ উদ্দেশ্য এরূপ মনে হয় যে, এই বিশেষ ব্যাপারে তাঁরা পূর্ণ তাকওয়া গুণে গুণান্বিত। তিরমিযীর এক হাদীসে পূর্ণ তাকওয়ার বর্ণনা এরূপ ভাষায় বিবৃত হয়েছে ঃ لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به اخذوا لما به باس অর্থাৎ বান্দা ততক্ষণ পূর্ণ তাকওয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে গোনাহ্ নয়, এমন কিছু বিষয়ও বর্জন করে। এই ভয়ে যে, এগুলো তাকে গোনাহে লিপ্ত করে দিতে পারে। অর্থাৎ গোনাহের আশংকা আছে, এমন বিষয়াদিকেও সে বর্জন করে। উদাহরণত কণ্ঠস্বর উঁচু করার এমন এক প্রকার আছে, যাতে গোনাহ্ নেই। অর্থাৎ যদ্দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির কষ্ট হয় না এবং এক প্রকার এমন আছে, যাতে গোনাহ্ আছে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির কষ্ট হয়। এখন পূর্ণ তাকওয়া হল সর্বাবস্থায় কণ্ঠস্বর উঁচু করাকে বর্জন করা। অতঃপর তাদের কর্মের পারলৌকিক ফায়দা বর্ণিত হচ্ছে ঃ) তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহের ঘটনা এই যে, এই বনী তামীম গোত্রই যখন পুনরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়, তখন তিনি বাড়ীর বাইরে ছিলেন না। বরং বিবিগণের কোন এক কক্ষে ছিলেন। তারা ছিল আনাড়ি গ্রাম্য লোক। সেমতে বাইরে দাঁড়িয়েই তাঁর নাম উচ্চারণ করে ডাকতে লাগল ঃ

يا محمد اخرج الينا হে মুহাম্মদ, আমাদের কাছে বের হয়ে আসুন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।—(দুররে মনসূর) যারা কক্ষের বাইরে থেকে আপনাকে চিৎকার করে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ (বুদ্ধিমান হলে আপনার সাথে শিষ্টাচারমূলক ব্যবহার করত এবং এভাবে নাম নিয়ে বাইরে থেকে ডাকার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত না। اكثرهم বলার কারণ হয় এই যে, তাদের কেউ কেউ আসলে অবুঝ ছিল না, অন্যের দেখাদেখি এ কাজে লিপ্ত হয়েছিল। না হয় যাতে কেউ উত্তেজিত না হয়, সেজন্য اكثرهم বলা হয়েছে। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই ধারণা করতে পারে যে, বোধ হয় তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি। ওয়ায-নসিহতের ক্ষেত্রে উত্তেজনাকর কথাবার্তা থেকে সাবধান থাকাই নিয়ম)। যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত (সামান্য) সবর (ও অপেক্ষা) করত, তবে এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত (কেননা এটাই ছিল শিষ্টাচারের কথা। তারা এখনও তওবা করলে ক্ষমা পাবে, কেননা,) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে কুরতুবীর ভাষ্য অনুযায়ী ছয়টি ঘটনা বর্ণিত আছে। কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র) বলেন: সব ঘটনা নির্ভুল। কেননা, সবগুলোই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে একটি ঘটনা বুখারীর বর্ণনা মতে তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهٖ—بَيْنَ الْيَدَيْنِ এর আসল অর্থ দুই হাতের মধ্যস্থল। এর উদ্দেশ্য সামনের দিক। অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না। কি বিষয়ে অগ্রণী হতে নিষেধ করা হয়েছে, কোরআন পাক তা উল্লেখ করেনি। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ যে কোন কথায় অথবা কাজে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অগ্রণী হয়ো না। বরং তাঁর জওয়াবের অপেক্ষা কর। তবে তিনিই যদি কাউকে জওয়াবদানের আদেশ করেন, তবে সে জওয়াব দিতে পারে। এমনিভাবে যদি তিনি পথ চলেন তবে কেউ যেন তাঁর অগ্রে না চলে। খাওয়ার মজলিসে কেউ যেন তাঁর আগে খাওয়া শুরু না করে। তবে তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা অথবা শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাউকে অগ্রে প্রেরণ করতে চান তবে তা ভিন্ন কথা, যেমন সফর ও যুদ্ধের বেলায় কিছু সংখ্যক লোককে অগ্রে যেতে আদেশ করা হত।

আলিম ও ধর্মীয় নেতাদের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত: কেউ কেউ বলেন, ধর্মের আলিম ও মাশায়েখের বেলায়ও এই বিধান কার্যকর। কেননা, তাঁরা পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী। নিম্নোক্ত ঘটনা এর প্রমাণ। একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূদ্দারদা (রা)-কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর অগ্রে অগ্রে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং বললেন: তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল, যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমা থেকে শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেন: দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি যে পয়গম্বরগণের পর হযরত আবূ বকর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।—(রূহুল-বয়ান) তাই আলিমগণ বলেন যে, ওস্তাদ ও পীরের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ—নবী করীম (সা)-এর মজলিসের এটা দ্বিতীয় আদব। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে কণ্ঠস্বরকে তাঁর কণ্ঠস্বরের চাইতে অধিক উঁচু করা অথবা তাঁর সাথে উঁচুস্বরে কথা বলা—যেমন পরস্পরে বিনা দ্বিধায় করা হয়, এক প্রকার বে-আদবী ও ধৃষ্টতা। সেমতে এই আয়াত অবতরণের পর সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা পাল্টে যায়। হযরত আবূ বকর (রা) আরয করেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আল্লাহ্র কসম! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির অনুরূপ কথাবার্তা বলব।—(বায়হাকী) হযরত ওমর (রা) এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে হত। —(সেহাহ্) হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উঁচু ছিল। এই আয়াত শুনে তিনি ভয়ে ক্রন্দন করলেন এবং কণ্ঠস্বর নীচু করলেন।—(দুররে-মনসুর)

রওযা মোবারকের সামনেও বেশী উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা নিষিদ্ধ ঃ কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও আদব তাঁর ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। তাই কোন কোন আলিম বলেন ঃ তাঁর পবিত্র কবরের সামনেও বেশী উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা আদবের খিলাফ। এমনভাবে যে মজলিসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীস পাঠ অথবা বর্ণনা করা হয়, তাতেও হট্টগোল করা বেআদবী। কেননা, তাঁর কথা যখন তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হত, তখন সবার জন্য চুপ করে শোনা ওয়াজিব ও জরুরী ছিল। এমনিভাবে ওফাতের পর যে মজলিসে বাক্যাবলী শুনানো হয়, সেখানে হট্টগোল করা বেআদবী।

মাস'আলা ঃ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে পয়গম্বরের উপর অগ্রণী হওয়ার নিষেধাজ্ঞায় যেমন আলিমগণ দাখিল আছেন, তেমনিভাবে আওয়ায উঁচু করারও বিধান তাই। আলিমগণের মজলিসে এত উঁচুস্বরে কথা বলবে না, যাতে তাঁদের আওয়ায চাপা পড়ে যায়।—(কুরতুবী)

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ—অর্থাৎ তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু করো না এই আশংকার কারণে যে, কোথাও তোমাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যায় এবং তোমরা টেরও পাও না। এ স্থলে শরীয়তের স্বীকৃত মূলনীতির দিক দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয় ঃ এক. আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের ঐকমত্যে একমাত্র কুফরই সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। কোন গোনাহের কারণে কোন সৎ কর্ম বিনষ্ট হয় না। এখানে মু'মিন তথা সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا শব্দযোগে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, কাজটি কুফর নয়। অতএব আমলসমূহ বিনষ্ট হবে কিরূপে? দুই. ঈমান একটি ইচ্ছাধীন কাজ। যে পর্যন্ত কেউ স্বেচ্ছায় ঈমান গ্রহণ না করে, মু'মিন হয় না। এমনিভাবে কুফরও একটি ইচ্ছাধীন কাজ। স্বেচ্ছায় কুফর অবলম্বন না করা পর্যন্ত কেউ কাফির হতে পারে না। এখানে আয়াতের শেষাংশে স্পষ্টত أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা টেরও পাবে না। অতএব এখানে খাঁটি কুফরের শাস্তি সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়া কিরূপে প্রযোজ্য হতে পারে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে এর এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যদ্দ্বারা সব প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ এই যে, মুসলমানগণ, তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কণ্ঠস্বর থেকে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করা এবং উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে বিরত থেকো। কারণ, এতে তোমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। আশংকার কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অগ্রণী হওয়া

অথবা তাঁর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করার মধ্যে তাঁর শানে ধৃষ্টতা ও বেআদবী হওয়ারও আশংকা আছে, যা রসূলকে কষ্টদানের কারণ। রসূলের কষ্টের কারণ হয়, এরূপ কোন কাজ সাহাবায়ে কিরাম ইচ্ছাকৃতভাবে করবেন, যদিও এরূপ কল্পনাও করা যায় না, কিন্তু অগ্রণী হওয়া ও কণ্ঠস্বর উঁচু করার মত কাজ কষ্টদানের ইচ্ছায় না হলেও তদ্দ্বারা কষ্ট পাওয়ার আশংকা আছে। তাই এই জাতীয় কাজ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও গোনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোন গোনাহের বৈশিষ্ট্য এই যে, যারা এই গোনাহ্ করে, তাদের থেকে তওবা ও সৎ কর্মের তওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তারা গোনাহে অহর্নিশি মগ্ন হয়ে পরিণামে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যা সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়ার কারণ। ধর্মীয় নেতা, ওস্তাদ অথবা পীরকে কষ্ট দেওয়া এমনি গোনাহ্, যদ্দ্বারা তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার আশংকা আছে। এভাবে নবীর সামনে অগ্রণী হওয়া এবং কণ্ঠস্বর উঁচু করা দ্বারাও তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার এবং অবশেষে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার আংশকা থাকে। ফলে সমস্ত সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। যারা এহেন কাজ করে, তারা যেহেতু কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছায় করে না, তাই সে টেরও পাবে না যে, এই কুফর ও সৎ কর্ম নিষ্ফল হওয়ার আসল কারণ কি ছিল। কোন কোন আলিম বলেনঃ বুযুর্গ পীরের সাথে ধৃষ্টতা ও বেআদবী ও মাঝে মাঝে তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার কারণ হয়ে যায়, যা পরিণামে ঈমানের সম্পদও বিনষ্ট করে দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

—এই আয়াতে নবী করীম (সা)-এর তৃতীয় আদব শেখানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি যখন নিজ বাসগৃহে তশরীফ রাখেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকা, বিশেষত গেঁয়ার্তুমি সহকারে নাম নিয়ে আহবান করা বেআদবী। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। حُجُرَاتٌ শব্দটি حُجْرَةٌ-এর বহুবচন। অভিধানে প্রাচীর চতুষ্টয় দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে حُجْرَةٌ বলা হয়, যাতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকে। নবী করীম (সা)-এর নয়জন বিবি ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক হুজরা তথা কক্ষ ছিল। তিনি পালাক্রমে এসব হুজরায় তশরীফ রাখতেন।

ইবনে সা'দ আতা খোরাসানীর রেওয়ায়েতক্রমে লিখেনঃ এসব হুজরা খর্জুরের শাখা দ্বারা নির্মিত ছিল এবং দরজায় মোটা কাল পশমী পর্দা ঝুলানো থাকত। ইমাম বোখারী (র) 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী দাউদ ইবনে কায়েসের উক্তি বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি এসব হুজরার যিয়ারত করেছি। আমার ধারণা এই যে, হুজরার দরজা থেকে ছাদবিশিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত ছয়-সাত হাতের ব্যবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং ছাদের উচ্চতা সাত-আট হাত ছিল। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের রাজত্বকালে তাঁরই নির্দেশে এসব হুজরা মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। মদীনার লোকগণ সেদিন অশ্রু রোধ করতে পারেন নি।

শানে-নুযূলঃ ইমাম বগভী (র) কাতাদাহ্ (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন,

বনূ তামীমের লোকগণ দুপুরের সময় মদীনায় উপস্থিত হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক হুজরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছিল গ্রাম্য এবং সামাজিকতার রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। কাজেই তারা হুজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করল : اخرج الينا يا محمد—এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এভাবে ডাকা-ডাকি করতে নিষেধ করা হয় এবং অপেক্ষা করার আদেশ দেওয়া হয়। মসনদে আহমদ, তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থেও এই রেওয়ায়েত বিভিন্ন শব্দযোগে বর্ণিত হয়েছে।—(মাযহারী)

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাঁদের আলিম ও মাশায়েখের সাথেও এই আদব ব্যবহার করেছেন। সহীহ্ বোখারী ও অন্যান্য কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে—আমি যখন কোন আলিম সাহাবীর কাছ থেকে কোন হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তাঁর গৃহে পৌঁছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তাঁর কাছে হাদীস জিজ্ঞাসা করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেন : হে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র চাচাত ভাই, আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর উত্তরে বলতেন : আলিম জাতির জন্য পয়গম্বর সদৃশ। আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। হযরত আবূ ওবায়দা (র) বলেন : আমি কোন দিন কোন আলিমের দরজায় যেয়ে কড়া নাড়া দিইনি; বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাৎ করব।—(রূহুল-মা'আনী)

মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতে اِلَيْهِمْ কথাটি যুক্ত হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, ততক্ষণ সবর ও অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ তিনি আগন্তুকদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য বাইরে আসেন। যদি অন্য কোন প্রয়োজনে তিনি বাইরে আসেন, তখনও নিজের মতলব সম্পর্কে কথা বলা সমীচীন নয়; বরং তিনি নিজে যখন আগন্তুকদের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন বলতে হবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟

قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾

---

(৬) মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, (যাতে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে) তবে (যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করো না; বরং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে) তা খুব পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ মসনদে আহমদের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর এই আয়াত অবতরণের ঘটনা এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, বনূ মুস্তালিক গোত্রের সরদার, উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা হারেস ইবনে মেরার বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন। আমি ইসলামের দাওয়াত কবূল করে যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলাম এবং বললাম ঃ এখন আমি স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলাম ও যাকাত প্রদানের দাওয়াত দেব। যারা আমার কথা মানবে এবং যাকাত দেবে, আমি তাদের যাকাত একত্র করে আমার কাছে জমা রাখব। আপনি অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত কোন দূত আমার কাছে প্রেরণ করবেন, যাতে আমি যাকাতের জমা অর্থ তার হাতে সোপর্দ করতে পারি। এরপর হারেস যখন ওয়াদা অনুযায়ী যাকাতের অর্থ জমা করলেন এবং দূত আগমনের নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন দূত আগমন করল না, তখন হারেস আশংকা করলেন যে, সম্ভবত রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নতুবা ওয়াদা অনুযায়ী দূত না পাঠানো কিছুতেই সম্ভবপর নয়। হারেস এই আশংকার কথা ইসলাম গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছেও প্রকাশ করলেন এবং সবাই মিলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন। এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা) নির্ধারিত তারিখে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-কে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পথিমধ্যে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-র মনে এই ধারণা জাগ্রত হয় যে, এই গোত্রের লোকদের সাথে তাঁর পুরাতন শত্রুতা আছে। কোথাও তাঁরা তাকে পেয়ে হত্যা না করে ফেলে। এই ভয়ের কথা চিন্তা করে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যেয়ে বলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করারও ইচ্ছা করেছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) রাগান্বিত হয়ে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। এদিক দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী রওয়ানা হল এবং ওদিক থেকে হারেস তাঁর সঙ্গিগণসহ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য বের হলেন। মদীনার অদূরে উভয় দল মুখোমুখি হল। মুজাহিদ বাহিনী দেখে হারেস জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনারা কোন্ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন? উত্তর হল ঃ আমরা তোমাদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছি। হারেস কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-কে প্রেরণ ও তাঁর প্রত্যাবর্তনের কাহিনী শুনানো হল এবং ওয়ালীদের এই বিবৃতিও শুনানো হল যে, বনূ মুস্তালিক গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাঁকে

হত্যার পরিকল্পনা করেছে। একথা শুনে হারেস বললেন : সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য রসূল করে প্রেরণ করেছেন, আমি ওলীদ ইবনে ওকবাকে দেখি-ওনি। সে আমার কাছে যায়নি। অতঃপর হারেস রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং আমার দূতকে হত্যা করতে চেয়েছ? হারেস বললেন : কখনই নয়, সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আপনাকে সত্য পয়গামসহ প্রেরণ করেছেন, সে আমার কাছে যায়নি এবং আমি তাকে দেখিওনি। নির্ধারিত সময়ে আপনার দূত যায়নি দেখে আমার আশংকা হয় যে, বোধ হয়, আপনি কোন ত্রুটির কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমরা খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। হারেস বলেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা হুজুরাতের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) নির্দেশ অনুযায়ী বনু মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছেন। গোত্রের লোকেরা পূর্বেই জানত যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দূত অমুক তারিখে আগমন করবে। তাই তারা অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে বস্তি থেকে বের হয়ে আসে। ওলীদ সন্দেহ করলেন যে, তারা বোধ হয় পুরাতন শত্রুতার কারণে তাকে হত্যা করতে এগিয়ে আসছে। সেমতে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে নিজ ধারণা অনুযায়ী আরয করলেন যে, তারা যাকাত দিতে সম্মত নয়; বরং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে প্রেরণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) রাত্রি বেলায় বস্তির নিকটে পৌঁছে গোপনে কয়েকজন গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। তারা ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের উপর কায়েম এবং যাকাত দিতে প্রস্তুত আছে। তাদের মধ্যে ইসলামের বিপরীত কোন কিছু নেই। খালিদ (রা) ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (এটা ইবনে কাসীরের একাধিক রেওয়ায়েতের সার-সংক্ষেপ)।

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন দুষ্ট ও পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোন লোক কিংবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে, তবে যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যতি-রেকে তার সংবাদ অথবা সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়।

আয়াত সম্পর্কিত বিধান ও মাস'আলা : ইমাম জাসসাস আহ্‌কামুল-কোরআনে বলেন : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ফাসিক ও পাপাচারীর খবর কবুল করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা, এই আয়াতে এক কিরাআত হচ্ছে : فَتَثَبَّتُوا

অর্থাৎ তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তড়িঘড়ি করো না; বরং অন্য উপায়ে এর সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাক। ফাসিকের খবর কবুল করা যখন না-জায়েয তখন সাক্ষ্য কবুল করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হবে। কেননা, সাক্ষ্য এমন একটি খবর,

যাকে শপথ ও কসম দ্বারা জোরালো করা হয়। এ কারণেই অধিকাংশ আলিমের মতে ফাসিকের খবর অথবা সাক্ষ্য শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন কোন ব্যাপারে ফাসিকের খবর ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সেটা এই বিধানের ব্যতিক্রম। কেননা, আয়াতে এই বিধানের একটি বিশেষ কারণ أن تصيبوا قوما بجهالة বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব যেসব ব্যাপারে এই কারণ অনুপস্থিত, সেগুলো আয়াতের বিধানে দাখিল নয়, অথবা এর ব্যতিক্রম। উদাহরণত কোন ফাসিক বরং কাফিরও যদি কোন বস্তু এনে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে এটা হাদিয়া দিয়েছে, তবে তার এই খবর সত্য বলে মেনে নেওয়া জায়েয। ফিকহ্ গ্রন্থে এর আরও বিবরণ পাওয়া যাবে।

সাহাবীদের আদালত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও জওয়াব : বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই আয়াতটি ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আয়াতে তাকে ফাসিক বলা হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউ ফাসিকও হতে পারে। এটা الصحابة كلهم عدول এই স্বীকৃত ও সর্বসম্মত মূলনীতির পরিপন্থী। অর্থাৎ সকল সাহাবীই সিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য। তাদের কোন খবর ও সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা আলূসী (র) রূহুল-মা'আনীতে বলেন : অধিকাংশ আলিম যে মাযহাব ও মতবাদ গ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে তাই সত্য ও নির্ভুল। তাঁরা বলেন : সাহাবায়ে কিরাম নিষ্পাপ নন, তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহ্ও সংঘটিত হতে পারে, যা ফিসক তথা পাপাচার। এরূপ গোনাহ্ হলে তাঁদের বেলায়ও শরীয়তসম্মত শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত হলে তাঁদের খবর এবং সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনাদৃষ্টে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআতের আকীদা এই যে, সাহাবী গোনাহ্ করতে পারেন, কিন্তু এমন কোন সাহাবী নেই, যিনি গোনাহ্ থেকে তওবা করে পবিত্র হন নি। কোরআন পাক رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বলে সর্বাবস্থায় তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছে। গোনাহ্ ক্ষমা করা ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হয় না। কাযী আবূ ইয়ালা (র) বলেন : সন্তুষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার একটি চিরাগত গুণ। তিনি তাদের জন্যই সন্তুষ্টি ঘোষণা করেন, যাদের সম্পর্কে জানেন যে, সন্তুষ্টির কারণাদির উপরই তাদের ওফাত হবে।

সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কিরামের বিরাট দলের মধ্য থেকে গুণাগুণতি কয়েকজন দ্বারা কখনও কোন গোনাহ্ হয়ে থাকলেও তাঁরা তাৎক্ষণিক তওবা করার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। রসূলে করীম (সা)-এর সংসর্গের বরকতে শরীয়ত তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ অথবা গোনাহ্ তাঁদের পক্ষ থেকে খুবই দুর্লভ ছিল। তাঁদের অসংখ্য সৎ কর্ম ছিল। নবী করীম (সা) ও ইসলামের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূলের অনুসরণকে তাঁরা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ জন্য এমন সাধনা করেছিলেন, যার নজীর অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এসব গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের মুকাবিলায় সারা জীবনের মধ্যে কোন গোনাহ্ হয়ে গেলেও তা স্বভাবতই ধর্তব্য নয়। এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর

রসূল (সা)-এর মাহাত্ম্য ও মহব্বতে তাঁদের অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। সামান্য গোনাহ্ হয়ে গেলেও তাঁরা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন এবং তাৎক্ষণিক তওবা করতেন; বরং নিজেকে শাস্তির জন্য নিজেই পেশ করে দিতেন। কোথাও নিজেই নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন। এসব ঘটনা হাদীসে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায় যেন গোনাহ্ করেনি। তৃতীয়ত কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পুণ্য কাজ নিজেও গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। বলা হয়েছে : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ —বিশেষত সাহাবায়ে কিরামের পুণ্যকাজ গোনাহের কাফফারা হবেই। কারণ, তাঁদের পুণ্য কাজ সাধারণ লোকদের মত ছিল না। তাঁদের অবস্থা আবূ দাউদ ও তিরমিযী হযরত সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

والله لمشهد رجل منهم مع النبى صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح -

"আল্লাহ্‌র কসম, তাঁদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির নবী করীম (সা)-এর সাথে জিহাদে শরীক হওয়া—যাতে তাঁর মুখমণ্ডল ধূলি ধূসরিত হয়ে যায়—তোমাদের সারা জীবনের ইবাদত থেকে উত্তম, যদিও তোমাদেরকে নূহ (আ)-এর আয়ুষ্কাল দান করা হয়।" অতএব গোনাহ্ হয়ে গেলে যদিও তাঁদেরকে নির্ধারিত শাস্তিই দেওয়া হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোন পরবর্তী ব্যক্তির জন্য তাঁদের কাউকে ফাসিক সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যুগে কোন সাহাবী দ্বারা ফিসক হওয়ার কারণে তাঁকে ফাসিক বলা হলেও এর কারণে তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ্) পরবর্তীকালেও সর্বদা ফাসিক বলা বৈধ নয়। —(রূহুল-মা'আনী)

আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-র ঘটনা হলেও আয়াতে তাঁকে ফাসিক বলা হয়েছে—একথা অকাট্যরূপে জরুরী নয়। কারণ, এই ঘটনার পূর্বে ফাসিক বলার মত কোন কাজ তিনি করেন নি। এই ঘটনায়ও নিজ ধারণা অনুযায়ী সত্য মনে করেই তিনি মোস্তালিক গোত্র সম্পর্কে একটি বাস্তবে ভ্রান্ত সংবাদ দিয়েছিলেন। তাই আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ অনায়াসেই তা হতে পারে, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এই আয়াত ফাসিকের খবর অগ্রহণীয় হওয়া সম্পর্কে একটি সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই আয়াত অবতরণের ফলে বিষয়টি এভাবে আরও জোরদার হয়েছে যে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) ফাসিক না হলেও তাঁর খবর শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা অগ্রহণীয় মনে হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল তাঁর খবরের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে তদন্তের আদেশ দেন। সুতরাং একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির খবরে ইঙ্গিতের ভিত্তিতে সন্দেহ হওয়ার কারণে যখন তদন্ত না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না, তখন ফাসিকের খবর কবুল না করা এবং তদনুযায়ী

ব্যবস্থা গ্রহণ না করা আরও সুস্পষ্ট। সাহাবীগণের 'আদালত' সম্পর্কিত আলোচনার কিছু অংশ পরবর্তী وان طائفتان من المؤمنين আয়াতেও বর্ণিত হবে।

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۝ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

(৭) তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসূল রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (৮) এটা আল্লাহ্‌র কৃপা ও নিয়ামত, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসূল (বিদ্যমান) আছেন (যা আল্লাহ্‌র বড় নিয়ামত ; যেমন আল্লাহ্ বলেন : لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ الخ —এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা এই যে, কোন ব্যাপারে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না যদিও তা পার্থিব ব্যাপার হয় এবং পার্থিব ব্যাপারাদিতে তিনি তোমাদের মতামত মেনে নেবেন, এরূপ চিন্তা করো না। কেননা) তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। (কারণ, সেটা উপযোগিতার খেলাফ হলে তদনুযায়ী কাজ করার মধ্যে অবশ্যই ক্ষতি হবে। কিন্তু রসূলের মতামত অনুযায়ী কাজ করলে সেরূপ হবে না। কেননা, পার্থিব ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও সেটা উপযোগিতার খেলাফ হওয়ার সম্ভাবনা যদিও অবান্তর ও নবুওয়তের পরিপন্থী নয়, কিন্তু প্রথমত এরূপ সম্ভাবনা বিশিষ্ট ব্যাপার খুবই কম হবে। হলে যদিও তাতে উপযোগিতা নষ্টও হয়ে যায়, তবে এই উপযোগিতার বিকল্প অর্থাৎ পুরস্কার ও রসূলের আনুগত্যের সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু তোমাদের মতামত অনুযায়ী কাজ করলে খুব নগণ্য সংখ্যক ব্যাপার এমন হবে, যাতে উপযোগিতা তোমাদের মতামতের অনুকূলে থাকবে ; কিন্তু তা নির্দিষ্ট না হওয়ার কারণে ক্ষতির আশংকাই বেশী থাকবে এবং এর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। এই ব্যাখ্যা দ্বারা 'অনেক বিষয়ে' কথাটির উপকারিতাও জানা গেল। মোটকথা, আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের মতানুযায়ী কাজ করলে তোমরাই বিপদগ্রস্ত হতে) কিন্তু আল্লাহ্ (তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন এভাবে

যে) তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করেছেন এবং তা (অর্জনকে) হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন এবং কুফর, পাপাচার (অর্থাৎ কবিরা গোনাহ্) ও (যে কোন) নাফরমানীর (অর্থাৎ সগীরা গোনাহ্র) প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (ফলে তোমরা সর্বদা রসূলের সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর এবং রসূলের সন্তুষ্টি বিধানকারী নির্দেশাবলী মেনে চল। মোটকথা তোমরা যখন জানতে পেরেছ যে, সাংসারিক বিষয়াদিতেও রসূলের আনুগত্য ওয়াজিব এবং পূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হয় না, তখন তোমরা অনতিবিলম্বে এই নির্দেশও কবুল করে নিয়েছ এবং কবুল করে ঈমানকে আরও পূর্ণ করে নিয়েছ)। তারাই আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহে সৎ পথ অবলম্বনকারী। আল্লাহ্ (এসব নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, তিনি এসবের উপকারিতা সম্পর্কে) সবিশেষ জ্ঞাত এবং (যেহেতু তিনি) প্রজ্ঞাময়, (তাই এসব নির্দেশ ওয়াজিব করে দিয়েছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর আগের আয়াতে ওলীদ ইবনে ওকবা ও মুস্তালিক গোত্রের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল। ওলীদ ইবনে ওকবা মুস্তালিক গোত্র সম্পর্কে খবর দিয়েছিল যে, তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। এতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দেয়। তাঁদের মত ছিল যে, মুস্তালিক গোত্রের বিপক্ষে যুদ্ধাভিযান করা হোক। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) ওলীদ ইবনে ওকবার খবরকে শক্তিশালী ইঙ্গিতের খেলাফ মনে করে কবুল করেন নি এবং তদন্তের জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে আদেশ করেন। আগের আয়াতে কোরআন এ বিষয়কে আইনের রূপ দান করেছে যে, যে ব্যক্তির খবরে শক্তিশালী ইঙ্গিতের মাধ্যমে সন্দেহ দেখা দেয়, তদন্তের পূর্বে তার খবর অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কিরামকে আরও একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও বনূ মুস্তালিক সম্পর্কিত খবর শুনে তোমাদের উত্তেজনা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের কারণে ছিল, কিন্তু তোমাদের মতামত নির্ভুল ছিল না। রসূলের অবলম্বিত পন্থাই উত্তম ছিল।—(মাযহারী) উদ্দেশ্য এই যে, পরামর্শ সাপেক্ষ ব্যাপারাদিতে কোন মত পেশ করা তো দুরস্ত, কিন্তু এরূপ চেষ্টা করা যে, রসূল (সা) এই মত অনুযায়ীই কাজ করুন, এটা দুরস্ত নয়। কেননা, সাংসারিক ব্যাপারাদিতে যদিও খুব কমই রসূলের মতামত উপযোগিতার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা নবুয়তের পরিপন্থী নয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে যে দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন, তা তোমাদের নেই। তাই রসূল যদি তোমাদের মতামত মেনে চলেন, তবে অনেক ব্যাপারে তোমাদের কষ্ট ও বিপদ হবে। যদি কুত্রাপি কোথাও তোমাদের মতামতের মধ্যেই উপযোগিতা নিহিত থাকে এবং তোমরা রসূলের আনুগত্যের খাতিরে নিজেদের মতামত পরিত্যাগ কর, যাতে তোমাদের সাংসারিক ক্ষতিও হয়ে যায়, তবে তাতে ততটুকু ক্ষতি নেই, যতটুকু তোমাদের মতামত মেনে চলার মধ্যে আছে। কেননা, এমতাবস্থায় কিছু সাংসারিক ক্ষতি হয়ে গেলেও রসূলের আনুগত্যের পুরস্কার ও সওয়াব এর চমৎকার বিকল্প বিদ্যমান আছে। عَنِتُّمْ শব্দটি

عنت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গোনাহ্ও হয় এবং কোন বিপদে পতিত হওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে।—(কুরতুবী)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

(৯) যদি মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (১০) মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে—যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যদি মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (অর্থাৎ যুদ্ধের মূল কারণ দূর করে যুদ্ধ বন্ধ করিয়ে দাও)। অতঃপর যদি (মীমাংসার চেষ্টার পরও) তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, (এবং যুদ্ধ-বিরতি কার্যকর না করে) তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে (আল্লাহ্র নির্দেশ বলে যুদ্ধ-বিরতি বোঝানো হয়েছে)। এরপর যদি আক্রমণকারী দল (আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে) ফিরে আসে (অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়), তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দাও (অর্থাৎ শরীয়তের বিধানানুযায়ী ব্যাপারটি মীমাংসা করে দাও। শুধু যুদ্ধ বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয়ো না। মীমাংসা না হলে পুনরায় যুদ্ধ বাধাবার আশংকা থাকবে)। এবং ইনসাফ কর। (অর্থাৎ কোন মানসিক স্বার্থকে প্রবল হতে দিয়ো না)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (পারস্পরিক মীমাংসার আদেশ দেওয়ার কারণ এই যে) মু'মিনরা তো (ধর্মীয় অভিন্নতা তথা আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কারণে একে অপরের) ভাই। অতএব তোমাদের দুই ভাইয়ের

মধ্যে মীমাংসা করে দাও (যাতে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে)। এবং (মীমাংসার সময়) আল্লাহ্কে ভয় কর (অর্থাৎ শরীয়তের মীমাংসার প্রতি লক্ষ্য রাখ), যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হক, আদব এবং তাঁর পক্ষে কষ্টদায়ক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে সাধারণ দলগত ও ব্যক্তিগত রীতিনীতি এবং পারস্পরিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। অপরকে কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকাই আলোচ্য আয়াতগুলোর মূল প্রতিপাদ্য।

শানে-নুযূল : এসব আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে তফসীরবিদগণ একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনায় খোদ মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়বস্তু আছে। এখন সকল ঘটনার সমষ্টি আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে অথবা কোন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুরূপ দেখে সেগুলোকেও অবতরণের কারণের মধ্যে শরীক করে দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে আসলে যুদ্ধ ও জিহাদের সরঞ্জাম ও উপকরণের অধিকারী রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করা হয়েছে। —(বাহর ; রূহুল মা'আনী) পরোক্ষভাবে সকল মুসলমানকেও সম্বোধন করা হয়েছে যে, তারা এ ব্যাপারে রাজন্যবর্গের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে কোন ইমাম, আমির, সরদার অথবা বাদশাহ্ নেই, সেখানে যতদূর সম্ভব বিবদমান উভয় পক্ষকে উপদেশ দিয়ে যুদ্ধ-বিরতিতে সম্মত করতে হবে। যদি উভয়েই সম্মত না হয়, তবে তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। কারও বিরোধিতা এবং কারও পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না। —(বয়ানুল কোরআন)

মাসায়েল : মুসলমানদের দুই দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। এক. বিবদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে না কিংবা এক দল শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে এবং অন্যদল শাসন বহির্ভূত হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয় দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি উপদেশে বিরত না হয়, তবে ইমামের পক্ষ থেকে মীমাংসা করা ওয়াজিব। যদি ইসলামী সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে কিসাস ও রক্ত বিনিময়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয় পক্ষের সাথে বিদ্রোহীর ন্যায় ব্যবহার করা হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ জুলুম ও নির্যাতন অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদিল বলা হবে। বিদ্রোহীদের প্রতি প্রযোজ্য বিস্তারিত বিধান ফিক্হ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে বিধান এই যে, যুদ্ধের আগে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। যুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের পর তাদের সন্তান-সন্ততিকে গোলাম অথবা বাঁদী করা হবে না এবং তাদের ধনসম্পদ যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ বলে গণ্য হবে না। তবে তওবা না করা পর্যন্ত ধনসম্পদ আটক রাখা হবে। তওবার পর প্রত্যর্পণ করা

হবে। আয়াতে বলা হয়েছে : فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا অর্থাৎ যদি বিদ্রোহী দল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তবে শুধু যুদ্ধ-বিরতিই যথেষ্ট হবে না। বরং যুদ্ধের কারণ ও পারস্পরিক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর, যাতে কোন পক্ষের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতা অবশিষ্ট না থাকে এবং স্থায়ী ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা যেহেতু ইমামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে, তাই তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কোরআন পাক উভয়-পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইনসাফের তাকীদ করেছে।—(বয়ানুল কোরআন)

মাস'আলা : যদি মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দল ইমামের বশ্যতা অস্বীকার করে, তবে ইমামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ শ্রবণ করা, তাদের কোন সন্দেহ কিংবা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার শরীয়তসম্মত বৈধ কারণ উপস্থিত করে, যদ্দ্বারা খোদ ইমামের অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয়, তবে সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে এই দলের সাহায্য ও সমর্থন করা, যাতে ইমাম জুলুম থেকে বিরত হয়। এক্ষেত্রে ইমামের জুলুম নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হওয়া শর্ত।—(মাযহারী)

পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য বর্জনের পক্ষে কোন সুস্পষ্ট ও সঙ্গত কারণ পেশ করতে না পারে এবং ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হালাল। ইমাম শাফেয়ী বলেন, তারা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা জায়েয হবে না।—(মাযহারী)

এই বিধান তখন, যখন এই দেশের বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হওয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। যদি উভয় পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ রাখে এবং কে বিদ্রোহী ও কে আদিল, তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমানই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদিল মনে করবে সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন করতে পারে। যার এরূপ কোন প্রবল ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষ থাকবে, যেমন জমল ও সিফফীন যুদ্ধে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ : ইমাম আবু বকর ইবনে আরাবী (রা) বলেন : এই আয়াত মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের যাবতীয় প্রকারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। সেসব দ্বন্দ্ব-কলহও এই আয়াতের মধ্যে দাখিল, যাতে উভয় পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণের ভিত্তিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরামের বাদানুবাদ এই প্রকারের মধ্যে পড়ে। কুরতুবী ইবনে আরাবীর এই উক্তি উদ্ধৃত করে এ স্থলে সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ তথা জঙ্গে-জমল ও সিফফীনের আসল স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে পরবর্তী যুগের মুসলমানদের কর্মপন্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এখানে কুরতুবীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হচ্ছে :

কোন সাহাবীকে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত বলা জায়েয নয়। কারণ, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমেই নিজ নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। তাঁরা সবাই আমাদের নেতা। আমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, আমরা যেন তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি এবং সবদা উত্তম পন্থায় তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কেননা, সাহাবী হওয়া বড়ই সম্মানের বিষয়। নবী করীম (সা) তাঁদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এছাড়া বিভিন্ন সনদে এই হাদীস প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত তালহা (রা) সম্পর্কে বলেছেন : ان طلحة شهيد يمشى على وجه الارض অর্থাৎ তালহা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরাকারী শহীদ।

এখন হযরত আলী (রা)-র বিরুদ্ধে হযরত তালহা (রা)-র যুদ্ধের জন্য বের হওয়া প্রকাশ্য গোনাহ্ ও নাফরমানী হলে এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি কিছুতেই শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না। এমনিভাবে হযরত তালহার এই কাজকে ভ্রান্ত এবং কর্তব্য পালনে ত্রুটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হলেও তাঁর জন্য শাহাদতের মর্তবা অর্জিত হত না। কারণ, শাহাদত একমাত্র তখনই অর্জিত হয়, যখন কেউ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কাজেই তাঁদের ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস পোষণ করাই জরুরী।

এ ব্যাপারে খোদ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত সহীহ্ ও মশহুর হাদীস দ্বিতীয় প্রমাণ। তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যুবায়রের হত্যাকারী জাহান্নামে আছে।

হযরত আলী (রা) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি, সফিয়্যা-তনয়ের হত্যাকারীকে জাহান্নামের খবর দিয়ে দাও। অতএব, প্রমাণিত হল যে, হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা) এই যুদ্ধের কারণে পাপী ও গোনাহ্গার ছিলেন না। এরূপ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত তালহাকে শহীদ বলতেন না এবং যুবায়রের হত্যাকারী সম্পর্কে জাহান্নামের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না। এছাড়া তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম। তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রায় সর্ববাদিসম্মত।

এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা এসব যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁদেরকেও ভ্রান্ত বলা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ মতের উপরই কায়েম রেখেছেন—এদিক দিয়ে তাঁদের কর্মপন্থাও সঠিক ছিল। সুতরাং এ কারণে তাঁদেরকে ভর্ৎসনা করা, তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তাঁদেরকে ফাসিক সাব্যস্ত করা এবং তাঁদের ফযিলত, সাধনা ও মহান ধর্মীয় মর্যাদা অস্বীকার করা কিছুতেই দুরস্ত নয়। জনৈক আলিমকে জিজ্ঞাসা করা হয় : সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদের ফলস্বরূপ যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি জওয়াবে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

অর্থাৎ সেই উম্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য এবং তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য। তারা কি করত না করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

একই প্রশ্নের জওয়াবে অন্য একজন বুযুর্গ বলেন ঃ এটা এমন রক্ত যে, আল্লাহ্ এর দ্বারা আমার হাতকে রঞ্জিত করেন নি। এখন আমি আমার জিহ্বাকে এর সাথে জড়িত করতে চাই না। উদ্দেশ্য এই যে, আমি কোন এক পক্ষকে কোন ব্যাপারে নিশ্চিত ভ্রান্ত সাব্যস্ত করার ভুলে লিপ্ত হতে চাই না।

আল্লামা ইবনে ফওরা বলেন ঃ আমাদের একজন সহযোগী বলেছেন যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যবর্তী বাদানুবাদ ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর অনুরূপ। তাঁরা পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও বেলায়েত ও নবুয়তের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যান নি। সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক ঘটনাবলীর ব্যাপারটিও হুবহু তাই।

হযরত মুহাসেবী (র) বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক রক্তপাতের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কিছু মন্তব্য করা সুকঠিন। কেননা, এ ব্যাপারে খোদ সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হযরত হাসান বসরী (র) সাহাবীদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন ঃ এসব যুদ্ধে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা অনুপস্থিত। তাঁরা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন। আমরা জানি না। যে ব্যাপারে সব সাহাবী একমত আমরা তাতে তাঁদের অনুসরণ করব এবং যে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চুপ থাকব।

হযরত মুহাসেবী (র) বলেন ঃ আমিও তাই বলি, যা হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন। আমি জানি তাঁরা যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাই আমাদের কাজ। আমাদের তরফ থেকে নতুন কোন পথ আবিষ্কার করা অনুচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করেছিলেন। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা সবাই সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ
وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ

بَعْدَ الْإِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ⊙

(১১) হে মু'মিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ্। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে, তারাই জালিম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, পুরুষরা যেন অপর পুরুষদেরকে উপহাস না করে। কেননা, (যাদেরকে উপহাস করা হয়) তারা তাদের (অর্থাৎ উপহাসকারীদের) অপেক্ষা (আল্লাহ্‌র কাছে) উত্তম হতে পারে এবং নারীরাও যেন অপর নারীদেরকে উপহাস না করে। কেননা, (যাদেরকে উপহাস করা হয়) তারা তাদের (অর্থাৎ উপহাসকারিণীদের) অপেক্ষা (আল্লাহ্‌র কাছে) শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (কেননা, এগুলো গোনাহ্)। বিশ্বাস স্থাপন করার পর (মুসলমানের প্রতি) গোনাহ্‌র নাম আরোপিত হওয়া (-ই) মন্দ। (অর্থাৎ মুসলমানকে এ কথা বলা যে, সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে যা ঘৃণার বিষয়। অতএব, এ থেকে বেঁচে থাক)। যারা (এহেন কাজ থেকে) বিরত না হয়, তারা জালিম (অর্থাৎ বান্দার হক নষ্টকারী। জালিমরা যে শাস্তি পাবে, তারাও তাই পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুজুরাতের শুরুতে নবী করীম (সা)-এর হক ও আদব, অতঃপর সাধারণ মুসলমানদের পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মুসলমানদের দলগত সংশোধনের বিধান উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক হক, আদব ও সামাজিক রীতিনীতি বিবৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক. কোন মুসলমানকে ঠাট্টা ও উপহাস করা, দুই. কাউকে দোষারোপ করা, এবং তিন. কাউকে অপমান করা অথবা পীড়াদায়ক নামে ডাকা।

কুরতুবী বলেন: কোন ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্য তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে, তাকে تمسخر - سخرية ও استهزا বলা হয়। এটা যেমন মুখে সম্পন্ন হয়, তেমনি হস্তপদ ইত্যাদি দ্বারা ব্যঙ্গ অথবা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে থাকে। কারও কথা শুনে অপমানের ভঙ্গিতে বিদ্রূপ করার মাধ্যমেও হতে পারে। কেউ কেউ বলেন: শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করে, এমনভাবে কারও সম্পর্কে আলোচনা করাকে تمسخر ও سخرية বলা হয়। কোরআনের বর্ণনা মতে এগুলো সব হারাম।

কোরআন পাক এত গুরুত্ব সহকারে سخر তথা উপহাস নিষিদ্ধ করেছে যে, এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী জাতিকে পৃথক পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য 'কওম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, অভিধানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত, যদিও রূপক ভঙ্গিতে নারীদেরকেও শামিল করা হয়ে থাকে। কোরআন পাক সাধারণত পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য 'কওম' শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু কোরআন এখানে 'কওম' শব্দটি বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য ব্যবহার করেছে এবং এর বিপরীতে نساء শব্দের মাধ্যমে নারীদের কথা উল্লেখ করেছে। উভয়কে বলা হয়েছে যে, যে পুরুষ অপর পুরুষকে উপহাস করে, সে আল্লাহ্‌র কাছে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। এমনিভাবে যে নারী অপর নারীকে উপহাস করে, সে আল্লাহ্‌র কাছে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। কোরআনে পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে উপহাস করা ও তা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ কোন পুরুষ নারীকে এবং কোন নারী পুরুষকে উপহাস করলে তা-ও হারাম। কিন্তু একথা উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের মেলামেশাই শরীয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। মেলামেশা না হলে উপহাসের প্রশ্নই ওঠে না। আয়াতের সারমর্ম এই যে, কোন ব্যক্তির দেহে, আকার-আকৃতিতে অথবা গঠন-প্রকৃতিতে কোন দোষ দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে কারও হাসাহাসি অথবা উপহাস করা উচিত নয়। কেননা, তার জানা নেই যে, সম্ভবত এই ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহ্‌র কাছে তার চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। এই আয়াত পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও মনীষীদের অন্তরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমর ইবনে শোরাহ্‌বিল (রা) বলেন : কোন ব্যক্তিকে বকরীর স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে যদি আমার হাসির উদ্রেক হয়, তবে আমি আশংকা করতে থাকি যে, কোথাও আমিও এরূপই না হয়ে যাই। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন : কোন কুকুরকেও উপহাস করতে আমার ভয় লাগে যে, আমিও নাকি কুকুর হয়ে যাই।—(কুরতুবী)

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের আকার-আকৃতি ও ধনদৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। কুরতুবী বলেন : এই হাদীস থেকে এই বিধি ও মূলনীতি জানা যায় যে, কোন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতরূপে ভাল অথবা মন্দ বলে দেওয়া জায়েয নয়। কারণ, যে ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মকে আমরা খুব ভাল মনে করছি, সে আল্লাহ্‌র কাছে নিন্দনীয় হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম মন্দ, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ তার কুকর্মের কাফফারা হয়ে যেতে পারে। তাই যে ব্যক্তিকে মন্দ অবস্থা ও কুকর্মে লিপ্ত দেখ, তার এই অবস্থাকে মন্দ মনে কর; কিন্তু তাকে হেয় ও লাঞ্ছিত মনে করার অনুমতি নেই। আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে لمز—এর অর্থ কারও দোষ বের করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষের কারণে ভৎসনা করা, ইরশাদ হয়েছে : لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ —অর্থাৎ

তোমরা নিজেদের দোষ বের করো না। এই বাক্যটি لَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ-এর মতই, যার অর্থ তোমরা নিজেদের দোষ বের করার অর্থ এই যে, তোমরা পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করো না এবং একে অন্যের দোষ বের করো না। এরূপ ভঙ্গিতে ব্যক্ত করার রহস্য একথা বলা যে, অপরকে হত্যা করা এক দিক দিয়ে নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা, প্রায়ই তো এরূপ হয়েই যায় যে, একজন অন্যজনকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির সমর্থকরা তাকেও হত্যা করে। এটা না হলেও প্রকৃত সত্য এই যে, মুসলমান সব ভাই ভাই। ভাইকে হত্যা করা যেন নিজেকে হত্যা করা এবং হস্তপদ বিহীন করে দেওয়া لَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ-এর অর্থ তাই। অর্থাৎ তোমরা অন্যের দোষ বের করলে, সে-ও তোমাদের দোষ বের করবে। কারণ, দোষ থেকে কোন মানুষ মুক্ত নয়। অনেক আলিম বলেন : وفيك عيوب وللناس اعين অর্থাৎ তোমার মধ্যেও দোষ আছে এবং মানুষের চক্ষু আছে। তারা দোষ দেখে। তুমি কারও দোষ বের করলে সে-ও তোমার দোষ বের করবে। যদি সে সবর করে, তবে সেই কথাই বলতে হবে যে, মুসলমান ভাইয়ের দুর্নাম নিজেরই দুর্নাম।

আলিমগণ বলেন : নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি রেখে তা সংশোধনের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকার মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত। যে এরূপ করে, সে অপরের দোষ বের করা ও বর্ণনা করার অবসরই পায় না। হিন্দুস্তানের সর্বশেষ মুসলমান বাদশাহ্ যফর চমৎকার বলেছেন :

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر۔ رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر
پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر ۔ تو جہان میں کوئی برا نہ رہا

আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে অপরকে মন্দ নামে ডাকা, যদ্দরুন সে অসন্তুষ্ট হয়। উদাহরণত কাউকে খঞ্জ, খোঁড়া অথবা অন্ধ বলে ডাকা অথবা অপমানজনক নামে সম্বোধন করা। হযরত আবু জুবায়ের আনসারী (রা) বলেন : এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমাদের অধিকাংশ লোকের দুই তিনটি করে নাম খ্যাত ছিল। তন্মধ্যে কোন কোন নাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লজ্জা দেওয়া ও লাঞ্ছিত করার জন্য লোকেরা খ্যাত করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তা জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে সেই মন্দ নাম ধরে তিনি সম্বোধন করতেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম বলতেন : ইয়া রসূলাল্লাহ্, সে এই নাম শুনলে অসন্তুষ্ট হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ-এর অর্থ হচ্ছে কেউ কোন গোনাহ্ অথবা মন্দ কাজ করে তওবা করার পরও তাকে সেই মন্দ কাজের নামে

ডাকা। উদাহরণত চোর, ব্যভিচারী অথবা শরাবী বলে সম্বোধন করা। যে ব্যক্তি চুরি, যিনা, শরাব ইত্যাদি থেকে তওবা করে নেয়, তাকে অতীত কুকর্ম দ্বারা লজ্জা দেওয়া ও হেয় করা হারাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন গোনাহ্ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তওবা করেছে তাকে সেই গোনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেন।—(কুরতুবী)

কোন কোন নামের ব্যতিক্রম ঃ কোন কোন লোকের এমন নাম খ্যাত হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ, কিন্তু এই নাম ব্যতীত কেউ তাকে চেনে না। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে এই নামে ডাকা জায়েয। এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত, যেমন কোন কোন মুহাদ্দিসের নামের সাথে احدب—اعرج ইত্যাদি খ্যাত আছে। খোদ রসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক অপেক্ষাকৃত লম্বা হাতবিশিষ্ট সাহাবীকে ذو اليدين নামে পরিচিত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ হাদীসের সনদে কতক নামের সাথে কিছু পদবী যুক্ত হয়, যেমন مروان الا صفر - سليمان الا عمش - حميد الطويل ইত্যাদি এসব। পদবী সহকারে নাম উল্লেখ করা জায়েয কি না? তিনি বললেন ঃ দোষ বর্ণনা করার ইচ্ছা না থাকলে এবং পরিচয় পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকলে জায়েয।—(কুরতুবী)

ভাল নামে ডাকা সুন্নত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মু'মিনের হক অপর মু'মিনের উপর এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে। এ কারণেই আরবে ডাক নামের ব্যাপক প্রচলন ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তা পছন্দ করেছিলেন। তিনি বিশেষ বিশেষ সাহাবীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন—হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে 'আতীক,' হযরত ওমর (রা)-কে 'ফারুক,' হযরত হামযা (রা)-কে 'আসাদুল্লাহ্' এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে 'সাইফুল্লাহ্' পদবী দান করেছিলেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

---

(১২) হে মু'মিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত

তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্। (তাই ধারণার যত প্রকার আছে, সবগুলোর বিধান জেনে নাও যে, কোন্ ধারণা জায়েয এবং কোনটি নাজায়েয। এরপর জায়েয ধারণার মধ্যেই থাক)। এবং (কারও দোষের) সন্ধান করো না। কেউ যেন কারও গীবত তথা পশ্চাতে নিন্দাও না করে। (এরপর গীবতের নিন্দা করে বলা হয়েছে) তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করবে? একে তো তোমরা (অবশ্যই) খারাপ মনে কর (অতএব বুঝে নাও যে, কোন ভ্রাতার গীবতও এরই মত)। আল্লাহ্কে ভয় কর (গীবত পরিত্যাগ করে তওবা করে নাও)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই আয়াতেও পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি ব্যক্ত হয়েছে এবং এতেও তিনটি বিষয় হারাম করা হয়েছে। এক. ظن তথা ধারণা ; দুই. تجسس অর্থাৎ কোন গোপন দোষ সন্ধান করা ; এবং তিন. গীবত অর্থাৎ কোন অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে শুনলেও অসহনীয় মনে করত। প্রথম বিষয় ظن এর অর্থ প্রবল ধারণা। এ সম্পর্কে কোরআন প্রথমত বলেছে যে, অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক ; এরপর কারণ-স্বরূপ বলা হয়েছে, কতক ধারণা পাপ। এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। অতএব কোন্ ধারণা পাপ, তা জেনে নেওয়া ওয়াজিব হবে, যাতে তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় এবং জায়েয না জানা পর্যন্ত তার কাছেও না যায়। আলিম ও ফিকহ্‌বিদগণ এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কুরতুবী বলেন ঃ ধারণা বলে এ স্থলে অপবাদ বোঝানো হয়েছে ; অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে শক্তিশালী প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন দোষ অথবা গোনাহ্ আরোপ করা। ইমাম আবু বকর জাসসাস 'আহকামুল কোরআন' গ্রন্থে এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ধারণা চার প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার হারাম, দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজিব, তৃতীয় প্রকার মুস্তাহাব এবং চতুর্থ প্রকার জায়েয। হারাম ধারণা এই যে, আল্লাহ্র প্রতি কুধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দেবেন অথবা বিপদেই রাখবেন। এটা যেন আল্লাহ্র মাগফিরাত ও রহমত থেকে নৈরাশ্য। হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا يموتن احد كم الا و هو يحسن الظن بالله তোমাদের কারও আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়। অন্য এক হাদীসে আছে انا عند ظن عبد ى بى —অর্থাৎ আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে। এখন তার আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক। এ থেকে

জানা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ফরয এবং কুধারণা পোষণ করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কুধারণা পোষণ করা হারাম। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث অর্থাৎ ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর। এখানে সবার মতেই ধারণা বলে প্রমাণ ব্যতিরেকে মুসলমানের প্রতি কুধারণা বোঝানো হয়েছে। যেসব কাজের কোন এক দিককে আমলে আনা আইনত জরুরী এবং সে সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই, সেখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব; যেমন পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও মোকদ্দমার ফয়সালায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া। কারণ, যে বিচারকের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়, তার জন্য ফয়সালা দেওয়া জরুরী ও ওয়াজিব এবং এই বিশেষ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে কোন বর্ণনা নেই। এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা বিচারকের জন্য জরুরী। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরও মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকে। তার সত্যবাদিতা নিছক একটা প্রবল ধারণা মাত্র। সেমতে এই ধারণা অনুযায়ী আমল করাই ওয়াজিব। এমনিভাবে যে জায়গায় কিবলার দিক অজ্ঞাত থাকে এবং জেনে নেওয়ার মত কোন লোকও না থাকে, সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তির উপর কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হলে সেই বস্তুর মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারেও প্রবল ধারণা অনুযায়ীই আমল করা ওয়াজিব। জায়েয ধারণা এমন, যেমন নামাযের রাক'আত সম্পর্কে সন্দেহ হল যে, তিন রাক'আত পড়া হয়েছে, না চার রাক'আত। এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়েয। যদি সে প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ তিন রাক'আত সাব্যস্ত করে চতুর্থ রাক'আত পড়ে নেয়, তবে তাও জায়েয। প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। এর জন্য সওয়াবও পাওয়া যায়।—(জাসসাস)

কুরতুবী বলেন : কোরআনে বলা হয়েছে :

لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا—এতে মু'মিনদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার তাকীদ আছে। অপর পক্ষে একটি সুবিদিত বাক্য আছে ان من الحزم سوء الظن —অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রতি কুধারণা পোষণ করাই সাবধানতা। এর উদ্দেশ্য এই যে, কুধারণার বশবর্তী হয়ে যেরূপ ব্যবহার করা হয়, প্রত্যেকের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ আস্থা ব্যতিরেকে নিজের জিনিস কাউকে সোপর্দ করবে না। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অপরকে চোর মনে করে লাঞ্ছিত করবে। মোটকথা, কোন ব্যক্তিকে চোর অথবা বিশ্বাসঘাতক মনে না করে নিজের ব্যাপারে সতর্ক হবে। শেখ সাদী (র)-র নিম্নোক্ত উক্তির অর্থই তাই।

نگه دار وآں شوخ در کیسه در - که دانده همه خلق را کیسه بر

আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে تجسس, অর্থাৎ কারও দোষ সন্ধান করা। এই শব্দে দুটি কিরাআত আছে। এক. لا تجسسوا —জীম সহকারে, এবং দুই লা تحسسوا হ্যা সহকারে। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে لا تجسسوا و لا تحسسوا উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। অধিকাংশ উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, জীম সহকারে تجسس এর অর্থ কোন গোপন বিষয় সন্ধান করা এবং হ্যা সহকারে تحسس এর অর্থ সাধারণ সন্ধান করা। সূরা ইউসুফে تَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ আয়াতে এই অর্থই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে দোষ তোমার সামনে আছে, তা ধরতে পার, কিন্তু কোন মুসলমানের যে দোষ প্রকাশ্য নয়, তা সন্ধান করা জায়েয নয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

لا تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم فان من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته ـ

মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ্ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ্ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন। —(কুরতুবী)

বয়ানুল কোরআনে আছে গোপনে অথবা নিদ্রার ভান করে কারও কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ, تجسس-এর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলমানের হিফাযতের উদ্দেশ্য থাকে, তবে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান জায়েয। আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে গীবত। অর্থাৎ কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কষ্টকর কথাবার্তা বলা, যদিও তা সত্য কথা হয়। কেননা, মিথ্যা হলে সেটা অপবাদ, যা কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা হারাম। এখানে 'অনুপস্থিতিতে' কথা থেকে এরূপ বোঝা সঙ্গত নয় যে, উপস্থিতিতে কষ্টকর কথা বলা জায়েয হবে। কেননা, এটা গীবত নয়, কিন্তু لمز তথা দোষ বের করার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী আয়াতে এর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে।

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا—এই আয়াত কোন মুসলমানের বেইজ্জতী ও অপমানকে তার মাংস খাওয়ার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত থাকলে এই বেইজ্জতী জীবিত মানুষের মাংস টেনে টেনে ভক্ষণ করার সমতুল্য হবে। لمز শব্দের মাধ্যমে কোরআন একে হারাম সাব্যস্ত করেছে, যেমন বলা হয়েছে, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ এবং আরও পরে এক আয়াত আসবে وَيْلٌ لِّكُلِّ

هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত না থাকলে তার পশ্চাতে কষ্টদায়ক কথাবার্তা বলা মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য। মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণ করলে যেমন তার কোন কষ্ট হয় না, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত গীবতের কথা না জানে, তারও কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু কোন মৃত মুসলমানের মাংস খাওয়া যেমন হারাম ও চূড়ান্ত নীচতা, তেমনি গীবত করাও হারাম এবং নীচতা। কারণ, অসাক্ষাতে কাউকে মন্দ বলা কোন বীরত্বের কাজ নয়।

এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গীবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলমানের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য প্রকাশ করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, কারও উপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করা পীড়াদানের কারণে হারাম, কিন্তু তার প্রতিরোধ সে নিজেও করতে পারে। প্রতিরোধের আশংকায় প্রত্যেকেরই এরূপ দোষ প্রকাশ করার সাহসও হয় না এবং এটা স্বভাবতই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে গীবতের মধ্যে কোন প্রতিরোধকারী থাকে না। নীচ থেকে নীচতর ব্যক্তি কোন উচ্চতর ব্যক্তির গীবত অনায়াসে করতে পারে। প্রতিরোধ না থাকার কারণে এর ধারা সাধারণত দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং এতে মানুষ লিপ্তও হয় বেশী। এসব কারণে গীবতের নিষিদ্ধতার উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে যে, কেউ গীবত শুনলে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধের শক্তি না থাকলে কমপক্ষে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনাও নিজে গীবত করার মতই।

হযরত মায়মূন (রা) বলেন ঃ একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে—একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম ঃ আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল ঃ কারণ, তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো তার সম্পর্কে কখনও কোন ভালমন্দ কথা বলিনি। সে বলল ঃ হ্যাঁ, একথা ঠিক, কিন্তু তুমি তার গীবত শুনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছ। এই ঘটনার পর হযরত মায়মূন (রা) নিজে কখনও কারও গীবত করেন নি এবং তাঁর মজলিসে কারও গীবত করতে দেন নি।

হযরত হাসান ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত শবে মি'রাজের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমাকে নিয়ে যাওয়া হলে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহের মাংস আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম—এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা তাদের ভাইয়ের গীবত করত এবং তাদের ইজ্জতহানি করত।—(মাযহারী)

হযরত আবূ সায়ীদ (রা) ও জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, الغيبة اشد من الزنا অর্থাৎ গীবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক গোনাহ্। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার

পর তওবা করলে তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু যে গীবত করে, তার গোনাহ্ প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না।—(মাযহারী)

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীবতের মাধ্যমে আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করা হয়। তাই যার গীবত করা হয়, তার কাছ থেকে মাফ নেওয়া জরুরী। কোন কোন আলিম বলেন : যার গীবত করা হয়, গীবতের সংবাদ তার কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত বান্দার হক হয় না। তাই তার কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়া জরুরী নয়। —(রাহুল মা'আনী) কিন্তু বয়ানুল কোরআনে একথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে : এমতাবস্থায় যদিও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরী নয়, কিন্তু যার সামনে গীবত করা হয়, তার সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং নিজ গোনাহ্ স্বীকার করা জরুরী। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, কিংবা লাপাত্তা হয়ে যায়, তবে তার কাফ্ফারা এই যে, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাতের দোয়া করবে এবং এরূপ বলবে : হে আল্লাহ্! আমার ও তার গোনাহ্ মাফ কর। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাই বলেছেন।

মাস'আলা : শিশু, উন্মাদ এবং কাফির যিম্মীর গীবতও হারাম। কেননা, তাদেরকে পীড়া দেওয়াও হারাম। হরবী কাফিরকে পীড়া দেওয়া হারাম না হলেও নিজের সময় নষ্ট করার কারণে তার গীবতও মাকরূহ।

মাস'আলা : গীবত যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। উদাহরণত খঞ্জকে হেয় করার উদ্দেশ্যে তার মত হেঁটে দেখানো।

মাস'আলা : কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে সব গীবতকেই হারাম করা হয়নি এবং কতক গীবতের অনুমতি আছে। উদাহরণত কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারও দোষ বর্ণনা করা জরুরী হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, তবে প্রয়োজন ও উপযোগিতাটি শরীয়তসম্মত হতে হবে। উদাহরণত কোন অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী এমন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করা, যে তার অত্যাচার দূর করতে সক্ষম। কারও সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা, কোন ঘটনা সম্পর্কে ফতওয়া গ্রহণ করার জন্য ঘটনার বিবরণ দান করা, মুসলমানদেরকে কোন ব্যক্তির সাংসারিক অথবা পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য তার অবস্থা বর্ণনা করা, কোন ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহ্ করে এবং নিজের পাপাচারকে নিজেই প্রকাশ করে, তার কুকর্ম আলোচনা করাও গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নিজের সময় নষ্ট করার কারণে মাকরূহ। —(বয়ানুল কোরআন, রাহুল-মা'আনী) এসব মাস'আলায় অভিন্ন বিষয় এই যে, কারও দোষ আলোচনা করার উদ্দেশ্য তাকে হেয় করা না হওয়া চাই, বরং প্রয়োজনবশতই আলোচনা হওয়া চাই।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا

وَ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

(১৩) হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহিযগার। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানব, আমি তোমাদের (সবাই)-কে এক পুরুষ ও এক নারী (অর্থাৎ আদম হাওয়া) থেকে সৃষ্টি করেছি। (তাই এদিক দিয়ে সব মানুষ সমান) এবং (এরপর যে পার্থক্য রেখেছেন যে) তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও (জাতির মধ্যে) বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন, (এটা শুধু এ জন্য) যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। (এতে অনেক উপযোগিতা রয়েছে। এজন্য নয় যে, তোমরা পরস্পরে গর্বিত হবে। কেননা) আল্লাহ্‌র কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহিযগার। (পরহিযগারীর পুরোপুরি অবস্থা কেউ জানে না, বরং এটা একমাত্র) আল্লাহ্ তা'আলা পুরোপুরি জানেন এবং পুরোপুরি খবর রাখেন (অতএব তোমরা কোন বংশমর্যাদা ও জাতিত্ব নিয়ে গর্ব করো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরের আয়াতসমূহে মানবিক ও ইসলামী অধিকার এবং সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে মানবিক সাম্যের একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা রয়েছে যে, কোন মানুষ অপর মানুষকে যেন নীচ ও ঘৃণ্য মনে না করে এবং নিজের বংশগত মর্যাদা, পরিবার, অথবা ধন-সম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে গর্ব না করে। কেননা, এগুলো প্রকৃত-পক্ষে গর্বের বিষয় নয়। এই গর্বের কারণে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই বলা হয়েছে : সব মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান হওয়ার দিক দিয়ে ভাই ভাই এবং পরিবার, গোত্র, অথবা ধন-দৌলতের দিক দিয়ে যে প্রভেদ আল্লাহ্ তা'আলা রেখেছেন, তা গর্বের জন্য নয়, পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য।

শানে-নুযূল : এই আয়াত মক্কা বিজয়ের সময় তখন নাযিল হয়, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত বিলাল হাবশী (রা)-কে মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন। এতে মক্কার অমুসলমান কোরাইশদের একজন বলল : আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে, আমার পিতা পূর্বেই মারা গেছেন। তাকে এই কুদিন দেখতে হয়নি। হারেস ইবনে হিশাম বলল : মুহাম্মদ কি মসজিদে-হারামে আযান দেওয়ার জন্য এই কাল কাক ব্যতীত অন্য কোন মানুষ পেলেন না? আবু

সুফিয়ান বললঃ আমি কিছুই বলব না, কারণ, আমার আশংকা হয় যে, আমি কিছু বললেই আকাশের মালিক তার (মুহাম্মদের) কাছে তা পৌঁছিয়ে দেবেন। এসব কথা-বার্তার পর জিবরাঈল (আ) আগমন করলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের সব কথাবার্তা বলে দিলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা কি বলেছিলে? অগত্যা তাদেরকে স্বীকার করতে হল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, গর্ব ও ইজ্জতের বিষয় প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও তাকওয়া, যা তোমাদের মধ্যে নেই এবং হযরত বিলাল (রা)-এর মধ্যে আছে। তাই তিনি তোমাদের চাইতে উত্তম ও সম্ভ্রান্ত। —(মাযহারী) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করেন। (যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পারে)। তওয়াফ শেষে তিনি এই ভাষণ দেন:

الحمد لله الذى اذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها - الناس رجلان بر تقى كريم على الله وفاجر شقى هين على الله ثم تلا يا ايها الناس انا خلقناكم الاية -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি অন্ধকার যুগের গর্ব ও অহংকার তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। এখন সব মানুষ মাত্র দুই ভাগে বিভক্তঃ এক. সৎ, পরহিযগার ও আল্লাহ্‌র কাছে সম্ভ্রান্ত, দুই. পাপাচারী, হতভাগা ও আল্লাহ্‌র কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।—(তিরমিযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ দুনিয়ার মানুষের কাছে ইজ্জত হচ্ছে ধন-সম্পদের নাম এবং আল্লাহ্‌র কাছে ইজ্জত পরহিযগারীর নাম।

شعوبا و قبائل — شعوب শব্দটি شعب-এর বহুবচন। এর অর্থ এক মূল থেকে উদ্ভূত বিরাট দল, যার মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও পরিবার থাকে। বড় পরিবার এবং তার বিভিন্ন অংশের জন্যও আলাদা আলাদা নাম আছে। সর্ববৃহৎ অংশকে شعب এবং ক্ষুদ্রতম অংশকে عشيرة বলা হয়। আবু রওয়াক বলেনঃ অনারব জাতিসমূহের বংশে পরিচয় সংরক্ষিত নেই। তাদেরকে شعوب বলা হয় এবং আরব জাতিসমূহের বংশে পরিচয় সংরক্ষিত আছে, তাদেরকে قبائل বলা হয়। اسباط শব্দটি বনী ইসরাঈলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বংশগত, দেশগত, অথবা ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য পারস্পরিক পরিচিতিঃ কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ফুটিয়ে তুলেছে যে, যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন, কিন্তু তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষের পরিচিতি ও সনাক্তকরণ সহজ হয়। উদাহরণত এক নামের দুই ব্যক্তি থাকলে পরিবারের পার্থক্য দ্বারা তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। মোটকথা, বংশগত পার্থক্যকে পরিচিতির জন্য ব্যবহার কর—গর্বের জন্য নয়।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

(১৪) মরুবাসীরা বলেঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুনঃ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি, বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (১৫) তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। (১৬) বলুনঃ তোমরা কি তোমাদের ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (১৭) তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং আল্লাহ্ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক। (১৮) আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় জানেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(বনূ আসাদ প্রমুখ গোত্রের কতক) মরুবাসী (আপনার কাছে এসে ঈমানের দাবী করে। এ ব্যাপারে তারা কয়েকটি গোনাহ্ করে। এক. মিথ্যা ভাষণ; কারণ, আন্তরিক বিশ্বাস ব্যতিরেকেই কেবল মুখে) বলে: আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলে দিন: তোমরা ঈমান আননি (কেননা, ঈমান আন্তরিক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল, তা তোমাদের মধ্যে নেই, যেমন ولما يدخل الايمان বাক্যে বলা হবে) বরং বল, (আমরা বিরোধিতা ত্যাগ করে) বশ্যতা স্বীকার করেছি। (এই বশ্যতা স্বীকার অর্থাৎ বিরোধিতা পরিত্যাগ শুধু বাহ্যিক আনুকূল্যের মাধ্যমেও হয়ে যায়)। এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। (কাজেই ঈমানের দাবী করো না। যদিও এ পর্যন্ত ঈমান আননি, কিন্তু এখনও) যদি আল্লাহ্ ও রসূলের (সকল বিষয়ে) আনুগত্য স্বীকার কর (এবং আন্তরিকভাবে ঈমান আন) তবে তোমাদের (ঈমান পরবর্তী) কর্ম (শুধু অতীত কুফরের কারণে) কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না (বরং পুরোপুরি সওয়াব দেওয়া হবে)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (এখন শোন, কামিল মু'মিনকে, যাতে তোমরা মু'মিন হতে চাইলে তদ্রূপ হও) তারাই পুরোপুরি মু'মিন যারা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর (তা সারা জীবন অব্যাহত রাখে, অর্থাৎ কখনও) সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ ধর্মের জন্য) প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা সংগ্রাম করে। (জিহাদ ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত)। তারাই সত্যনিষ্ঠ (অর্থাৎ পুরোপুরি সত্যনিষ্ঠ। শুধু ঈমান থাকলেও সত্যনিষ্ঠ হতো। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কিছুই নেই, অথচ তোমরা দাবী করছ পূর্ণ ঈমানের। সুতরাং তাদের এক মন্দ কর্ম তো হচ্ছে মিথ্যা ভাষণ, যেমন আল্লাহ্ বলেন: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امنا ... وما هم بمؤمنين এবং দ্বিতীয় মন্দ কর্ম এই যে, তারা ধোঁকা দেয়, যেমন আল্লাহ্ বলেন: يُخَادِعُونَ اللهَ অতএব) আপনি বলে দিন: তোমরা কি তোমাদের ধর্ম (গ্রহণ করা) সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে অবহিত করছ? (অর্থাৎ আল্লাহ্ জানেন যে তোমরা ধর্ম গ্রহণ করনি। এমতাবস্থায় যে, তোমরা ধর্ম গ্রহণ করার দাবী করছ; এতে [illegible] আল্লাহ্‌র জ্ঞানের বিপরীতে তোমরা আল্লাহ্‌কে একথা বলে যাচ্ছ) অথচ (এটা অসম্ভব, কেননা,) আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে এবং (এছাড়াও) আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (এ বিষয়ের [illegible] যে, তোমাদের ঈমান-না আনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র জ্ঞানই নির্ভুল। তাদের তৃতীয় মন্দ কর্ম এই) তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে [illegible] মনে করে (এটা চরম মূর্খতা। [illegible] এই [illegible] আমরা বিনা যুদ্ধে মুসলমান হয়ে গেছি [illegible])। আপনি বলে দিন: তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে [illegible]

মনে করো না। (কেননা, ধৃষ্টতা বাদ দিলেও তোমাদের মুসলমান হওয়াতে আমার কি উপকার হয়েছে এবং মুসলমান না হওয়াতে আমার কি ক্ষতি? তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদেরই পরকালের উপকার এবং মিথ্যাবাদী হলে তোমাদেরই ইহকালের উপকার আছে অর্থাৎ তোমরা হত্যা, কারাবাস ইত্যাদি থেকে বেঁচে গেছ। অতএব আমাকে ধন্য করেছ মনে করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা।) বরং আল্লাহ্ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন। যদি তোমরা (ঈমানের এই দাবীতে) সত্যবাদী হও। (কেননা, ঈমান একটি বড় নিয়ামত, আল্লাহ্‌র শিক্ষা ও তওফীক ব্যতীত অর্জিত হয় না। এমন বড় নিয়ামত দান করেছেন, এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। সুতরাং ধোঁকা ও ধন্য করেছ মনে করা থেকে বিরত হও। মনে রেখো,) আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব অদৃশ্য বিষয় জানেন। (এই ব্যাপক জ্ঞানের কারণে) তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তাও জানেন। (এই জ্ঞান অনুযায়ীই তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন। অতএব তাঁর সামনে মিথ্যা বলার ফায়দা কি?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হচ্ছে পরহিযগারী। এই পরহিযগারী একটি অপ্রকাশ্য বিষয়, যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কোন ব্যক্তির পক্ষেই পবিত্রতার দাবী করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, ঈমানের আসল ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে শুধু মুখে নিজেকে মু'মিন বলা ঠিক নয়। সমগ্র সূরার প্রথমে নবী করীম (সা)-এর হক অতঃপর পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে বলা হচ্ছে যে, আন্তরিক বিশ্বাস এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালে সৎকর্ম গ্রহণীয় হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত।

শানে-নুযূল: ইমাম বগভী (র)-র বর্ণনা অনুযায়ী আয়াত অবতরণের ঘটনা এই যে, বনূ আসাদের কতিপয় ব্যক্তি নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়। তারা অন্তরগতভাবে মু'মিন ছিল না। শুধু সদকা-খয়রাত লাভের জন্য তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিল। বাস্তবে মু'মিন না হওয়ার কারণে ইসলামী বিধি-বিধান ও রীতিনীতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ও বেখবর ছিল। মদীনার পথে ঘাটে তারা মলমূত্র ও আবর্জনা ছড়িয়ে দিল এবং বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়ে দিল। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে একে তো ঈমানের মিথ্যা দাবী করল, দ্বিতীয়ত তাঁকে ধোঁকা দিতে চাইল এবং তৃতীয়ত মুসলমান হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ধন্য করেছে বলে প্রকাশ করল। তারা বলল: অন্যান্য লোক দীর্ঘকাল পর্যন্ত আপনার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে, অনেক যুদ্ধ করেছে, এরপর মুসলমান হয়েছে। কিন্তু আমরা কোনরূপ যুদ্ধ ছাড়াই আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছি। কাজেই আমাদের সদিচ্ছাকে মূল্য দেওয়া দরকার। এটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শানে একপ্রকার ধৃষ্টতা। কারণ, এই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করার পেছনে মুসলমানদের সদকা-খয়রাত দ্বারা নিজেদের দারিদ্র্য দূর করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যদি তারা বাস্তবিকই খাঁটি মুসলমান হয়ে যেত, তবে এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নয়—বরং তাদেরই উপকার হিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য

আয়াতসমূহ নাযিল হয় এবং তাদের মিথ্যা দাবী ও অনুগ্রহ প্রকাশের মুখোশ উন্মোচন করা হয়।

وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا—তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না, শুধু বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তারা মিথ্যা দাবী করছিল। তাই কোরআন তাদের ঈমান না থাকা এবং ঈমানের দাবী মিথ্যা হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছে ঃ তোমাদের 'ঈমান এনেছি' বলা মিথ্যা। তোমরা বড় জোর اسلمنا 'ইসলাম কবুল করেছি' বলতে পার। কেননা, ইসলামের শাব্দিক অর্থ বাহ্যিক কাজেকর্মে আনুগত্য করা। তারা তাদের ঈমানের দাবী সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য কিছু কাজকর্ম মুসলমানদের মত করতে শুরু করেছিল। তাই আক্ষরিক দিক দিয়ে এক প্রকার আনুগত্য হয়ে গিয়েছিল। অতএব আভিধানিক অর্থে اسلمنا বলা শুদ্ধ ছিল।

ইসলাম ও ঈমানে সম্পর্ক আছে কি ঃ উপরের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ইসলামের আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে—পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। তাই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ হতে পারে না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পারিভাষিক পার্থক্য আছে। পারিভাষিক ঈমান ও পারিভাষিক ইসলাম অর্থের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। শরীয়তের পরিভাষায় অন্তরগত বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, অর্থাৎ অন্তর দ্বারা আল্লাহর একত্ব ও রসূলের রিসালতকে সত্য জানা। পক্ষান্তরে বাহ্যিক কাজকর্মে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরীয়তে অন্তরগত বিশ্বাস ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ তার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্মে প্রতিফলিত না হয়। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুখে কালিমার স্বীকারোক্তি করা। এমনিভাবে ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্মের নাম হলেও শরীয়তে ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি না হয়। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে সেটা হবে 'নিফাক' তথা মুনাফিকী। এভাবে ইসলাম ও ঈমান সূচনা ও শেষ প্রান্তের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজকর্ম পর্যন্ত পৌঁছে এবং ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে শুরু হয়ে অন্তরের বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলাম ও ঈমান একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান ইসলাম ব্যতীত ধর্তব্য নয় এবং ইসলাম ঈমান ব্যতীত শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তে এটা অসম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে—মু'মিন হবে না এবং মু'মিন হবে—মুসলিম হবে না। এটা পারিভাষিক ইসলাম ও ঈমানের বেলায়ই প্রযোজ্য। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এটা সম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে—মু'মিন হবে না, যেমন মুনাফিকদের অবস্থা তাই ছিল। বাহ্যিক আনুগত্যের কারণে তাদেরকে মুসলিম বলা হত, কিন্তু অন্তরে ঈমান না থাকার কারণে তারা মু'মিন ছিল না

سورة ق

সূরা ক্বাফ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৫, আয়াত ৩ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ

فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَیْءٌ عَجِيْبٌ ۝ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ

ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ

وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ

فِیْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا

وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا

رَوَاسِیَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍ ۝ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰی

لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا

بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝ كَذَّبَتْ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۝ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ

لُوْطٍ ۝ وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۝

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِیْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

(১) সম্মানিত কোরআনের শপথ, (২) বরং তারা তাদের মধ্য থেকেই একজন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেছে দেখে বিস্ময় বোধ করে। অতঃপর কাফিররা বলে: এটা আশ্চর্যের ব্যাপার! (৩) আমরা মরে গেলে এবং মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি পুনরুত্থিত হব? এ প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। (৪) মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস করবে, তা আমার জানা আছে এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত কিতাব। (৫) বরং তাদের কাছে সত্য আগমন করার পর তারা তাকে মিথ্যা বলছে। ফলে তারা সংশয়ে পতিত রয়েছে। (৬) তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না—আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই। (৭) আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার বোঝা স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি, (৮) প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্য জ্ঞান ও স্মরণিকাস্বরূপ। (৯) আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্বারা বাগান ও শস্য উদগত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয় (১০) এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর, (১১) বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত দেশকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে। (১২) তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহের সম্প্রদায়, কূপবাসীরা এবং সামূদ সম্প্রদায়, (১৩) আদ, ফিরাউন ও লূতের সম্প্রদায়, (১৪) বনবাসীরা এবং তুব্বা সম্প্রদায়। প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে, অতঃপর আমার শাস্তির যোগ্য হয়েছে। (১৫) আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ক্বাফ (-এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন)। সম্মানিত কোরআনের শপথ (অর্থাৎ অন্যান্য কিতাবের চাইতে শ্রেষ্ঠ। আমি আপনাকে কিয়ামতের ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছি, কিন্তু তারা মানে না,) বরং তারা এ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে (অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে) একজন ভয় প্রদর্শনকারী (পয়গম্বর) আগমন করেছেন, (যিনি তাদেরকে কিয়ামতের ভয় প্রদর্শন করেন)। অতঃপর কাফিররা বলে: (প্রথমত) এটা এক বিস্ময়ের ব্যাপার (যে, মানুষ পয়গম্বর হবে, দ্বিতীয়ত সে এক অদ্ভুত বিষয়ের দাবী করবে যে, আমরা পুনরায় জীবিত হব)। আমরা যখন মরে যাব এবং মৃত্তিকায় পরিণত হব, এরপরও কি পুনরুত্থিত হব? এই পুনরুত্থান সুদূরপরাহত। (মোটকথা এই যে, প্রথমত সে আমাদের মতই মানুষ। পয়গম্বরীর দাবী করার অধিকার তার নেই। দ্বিতীয়ত সে একটি অসম্ভব বিষয়ের দাবী করে অর্থাৎ আমরা মৃত্যুর পরও মাটি হয়ে যাওয়ার পর পুনরুত্থিত হব। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার সম্ভাব্যতা প্রমাণিত করে তাদের উক্তি খণ্ডন করেছেন। এর সার-সংক্ষেপ এই যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করার দুটি কারণ হতে পারে। এক. যেসব বিষয়ের পুনরুত্থিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর পুনরুত্থানের যোগ্যতাই না থাকা। এটা প্রত্যক্ষভাবে

ভ্রান্ত। কেননা, সেগুলো বর্তমানে তোমাদের সামনে জীবিত উপস্থিত আছে। জীবিত হওয়ার যোগ্যতাই না থাকলে বর্তমানে কিরূপে জীবিত আছে? দুই. আল্লাহ্ তা'আলার পুনরায় জীবিত করার শক্তি না থাকা, এ কারণে যে, মৃতের যেসব অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, সেগুলো কোথায় কোথায় পড়ে আছে, তা জানা নেই। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: আমার জ্ঞানের অবস্থা এই যে,) মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস করে, তা আমার জানা আছে এবং (আজ থেকেই জানি না, বরং আমার জ্ঞান চিরকালের। এমনকি, ঘটনার পূর্বেই সব বস্তুর সব অবস্থা আমি আমার চিরাগত জ্ঞানের সাহায্যে এক কিতাবে অর্থাৎ 'লওহে মাহ্ফুযে' লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলাম এবং এখন পর্যন্ত) আমার কাছে (সেই) কিতাব (অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুয) সংরক্ষিত আছে। তাতে এসব বিক্ষিপ্ত অংশের স্থান, রকম, পরিমাণ ও গুণ সবকিছু আছে। চিরাগত জ্ঞান কেউ বুঝতে না পারলে তার এরূপ বুঝে নেওয়া উচিত যে, যে দফতরে সবকিছু আছে, তা আল্লাহর সামনে উপস্থিত। কিন্তু তারা এরপর অহেতুক বিস্ময় বোধ করে; শুধু বিস্ময়ই নয়) বরং সত্য কথা নবুওয়ত ও পরকালে পুনরুত্থান ও) যখন তাদের কাছে পৌঁছে তখন তাকে মিথ্যা বলে। তারা এক দোদুল্যমান অবস্থায় পতিত আছে (কখনও বিস্ময় বোধ করে, কখনও মিথ্যা বলে। এটা ছিল মধ্যবর্তী বাক্য। এরপর কুদরত বর্ণিত হচ্ছে:) তারা কি (আমার কুদরতের কথা জানে না এবং তারা কি) উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না? আমি কিভাবে তা (সমুন্নত ও বৃহৎ) নির্মাণ করেছি এবং (তারকা দ্বারা) সুশোভিত করেছি, তাতে (মজবুতির কারণে) ফাটলও নেই (যেমন অধিকাংশ নির্মাণকাজে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর ফাটল দেখা দেয়। আমার এই কুদরত আকাশে)। ভূমিকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার বোঝা স্থাপন করেছি, এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদ্গত করেছি, যা প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জ্ঞান ও বোঝার উপায় (অর্থাৎ এমন বান্দার জন্য, যে সৃষ্ট জগতকে এভাবে দেখে যে, এগুলো কে সৃষ্টি করেছে? এ থেকেও আমার কুদরত প্রকাশমান যে,) আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্বারা আমি বাগান ও শস্যরাজি উদ্গত করি এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। আমি বৃষ্টি দ্বারা মৃত দেশকে জীবিত করি। এমনিভাবে (বুঝে নাও যে,) মৃতদের পুনরুত্থান ঘটবে। (কেননা, আল্লাহ্র সত্তাগত কুদরতের সামনে সবকিছুই সমান; বরং যে সত্তা বৃহৎ বস্তুসমূহ সৃষ্টি করতে সক্ষম, সে যে ক্ষুদ্র বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, তা বলাই বাহুল্য। এ কারণেই এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এগুলো সৃষ্টি করা একটি মৃতকে পুনরুজ্জীবন দান করার চাইতে অনেক বড় কাজ। আল্লাহ্ বলেন: لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ অতএব এসব বড় বড় কাজ করতে যিনি সক্ষম, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম হবেন না কেন? কাজেই জানা গেল মৃতকে জীবিত করা অসম্ভব নয়—সম্ভবপর এবং জীবিতকারী আল্লাহ্র কুদরত অপার। এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ অথবা প্রত্যাখ্যান করার কি কারণ থাকতে পারে। অতঃপর যারা প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য অতীত সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা যেমন কিয়ামত অস্বীকার করে রসূলকে মিথ্যাবাদী

বলে, তেমনি) তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহের সম্প্রদায়, কূপবাসীরা, সামূদ ও আদ সম্প্রদায়, ফিরাউন, লূতের সম্প্রদায়, বনবাসীরা এবং তুব্বা সম্প্রদায়। (অর্থাৎ) প্রত্যেকেই পয়গম্বরগণকে (অর্থাৎ নিজ নিজ পয়গম্বরকে তওহীদ, রিসালত ও কিয়ামতের ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী বলেছে, অতঃপর আমার শাস্তির যোগ্য হয়েছে। (তাদের সবার উপর আযাব এসেছে। এমনিভাবে এদের উপরও আযাব আসবে দুনিয়াতে কিংবা পরকালে। সতর্ক করার পর আবার পূর্বের বিষয়বস্তু ভিন্ন ভংগিতে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) আমি কি প্রথম-বার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি (যে পুনর্বার জীবিত করতে পারব না। অর্থাৎ একটা সাময়িক বাধা এরূপও হতে পারত যে, কর্মী-ক্লান্ত হয়ে পড়ার কারণে কাজ করতে সক্ষম নয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের দোষ ত্রুটি থেকেও পবিত্র। তাঁর উপর কোন কিছুর প্রভাব পড়ে না এবং ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কাজেই কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে গেল। যারা কিয়ামত অস্বীকার করছে, তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই)। বরং তারা নতুন ভাবে সৃষ্টির ব্যাপারে (প্রমাণ ছাড়াই) সন্দেহ পোষণ করছে, (যা প্রমাণাদির আলোকে ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়)।

সূরা কাফের বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা কাফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা হুজুরাতের উপসংহারেও এমনি বিষয়বস্তু উল্লেখ ছিল। এটাই সূরাদ্বয়ের যোগসূত্র।

একটি হাদীস থেকে সূরা কাফের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। হাদীসে উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহের সন্নিকটেই আমার গৃহ ছিল। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রুটি পাকানোর চুল্লিও ছিল অভিন্ন। তিনি প্রতি শুক্র-বারে জুম'আর খোতবায় সূরা কাফ তিলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি আমার মুখস্থ হয়ে যায়।—(মুসলিম-কুরতুবী)

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) আবূ ওয়াকেদ লাইসী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) দুই ঈদের নামাযে কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন ঃ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ এবং قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ । হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময় সূরা কাফ তিলাওয়াত করতেন। —(সূরাটি বেশ বড়) কিন্তু এতদসত্ত্বেও নামায হাল্কা মনে হত।—(কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর তিলাওয়াতের বিশেষ প্রভাবেই বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম নামাযও মুসল্লীদের কাছে হাল্কা মনে হত।

আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় কি? أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ —বাক্য থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু একথাই সুবিদিত যে, উপরে যে নীলাভ

রঙ দৃষ্টিগোচর হয় তা শূন্যমণ্ডলের রঙ। কিন্তু আকাশের রঙও যে তাই হবে—একথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই। এ ছাড়া আয়াতে نظر শব্দের অর্থ চর্মচক্ষে দেখা না হয়ে অন্তর চক্ষে দেখা অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করাও হতে পারে। —(বয়ানুল-কোরআন)

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কিত একটি বহুল উত্থাপিত প্রশ্নের জওয়াব :

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ কাফির ও মুশরিকরা কিয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করে। তাদের সর্ববৃহৎ প্রমাণ এই বিস্ময় যে, মৃত্যুর পর মানুষের দেহের অধিকাংশ অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে দিকবিদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পানি ও বায়ু মানবদেহের প্রতিটি কণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন দান করার জন্য এই বিক্ষিপ্ত কণাসমূহের অবস্থানস্থল জানা এবং প্রত্যেকটি কণাকে আলাদাভাবে একত্র করার সাধ্য কার আছে? কোরআন পাকের ভাষায় এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, মানুষ তার সসীম জ্ঞানের মাপকাঠিতে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম জ্ঞানকে পরিমাপ করার কারণেই এই পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান এতই বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী যে, মৃত্যুর পর মানবদেহের প্রতিটি অংশ তাঁর দৃষ্টিতে উপস্থিত থাকে। তিনি জানেন মৃতের কোন্ কোন্ অংশ মৃত্তিকা গ্রাস করেছে। মানবদেহের কিছু অস্থি আল্লাহ্ তা'আলা এমন তৈরী করেছেন যে, এগুলোকে মৃত্তিকা গ্রাস করতে পারে না। অবশিষ্ট যেসব অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যায়, সেগুলো সবই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, সবগুলোকে এক জায়গায় একত্র করবেন। সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এখন প্রত্যেক মানুষের দেহ যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তাতেও সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের উপাদান সন্নিবেশিত রয়েছে। কোনটি খাদ্যের আকারে এবং কোনটি ঔষধের আকারে সন্নিবেশিত হয়ে বর্তমান মানবদেহ গঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পুনর্বার এসব উপাদানকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার পর আবার এক জায়গায় একত্র করা আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন হবে কি? মৃত্যুর পর এবং মৃত্তিকায় পরিণত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা মানবদেহের এসব উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন; শুধু তাই নয়, বরং মানব সৃষ্টির পূর্বেই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পরিবর্তন এবং মৃত্যু পরবর্তী প্রতিটি অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে 'লওহে-মাহফুযে' লিখিত আকারে বিদ্যমান আছে।

অতএব, এমন সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সম্পর্কে উপরোক্ত বিস্ময় প্রকাশ করা স্বয়ং বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ আয়াতের এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।—(বাহরে-মুহীত)

فِىْ أَمْرٍ مَّرِيْجٍ—অভিধানে مَرِيْج শব্দের অর্থ মিশ্র, যাতে বিভিন্ন প্রকার

বস্তুর মিশ্রণ থাকে এবং যার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। এরূপ বস্তু সাধারণত ফাসিদ ও দূষিত হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত আবু হুরায়রা (রা) مَرِيجٍ শব্দের অনুবাদ করেছেন ফাসিদ ও দুষ্ট। যাহ্হাক, কাতাদাহ, হাসান বসরী (র) প্রমুখ এর অনুবাদ করেছেন মিশ্র ও জটিল। উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা নবুয়ত অস্বীকার করার ব্যাপারেও এক কথার উপর অটল থাকে না। রসূলকে কখনও যাদুকর, কখনও কবি, কখনও অতিভিরবাদী এবং কখনও জ্যোতিষী বলে। তাদের কথাবার্তা স্বয়ং মিশ্র ও দুষ্ট। অতএব, কোন্ কথার জওয়াব দেওয়া যায়।

এরপর নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বিশালকায় বস্তুসমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় শক্তি বিধৃত করা হয়েছে। নভোমণ্ডল সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ — فُرُوجٍ শব্দটি فَرْج-এর বহুবচন। এর অর্থ ফাটল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশের এই বিশালকায় গোলক সৃষ্টি করেছেন। এটি মানুষের হাতে নির্মিত হলে এতে হাজারো জোড়াতালি ও ফাটলের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হত। কিন্তু তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এতে না কোন তালি আছে এবং না কোথাও ভগ্নাংশ বা সেলাইয়ের চিহ্ন আছে। আকাশগাত্রে নির্মিত দরজা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, দরজাকে ফাটল বলা হয় না।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের রিসালত ও পরকাল প্রত্যাখ্যানের বিষয় বর্ণিত হয়েছিল। এটা যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য মর্মপীড়ার কারণ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সান্ত্বনার জন্য অতীত যুগের পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন : প্রত্যেক পয়গম্বরের সাথেই কাফিররা পীড়াদায়ক আচরণ করেছে। এটা পয়গম্বরগণের চিরন্তন প্রাপ্য। এতে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী কোরআনে বারবার বর্ণিত হয়েছে। তিনি সাড়ে নয় শ বছর পর্যন্ত তাদের হিদায়তের জন্য প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তারা শুধু তাঁকে প্রত্যাখ্যানই করেনি, বরং নানাভাবে উৎপীড়নও করেছে।

أَصْحَابُ الرَّسِّ কারা? : رَس শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থে ইট, পাথর ইত্যাদি দ্বারা পাকা করা হয় না এরূপ কাঁচা কূপকে رَس বলা হয়। أَصْحَابُ الرَّسِّ বলে আযাবের পর সামূদ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদেরকে বোঝানো হয়। যাহ্হাক (র) প্রমুখ তফসীরকারের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের কাহিনী এই যে, সালেহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে চার হাজার ঈমানদার ব্যক্তি এই আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। আযাবের পর তারা এই স্থান

তাদের আদর হাযরামাউতে বসতি স্থাপন করে। হযরত সালেহ্ (আ)-ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা একটি কূপের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। অতঃপর হযরত সালেহ্ (আ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ কারণেই এই স্থানের নাম حضر موت (হাযারা-মাউত অর্থাৎ মৃত্যু হাযির হল) হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশধরদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। তাদের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তারা তাঁকে হত্যা করে। ফলে আযাবে পতিত হয় এবং তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কূপটি অকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা শ্মশানে পরিণত হয়। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই উল্লিখিত হয়েছে : وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ অর্থাৎ তাদের অকেজো কুয়া এবং মজবুত জনশূন্য দালান-কোঠা শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।

ثمود — হযরত সালেহ (আ)-এর উম্মত। তাদের কাহিনী কোরআনে বারবার উল্লিখিত হয়েছে।

عاد — বিশাল বপু এবং শক্তি ও বীরত্বে আদ জাতি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় খ্যাত ছিল। হযরত হূদ (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফরমানী করে এবং তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝনঝার আযাবে সব ফানা হয়ে যায়।

اخوان لوط — হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

اصحاب الايكة — ঘন জঙ্গল ও বনকে ايكة বলা হয়। তারা এরূপ জায়গাতেই বসবাস করত। হযরত শোয়ায়েব (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা অবাধ্যতা করে এবং আযাবে পতিত হয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।

قوم تبع — ইয়ামনের জনৈক সম্রাটের উপাধি ছিল তুব্বা। সপ্তম খণ্ডের সূরা দোখানে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا

سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ
غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ
عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ
الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ
بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾
مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

(১৬) আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (১৭) যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। (১৮) সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (১৯) মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। (২০) এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। (২১) প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে; তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। (২২) তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। (২৩) তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে: আমার কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই। (২৪) তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীকে, (২৫) যে বাধা দিত মঙ্গলজনক কাজে, সীমালংঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে। (২৬) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (২৭) তার সঙ্গী শয়তান বলবে: হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুত সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত। (২৮) আল্লাহ্ বলবেন: আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছিলাম। (২৯) আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

উপরে কিয়ামতের দিন মৃতদের জীবিত হওয়ার সম্ভাব্যতা প্রমাণিত হয়েছে। অতঃপর তার বাস্তবতা বর্ণনা করা হচ্ছে। বাস্তবতা পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই

প্রথমে এ কথাই বলা হচ্ছে ঃ) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি।— (এটা শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ) তার মনে যেসব কুচিন্তা জাগরিত হয়, আমি তা- (ও) জানি। (অতএব যেসব ক্রিয়াকর্ম তার হস্ত, পদ ও জিহ্বা দ্বারা সংঘটিত হয়, তা আরও উত্তমরূপে জানি ; বরং আমি তার হাল অবস্থা এত জানি যে, যা সে নিজেও জানে না। সুতরাং জানার দিক দিয়ে) আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। (এই ধমনী কর্তন করা হলে মানুষ মারা যায়। মানুষের সাধারণ অভ্যাসে জানোয়ারের আত্মা বের করার জন্য গ্রীবা কর্তনেরই পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। আয়াতে কলিজা থেকে উদ্ভূত এবং হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত —উভয় প্রকার ধমনী বোঝানো যেতে পারে। তবে হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত ধমনী বোঝানোই অধিক সঙ্গত। কেননা, এই প্রকার ধমনীতে আত্মা সতেজ ও রক্ত নিস্তেজ থাকে। কলিজা থেকে উদ্ভূত ধমনীর অবস্থা এর বিপরীত। যার মধ্যে আত্মার প্রভাব বেশী, এখানে সেই ধমনী বোঝানোই উপযুক্ত। সূরা হাক্কায় হৃৎপিণ্ডের ধমনী অর্থে وتين শব্দের ব্যবহার এর সমর্থন করে। আলোচ্য আয়াতে وريد শব্দ ব্যবহৃত হলেও এর আভিধানিক অর্থের মধ্যে উভয় প্রকার ধমনী দাখিল আছে। সুতরাং উদ্দেশ্য এই যে, আমি জানার দিক দিয়ে তার আত্মা ও মনের চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। অর্থাৎ মানুষ নিজের হাল-অবস্থা যেমন জানে, আমি তার হাল-অবস্থা তার চাইতেও বেশী জানি। সেমতে মানুষ তার অনেক অবস্থা জানে না। যা জানে, তা-ও অনেক সময় ভুলে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তায় এর অবকাশ নেই। যে জ্ঞান সর্বাবস্থায় হয়, তা এক অবস্থার জ্ঞানের চাইতে নিশ্চিতই বেশী হবে। সুতরাং আল্লাহ্র জ্ঞান যে মানুষের সব অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, তা প্রমাণিত হয়ে গেল। অতঃপর একে আরও জোরদার করার জন্য বলা হয়েছে যে, মানুষের ক্রিয়াকর্ম ও অবস্থা কেবল আল্লাহ্র জ্ঞানেই সংরক্ষিত নয় ; বরং বাহ্যিক তর্ককারীদের মুখ বন্ধ করার জন্য সেইসব ক্রিয়াকর্ম ফেরেশতাদের মাধ্যমে লিখিয়েও সংরক্ষিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ) যখন দুইজন গ্রহণকারী ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে (মানুষের ক্রিয়াকর্ম) গ্রহণ করতে থাকে (এবং প্রত্যেক আমল লিপিবদ্ধ করে, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ بلى ورسلنا لديهم يكتبون

আরও বলেন ঃ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون — মানুষের সব কাজকর্মের মধ্যে কথাবার্তা সর্বাধিক হালকা। কিন্তু এর অবস্থা এই যে) সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছেই সদাপ্রস্তুত প্রহরী আছে। (নেক কথা হলে ডান দিকের ফেরেশতা এবং অসৎ কথা হলে বাম দিকের ফেরেশতা তা লিপিবদ্ধ করে। মুখে উচ্চারিত এক একটি বাক্যই যখন সংরক্ষিত ও লিখিত আছে, তখন অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম সংরক্ষিত হবে না কেন ? পরকালীন জীবন ও ক্রিয়াকর্মের প্রতিদান ও শাস্তির ভূমিকা হচ্ছে মৃত্যু। তাই মানুষকে সতর্ক করার জন্য মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। কেননা, মৃত্যু থেকে উদাসীনতার ফলস্বরূপ কিয়ামত অস্বীকার করা হয়। ইরশাদ হচ্ছে—হুঁশিয়ার হয়ে যাও)। মৃত্যু-যন্ত্রণা নিশ্চিতই (নিকটে) এসে গেছে (অর্থাৎ প্রত্যেকের মৃত্যু নিকটবর্তী)।

এ থেকেই টালবাহানা (ও পলায়ন) করতে (মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি সংক্রান্ত [illegible] মধ্যে একই রূপ বিদ্যমান। কাফির ও পাপাচারী ব্যক্তির সংসারাসক্তির কারণে মৃত্যু থেকে পলায়ন আরও সুস্পষ্ট। আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহাতিশয্যে কোন বিশেষ বান্দার কাছে যদি মৃত্যু আনন্দদায়ক ও কাম্য হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়। কেননা, এটা মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসের উর্ধ্বে। এই ভূমিকা অর্থাৎ মৃত্যুর আলোচনার পর এখন আসল উদ্দেশ্য কিয়ামতের বাস্তবতা বর্ণিত হচ্ছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পুনর্বার) শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে (এতে সবাই জীবিত হয়ে যাবে)। এটা হবে শাস্তির দিন। (মানুষকে এর ভয় প্রদর্শন করা হত। অতঃপর কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী ও অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে) প্রত্যেক ব্যক্তি এভাবে (কিয়ামতের ময়দানে) আগমন করবে যে, তার সাথে (দু'জন ফেরেশতা) থাকবে (তাদের একজন) চালক ও (অপরজন তার ক্রিয়াকর্মের) সাক্ষী। [এক হাদীসে আছে এই চালক ও সাক্ষী সেই ফেরেশতাদ্বয়ই হবে, যারা জীবদ্দশায় মানুষের ডানে ও বামে বসে ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করত। (দুররে মনসূর) যদি এই হাদীস হাদীসবিদদের শর্তানুযায়ী গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে অন্য দু'জন ফেরেশতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন কেউ কেউ একথা বলেন। তারা কিয়ামতের ময়দানে পৌঁছার পর তাদের মধ্যে যে কাফির হবে, তাকে বলা হবে :] তুমি তো এই দিন সম্পর্কে বেখবর ছিলে (অর্থাৎ একে স্বীকার করতে না) এখন আমি তোমার সম্মুখ থেকে (অস্বীকার ও উদাসীনতার) যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি (এবং কিয়ামত চাক্ষুষ দেখিয়ে দিয়েছি)। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। (অনুভূতির পথে কোন বাধা নেই। দুনিয়াতেও যদি তুমি বাধা অপসারণ করে দিতে, তবে আজ তোমার সুদিন হত। অতঃপর) তার সঙ্গী (কর্ম লিপিবদ্ধকারী) ফেরেশতা [আমলনামা উপস্থিত করে বলবে : আমার কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই—(দুররে মনসূর) সেমতে আমলনামা অনুযায়ী কাফিরদের সম্পর্কে উপরোক্ত দু'জন ফেরেশতাকে আদেশ করা হবে :] তোমরা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর, যে কুফর করে, (সত্যের প্রতি) ঔদ্ধত্য পোষণ করে, সৎ কাজে বাধাদান করে এবং (দাসত্বের) সীমালংঘন করে ও (ধর্মের ব্যাপারে) সন্দেহ সৃষ্টি করে। সে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করে, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (কাফিররা যখন জানতে পারবে যে, এখন তারা চিরস্থায়ী দুর্ভোগে পতিত হবে, তখন আত্মরক্ষার্থে তারা পথভ্রষ্টকারীদেরকে অভিযোগ করে বলবে : [illegible] আমাদেরকে এরাই পথভ্রষ্ট করেছে। যেহেতু শয়তান পথভ্রষ্টকারীদের মধ্যে দাখিল ছিল, তাই বলা হয়েছে :) তার সঙ্গী শয়তান বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করিনি (যেমন তার অভিযোগ থেকে বোঝা যায়) কিন্তু (আসল ব্যাপার এই যে) সে নিজেই (স্বেচ্ছায়) সুদূর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল (আমিও অপহরণ করেছি, কিন্তু এতে জোর-জবর ছিল না। তাই তার পথভ্রষ্টতার প্রভাব আমার উপর পতিত হওয়া উচিত নয়)। ইরশাদ হবে : আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না (এটা নিষ্ফল)। আমি তো পূর্বেই তোমাদের কাছে শাস্তির খবর প্রেরণ করেছিলাম (যে, যে ব্যক্তি কুফর করবে স্বেচ্ছায় অথবা অপরের প্ররোচনায় এবং যে কুফরের আদেশ করবে স্বেচ্ছায় অথবা অপরের উস্কানিতে, তাদের সবাইকে শাস্তি [illegible] জাহান্নামের শাস্তি দেব। [illegible]) আমার কাছে (উপরোক্ত শাস্তির বিধান)

মদদদাতা হবে না (বরং তোমরা সবাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে) এবং আমি (এ ব্যাপারে) বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই। (বরং বান্দারা নিজেরাই এমন অপকর্ম করে আজ তার শাস্তি ভোগ করছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যারা হাশর ও নশর অস্বীকার করত এবং মৃতদের জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস্য-যুক্তি বহির্ভূত মনে করত, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের সন্দেহ এভাবে নিরসন করা হয়েছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানকে নিজেদের জ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিমাপ করে রেখেছ। তাই এই খটকা দেখা দিয়েছে যে, মৃতের দেহ-উপাদান মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পর এগুলোকে কিভাবে একত্র করা সম্ভব হবে? কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু আমার জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। এগুলোকে যখন ইচ্ছা একত্র করে দেওয়া আমার জন্য মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহেও আল্লাহর জ্ঞানের বিস্তৃতি ও সর্বব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে: মানুষের বিক্ষিপ্ত দেহ-উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়ার চাইতে বড় বিষয় এই যে, আমি প্রত্যেক মানুষের মনের নিভৃতে জাগরিত কল্পনাসমূহকেও সর্বদা ও সর্বাবস্থায় জানি। দ্বিতীয় আয়াতে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমি গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও মানুষের অধিক নিকটবর্তী। যে ধমনীর উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল, তাও তার এতটুকু নিকটবর্তী নয়, যতটুকু আমি নিকটবর্তী। তাই তার হাল-অবস্থা স্বয়ং তার চাইতে আমি বেশী জানি।

আল্লাহ্ গ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী—একথার তাৎপর্য:

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই আয়াতে জ্ঞানগত নৈকট্য বোঝানো হয়েছে, স্থানগত নৈকট্য উদ্দেশ্য নয়।

আরবী ভাষায় وريد শব্দের অর্থ প্রত্যেক প্রাণীর সেই সমস্ত শিরা-উপশিরা যেগুলোর দিয়ে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ জাতীয় শিরা-উপশিরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক. যা কলিজা থেকে উদ্ভূত হয়ে সারা দেহে খাঁটি রক্ত পৌঁছে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই প্রকার শিরাকেই وريد বলা হয়। দুই. যা হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত হয়ে রক্তের সূক্ষ্ম বাষ্প সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্তের এই সূক্ষ্ম বাষ্পকে রূহ্ বলা হয়। প্রথম প্রকার শিরা মোটা এবং দ্বিতীয় প্রকার শিরা চিকন হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী وريد শব্দটি কলিজা থেকে উদ্ভূত শিরার অর্থে নেওয়াই জরুরী নয়। বরং হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত ধমনীকেও আভিধানিক দিক দিয়ে وريد বলা যায়। কেননা, এতেও এক প্রকার রক্তই সঞ্চালিত হয়। এ স্থলে আয়াতের উদ্দেশ্য মানুষের অন্তরগত অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম অবগত হওয়া। তাই এ অর্থই অধিক উপযুক্ত। মোটকথা, উল্লিখিত দুই অর্থের মধ্যে যে কোন অর্থই নেওয়া

হোক সর্বাবস্থায় প্রাণীর জীবন এর উপর নির্ভরশীল। এসব শিরা কেটে দিলে প্রাণীর আত্মা বের হয়ে যায়। অতএব সারকথা এই দাঁড়াল যে, যে ধমনীর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল, আমি সে ধমনীর চাইতেও অধিক তার নিকটবর্তী অর্থাৎ তার সবকিছুই আমি জানি।

সূফী বুযুর্গগণের মতে আয়াতে কেবল জ্ঞানগত নৈকট্যই উদ্দেশ্য নয়, বরং এখানে বিশেষ এক ধরনের সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে, যার স্বরূপ ও গুণাগুণ তো কারও জানা নেই, কিন্তু এই সংলগ্নতার অস্তিত্ব অবশ্যই বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াত এবং অনেক সহীহ্ হাদীস এ তথ্যের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ অর্থাৎ সিজদা কর এবং আমার নৈকট্যশীল হয়ে যাও। হিজরতের ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলেছিলেন: إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন: إِنَّ مَعِيَ رَبِّي অর্থাৎ আমার পালনকর্তা আমার সঙ্গে আছেন। হাদীসে আছে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে সিজদায় থাকে। হাদীসে আরও আছে, আল্লাহ্ বলেন: আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে।

ইবাদতের মাধ্যমে এবং মানুষের নিজের কর্ম ফলস্বরূপ অর্জিত এই নৈকট্য বিশেষভাবে মু'মিনের জন্য নির্দিষ্ট। এরূপ মু'মিন 'আল্লাহ্র ওলী' বলে অভিহিত হন। এই নৈকট্য সেই নৈকট্য নয়, যা প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরের প্রাণের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সমভাবে রয়েছে। মোটকথা, উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মানুষের এক বিশেষ প্রকার সংলগ্নতা আছে, যদিও আমরা এর স্বরূপ ও গুণাগুণ উপলব্ধি করতে সক্ষম নই। মওলানা রূমী (র) তাই বলেন:

اتصالے بے مثال و بے قیاس - ہست رب الناس را با جان ناس

অর্থাৎ মানবাত্মার সাথে তার পালনকর্তার এমন একটা গভীর নৈকট্য বিদ্যমান, যার কোন স্বরূপ বা তুলনা বর্ণনা করা যায় না।

এই নৈকট্য ও সংলগ্নতা চোখে দেখা যায় না, বরং ঈমানী দূরদর্শিতা দ্বারা জানা যায়। তফসীরে মাযহারীতে এই নৈকট্য ও সংলগ্নতাকেই আয়াতের মর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে জ্ঞানগত সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর এই দুই অর্থ থেকে আলাদা এক তৃতীয় তফসীর এই বর্ণনা করেছেন যে আয়াতে نَحْنُ শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার

সত্তা বোঝানো হয়নি, বরং তাঁর ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে এতটুকু ওয়াকিফহাল, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয়।

প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা আছে ঃ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ

تَلَقِّى শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেওয়া এবং অর্জন করে নেওয়া। تَلَقِّى — فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ অর্থাৎ নিয়ে নিলেন আদম তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য। আলোচ্য আয়াতে مُتَلَقِّيَانِ বলে দুইজন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদা সর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে। عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ অর্থাৎ তাদের একজন ডানদিকে থাকে এবং সৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বামদিকে থাকে এবং অসৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করে। قَعِيْدٌ শব্দটি قَاعِد (উপবিষ্ট) অর্থে একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। قَعِيْدٌ এর অর্থ قَاعِد হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, قَاعِد শুধু উপবিষ্ট অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قَعِيْد শব্দটি ব্যাপক। যে ব্যক্তি কারও সঙ্গে থাকে, তাকে قَعِيْد বলা হয়---উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক অথবা চলাফেরারত হোক। উপরোক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের অবস্থাও তাই। তারা সর্বদা সর্বাবস্থায় মানুষের সঙ্গে থাকে---সে উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক, চলাফেরারত হোক অথবা নিদ্রিত হোক। কেবল প্রস্রাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী-সহবাসের প্রয়োজনে যখন সে গুপ্তাঙ্গ খোলে তখন ফেরেশতাদ্বয় সরে যায়। কিন্তু তদবস্থায়ও সে কোন গোনাহ্ করলে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি বলে তারা তা জানতে পারে।

ইবনে কাসীর আহ্‌নাফ ইবনে কায়স (র)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন ঃ এই ফেরেশতাদ্বয়ের মধ্যে ডানদিকের ফেরেশতা নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বামদিকের ফেরেশতারও দেখাশুনা করে। মানুষ যদি কোন গোনাহ্ করে, তবে ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলে ঃ এখনি এটা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না। তাকে সময় দাও। যদি সে তওবা করে তবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর।---(ইবনে আবী হাতেম)

আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা ঃ হযরত হাসান বসরী (র) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন ঃ

হে আদম সন্তানগণ। তোমাদের জন্য আমলনামা বিছানো হয়েছে এবং দুইজন সম্মানিত ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে। একজন তোমার ডানদিকে, অপরজন বাম-দিকে। ডান দিকের ফেরেশতা তোমার নেক আমল লিখে এবং বামদিকের ফেরেশতা গোনাহ্ ও কুকর্ম লিপিবদ্ধ করে। এখন এই সত্য সামনে রেখে তোমার মনে যা চায়, তাই কর এবং কম আমল কর কিংবা বেশী কর। অবশেষে যখন তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তখন এই আমলনামা বন্ধ করে তোমার গ্রীবায় রেখে দেওয়া হবে। এটা কবরে তোমার সাথে যাবে এবং থাকবে। অবশেষে তুমি কিয়ামতের দিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طَائِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا - اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا -

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তার ঘাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন সে তা খোলা অবস্থায় পাবে। এখন নিজের আমলনামা নিজেই পাঠ কর। তুমি নিজেই তোমার হিসাব করার জন্য যথেষ্ট।

হযরত হাসান বসরী (র) আরও বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, তিনি বড়ই ন্যায় ও সুবিচার করেছেন, যিনি স্বয়ং তোমাকেই তোমার ক্রিয়াকর্মের হিসাবকারী করেছেন। (ইবনে কাসীর) বলা বাহুল্য, আমলনামা কোন পার্থিব কাগজ নয় যে, এর কবরে সঙ্গে যাওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকার ব্যাপারে খট্‌কা হতে পারে। এটা এমন একটা অর্থগত বস্তু যার স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তাই এর প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠহার হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়।

মানুষের প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হয় ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই পরিদর্শক ফেরেশতা রেকর্ড করে নেয়। হযরত হাসান বসরী (র) ও কাতাদাহ বলেন ঃ এই ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি বাক্য রেকর্ড করে। তাতে কোন গোনাহ্ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ কেবল সেসব বাক্য লিখিত হয়, যেগুলো সওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য। ইবনে কাসীর উভয় উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে প্রথমোক্ত উক্তি অগ্রগণ্য মনে হয়। এরপর তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেই আলী ইবনে আবী তালহা (রা)-র এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যদ্দ্বারা উভয় উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এই রেওয়ায়েতে আছে, প্রথমে তো প্রতিটি কথাই লিপি-বদ্ধ করা হয়, তাতে কোন গোনাহ্ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু সপ্তাহের

বৃহস্পতিবার দিনে ফেরেশতা লিখিত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করে এবং যেসব উক্তি সওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য এবং ভাল অথবা মন্দ সেগুলো রেখে বাকীগুলো মিটিয়ে দেয়। অপর এক আয়াতে আছে ঃ وَيَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ -এর অর্থ তাই।

ইমাম আহমদ (র) হযরত বিলাল ইবনে হারিস মুযনী (রা) থেকে যে রিওয়ায়েত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

মানুষ মাঝে মাঝে কোন ভাল কথা বলে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু সে মামুলি বিষয় মনে করেই কথাটি বলে এবং টেরও পায় না যে, এর সওয়াব এতই সুদূর-প্রসারী যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সন্তুষ্টি লিখে দেন। এমনিভাবে মানুষ আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কোন বাক্য মামুলি মনে করে উচ্চারণ করে। সে ধারণাও করতে পারে না যে, এর গোনাহ্ ও শাস্তি কতদূর পরিব্যাপ্ত হবে। এই বাক্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী অসন্তুষ্টি লিখে দেন।—(ইবনে কাসীর)

হযরত আলকামাহ্ (র) এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ এই হাদীস আমাকে অনেক কথা মুখে উচ্চারণ করা থেকে বিরত রেখেছে। —(ইবনে কাসীর)

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ মৃত্যু-যন্ত্রণা

سَكْرَةُ الْمَوْتِ—-এর অর্থ মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর সময় মূর্ছা যাওয়া। আবূ বকর ইবনে আম্বারী (র) হযরত মসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর মধ্যে যখন মৃত্যুর ক্রিয়া শুরু হয়, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে কাছে ডাকলেন। পিতার অবস্থা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে এই কবিতাংশ উচ্চারিত হয়ে যায় ঃ اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر—অর্থাৎ আত্মা একদিন অস্থির হবে এবং বক্ষ সংকুচিত হয়ে যাবে। হযরত আবূ বকর (রা) শুনে বললেন ঃ তুমি বৃথাই এই কবিতা পাঠ করেছ। এর পরিবর্তে এই আয়াত পাঠ করলে না কেন? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ —ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে এই অবস্থা দেখা দিলে তিনি হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করতেন এবং বলতেন ঃ لا اله الا الله ان للموت سكرات—অর্থাৎ কালিমা তাইয়েবা পাঠ করে বলতেন ঃ মৃত্যু-যন্ত্রণা বড় সাংঘাতিক।

بِالْحَقِّ—এখানে باء অব্যয়টি تعدية অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই

যে, মৃত্যু-যন্ত্রণা সত্য বিষয়কে নিয়ে এল। অর্থাৎ মৃত্যু-যন্ত্রণা এমন বিষয়কে সামনে উপস্থিত করেছে, যা সত্য ও প্রতিষ্ঠিত এবং যা থেকে পলায়নের অবকাশ নেই। —(মাযহারী)

ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ — تَحِيْدُ শব্দটি حيد থেকে উদ্ভূত। অর্থ সরে যাওয়া, পলায়ন করা। আয়াতের অর্থ এই যে, এই মৃত্যু থেকেই তুমি পলায়ন করতে।

বাহ্যত সাধারণ মানুষকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি স্বভাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে আপদ মনে করে এ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ্ নয়। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের এই স্বভাব ও প্রকৃতিগত বাসনা পুরোপুরিভাবে কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। একদিন না একদিন মৃত্যু আসবেই; তুমি যতই পলায়ন কর না কেন।

মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিতকারী ফেরেশতাদ্বয়ঃ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ — এই আয়াতের পূর্বে কিয়ামত কায়েম হওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষের হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন سائق থাকবে। سائق সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জন্তুদের অথবা কোন দলের পেছনে থেকে তাকে কোন বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেয়। شهيد -এর অর্থ সাক্ষী। سائق যে ফেরেশতা হবে এ ব্যাপারে সব রেওয়ায়েতই একমত। شهيد-সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কারও কারও মতে সেও একজন ফেরেশতাই হবে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে দুইজন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের ময়দানে পৌঁছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এই ফেরেশতাদ্বয় ডান ও বামে বসে আমল লিপিবদ্ধকারী কিরামুন-কাতেবীন ফেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই ফেরেশতাও হতে পারে।

شهيد সম্পর্কে কেউ বলেনঃ সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ মানুষকেই شهيد বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেনঃ ফেরেশতা হওয়াই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায়। হযরত ওসমান গনী (রা) খোতবায় এই আয়াত তিলাওয়াত করে এই তফসীরই করেছেন। হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও ইবনে যায়েদ (রা) থেকেও তাই বর্ণিত আছে।

মৃত্যুর পর মানুষ এমন সবকিছু দেখবে, যা জীবিতাবস্থায় দেখতে পেত নাঃ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ — অর্থাৎ আমি তোমাদের

সামনে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। ইবনে জরীর (র), ইবনে কাসীর প্রমুখের মতে মু'মিন, কাফির, মুত্তাকী ও ফাসিক নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া স্বপ্নজগত সদৃশ এবং পরকাল জাগরণ সদৃশ। স্বপ্নে যেমন মানুষের চক্ষুদ্বয় বন্ধ থাকে এবং কিছুই দেখে না, এমনিভাবে পরজগত সম্পর্কিত বিষয়াবলী দুনিয়াতে চর্মচক্ষে দেখে না। কিন্তু এই চর্মচক্ষু বন্ধ হওয়া মাত্রই স্বপ্নজগত খতম হয়ে জাগরণের জগত শুরু হয়ে যায়। এ জগতে পরকাল সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সামনে এসে যায়। এ কারণেই কোন কোন আলিম বলেন ঃ النَّاسُ نِيَامٌ فَاذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا—অর্থাৎ আজিকার পার্থিব জীবনে সব মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, তখন জাগ্রত হবে।

قَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ—এখানে সঙ্গী অর্থ সেই ফেরেশতা যে ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য মানুষের সাথে থাকত। পূর্বেই জানা গেছে যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা দুইজন। কিন্তু কিয়ামতে উপস্থিত হওয়ার সময় একজনকে চালক ও অপরজনকে সাক্ষী এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে। তাই পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়কে হাশরের ময়দানে উপস্থিতির সময় দুইটি কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। একজনকে পশ্চাতে থেকে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাকেই سَائِقٌ তথা চালক বলা হয়েছে। অপরজনের দায়িত্বে তার আমলনামা দেওয়া হয়েছে। তাকে شَهِيْدٌ তথা সাক্ষী নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে পৌঁছার পর আমল-নামার ফেরেশতা আরম্ভ করবে ঃ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ অর্থাৎ তাঁর লিখিত আমল-নামা আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে জরীর বলেন ঃ এখানে قَرِيْن শব্দটি দ্বারা উভয় ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে।

اَلْقِيَا—اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ শব্দটি দ্বিবাচক পদ। আয়াতে কোন্ ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে? বাহ্যত পূর্বোক্ত চালক ও সাক্ষী ফেরেশতা-দ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ অন্য কথাও বলেছেন। (ইবনে-কাসীর)

قَرِيْن—قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهٗ শব্দের আসল অর্থ যে সঙ্গে থাকে এবং মিলিত। এই অর্থের দিক দিয়ে আগের আয়াতে এর দ্বারা আসল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা বোঝানো হয়েছিল। উপরোক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে যেমন মানুষের সঙ্গী হয়ে

থাকে এবং মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও পাপের দিকে আহবান করে। আলোচ্য আয়াতে قرين বলে এই শয়তানই বোঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ হয়ে যাবে, তখন এই শয়তান বলবে ঃ পরওয়ারদিগার, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি, বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করত এবং সদুপদেশে কর্ণপাত করত না। বাহ্যত বোঝা যায় যে, এর আগে জাহান্নামী ব্যক্তি নিজেই এই অজুহাত পেশ করবে যে, আমাকে এই শয়তান বিভ্রান্ত করেছিল। নতুবা আমি সৎ কাজ করতাম। এর জওয়াবে শয়তান পূর্বোক্ত কথা বলবে। উভয়ের বাকবিতণ্ডার জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ

لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد—অর্থাৎ আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তোমাদের অসার ওযরের জওয়াব দিয়েছি এবং ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে প্রমাণাদি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। আজ এই অনর্থক তর্ক-বিতর্ক কোন উপকারে আসবে না।

ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد—আমার কথা রদবদল হয় না। যা ফয়সালা করেছি, তা কার্যকর হবেই। আমি কারও প্রতি জুলুম করিনি। ইনসাফের ফয়সালা করেছি।

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ۝ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۝ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝

(৩০) যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?' সে বলবে, 'আরও আছে কি?' (৩১) জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্‌ভীরুদের অদূরে। (৩২) তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল— (৩৩) যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হত—(৩৪) তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্তকাল বসবাসের দিন। (৩৫) তারা তথায় যা চাবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এখান থেকে হাশরের অবশিষ্ট ঘটনাবলী বর্ণিত হচ্ছে। মানুষকে সেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিন) সেদিন আমি জাহান্নামকে (কাফিরদের প্রবেশ করার পর) জিজ্ঞাসা করব : তুমি ভরে গেছ কি ? সে বলবে : আরও আছে কি ? [কাফিরদেরকে আরও ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই সম্ভবত এই জিজ্ঞাসা, যাতে জওয়াব শুনে তাদের অন্তরে দোযখের আতংক আরও বেড়ে যায় যে, আমরা কিরূপ ভয়ংকর ঠিকানায় পৌঁছে গেছি। সে তো সবাইকে গ্রাস করতে চায়। জাহান্নামের তরফ থেকে 'আরও আছে কি' বলে যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে, এটাও সম্ভবত আল্লাহ্‌র দুশমন কাফিরদের প্রতি জাহান্নামের প্রচণ্ড ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ। সূরা মুলকে এই ক্রোধ এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ জাহান্নাম জওয়াবে একথা বলেনি যে, তার পেট ভরেনি। সে ক্রোধবশতই আরও চেয়েছে। কাজেই এটা لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ আয়াতের পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ আমি জিন ও মানব দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করে দেব। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ করে দেওয়ার সাবেক ওয়াদা অনুযায়ী জিন ও মানবকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে থাকবেন আর জাহান্নাম এ কথাই বলতে থাকবে যে, আরও আছে কি ? (ইবনে কাসীর) জান্নাতের বর্ণনা এই যে] জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্‌ভীরুদের অদূরে (এবং আল্লাহ্‌ভীরুদেরকে বলা হবে :) এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তোমাদের প্রত্যেক (আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিক) অনুরাগীকে (এবং সৎ কর্ম ও ইবাদত পালনকারীকে) যে না দেখে আল্লাহ্‌কে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে (আল্লাহ্‌র কাছে) উপস্থিত হত। (তাদেরকে আদেশ করা হবে :) তোমরা এই জান্নাতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটা অনন্তকাল বসবাসের (আদেশ হওয়ার) দিন। তারা তথায় যা চাবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে (তাদের প্রার্থিত বস্তু অপেক্ষা) আরও বেশী (নিয়ামত) আছে (যা জান্নাতীরা কল্পনাও করতে পারবে না)। জান্নাতের নিয়ামত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : জান্নাতের নিয়ামত কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তন্মধ্যে একটি নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্‌র দীদার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَوَّابٍ কারা : لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ—অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক أَوَّابٍ ও حَفِيظٍ-এর জন্য রয়েছে। أَوَّابٍ-এর অর্থ অনুরাগী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরক্ত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ, শা'বী ও মুজাহিদ বলেন : যে ব্যক্তি নির্জনতায় গোনাহ্ স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই اواب। হযরত ওবায়দ ইবনে ওমর বলেন : اواب এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক উঠাবসায় আল্লাহ্‌র কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি আরও বলেন : আমাকে বলা হয়েছে যে, اواب ও حفيظ এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে :

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا اَصَبْتُ مِنْ مَّجْلِسِىْ هٰذَا

আল্লাহ্ পবিত্র এবং তাঁরই প্রশংসা। হে আল্লাহ্, আমি এই মজলিসে যে গোনাহ্ করেছি, তা থেকে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার এই মজলিসে কৃত সব গোনাহ্ মাফ করে দেন। দোয়া এই :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তুমি পবিত্র এবং প্রশংসা তোমারই। তোমা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : حفيظ এমন ব্যক্তি, যে নিজ গোনাহ্সমূহ স্মরণ রাখে, যাতে সেগুলো মোচন করিয়ে নেয়। তাঁর কাছ থেকে অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে حفيظ এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান স্মরণ রাখে। হযরত আবু হুরায়রার হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে (ইশরাকের) চার রাক'আত নামায পড়ে, সে حفيظ ও اواب। —(কুরতুবী)

وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ—আবু বকর ওয়াররাক বলেন : منيب (বিনীত) এর আলামত এই যে, সে আল্লাহ্‌র আদবকে সর্বদা চিন্তায় উপস্থিত রাখবে, তাঁর সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকবে এবং মনের কুবাসনা পরিত্যাগ করবে।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا—অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাবে, তা-ই পাবে। অর্থাৎ চাওয়া মাত্রই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও অপেক্ষার বিড়ম্বনা সইতে হবে না। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর বাচনিক রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : জান্নাতে কারও সন্তানের বাসনা হলে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের কায়িক বৃদ্ধি—এগুলো সব এক মুহূর্তের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে যাবে।—(ইবনে কাসীর)

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ —অর্থাৎ আমার কাছে এমন নিয়ামতও আছে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্ক্ষাও করতে পারবে না। হযরত আনাস ও জাবের (রা) বলেন ঃ এই বাড়তি নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার যিয়ারত তথা সাক্ষাৎ, যা জান্নাতীরা লাভ করবে। لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ আয়াতের তফসীরে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে, জান্নাতীরা প্রতি শুক্রবার আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে।—(কুরতুবী)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ۝

(৩৬) আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। তাদের কোন পলায়ন-স্থান ছিল না। (৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। (৩৮) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৩৯) অতএব তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন, (৪০) রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পশ্চাতেও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তাদের (মক্কাবাসীদের) পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে (কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছি, যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল এবং (সাংসারিক সাজ-সরঞ্জাম বাড়ানোর জন্য) দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত (অর্থাৎ শক্তিশালী হওয়ার পর জীবনোপকরণের

ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নত ছিল ; কিন্তু যখন আযাব আসল, তখন) তাদের পলায়নের স্থানও ছিল না। এতে (অর্থাৎ ধ্বংস করার ঘটনায়) তার জন্য উপদেশ রয়েছে, যে (সমঝদার) অন্তঃকরণশীল অথবা (সমঝদার না হলে কমপক্ষে) যে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। (শ্রবণ করার পর সংক্ষেপে সত্যে বিশ্বাসী হয়ে যায়। যদি আল্লাহ্র কুদরতকে অক্ষম মনে করে তোমরা কিয়ামত অস্বীকার করে থাক, তবে তা বাতিল। কারণ, আমার কুদরত এমন যে,) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে (অর্থাৎ দিনের সমান সময়কালের মধ্যে) সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শও করেনি। (এমতা-

বস্থায় মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন ? আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْىِۦَ الْمَوْتٰى এসব সন্দেহ নিরসনকারী জওয়াব সত্ত্বেও

তারা অনবরত অস্বীকারই করে যাচ্ছে) অতএব আপনি সবর করুন (অর্থাৎ দুঃখ করবেন না। যেহেতু কোনদিকে মনকে নিবিষ্ট করা ব্যতীত দুঃখের কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না। তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ) এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (অর্থাৎ সকালের নামাযে) এবং সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ যোহর ও আসরের নামাযে) আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং রাত্রিতেও তাঁর পবিত্রতা (ও প্রশংসা) ঘোষণা করুন (এতে মাগরিব ও ইশা দাখিল হয়ে গেছে) এবং (ফরয) নামাযের পশ্চাতেও (এতে নফল ও ওজিফা দাখিল হয়ে গেছে। মোটকথা এই যে, আল্লাহ্র যিকির ও ফিকিরে মশগুল থাকুন, যাতে তাদের কুফরী কথা-বার্তার দিকে ধ্যানই না হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ — نَقَّبُوْا শব্দটি تَنْقِيْب থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা। বাকপদ্ধতিতে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مَحِيْص -এর অর্থ আশ্রয়স্থল। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা তোমাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল এবং যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। কিন্তু দেখ পরিণামে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কোন ভূখণ্ড অথবা গৃহ তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে আশ্রয় দিতে পারল না।

জ্ঞানার্জনের দুই পন্থা ঃ لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ — হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এখানে 'কল্‌ব' বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কল্‌ব

তথা অন্তকরণ। তাই একে কলব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এখানে কলব বলে হায়াত তথা জীবন বোঝানো হয়েছে। কারণ, কলবের উপরই হায়াত ভিত্তি-শীল। আয়াতের অর্থ এই যে, এই সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা সেই ব্যক্তিই উপদেশ ও শিক্ষার উপকার লাভ করতে পারে, যার বোধশক্তি অথবা হায়াত আছে। বোধশক্তিহীন অথবা মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ — لقاء سمع।-এর অর্থ কোন কথা কান লাগিয়ে শোনা এবং شهيد এর অর্থ উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, দুই ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াত-সমূহের দ্বারা উপকার লাভ করে। এক যে স্বীয় বোধশক্তি দ্বারা সব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে। দুই. অথবা সে আয়াতসমূহকে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে; অন্তরকে অনুপস্থিত রেখে শুধু কানে শুনে না। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : কামিল বুযুর্গগণ প্রথমোক্ত প্রকারের মধ্যে এবং তাঁদের অনুসারী ও মুরীদগণ দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে দাখিল।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ — سبح শব্দটি تسبيح থেকে উদ্ভূত। অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ্ (পবিত্রতা বর্ণনা) করা। মুখে হোক কিংবা নামাযের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন : সূর্যোদয়ের পূর্বে তসবীহ্ করার অর্থ ফজরের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তসবীহ্ করার মানে আসরের নামায। হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ্র বাচনিক এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

ان استطعتم ان لا تغلبوا على صلوة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب -

চেষ্টা কর, যাতে তোমার সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযগুলো ফওত না হয়ে যায়, অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায। এর প্রমাণ হিসাবে জরীর উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।—(কুরতুবী)

সেইসব তসবীহও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ করার প্রতি সহীহ্ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশ বার করে 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশী হয়।—(মাযহারী)

وَأَدْبَارَ السُّجُودِ — হযরত মুজাহিদ বলেন : سجود বলে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে এবং পশ্চাতে বলে সেসব তসবীহ্ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফযিলত

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং এক বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' পাঠ করবে, তার গোনাহ্ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়।—(বুখারী-মুসলিম) ফরয নামাযের পরে যেসব সুন্নত নামায পড়ার কথা সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, أَدْبَارَ السُّجُوْدِ বলে সেগুলোও বোঝানো যেতে পারে।—(মাযহারী)

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ۝ اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ۝ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ۝

(৪১) শুন, যে দিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে, (৪২) যেদিন মানুষ নিশ্চিত মহানাদ শুনতে পাবে, সেদিনই পুনরুত্থান দিবস। (৪৩) আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। (৪৪) যেদিন ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে বের হয়ে আসবে। এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্য অতি সহজ। (৪৫) তারা যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন। অতএব যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি, মনোযোগ সহকারে) শুন, যেদিন এক আহ্বানকারী ফেরেশতা (অর্থাৎ হযরত ইসরাফীল শিংগায় ফুঁক দিয়ে মৃতদেরকে কবর থেকে বের হয়ে আসার জন্য) নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে (অর্থাৎ আওয়াজটি নির্বিঘ্নে সবার কানে পৌঁছবে, যেন নিকটতম স্থান থেকেই কেউ আহ্বান করছে।—দূরের আওয়াজ সাধারণত কারও কানে পৌঁছে এবং কারও কানে পৌঁছে না—এরূপ হবে না)। যেদিন মানুষ এই চিৎকার নিশ্চিতরূপে শুনতে পাবে, সেদিনই (কবর থেকে) পুনরুত্থান দিবস। আমিই (এখনও) জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন

(এতেও মৃতদেরকে পুনর্জীবন দান করার শক্তির প্রতি ইঙ্গিত আছে)। যেদিন ভূমণ্ডল তাদের (অর্থাৎ মৃতদের) থেকে উন্মুক্ত হয়ে যাবে তারা (বের হয়ে কিয়ামতের দিকে) ছুটাছুটি করবে। এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্য অতি সহজ। (মোটকথা, কিয়ামতের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। এরপরও কেউ না মানলে আপনি দুঃখ করবেন না। কেননা) তারা (কিয়ামত ইত্যাদি সম্পর্কে) যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। (আমি নিজেই বুঝে নেব)। আপনি তাদের উপর (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) জোরজবরকারী নন ; (বরং শুধু সতর্ককারী ও প্রচারকারী) অতএব কোর-আনের মাধ্যমে (সাধারণভাবে সবাইকে এবং বিশেষভাবে এমন ব্যক্তিকে) উপদেশ দান করুন, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে। [এতে ইঙ্গিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যদিও সবাইকে উপদেশ দেন এবং সবার কাছে প্রচার করেন, তবুও গুটিকতক লোকই আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করে। অতএব বোঝা গেল যে, এটা তাঁর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। অতএব ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় বিধায় এর জন্য চিন্তা কিসের ?]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ—অর্থাৎ যেদিন আহ্বানকারী ফেরেশতা নিকট থেকেই আহ্বান করবে। ইবনে আসাকির জায়দ ইবনে জাবের থেকে বর্ণনা করেন, এই ফেরেশতা আর কেউ নয়—স্বয়ং ইসরাফীল। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃতদেরকে এই বলে সম্বোধন করবেন ঃ হে পচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! শুন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে হিসাবের জন্য সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন।—(মাযহারী)

আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় ফুঁৎকার বর্ণিত হয়েছে, যদ্দ্বারা বিশ্বজগতকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। নিকটবর্তী স্থানের অর্থ এই যে, তখন এই আওয়াযটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে, যেন কানের কাছ থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা বলেন ঃ আওয়াযটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন ঃ নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরা। এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক থেকে এর দূরত্ব সমান।—(কুরতুবী)

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا—অর্থাৎ যখন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে সব মৃত বের হয়ে আসবে এবং ছুটাছুটি করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়াতে থাকবে। সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় ইসরাফীল (আ) সবাইকে আহ্বান করবেন।

তিরমিযীতে মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শাম দেশের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ

من ههنا الى ههنا تحشرون ركبانا ومشاة ونجرون على وجوهكم يوم القيامة -

এখান থেকে সেখান পর্যন্ত তোমরা উত্থিত হবে। কেউ সওয়ার হয়ে, কেউ পদব্রজে এবং কেউ উপুড় হয়ে কিয়ামতের ময়দানে নীত হবে।

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ—অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে আপনি কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রচারকার্য ব্যাপক হলেও একমাত্র তারাই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে।

হযরত কাতাদাহ্ (র) এই আয়াত পাঠ করে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَّخَافُ وَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْا مَوْعُوْدَكَ يَا بَارُّ يَا رَحِيْمُ

হে আল্লাহ্, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার ওয়াদার আশা করে। হে ওয়াদা পূরণকারী, হে দয়াময়।

سورة الذاريات

সূরা যারিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬০ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمٰتِ
اَمْرًا ﴿٤﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾
وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُّؤْفَكُ عَنْهُ
مَنْ اُفِكَ ﴿٩﴾ قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾
يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾ ذُوْقُوْا
فِتْنَتَكُمْ ۚ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ
جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ
مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾ وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْاَرْضِ
اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَآءِ
رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ
مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে

(১) কসম ঝঞ্ঝাবায়ুর, (২) অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের, (৩) অতঃপর মৃদু চলমান জলযানের, (৪) অতঃপর কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতাগণের, (৫) তোমাদেরকে প্রদত্ত

ওয়াদা অবশ্যই সত্য। (৬) ইনসাফ অবশ্যম্ভাবী। (৭) পথবিশিষ্ট আকাশের কসম, (৮) তোমরা তো বিরোধপূর্ণ কথা বলছ। (৯) যে ভ্রষ্ট, সেই এ থেকে মুখ ফিরায়, (১০) অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, (১১) যারা উদাসীন, ভ্রান্ত। (১২) তারা জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কবে হবে? (১৩) যে দিন তারা অগ্নিতে পতিত হবে, (১৪) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা একেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (১৫) আল্লাহ্‌ভীরুরা জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে (১৬) এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতি-পূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, (১৭) তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, (১৮) রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, (১৯) এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল। (২০) বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে (২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (২২) আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুতি সবকিছু। (২৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম ঝন্‌ঝাবায়ুর, অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের (অর্থাৎ বৃষ্টি) অতঃপর মৃদু-চলমান জলযানের, অতঃপর ফেরেশতাদের, যারা (আদেশ অনুযায়ী পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে) বস্তুসমূহ বণ্টন করে (উদাহরণত যেখানে যে পরিমাণ রিযিকের মূল উপাদান বৃষ্টির আদেশ হয়, মেঘমালার সাহায্যে সেখানে সেই পরিমাণ বৃষ্টি পৌঁছে দেয়। এমনিভাবে হাদীসে আছে, জননীর গর্ভাশয়ে আদেশানুযায়ী নর ও নারীর আকার তৈরী করে। অতঃপর কসমের জওয়াব বর্ণনা করা হচ্ছে :) তোমাদেরকে প্রদত্ত (কিয়ামতের) ওয়াদা অবশ্যই সত্য এবং (কর্মসমূহের) প্রতিদান (ও শাস্তি) অবশ্যম্ভাবী (এসব কসমের মধ্যে প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরতের বলে এসব আশ্চর্য কর্মকাণ্ড হওয়া সর্বশক্তিমান হওয়ার প্রমাণ। অতএব, এমন সর্বশক্তিমানের পক্ষে কিয়ামত সংঘটিত করা মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বাক্যের কসম খাওয়া হয়েছে সেসবের তফসীর দুররে-মনসুরের এক হাদীস দ্বারা পরে বর্ণিত হবে। বিশেষভাবে এসব বস্তুর কসম খাওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, এতে সৃষ্ট বস্তুর বিভিন্ন প্রকারের দিকে ইঙ্গিত হয়ে গেছে। সেমতে ফেরেশতা উর্ধ্বজগতের সৃষ্ট এবং বাতাস ও জলযান অধঃজগতের সৃষ্ট এবং মেঘমালা শূন্য জগতের সৃষ্ট। অধঃজগতের দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি চোখে দৃষ্টিগোচর হয় এবং অপরটি হয় না। এরূপ দুটি বস্তু উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, কিয়ামত সম্পর্কিত এক বিষয়বস্তুতে খোদ আকাশের কসম খাওয়া হয়েছে, যেমন উপরে উর্ধ্বজগত সম্পর্কিত বস্তুসমূহের ছিল। অর্থাৎ) কসম আকাশের, যাতে (ফেরেশতাদের চলার) পথ আছে। (যেমন আল্লাহ্ বলেন : وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ অতঃপর কসমের জওয়াবে বলা হচ্ছে :) তোমরা (অর্থাৎ সবাই কিয়ামত সম্পর্কে) বিভিন্ন কথাবার্তা বলছ (কেউ সত্য বলে এবং কেউ মিথ্যা

বলে। আল্লাহ্ বলেন ঃ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ —আকাশের কসম দ্বারা সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাত আকাশে অবস্থিত এবং আকাশে পথও আছে। কিন্তু যে সত্য বিষয়ে মতবিরোধ করবে, তার জন্য পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এসব মতবিরোধকারীদের মধ্যে) সে-ই (কিয়ামতের বাস্তবতা ও প্রতিদানের বিশ্বাস থেকে) মুখ ফিরায়, যে (পুরোপুরিভাবে পুণ্য ও সৌভাগ্য থেকে) বঞ্চিত ঃ (যেমন হাদীসে আছে, من حرمه فقد حرم الخير كله —অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সব পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। মতবিরোধকারীদের অপরপক্ষ অর্থাৎ যারা কিয়ামতকে সত্য বলে, তাদের অবস্থা এরই মুকাবিলা থেকে জানা যায় যে, তারা পুণ্য ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত নয়। অতঃপর বঞ্চিতদের নিন্দা করে বলা হচ্ছে ঃ) যারা ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে, তারা ধ্বংস হোক, (অর্থাৎ যারা কোনরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকেই কিয়ামতকে অস্বীকার করে) যারা মূর্খতাবশত উদাসীন। (তারা ঠাট্টা ও ত্বরান্বিত করার ভঙ্গিতে) জিজ্ঞাসা করে ঃ প্রতিফল দিবস কবে হবে? (জওয়াব এই যে, সেদিন হবে) যেদিন তারা অগ্নিদগ্ধ হবে (এবং বলা হবে ঃ) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা একেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (এই জওয়াবটি এমন, যেমন ধরুন, একজন অপরাধীর জন্য ফাঁসিতে ঝুলানোর আদেশ হয়ে গেছে। কিন্তু এই বোকা ফাঁসির তারিখ না বলার কারণে আদেশ-টিকে কেবল মিথ্যাই মনে করতে থাকে এবং বলতে থাকে যে, ফাঁসি কবে হবে? এই প্রশ্নটি যেহেতু হঠকারিতা প্রসূত, তাই জওয়াবে তারিখ বলার পরিবর্তে একথা বলাই সঙ্গত হবে যে, সেদিন তখন আসবে, যখন তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর অপরপক্ষ অর্থাৎ মু'মিন ও সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের সওয়াব বর্ণিত হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা জান্নাতে প্রস্রবণে থাকবে এবং তারা (সানন্দে) গ্রহণ করবে, যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দান করবেন। (কেননা) তারা ইতিপূর্বে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) সৎকর্মপরায়ণ ছিল।

(সুতরাং هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ এর ওয়াদা অনুযায়ী তাদের সাথে এই ব্যবহার করা হবে। এরপর তাদের সৎকর্মপরায়ণতার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ) তারা (ফরয ও ওয়াজিব পালন করার পর নফল ইবাদতে এতই লিপ্ত থাকত যে) রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত (অর্থাৎ বেশীর ভাগ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করত এবং এতদসত্ত্বেও তারা তাদের ইবাদতকে তেমন কিছু মনে করত না; বরং) রাতের শেষ প্রহরে (নিজেদেরকে ইবাদতে ত্রুটিকারী মনে করে) তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। (এ হচ্ছে দৈহিক ইবাদতের অবস্থা)। এবং (আর্থিক ইবাদতের অবস্থা এই যে,) তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের (সবার) হক ছিল [অর্থাৎ এমন নিয়মিত দান করত, যেন তাদের কাছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের পাওনা আছে।এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য যাকাত নয় এবং এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, জান্নাত ও প্রস্রবণ পাওয়া নফল ইবাদতের উপর নির্ভরশীল, বরং এখানে যাকাত নয় এমন দান বোঝানো হয়েছে। (দুররে-মনসুর) আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, জান্নাত ও প্রস্রবণ পাওয়া নফল ইবাদতের উপর নির্ভরশীল; বরং জান্নাতের উচ্চস্তরের অধিকারীদের

কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু কাফিররা কিয়ামত অস্বীকার করত, তাই অতঃপর এর প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে] বিশ্বাসকারীদের (অর্থাৎ বিশ্বাস করার চেষ্টাকারীদের) জন্য (কিয়ামতের সম্ভাব্যতা বিষয়ে) পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন (ও প্রমাণ) রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (রয়েছে, অর্থাৎ তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অবস্থাও কিয়ামতের সম্ভাব্যতার প্রমাণ। এসব প্রমাণ যেহেতু সুস্পষ্ট, তাই শাসানির ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে ঃ) তোমরা কি (মতলব) অনুধাবন করবে না ? (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কিত বিশ্বাস না থাকার কারণে তোমরা কিয়ামতেই বিশ্বাসী নও। এসম্পর্কে কথা এই যে) তোমাদের রিযিক এবং (কিয়ামত সম্পর্কে) তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সেসব (অর্থাৎ সেসবের নির্দিষ্ট সময়) আকাশে (লওহে মাহ্ফুযে) লিপিবদ্ধ আছে। (এর নিশ্চিত জ্ঞান পৃথিবীতে কোন উপযোগিতার কারণে নাযিল করা হয়নি। সেমতে وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ আয়াতেও নির্দিষ্ট সময় বলা হয়নি। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় যে, বৃষ্টির নির্দিষ্ট দিন কারও জানা থাকে না। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও যখন রিযিক নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায়, তখন নির্দিষ্ট তারিখ জানা না থাকার কারণে কিয়ামত না হওয়া কিরূপে জরুরী হয়ে যায় ? এরূপ প্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত করার কারণেই مَا تُوعَدُونَ এর সাথে رِزْقُكُمْ-কে সংযুক্ত করা হয়েছে। অতএব যখন কিয়ামত না হওয়ার প্রমাণ নেই এবং হওয়ার প্রমাণ আছে, তখন) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, এটা (অর্থাৎ কর্মফল দিবস) সত্য (এবং এমন নিশ্চিত) যেমন তোমরা কথাবার্তা বলছ। (এতে কখনও সন্দেহ হয় না, তেমনি কিয়ামতকেও নিশ্চিত জ্ঞান কর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সূরা ক্বাফ-এর ন্যায় বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব ও আযাব সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় বস্তুর কসম খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কিয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। এক. اَلذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا দুই. اَلْحٰمِلٰتِ وِقْرًا তিন. اَلْجٰرِيٰتِ يُسْرًا এবং চার. اَلْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا—

ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারূক (রা) ও আলী মোর্তাযা (রা)-র উক্তিতে এই বস্তু চতুষ্টয়ের তফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

ذاريات বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ঝন্‌ঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে। حاملات وقرا -এর শাব্দিক অর্থ বোঝাবাহী অর্থাৎ যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে। جاريات يسرا বলে পানিতে সচ্ছল গতিতে চলমান জলযান বোঝানো হয়েছে। مقسمات امرا এর অর্থ সেইসব ফেরেশতা, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সৃষ্ট জীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী রিযিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ বন্টন করে।—(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, দুররে-মনসুর)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ—حبك—শব্দটি حبكة-এর বহুবচন। এর অর্থ কাপড় বয়নে উত্থিত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও حبك বলা হয়। অনেক তফসীরবিদের মতে এ স্থলে এই অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পথবিশিষ্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে ফেরেশতাদের যাতায়াতের পথ এবং তারকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই বোঝানো যেতে পারে।

বয়নে উত্থিত পাড় কাপড়ের শোভা ও সৌন্দর্যও হয়ে থাকে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে حبك-এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও সৌন্দর্য। আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশের কসম। যে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য এখানে কসম খাওয়া হয়েছে, তা এই : اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ—বাহ্যত এতে মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ উক্তি করত এবং কখনও উন্মাদ, কখনও যাদুকর, কখনও কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। মুসলিম ও কাফির নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে এখানে সম্বোধন করার সম্ভাবনাও আছে, তখন 'বিভিন্ন রূপ উক্তির' অর্থ হবে এই যে, তাদের মধ্যে কেউ তো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে।—(মাযহারী)

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ—افك-এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো।

عنه-এর সর্বনামে দু'টি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা আছে। এক. এই সর্বনাম দ্বারা কোরআন ও রসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন ও রসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্য বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে।

দুই. এই সর্বনাম দ্বারা قول مختلف (বিভিন্ন উক্তি) বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্ন রূপ ও পরস্পর বিরোধী উক্তির কারণে সেই ব্যক্তিই কোরআন ও রসূল থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল হতভাগ্য ও বঞ্চিত।

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ—خراص-এর অর্থ অনুমানকারী এবং অনুমানভিত্তিক

উক্তিকারী। এখানে সেই কাফির ও অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোন প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে 'মিথ্যাবাদীর দল' বললেও অযৌক্তিক হবে না। এই বাক্যে তাদের জন্য অভিশাপের অর্থে বদদোয়া রয়েছে।—(মাযহারী) কাফিরদের আলোচনার পর কয়েক আয়াতেই মু'মিন ও পরহিযগারদের আলোচনা করা হয়েছে।

ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ও তার বিবরণ ঃ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

يَهْجَعُونَ শব্দটি هُجُوع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে মু'মিন পরহিযগারদের এই গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাগ্রত থাকে। ইবনে জরীর এই তফসীর করেছেন। হযরত হাসান বসরী (র) থেকে তাই বর্ণিত আছে যে, পরহিযগারগণ রাত্রিতে জাগরণ ও ইবাদতের ক্লেশ স্বীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ, মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে مَا শব্দটি 'না' বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশ নামায ইত্যাদি ইবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোন অংশে ইবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রা)-র মতে সে-ও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু জাফর বাকের (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

হযরত হাসান বসরী (র)-র বর্ণনামতে আহ্নাফ ইবনে কায়সের উক্তি এই ঃ আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জান্নাতবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আমার চাইতে অনেক উচ্চে, ঊর্ধ্বে ও স্বতন্ত্র। আমার ক্রিয়াকর্ম তাদের মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছে না। কারণ, তারা রাত্রিতে কম নিদ্রা যায় এবং ইবাদত বেশী করে। এরপর আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জাহান্নামবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আল্লাহ্ ও রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে। আল্লাহ্র রহমতে আমি এগুলো থেকে মুক্ত। তাই তুলনা করার সময় আমার ক্রিয়াকর্ম না জান্নাতবাসীদের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে এবং না আল্লাহ্র রহমতে জাহান্নামবাসীদের সাথে খাপ খায়। অতএব, জানা গেল ক্রিয়াকর্মের দিক দিয়ে আমার মর্তবা তাই, যা কোরআন পাক নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছে ঃ

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا —অর্থাৎ যারা ভালমন্দ ক্রিয়াকর্ম মিশ্রিত করে রেখেছে। অতএব, আমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে কমপক্ষে এই সীমার মধ্যে থাকে।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রা) বলেন ঃ বনী তামীমের জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে বলল ঃ হে আবূ উসামা, আল্লাহ্ তা'আলা পরহিযগারদের জন্য যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ), আমরা নিজেদের মধ্যে তা পাই না। কারণ, আমরা রাত্রি বেলায় খুব কম জাগ্রত থাকি ও ইবাদত করি। আমার পিতা এর জওয়াবে বললেন ঃ

طوبى لمن رقد اذا نعس واتقى الله اذا استيقظ —তার জন্য সুসংবাদ, যে নিদ্রা আসলে নিদ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন জাগ্রত থাকে, তখন তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করে না।— (ইবনে কাসীর)

উদ্দেশ্য এই যে, কেবল রাত্রিবেলায় অধিক জাগ্রত থাকলেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়া যায় না ; বরং যে ব্যক্তি নিদ্রা যেতে বাধ্য হয় এবং রাত্রিতে অধিক জাগ্রত থাকে না, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় গোনাহ্ ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, সে-ও ধন্যবাদের পাত্র।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

يا ايها الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام -

লোক সকল! তোমরা মানুষকে আহার করাও, আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম কর এবং রাত্রিবেলায় তখন নামায পড়, যখন মানুষ নিদ্রা-মগ্ন থাকে। এভাবে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।—(ইবনে কাসীর)

রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনায় বরকত ও ফযীলত ঃ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ

يَسْتَغْفِرُونَ অর্থাৎ মু'মিন পরহিযগারগণ রাত্রির শেষ প্রহরে গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে। اسحار শব্দটি سحر-এর বহুবচন। এর অর্থ রাত্রির ষষ্ঠ প্রহর। এই প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করার ফযীলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে ঃ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ —

بِالْأَسْحَارِ সহীহ্ হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন (কিভাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না)। তিনি ঘোষণা করেন ঃ কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবূল করব ? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব ?—(ইবনে কাসীর)

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার আয়াতে সেই সব পরহিযগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে যে, তারা রাত্রিতে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্ষমা প্রার্থনা করার বাহ্যত কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। যারা সমগ্র রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করে, তারা শেষ রাত্রে কোন্ গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে ?

জওয়াব এই যে, তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার অধ্যাত্ম জ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের ইবাদতকে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই ত্রুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। —(মাযহারী)

সদকা-খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ : وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ — سَائِل বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে তার অভাব মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয় এবং মানুষ তাকে সাহায্য করে। مَحْرُوم বলে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। আয়াতে মু'মিন-মুত্তাকীদের এই গুণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ স্বীয় অভাব প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না ; বরং যারা স্বীয় অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে এবং তাদের খোঁজখবর নেয়।

বলা বাহুল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন-মুত্তাকীগণ কেবল দৈহিক ইবাদত তথা নামায ও রাত্রি জাগরণ করেই ক্ষান্ত হয় না ; বরং আর্থিক ইবাদতেও অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ভিক্ষুকদের ছাড়া তারা এমন লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে নিজেদের অভাব কাউকে জানায় না। কিন্তু কোরআন পাক এই আর্থিক ইবাদত وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ তারা যেসব ফকীর ও মিসকীনকে দান করে, তাদের কাছে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না ; বরং এরূপ মনে করে দান করে যে, তাদের ধনসম্পদে এই ফকীরদেরও অংশ ও হক আছে এবং হকদারকে তার হক দেওয়া কোন অনুগ্রহ হতে পারে না ; বরং এতে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার সুখ রয়েছে।

বিশ্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী রয়েছে :

وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ — অর্থাৎ বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে

কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে কাফিরদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে)। অতঃপর মু'মিন পরহিযগারদের অবস্থা, গুণাবলী ও উচ্চ মর্তবা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আবার কাফির ও কিয়ামত অবিশ্বাসকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অস্বীকারে বিরত হওয়ার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অতএব এই বাক্যের সম্পর্ক পূর্বোল্লেখিত إِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ বাক্যের সাথে রয়েছে, যাতে কোরআন ও রসূলকে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

তফসীর মাযহারীতে একেও মু'মিন-মুত্তাকীদেরই গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং مُوقِنِيْنَ-এর অর্থ আগের مُتَّقِيْنَ-ই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা পৃথিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়; যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগবাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক-একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ায় হাজারো বৈচিত্র্য রয়েছে। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠে নদীনালা, কূপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূপৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন।

وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ — এ স্থলে নিদর্শনাবলীর বর্ণনায় আকাশ ও শূন্য জগতের সৃষ্ট বস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে : ভূপৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠের সৃষ্ট বস্তুও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক-একটি অঙ্গকে আল্লাহ্র কুদরতের এক-একটি পুস্তক দেখতে পাবে। তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

কিভাবে একফোঁটা মানবীয় বীর্য বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষ্ম উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্য থেকে একটি জমাট রক্ত তৈরী হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরী করা হয় এবং অস্থিকে মাংস পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার আলো-বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুধী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্ন রূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন ও মেযাজের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ্ পাকেরই কুদরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। فتبارك الله احسن الخالقين

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দূরে নয়—স্বয়ং তার অস্তিত্বের মধ্যেই দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহ্‌কে সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে, তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় নেই। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : أَفَلَا تُبْصِرُونَ অর্থাৎ তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশী জ্ঞান-বুদ্ধির দরকার হয় না, দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ—অর্থাৎ আকাশে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তফসীর ও তফসীরের সার-সংক্ষেপে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ 'লওহে-মাহফুযে' লিপিবদ্ধ থাকা। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মানুষের রিযিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে।

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি তার নির্ধারিত রিযিক থেকে বেঁচে থাকার ও পলায়ন করারও চেষ্টা করে তবে রিযিক তার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড় দেবে। মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে যেমন আত্মরক্ষা করতে পারে না, তেমনি রিযিক থেকেও পলায়ন সম্ভবপর নয়। —(কুরতুবী)

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এখানে রিযিক অর্থ বৃষ্টি এবং আকাশ বলে শূন্য জগৎসহ ঊর্ধ্বজগৎ বোঝানো হয়েছে। ফলে মেঘমালা থেকে বর্ষিত বৃষ্টিকেও আকাশের বস্তু বলা যায়। مَا تُوعَدُونَ বলে জান্নাত ও তার নিয়ামতরাজি বোঝানো হয়েছে।

إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ — অর্থাৎ তোমরা যেমন নিজেদের কথাবার্তা বলার মাধ্যমে কোন সন্দেহ কর না, কিয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এই যে, উপরোক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে, কিন্তু বাকশক্তিতে কখনও কোন ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।—(কুরতুবী)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۝ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ
فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۝ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ
سَمِينٍ ۝ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ
قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝ قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ
إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝ [illegible]
[illegible] أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن
طِينٍ ۝ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ
فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ وَفِي
مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ
وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

(২৪) আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? (২৫) যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ সালাম, তখন সে বলল ঃ সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক। (২৬) অতঃপর সে গৃহে গেল এবং একটি ঘৃতেপক্ক মোটা গোবৎস নিয়ে হাযির হল। (২৭) সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বলল ঃ তোমরা আহার করছ না কেন? (২৮) অতঃপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল। তারা বলল ঃ ভীত হবেন না। তারা তাঁকে একটি জ্ঞানীগুণী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল। (২৯) অতঃপর তাঁর স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বলল ঃ আমি তো বৃদ্ধা বন্ধ্যা। (৩০) তারা বলল ঃ তোমার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (৩১) ইবরাহীম বলল ঃ হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? (৩২) তারা বলল ঃ আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, (৩৩) যাতে তাদের উপর মাটির ঢিলা নিক্ষেপ করি। (৩৪) যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্য আপনার পালনকর্তার কাছে চিহ্নিত আছে। (৩৫) অতঃপর সেখানে যারা ঈমানদার ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম (৩৬) এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি। (৩৭) যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি (৩৮) এবং নিদর্শন রয়েছে মূসার বৃত্তান্তে; যখন আমি তাঁকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। (৩৯) অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ সে হয় যাদুকর, না হয় পাগল। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল অভিযুক্ত। (৪১) এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু। (৪২) এই বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল ঃ তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (৪৩) আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছুকাল মজা লুটে নাও। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখছিল। (৪৫) অতঃপর তারা দাঁড়াতে সক্ষম হল না এবং কোন প্রতিকারও করতে

পারল না। (৪৬) আমি ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার কাছে ইবরাহীম (আ)-এর সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? ['সম্মানিত' বলার এক কারণ এই যে, তারা ফেরেশতা ছিল। ফেরেশ-তাদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে بل عباد مكرمون বলা হয়েছে। অথবা এর কারণ ছিল এই যে, ইবরাহীম (আ) স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী তাদেরকে সম্মান করেছিলেন। বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে 'মেহমান' বলা হয়েছে। কারণ, তাঁরা মানুষের বেশে আগমন করেছিল। এই বৃত্তান্ত তখনকার ছিল,] যখন তারা (মেহমানরা) তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করল, তখন ইবরাহীম (আ)-ও (জওয়াবে) বললেন : সালাম। (আরও বললেন :) অপরিচিত লোক (মনে হয়। বাহ্যত তিনি একথা মনে মনে চিন্তা করেছিলেন। কারণ, এরপর ফেরেশতাদের কোন উত্তর উল্লেখ করা হয়নি। একথা সরাসরি তাদেরকে বলে দেওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনাও আছে যে, আপনাদেরকে তো চিনলাম না। আগন্তুক মেহ-মানরা এর কোন জওয়াব দেয়নি এবং ইবরাহীম (আ)-ও জওয়াবের অপেক্ষা করেন নি। মোটকথা এই সালাম ও কালামের পর) তিনি গৃহে গেলেন এবং একটি মোটা গোবৎস ভাজা (لقوله تعالى بعجل حنيذ) নিয়ে হাযির হলেন। তিনি গোবৎসটি তাদের সামনে রাখলেন। [তারা ফেরেশতা ছিল বিধায় আহার করল না। তখন ইবরাহীম (আ)-এর সন্দেহ হল এবং] বললেন : তোমরা আহার করছ না কেন? (এরপরও যখন আহার করল না, তখন) তাদের সম্পর্কে তিনি শংকিত হলেন (যে এরা শত্রু কিনা, কে জানে; যেমন সূরা হূদে বর্ণিত হয়েছে)। তারা বলল : আপনি ভীত হবেন না। (আমরা মানুষ নই, ফেরেশতা। একথা বলে) তারা তাঁকে এক পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল, যে জ্ঞানীগুণী (অর্থাৎ নবী) হবে। [কেননা, মানবজাতির মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক জ্ঞানী হন। এখানে হযরত ইসহাক (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। এসব কথাবার্তা চলছিল, ইতিমধ্যে] তাঁর স্ত্রী (হযরত সারা, যিনি নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন, لقوله تعالى وامرأته قائمة সন্তানের সংবাদ শুনে) চিৎকার করতে করতে সামনে এলেন। অতঃপর ফেরেশতারা যখন তাঁকেও এই সংবাদ শোনাল لقوله تعالى فبشرناها باسحاق —তখন আশ্চর্যান্বিতা হয়ে) মুখ চাপড়িয়ে বললেন : (প্রথমত) আমি বৃদ্ধা (এরপর) বন্ধ্যা। (এমতাবস্থায় সন্তান হওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার বটে;) ফেরেশতারা বলল : (আশ্চর্য হবেন না لقوله تعالى اتعجبين) আপনার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি

প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (অর্থাৎ বিষয়টি বাস্তবে আশ্চর্যের হলেও আপনি নবী-পরিবারের লোক, জ্ঞানে-গুণে ধন্য। আল্লাহ্র উক্তি জেনে আশ্চর্য বোধ করা উচিত নয়)। ইবরাহীম (আ) (নবীসুলভ দূরদর্শিতা দ্বারা জানতে পারলেন যে, সুসংবাদ ছাড়া তাদের আগমনের আরও উদ্দেশ্য আছে। তাই) বললেন : হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? তারা বলল : আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ কওমে লূতের) প্রতি প্রেরিত হয়েছি, যাতে তাদের উপর পাথর বর্ষণ করি—যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্য আপনার পালনকর্তার কাছে (অর্থাৎ অদৃশ্য জগতে) চিহ্নিত আছে। (সূরা হূদে তা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : যখন আযাবের সময় ঘনিয়ে এল, তখন) সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি। (এতে বোঝানো হয়েছে যে, সেখানে মুসলমানদের আর কোন গৃহই ছিল না। কারণ, যার অস্তিত্ব আল্লাহ্ জানেন না, তা মওজুদ হতেই পারে না)। যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য সেথায় (চিরকালের জন্য) একটি নিদর্শন রেখেছি এবং মূসা (আ)-র বৃত্তান্তেও নিদর্শন রয়েছে; যখন আমি তাঁকে সুস্পষ্ট প্রমাণ (অর্থাৎ মো'জেযা)-সহ ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, সে পারিষদবর্গসহ মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল : সে হয় যাদুকর, না হয় উন্মাদ। অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম (অর্থাৎ নিমজ্জিত করলাম)। সে শাস্তিযোগ্য কাজই করেছিল এবং নিদর্শন রয়েছে 'আদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর অশুভ বায়ু প্রেরণ করেছিলাম। এই বায়ু যার উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল (অর্থাৎ ধ্বংসের আদেশপ্রাপ্ত যেসব বস্তুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হত,) তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল : [অর্থাৎ সালেহ্ (আ) বলেছিলেন :] কিছুকাল আরাম করে নাও। (অর্থাৎ কুফর থেকে বিরত না হলে কিছুদিন পরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে)। অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল, এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখছিল। (অর্থাৎ এই আযাব খোলাখুলিভাবে আগমন করল)। অতএব, তারা না দাঁড়াতে সক্ষম হল (বরং উপুড় হয়ে পড়ে রইল لقوله تعالى جاثمين -) এবং না কোন প্রতিকার করতে পারল। ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়েরও ঐ অবস্থা হয়েছিল। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্ত্বনার জন্য অতীত যুগের কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

فَقَالُوْا سَلَامًا - قَالَ سَلَامٌ — ফেরেশতাগণ বলেছিল سَلَامًا ইবরাহীম (আ) জওয়াবে বললেন سَلَامٌ কেননা, এতে সার্বক্ষণিক শান্তির অর্থ নিহিত রয়েছে।

কোরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জওয়াব সালামকারীর ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও। ইবরাহীম (আ) এভাবে সেই নির্দেশ পালন করলেন।

قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ—مُنْكَر শব্দের অর্থ অপরিচিত। ইসলামে গোনাহের কাজও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গোনাহ্‌কেও مُنْكَر বলে দেওয়া হয়। বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে চিনতে পারেন নি। তাই মনে মনে বললেন : এরা তো অপরিচিত লোক। এটাও সম্ভবপর যে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা।

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ—رَاغَ শব্দটি رَوْغٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ গোপনে চলে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্য এভাবে গৃহে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি। নতুবা তারা এ কাজে বাধা দিত।

মেহমানদারির উত্তম রীতিনীতি : ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতে মেহমানদারির কতিপয় উত্তম রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথম এই যে, তিনি প্রথমে মেহমানদেরকে আহার্য আনার কথা জিজ্ঞাসা করেন নি; বরং চুপিসারে গৃহে চলে গেলেন। অতঃপর অতিথি আপ্যায়নের জন্য তাঁর কাছে যে উত্তম বস্তু অর্থাৎ গোবৎস ছিল, তাই যবেহ্ করলেন এবং ভাজা করে নিয়ে এলেন। দ্বিতীয়ত, আনার পর তা খাওয়ার জন্য মেহমানদেরকে ডাকলেন না; বরং তারা যেখানে উপবিষ্ট ছিল, সেখানে এনে সামনে রেখে দিলেন। তৃতীয়ত, আহার্য বস্তু পেশ করার সময় কথাবার্তার ভঙ্গিতে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি ছিল না। বরং বলেছেন أَلَا تَأْكُلُونَ—অর্থাৎ তোমরা কি খাবে না। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, খাওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও আমার খাতিরে কিছু খাও।

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ—অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) তাদের না খাওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে শংকাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্রসমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোন মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী শত্রু বলে আশংকা করা হত। সেই যুগের চোর-ডাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা জ্ঞান ছিল যে, তারা যার বাড়ীতে কিছু খেত, তার ক্ষতি সাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশংকার কারণ ছিল।

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ—صَرَّة-এর অর্থ অসাধারণ আওয়ায। কলমের শব্দকে صَرِيْر বলা হয়। হযরত সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিতেছে, আর একথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান স্ত্রীর

গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বললেন : عَجُوزٌ عَقِيمٌ অর্থাৎ প্রথমত আমি বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা। যৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন বার্ধক্যে এটা কিরূপে সম্ভব হবে? জওয়াবে ফেরেশতাগণ বলল : كَذٰلِكَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজও এমনিভাবেই হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স একশ বছর ছিল।—(কুরতুবী)

এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহ্‌র ফেরেশতা। অতএব তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি অভিযানে আগমন করেছেন? তারা হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আযাব নাযিল করার কথা বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয়—মাটি নির্মিত কংকর দ্বারা হবে। مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ—অর্থাৎ কংকরগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্য কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে লূতের আযাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে দেন। এটা প্রস্তর বর্ষণের পরিপন্থী নয়। প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং পরে সমগ্র ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কওমে-লূতের পর মূসা (আ)-র সম্প্রদায়, ফিরাউন প্রমুখ সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ফিরাউনকে যখন মূসা (আ) সত্যের পয়গাম দেন, তখন বলা হয়েছে : فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ অর্থাৎ ফিরাউন মূসা (আ)-র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনা-বাহিনী ও পারিষদবর্গের উপর ভরসা করে। رُكْن-এর শাব্দিক অর্থ শক্তি। হযরত লূত (আ)-এর বাক্যে اَوْ اٰوِیْ اِلٰی رُكْنٍ شَدِيْدٍ- এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর 'আদ সম্প্রদায়, সামূদ এবং পরিশেষে কওমে নূহের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঘটনার বিবরণ ইতিপূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ۝ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ

الْمٰهِدُوْنَ۝ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۝
فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ
اِلٰـهًا اٰخَرَ ۭ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۝ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ
قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ۝ وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(৪৭) আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী। (৪৮) আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম। (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। (৫০) অতএব আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (৫১) তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (৫২) এমনিভাবে, তাদের পূর্ব-বর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা বলেছেঃ যাদুকর, না হয় উন্মাদ। (৫৩) তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্তুত তারা দুষ্ট সম্প্রদায়। (৫৪) অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এতে আপনি অপরাধী হবেন না। (৫৫) এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মু'মিনদের উপকারে আসবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (নিজ) ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি ব্যাপক ক্ষমতাশালী। আমি ভূমিকে বিছানা (স্বরূপ) করেছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম। (অর্থাৎ এতে কত চমৎকার উপকারিতা নিহিত রেখেছি। আমি প্রত্যেক বস্তু দুই দুই প্রকার সৃষ্টি করেছি, এই প্রকারের অর্থ বিপরীত পক্ষ। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে কোন-না-কোন সত্তাগত ও অসত্তাগত গুণ এমন রয়েছে, যা অন্য বস্তুর গুণের বিপরীত। ফলে এক বস্তুকে অপর বস্তুর বিপরীত গণ্য করা হয়; যেমন আকাশ ও পাতাল, উত্তাপ ও শৈত্য, মিষ্ট ও তিক্ত, ছোট ও বড়, সুশ্রী ও কুশ্রী, সাদা ও কাল এবং আলো ও অন্ধকার)। যাতে তোমরা (এসব সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমে তওহীদকে) হৃদয়ঙ্গম কর। (হে পয়গম্বর! তাদেরকে বলে দিন, যখন এসব সৃষ্ট বস্তু স্রষ্টার একত্ব বোঝায়, তখন) তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের উচিত, এসব প্রমাণের ভিত্তিতে) আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও, (তদুপরি) আমি তোমাদের (বোঝানোর) জন্য আল্লাহ্‌র

পক্ষ থেকে স্পষ্ট সতর্ককারী (যে, তওহীদ অমান্য করলে শাস্তি হবে। কাজেই তওহীদের বিশ্বাস আরও জরুরী। আরও স্পষ্ট করে বলছি ঃ) তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। (তওহীদের বিষয়বস্তু শব্দান্তরে বর্ণনার কারণে সতর্কীকরণের তাকীদার্থে বলা হচ্ছে ঃ) আমি তোমাদের (বোঝানোর) জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে স্পষ্ট সতর্ককারী। (অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন ঃ আপনি নিঃসন্দেহে স্পষ্ট সতর্ককারী কিন্তু আপনার বিরোধী পক্ষ এত মূর্খ যে, তারা আপনাকে কখনও যাদুকর, কখনও উন্মাদ বলে। অতঃপর আপনি সবর করুন। কেননা, তারা যেমন আপনাকে বলছে,) এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা (সবাই অথবা কতক) বলেছে ঃ যাদুকর, না হয় উন্মাদ। (অতঃপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার মুখে একই কথা উচ্চারিত হওয়ার কারণে বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হচ্ছে ঃ) তারা কি একে অপরকে এ বিষয়ের ওসীয়ত করে এসেছে ? (অর্থাৎ এই ঐকমত্য তো এখন, যেমন একে অপরকে বলে গেছে, দেখ যে রসূলই আগমন করে, তোমরা তাকে আমাদের মতই বলবে। অতঃপর বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, একে অপরকে এ বিষয়ে কোন ওসীয়ত করেনি। কেননা, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সাথে দেখাও করেনি। বরং ঐকমত্যের কারণ এই যে) তারা সবাই অবাধ্য সম্প্রদায় (অর্থাৎ অবাধ্যতায় যখন তারা অভিন্ন, তখন উক্তিও অভিন্ন হয়ে গেছে)। অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (অর্থাৎ তাদের মিথ্যাবাদী বলার পরোয়া করবেন না)। এতে আপনি অপরাধী হবেন না। বোঝাতে থাকুন কেননা, বোঝানো (যাদের ভাগ্যে ঈমান নেই, তাদেরকে জব্দ করার কাজে আসবে এবং যাদের ভাগ্যে ঈমান আছে, সেই) ঈমানদারদেরকে (এবং যারা পূর্ব থেকে মু'মিন, তাদেরকেও) উপকার দেবে। (মোট কথা, উপদেশ দানের মধ্যে সবারই উপকার আছে। আপনি উপদেশ দিয়ে যান এবং ঈমান না আনার কারণে দুঃখ করবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং অস্বীকারকারীদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় শক্তি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে কিয়ামত ও কিয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এছাড়া আয়াতসমূহে তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং রিসালতে বিশ্বাস স্থাপনের তাকীদ রয়েছে।

بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ — اَيْد শব্দের অর্থ শক্তি ও সামর্থ্য। এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ তফসীরই করেছেন।

فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ — অর্থাৎ আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও। হযরত ইবনে আব্বাস

(রা) বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গোনাহ্ থেকে ছুটে পালাও। আবু বকর ওয়াররাক ও জুনায়েদ বাগদাদী (র) বলেন ঃ প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে গোনাহ্র দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে ছুটে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।—(কুরতুবী)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ۝ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝

(৫৬) আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিনকে সৃষ্টি করেছি। (৫৭) আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। (৫৮) আল্লাহ্ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা, শক্তিশালী, পরাক্রান্ত। (৫৯) অতএব এই জালিমদের প্রাপ্য তাই, যা তাদের অতীত সহচরদের প্রাপ্য ছিল। কাজেই তারা যেন আমার কাছে তা তাড়াতাড়ি না চায়। (৬০) অতএব কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রকৃতপক্ষে) আমার ইবাদত করার জন্যই আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি (এখন আনুষঙ্গিকভাবে ও ইবাদতের পূর্ণতার খাতিরে জিন ও মানব সৃষ্টির ফলে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়া আয়াতের পরিপন্থী নয়। এমনিভাবে কতক জিন ও কতক মানব দ্বারা ইবাদত সংঘটিত না হওয়াও এই বিষয়বস্তুর প্রতিকূলে নয়। কেননা, لِيَعْبُدُونِ—এর সারমর্ম হচ্ছে তাদেরকে ইবাদতের আদেশ করা—ইবাদত করতে বাধ্য করা নয়। শুধু জিন ও মানবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এখানে ইচ্ছাধীন ও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ইবাদত বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাদের মধ্যে ইবাদত আছে বটে, কিন্তু তা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নয়। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু তথা জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির ইবাদত ইচ্ছাধীন নয়। মোট কথা এই যে, তাদের কাছে আইনগত দাবী হল ইবাদত। এছাড়া) আমি তাদের কাছে (সৃষ্ট জীবের) জীবিকা দাবী করি না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ্ নিজেই সবার রিযিকদাতা (কাজেই সৃষ্ট জীবকে রিযিকদানের দায়িত্ব তাদের হাতে অর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই), শক্তিশালী,

পরাক্রান্ত। (অপারকতা, দুর্বলতা ও অভাব-অনটনের কোন যৌক্তিক সম্ভাবনাও নেই। কাজেই আহার্য চাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখন ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, যখন ইবাদতের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল এবং ইবাদতের প্রধান অঙ্গ ঈমান, তখন এরা এখনও শিরক ও কুফরকে আঁকড়ে থাকলে শুনে রাখুক) এই জালিমদের প্রাপ্য শাস্তি আল্লাহ্র জ্ঞানে তাই (নির্ধারিত), যা তাদের (অতীত) সমমনাদের প্রাপ্য (নির্ধারিত) ছিল। (অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধী জালিমের জন্য আল্লাহ্র জ্ঞানে বিশেষ বিশেষ সময় নির্ধারিত আছে। প্রত্যেক অপরাধীকে পালাক্রমে আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়—কখনও ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানে এবং কখনও শুধু পরকালে)। অতএব তারা যেন আমার কাছে তা (অর্থাৎ আযাব) তাড়াতাড়ি না চায়, (যেমন এটাই তাদের অভ্যাস। তারা সতর্কবাণী শুনে মিথ্যারোপ করার ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি আযাব চাইতে থাকে)। অতএব (যখন পালার দিন আসবে, যার মধ্যে কঠোরতর দিন হচ্ছে প্রতিশ্রুত দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, তখন) কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। (খোদ এই সূরাও এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা শুরু হয়েছিল : إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ এবং ইতিও এই প্রতিশ্রুতির উপর করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এতে সূরার অলংকারগত সৌন্দর্যই প্রকাশ পেয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এখানে বাহ্য দৃষ্টিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। এক. যাকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য সেই কাজ থেকে বিরত থাকা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব, অপ্রাকৃত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিপরীত কোন কাজ করা অসম্ভব। দুই. আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব সৃষ্টিকে কেবল ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের সৃষ্টিতে ইবাদত ব্যতীত আরও অনেক উপকারিতা ও রহস্য বিদ্যমান আছে।

প্রথম প্রশ্নের জওয়াবে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই বিষয়বস্তু শুধু মু'মিনদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি মু'মিন জিন ও মু'মিন মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। বলা বাহুল্য, যারা মু'মিন, তারা কমবেশী ইবাদত করে থাকে। যাহ্হাক, সুফিয়ান প্রমুখ তফসীরবিদ এই উক্তি করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এই আয়াতের এক কিরা'আত مُؤْمِنِين শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াত এভাবে পাঠ করা হয়েছে وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ এই কিরা'আত থেকে উপরোক্ত তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের জওয়াবে

তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, আয়াতে জবরদস্তিমূলক ইচ্ছা বোঝানো হয়নি, যার বিপরীত হওয়া অসম্ভব বরং আইনগত ইচ্ছা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে ইবাদত করার আদেশ দিই। আল্লাহ্র আদেশকে মানুষের ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত রাখা হয়েছে। তাই আদেশের বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ সবাইকে ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন; কিন্তু সাথে সাথে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষমতাও দিয়েছেন। তাই কোন কোন লোক আল্লাহ্প্রদত্ত ইচ্ছা যথার্থ ব্যয় করে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ইচ্ছার অসদ্ব্যবহার করে ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই উক্তি ইমাম বগভী (র) হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তফসীরে-মাযহারীতে এর সরল তফসীর এই বর্ণিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। সেমতে প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে এই প্রতিভা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এরপর কেউ এই প্রতিভাকে সঠিক পথে ব্যয় করে কৃতকার্য হয় এবং কেউ একে গোনাহ্ ও কুপ্রবৃত্তিতে বিনষ্ট করে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او يمجسانه অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইহুদী অথবা অগ্নিপূজারীতে পরিণত করে। 'প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ' করার অর্থ অধিকাংশ আলিমের মতে ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করা। অতএব, এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগতভাবে ইসলাম ও ঈমানের যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। এরপর তার পিতামাতা এই প্রতিভাকে বিনষ্ট করে কুফরের পথে পরিচালিত করে। এই হাদীসের অনুরূপ আলোচ্য আয়াতেরও এরূপ অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বর্ণিত হয়েছে যে, ইবাদতের জন্য কাউকে সৃষ্টি করা তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়ার পরিপন্থী নয়। مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ—অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোন উপকার চাই না যে, তারা রিযিক সৃষ্টি করবে আমার জন্য অথবা নিজেদের জন্য অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্ট জীবের জন্য। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা, যত বড় লোকই হোক না কেন—কেউ যদি কোন গোলাম ক্রয় করে এবং তার পেছনে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাবে এবং রুযী-রোযগার করে মালিকের হাতে সমর্পণ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে আমার কোন উপকার উদ্দেশ্য নয়।

ذَنُوبًا — শব্দের আসল অর্থ কূয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কূয়াগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذنوب শব্দের অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা দেওয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালার কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যও পালা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুফর থেকে বিরত না হয়, তবে আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন ত্বরিত আযাব চাওয়া থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ কাফিররা অস্বীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে যে, আমরা বাস্তবিক অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের উপর আযাব আসে না কেন? এর জওয়াব এই যে, আযাব নির্দিষ্ট সময় ও পালা অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এল বলে! কাজেই তাড়াহড়া করো না।

سورة الطور

সূরা তূর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৯ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالطُّوْرِ ۙ﴿۱﴾ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۙ﴿۲﴾ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۙ﴿۳﴾ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۙ﴿۴﴾
وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۙ﴿۵﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۙ﴿۶﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ﴿۷﴾
مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۙ﴿۸﴾ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۙ﴿۹﴾ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ
سَيْرًا ؕ﴿۱۰﴾ فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۙ﴿۱۱﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ
يَّلْعَبُوْنَ ۘ﴿۱۲﴾ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ؕ﴿۱۳﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ
كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿۱۴﴾ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۚ﴿۱۵﴾ اِصْلَوْهَا
فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۙ﴿۱۷﴾ فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ
رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿۱۸﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـئًا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۙ﴿۱۹﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ
عِيْنٍ ﴿۲۰﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿۲۱﴾
وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿۲۲﴾ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا
لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ﴿۲۳﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ

فَكِهُوْنَ ۝ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ۝ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ۝ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ۝ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(১) কসম তূর পর্বতের (২) এবং লিখিত কিতাবের (৩) প্রশস্ত পত্রে, (৪) কসম বায়তুল-মামুর তথা আবাদ গৃহের (৫) এবং সমুন্নত ছাদের (৬) এবং উত্তাল সমুদ্রের (৭) আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, (৮) তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৯) সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে (১০) এবং পর্বতমালা হবে চলমান, (১১) সেইদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে, (১২) যারা ক্রীড়াচ্ছলে মিছামিছি কথা বানায়। (১৩) যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। (১৪) এবং বলা হবে : এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে, (১৫) এটা কি যাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? (১৬) এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। (১৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নিয়ামতে (১৮) তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। (১৯) তাদেরকে বলা হবে : তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। (২০) তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (২১) যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতাদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। (২২) আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। (২৩) সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। (২৪) সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে। (২৫) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৬) তারা বলবে : আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। (২৭) অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (২৮) আমরা পূর্বেও আল্লাহ্‌কে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম তূর (পর্বতের), এই সেই কিতাবের, যা উম্মুক্ত পত্রে লিখিত আছে। (অর্থাৎ

আমলনামা, যার সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا

এবং কসম বায়তুল মামুরের (এটা সপ্তম আকাশে ফেরেশতাদের ইবাদতখানা)। এবং কসম সমুন্নত ছাদের (অর্থাৎ আকাশের; আল্লাহ্ বলেনঃ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ

سَقْفًا مَحْفُوظًا—আরও বলেন اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ) এবং কসম উত্তাল-সমুদ্রের। (অতঃপর কসমের জওয়াব বলা হচ্ছেঃ) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার আযাব অবশ্যম্ভাবী, কেউ একে প্রতিরোধ করতে পারবে না। (এটা সেদিন হবে) যেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা (স্বস্থান থেকে) সরে যাবে। [অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রকম্পিত হওয়া সাধারণ অর্থেও হতে পারে এবং বিদীর্ণ হওয়ার অর্থেও হতে পারে; যেমন অন্য আয়াতে আছে فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ রূহুল-মা'আনীতে উভয় তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। অগ্রে-পশ্চাতে উভয়টি হতে পারে। এখানে পর্বতমালার সরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ يَنْسِفُهَا

رَبِّىْ অন্য আয়াতে আছে بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً এসব কসমের কারণ একটি উদ্দেশ্যকে চিন্তাধারার নিকটবর্তী করা। উদ্দেশ্য এইঃ কিয়ামত সংঘটনের আসল কারণ প্রতিদান ও শাস্তি। এটা শরীয়তের বিধানাবলীর ভিত্তিতে হবে। অতএব, তুর পর্বতের কসম খাওয়ার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাক্যালাপ ও বিধানাবলী প্রদানের মালিক। এসব বিধান পালন অথবা প্রত্যাখ্যানের ভিত্তিতে প্রতিদান ও শাস্তি হবে। আমলনামার কসম খাওয়ার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই বিধানাবলী পালন ও প্রত্যাখ্যান সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিদান ও শাস্তি এর উপর নির্ভরশীল, যাতে বিধানাবলী প্রতিপালন জরুরী হয়। বায়তুল মামুরের কসমে ইঙ্গিত আছে যে, ইবাদত একটি জরুরী বিষয়। এমনকি, যে ফেরেশতাদের প্রতিদান ও শাস্তি নেই, তাদেরকেও এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। অতঃপর জান্নাত ও দোযখ এই দুটি বস্তু হচ্ছে প্রতিদান ও শাস্তির পরিণতি। আকাশের কসমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জান্নাত আকাশের মতই সমুন্নত বস্তু। উত্তাল সমুদ্রের কসমে ইশারা রয়েছে যে, দোযখও উত্তাল সমুদ্রের অনুরূপ ভয়াবহ বস্তু। এরপর কিয়ামতের কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যখন শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী তখন] যারা (কিয়ামত, তওহীদ, রিসালত ইত্যাদি সত্য বিষয়ে) মিথ্যা-রোপ করে (এবং) যারা ক্রীড়াচ্ছলে মিছামিছি কথা বানায়, (ফলে শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়)

সেদিন তাদের খুবই দুর্ভোগ হবে, যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। (কেমনা, এরূপ জায়গার দিকে কেউ স্বেচ্ছায় যেতে চাইবে না। অতঃপর নিক্ষেপের সময় فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْأَقْدَامِ—অর্থাৎ মাথার ও পায়ে ধরে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তাদেরকে দোযখ দেখিয়ে শাসিয়ে বলা হবে:) এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে (অর্থাৎ এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলতে) এবং যাদু আখ্যা দিতে। আয়াতগুলো তো তোমাদের মতে যাদু ছিলই। এখন এটা (-ও) কি যাদু, (দেখে বল) না (এখনও) তোমরা চোখে দেখছ না? (যেমন দুনিয়াতে চোখে না দেখার কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলে)। এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। (তোমাদের হা-হুতাশের কারণে মুক্তি দান করা হবে না এবং মেনে নেওয়ার ফলেও দয়া করে দোযখ থেকে বের করা হবে না, বরং অনন্তকাল এতে থাকতে হবে)। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। (তোমরা কুফর করতে, যা সর্ববৃহৎ অবাধ্যতা এবং আল্লাহ্‌র হক ও অসীম গুণাবলীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা। সুতরাং প্রতিফলস্বরূপ অনন্তকাল দোযখ ভোগ করবে। অতঃপর কাফিরদের বিপরীতে মু'মিনদের কথা বলা হচ্ছে:) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা (জান্নাতের) উদ্যানসমূহে ও ভোগবিলাসের মধ্যে থাকবে। তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে (ভোগবিলাস) দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। (এবং জান্নাতে দাখিল করে বলবেন:) তোমরা (দুনিয়াতে) যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ খুব তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (এটা হবে সাধারণ মু'মিনদের অবস্থা। অতঃপর সেই মু'মিনদের কথা বলা হচ্ছে, যাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমানের গুণে গুণান্বিত। বলা হচ্ছে:) যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানে তাদের অনুগামী (অর্থাৎ তারাও ঈমানদার যদিও তারা আমলে পিতাদের সীমা পর্যন্ত পৌঁছেনি। আমলের কথা উল্লেখ না করায় তা বোঝা যায়। এছাড়া হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, বলা হয়েছে: كانوا دونه فى العمل وكانت منازل ابائهم ارفع ولم يبلغوا درجتك وعملك এমতাবস্থায় আমলে ত্রুটি থাকার কারণে তাদের মর্তবা কম হবে না বরং মু'মিন পিতাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য) আমি সন্তানদেরকেও (মর্তবায়) তাদের সাথে মিলিত করে দেব। (মিলিত করার জন্য) আমি তাদের (অর্থাৎ জান্নাতী পিতাদের) আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না (অর্থাৎ পিতাদের কিছু আমল হ্রাস করে সন্তানদেরকে দিয়ে সমান করা হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তির কাছে ছয়শ টাকা এবং এক ব্যক্তির কাছে চারশ টাকা আছে। উভয়কে সমান করার উদ্দেশ্য হলে এক উপায় হল এই যে, ছয়শ টাকা ওয়ালার কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে চারশ ওয়ালাকে দেওয়া। ফলে উভয়ের কাছে পাঁচশ পাঁচশ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় উপায় এই যে ছয়শ ওয়ালার কাছ থেকে কিছুই না নেওয়া, বরং চারশ ওয়ালাকে নিজের কাছ থেকে দু'শ টাকা দিয়ে দেওয়া

এবং উভয়কে সমান সমান করে দেওয়া। এটা দাতাদের পক্ষে অধিক উপযুক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এক্ষেত্রে প্রথম উপায় অবলম্বিত হবে না। যার ফলে এই হত যে, পিতাদেরকে আমল কম হওয়ার কারণে নীচের স্তরে নামিয়ে আনা হত এবং সন্তানদেরকে কিছু উপরে তুলে দেওয়া হত। এটা হবে না, বরং দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করা হবে। ফলে পিতাগণ তাদের উচ্চস্তরেই থেকে যাবে এবং সন্তানদেরকে তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। সন্তানদের মধ্যে ঈমানের শর্ত না থাকলে তারা মু'মিন পিতাদের সাথে মিলিত হতে পারবে না। কেননা, কাফিরদের মধ্যে) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ (কুফরী) কৃতকর্মের জন্য দায়ী। (لقوله تعالى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلَّا اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ অর্থাৎ মুক্তির কোন উপায় নেই। ফলে তাদের মু'মিন পিতাদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই মিলিত হওয়ার জন্য সন্তানদের মধ্যে ঈমান থাকা শর্ত। অতঃপর পুনরায় ঈমানদার ও জান্নাতীদের কথা বলা হচ্ছে ঃ) আমি তাদেরকে দেব ফলমূল ও গোশ্‌ত, যা তারা পছন্দ করবে। সেখানে তারা (আনন্দ-উল্লাসের ভঙ্গিতে) একে অপরকে পানপাত্র দেবে। এতে (অর্থাৎ পানীয়তে) অসার বকাবকি নেই, (কেননা তা নেশাযুক্ত হবে না) এবং পাপ কর্মও নেই। তাদের কাছে (ফলমূল আনার জন্য) এমন কিশোররা আসা-যাওয়া করবে (এই কিশোর কারা? সূরা ওয়াকিয়ায় তা বর্ণনা করা হবে)। যারা (বিশেষভাবে) তাদেরই সেবায় নিয়োজিত থাকবে (এবং এমন সুশ্রী হবে) যেন সুরক্ষিত 'মোতি'। (যা অত্যন্ত চমকদার ও ধূলাবালু মুক্ত হয়ে থাকে। তারা আধ্যাত্মিক আনন্দও লাভ করবে। তন্মধ্যে এক এই যে,) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে (এবং একথাও) বলবে যে, আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে (অর্থাৎ দুনিয়াতে পরিণাম সম্পর্কে) ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও (অর্থাৎ দুনিয়াতে) তাঁর কাছে দোয়া করতাম (যে, আমাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করে জান্নাত দান করুন। তিনি আমাদের দোয়া কবুল করেছেন)। তিনি বাস্তবিকই অনুগ্রহকারী, পরম দয়ালু। (এটা যে আনন্দের বিষয়বস্তু তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالطُّوْرِ—হিব্রু ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদ্গত হয়। এখানে তূর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তূরে সিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি পাহাড় আছে। তন্মধ্যে তূর একটি। —(কুরতুবী) তূরের কসম খাওয়ার মধ্যে উপরোক্ত বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য কিছু কালাম ও আহকাম আগমন করেছে। এগুলো মেনে চলা ফরয।

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ—رق শব্দের আসল অর্থ লেখার জন্য

কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। লিখিত 'কিতাব' বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোন কোন তফসীরবিদের মতে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে।

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ—আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল মামূর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, মি'রাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বায়তুল মামূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে।—(ইবনে কাসীর)

সপ্তম আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মামূর। এ কারণেই মি'রাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (সা) এখানে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বায়তুল মামূরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। —(ইবনে কাসীর)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ—مسجور শব্দটি سجر থেকে উদ্ভূত। এটা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করা। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ—অর্থাৎ চতুর্দিকের সমুদ্র অগ্নি হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তফসীরই হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আলী ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে। —(ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রা)-কে জনৈক ইহুদী প্রশ্ন করল ঃ জাহান্নাম কোথায়? তিনি বললেন ঃ সমুদ্রই জাহান্নাম। পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থে অভিজ্ঞ ইহুদী এই উত্তর সমর্থন করল।—(কুরতুবী) হযরত কাতাদাহ (র) প্রমুখ مسجور-এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জরীর (র) এই অর্থই পছন্দ করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ—আপনার পালনকর্তার আযাব অবশ্যম্ভাবী। একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা পূর্বোল্লিখিত কসমসমূহের জওয়াব।

একবার হযরত ওমর (রা) সূরা তূর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না।—(ইবনে কাসীর)

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতএম (রা) বলেনঃ মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি একবার বদরের যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে মদীনা পৌঁছেছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি যখন إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হল যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন, এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাব।—(কুরতুবী)

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا—অভিধানে অস্থির নড়াচড়াকে مور বলা হয়। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আকাশ অস্থিরভাবে নড়াচড়া করবে।

ঈমান থাকলে বুযুর্গদের সাথে বংশগত সম্পর্ক পরকালেও উপকারে আসবেঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

অর্থাৎ যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকেও জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়, যাতে বুযুর্গদের চক্ষু শীতল হয়।—(মাযহারী)

সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেনঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সম্ভবত রসূলুল্লাহ্ (সা)-রই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরয করবেঃ পরওয়ারদিগার, দুনিয়াতে নিজের জন্য ও তাদের সবার জন্য আমল করে-ছিলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হবেঃ তাদেরকেও জান্নাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক। —(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেনঃ এসব রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। অপরদিকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদের পিতামাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। মসনদে আহমদে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন নেক বান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবে : পরওয়ারদিগার, আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেওয়া হল ? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবে : তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করেছে। এটা তারই ফল।

وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ—الت ও ألات-এর শাব্দিক অর্থ হ্রাস করা।—(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই : সন্তান-সন্ততিকে তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, বুযুর্গদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে। বরং আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় তাদেরকে পিতাদের সমান করে দেবেন।

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ—অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্য দায়ী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে নেক কর্মের বেলায় সৎ কর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু গোনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না।—(ইবনে কাসীর)

فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ
شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم
مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ
طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ
مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾
أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ
رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ
مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ
تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ

يَكْتُبُونَ ۞ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ۞
أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَإِن يَرَوْا
كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ۞ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ
يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُ
هُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ
ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ
بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۞

(২৯) অতএব আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং উন্মাদও নন। (৩০) তারা কি বলতে চায় : সে একজন কবি, আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি। (৩১) বলুন : তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি। (৩২) তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে, না তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? (৩৩) না তারা বলে : এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী। (৩৪) যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক। (৩৫) তারা কি আপনা আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (৩৬) না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। (৩৭) তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভাণ্ডার রয়েছে, না তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক? (৩৮) না তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। (৩৯) না তার কন্যা সন্তান আছে আর তোমাদের আছে পুত্র সন্তান? (৪০) না আপনি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান যে, তাদের উপর জরিমানার বোঝা চেপে বসেছে? (৪১) না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিপিবদ্ধ করে? (৪২) না তারা চক্রান্ত করতে চায়? অতএব যারা কাফির, তারাই চক্রান্তের শিকার হবে। (৪৩) না তাদের আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য আছে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। (৪৪) তারা যদি আকাশের কোন খণ্ডকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে : এটা তো পুঞ্জীভূত মেঘ। (৪৫) তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত পতিত হবে। (৪৬) সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪৭) গোনাহ্গারদের জন্য এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে,

কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন এবং আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি গাত্রোত্থান করেন। (৪৯) এবং রাত্রির কিছু অংশে এবং তারকা অস্তমিত হওয়ার সময় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আপনার প্রতি প্রচারযোগ্য বিষয়বস্তু সম্বলিত ওহী নাযিল করা হয়; (যেমন উপরে জান্নাত ও জাহান্নামের অধিকারীদের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, তখন) আপনি (এসব বিষয়বস্তুর সাহায্যে মানুষকে) উপদেশ দান করুন। কেননা, আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং উম্মাদও নন (যেমন মুশরিকদের এ উক্তি সূরা ওয়ায-যোহার শানে নুযূলে বর্ণিত আছে قد ترك شيطا نك-এর সারমর্ম এই যে, আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী হতে পারেন না। কারণ, অতীন্দ্রিয়বাদীরা শয়তানের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে। শয়তানের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। এক আয়াতে আছেঃ ويقولون انه لمجنون—এখানে বলা হয়েছে যে, আপনি উম্মাদ নন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি নবী। নবীর কাজ সব সময় উপদেশ দান করা—মানুষ যাই বলুক)। তারা কি (অতীন্দ্রিয়বাদী ও উম্মাদ বলা ছাড়াও একথা) বলতে চায়ঃ সে একজন কবি, আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছি (দুররে মনসূরে আছে, কোরাইশরা পরামর্শগৃহে একত্রিত হয়ে প্রস্তাব পাস করল যে, মুহাম্মদও একজন কবি। অন্যান্য কবি যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে খতম হয়ে গেছে, সেও তেমনি খতম হয়ে যাবে এবং ইসলামের ঝগড়া মিটে যাবে)। আপনি বলে দিনঃ (ভাল কথা,) তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষারত আছি। (অর্থাৎ তোমরা আমার পরিণতি দেখ, আমিও তোমাদের পরিণতি দেখি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, আমার পরিণতি শুভ এবং তোমাদের পরিণতি অশুভ ও ব্যর্থতা। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তোমরা মরবে, আমি মরব না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল তার ধর্ম অচল হয়ে যাবে এবং তার মৃত্যুর পর তা মিটে যাবে। এখানে তা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। সেমতে তাই হয়েছে। তারা যে এসব কথাবার্তা বলে) তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে শিক্ষা দেয়, না তারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক? (তারা নিজেদেরকে প্রগাঢ় বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী বলে দাবী করে, যেমন সূরা আহ্‌কাফে বর্ণিত তাদের উক্তি থেকে বোঝা যায় لوكان خيرا ما سبقونا اليه। মায়ালেম কিতাবেও বর্ণিত আছে যে, কোরাইশ সরদারগণ মানুষের মধ্যে অত্যধিক বুদ্ধিমান হিসেবে পরিচিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাদের বুদ্ধির অবস্থা দেখানো হয়েছে যে, বুদ্ধি সঠিক হলে এমন বিষয়ের শিক্ষা দিত না। এটা বুদ্ধির শিক্ষা না হলে নিছক দুষ্টুমি

ও হঠকারিতাই হবে)। না তারা বলে ঃ এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? (এরূপ নয়।) বরং (একথা বলার একমাত্র কারণ এই যে,) তারা (প্রতিহিংসাবশত) অবিশ্বাসী। (নিয়ম এই যে, মানুষ যে বিষয়কে বিশ্বাস করে না, হাজার সত্য হলেও সে সম্পর্কে নেতিবাচক কথাই বলে। খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে আরেক জওয়াব এই যে, এটা যদি তারই রচিত হবে তবে) তারা (-ও তো আরবী ভাষাভাষী, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী) এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক যদি তারা (এ দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাকে। (রিসালত সম্পর্কিত এসব বিষয়বস্তুর পর এখন তওহীদ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ তারা যে তওহীদ অস্বীকার করে,) তারা কি কোন স্রষ্টা ব্যতীত আপনা-আপনি সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? (না এই যে, তারা নিজেদের স্রষ্টাও নয় এবং স্রষ্টা ব্যতীত সৃজিতও হয়নি, কিন্তু) তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? (এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্রষ্টাগুণের মধ্যে অংশীদার, সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে যে, স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্ এবং সে নিজেও স্রষ্টার মুখাপেক্ষী তার জন্য তওহীদে বিশ্বাসী হওয়া এবং আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করাও অপরিহার্য। সে ব্যক্তিই তওহীদ অস্বীকার করতে পারে, যে একমাত্র আল্লাহ্কেই স্রষ্টা মনে করে না অথবা সে সৃজিত একথা অস্বীকার করে। চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে কাফিররা জানত না যে, স্রষ্টা যখন এক তখন উপাস্যও এক হবে। তাই অতঃপর তাদের এই মূর্খতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাস্তবে এরূপ নয়) বরং তারা (মূর্খতার কারণে তওহীদে) বিশ্বাস করে না। (মূর্খতা এটাই যে, স্রষ্টা হলেই উপাস্য হতে হবে একথা চিন্তা-ভাবনা করে না অতঃপর রিসালত সম্পর্কে তাদের অন্যান্য ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। তারা আরও বলত যে, নবুয়ত দান করা যদি অপরিহার্যই ছিল, তবে মক্কা ও তায়িফের অমুক অমুক সরদারকে নবুয়ত দেওয়া হল না কেন? আল্লাহ্ তা'আলা জওয়াবে বলেন ঃ) তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার (নবুয়তসহ নিয়ামত ও রহমতের) ভাণ্ডার রয়েছে (যে যাকে ইচ্ছা নবুয়ত দিয়ে দেবে, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) না তারাই (এই নবুয়ত বিভাগের) হর্তাকর্তা? (যে, যাকে ইচ্ছা, নবুয়ত দান করার আদেশ দেবে? অর্থাৎ নবুয়ত দান করার উপায় দুইটি ঃ এক. ভাণ্ডারের অধিকারী হয়ে, দুই. যারা ভাণ্ডারের অধিকারী, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হয়ে নির্দেশের মাধ্যমে তা দান করবে। এখানে উভয় সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তারা মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালত অস্বীকার করে এবং মক্কা ও তায়িফের সরদারদেরকে রিসালতের যোগ্য মনে করে। তাদের কাছে এর কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ নেই, বরং এর বিপরীতে প্রমাণাদি রয়েছে। এ কারণেই শুধু প্রশ্নবোধক 'না' বলা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, এর পক্ষে কোন ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণও নেই) না তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে (আকাশের) কথাবার্তা শ্রবণ করে (অর্থাৎ তাদের কোন ব্যক্তির প্রতি ওহী নাযিল হয় না এবং তাদের কেউ আকাশে আরোহণ করে না। অতঃপর এ সম্পর্কে একটি যুক্তিগত সম্ভাবনা বাতিল করা হচ্ছে যে, যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তারা আকাশে আরোহণ করার ও সেখানকার কথাবার্তা শোনার দাবী করতে থাকবে) তবে তাদের শ্রোতা (এই দাবীর পক্ষে) সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক (যে, সে ওহী লাভ করেছে, যেমন আমাদের নবী স্বীয়

ওহীর পক্ষে নিশ্চিত অলৌকিক প্রমাণাদি রাখেন। অতঃপর আবার তওহীদের এক বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ তওহীদ অবিশ্বাসীরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করে শিরক করে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি) আল্লাহ্‌র কি কন্যা সন্তান আছে, আর তোমাদের আছে পুত্র সন্তান? (অর্থাৎ নিজেদের জন্য তো তোমা-দের জ্ঞানে উৎকৃষ্ট বস্তু পছন্দ কর আর আল্লাহ্‌র জন্য এমন বস্তু পছন্দ কর, যাকে তোমরা নিকৃষ্ট মনে কর। অতঃপর আবার রিসালত সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, আপনার সত্যতা প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও আপনার অনুসরণ তাদের পছন্দনীয় নয়। তবে) আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান যে, এই কর দেওয়া তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে গেছে? যেমন আল্লাহ্ বলেন,

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا অতঃপর কিয়ামত ও প্রতিদান সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তারা বলে: প্রথমত, কিয়ামত হবেই না, যদি হয় তবে সেখানেও আমরা ভাল অবস্থায় থাকব। যেমন আল্লাহ্ বলেন: وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي

إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা এই যে) তাদের কাছে কি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারা তা (সংরক্ষিত রাখার জন্য) লিপিবদ্ধ করে? না তারা (রসূ-লের সাথে) চক্রান্ত করতে চায়? (অন্য আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ)

অতএব যারা কাফির, তারাই এই চক্রান্তের শিকার হবে। (সেমতে তারা চক্রান্তে ব্যর্থ হয়ে বদরে নিহত হয়েছে। অতঃপর তওহীদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে) আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের অন্য কোন উপাস্য আছে কি? আল্লাহ্ তাদের আরোপিত শিরক থেকে পবিত্র। (কাফিররা রিসালতের বিপক্ষে এ কথাও বলত যে, আমরা তখন আপনাকে রসূলরূপে মেনে নেব, যখন আপনি আকাশের কোন খণ্ড ভূপাতিত করে দেন।

যেমন আল্লাহ্ বলেন: أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا —এর জওয়াব এই যে, রিসালতের পক্ষে শুরু থেকেই প্রমাণ কায়েম রয়েছে। কাজেই ফরমায়েশী প্রমাণ কায়েম করার কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, প্রমাণপ্রার্থী সত্যান্বেষী হলে ফরমায়েশী প্রমাণও কায়েম করা যায়। কিন্তু কাফিরদের ফরমায়েশ সত্যের জন্য নয়, নিছক হঠ-কারিতাবশত। তারা তো এমন হঠকারী যে) তারা যদি আকাশের কোন খণ্ডকে পতিত হতেও দেখে, তবুও বলবে: এটা তো পুঞ্জীভূত মেঘ। (যেমন আল্লাহ্ বলেন:

وَلَوْ اَنَّا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُوْنَ অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, এরা যখন এতই উদ্ধত ও অবাধ্য, তখন তাদের কাছে ঈমান প্রত্যাশা করে দুঃখিত হবেন না ; বরং) তাদেরকে ছেড়ে দিন সেই দিনের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যে দিন তাদের হুঁশ উড়ে যাবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। অতঃপর সেই দিনের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে) যে দিন তাদের (ইসলামের বিরোধিতা ও নিজেদের সাফল্য সম্পর্কিত) চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা (কোথাও থেকে) সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (সেদিন তারা সত্যাসত্য জেনে নেবে। এর আগে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না)। গোনাহ্‌গারদের জন্য এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন দুর্ভিক্ষ, বদরে নিহত হওয়া ইত্যাদি)। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। ('অধিকাংশ' বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তাদের কতকের জন্য ঈমান অবধারিত ছিল। তাদের শাস্তির জন্য যখন আমি সময় নির্ধারিত রেখেছি, তখন) আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। (এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের প্রতিশোধ ত্বরান্বিত করতে চাইবেন না যে, তারা আপনার কোন ক্ষতি সাধন করবে। এরূপ আশংকা করবেন না। কেননা) আপনি আমার হিফাযতে আছেন। (অতএব ভয় কিসের ? তাদের কুফরের কারণে অন্তর ব্যথিত হলে এর প্রতিকার এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করুন। উদাহরণত মজলিস থেকে অথবা নিদ্রা থেকে) গাত্রোত্থানের সময় (উদাহরণত তাহাজ্জুদে) আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং রাত্রির কিছু অংশে (অর্থাৎ ইশার সময়ে) এবং তারকা অস্তমিত হওয়ার পশ্চাতে (অর্থাৎ ফজরে) তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (সারকথা এই যে, অন্তরকে এ কাজে মশগুল রাখুন, তাহলে চিন্তা-ভাবনা প্রবল হতে পারবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا —শত্রুদের শত্রুতা-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ আমার হিফাযতে আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখব। আপনি তাদের পরোয়া করবেন না। অন্য এক আয়াতে আছে : وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনার হিফাযত করবেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার

প্রতিকারও। বলা হয়েছে ঃ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এর এক অর্থ নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান করা। ইবনে জরীর (র) তাই বলেন। এক হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হয়ে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, সে যে দোয়াই করে, তা-ই কবূল হয়। বাক্যগুলো এই ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

এরপর যদি সে অযু করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবূল করা হবে। —(ইবনে কাসীর)

মজলিসের কাফ্‌ফারা ঃ মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ' যখন দণ্ডায়মান হন'—এর অর্থ এই যে, যখন কেউ মজলিস থেকে উঠে, তখন এই বাক্য পাঠ করবে ঃ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ—এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে আতা ইবনে আবী রাবাহ (র) বলেন ঃ তুমি যখন মজলিস থেকে উঠ, তখন তসবীহ্ ও তাহ্‌মীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোন সৎ কাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে ভালমন্দ কথাবার্তা হয়, সে যদি মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এই মজলিসে যেসব গোনাহ্ হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করেন। বাক্যগুলো এই ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ—(তিরমিযী—ইবনে কাসীর)।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ—অর্থাৎ রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। মাগরিব ও ইশার

নামায এবং সাধারণ তসবীহ্ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ অর্থাৎ তারকা অস্তমিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের নামায ও তখনকার তসবীহ্ পাঠ বোঝানো হয়েছে—(ইবনে কাসীর)

سورة النجم

সূরা নজম

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬২ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ﴿۱﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ﴿۲﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۗ﴿۳﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ﴿۴﴾ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۙ﴿۵﴾ ذُوْ مِرَّةٍ ؕ فَاسْتَوٰى ۙ﴿۶﴾ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ؕ﴿۷﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ﴿۸﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ﴿۹﴾ فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ؕ﴿۱۰﴾ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ﴿۱۱﴾ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ﴿۱۲﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۙ﴿۱۳﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿۱۴﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ؕ﴿۱۵﴾ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۙ﴿۱۶﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿۱۷﴾ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿۱۸﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(১) নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। (২) তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হন নি এবং বিপথগামীও হন নি (৩) এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। (৪) কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। (৫) তাকে শিক্ষাদান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা, (৬) সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল (৭) ঊর্ধ্ব দিগন্তে, (৮) অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল। (৯) তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। (১০) তখন আল্লাহ্‌ তার বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন। (১১) রসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। (১২) তোমরা কি বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে ? (১৩) নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, (১৪) সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে, (১৫) যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত। (১৬) যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। (১৭) তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। (১৮) নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যে কোন) নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। [এর জওয়াব হচ্ছে مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى—এর সাথে এই কসমের বিশেষ মিল আছে। অর্থাৎ নক্ষত্র যেমন উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত আগাগোড়া পথে তার নিয়মিত গতি থেকে এদিক-সেদিক হয় না, তেমনি রসূলুল্লাহ্ (সা) সারা জীবন পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতা থেকে মুক্ত রয়েছেন। এছাড়া আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নক্ষত্র দ্বারা যেমন পথ প্রদর্শন হয়, তেমনি পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতার অনুপস্থিতির কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) দ্বারাও পথপ্রদর্শন হয়। নক্ষত্র যখন মধ্যগগনে অবস্থান করে, তখন তার দ্বারা দিক নির্ণয় করা যায় না। তাই নক্ষত্রের সাথে অস্তমিত হওয়ার সময় যোগ করা হয়েছে। উদয়ের সময়ও নক্ষত্র দিগন্তের কাছাকাছি থাকে। কিন্তু পথপ্রদর্শন প্রার্থীরা অস্তমিত হওয়ার সময়কেই সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে। তারা মনে করে যে, এ সময়ে পথপ্রদর্শনের উপকারিতা লাভ না করলে একটু পরেই নক্ষত্র অস্তমিত হয়ে যাবে। উদয়ের সময় এই ব্যাকুলতা থাকে না। কারণ, তখন সময় প্রশস্ত থাকে। সুতরাং এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে হিদায়ত অর্জন করাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর এবং আগ্রহ সহকারে ধাবিত হও। এরপর কসমের জওয়াবে বলা হচ্ছে ঃ] তোমাদের (এই সার্বক্ষণিক) সংগী (অর্থাৎ পয়গম্বর, যার অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম তোমাদের নখদর্পণে এবং যার কাছ থেকে তোমরা সততার প্রমাণ হাসিল করতে পার, তিনি) পথভ্রষ্ট হন নি এবং বিপথগামীও হন নি। (ضَلَال-এর অর্থ পথ ভুলে দাঁড়িয়ে থাকা এবং যার غَوَايَت-এর অর্থ বিপথকে পথ মনে করে চলতে থাকা।—(খাযেন) অর্থাৎ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী তিনি নবুয়ত ও দাওয়াতের ব্যাপারে বিপথগামী নন, বরং তিনি সত্য নবী)। এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। (যেমন তোমরা افْتَرٰهُ বলে থাক, বরং) তাঁর কথা নিছক ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। [অর্থ ও ভাষা উভয়ের ওহী, হলে তা কোরআন এবং শুধু অর্থের ওহী হলে তা সুন্নাহ্ নামে অভিহিত হয়। এই ওহী খুঁটিনাটি বিষয়েরও হতে পারে কিংবা কোন সামগ্রিক নীতিরও হতে পারে, যদ্দ্বারা ইজতিহাদ করা যায়। সুতরাং আয়াতে ইজতিহাদ অস্বীকার করা হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র সাথে মিথ্যা কথা সম্পর্কযুক্ত করেন—কাফিরদের এবম্বিধ ধারণা খণ্ডন করাই আসল উদ্দেশ্য। অতঃপর ওহীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে যে] তাঁকে মহাশক্তিশালী ফেরেশতা (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই ওহী) শিক্ষা দান করে। (সে স্বীয় চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা শক্তিশালী হয়নি ;) সহজাত শক্তিসম্পন্ন। [এক রেওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আ) নিজের শক্তি বর্ণনা করেন ঃ আমি কওমে লূতের গোটা জনপদকে সমূলে উৎপাটিত করে আকাশের নিকট নিয়ে যাই এবং নিচে ছেড়ে দিই। (দুররে-মনসূর) উদ্দেশ্য এই যে, এই কালাম কোন শয়তানের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছেনি যে, তাঁকে অতীন্দ্রিয়বাদী বলা হবে, বরং ফেরেশতার মাধ্যমে পৌঁছেছে। ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসার সময় মাঝপথে শয়তান হস্তক্ষেপ

করেছে—এরূপ সম্ভাবনা নাকচ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্ভবত ফেরেশতার সাথে মহাশক্তিশালী বিশেষণটি যুক্ত করা হয়েছে। ফলে ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, শয়তানের সাধ্য নেই যে, তার কাছে ঘেঁষে। অতঃপর ওহী সমাপ্ত হলে তা হুবহু জনসমক্ষে প্রমাণ করার ওয়াদা আল্লাহ্ নিজেই করেছেন : إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ অতঃপর একটি প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন এই যে, ওহী নিয়ে আগমনকারী ব্যক্তি যে ফেরেশতা তা পূর্ব পরিচয়ের ভিত্তিতেই জানা যেতে পারে। পূর্ণ পরিচয় আসল আকার-আকৃতিতে দেখার উপর নির্ভরশীল। অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন কি? জওয়াব এই যে, তিনি পূর্বেও দেখেছিলেন। কয়েকবার তো অন্য আকৃতিতে দেখেছেন]। অতঃপর (একবার এমনও হয়েছে যে) সেই ফেরেশতা আসল আকৃতিতে তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করল, সে (তখন) ঊর্ধ্বদিগন্তে ছিল। [এক রেওয়ায়েতে এর তফসীরে পূর্বদিগন্ত বলা হয়েছে। সম্ভবত মধ্যগগনে দেখা কষ্টকর বিধায় দিগন্ত দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিম্ন দিগন্তেও কোন কিছু পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই ঊর্ধ্ব দিগন্তে মনোনীত করা হয়েছে। এর ঘটনা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার জিবরাঈলকে বললেন : আমি আপনাকে আসল আকৃতিতে দেখতে চাই। সেমতে জিবরাঈল (আ) তাঁকে হেরা গিরিগুহার নিকটে এবং তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যিয়াদ মহল্লায় দেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি ওয়াদার স্থানে পৌঁছে জিবরাঈলকে পূর্ব দিগন্তে দেখতে পেলেন যে, তাঁর ছয়শ বাহু প্রসারিত হয়ে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকাকে ঘিরে রেখেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) অতঃপর বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন জিবরাঈল (আ) মানবাকৃতি ধারণ করে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আগমন করলেন। পরবর্তী আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।—(জালালাইন) সারকথা এই যে, ফেরেশতা প্রথমে আসল আকৃতিতে ঊর্ধ্ব দিগন্তে আত্মপ্রকাশ করল। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বেহুঁশ হয়ে পড়লেন, তখন] সে তাঁর নিকটে এল এবং আরও নিকটে এল, (নৈকট্যের কারণে তাদের মধ্যে) দুই ধনুক পরিমাণ ব্যবধান রয়ে গেল কিংবা আরও কম ব্যবধান রয়ে গেল। আরবদের অভ্যাস ছিল দুই ব্যক্তি পরস্পরে চূড়ান্ত পর্যায়ের একতা ও সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলে উভয়ই তাদের ধনুকের সূতা পরস্পরে সংযুক্ত করে দিত। এতেও কোন কোন অংশের দিক দিয়ে কিছু ব্যবধান অবশ্যই থেকে যায়। এই প্রচলিত পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে নৈকট্য ও ঐক্য বোঝানো হয়েছে। এটা ছিল নিছক দৃশ্যত ঐক্যের আলামত। যদি এর সাথে অন্তরগত এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যও সংযুক্ত হয়, তবে أَوْ أَدْنَىٰ অর্থাৎ আরও কম ব্যবধান হতে পারে। সুতরাং أَوْ أَدْنَىٰ কথাটি বাড়ানোর ফলে ইঙ্গিত হয়েছে যে, দৃশ্যত নৈকট্য ছাড়াও রসূলুল্লাহ্ (সা) ও জিবরাঈলের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্কও ছিল, যা পূর্ণ পরিচয়ের মহান ভিত্তি। মোটকথা জিবরাঈলের সান্ত্বনাদানের ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) শান্ত সুস্থির হলেন। স্বস্তি লাভ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা (এই ফেরেশতার মাধ্যমে) তাঁর বান্দার (রসূলের) প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন [যা নির্দিষ্টভাবে জানা নেই এবং জানার প্রয়োজনও নেই। তখন প্রত্যাদেশ করা আসল উদ্দেশ্য ছিল না, বরং জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখিয়ে তার

পূর্ণ পরিচয় দান করাই আসল লক্ষ্য ছিল। এতদসত্ত্বেও পরিচয়ে অধিক সহায়ক হবে বিবেচনা করেই সম্ভবত তখন প্রত্যাদেশ করা হয়েছিল। কেননা জিবরাঈল (আ) আসল আকৃতিতে থাকার কারণে এ সময়কার ওহী যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, তা অকাট্য ও সুনিশ্চিত। মানবাকৃতিতে থাকা অবস্থায় অন্য সময়ের ওহীকে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) একই রূপ দেখবেন, তখন তাঁর এই বিশ্বাস আরও জোরদার হবে যে, উভয় অবস্থায় ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতা একই। উদাহরণত কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ও কথার ভঙ্গি জানা থাকলে যদি কোন সময় সে আকৃতি পরিবর্তন করেও কথা বলে, তবে পরিষ্কার চেনা যায়। অতঃপর এই দেখা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন এই যে, আসল আকৃতিতে দেখা সত্ত্বেও অন্তঃকরণের অনুভূতি ও উপলব্ধিতে ভ্রান্তি হওয়ার আশংকা রয়েছে। অনুভূতিতে এরূপ ভ্রান্তি হওয়া বিরল নয়। সঠিক অনুভূতির মালিক হওয়া সত্ত্বেও পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে পরিচিত জনকেও চিনতে ভুল করে। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই দেখা বিশুদ্ধ ছিল কি না, তা-ই প্রশ্ন। জওয়াব এই যে, এই দেখা বিশুদ্ধ ছিল। কেননা, এই দেখার সময়] রসূলের অন্তর দেখা বস্তুর ব্যাপারে মিথ্যা বলেনি। (প্রমাণ এই যে, এ জাতীয় সম্ভাবনাকে আমল দিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের উপর থেকে আস্থা উঠে যাবে। ফলে সমগ্র বিশ্বের কাজ-কারবার অচল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি অনুভবকারী ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি ত্রুটিযুক্ত হয়, তবে তার ক্ষেত্রে অন্তরগত ভ্রান্তির আশংকাকে আমল দেওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জ্ঞান-বুদ্ধি যে ত্রুটিযুক্ত ছিল না এবং তিনি যে মেধাবী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তা সুবিদিত ও প্রত্যক্ষ। এই বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও বিপক্ষ দল বিতর্ক ও বাদানুবাদে বিরত হত না। তাই অতঃপর বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যখন পরিচয় ও দেখার সন্তোষজনক প্রমাণ শুনে নিলে, তখন) তোমরা কি তাঁর (অর্থাৎ রসূলের) সাথে সে বিষয়ে বিতর্ক করবে, যা সে দেখেছে ? (অর্থাৎ মানুষের জানা অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে থাকে। সর্বনাশের কথা এই যে, তোমরা এসব বিষয়েও বিরোধ কর। এভাবে তো তোমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সমূহেও হাজারো সন্দেহ থাকতে পারে। তোমরা যদি এই অমূলক ধারণা কর যে, এক-বার দেখেই কোন বস্তুর পরিচয় কিভাবে হতে পারে তবে এর জওয়াব এই যে, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, পরিচয়ের জন্য বারবার দেখাই জরুরী, তবে) তিনি (অর্থাৎ রসূল) তাকে আরেকবার ও (আসল আকৃতিতে) দেখেছিলেন। (সুতরাং তোমাদের সেই ধারণাও দূর হয়ে গেল। দুবার একই রূপ দেখার কারণে পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, সে-ই জিবরাঈল। অতঃপর আরেকবার দেখার স্থান বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মি'রাজের রাত্রিতে দেখেছেন) সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে। (বদরিকা বৃক্ষকে সিদরা বলা হয় এবং মুন্তাহার অর্থ শেষ প্রান্ত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ এটা সপ্তম আকাশে অবস্থিত একটা বদরিকা বৃক্ষ। ঊর্ধ্ব জগৎ থেকে যেসব বিধি-বিধান ও রিযিক ইত্যাদি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো প্রথমে সিদরাতুল-মুন্তাহায় পৌঁছে, অতঃপর সেখান থেকে ফেরেশতারা পৃথিবীতে আনয়ন করে। এমনিভাবে পৃথিবী থেকে যেসব আমল ও কাজকর্ম ঊর্ধ্ব জগতে আরোহণ করে সেগুলোও প্রথমে সিদরাতুল-মুন্তাহায় পৌঁছে। অতঃপর সেখান থেকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়। কাজেই সিদরাতুল-মুন্তাহা ডাকঘরের অনুরূপ, যেখান থেকে চিঠিপত্রের আগমন-নির্গমন

হয়ে থাকে। অতঃপর সিদরাতুল-মুন্তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে যে)-এর (অর্থাৎ সিদরাতুল-মুন্তাহার) নিকটে জান্নাতুল-মাওয়া অবস্থিত। ('মাওয়া' শব্দের অর্থ বসবাসের জায়গা। নেক বান্দাদের বসবাসের জায়গা বিধায় একে জান্নাতুল-মাওয়া বলা হয়। মোটকথা, সিদরাতুল-মুন্তাহা একটি স্বতন্ত্র মহিমামণ্ডিত স্থানে অবস্থিত। এখন দেখার সময়কাল বর্ণনা করা হচ্ছে যে) যখন সিদরাতুল-মুন্তাহাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যা আচ্ছন্ন করছিল। [এক রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা দেখতে স্বর্ণের প্রজাপতির ন্যায় ছিল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রকৃতপক্ষে ফেরেশতা ছিল। আরেক রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এক নজর দেখার বাসনা প্রকাশ করে ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে এবং এই বৃক্ষে একত্রিত হয়।—(দুররে-মনসূর) এতেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মানিত ছিলেন। এখানে আরও একটি সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, বিস্ময়কর বস্তু দেখে স্বভাবতই দৃষ্টি ঘুরপাক খেয়ে যায় এবং পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার শক্তি থাকে না। সুতরাং এমতাবস্থায় জিবরাঈলের আকৃতি কিরূপে উপলব্ধি করা যাবে? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, আশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) মোটেই হতবুদ্ধি ও বিস্মিত হন নি। সেমতে যেসব বস্তু দেখার নির্দেশ ছিল, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করার ক্ষেত্রে] তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি (বরং সেগুলোকে যথাযথরূপে দেখেছেন) এবং (কোন কোন বস্তু দেখার নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত সেগুলোর প্রতি) সীমালংঘনও করেনি। [অর্থাৎ অনুমতির পূর্বে দেখেন নি। এটা তাঁর চূড়ান্ত দৃঢ়তার প্রমাণ। আশ্চর্য বস্তু দেখার বেলায় মানুষ সাধারণত এই দ্বিবিধ কাণ্ড করে থাকে—যেসব বস্তু দেখতে বলা হয়, সেগুলো দেখে না এবং যেগুলো দেখতে বলা হয় না, সেগুলোর দিকে তাকাতে থাকে। ফলে শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃঢ়তা শক্তি বর্ণনা করা হচ্ছে যে] নিশ্চয় তিনি তাঁর পালনকর্তার (কুদরতের) মহান অত্যাশ্চর্য নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছেন। (কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। মি'রাজের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেথায় পয়গম্বরগণকে দেখেছেন, আত্মাসমূহকে দেখেছেন এবং জান্নাত-দোযখ ইত্যাদি অবলোকন করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, তিনি চূড়ান্ত দৃঢ়চেতা। সুতরাং অভিভূত হয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মোট কথা, জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের পরিচয় সম্পর্কিত যেসব সন্দেহ ছিল, উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে সেগুলো দূরীভূত হয়ে রিসালত প্রমাণিত ও সুনিশ্চিত হয়ে গেল। এ স্থলে এটাই ছিল উদ্দেশ্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা নজমের বৈশিষ্ট্য : সূরা নজম প্রথম সূরা, যা রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় ঘোষণা করেন।—(কুরতুবী) এই সূরাতেই সর্বপ্রথম সিজদার আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) তিলাওয়াতের সিজদা করেন। মুসলমান ও কাফির সবাই এই সিজদায় শরীক হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় মজলিসে যত কাফির ও মুশরিক উপস্থিত ছিল, সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সিজদায় আভূমি নত হয়ে যায়। কেবল এক অহংকারী ব্যক্তি যার

নাম সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে, সে সিজদা করেনি। কিন্তু সে এক মুষ্টি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল ঃ ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ আমি সেই ব্যক্তিকে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখছি। —(ইবনে কাসীর)

এই সূরার শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্য নবী হওয়া এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى —নক্ষত্রমাত্রকেই نجم বলা হয় এবং এর বহুবচন نجوم — কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্ষত্রের সমষ্টি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নজমের তফসীর 'সুরাইয়া' অর্থাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডল দ্বারা করেছেন। ফাররা ও হযরত হাসান বসরী (র) প্রথম তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।—(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই অবলম্বন করা হয়েছে। هوى শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নক্ষত্রের কসম খেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওহী সত্য, বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। সূরা সাফফাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর কসম খেতে পারেন। কিন্তু অন্য কারও জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর কসম খাওয়ার অনুমতি নেই। এখানে নক্ষত্রের কসম খাওয়ার এক তাৎপর্য এই যে, অন্ধকার রাতে দিক ও রাস্তা নির্ণয়ের কাজে নক্ষত্র ব্যবহৃত হয়, তেমনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমেও আল্লাহ্র পথের দিকে হিদায়ত অর্জিত হয়।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى — এই বিষয়বস্তুর কারণেই কসম খাওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন, তাই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের বিশুদ্ধ পথ। তিনি পথ ভুলে যান নি এবং বিপথগামীও হন নি।

রসূলের পরিবর্তে তোমাদের সংগী বলার রহস্য ঃ এ স্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম অথবা 'নবী' শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে 'তোমাদের সংগী' বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) বাইরে থেকে আগত কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন, যার সত্যবাদিতায় তোমরা সন্দিগ্ধ হবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সংগী। তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানেই শৈশব অতিবাহিত করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর জীবনের কোন দিক তোমাদের কাছে গোপন নয়। তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছ যে, তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তোমরা তাঁকে শৈশবেও কোন মন্দ কাজে লিপ্ত দেখনি। তাঁর চরিত্র, অভ্যাস, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি তোমাদের এতটুকু আস্থা ছিল যে, সমগ্র মক্কাবাসী তাঁকে 'আল-আমীন' বলে সম্বোধন করত। এখন নবুয়ত দাবী করায় তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করেছ। সর্বনাশের কথা এই যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে কখনও মিথ্যা বলেন নি, তিনি আল্লাহ্র ব্যাপারে মিথ্যা বলছেন বলে তোমরা তাঁকে অভিযুক্ত করছ। তাই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى —অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরী করে আল্লাহ্‌র দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন না। এর কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। বুখারীর বিভিন্ন হাদীসে ওহীর অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে এক. যার অর্থ ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, এর নাম কোরআন। দুই. যার কেবল অর্থ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন, এর নাম হাদীস ও সুন্নাহ্। এরপর হাদীসে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু বিধৃত হয়, কখনও তা কোন ব্যাপারের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনও কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়। এই নীতির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ভ্রান্তি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) তথা পয়গম্বরকুলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান বর্ণনা করেন, সেগুলোতে ভুল হয়ে গেলে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর সাহায্যে শুধরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য মুজতাহিদ আলিম ইজতিহাদে ভুল করলে তারা তার উপর কায়েম থাকতে পারেন। তাদের এই ভুলও আল্লাহ্‌র কাছে কেবল ক্ষমার্হই নয়; বরং ধর্মীয় বিধান হৃদয়ঙ্গম করার-ক্ষেত্রে তাঁরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্য তাঁরা কিঞ্চিৎ সওয়াবেরও অধিকারী হন।

এই বক্তব্য দ্বারা আলোচ্য আয়াত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবও হয়ে গেছে। প্রশ্ন এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সব কথাই যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী হয়ে থাকে, তখন জরুরী হয়ে পড়ে যে, তিনি নিজ মতামত ও ইজতিহাদ দ্বারা কোন কিছু বলেন না। অথচ সহীহ্ হাদীসসমূহে একাধিক ঘটনা এমন বর্ণিত আছে যে, প্রথমে তিনি এক নির্দেশ দেন, অতঃপর ওহীর আলোকে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রথম নির্দেশটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছিল না; বরং তিনি স্বীয় মতামত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। এর জওয়াব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহী কখনও সামগ্রিক নীতির আকারে হয়, যদ্দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ভুল হওয়ারও আশংকা থাকে।

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰى — এখান থেকে অষ্টাদশতম আয়াত لَقَدْ رَأٰى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত সব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওহীতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌র কালাম তাঁকে এভাবে দান করা হয়েছে যে, এতে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তির আশংকা থাকতে পারে না।

এই আয়াতসমূহের তফসীরে তফসীরবিদদের মতভেদ: এসব আয়াতের ব্যাপারে দু'প্রকার তফসীর বর্ণিত রয়েছে। এক. আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তফসীরের

সারমর্ম এই যে, এসব আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ ও আল্লাহ্‌র দর্শন ও নৈকট্য লাভের কথা আলোচিত হয়েছে।

মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, اسْتَوٰى এবং دَنٰى فَتَدَلّٰى এগুলো সব আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষণ ও কর্ম। তফসীরে মাযহারী এই তফসীর অবলম্বিত হয়েছে। দুই. অন্য অনেক সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে এসব আয়াতে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং 'মহাশক্তিশালী' ইত্যাদি শব্দ জিব-রাঈলের বিশেষণ। এই তফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা নজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউ-দের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা নজম। বাহ্যত মি'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি তর্কাতীত নয়। আসল কারণ এই যে, হাদীসে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) এসব হাদীসের যে তফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লিখিত আছে। মসনদে-আহমদে বর্ণিত হাদীসের ভাষা এরূপ:

عن الشعبى عن مسروق قال كنت عند عائشة فقلت اليس الله يقول ولقد راه بالافق المبين - ولقد راه نزلة اخرى فقالت انا اول هذه الامة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال انما ذاك جبرائيل لم يره فى صورته التى خلق عليها الا مرتين راه منهبطا من السماء الى الارض سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض -

শা'বী হযরত মসরূক থেকে বর্ণনা করেন—তিনি একদিন হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ্‌কে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মসরূক বলেন: আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى - وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ হযরত আয়েশা (রা) বললেন: মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন: আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরাঈল (আ)। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বর্ণিত দেখার অর্থ এই যে, তিনি জিবরাঈলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্য-মণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল।—(ইবনে কাসীর)

সহীহ্ মুসলিমেও এই রেওয়ায়েত প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত আছে। হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল বারী গ্রন্থে ইবনে মরদুওয়াইহ (র) থেকে এই রেওয়ায়েত একই সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আয়েশা (রা)-র ভাষা এরূপ:

انا اول من سال رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذا فقلت يا رسول الله هل رايت ربك فقال لا انما رايت جبرا ئيل منهبطا ـ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এই আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন কি ? তিনি বললেন, না, বরং আমি জিবরাঈলকে নিচে অবতরণ করতে দেখেছি।—(ফতহুল-বারী, ৮ম খণ্ড, ৪৯৩ পৃঃ)

সহীহ্ বুখারীতে শায়বানী বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত যররকে এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

তিনি জওয়াবে বললেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈলকে ছয়শ বাহুবিশিষ্ট দেখেছেন। ইবনে জরীর (র) আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈলকে রফরফের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে রেখেছিল।

ইবনে কাসীরের বক্তব্য ঃ ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীরে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ সূরা নজমের উল্লিখিত আয়াতসমূহে 'দেখা' ও 'নিকটবর্তী হওয়া' বলে জিবরাঈলকে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বোঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা, আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, আবূ যর গিফারী, আবূ হুরায়রা প্রমুখ সাহাবীর এই উক্তি। তাই ইবনে কাসীর আয়াতসমূহের তফসীরে বলেন ঃ

আয়াতসমূহে উল্লিখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটবর্তী হওয়া। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাত্রিতে সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারের দেখা নবুয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক যমানায় হয়েছিল। তখন জিবরাঈল সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যদ্দরুন রসূলুল্লাহ্ (সা) নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা বারবার তাঁর মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হত, তখনই জিবরাঈল (আ) দৃষ্টির অন্তরালে থেকে আওয়ায দিতেন ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি আল্লাহ্র সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এই আওয়ায শুনে তাঁর মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। যখনই মনে বিরূপ কল্পনা দেখা দিত, তখনই জিবরাঈল (আ) অদৃশ্যে থেকে এই আওয়াযের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। অবশেষে একদিন জিবরাঈল (আ) মক্কার উন্মুক্ত ময়দানে তাঁর আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর ছয়শ বাহু ছিল এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিলেন।

এরপর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌঁছান। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে জিবরাঈলের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্র দরবারে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে উঠে।—(ইবনে কাসীর)

সারকথা এই যে, ইমাম ইবনে কাসীরের মতে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীর তাই, যা উপরে বর্ণনা করা হল। এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল—কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অতঃপর জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকটে আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন।

দ্বিতীয়বার দেখার কথা وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى—আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে মি'রাজের রাত্রিতে এই দেখা হয়। উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই তফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আবূ হাইয়ান, ইমাম রাযী প্রমুখ এই তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-ও এই তফসীরই অবলম্বন করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, সূরা নজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবভী মুসলিম শরীফের টীকায় এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারী গ্রন্থেও এই তফসীর অবলম্বন করেছেন।

ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى—مِرَّةٌ শব্দের অর্থ শক্তি। জিবরাঈলের অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্য এটাও তাঁরই বিশেষণ। এতে করে এই ধারণার অবকাশ থাকে না যে, ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাজে কোন শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ, জিবরাঈল এতই শক্তিশালী যে, শয়তান তাঁর কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

فَاسْتَوٰى এর অর্থ সোজা হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য এই যে, জিবরাঈলকে যখন প্রথম দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করছিলেন। অবতরণের পর তিনি ঊর্ধ্ব দিগন্তে সোজা হয়ে বসে যান। দিগন্তের সাথে 'ঊর্ধ্ব' সংযুক্ত করার রহস্য এই যে, ভূমির সাথে মিলিত যে দিগন্ত তা সাধারণত দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই জিবরাঈলকে ঊর্ধ্ব দিগন্তে দেখানো হয়েছে।

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى—دَنٰى শব্দের অর্থ নিকটবর্তী হল এবং تَدَلّٰى শব্দের অর্থ ঝুলে গেল। অর্থাৎ ঝুঁকে পড়ে নিকটবর্তী হল। فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সুতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে قَابٌ বলা হয়। এই ব্যবধান

আনুমানিক এক হাত হয়ে থাকে। قاب قوسين দুই ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধান বলার কারণ আরবদের একটি বিশেষ অভ্যাস। দুই ব্যক্তি পরস্পরে শান্তিচুক্তি ও সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলে এর এক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত আলামত ছিল হাতের উপর হাত মারা। অপর একটি আলামত ছিল এই যে, উভয়েই আপন আপন ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সূতা অপরের দিকে রাখত। এভাবে উভয় ধনুকের সূতা পরস্পরে মিলিত হয়ে যাওয়াকে সম্প্রীতি ও সখ্যতার ঘোষণা মনে করা হত। এ সময় উভয় ব্যক্তির মাঝখানে দুই ধনুকের 'কাবের' ব্যবধান থেকে যেত অর্থাৎ প্রায় দুই হাত বা এক গজ। এরপর أَوْ أَدْنَى বলে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই মিলন সাধারণ প্রথাগত মিলনের অনুরূপ ছিল না; বরং এর চাইতেও গভীর ছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ)-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌঁছিয়েছেন তা শ্রবণে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাঈল (আ)-কে না চেনা এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ করার আশংকাও বাতিল হয়ে যায়।

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى—এখানে أَوْحَى ক্রিয়াপদের কর্তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এবং عبده-এর সর্বনাম দ্বারা তাঁকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-কে শিক্ষক হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সন্নিকটে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন।

একটি শিক্ষাগত খটকা ও তার জওয়াব ঃ এখানে বাহ্যত একটি খট্কা দেখা দেয় যে, উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে সব সর্বনাম দ্বারা অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় শুধু فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ আয়াতে সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্কে বোঝানো পূর্বাপর বর্ণনার বিপরীত এবং انتشار ضمائر। তথা সর্বনামসমূহের বিক্ষিপ্ততার কারণ।

মওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) এর জওয়াবে বলেন ঃ এখানে পূর্বাপর বর্ণনায় কোন ত্রুটি নেই এবং সর্বনামসমূহের বিক্ষিপ্ততাও নেই; বরং সত্য এই যে, সূরার শুরুতে إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى বলে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছিল, তারই ধারাবাহিক বর্ণনা এভাবে করা হয়েছে যে, ওহী প্রেরণকারী স্পষ্টত আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নয়। কিন্তু এই ওহী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে জিবরাঈল (আ) ছিলেন মাধ্যম। কয়েকটি আয়াতে এই মাধ্যমের পূর্ণ সত্যায়ন করার পর পুনরায় أوحى الى عبده বলা হয়েছে। সুতরাং এটা প্রথম বাক্যেরই পরিশিষ্ট। একে সর্বনামের বিক্ষিপ্ততা বলা

যায় না। কারণ, اوحى এবং عبده—এসবের সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌কে বোঝানো ছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই যে নেই, এটা স্বতঃসিদ্ধ। مَا اَوْحَى অর্থাৎ যা ওহী করার ছিল। এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা অস্পষ্ট রেখে এর মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সহীহ্ বুখারীর হাদীস থেকে জানা যায় যে, তখন সূরা মুদ্দাসসিরের শুরু ভাগের কতিপয় আয়াত ওহী করা হয়েছিল।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন বাস্তবিকই সত্য কালাম। হাদীসবিদগণ যেমন হাদীসের সনদ রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পুরোপুরি বর্ণনা করেন, তেমনি এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের সনদ বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যাদেশকারী স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হচ্ছেন জিবরাঈল (আ)। আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ)-এর উচ্চমর্যাদা ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা যেন সনদের মাধ্যমের ন্যায়ানুগ সত্যায়ন।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى فواد—শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ। উদ্দেশ্য এই যে, চক্ষু যা কিছু দেখেছে, অন্তঃকরণও তা যথাযথ উপলব্ধি করতে কোন ভুল করেনি। এই ভুল ও ত্রুটিকেই আয়াতে كذب শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ দেখা বস্তুকে উপলব্ধি করার ব্যাপারে অন্তঃকরণ মিথ্যা বলেনি। مَا رَاٰى শব্দের অর্থ যা কিছু দেখেছে। কি দেখেছে, কোরআনে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদগণের উক্তি দ্বিবিধ। কারও কারও মতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছে এবং কারও কারও মতে জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছে। এই তফসীর অনুযায়ী رَاٰى শব্দটি আক্ষরিক অর্থে (চর্মচক্ষে দেখার অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে অন্তর্চক্ষু দ্বারা দেখার অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আয়াতে অন্তকরণকে উপলব্ধি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতে উপলব্ধি করা বোধশক্তির কাজ। এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্র অন্তকরণ। তাই কখনও বোধশক্তিকেও 'কল্‌ব' (অন্তকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দেওয়া হয়; যেমন لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ আয়াতে কল্‌ব বলে বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। কোরআন পাকের لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

نَزْلَةً أُخْرَى—وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرَى ٥ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى —এর অর্থ দ্বিতীয়বারের অবতরণ। এই অবতরণও জিবরাঈল (আ)-কে প্রথম দেখার স্থান যেমন মক্কার ঊর্ধ্ব দিগন্ত বলা হয়েছিল, তেমনি দ্বিতীয়বার দেখার স্থান সপ্তম আকাশের 'সিদরাতুল-মুন্তাহা' বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মি'রাযের রাত্রিতেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এতে করে দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অভিধানে 'সিদরাহ্' শব্দের অর্থ বদরিকা বৃক্ষ। 'মুন্তাহা' শব্দের অর্থ শেষ প্রান্ত। সপ্তম আকাশে আরশের নীচে এই বদরিকা বৃক্ষ অবস্থিত। মুসলিমের রেওয়ায়েতে একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় রেওয়ায়েতের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই বৃক্ষের মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা-প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।—(কুরতুবী) সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে 'মুন্তাহা' বলা হয়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্র বিধানাবলী প্রথমে 'সিদরাতুল-মুন্তাহায়' নাযিল হয় এবং এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌঁছায় এবং এখান থেকে অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। মসনদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) থেকে একথা বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى—مَأْوٰى শব্দের অর্থ ঠিকানা, বিশ্রামস্থল। জান্নাতকে مَأْوٰى বলার কারণ এই যে, এটাই মানুষের আসল ঠিকানা। আদম (আ) এখানেই সৃজিত হন, এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং এখানেই জান্নাতীরা বসবাস করবে।

জান্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান ঃ এই আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, জান্নাত এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস তাই যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কিয়ামতের পর সৃজিত হবে না। এখনও এগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এই আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নীচে অবস্থিত। সপ্তম আকাশ যেন জান্নাতের ভূমি এবং আরশ তার ছাদ। কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসের কোন রেওয়ায়েতে জাহান্নামের অবস্থানস্থল পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়নি। সূরা তূরের আয়াত وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ থেকে কোন কোন তফসীরবিদ এই তথ্য উদ্ধার করেছেন যে, জাহান্নাম সমুদ্রের নিম্নদেশে পৃথিবীর অতল গভীরে অবস্থিত। বর্তমানে তার উপর কোন ভারী ও শক্ত আচ্ছাদন রেখে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন এই আচ্ছাদন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের অগ্নি বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রকে অগ্নিতে রূপান্তরিত করে দেবে।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ মৃত্তিকা খনন করে ভূগর্ভের অপর প্রান্তে

যাওয়ার প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে। তারা বিপুলায়তন যন্ত্রপাতি এ কাজের জন্য আবিষ্কার করেছে। যে দল এ কাজে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, তারা মেশিনের সাহায্যে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শক্ত পাথরের এমন একটা স্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার কারণে তাদের খননকার্য এগুতে পারেনি। তারা অন্য জায়গায় খনন আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখানেও ছয় মাইলের পর তারা শক্ত পাথরের সম্মুখীন হয়েছে। এভাবে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ছয় মাইলের পর সমগ্র ভূগর্ভের উপর একটি প্রস্তরাবরণ রয়েছে, যাতে কোন মেশিন কাজ করতে সক্ষম নয়। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর ব্যাস হাজার হাজার মাইল। তন্মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে বিজ্ঞান মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর প্রস্তরাবরণের অস্তিত্ব স্বীকার করে প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, সমগ্র ভূগর্ভকে কোন প্রস্তরাবরণ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। যদি কোন সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম এই প্রস্তরাবরণের নীচে অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না।

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى —অর্থাৎ যখন বদরিকা বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্তু। মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তখন বদরিকা বৃক্ষের উপর স্বর্ণনির্মিত প্রজাপতি চতুর্দিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল। মনে হয়, আগন্তুক মেহমান রাসূলে করীম (সা)-এর সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা বৃক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى — زاغ শব্দটি زيغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বক্র হওয়া, বিপথগামী হওয়া। طغى শব্দটি طغيان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যা কিছু দেখেছেন, তাতে দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি। এতে এই সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, মাঝে মাঝে মানুষেরও দৃষ্টি বিভ্রম করে; বিশেষ করে যখন সে কোন বিস্ময়কর অসাধারণ বস্তু দেখে। এর জওয়াবে কোরআন দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা, দুই কারণে দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে—এক. দৃষ্টি দেখার বস্তু থেকে সরে গিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেলে। ما زاغ বলে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, রসূলের দৃষ্টি অন্য বস্তুর উপর নয়; বরং যা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তার উপরই পতিত হয়েছে। দুই. দৃষ্টি উদ্দিষ্ট বস্তুর উপর পতিত হয়, কিন্তু সাথে সাথে এদিক-সেদিক অন্য বস্তুও দেখতে থাকে। এতেও মাঝে মাঝে বিভ্রম হওয়ার আশংকা থাকে। এ ধরনের দৃষ্টিবিভ্রমের জওয়াবে وما طغى বলা হয়েছে।

যাঁরা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে জিবরাঈল (আ)-কে দেখার কথা বলেন, তাঁদের মতে এই আয়াতেরও অর্থ এই যে, জিবরাঈল (আ)-কে দেখার ব্যাপারে দৃষ্টি ভুল করেনি। এই বর্ণনার প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) হলেন ওহীর

মাধ্যম। রসূলুল্লাহ্ (সা) যদি তাঁকে উত্তমরূপে না দেখেন এবং না চেনেন, তবে ওহী সন্দেহ-মুক্ত থাকে না।

পক্ষান্তরে যাঁরা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার কথা বলেন, তাঁরা এখানেও বলেন যে, আল্লাহ্র দীদারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টি কোন ভুল করেনি; বরং ঠিক ঠিক দেখেছে। তবে এই আয়াত চর্মচক্ষে দেখার বিষয়টিকে আরও অধিক ফুটিয়ে তুলেছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের তফসীরে আরও একটি বক্তব্য : সূরা নজমের আয়াত-সমূহে সাহাবী, তাবেয়ী, মুজতাহিদ ইমাম, হাদীসবিদ ও তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি ও শিক্ষাগত খট্‌কা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। 'মুশকিলাতুল-কোরআন' গ্রন্থে মাওলানা আন-ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) এসব আয়াতের তফসীর এভাবে করেছেন যে, উপরোক্ত বিভিন্ন রূপ উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়। এই তফসীর দেখার পূর্বে কতিপয় সর্ববাদীসম্মত বিষয় দৃষ্টির সামনে থাকা উচিত।

এক. রসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। এই উভয়বার দেখার কথা সূরা নজমের আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয়বার দেখার বিষয়টি আয়াত থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এই দেখা সপ্তম আকাশে 'সিদরাতুল-মুন্তাহার' নিকটে হয়েছে। বলা বাহুল্য, মি'রাযের রাত্রিতেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এভাবে দেখার স্থান ও সময়কাল উভয়ই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। প্রথম দেখার স্থান ও সময়কাল আয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। কিন্তু সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র নিম্নোক্ত হাদীস থেকে এই দু'টি বিষয় নির্দিষ্টরূপে জানা যায়।

قال وهو يحدث عن فترة الوحى فقال فى حديثه بين انا امشى اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصرى فاذا الملك الذى جاء نى بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملونى فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر الى قوله والرجز فاهجر فحمى الوحى وتتابع -

রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর বিরতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন : একদিন আমি যখন পথে চলমান ছিলাম, হঠাৎ আকাশের দিক থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম। আমি উপরের দিকে দৃষ্টি তুলতেই দেখি যে, ফেরেশতা হেরা গিরিগুহায় আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত একটি কুরসীতে উপবিষ্ট রয়েছেন। এই দৃশ্য দেখার পর আমি ভীত হয়ে গৃহে ফিরে এলাম এবং বললাম : আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মুদ্দাসসিরের আয়াত وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ পর্যন্ত নাযিল করলেন এবং এরপর অবিরাম ওহীর আগমন অব্যাহত থাকে।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখার প্রথম

ঘটনা ওহীর বিরতিকালে মক্কায় তখন সংঘটিত হয়, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা শহরে কোথাও গমনরত ছিলেন। কাজেই প্রথম ঘটনা মি'রাযের পূর্বে মক্কায় এবং দ্বিতীয় ঘটনা মি'রাযের রাত্রিতে সপ্তম আকাশে ঘটে।

দুই. এ বিষয়টিও সর্ববাদীসম্মত যে, সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহ (কমপক্ষে وَلَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى থেকে وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى পর্যন্ত) মি'রাযের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহের তফসীর এভাবে করেছেন ঃ

কোরআন পাক সাধারণ রীতি অনুযায়ী সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। এক. জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে তখন দেখা, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর বিরতিকালে মক্কায় কোথাও গমনরত ছিলেন। এটা মি'রাযের পূর্ববর্তী ঘটনা। -

দুই. মি'রাযের ঘটনা। এতে জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দ্বিতীয়বার দেখার চাইতে আল্লাহ্র অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ এবং মহান নিদর্শনাবলী দেখার কথা অধিক বিধৃত হয়েছে। এসব নিদর্শনের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ্র যিয়ারত ও দীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও তাঁর ওহীর ব্যাপারে সন্দেহকারীদের জওয়াব দেওয়াই সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহের আসল উদ্দেশ্য। নক্ষত্রের কসম খেয়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মতকে যা কিছু বলেন, এতে কোন ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তির আশংকা নেই। তিনি নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কিছু বলেন না, বরং তাঁর কথা সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয়ে থাকে। অতঃপর এই ওহী যেহেতু জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয় তিনি গুরু ও প্রচারক হিসেবে ওহী পৌঁছান, তাই জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলী ও মাহাত্ম্য কয়েক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ের বিবরণ অধিক মাত্রায় বর্ণনা করার কারণ সম্ভবত এই যে, মক্কার কাফিররা ইসরাফীল ও মিকাঈল ফেরেশতা সম্পর্কে অবগত ছিল, জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। মোট কথা, জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলী উল্লেখ করার পর পুনরায় আসল বিষয়বস্তু ওহীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى — এ পর্যন্ত এগারটি আয়াতে ওহী ও রিসালত সপ্রমাণ করার প্রসঙ্গে জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব গুণ জিবরাঈল (আ)-এর জন্যই স্বাভাবিকভাবে প্রযোজ্য। কোন কোন তফসীরবিদের অনুরূপ এগুলোকে যদি আল্লাহ্ তা'আলার গুণ সাব্যস্ত করা হয়, তবে ব্যর্থতার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। উদাহরণত شَدِيْدُ الْقُوٰى ذُوْ مِرَّةٍ - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى এবং دَنٰى فَتَدَلّٰى - ইত্যাদি বিশেষণকে

আর্থিক হেরফেরসহ তো আল্লাহ্ তা'আলার জন্য প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এগুলো জিবরাঈল (আ)-এর জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত দেখা, নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি সব জিবরাঈল (আ)-কে দেখার সাথে সম্পৃক্ত করাই অধিক সঙ্গত ও নিরাপদ মনে হয়।

তবে এরপর দ্বাদশতম আয়াত لَقَدْ رَاٰى থেকে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ)-কে দ্বিতীয়বার আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণিত হলেও তা অন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনার দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিক। এর এসব নিদর্শনের মধ্যে আল্লাহ্র দীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও উপেক্ষণীয় নয়। সমর্থনে সহীহ্ হাদীস এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি রয়েছে। তাই مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى আয়াতের তফসীর এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) চর্মচক্ষে যা দেখেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ তার সত্যায়ন করেছে যে, ঠিকই দেখেছেন। এই সত্যায়নে অন্তঃকরণ কোন ভুল করেনি। এখানে 'যা কিছু দেখেছেন'—এই ব্যাপক ভাষার মধ্যে জিবরাঈল (আ)-কে দেখাও শামিল আছে এবং মি'রাযের রাত্রিতে যা যা দেখেছেন সবই অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র দীদার ও যিয়ারত। পরবর্তী আয়াত দ্বারাও এর সমর্থন হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى—এতে কাফির-দেরকে বলা হয়েছে, পয়গম্বর যা কিছু দেখেছেন এবং ভবিষ্যতে দেখবেন, তা সন্দেহ ও বিতর্কের বিষয়বস্তু নয়—চাক্ষুষ সত্য। আয়াতে مَا يَرٰى-এর পরিবর্তে مَا قَدْ رَاٰى বলা হয়নি। এতে মি'রাজের রাত্রিতে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী দেখার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى আয়াতে এর পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতেও জিবরাঈল (আ)-কে দেখা এবং আল্লাহ্কে দেখা—এই উভয় দেখা উদ্দেশ্য হতে পারে। জিবরাঈল (আ)-কে দেখার বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। আল্লাহ্কে দেখার প্রতি এভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দেখার জন্য নৈকট্য স্বভাবতই জরুরী। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শেষ রাত্রিতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।

—আয়াতের অর্থ এই যে, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র নৈকট্যের স্থান 'সিদরাতুল-মুন্তাহার' কাছে ছিলেন, তখন দেখেছেন। এতে আল্লাহ্র যিয়ারতও উদ্দেশ্য হওয়ার পক্ষে এই হাদীস সাক্ষ্য দেয় ঃ

واتيت سدرة المنتهى فغشيتنى ضبابة خررت لها ساجدا وهذه الضبابة فى الظلل من الغمام التى يأتى فيها الله ويتجلى -

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি 'সিদরাতুল-মুন্তাহার' নিকটে পৌঁছলে মেঘমালার ন্যায় এক প্রকার বস্তু আমাকে ঘিরে ফেলল। আমি এর পরিপ্রেক্ষিতে সিজদানত হয়ে গেলাম। কোরআন পাকের এক আয়াতে উল্লিখিত আছে যে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। মেঘমালার ছায়ার ন্যায় এক প্রকার বস্তুতে আল্লাহ্ তা'আলা অবতরণ করবেন।

এমনিভাবে পরবর্তী আয়াত مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى—এর অর্থেও উভয় দেখা শামিল রয়েছে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই দেখা জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্ষে হয়েছে। সার কথা এই যে, মি'রাজের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহে দেখা সম্পর্কে যেসব বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, সবগুলোতে জিবরাঈল (আ)-কে দেখা ও আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখা—উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। কেউ কেউ এসব আয়াতের তফসীরে আল্লাহ্কে দেখার কথা বলেছেন এবং কোরআনের ভাষায় এরূপ অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে।

আল্লাহ্র দীদার ঃ সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, পরকালে জান্নাতীগণ তথা সর্বশ্রেণীর মু'মিনগণ আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করবেন। সহীহ্ হাদীসসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র দীদার কোন অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। তবে দুনিয়াতে এই দীদারকে সহ্য করার মত শক্তি মানুষের দৃষ্টিতে নেই। তাই দুনিয়াতে কেউ এই দীদার লাভ করতে পারে না। পরকালের ব্যাপারে খোদ কোরআন বলে ঃ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ —অর্থাৎ পরকালে মানুষের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী করে দেওয়া হবে এবং যবনিকা সরিয়ে নেওয়া হবে। ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ্কে দেখতে পারে না। কেননা, মানুষের দৃষ্টি ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্ তা'আলা অক্ষয়। পরকালে যখন মানুষকে অক্ষয় দৃষ্টি দান করা হবে, তখন আল্লাহ্র দীদারে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাযী আয়ায (র) থেকেও প্রায় এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে এবং সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে একথা প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا এ থেকে এ বিষয়ের সম্ভাবনাও বোঝা যায় যে, দুনিয়াতেও কোন সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টিতে বিশেষভাবে সেই শক্তি দান করা যেতে পারে, যদ্দ্বারা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মি'রাজের রাত্রিতে যখন সপ্ত আকাশ, জান্নাত, জাহান্নাম ও আল্লাহ্র বিশেষ নিদর্শনাবলী অবলোকন করার জন্যই তিনি স্বতন্ত্রভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার দীদারের ব্যাপারটি দুনিয়ার সাধারণ বিধি থেকেও ব্যতিক্রম ছিল। কারণ, তখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন না। সম্ভাবনা প্রমাণিত হওয়ার পর প্রশ্ন থেকে যায় যে, দীদার বাস্তবে হয়েছে কি না। এ ব্যাপারে হাদীসের রেওয়ায়েত বিভিন্ন রূপ এবং কোরআনের আয়াত সম্ভাবনা ও অবকাশ যুক্ত। এ কারণেই এ বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণের পূর্বাপর

মতভেদ চলে আসছে। ইবনে কাসীর এসব আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করেছেন। কিন্তু সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইবনে কাসীর অতঃপর উভয় দলের প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) ফতহুল-বারী গ্রন্থে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই মতবিরোধ উল্লেখ করার পর কিছু উক্তি এমনও উদ্ধৃত করেছেন, যদ্দ্বারা উপরোক্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন ঃ কুরতুবীর মতে এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করা এবং নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়। কেননা, এ বিষয়টির সঙ্গে কোন 'আমল' জড়িত নয়, বরং এটা বিশ্বাসগত প্রশ্ন। এতে অকাট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর নয়। কোন বিষয় অকাট্যরূপে না জানা পর্যন্ত সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই বিধান। আমার মতে এটাই নিরাপদ ও সাবধানতার পথ। তাই এ প্রশ্নের দ্বিপাক্ষিক যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করা হলো না।

أَفَرَءَيْتُمُ اللَّٰتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلْإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَٰئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

(১৯) তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওয্যা সম্পর্কে, (২০) এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? (২১) পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য?

(২২) এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। (২৩) এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছ। এর সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল নাযিল করেন নি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসেছে। (২৪) মানুষ যা চায়, তা-ই কি পায়? (২৫) অতএব, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মঙ্গলই আল্লাহ্র হাতে। (২৬) আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। (২৭) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। (২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসূ নয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুশরিকগণ! প্রমাণিত হয়ে গেল যে, রসূল ওহীর অনুসরণে কথাবার্তা বলেন এবং তিনি এই ওহীর আলোকে তওহীদের নির্দেশ দেন, যা যুক্তি প্রমাণেও সিদ্ধ। কিন্তু তোমরা এর পরও প্রতিমা পূজা কর। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে) তোমরা (কখনও এসব প্রতিমা উদাহ-রণত) লাত ও ওয্যা এবং তৃতীয় আরেক মানাত সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি? (যাতে তোমরা জানতে পারতে যে, তারা পূজার যোগ্য কিনা? তওহীদ সম্পর্কে আরেকটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, তোমরা ফেরেশতাকুলকে আল্লাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করে উপাস্য বলে থাক। জিজ্ঞাস্য এই যে,) পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্র জন্য? (অর্থাৎ যে কন্যাদেরকে তোমরা লজ্জা ও ঘৃণাযোগ্য মনে কর, তাদেরকে আল্লাহ্র সাথে সম্বন্ধযুক্ত কর)। এটা তো খুবই অসংগত বন্টন। (ভাল জিনিস তোমাদের ভাগে এবং মন্দ জিনিস আল্লাহ্র ভাগে! এটা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্র জন্য পুত্র সন্তান সাব্যস্ত করাও অসংগত)। এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, (অর্থাৎ উপাস্যরূপে এগুলোর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। বরং নামই সার) যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছ। এদের (উপাস্য হওয়ার) সমর্থনে আল্লাহ্ কোন (যুক্তিগত ও ইতিহাসগত) দলীল প্রেরণ করেন নি, (বরং) তারা (উপাস্য হওয়ার এই বিশ্বাসে) কেবল অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে (যে প্রবৃত্তি অনুমান থেকে উদ্ভূত হয়)। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (সত্যভাষী ও ওহীর অনুসারী রসূলের মাধ্যমে বাস্তব বিষয়ের) পথনির্দেশ এসে গেছে। (অর্থাৎ তাদের দাবীর সমর্থনে তো কোন দলীল নেই, কিন্তু রসূলের মাধ্যমে দলীল শুনেও তা মানে না। আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের উপাস্য হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল প্রসঙ্গে এই আলো-চনা হল। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমরা প্রতিমাদেরকে এই উদ্দেশ্যে উপাস্য মনে কর যে, তারা আল্লাহ্র কাছে তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এই উদ্দেশ্যও নিরেট ধোঁকা ও বাতিল। চিন্তা কর) মানুষ যা চায়, তাই কি পায়? না। কেননা, প্রত্যেক আশা আল্লাহ্র হাতে—পরকালেরও এবং ইহকালেরও। (সুতরাং তিনি যে আশাকে ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। কোরআনের আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের এই বাতিল আশা পূর্ণ করতে চাইবেন না। কাজেই প্রতিমারা দুনিয়াতে কাফিরদের অভাব-অনটনের ব্যাপারে

সুপারিশ করবে না এবং পরকালে আযাব থেকে মুক্তির ব্যাপারেও সুপারিশ করবে না। তাই নিশ্চিতরূপেই তাদের আশা পূর্ণ হবে না। বেচারী প্রতিমা কি সুপারিশ করবে, তাদের মধ্যে তো সুপারিশের যোগ্যতাই নেই। যারা এই দরবারে সুপারিশ করার যোগ্য, আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া তাদের সুপারিশও কার্যকর হবে না। সেমতে) আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে, (এতে বোধ হয় উচ্চমর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে; কিন্তু এই উচ্চমর্যাদা সত্ত্বেও) তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না (বরং সুপারিশই করতে পারে না,) কিন্তু যখন আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা অনুমতি দেন এবং যার জন্য (সুপারিশ) পছন্দ করেন। (মানুষ চাপে পড়ে এবং উপযোগিতাবশত পছন্দ ছাড়াও অনুমতি দেয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র ব্যাপারে এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই। তাই وَيَرْضَى বলা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র সন্তান সাব্যস্ত করা কুফর। সেমতে) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না (এবং এ কারণে কাফির) তারাই ফেরেশতাগণকে (আল্লাহ্‌র কন্যা তথা) নারী-বাচক নাম দিয়ে থাকে। (তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র 'পরকালের অবিশ্বাস' উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এ দিকে ইঙ্গিত করা যে, এসব পথভ্রষ্টতা পরকালের প্রতি উদাসীনতা থেকেই উদ্ভূত। নতুবা পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি স্বীয় মুক্তির ব্যাপারে অবশ্যই চিন্তা করে। ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা যখন কুফর হল, তখন প্রতিমাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করা যে কুফর তা আরও উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়। তাই এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়নি। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করা বাতিল) অথচ এ বিষয়ে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তারা কেবল ভিত্তিহীন ধারণার উপর চলে। নিশ্চয় সত্যের ব্যাপারে (অর্থাৎ সত্য প্রমাণে) ভিত্তিহীন ধারণা মোটেও ফলপ্রসূ নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত, রিসালত ও তাঁর ওহী সংরক্ষিত হওয়ার প্রমাণাদি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা কোন দলীল ব্যতিরেকেই বিভিন্ন প্রতিমাকে উপাস্য ও কার্যনির্বাহী সাব্যস্ত করে রয়েছে এবং ফেরেশতাকুলকে আল্লাহ্‌র কন্যা আখ্যায়িত করেছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রতিমাদেরকেও আল্লাহ্‌র কন্যা বলত।

আরবের মুশরিকরা অসংখ্য প্রতিমার পূজা করত। তন্মধ্যে তিনটি প্রতিমা ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবের বড় বড় গোত্র এগুলোর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছিল। প্রতিমাত্রয়ের নাম ছিল লাত, ওয্যা ও মানাত। লাত তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোত্রের, ওয্যা কোরায়েশ গোত্রের এবং মানাত বনী হেলালের প্রতিমা ছিল। এসব প্রতিমার অবস্থান স্থলে মুশরিকরা বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব গৃহকে কা'বার অনুরূপ মর্যাদা দান করা হত। মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ্ (সা) এসব গৃহ ভূমিসাৎ করে দেন।—(কুরতুবী)

قِسْمَةٌ ضِيزَى — ضِيزَى শব্দটি ضوز থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জুলুম করা, অধিকার খর্ব করা। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) قسمة ضيزى এর অর্থ করেছেন নিপীড়নমূলক বন্টন।

ধারণার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান : إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

আরবী ভাষায় ظن শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। আয়াতে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এটাই মুশরিকদের প্রতিমা পূজার কারণ ছিল। দুই. এমন ধারণা যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীতে আসে। 'একীন' তথা দৃঢ়বিশ্বাস সেই বাস্তবসম্মত অকাট্য জ্ঞানকে বলা হয়, যাতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই; যেমন কোরআন পাক অথবা হাদীসে-মুতাওয়াতির থেকে অর্জিত জ্ঞান। এর বিপরীতে 'যন' তথা ধারণা সেই জ্ঞানকে বলা হয়, যা ভিত্তিহীন কল্পনা তো নয়; বরং দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই দলীল অকাট্য নয়, যাতে অন্য কোন সম্ভাবনাই না থাকে; যেমন সাধারণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধি-বিধান। প্রথম প্রকারকে 'একিনিয়্যাত' তথা দৃঢ় বিশ্বাসপ্রসূত বিধানাবলী এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'যন্নীয়্যাত' তথা ধারণাপ্রসূত বিধানাবলী বলা হয়ে থাকে। এই প্রকার ধারণা শরীয়তে ধর্তব্য। এর পক্ষে কোরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এই ধারণাপ্রসূত বিধান অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব—এ বিষয়ে সবাই একমত। আলোচ্য আয়াতে যে ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে, তার অর্থ অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। তাই কোন খট্‌কা নেই।

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ۝ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ۝ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ۝

(২৯) অতএব, যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তার তরফ থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। (৩০) তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে। (৩১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র, যাতে তিনি মন্দ কর্মীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সৎকর্মীদেরকে দেন ভাল ফল, (৩২) যারা বড় বড় গোনাহ্ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে। অতএব, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি ভাল জানেন কে সংযমী ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى এবং إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ আয়াতদ্বয় থেকে জানা গেল যে, মুশরিকরা হঠকারী। কোরআন ও হিদায়ত নাযিল হওয়া সত্ত্বেও তারা অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। হঠকারীর কাছ থেকে সত্য গ্রহণের আশা করা যায় না অতএব) যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে, আপনি তার তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (কেবল পার্থিব জীবন কামনা করে বলেই পরকালে বিশ্বাস করে না, যা لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ থেকে উপরে জানা গেছে)। তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই (অর্থাৎ পার্থিব জীবন পর্যন্তই। অতএব, তাদের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করুন)। আপনার পালনকর্তা ভাল জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনিই ভাল জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত। (এ থেকে তাঁর জ্ঞান প্রমাণিত হয়েছে। এখন কুদরত সপ্রমাণ করা হচ্ছে :) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র। (যখন জ্ঞান ও কুদরতে আল্লাহ্ কামিল এবং তাঁর আইন ও বিধানাবলী পালনের দিক দিয়ে মানুষ দুই প্রকার-পথভ্রষ্ট ও সুপথপ্রাপ্ত, তখন) পরিণাম এই যে, তিনি মন্দ কর্মীদেরকে তাদের (মন্দ) কর্মের বিনিময়ে (বিশেষ ধরনের) প্রতিফল দেবেন এবং সৎকর্মীদেরকে তাদের সৎ কর্মের বিনিময়ে (বিশেষ ধরনের) প্রতিফল দেবেন। (কাজেই তাদের ব্যাপার তাঁরই কাছে সোপর্দ করুন। অতঃপর সৎকর্মীদের পরিচয় দান করা হচ্ছে :) যারা বড় বড় গোনাহ্ এবং (বিশেষ করে) অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে, ছোটখাট গোনাহ্ করলেও (এখানে যে সৎ কর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে, তা ছোটখাট গোনাহ্ দ্বারা ত্রুটিযুক্ত হয় না। আয়াতে উল্লিখিত ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, আয়াতে যে সৎকর্মীদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাদের তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য বড় বড় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা তো শর্ত, কিন্তু মাঝে মাঝে ছোটখাট গোনাহ্ হয়ে যাওয়া এর পরিপন্থী নয়। তবে ছোটখাট গোনাহ্ও কচিৎ হয়ে যাওয়া শর্ত

—অভ্যাস না হওয়া চাই এবং বারবার না করা চাই। বারবার করলে ছোটখাট গোনাহ্ও বড় গোনাহ্ হয়ে যায়। ব্যতিক্রমের অর্থ এরূপ নয় যে, ছোটখাট গোনাহ্ করার অনুমতি আছে। বড় বড় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার যে শর্ত রয়েছে, এর অর্থ এরূপ নয় যে, বড় বড় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার উপর সৎকর্মীদের সৎকর্মের উত্তম প্রতিদান পাওয়া নির্ভরশীল। কেননা, যে বড় বড় গোনাহ্ করে, সেও কোন সৎ কর্ম করলে তার প্রতিদান পাবে। আল্লাহ্ বলেন : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ সুতরাং এই শর্ত প্রতিদান দেওয়ার দিক দিয়ে নয়; বরং তাকে সৎকর্মী ও আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র উপাধি দান করার দিক দিয়ে। উপরে মন্দ কর্মীদেরকে শাস্তিদানের কথা বলা হয়েছে। এ থেকে গোনাহ্গারদেরকে নিরাশ করার ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে তারা ঈমান ও তওবা করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। এছাড়া সৎকর্মীদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়ার ওয়াদার কারণে তাদের আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হওয়ার ধারণাও আশংকা রয়েছে। তাই পরবর্তী আয়াতে উভয় প্রকার ধারণা খণ্ডন করে বলা হয়েছে : নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। অতএব, যারা গোনাহ্-গার তারা যেন ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সাহস হারিয়ে না ফেলে। তিনি ইচ্ছা করলে কুফর ও শিরক ব্যতীত সব গোনাহ্ কৃপাবশতই মাফ করে দেন। অতএব, ক্ষতিপূরণ করলে কেন মাফ করবেন না। এমনিভাবে সৎকর্মীরা যেন আত্মম্ভরী না হয়ে উঠে। কেননা, মাঝে মাঝে সৎ কর্মে অপ্রকাশ্য ত্রুটি মিলিত হয়ে যায়। ফলে সৎ কর্ম গ্রহণযোগ্য থাকে না। সৎ কর্ম যখন গ্রহণীয় হবে না, তখন সৎকর্মী আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হবে না। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তোমাদের কোন অবস্থা তোমরা নিজে জানবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা জান-বেন। শুরু থেকেই এরূপ হয়ে আসছে। সেমতে) তিনি তোমাদের সম্পর্কে (ও তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে তখন থেকে) ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদম (আ)-কে তার মাধ্যমে তোমরাও মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছ এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে। (এই উভয় অবস্থায় তোমরা নিজেদের সম্পর্কে কিছুই জানতে না; কিন্তু আমি জানতাম। এমনিভাবে এখনও তোমাদের নিজে-দের ব্যাপারে অনবহিত হওয়া এবং আমার অবহিত ও ওয়াকিফহাল হওয়া কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়)। অতএব, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। (কেননা) তিনি ভাল জানেন কে তাকওয়া অবলম্বনকারী। (অর্থাৎ তিনি জানেন যে, অমুক তাকওয়া অবলম্বনকারী নয়, যদিও দৃশ্যত উভয়েই তাকওয়া অবলম্বন করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا - ذٰلِكَ

مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ অর্থাৎ যারা আমার স্মরণে বিমুখ এবং একমাত্র পার্থিব জীবনই

কামনা করে, আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের দৌড় পার্থিব জীবন পর্যন্তই।

কোরআন পাক পরকাল ও কিয়ামতে অবিশ্বাসীদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছে। পরিতাপের বিষয় ইংরেজী শিক্ষা এবং পার্থিব লোভ-লালসা আজকাল মুসলমানদের অবস্থা তাই করে দিয়েছে। আজকাল আমাদের সকল জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেষ্টা কেবল অর্থনীতিকেই কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। ভুলেও আমরা পরকালীন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করি না। আমরা রসূলে পাক (সা)-এর নাম উচ্চারণ করি এবং তাঁর সুপারিশ আশা করি, কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে এহেন অবস্থা-সম্পন্নদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেন। নাউযুবিল্লাহি মিনহা।

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনকারী সৎকর্মীদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করে তাদের পরিচয় এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সাধারণভাবে কবীরা তথা বড় বড় গোনাহ্ থেকে এবং বিশেষভাবে নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। এতে لمم শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে যে, ছোটখাট গোনাহে লিপ্ত হওয়া তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত করে না।

لَمَم শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে দু'রকম উক্তি বর্ণিত আছে। এক. এর অর্থ সগীরা অর্থাৎ ছোটখাট গোনাহ্। সূরা নিসার আয়াতে একে اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ বলা হয়েছে। سيئات

এই উক্তি হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইবনে কাসীর বর্ণনা করেছেন। দুই. এর অর্থ সেসব গোনাহ্, যা কদাচিৎ সংঘটিত হয়, অতঃপর তা থেকে তওবা করত চিরতরে বর্জন করা হয়। এই উক্তিও ইবনে কাসীর প্রথমে হযরত মুজাহিদ থেকে এবং পরে হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর সারমর্মও এই যে, কোন সৎ লোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গোনাহ্ হয়ে গেলে যদি সে তওবা করে, তবে সে-ও সৎকর্মী ও মুত্তাকীদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না। সূরা আলে-ইমরানের এক আয়াতে মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে এই বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আয়াত এই ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ তারাও মুত্তাকীদের তালিকাভুক্ত, যাদের দ্বারা কোন অশ্লীল কার্য ও কবীরা গোনাহ্ হয়ে যায় অথবা গোনাহ্ করে নিজের উপর জুলুম করে বসলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্কে স্মরণ করে ও গোনাহ্ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে গোনাহ্ ক্ষমা করতে পারে ? যা গোনাহ্ হয়ে যায়, তার উপর অটল থাকে না। অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, সগীরা তথা ছোটখাট গোনাহ্ বারবার করা হলে এবং অভ্যাস করে নিলে তা কবীরা হয়ে যায়। তাই তফসীরের সার-সংক্ষেপে لمم এর তফসীরে এমন গোনাহ্র কথা বলা হয়েছে, যা বারবার করা হয় না।

সগীরা ও কবীরা গোনাহের সংজ্ঞা দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা নিসার اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ আয়াতের তফসীরে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ

اَجِنَّةٌ—শব্দটি جَنِيْنٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ গর্ভস্থিত ভ্রূণ। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞান রাখে না, যতটুকু তার স্রষ্টা রাখেন। কেননা, মাতৃগর্ভে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার কোন জ্ঞান ও চেতনা থাকে না, কিন্তু তার স্রষ্টা বিজ্ঞসুলভ সৃষ্টিকুশলতায় তাকে গড়ে তোলে। আয়াতে মানুষের অক্ষমতা ও অজ্ঞানতা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, মানুষ যে কোন ভাল ও সৎ কাজ করে, সেটা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহ। কারণ, কাজ করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি তৈরী করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিনিই গতিশীল করেছেন। অন্তরে সৎ কাজের প্রেরণা ও সংকল্প তাঁরই তওফীক দ্বারা হয়। অতএব, মানুষ যতবড় সৎকর্মী, মুত্তাকী ও পরহিযগারই হোক না কেন, নিজ কর্মের জন্য গর্ব করার অধিকার তার নেই। এছাড়া ভালমন্দ সব সমাপ্তি ও পরিণামের উপর নির্ভরশীল। সমাপ্তি ভাল হবে কি মন্দ হবে, তা এখনও জানা নেই। অতএব, গর্ব ও অহংকার কিসের উপর ? পরবর্তী আয়াতে এ কথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى — অর্থাৎ তোমরা নিজেদের পবিত্রতা দাবী করো না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন কে কতটুকু পানির মাছ। শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ভীতির উপর নির্ভরশীল—বাহ্যিক কাজকর্মের উপর নয়। আল্লাহ্ভীতিও তা-ই ধর্তব্য, যা মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম থাকে।

হযরত যয়নব বিনতে আবূ সালমা (রা)-র পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বাররা', যার অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। রসূলুল্লাহ্ (সা) আলোচ্য فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ আয়াত

তিলাওয়াত করে এই নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ এতে সৎ হওয়ার দাবী রয়েছে। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে যয়নব রাখা হয়।—(ইবনে কাসীর)

ইমাম আহমদ (র) আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (র) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেন ঃ তুমি যদি কারও প্রশংসা করতেই চাও, তবে একথা বলে কর ঃ আমার জানা মতে এই ব্যক্তি সৎ, আল্লাহ্ভীরু। সে আল্লাহ্র কাছেও পাক-পবিত্র কিনা আমি জানি না।

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ۝ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۝ أَعِندَهُ عِلْمُ
الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ۝ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۝ وَإِبْرَاهِيمَ
الَّذِي وَفَّىٰ ۝ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۝ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ
إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۝ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۝
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ۝ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۝ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ
وَأَحْيَا ۝ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا
تُمْنَىٰ ۝ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ۝ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۝ وَ
أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ۝ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۝ وَثَمُودَا فَمَا
أَبْقَىٰ ۝ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۝
وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۝ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ
هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ۝ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ۝ لَيْسَ لَهَا مِن
دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝ وَتَضْحَكُونَ
وَلَا تَبْكُونَ ۝ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ۝ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩

সিজদা

(৩৩) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে মুখ ফিরিয়ে নেয় (৩৪) এবং দেয় সামান্যই ও পাষাণ হয়ে যায়। (৩৫) তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে দেখে? (৩৬) তাকে কি

জানানো হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে, (৩৭) এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল? (৩৮) কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও গোনাহ্ নিজে বহন করবে না (৩৯) এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে (৪০) তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। (৪১) অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (৪২) তোমার পালনকর্তার কাছে সবকিছুর সমাপ্তি, (৪৩) এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান (৪৪) এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান (৪৫) এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল—পুরুষ ও নারী (৪৬) একবিন্দু বীর্য থেকে যখন স্খলিত করা হয়। (৪৭) পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই, (৪৮) এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৪৯) এবং তিনিই শিরা নক্ষত্রের মালিক। (৫০) তিনিই প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন। (৫১) এবং সামূদকেও অতঃপর কাউকে অব্যাহতি দেন নি। (৫২) এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল আরও জালিম ও অবাধ্য। (৫৩) তিনিই জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছেন (৫৪) অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেয় যা আচ্ছন্ন করার। (৫৫) অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যা বলবে? (৫৬) অতীতের সতর্ক-কারীদের মধ্যে সে-ও একজন সতর্ককারী। (৫৭) কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। (৫৮) আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ একে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (৫৯) তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? (৬০) এবং হাসছ—ক্রন্দন করছ না? (৬১) তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ, (৬২) অতএব, আল্লাহ্‌কে সিজদা কর এবং তাঁর ইবাদত কর।

শানে-নুযূল ঃ দুররে মনসূরে ইবনে জরীর (র)-এর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার বন্ধু এই বলে তাকে তিরস্কার করল যে, তুমি পৈতৃক ধর্ম কেন ছেড়ে দিলে? সে বলল ঃ আমি আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করি। বন্ধু বলল ঃ তুমি আমাকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমি তোমার শাস্তি নিজের কাঁধে নিয়ে নেব। ফলে তুমি বেঁচে যাবে। সেমতে সে বন্ধুকে কিছু অর্থকড়ি দিল। বন্ধু আরও চাইলে সে সামান্য ইতস্তত করার পর আরও দিল এবং অবশিষ্ট অর্থের একটি দলিল লিখে দিল। রূহুল মা'আনীতে এই ব্যক্তি'র নাম 'ওলীদ ইবনে মুগীরা' লিখিত আছে। সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করে শাস্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সৎকর্মীদের পরিচয় শুনলেন, এখন) আপনি কি তাকেও দেখেছেন, যে (সত্যধর্ম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সামান্যই দেয়, অতঃপর বন্ধ করে দেয়? (অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে অর্থকড়ি দেওয়ার ওয়াদা নিজ স্বার্থোদ্ধারের জন্য করে, তাকেও পুরোপুরি দেয় না। এ থেকেই বোঝা যায় যে, এরূপ ব্যক্তি অপরের উপকারের জন্য কিছুই ব্যয় করবে না। এর-সারমর্ম এই যে, সে কৃপণ) তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে তা দেখে? যার মাধ্যমে সে জানতে পেরেছে যে, অমুক ব্যক্তি আমার পাপের শাস্তি নিজে গ্রহণ করে আমাকে বাঁচিয়ে দেবে। তার কাছে কি সেই বিষয়বস্তু পৌঁছেনি, যা আছে মূসা (আ)-র কিতাবসমূহে [তওরাত ছাড়াও মূসা (আ)-র দশটি সহীফা ছিল] এবং ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবে, সে বিধানাবলী পূর্ণরূপে পালন করেছিল? (সেই বিষয়বস্তু) এই যে, কেউ কারও গোনাহ্

(এভাবে) বহন করবে না (যে, গোনাহ্‌কারী মুক্ত হয়ে যায়। কাজেই সে কিরূপে বুঝল যে, এই ব্যক্তি তার গোনাহ্ বহন করবে?) এবং মানুষ (ঈমানের ব্যাপারে) তাই পায়, যা সে করে (অর্থাৎ অন্যের ঈমান দ্বারা তার কোন উপকার হবে না। সুতরাং তিরস্কার-কারী ব্যক্তির ঈমান থাকলেও তা তার উপকারে আসত না। তার ঈমান না থাকলে তো কথাই নেই)। এবং মানুষের কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি নিজের সাফল্যের চেষ্টা থেকে কিভাবে গাফিল হয়ে গেল?) এবং আপনার পালনকর্তার কাছে সবাইকে পৌঁছতে হবে। (এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি কিরূপে নিশ্চিত হয়ে গেল?) এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান। তিনিই পুরুষ ও নারীর যুগল (গর্ভাশয়ে) স্খলিত একবিন্দু বীর্য থেকে সৃষ্টি করেন। (অর্থাৎ সব কাজকর্মের তিনিই মালিক—অন্য কেউ নয়। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি কিরূপে বুঝে নিল যে, কিয়ামতের দিন তাকে আযাব থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা অন্যের করায়ত্ত থাকবে)? এবং পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই। (অর্থাৎ কারও দায়িত্বের ন্যায় এটা অবশ্যই হবে। অতএব, কিয়ামত হবে না, এটা যেন এই ব্যক্তির নিশ্চিত হওয়ার কারণ না হয়)। এবং তিনিই ধনবান করেন এবং সম্পদ দান করেন। এবং তিনিই শিরা-নক্ষত্রের মালিক। (মূর্খতা যুগে কোন কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। অর্থাৎ পূর্বোক্ত কাজকর্মের এসব কাজকর্ম ও বিষয়সমূহের মালিকও তিনিই। পূর্বোক্ত কাজকর্ম মানুষের অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। এবং এসব কাজকর্ম মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। সম্পদ ও নক্ষত্র উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, তোমরা যাকে সাহায্যকারী মনে কর, তার মালিকও আমিই। অতএব, কিয়ামতে অন্যরা এসব কাজকর্মের অধিকারী হবে কিরূপে?) এবং তিনিই আদি আদ সম্প্রদায়কে (কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছেন এবং সামূদকেও, অতঃপর কাউকে অব্যাহতি দেন নি। তাদের পূর্বে কওমে নূহকে (ধ্বংস করেছেন)। তারা ছিল আরও জালিম ও অবাধ্য। কারণ, সাড়ে নয়শ বছরের দাওয়াতের পরও তারা পথে আসেনি এবং (লূতের) জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে তিনিই নিক্ষেপ করেছেন, অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেয়, যা আচ্ছন্ন করার। (অর্থাৎ উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হতে থাকে। অতএব, এই ব্যক্তি যদি এসব ঘটনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করত, তবে কুফরের আযাবকে ভয় করত। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, হে মানুষ! তোমাকে এমন বিষয়বস্তু জানানো হল, যা হিদায়ত হওয়ার কারণে এক একটি নিয়ামত)। অতএব, তুমি তোমার পালনকর্তার কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? (এবং এসব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে উপকৃত হবে না?) তিনিও (অর্থাৎ এই পয়গম্বরও) অতীতের সতর্ককারীদের মধ্যে একজন সতর্ককারী। (তাঁকে মেনে নাও। কারণ) দ্রুত আগমনকারী বিষয় (অর্থাৎ কিয়ামত) নিকটে এসে গেছে। (যখন তা আসবে, তখন) আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ একে হটাতে পারবে না। (সুতরাং কারও ভরসায় নিশ্চিন্তে বসে থাকার অবকাশ নেই। অতএব, এমন ভয়াবহ কথাবার্তা শুনেও) তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? এবং (পরিহাসছলে) হাসছ—(আযাবের ভয়ে) ক্রন্দন করছ না? তোমরা অহংকার করছ। (এ থেকে বিরত হও এবং পয়গম্বরের

শিক্ষা অনুযায়ী) আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং (শিরকবিহীন) ইবাদত কর, (যাতে তোমরা মুক্তি পাও)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى — تولى-এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য থেকে মুখ ফেরানো।

أَكْدَى — শব্দটি كدية থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সেই প্রস্তরখণ্ড, যা কূপ অথবা ভিত্তি খনন করার সময় মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং খননকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে أكدى-এর অর্থ এই যে, প্রথমে কিছু দিল, এরপর হাত গুটিয়ে নিল। উপরে আয়াতের শানে-নুযূলে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে অথবা শুরুতে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দিকে কিছু আকৃষ্ট হয়, অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। এই তফসীর হযরত মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى —শানে-নুযূলের ঘটনা অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি কোন এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আযাব আমি মাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যদ্দ্বারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার শাস্তি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলা বাহুল্য, এটা নিরেট প্রতারণা। তার কাছে কোন অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং অন্য কেউ তার পরকালীন শাস্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি শানে-নুযূলের ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, দানকার্য শুরু করে তা বন্ধ করে দেওয়ার কারণ এই ধারণা হতে পারে যে, উপস্থিত সম্পদ ব্যয় করে দিলে আবার কোথা থেকে আসবে। এই ধারণা খণ্ডন করার জন্য বলা হয়েছে, তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যদ্দ্বারা সে যেমন দেখতে পাচ্ছে যে, এই সম্পদ খতম হয়ে যাবে এবং তৎস্থলে অন্য সম্পদ সে লাভ করতে পারবে না? এটা ভুল। তার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং তার এই ধারণাও সঠিক নয়। কেননা, কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ — অর্থাৎ তোমরা যা ব্যয় কর, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তার বিকল্প দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

চিন্তা করলে দেখা যায়, কোরআনের এই বাণীর সত্যতা কেবল টাকা-পয়সার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষ দুনিয়াতে যে কোন শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দেহে তার বিকল্প সৃষ্টি করতে থাকেন। নতুবা মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি ইস্পাত নির্মিতও হত, তবে ষাট-সত্তর বছর ব্যবহার করার দরুন তা ক্ষয় হয়ে যেত। পরিশ্রমের ফলে মানুষের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতটুকু ক্ষয় হয়, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের ন্যায় তার বিকল্প ভিতর থেকেই সৃষ্টি করে দেন। অর্থ-সম্পদের ব্যাপারেও তদ্রূপ। মানুষ ব্যয় করতে থাকে আর তার বিকল্প আগমন করতে থাকে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত বিলাল (রা)-কে বলেন : انفق يا بلال و لا تخش من ذى العرش اقلا বিলাল, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে থাক এবং আশংকা করো না যে, আরশের অধিপতি আল্লাহ্ তোমাকে নিঃস্ব করে দেবেন।—(ইবনে কাসীর)

এই—اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একটি বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে وفى বলা হয়েছে। وفاء শব্দের অর্থ ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ গুণ, অঙ্গীকার পূরণের কিঞ্চিৎ বিবরণ : উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্র আনুগত্য করবেন এবং মানুষের কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি এই অঙ্গীকার সকল দিক দিয়েই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এতে তাঁকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হতে হয়েছে। وفى শব্দের এই তফসীর ইবনে কাসীর, ইবনে জরীর প্রমুখের মতে।

কোন কোন হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ বিশেষ কর্মকাণ্ড বোঝানোর জন্য وفى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা উপরোক্ত তফসীরের পরিপন্থী নয়। কেননা, অঙ্গীকার পালন শব্দটি আসলে ব্যাপক। এতে নিজস্ব কর্মকাণ্ড-সহ আল্লাহ্র বিধানাবলী প্রতিপালন এবং আল্লাহ্র আনুগত্যও দাখিল আছে। এছাড়া রিসালতের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত কর্মকাণ্ডও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণত আবু ওসামা (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى আয়াত তিলাওয়াত করে তাঁকে বললেন : তুমি জান এর মতলব কি? আবু ওসামা (রা) আরয করলেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-ই ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : অর্থ এই যে, وفى عمل يومه با ربع ركعات فى اول النهار অর্থাৎ তিনি দিনের কাজ এভাবে পূর্ণ করে দেন যে, দিনের শুরুতে (ইশরাকের) চার রাক'আত নামায পড়ে নেন।—(ইবনে কাসীর)

তিরমিযীতে আবূ যর (রা) বর্ণিত এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

ابن ادم اركع لى اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره -

অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেনঃ হে বনী আদম, দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাক'আত নামায পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

মুয়ায ইবনে আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আমি তোমা-দেরকে বলছি, আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে الَّذِىْ وَفّٰى খেতাব কেন দিলেন। কারণ এই যে, তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল এই আয়াত পাঠ করতেন ঃ

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ - (ইবনে কাসীর)—

মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফার বিশেষ নির্দেশ ও শিক্ষা ঃ কোরআন পাক পূর্ব-বর্তী কোন পয়গম্বরের উক্তি অথবা শিক্ষা উদ্ধৃত করার মানে এই হয় যে, এই উম্মতের জন্যও সেটা অবশ্য পালনীয়। তবে এর বিপক্ষে কোন আয়াত অথবা হাদীস থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। পরবর্তী আঠার আয়াতে সেই সব বিশেষ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় ছিল। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মগত বিধান মাত্র দুটি। অবশিষ্ট শিক্ষা উপদেশ ও আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। কর্মগত বিধানদ্বয় এই ঃ

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى এবং اَنْ لَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

— وزر শব্দের আসল অর্থ বোঝা। প্রথম আয়াতের অর্থ এই যে, কোন বোঝা বহনকারী নিজের ছাড়া অপরের বোঝা বহন করবে না। এখানে বোঝা অর্থ পাপ ও শাস্তির বোঝা। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অপরের শাস্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারও হবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ — অর্থাৎ কোন শক্তি যদি পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহন কর, তবে তার বোঝার কিয়দংশও বহন করার সাধ্য কারও হবে না।

একের গোনাহে অপরকে পাকড়াও করা হবে না ঃ এই আয়াতের শানে-নুযূলে বর্ণিত ব্যক্তির ধারণাও অসার প্রমাণিত হয়েছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা ইসলাম গ্রহণে

ইচ্ছুক ছিল। তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করল এবং নিশ্চয়তা দিল যে, কিয়ামতে কোন আযাব হলে সে নিজে তা গ্রহণ করে তাকে বাঁচিয়ে দেবে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র দরবারে একের গোনাহে অপরকে পাকড়াও করার কোন সম্ভাবনা নেই।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকজন অবৈধ বিলাপ ও ক্রন্দন করলে তাদের এই কর্মের কারণে মৃতের আযাব হয়। এটা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে নিজেও মৃতের জন্য বিলাপ ও আহাজারিতে অভ্যস্ত হয় অথবা যে ওয়ারিস-দেরকে ওসীয়ত করে যে, তার মৃত্যুর পর যেন বিলাপ ও ক্রন্দনের ব্যবস্থা করা হয়।—(মাযহারী) এমতাবস্থায় তার আযাব তার নিজের কারণে হয়, অন্যের কর্মের কারণে নয়।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى—এর সারমর্ম এই যে, অপরের আযাব যেমন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি অপরের কাজ নিজে করার অধিকারও কারও নেই। এতে করে সে অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরয নামায আদায় করতে পারে না এবং ফরয রোযা রাখতে পারে না। এভাবে যে, অপর ব্যক্তি এই ফরয নামায ও রোযা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান কবূল করতে পারে না, যার ফলে অপরকে মু'মিন সাব্যস্ত করা যায়।

আলোচ্য আয়াতের এই তফসীরে কোন আইনগত খট্‌কা ও সন্দেহ নেই। কেননা হজ্জ ও যাকাতের প্রশ্নে বেশীর বেশী এই সন্দেহ হতে পারে যে, প্রয়োজন দেখা দিলে আইনত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করতে পারে অথবা অপরের যাকাত তার অনুমতিক্রমে দিতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই সন্দেহ ঠিক নয়। কারণ, কাউকে নিজের স্থলে বদলী হজ্জের জন্য প্রেরণ করা এবং তার ব্যয়ভার নিজে বহন করা অথবা কাউকে নিজের তরফ থেকে যাকাত আদায় করার আদেশ দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির নিজের কাজ ও চেষ্টারই অংশ বিশেষ। তাই এটা আয়াতের পরিপন্থী নয়।

'ইসালে সওয়াব' তথা মৃতকে সওয়াব পৌঁছানো ঃ উপরে আয়াতের অর্থ এই জানা গেল যে, এক ব্যক্তি অপরের ফরয ঈমান, ফরয নামায ও ফরয রোযা আদায় করে তাকে ফরয থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এতে জরুরী হয় না যে, এক ব্যক্তির নফল ইবাদতের উপকারিতা ও সওয়াব অন্য ব্যক্তি পেতে পারে না; বরং এক ব্যক্তির দোয়া ও দান-খয়রাতের সওয়াব অপর ব্যক্তি পেতে পারে। এটা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং আলিমগণের সর্বসম্মত ব্যাপার।—(ইবনে কাসীর)

কেবল কোরআন তিলাওয়াতের সওয়াব অপরকে দান করা ও পৌঁছানো জায়েয কি না, এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) মতভেদ করেন। তাঁর মতে এটা জায়েয নয়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাপক অর্থদৃষ্টে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ ইমাম ও ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে দোয়া ও দান-খয়রাতের সওয়াব যেমন অপরকে পৌঁছানো যায়, তেমনি কোরআন তিলাওয়াত ও প্রত্যেক নফল ইবাদতের সওয়াব অপরকে পৌঁছানো

জায়েয। এরূপ সওয়ার পৌঁছালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা পাবে। কুরতুবী বলেন ঃ অনেক হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, মু'মিন ব্যক্তি অপরের সৎ কর্মের সওয়াব পায়। তফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে এসব হাদীস বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফার বরাত দিয়ে যে দু'টি বিধান বর্ণিত হল, এগুলো অন্যান্য পয়গম্বরের শরীয়তেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁদের আমলে এই মূর্খতাসুলভ প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল যে, পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এবং পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে অথবা ভ্রাতা-ভগ্নীকে হত্যা করা হত। তাঁদের শরীয়ত এই কুপ্রথা বিলীন করেছিল।

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى — অর্থাৎ কেবল বাহ্যিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রত্যেকের প্রচেষ্টার আসল স্বরূপও দেখা হবে যে, তা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য করা হয়েছে, না অন্যান্য জাগতিক স্বার্থও এতে শামিল আছে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ انما الاعمال بالنيات। অর্থাৎ কেবল দৃশ্যত কর্মই যথেষ্ট নয়। কর্মে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আদেশ পালনের খাঁটি নিয়ত থাকা জরুরী।

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ — উদ্দেশ্য এই যে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকেই ফিরে যেতে হবে এবং কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ এই বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনার গতিধারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তায় পৌঁছে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার অনুমতিও নেই; যেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলার অবদান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর; তাঁর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো না। এটা তোমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। কাজেই বিষয়টিকে আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সোপর্দ কর।

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ — অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে আনন্দ ও শোক এবং এর পরিণতিতে হাসি ও কান্না প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করে এবং এতদুভয়কে তাদের বাহ্যিক কারণাদির সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যাপার শেষ করে দেয়। অথচ ব্যাপারটি চিন্তা-ভাবনা সাপেক্ষ। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, কারও আনন্দ অথবা শোক এবং হাসি ও কান্না স্বয়ং তার কিংবা অন্য কারও করায়ত্ত নয়। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন এবং তিনিই কারণাদিকে ক্রিয়াশক্তি দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে ক্রন্দনকারীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন এবং হাস্যরতদেরকে এক মিনিটের মধ্যে কাঁদিয়ে দিতে পারেন। কবি চমৎকার বলেছেন ঃ

بگوش گل چہ سخن گفتۂ کہ خنداں ست

بعند ليب چـة فــرمــود ۵ کے نا لا ن ست

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى — غناء শব্দের অর্থ ধনাঢ্যতা এবং اغناء শব্দের অর্থ অপরকে ধনাঢ্য করা। اقنى শব্দটি قنية থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংরক্ষিত ও রিজার্ভ সম্পদ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে ধনবান ও অভাব মুক্ত করেন এবং তিনিই যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন যাতে সে তা সংরক্ষিত করে।

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى — شعرى একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোন কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই, যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, মালিক ও পালকর্তা তিনি।

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى — 'আদ জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষতম জাতি। তাদের দু'টি শাখা পর পর প্রথম ও দ্বিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হযরত হূদ (আ)-কে রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে ঝন্ঝা বায়ুর আযাব আসে। ফলে সমগ্র জাতি নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। কওমে নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম আযাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।—(মাযহারী) সামূদ সম্প্রদায়ও তাদের অপর শাখা। তাদের প্রতি হযরত সালেহ্ (আ)-কে প্রেরণ করা হয়। যারা অবাধ্যতা করে, তাদের প্রতি বজ্রনিনাদের আযাব আসে। ফলে তাদের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى — مؤتفكة-এর শাব্দিক অর্থ সংলগ্ন। এখানে কয়েকটি জনপদ ও শহর একত্রে সংলগ্ন ছিল। হযরত লূত (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তিস্বরূপ জিবরাঈল (আ) তাদের জনপদসমূহ উল্টে দেন।

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى — অর্থাৎ আচ্ছন্ন করে নিল জনপদগুলোকে উল্টে দেওয়ার পর। তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। এ পর্যন্ত মূসা (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবের বরাত দিয়ে বর্ণিত শিক্ষা সমাপ্ত হল।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى — تمارى শব্দের অর্থ বিবাদ ও বিরোধিতা করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : এখানে প্রত্যেক মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে

যে, পূর্ববর্তী আয়াত এবং মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় বর্ণিত আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর শিক্ষার সত্যতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও আযাবের ঘটনাবলী শুনে বিরোধিতা বর্জন করার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটা নিয়ামত। এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কোন্ কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে বিবাদ ও বিরোধিতা করতে থাকবে।

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى—هٰذَا শব্দ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা) অথবা কোরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইনিও অথবা এই কোরআনও পূর্ববর্তী পয়গম্বর অথবা কিতাবসমূহের ন্যায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সতর্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সরল পথ এবং দীন ও দুনিয়ার সাফল্য সম্বলিত নির্দেশাবলী নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখান।

اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ—অর্থাৎ নিকটে আগমনকারী বস্তু নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না। এখানে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বয়সের দিক দিয়ে কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। কারণ, উম্মতে মুহাম্মদী বিশ্বের সর্বশেষ ও কিয়ামতের নিকটবর্তী উম্মত।

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ—هٰذَا الْحَدِيْثِ বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন স্বয়ং একটি মো'জেযা। এটা তোমাদের সামনে এসে গেছে। এ জন্যও কি তোমরা আশ্চর্যবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য করছ এবং গোনাহ্ ও ত্রুটির কারণে ক্রন্দন করছ না?

وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ—سمود-এর আভিধানিক অর্থ গাফিলতি ও নিশ্চিন্ততা। এর অপর অর্থ গান-বাজনা করা। এ স্থলে এই অর্থও হতে পারে।

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا—অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ চিন্তাশীল মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশের সবক দেয়। এসব আয়াতের দাবী এই যে, তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হও এবং সিজদা কর ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নজমের এই আয়াত পাঠ করে রসূলুল্লাহ্ (সা) সিজদা করলেন এবং তাঁর সাথে সব মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানব সিজদা করল। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা নজম পাঠ করে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করলে তাঁর সাথে উপস্থিত সকল মু'মিন ও মুশরিক সিজদা করল,

একজন কোরায়েশী বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুষ্ঠি মাটি তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বলল ঃ আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ এই ঘটনার পর আমি বৃদ্ধকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, তখন যেসব মুশরিক মজলিসে উপস্থিত ছিল, আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তারাও সিজদা করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য কুফরের কারণে তখন এই সিজদার কোন সওয়াব ছিল না। কিন্তু এই সিজদার প্রভাবে পরবর্তীকালে তাদের সবারই ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করার তওফীক হয়ে যায়। যে বৃদ্ধ সিজদা থেকে বিরত ছিল, একমাত্র সে-ই কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে সূরা নজম আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, কিন্তু তিনি সিজদা করেন নি। এই হাদীসদৃষ্টে জরুরী হয় না যে, সিজদা ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কেননা এতে সম্ভাবনা আছে যে, তখন তাঁর ওযু ছিল না অথবা সিজদার পরিপন্থী অন্য কোন ওযর বিদ্যমান ছিল। এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিক সিজদা জরুরী হয় না, পরেও করা যায়।

سورة القمر

সূরা কামার

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا

سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۝ حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ

فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ۝

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ۗ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (২) তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত যাদু। (৩) তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিরীকৃত হয়। (৪) তাদের কাছে এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে সাবধানবাণী রয়েছে। (৫) এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান তবে সতর্ককারিগণ তাদের কোন উপকারে আসে না। (৬) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন আহ্‌বানকারী আহ্‌বান করবে এক অপ্রিয় পরিনামের দিকে, (৭) তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পংগপাল সদৃশ। (৮) তারা আহ্‌বানকারীর দিকে দৌড়তে থাকবে। কাফিররা বলবে ঃ এটা কঠিন দিন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিরদের জন্য উচ্চস্তরের সতর্ককারী বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। সেমতে) কিয়ামত আসন্ন, (যাতে মিথ্যারোপ করার কারণে বড় বিপদ হবে এবং কিয়ামত নিটবর্তী

হওয়ার আলামতও বাস্তব রূপ লাভ করেছে। সেমতে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।] এর মাধ্যমে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি মো'জেযা। এতে তাঁর নবুয়ত প্রমাণিত হয়। নবীর প্রত্যেকটি কথা সত্য। তাই তিনি যে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, সেটাও সত্য হওয়া জরুরী। এভাবে সতর্ককারী বিদ্যমান হয়ে গেছে। এতে তাদের প্রভাবান্বিত হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে] তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে ঃ এটা যাদু, যা এক্ষণি খতম হয়ে যাবে। (অর্থাৎ এটা বাতিল। কারণ, বাতিলের প্রভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

—উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের নৈকট্য থেকে উপদেশ লাভ করা নবুয়তে বিশ্বাসী হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তারা এর দলীলের প্রতিই লক্ষ্য করে না এবং একে বাতিল মনে করে। এমতাবস্থায় তাদের উপর এর কি প্রভাব পড়তে পারে ? এ ব্যাপারে) তারা (বাতিলে দৃঢ়-বিশ্বাসী হয়ে সত্যের প্রতি) মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। (অর্থাৎ তারা কোন বিশুদ্ধ দলীলের ভিত্তিতে নয়, বরং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে এবং সত্যের প্রতি মিথ্যারোপ করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা মো'জেযাকে যাদু বলে, যার প্রভাব দ্রুত বিলীন হয়ে যায়। অতএব নিয়ম এই যে) প্রত্যেক বিষয় (কিছুদিন পর আসল অবস্থায় এসে) স্থিরীকৃত হয়ে যায়। (অর্থাৎ কারণ, ও লক্ষণাদি দ্বারা সত্য যে সত্য এবং মিথ্যা যে মিথ্যা তা সাধারণত নির্দিষ্ট হয়ে যায়। বাস্তবে তো এখন সত্য নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট, কিন্তু স্বল্পবুদ্ধিদের এখন তা বুঝে না আসলে কিছুদিন পরও বুঝে আসতে পারে। চিন্তা-ভাবনা করলে কিছুদিন পর তোমরাও জানতে পারবে যে, এটা ধ্বংসশীল যাদু, না অক্ষয় সত্য ? উল্লিখিত সতর্ককারী ছাড়াও) তাদের কাছে (অতীত উম্মতদের) এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে (যথেষ্ট) সাবধানবাণী রয়েছে। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে (তাদের অবস্থা এই যে) সতর্কবাণীসমূহ তাদের কোন উপকারে আসে না। অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (যখন কিয়ামত ও আযাবের সময় এসে যাবে, তখন আপনা-আপনি জানা যাবে। অর্থাৎ) যেদিন একজন আহ্বানকারী ফেরেশতা এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে আহ্বান করবে, তখন তাদের নেত্র (অপমান ও ভয়ের কারণে) অবনমিত হবে (এবং) কবর থেকে বিক্ষিপ্ত পংগপালের ন্যায় বের হবে। তারা (বের হয়ে) আহ্বানকারীর দিকে ছুটতে থাকবে। (সেখানকার কঠোরতা দেখে) কাফিররা বলবে ঃ এই দিন বড় কঠোর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী সূরা নজম أَزِفَتِ الْآزِفَةُ বলে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাকে এই বিষয়বস্তু দ্বারাই অর্থাৎ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বলেই শুরু করা হয়েছে। এরপর কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার

একটি দলীল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা আলোচিত হয়েছে। কেননা, কিয়ামতের বিপুল সংখ্যক আলামতের মধ্যে সর্ববৃহৎ আলামত হচ্ছে খোদ শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত। এক হাদীসে তিনি বলেনঃ আমার আগমন ও কিয়ামত হাতের দুই অঙ্গুলির ন্যায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আরও কতিপয় হাদীসে এই নৈকট্যের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মো'জেযা হিসাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াও কিয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়া এ মো'জেযাটি আরও এক দিক দিয়ে কিয়ামতের আলামত। তা এই যে, চন্দ্র যেমন আল্লাহ্র কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে কিয়ামতে সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযাঃ মক্কার কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তাঁর রিসালতের স্বপক্ষে কোন নিদর্শন চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা প্রকাশ করেন। এই মো'জেযার প্রমাণ কোরআন পাকের وَانْشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে আছে এবং অনেক সহীহ্ হাদীসেও আছে। এসব হাদীস সাহাবায়ে কিরামের একটি বিরাট দলের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও জুবায়ের ইবনে মুতইম, ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক (রা) প্রমুখ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ একথাও বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং মো'জেযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইমাম তাহাভী (র) ও ইবনে কাসীর এই মো'জেযা সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েতকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এই মো'জেযার বাস্তবতা অকাট্যরূপে প্রমাণিত।

ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কার মিনা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তাঁর কাছে নবুয়তের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ্ তা'আলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক খণ্ড পূর্বদিকে ও অপর খণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সবাইকে বললেনঃ দেখ এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মো'জেযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মো'জেযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগলঃ মুহাম্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে যাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, মক্কায় এই মো'জেযা দুইবার সংঘটিত হয়। কিন্তু সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহে একবারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। —(বয়ানুল-কোরআন) এ সম্পর্কিত কয়েকটি রেওয়ায়েত ইবনে কাসীর থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলঃ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেনঃ

ان اهل مكة سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم اية فاراهم القمر شقين حتى راوا حراء بينهما -

মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে নবুয়তের কোন নিদর্শন দেখতে চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বতকে উভয় খণ্ডের মাঝখানে দেখতে পেল।—(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ

انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين حتى نظروا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। সবাই এই ঘটনা অবলোকন করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা সাক্ষ্য দাও।

ইবনে জরীর (রা)-ও নিজ সনদে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আরও উল্লিখিত আছে ঃ

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر فاخذت فرقة خلف الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا

আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আমি মিনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং এক খণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সাক্ষ্য দাও, সাক্ষ্য দাও।

আবু দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ

انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين فقال كفار قريش اهل مكة هذا سحر سحركم به ابن ابى كبشة انظروا السفار فان كانوا راوا ما رايتم فقد صدق - وان كانوا لم يروا مثل ما رايتم فهو سحر سحركم به فسئل السفار قال وقد موا من كل جهة فقالوا رأينا -

মক্কায় (অবস্থানকালে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। কোরায়েশ কাফিররা বলতে থাকে, এটা যাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে যাদু করেছে। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবী সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা যাদু ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করে।—(ইবনে কাসীর)

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ গ্রীক দর্শনের নীতি এই যে, আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের পক্ষে বিদীর্ণ হওয়া ও সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব। জওয়াব এই যে, দার্শনিকদের

এই নীতি নিছক একটি দাবী মাত্র। এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সবগুলো অসার ও ভিত্তিহীন। আজ পর্যন্ত কোন যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে প্রমাণ করা যায়নি। তবে অজ্ঞ জনসাধারণ প্রত্যেক সুকঠিন বিষয়কে অসম্ভব বলে ধারণা করে থাকে। বলা বাহুল্য, মো'জেযা বলাই হয় এমন কাজকে, যা সাধারণ অভ্যাস বিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধ্যাতীত এবং বিস্ময়কর হয়ে থাকে। সচরাচর ঘটে এরূপ মামুলী ঘটনাকে কেউ মো'জেযা বলবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এরূপ বিরাট ঘটনা ঘটে থাকলে বিশ্বের ইতিহাসে তা স্থান পেত। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, ঘটনাটি মক্কায় রাত্রিকালে ঘটেছিল। তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল। সুতরাং সেসব দেশে এই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। কোন কোন দেশে অর্ধ রাত্রি এবং কোন কোন দেশে শেষ রাত্রি ছিল। তখন সাধারণত সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে। যারা জাগ্রত থাকে, তারাও তো সর্বক্ষণ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে না। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে তার আলোকরশ্মিতে তেমন কোন প্রভেদ হয় না যে, এই প্রভেদ দেখে মানুষ চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে। এছাড়া এটা ছিল স্বল্পক্ষণের ঘটনা। আজকাল দেখা যায় যে, কোন দেশে চন্দ্রগ্রহণ হলে পূর্বেই পত্র-পত্রিকা ও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও হাজারো লাখো মানুষ চন্দ্রগ্রহণের কোন খবর রাখে না। তারা টেরই পায় না। জিজ্ঞাসা করি, এটা কি চন্দ্রগ্রহণ আদৌ না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লিখিত না হওয়ার কারণে এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না।

এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 'তারীখে-ফেরেশতা' গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। মালাবারের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর রোজ-নামচায় তা লিপিবদ্ধও করেছিলেন। এই ঘটনাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। উপরে আবূ দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে।

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ — مستمر শব্দের প্রচলিত

অর্থ দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আরবী ভাষায় কোন সময়ে استمر ও مر চলে যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অর্থেও আসে। তফসীরবিদ মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এ স্থলে এই অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা স্বল্পক্ষণস্থায়ী যাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। مستمر শব্দের এক অর্থ শক্ত ও কঠোর হয়। আবুল আলীয়া ও যাহ্হাক (রা) এই তফসীরই করেছেন। অর্থাৎ এটা বড় শক্ত যাদু।

মক্কাবাসীরা যখন চাক্ষুষ দেখাকে মিথ্যা বলতে পারল না, তখন যাদু ও শক্ত যাদু বলে নিজেদেরকে প্রবোধ দিল।

وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ — مُسْتَقِرٌّ —এর শাব্দিক অর্থ স্থির হওয়া। অর্থ এই যে, প্রত্যেক কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যের উপর যে জালিয়াতির পর্দা ফেলে রাখা হয়, তা পরিণামে উন্মুক্ত হয়েই যায় এবং সত্য সত্যরূপে এবং মিথ্যা মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়ে যায়।

مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ -এর শাব্দিক অর্থ মাথা তোলা, আয়াতের অর্থ এই যে, আহ্বানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। আগের আয়াতে দৃষ্টি অবনমিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয় বক্তব্যের মিল এভাবে যে, হাশরে বিভিন্ন স্থান হবে। কোন কোন স্থানে মস্তক অবনমিতও থাকবে।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۝ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ۝ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ۝ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ۝ وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝

---

(৯) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল। তারা মিথ্যারোপ করেছিল আমার বান্দা নূহের প্রতি এবং বলেছিল ঃ এ তো উন্মাদ। তারা তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। (১০) অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল ঃ আমি অক্ষম, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর। (১১) তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। (১২) এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। (১৩) আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে, (১৪) যা চলত আমার দৃষ্টির সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। (১৫) আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (১৬) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (১৭) আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল (অর্থাৎ তারা নূহের প্রতি মিথ্যা-রোপ করেছিল এবং) বলেছিল : এ তো উম্মাদ! (তারা কেবল একথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং একটি অনর্থক কাজও করেছিল, অর্থাৎ) তারা নূহ (আ)-কে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। (সূরা শোয়ারায় এর উল্লেখ আছে : لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ)-অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল : আমি অপারক, (আমি এদের মুকাবিলা করতে পারি না) অতএব আপনিই (তাদের) প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। (অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দিন, যেমন অন্য আয়াতে আছে : رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا-) অতঃপর আমি প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে তাদের উপর আকাশের দ্বার খুলে দিলাম এবং ভূমি থেকে জারি করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর (আকাশ ও যমীনের) সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে (অর্থাৎ কাফিরদের ধ্বংস সাধনে। উভয় পানি মিলিত হয়ে প্লাবন বৃদ্ধি করল এবং তাতে সবাই নিমজ্জিত হল)। আমি নূহ (আ)-কে (প্লাবন থেকে বাঁচানোর জন্য) আরোহণ করালাম এক কাঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে, যা আমারই তত্ত্বাবধানে (পানির উপর) ভেসে চলত। (মু'মিনগণও তার সাথে ছিল)। এটাই তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। [অর্থাৎ নূহ (আ)। রসূল ও আল্লাহ্‌র অধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এতে কুফরও দাখিল আছে। অতএব কুফরের কারণে নিমজ্জিত করা হয়নি—এরূপ সন্দেহ করার অব-কাশ রইল না]। আমি এই ঘটনাকে শিক্ষার জন্য (কাহিনী ও কিংবদন্তীতে) রেখে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (দেখ) আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী কেমন কঠোর ছিল। আমি (এমন এমন কাহিনী সম্বলিত) কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। (সাধারণত সবার জন্য, কারণ এর বর্ণনাভঙ্গি সুস্পষ্ট এবং বিশেষত আরবদের জন্য, কারণ এটা আরবী ভাষায়)। অতএব (কোরআনে এসব উপদেশের বিষয়-বস্তু দেখে) কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (অর্থাৎ এসব কাহিনী দেখে বিশেষভাবে কাফিরদের সতর্ক হওয়া উচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَازْدُجِرَ—مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ এর শাব্দিক অর্থ হুমকি প্রদর্শন করা হল। উদ্দেশ্য এই যে, তারা নূহ (আ)-কে পাগলও বলল এবং তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করে রিসালতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা নূহ (আ)-কে

হুমকি প্রদর্শন করে বলল ঃ যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব।

আবদ ইবনে হুমায়েদ (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, নূহ (আ)-র সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাঁকে পথেঘাটে কোথাও পেলে গলা টিপে ধরত। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। এরপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতেন ঃ আল্লাহ্, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। তারা অজ্ঞ। সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের জওয়াব দোয়ার মাধ্যমে দিয়ে অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি বদদোয়া করেন, যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়।

فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ — অর্থাৎ ভূমি থেকে স্ফীত পানি এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এভাবে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল যে, সমগ্র জাতিকে ডুবিয়ে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ্ তা'আলা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল। ফলে পাহাড়ের চূড়ায়ও কেউ আশ্রয় পেল না।

ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ — الواح শব্দটি لوح-এর বহুবচন। অর্থ কাঠের তক্তা। دسر শব্দটি دسار এর বহুবচন। অর্থ পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে তক্তাকে সংযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য নৌকা।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ — ذكر এর অর্থ দ্বিবিধ ঃ এক. মুখস্থ করা এবং দুই. উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন ঐশী গ্রন্থ এরূপ ছিল না। তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুর মানুষের মুখস্থ ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সহজীকরণের ফলশ্রুতিতেই কচি কচি বালক-বালিকারাও সমগ্র কোরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি যের-যবরের পার্থক্য হয় না। চৌদ্দশ বছর ধরে প্রতি স্তরে প্রতি ভূখণ্ডে হাজারো লাখো হাফেযের বুকে আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআন সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এ ছাড়া কোরআন পাক তার উপদেশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে খুবই সহজ করে বর্ণনা করেছে। ফলে বড় বড় আলিম, বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক যেমন এর দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনি গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিরাও এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

ইজতিহাদ তথা বিধানাবলী চয়ন করার জন্য কোরআনকে সহজ করা হয়নি ঃ আলোচ্য আয়াতে يسرنا এর সাথে للذكر সংযুক্ত করে আরও বলা হয়েছে যে, মুখস্থ করা ও উপদেশ গ্রহণ করার সীমা পর্যন্ত কোরআনকে সহজ করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক

আলিম ও জাহিল, ছোট ও বড়—সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এতে জরুরী হয় না যে, কোরআন পাক থেকে বিধানাবলী চয়ন করাও তেমনি সহজ হবে। বলা বাহুল্য, এটা একটা স্বতন্ত্র ও কঠিন শাস্ত্র। যেসব প্রগাঢ় জ্ঞানী আলিম এই শাস্ত্রের গবেষণায় জীবনপাত করেন, কেবল তারাই এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন। এটা প্রত্যেকের বিচরণক্ষেত্র নয়।

কোন কোন মুসলমান উপরোক্ত আয়াতকে সম্বল করে কোরআনের মূলনীতি ও ধারাসমূহ পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করেই মুজতাহিদ হতে চায় এবং বিধানাবলী চয়ন করতে চায়। উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এটা পরিষ্কার পথভ্রষ্টতা।

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۝ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا
صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ۝
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ۝ فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ
اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ۝ ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ
كَذَّابٌ اَشِرٌ ۝ سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ۝ اِنَّا مُرْسِلُوا
النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ
بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ۝ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ۝ فَكَيْفَ
كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۝ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا
كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۢ بِالنُّذُرِ ۝ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۭ
نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ۝ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ۝
وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝ وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ

فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً
عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۞ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ وَلَقَدْ جَآءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۞
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ۞

(১৮) 'আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (১৯) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা-বায়ু এক চিরা-চরিত অশুভ দিনে। (২০) তা মানুষকে উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড। (২১) অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (২২) আমি কোরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (২৩) সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (২৪) তারা বলেছিলঃ আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব? তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকার-গ্রস্তরূপে গণ্য হব। (২৫) আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি উপদেশ নাযিল করা হয়েছে? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (২৬) এখন আগামীকল্যই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (২৭) আমি তাদের পরীক্ষার জন্য এক উষ্ট্রী প্রেরণ করব, অতএব তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর কর (২৮) এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানির পালা নির্ধারিত হয়েছে এবং পালাক্রমে উপস্থিত হতে হবে। (২৯) অতঃপর তারা তাদের সংগীকে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। (৩০) অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (৩১) আমি তাদের প্রতি একটিমাত্র নিনাদ প্রেরণ করে-ছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত দলিত খোঁয়াড়ের ন্যায়। (৩২) আমি কোরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৩৩) লূত-সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (৩৪) আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু; কিন্তু লূত-পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে উদ্ধার করেছিলাম। (৩৫) আমার পক্ষ থেকে অনু-গ্রহস্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, আমি তাদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। (৩৬) লূত তাদেরকে আমার প্রচণ্ড পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করেছিল। (৩৭) তারা লূত (আ)-এর কাছে তার মেহ-মানদেরকে দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের চক্ষু লোপ করে দিলাম অতএব আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (৩৮) তাদেরকে প্রত্যুষে নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনে-ছিল। (৩৯) অতএব আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আস্বাদন কর। (৪০) আমি কোরআন-কে বুঝবার জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৪১) ফির-আউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারিগণ আগমন করেছিল। (৪২) তারা আমার সকল

নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর আমি পরাভূতকারী, পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আদ সম্প্রদায়ও (তাদের পয়গম্বরের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (তাদের কাহিনী এই যে) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রচণ্ড বাতাস, এক অবিরাম অশুভ দিনে। (অর্থাৎ সেই সময়টি তাদের জন্য চিরতরে অশুভ হয়ে রয়েছে। সেদিন যে শাস্তি এসেছিল, সেটা কবরের আযাবের সাথে সংলগ্ন হয়ে গেছে। এরপর পরকালের আযাব এবং তার সাথে মিলিত হবে, যা কোন সময় খতম হবে না)। সেই বায়ু এভাবে মানুষকে (তাদের জায়গা থেকে) উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড। (এতে তাদের দীর্ঘাকৃতি হওয়ার দিকেও ইঙ্গিত আছে)। অতএব (দেখ) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। আমি কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সামূদ সম্প্রদায়ও পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (কেননা, এক পয়গম্বরের প্রতি মিথ্যারোপ করা সকল পয়গম্বরের প্রতি মিথ্যারোপ করারই নামান্তর)। তারা বলেছিল ঃ আমরা কি আমাদেরই একাকী একজনের অনুসরণ করব? (অর্থাৎ ফেরেশতা হলে আমরা ধর্মের ব্যাপারে তার অনুসরণ করতাম অথবা সাঙ্গপাঙ্গ বিশিষ্ট হলে পার্থিব ব্যাপারে তার অনুসরণ করতাম। সে তো একাকী মানব। এমতাবস্থায় যদি আমরা অনুসরণ করি) তবে তো আমরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্তরূপে গণ্য হব। আমাদের মধ্য থেকে (মনোনীত হয়ে) তার প্রতিই কি ওহী নাযিল হয়েছে? (কখনই এরূপ নয়) বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। [নেতা হওয়ার জন্য দম্ভভরে সে এমন কথাবার্তা বলে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সালেহ্ (আ)-কে বললেন ঃ তুমি তাদের অর্থহীন কথাবার্তায় দুঃখ করো না] সত্বরই (অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই) তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (অর্থাৎ নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে তারাই মিথ্যাবাদী এবং দম্ভের কারণে তারাই নবীর অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করে। তারা উষ্ট্রীর মো'জেযা চাইত। তাদের আবেদন অনুযায়ী প্রস্তরের ভিতর থেকে) তাদের পরীক্ষার জন্য আমি এক উষ্ট্রী বের করব। অতএব তাদের (কর্মকাণ্ডের) প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর কর। (উষ্ট্রী আবির্ভূত হলে) তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে (কূপের) পানির পালা নির্ধারিত হয়েছে। (অর্থাৎ তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু ও উষ্ট্রীর পালা নির্ধারিত হয়ে গেছে)। প্রত্যেককে পালা-ক্রমে উপস্থিত হতে হবে। [সেমতে উষ্ট্রী আবির্ভূত হল এবং সালেহ্ (আ) একথা জানিয়ে দিলেন]। অতঃপর (পালা দেখে তারা অতিষ্ঠ হয়ে গেল এবং) তারা (উষ্ট্রীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে) তাদের সংগী (কুদার)-কে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। অতঃপর (দেখ) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী (শাস্তি এই যে) আমি তাদের প্রতি একটি মাত্র নিনাদ (ফেরেশতার) প্রেরণ করেছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত দলিত বেড়ার ন্যায়। (অর্থাৎ ক্ষেত অথবা জন্তু-জানোয়ারের

হিফাযতের জন্য শুষ্ক তৃণ ইত্যাদি দ্বারা বেড়া অথবা খোঁয়াড় বানানো হয়। কিছুদিন পর এগুলো দলিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তারাও এমনিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আরবরা এই বেড়া ও খোঁয়াড়ের সাথে দিবারাত্র পরিচিত ছিল। তাই তারা এর অর্থ খুব বুঝত)। আমি কোরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? লূত সম্প্রদায়ও পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করেছি। কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে (বস্তির বাইরে নিয়ে যেয়ে) উদ্ধার করেছিলাম। আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ-স্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে (অর্থাৎ ঈমান আনে), আমি তাদেরকে এইভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। [অর্থাৎ ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা করি। লূত (আ) আযাব আসার পূর্বে] তাদের আমার প্রচণ্ড আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করেছিল। (অর্থাৎ বিশ্বাস করল না। যখন লূতের কাছে আমার ফেরেশতা মেহমানের বেশে আগমন করল এবং তারা সুন্দর বালকদের আগমন জানতে পারল, তখন সেখানে এসে). তারা লূতের কাছে তার মেহমানদেরকে কুমতলবে দাবী করল। [ফলে লূত (আ) প্রথমে বিব্রত হলেন। কিন্তু তারা ছিল ফেরেশতা। কাজেই ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়ে] আমি তাদের চক্ষু লোপ করে দিলাম। [অর্থাৎ জিবরাঈল (আ) তাঁর পাখা তাদের চোখের উপর রেখে দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল। তাদেরকে বলা হল :] অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর মজা আস্বাদন কর। (অন্ধ করার পর) প্রত্যূষে তাদেরকে স্থায়ী আযাব আঘাত হেনেছিল। (বলা হল :) অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আস্বাদন কর। (এই বাক্য প্রথমে অন্ধ হওয়ার আযাবের পর বলা হয়েছিল। এখানে ধ্বংস করার পর বলা হয়েছে। কাজেই পুনরাবৃত্তি নেই)। আমি কোরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? ফিরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও অনেক সতর্কবাণী পৌঁছেছিল। [অর্থাৎ মূসা (আ)-র বাণী ও মো'জেযা]। কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শনের (অর্থাৎ নয়টি প্রসিদ্ধ নিদর্শনের) প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। (অর্থাৎ সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ তওহীদ ও নবুয়তের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। নতুবা ঘটনাবলীকে মিথ্যা বলা সম্ভবপর নয়)। অতঃপর আমি প্রবল পরাক্রান্তের ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (অর্থাৎ আমার পাকড়াওকে কেউ প্রতিহত করতে পারল না। সুতরাং প্রবল পরাক্রান্ত স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কতক শব্দার্থের ব্যাখ্যা : سعر শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে সামূদ গোত্রের আলোচনায় তাদেরই উক্তিতে। এখানে এর অর্থ পাগলামি। দ্বিতীয় فى ضلا ل وسعر বাক্যাংশে। এখানে سعر এর অর্থ জাহান্নামের অগ্নি। অভিধানে এই শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مراودة — راودوه عن ضيفه শব্দের অর্থ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার

জন্য কাউকে ফুসলানো। কওমে লূত বালকদের সাথে অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরীক্ষার জন্যই কয়েকজন ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য লূত (আ)-এর গৃহে উপস্থিত হয়। লূত (আ) দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা প্রাচীর টপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। লূত (আ) বিব্রত বোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন ঃ আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই আগমন করেছি।

সূরা কামার কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার লোভ-লালসায় পতিত এবং পরকাল-বিমুখ কাফিরদের চৈতন্য ফিরে আসে। প্রথমে কিয়ামতের আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের পার্থিব মন্দ পরিণাম ব্যক্ত করার জন্য পাঁচটি বিশ্ববিশ্রুত সম্প্রদায়ের অবস্থা, পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের অশুভ পরিণতি ও ইহকালেও নানা আযাবে পতিত হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

সর্বপ্রথম নূহ (আ)-র সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তারাই বিশ্বের সর্বপ্রথম জাতি, যাদেরকে আল্লাহ্র আযাব ধ্বংস করে দেয়। এই কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে 'আদ, সামূদ, কওমে-লূত ও কওমে ফিরাউন এই চার সম্প্রদায়ের আলোচনা রয়েছে। তাদের ঘটনাবলী কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পাঁচটি জাতি ছিল বিশ্বের শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত জনগোষ্ঠী। কোন শক্তির কাছে তারা মাথা নত করত না। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের উপর আল্লাহ্র আযাব আগমনের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির বর্ণনা শেষে কোরআন পাক এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছে ঃ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ — অর্থাৎ এত শক্তিশালী ও জনবহুল জাতির উপর যখন আল্লাহ্র আযাব নেমে এল, তখন দেখ, তারা কিভাবে মশা-মাছির ন্যায় নিপাত হয়ে গেল! এতদসঙ্গে মু'মিন ও কাফিরদের উপদেশের জন্য এই বাক্যটিও বারবার উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ — অর্থাৎ আল্লাহ্র এই মহা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে কোরআন। উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সীমা পর্যন্ত আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কাজেই সেই ব্যক্তি চরম হতভাগা ও বঞ্চিত, যে কোরআন দ্বারা উপকৃত হয় না। পরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে বিদ্যমান লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যুগের কাফিররা ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শক্তি ও সাহসে 'আদ, সামূদ ও ফিরাউন সম্প্রদায়ের চাইতে বেশী নয়। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে।

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ
نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ
وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ
يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ
شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ
أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾
وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي
مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

(৪৩) তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ? না তোমাদের মুক্তির সনদপত্র রয়েছে কিতাবসমূহে? (৪৪) না তারা বলে যে, আমরা এক অপরাজেয় দল? (৪৫) এ দল তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (৪৬) বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (৪৭) নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। (৪৮) যেদিন তাদেরকে মুখ হেঁচড়িয়ে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে: অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর। (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। (৫০) আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত। (৫১) আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে ধ্বংস করেছি, অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৫২) তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে (৫৩) ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ। (৫৪) আল্লাহভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে; (৫৫) যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিরদের কাহিনী ও কুফরের কারণে তাদের শাস্তির ঘটনাবলী তোমরা শুনলে। এখন তোমরাও যখন কুফরের অপরাধে অপরাধী, তখন তোমাদের শাস্তির কবল থেকে বেঁচে যাওয়ার কোন কারণ নেই)। তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের (অর্থাৎ উল্লিখিত কাফিরদের) চাইতে শ্রেষ্ঠ? (যে কারণে তোমরা অপরাধ করা সত্ত্বেও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না?) না তোমাদের জন্য (ঐশী) কিতাবসমূহে মুক্তির সনদপত্র রয়েছে? না তারা

বলে যে, আমরা এক অপরাজেয় দল? (তাদের পরাজিত হওয়ার তো সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে এবং তারা নিজেরাও এতে বিশ্বাস করে। এরপরও একথা বলার অর্থ এই যে, তাদের মধ্যে শাস্তি প্রতিরোধকারী কোন শক্তি আছে। শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়ার উল্লিখিত তিনটি উপায়ের মধ্য থেকে কোন্‌টি তোমাদের অর্জিত আছে? প্রথমোক্ত দুটি উপায় তো সুস্পষ্টরূপেই বাতিল। অভ্যন্ত কারণাদির দিক দিয়ে তৃতীয় উপায়টি সম্ভবপর হলেও তা ঘটবে না, বরং বিপরীতটা ঘটবে। এভাবে ঘটবে যে,) এ দল শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। (এই ভবিষ্যদ্বাণী বদর, খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। এই পার্থিব শাস্তিই শেষ নয়)। বরং (বড় শাস্তির জন্য) কিয়ামত তাদের (আসল) প্রতিশ্রুত সময়। (কিয়ামতকে সামান্য মনে করো না বরং) কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে। একে অস্বীকার করার ব্যাপারে) এই অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। (তাদের এই ভুল সেদিন ধরা পড়বে,) যেদিন তাদেরকে মুখ হেঁচড়িয়ে জাহান্নামের দিকে টেনে নেওয়া হবে। (বলা হবে:) জাহান্নামের (অগ্নির) মজা আস্বাদন কর। (যদি তারা এ কারণে সন্দেহ করে যে, কিয়ামত এই মুহূর্তে কেন সংঘটিত হয় না, তবে এর কারণ এই যে,) আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। (সেই পরিমাণ আমার জানা আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর সময়কাল ইত্যাদি আমার জ্ঞানে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত আছে। এমনিভাবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ারও একটি সময় নির্দিষ্ট আছে। সেই সময় না আসার কারণেই কিয়ামত সংঘটিত হচ্ছে না। এর ফলে কিয়ামত সংঘটিতই হবে না বলে প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। সময় এলে সে সম্পর্কে) আমার কাজ মুহূর্তের মধ্যে চোখের পলকে হয়ে যাবে। (তোমরা যদি মনে কর যে, তোমাদের চালচলন আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় ও গর্হিত নয়। ফলে কিয়ামত হলেও তোমাদের কোন চিন্তা নেই, তবে শুনে রাখ) আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি। (এটাই তোমাদের চালচলন গর্হিত হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল)। অতএব (এই দলীল থেকে) উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (তাদের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতা-বহির্ভূতও নয়, যদ্দরুন তাদের ক্রিয়াকর্ম গর্হিত হওয়া সত্ত্বেও আযাব থেকে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারত। বরং) তারা যা কিছু করে, সবই (আল্লাহ্ তা'আলা জানেন এবং) আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে (এরূপ নয় যে, কিছু লেখা হয়েছে এবং কিছু বাদ পড়েছে, বরং) প্রত্যেক ছোট ও বড় সবই (তাতে) লিপিবদ্ধ। (সুতরাং আযাব যে হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে) যারা আল্লাহ্‌ভীরু পরহিযগার, তারা থাকবে (জান্নাতের) উদ্যানসমূহে ও নির্ঝরিণীতে, চমৎকার স্থানে, সর্বাধিপতি সম্রাট আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে অর্থাৎ জান্নাতের সাথে আল্লাহ্‌র নৈকট্যও অর্জিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কয়েকটি শব্দার্থের ব্যাখ্যা: زبر শব্দটি زبور এর বহুবচন। অভিধানে প্রত্যেক লিখিত কিতাবকে زبور বলা হয়। হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। ادهى—এর অর্থ অত্যধিক ভয়াবহ এবং امر শব্দের

অর্থ তিক্ততর। এটা مر থেকে উদ্ভূত। কঠোর ও কষ্টকর বিষয়কেও أمر ও مر বলা হয়। سعر শব্দের অর্থ এখানে জাহান্নামের অগ্নি। أشياع শব্দটি شيعة এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী, অর্থাৎ যারা তাদের অনুসারী ও সমমনা। مقعد এর অর্থ মজলিস, বসার জায়গা এবং صدق এর অর্থ সত্য। উদ্দেশ্য এই যে, এই মজলিস মহতী হবে। এতে কোন অসার ও বাজে কথাবার্তা হবে না।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ — قدر শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাপ করা, কোন বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরী করা। আয়াতে এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব জাহানের সকল শ্রেণীর বস্তু বিজ্ঞসুলভ পরিমাপ সহকারে ছোটবড় ও বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে তৈরী করেছেন। অঙ্গুলিসমূহ একই রূপ তৈরী করেন নি—দৈর্ঘ্যে পার্থক্য রেখেছেন। হাত পায়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ রেখেছেন, খোলা, বন্ধ হওয়া এবং সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য স্প্রিং সংযোজিত করেছেন। এক এক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্র কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর দ্বার উন্মোচিত হতে দেখা যাবে।

শরীয়তের পরিভাষায় 'কদর' শব্দটি আল্লাহ্র তকদীর তথা বিধিলিপির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন।

মসনদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, কোরাইশ কাফিররা একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে তকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু তকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ আদি-কালে সৃজিত বস্তু, তার পরিমাণ, সময়কাল, হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই লিখে দেওয়া হয়েছিল। এখন বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টিলাভ করে, তা এই আদিকালীন তকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টিলাভ করে।

তকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিশ্বাস। যে একে সরাসরি অস্বীকার করে, সে কাফির। আর যারা ব্যর্থতার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার করে, তারা ফাসিক। আহমদ, আবু দাউদ ও তিবরানী বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : প্রত্যেক উম্মতে কিছু লোক মজুসী (অগ্নিপূজারী কাফির) থাকে। আমার উম্মতের মজুসী তারা, যারা তকদীর মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খবর নিও না এবং মরে গেলে কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করো না—(রূহুল-মা'আনী)॥

سورة الرحمن

সূরা আর-রহমান

মদীনায় অবতীর্ণ, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ اَلشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَّالنَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا
وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿٧﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ﴿٨﴾ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿٩﴾ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ
النَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾
وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾
رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٨﴾
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) করুণাময় আল্লাহ্ (২) শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, (৩) সৃষ্টি করেছেন মানুষ, (৪) তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (৫) সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে (৬) এবং তৃণলতা

ও বৃক্ষাদি সিজদারত আছে। (৭) তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড, (৮) যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর তুলাদণ্ডে। (৯) তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না। (১০) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য। (১১) এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। (১২) আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। (১৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে (১৫) এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে (১৬) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৭) তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। (১৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (১৯) তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। (২০) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করে না। (২১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে (২২) উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মোতি ও প্রবাল। (২৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৪) দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বতদৃশ্য জাহাজসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রণাধীন)। (২৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

সূরার যোগসূত্র এবং فبای آلاء বাক্যটি বারবার উল্লেখ করার তাৎপর্য: পূর্ববর্তী সূরা ক্বামারের অধিকাংশ বিষয়বস্তু অবাধ্য জাতিসমূহের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছিল। তাই প্রত্যেক শাস্তির পর মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্য فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ বাক্যটি বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাথে সাথে ঈমান ও আনুগত্যে উৎসাহিত করার জন্য দ্বিতীয় বাক্য وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ-কে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

এর বিপরীতে সূরা রহমানের বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবদানসমূহের বর্ণনা সম্পর্কিত। তাই যখন কোন বিশেষ অবদান উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই মানুষকে হুঁশিয়ার ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে উৎসাহিত করার জন্য فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا বাক্যটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র সূরায় এই বাক্য একত্রিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক বার বাক্যটি নতুন নতুন বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এটা অলংকার শাস্ত্রের পরিপন্থী নয়। আল্লামা সুয়ূতী এ ধরনের পুনরুল্লেখের

নাম রেখেছেন তরদীদ। এটা বিশুদ্ধভাষী আরবদের গদ্য ও পদ্য রচনায় বহুল ব্যবহৃত ও প্রশংসিত। শুধু আরবী ভাষাই নয়, ফারসী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় সর্বজনস্বীকৃত কবিদের কাব্যেও এর নযীর পাওয়া যায়। এসব নযীর উদ্ধৃত করার স্থান এটা নয়। তফসীর রূহুল-মা'আনীতে এ স্থলে কয়েকটি নযীর উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

করুণাময় আল্লাহ্ (তাঁর অসংখ্য অবদান আছে। তন্মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক অবদান এই যে, তিনি) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য এবং ইল্‌ম হাসিল করে আমল করার জন্য কোরআন নাযিল করেছেন, যাতে বান্দারা চিরস্থায়ী সুখ ও আরাম হাসিল করে। আরেকটি শারীরিক অবদান এই যে, তিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষ, (অতঃপর) তাকে শিখিয়েছেন বিবৃতি (এর উপকারিতা হাজারো। অন্যের মুখ থেকে কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া তন্মধ্যে একটি। আরেকটি বিশ্বজনীন দৈহিক অবদান এই যে, তাঁর আদেশে) সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে এবং তৃণলতা ও বৃক্ষাদি। (আল্লাহ্‌র) অনুগত। সূর্য ও চন্দ্রের গতি দ্বারা দিবা-রাত্র, শীত-গ্রীষ্ম এবং মাস ও বছরের হিসাব জানা যায়। কাজেই তা অবদান। (আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য বৃক্ষাদির মধ্যে অসংখ্য উপকার সৃষ্টি করেছেন। কাজেই বৃক্ষের আনুগত্যও এক অবদান। আরেক অবদান এই যে) তিনিই আকাশকে সমুন্নত করেছেন। (নভোমণ্ডলীয় উপকারিতা ছাড়াও এর একটা বড় উপকার এই যে, একে দেখে স্রষ্টার অপরিসীম মাহাত্ম্য অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ্ বলেন : يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ আরেক অবদানএই যে, তিনিই (দুনিয়াতে) দাড়ি-পাল্লা স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা ওজনে কমবেশী না কর। (এটা যখন লেনদেনের হক পূর্ণ করার একটি যন্ত্র, যদ্দ্বারা হাজারো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট দূর হয় তখন তোমরা বিশেষভাবে এই অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং এটাও এক কৃতজ্ঞতা যে) তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না। (আরেক অবদান এই যে) তিনিই সৃষ্ট জীবের জন্য পৃথিবীকে (তার স্থানে) স্থাপন করেছেন। এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। আর আছে খোসা বিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধ ফুল অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (অর্থাৎ অস্বীকার করা খুবই হঠকারিতা এবং জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহকে অস্বীকার করার নামান্তর। আরেক অবদান এই যে) তিনিই মানুষকে (অর্থাৎ তাদের আদি পুরুষ আদমকে) সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে এবং জিনকে (অর্থাৎ তাদের আদি পুরুষকে) সৃষ্টি করেছেন খাঁটি অগ্নি থেকে (যাতে ধূম্র ছিল না। অতঃপর প্রজননের মাধ্যমে উভয় জাতি বংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালন-কর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। (দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের অর্থ সূর্য ও চন্দ্রের দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল। দিবা-রাত্রির শুরু ও শেষের উপকারিতা এর সাথে

সম্পৃক্ত। কাজেই এটাও একটা অবদান। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (আরেক অবদান এই যে) তিনি দুই দরিয়াকে (দৃশ্যত) মিলিত করেছেন, ফলে (বাহ্যত) সংযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়, কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক (প্রাকৃতিক) অন্তরাল, যা তারা (অর্থাৎ উভয় দরিয়া) অতিক্রম করতে পারে না। (লবণাক্ত পানি ও মিষ্ট পানির উপকারিতা অজানা নয়। দুই দরিয়া সংযুক্ত হওয়ার মধ্যে প্রমাণগত অবদানও আছে)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (দুই দরিয়া সম্পর্কিত এক অবদান এই যে) উভয় দরিয়া থেকে মোতি ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। (এগুলোর উপকারিতা ও অবদান হওয়া বর্ণনা সাপেক্ষ নয়)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (আরেক অবদান এই যে) তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন (ও মালিকানাধীন) সেই জাহাজসমূহ যেগুলো সমুদ্রে পর্বত সদৃশ ভাসমান (দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলোর উপকারিতাও দিবালোকের মত সুস্পষ্ট)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আর-রহমান মক্কায় অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কুরতুবী কতিপয় হাদীসের ভিত্তিতে মক্কায় অবতীর্ণ হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিরমিযীতে হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন লোকের সামনে সমগ্র সূরা আর-রহমান তিলাওয়াত করেন। তাঁরা শুনে নিশ্চুপ থাকলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ আমি 'লায়লাতুল জিনে' (জিন-রজনীতে) জিনদের সামনে এই সূরা তিলাওয়াত করেছিলাম। প্রভাবান্বিত হওয়ার দিক দিয়ে তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম ছিল। কারণ, আমি যখনই সূরার فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا আয়াতটি তিলাওয়াত করতাম, তখনই তারা সমস্বরে বলে উঠত : ربنا لا نكذب بشيء من نعمك فلك الحمد অর্থাৎ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার কোন অবদানকেই অস্বীকার করব না। আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। কেননা, 'জিন-রজনীর' ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল। এই রজনীতে রসূলুল্লাহ্ (সা) জিনদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছিলেন।

কুরতুবী এ ধরনের আরও কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সব হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরাটিকে 'রহমান' শব্দ দ্বারা শুরু করার তাৎপর্য এই যে, মক্কার কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার এই নাম সম্পর্কে অবগত ছিল না। তাই মুসলমানদের মুখে 'রহমান' নাম শুনে

তারা বলাবলি করত : وَمَا الرَّحْمٰنُ রহমান আবার কি? তাদেরকে অবহিত করার জন্য এখানে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পরের আয়াতে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই 'রহমান' শব্দটি ব্যবহার করে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কার্যকরী কারণ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও করুণা। নতুবা তাঁর দায়িত্বে কোন কাজ ওয়াজিব বা জরুরী নয় এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

এরপর সমগ্র সূরায় আল্লাহ্ তা'আলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবদানসমূহের অব্যাহত বর্ণনা রয়েছে। عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ বলে সর্ববৃহৎ অবদান দ্বারা শুরু করা হয়েছে। কোরআন সর্ববৃহৎ অবদান। কেননা, এতে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার কল্যাণ রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম কোরআনকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে পরকালীন উচ্চ মর্যাদা ও নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং দুনিয়াতেও এমন উচ্চ আসন দান করেছেন, যা রাজা-বাদশাহ্‌রাও হাসিল করতে পারে না।

ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী عَلَّمَ ক্রিয়াপদের দুটি কর্ম থাকে—এক. যা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং দুই. যাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। আয়াতে প্রথম কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ কোরআন। কিন্তু দ্বিতীয় কর্ম অর্থাৎ কাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা) উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র সৃষ্ট জীব এতে দাখিল রয়েছে। এরূপও হতে পারে যে, কোরআন নাযিল করার লক্ষ্য সমগ্র সৃষ্ট জগতকে পথপ্রদর্শন করা ও তাদেরকে নৈতিক চরিত্র ও সৎ কর্ম শিক্ষা দেওয়া। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যই আয়াতে বিশেষ কোন কর্ম উল্লেখ করা হয়নি।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ—মানব সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় অবদান। স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে এটাই সর্বাগ্রে। কোরআন শিক্ষা দেওয়ার অবদানটি মানব সৃষ্টির পরেই হতে পারে। কিন্তু কোরআন পাক এই অবদান অগ্রে এবং মানব সৃষ্টি পরে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই হচ্ছে কোরআন শিক্ষা এবং কোরআন নির্দেশিত পথে চলা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে শুধু আমার ইবাদত করার জন্য করেছি। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র শিক্ষা ব্যতীত ইবাদত হতে পারে না।

কোরআন এই শিক্ষার উপায়। অতএব এই দিক দিয়ে কোরআন শিক্ষা মানব সৃষ্টির অগ্রে স্থান লাভ করেছে।

মানব সৃষ্টির পর অসংখ্য অবদান মানবকে দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের ক্রমবিকাশ, অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সাথে যেসব অবদান সম্পর্কযুক্ত ; যেমন পানাহার, শীত ও গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ, বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে মানব ও জন্তু-জানোয়ার নির্বিশেষে প্রাণীমাত্রই অংশীদার। কিন্তু যেসব অবদান বিশেষভাবে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে প্রথমে কোরআন শিক্ষা ও পরে বর্ণনা শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া বর্ণনাশক্তির উপরই নির্ভরশীল।

এখানে বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা, লেখা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বর্ণনা এবং অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা ও বাকপদ্ধতি সবই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ এবং এটা কার্যত عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا আয়াতের তফসীরও।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ —আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াতে নভোমণ্ডলীয় অবদানসমূহের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সূর্য ও চন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, বিশ্ব-জগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এই দু'টি গ্রহের গতি ও কিরণ-রশ্মির সাথে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে।

حُسْبَانٌ শব্দটি কারও কারও মতে ধাতু। এর অর্থ হিসাব। কেউ কেউ বলেন যে, এটা حساب শব্দের বহুবচন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন এবং মাস ও বছর নির্ধারিত হয়। حُسْبَانٌ শব্দটিকে حساب-এর বহুবচন ধরা হলে অর্থ এই হবে যে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমণের আলাদা আলাদা হিসাব আছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবের উপর সৌর ও চান্দ্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লাখো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয়নি।

বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ বলা হয়। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর নব নব আবিষ্কার প্রত্যেকটি বুদ্ধিমান মানুষকে হতবুদ্ধি করে রেখেছে। কিন্তু মানবাবিষ্কৃত বস্তু ও আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রত্যেকেরই চোখে পড়ে। মানবাবিষ্কৃত বস্তুর মধ্যে ভাঙ্গাগড়া এক অপরিহার্য বিষয়। মেশিন যতই মজবুত ও শক্ত হোক না কেন কিছু-দিন পর তা মেরামত করা, কমপক্ষে কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা জরুরী হয়ে পড়ে।

মেরামত ও পরিচ্ছন্নকরণের সময়ে মেশিনটি অকেজো থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার প্রবর্তিত এই বিশালকায় গ্রহগুলো কোন সময় মেরামতের মুখাপেক্ষী হয় না এবং এদের অব্যাহত গতিধারায় কোন পার্থক্যও হয় না।

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ —কাণ্ডবিহীন লতানো গাছকে نَجْم এবং কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষকে شَجَر বলা হয়। অর্থাৎ সর্বপ্রকার লতাপাতা ও বৃক্ষ আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সিজদা করে। সিজদা চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের লক্ষণ। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বৃক্ষ, লতাপাতা, ফল ও ফুলকে যে যে বিশেষ কাজ ও মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা অনবরত সেই কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। এই সৃষ্টিজগত ও বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে 'সিজদা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।—(রূহুল-মা'আনী, মাযহারী)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ —رفع ও وضع দুটি বিপরীত শব্দ رفع শব্দের অর্থ সমুন্নত করা এবং وضع শব্দের অর্থ নীচে রাখা। আয়াতে প্রথমে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলা হয়েছে। স্থানগত উচ্চতা ও মর্যাদাগত উচ্চতা উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আকাশের মর্যাদা পৃথিবীর তুলনায় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী আকাশের বিপরীত গণ্য হয়। সমগ্র কোরআনে এই বৈপরীত্য সহকারেই আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলার পর মীযান স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে, যা আকাশের বিপরীতে আসে না। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এখানেও প্রকৃতপক্ষে আকাশের বিপরীতে পৃথিবীকে আনা হয়েছে। তিন আয়াতের পর বলা হয়েছে وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ কাজেই আসলে আকাশ ও পৃথিবীর বৈপরীত্যই ফুটানো হয়েছে। কিন্তু বিশেষ রহস্যের কারণে উভয়ের মাঝখানে তৃতীয় একটি বিষয় অর্থাৎ মীযান স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। মনে হয় এতে রহস্য এই যে, মীযান স্থাপন এবং পরবর্তী তিন আয়াতে বর্ণিত মীযানকে যথাযথ ব্যবহার করার নির্দেশ, এতদুভয়ের সারমর্ম হচ্ছে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আত্মসাৎ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা। এখানে আকাশকে সমুন্নতকরণ ও পৃথিবী স্থাপনের মাঝখানে মীযানের কথা উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যও ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে শান্তিও ন্যায় এবং ইনসাফের মাধ্যমেই কায়েম থাকতে পারে। নতুবা অনর্থই অনর্থ হবে।

হযরত কাতাদাহ্, মুজাহিদ, সুদ্দী প্রমুখ 'মীযান' শব্দের তফসীর করেছেন ন্যায়-বিচার। কেননা, মীযান তথা দাঁড়িপাল্লার আসল লক্ষ্য ন্যায়বিচারই। তবে মীযানের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে দাঁড়িপাল্লা। কোন কোন তফসীরবিদ মীযানকে এই অর্থেই নিয়েছেন। এর সারমর্মও পারস্পরিক লেনদেনে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা। এখানে মীযানের

অর্থে এমন যন্ত্র দাখিল আছে, যদ্দারা কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়; তা দুই পাল্লা-বিশিষ্ট হোক কিংবা কোন আধুনিক পরিমাপযন্ত্র হোক।

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ —এই আয়াতে দাঁড়িপাল্লা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা ওজনে কমবেশী করে জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত না হও।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ —অর্থাৎ ইনসাফ সহকারে ন্যায্য ওজন কায়েম কর।

قسط-এর শাব্দিক অর্থ ইনসাফ।

اَقِيْمُوا الْوَزْنَ—وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ বাক্যে যে বিষয়টি ধনাত্মক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে, এই বাক্যে তাই ঋণাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ওজনে কম দেওয়া হারাম।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক প্রাণীকে اَنام বলা হয়।—(কামুস)

বায়যাভী বলেনঃ যার আত্মা আছে, সেই —আয়াতে انام বলে বাহ্যত মানব ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, যাদের আত্মা আছে, তাদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীই শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত। এই সূরায় فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا বলে তাদেরকে বারবার সম্বোধনও করা হয়েছে।

فَاكِهَةٌ—فِيْهَا فَاكِهَةٌ এমন ফলমূলকে বলা হয়, যা আহারের পর স্বভাবত মুখের স্বাদ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়।

وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ—اكمام শব্দটি كم-এর বহুবচন। এর অর্থ সেই বহিরাবরণ, যা খর্জুর ইত্যাদি ফলগুচ্ছের উপরে থাকে।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ—حب-এর অর্থ শস্য; যেমন গম, বুট, ধান, মাষ, মসুর ইত্যাদি। عصف সেই খোসাকে বলে, যার ভেতরে আল্লাহ্র কুদরতে মোড়কবিশিষ্ট অবস্থায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা হয়। এই খোসার আবরণে মোড়কবিশিষ্ট হওয়ার

৩১—

কারণে শস্যের দানা দূষিত আবহাওয়া ও পোকা-মাকড় ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শস্যের দানার সাথে 'খোসাবিশিষ্ট' কথাটি যোগ করে বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, তোমরা যে রুটি, ডাল ইত্যাদি প্রত্যহ কয়েকবার আহার কর, এর এক একটি দানাকে সৃষ্টিকর্তা কিরূপ সুকৌশলে মৃত্তিকা ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এরপর কিভাবে একে কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য আবরণ দ্বারা আবৃত করেছেন। এত কিছুর পরই সেই দানা তোমাদের মুখের গ্রাসে পরিণত হয়েছে। এর সাথে সম্ভবত আরও একটি অবদানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই খোসা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর খোরাক হয়, যাদের দুধ তোমরা পান কর এবং যাদেরকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত কর।

وَالرَّيْحَانُ—এর প্রসিদ্ধ অর্থ সুগন্ধি। ইবনে যায়েদ (র) আয়াতের এই অর্থই বুঝিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ থেকে নানা রকমের সুগন্ধি এবং সুগন্ধযুক্ত ফুল সৃষ্টি করেছেন। ريحان শব্দটি কোন কোন সময় নির্যাস ও রিযিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বলা হয় خرجت اطلب ريحان الله অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র রিযিক অন্বেষণে বের হলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আয়াতে ريحان এর এ তফসীরই করেছেন।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ। آلاء শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ অবদান। আয়াতে জিন ও মানবকে সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আর-রহমানের একাধিক আয়াতে জিনদের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায়।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ—এখানে انسان বলে সরাসরি মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট আদম (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। صلصال-এর অর্থ পানি মিশ্রিত শুষ্ক মাটি। فخار-এর অর্থ পোড়ামাটি। অর্থাৎ মানুষকে পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ—جان-এর অর্থ জিন জাতি। مارج-এর অর্থ অগ্নিশিখা। জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান মৃত্তিকা।

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ—শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচল পরিবর্তিত হয়। শীতকালে مشرق অর্থাৎ উদয়াচল এবং مغرب অর্থাৎ অস্তাচল

ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হয়। আয়াতে সম্বৎসরের এই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলকে مغربين ও مشرقين বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

مرج البحرين—مرج এর আভিধানিক অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত ছেড়ে দেওয়া بحرين বলে মিঠা ও লোনা দুই দরিয়া বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়ে যায়, যার নযীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে-নীচেও প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ্ তা'আলার এই অপার শক্তি প্রকাশ করার জন্যই বলা হয়েছে :

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان —অর্থাৎ উভয় দরিয়া পরস্পরে মিলিত হয়, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে আল্লাহ্র কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা দূর পর্যন্ত তাদেরকে মিশ্রিত হতে দেয় না।

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان—لؤلؤ শব্দের অর্থ মোতি এবং مرجان এর অর্থ প্রবাল। এটাও মূল্যবান মণিমুক্তা। এতে বৃক্ষের ন্যায় শাখা হয়। এই মোতি ও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয়। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, মোতি ও মণিমুক্তা লোনা সমুদ্র থেকে বের হয়—মিঠা সমুদ্র নয়। আয়াতে উভয় প্রকার সমুদ্র থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর জওয়াব এই যে, মোতি উভয় প্রকার সমুদ্রেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু মিঠা পানির সমুদ্র প্রবহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজসাধ্য নয়। মিঠা পানির সমুদ্র প্রবাহিত হয়ে লোনা সমুদ্রে পতিত হয় এবং সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়। এ কারণেই লোনা সমুদ্রকে মোতির উৎস বলা হয়ে থাকে।

وله الجوار المنشئات فى البحر كالاعلام—جوار শব্দটি جارية এর বহুবচন। এর এক অর্থ নৌকা, জাহাজ। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। منشئات শব্দটি نشأ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ভেসে উঠা, উঁচু হওয়া অর্থে এখানে নৌকার পাল বোঝানো হয়েছে, যা পতাকার ন্যায় উঁচু হয়। আয়াতে নৌকার নির্মাণ-কৌশল ও পানির উপর বিচরণ করার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِ

كِرَامِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝
سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ يٰمَعْشَرَ
الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۚ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ
فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ
فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ۝ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ ۝
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا
الْمُجْرِمُوْنَ ۝ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(২৬) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। (২৭) একমাত্র আপনার মহিমময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া। (২৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন-কর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি সর্বদাই কোন-না-কোন কাজে রত আছেন। (৩০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩১) হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্য কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (৩২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (৩৪) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার

করবে? (৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। (৩৬) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩৭) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন হয়ে যাবে রক্তিমাভ, লাল চামড়ার ন্যায়। (৩৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩৯) সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, না জিন। (৪০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে; অতএব তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেওয়া হবে। (৪২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলত। (৪৪) তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। (৪৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ পর্যন্ত যেসব অবদানের কথা তোমরা শুনলে, তোমাদের উচিত তওহীদ ও ইবাদতের মাধ্যমে এগুলোর কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং কুফর ও গোনাহের মাধ্যমে অকৃ-তজ্ঞতা না করা। কেননা, এ জগত ধ্বংস হওয়ার পর আরেকটি জগৎ আসবে। সেখানে ঈমান ও কুফরের কারণে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে তাই বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই (অর্থাৎ জিন ও মানব) ধ্বংস হয়ে যাবে এবং (একমাত্র) আপনার পালনকর্তার মহিমময় ও মহানুভব সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। (উদ্দেশ্য জিন ও মানবকে হুঁশিয়ার করা। তারা ভূপৃষ্ঠে বসবাস করে। তাই বিশেষভাবে ভূপৃষ্ঠের সবকিছু ধ্বংস হবে বলা হয়েছে। এতে জরুরী হয় না যে, অন্য কোন বস্তু ধ্বংস হবে না। এখানে আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। মহিমময় ও মহানুভব। প্রথমটি সত্তাগত ও দ্বিতীয়টি আপেক্ষিক। এর সারমর্ম এই যে, অনেক মহি-মান্বিত ব্যক্তি অপরের অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার মহামহিম হওয়া সত্ত্বেও বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেন। পৃথিবী ধ্বংস হওয়া ও এরপর প্রতিদান ও শাস্তিদানের সংবাদ দেওয়া মানুষকে ঈমানরূপ ধন দান করার নামান্তর। তাই এটা একটা বড় অবদান। সেমতে বলা হয়েছে ঃ) অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার। (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (তিনি এমন মহিমময় যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁরই কাছে (নিজ নিজ প্রয়োজন) প্রার্থনা করে। (ভূমণ্ডলে বসবাসকারীদের প্রয়োজন বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। নভোমণ্ডলে বসবাসকারীরা পানাহার না করলেও দয়া ও অনুকম্পার মুখাপেক্ষী। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার মহানুভবতা প্রকারান্তরে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তিনি সর্বদাই, কোন-না-কোন কাজে রত থাকেন। (এর অর্থ এরূপ নয় যে, কাজ করা তাঁর সত্তার জন্য অপরিহার্য। বরং অর্থ এই যে, বিশ্বচরাচরে যত কাজ হচ্ছে, সবই তাঁরই কাজ। তাঁর অনুগ্রহ এবং অনুকম্পাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মহিমময় হওয়া সত্ত্বেও এরূপ অনুগ্রহ

ও অনুকম্পা করাও একটি মহান অবদান)। অতএব হে মানব ও জিন! তোমরা তোমাদের পালন-কর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (অতঃপর আবার পৃথিবী ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তোমরা মনে করো না যে, ধ্বংসের পর শাস্তি ও প্রতিদান হবে না; বরং আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করব এবং শাস্তি ও প্রতিদান দেব। বলা হচ্ছে ঃ) হে মানব ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের (হিসাব-নিকাশের) জন্য কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (অর্থাৎ হিসাব কিতাব নেব। রূপক ও আতিশয্যের অর্থে একেই কর্মমুক্ত হওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আতিশয্য এভাবে বোঝা যায় যে, মানুষ সব কাজ থেকে মুক্ত হয়ে কোন কাজে হাত দিলে একে পূর্ণ মনোনিবেশ বলে গণ্য করা হয়। মানুষের বুঝবার জন্য একথা বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার শান এই যে, তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্য বাঁধা হয়ে যায় না। তিনি যে কাজে মনোনিবেশ করেন পূর্ণরূপেই মনোনিবেশ করেন। আল্লাহ্র কাজে অসম্পূর্ণ মনোনিবেশের সম্ভাবনা নেই। এই হিসাব নিকাশের সংবাদ দেওয়াও একটি মহান অবদান। তাই বলা হচ্ছে ঃ) হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (হিসাব-নিকাশের সময় কারও পলায়ন করারও সম্ভাবনা নেই। তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ) হে জিন ও মানবকুল! নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমা অতিক্রম করে বাইরে চলে যাওয়া যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে (আমিও দেখি,) তোমরা চলে যাও, (কিন্তু) শক্তি ব্যতীত তোমরা চলে যেতে পারবে না। (শক্তি তোমাদের নেই। কাজেই চলে যাওয়াও সম্ভবপর নয়। কিয়ামতেও তদ্রূপ হবে। বরং সেখানে অক্ষমতা আরও বেশী হবে। মোটকথা, পলায়ন করার সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়টি বলে দেওয়াও হিদায়তের কারণ এবং একটি মহান অবদান।) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (উপরে যেমন হিসাব-নিকাশের সময় তাদের অক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি অতঃপর আযাবের সময় তাদের অক্ষমতা উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ হে জিন ও মানব অপরাধীরা!) তোমাদের প্রতি (কিয়ামতের দিন) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং ধূম্রকুঞ্জ ছাড়া হবে। অতঃপর তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না। একথা বলাও হিদায়তের উপায় হওয়ার কারণে একটি মহান অবদান)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (যখন হিসাব-নিকাশ নেওয়া ও এতদসঙ্গে তোমাদের অক্ষমতার কথা জানা গেল, তখন কিয়ামতের দিন প্রতিদান ও শাস্তির বাস্তবতা প্রমাণিত হয়ে গেল। সুতরাং) যখন (কিয়ামত আসবে এবং) আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন হয়ে যাবে রক্তিমাভ, লাল চামড়ার মত। (ক্রোধের সময় চেহারা রক্তিমাভ হয়ে যায়। ক্রোধের আলামত হিসাবেই সম্ভবত এই রং হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি মহান অবদান)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? অতঃপর বলা হচ্ছে যে, অপরাধী ও অপরাধের পরিচয় আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে, কিন্তু ফেরেশতারা অপরাধীদেরকে কিভাবে চিনবে? এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে। (কারণ তাদের

চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষু নীলাভ হবে। যেমন অন্য আয়াতে আছে تَسْوَدُّ وُجُوهٌ এবং نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا অতঃপর তাদের কেশাগ্র ও পা ধরে টেনে নেওয়া হবে। এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অর্থাৎ আমল অনুযায়ী কারও কেশাগ্র এবং কারও পা ধরা হবে অথবা কখনও কেশাগ্র এবং কখনও পা ধরা হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি অবদান)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? এটাই সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলতো। তারা জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। (অর্থাৎ কখনও অগ্নির আযাব এবং কখনও ফুটন্ত পানির আযাব হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি অবদান) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ-

এর অর্থ এই যে, ভূপৃষ্ঠে যত জিন ও মানব আছে, তারা সবাই ধ্বংসশীল। এই সূরায় জিন ও মানবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, আকাশ ও আকাশস্থিত সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসশীল নয়। কেননা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টিও ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

وَجْهُ رَبِّكَ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে وَجْهُ বলে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা এবং শব্দের رَبِّكَ সম্বোধন সর্বনাম দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বোঝানো হয়েছে। এটা সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি বিশেষ সম্মান। প্রশংসার স্থলে কোথাও তাঁকে عَبْدَهُ এবং কোথাও رَبِّكَ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, জিন ও মানবসহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। অক্ষয় হয়ে থাকবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা।

ধ্বংসশীল হওয়ার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এসব বস্তু এখনও সত্তাগতভাবে ধ্বংসশীল। এগুলোর মধ্যে চিরস্থায়ী হওয়ার যোগ্যতাই নেই। আরেক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

কোন তফসীরবিদ وَجْهُ رَبِّكَ —এর তফসীর এরূপ করেছেন যে, সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে একমাত্র সেই বস্তুই স্থায়ী, যা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আছে। এতে শামিল আছে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা এবং মানুষের সেসব কর্ম ও অবস্থা, যা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সারমর্ম এই যে, মানব জিন ও ফেরেশতা যে কাজ আল্লাহ্র জন্য করে, সেই কাজও চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোন সময় ধ্বংস হবে না। —(মাযহারী, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ —অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা কিছু অর্থ-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, সুখ-কষ্ট অথবা ভালবাসা ও শত্রুতা আছে, সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কাছে যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, সেগুলো ধ্বংস হবে না।

ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ —অর্থাৎ সেই পালনকর্তা মহিমামণ্ডিত এবং মহানুভবও। মহানুভব হওয়ার এক অর্থ এই যে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান বলতে যা কিছু আছে, এ সবেরই যোগ্য একমাত্র তিনিই। আরেক অর্থ এই যে, তিনি মহিমময় হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মত নন যে, অন্যের বিশেষত দরিদ্রের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না; বরং তিনি অকল্পনীয় সম্মান ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবেরও সম্মান বর্ধন করেন। তাদেরকে অস্তিত্ব দানের পর নানাবিধ অবদান দ্বারা ভূষিত করেন এবং তাদের প্রার্থনা ও দোয়া শুনেন। পরবর্তী আয়াতে এই দ্বিতীয় অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ —বাক্যটি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। এই শব্দগুলো উল্লেখ করে যে দোয়াই করা হয়, কবুল হয়। তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ الظوا بيا ذا الجلال والاكرام —অর্থাৎ তোমরা "ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" বলে দোয়া করো। (কারণ, এটা কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক)।—মাযহারী

يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ —অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং তার কাছেই প্রয়োজনাদি যাচ্ঞা করেন। পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের রিযিক, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুখ-শান্তি, পরকালে ক্ষমা, রহমত ও জান্নাত প্রার্থনা করে এবং আকাশের অধিবাসীরা যদিও পানাহার করে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার তারাও মুখাপেক্ষী। كُلَّ يَوْمٍ

শব্দটি يسئل বাক্যের ظرف—অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের এই যাচ্ঞা ও প্রার্থনা প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। এর সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্ট বস্তু বিভিন্ন ভূখণ্ডে ও বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কাছে নিজেদের অভাব-অনটন সর্বক্ষণ পেশ করতে থাকে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীস্থ ও আকাশস্থ সমগ্র সৃষ্ট জীব ও তাদের প্রত্যেকের অসংখ্য অভাব-অনটন আছে। তাও আবার প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি পলে পেশ করা হচ্ছে। এগুলো এই মহিমময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে শুনতে পারে এবং পূর্ণ করতে পারে? তাই كُلَّ يَوْمٍ এর সাথে هُوَ فِى شَأْنٍ ও বলা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বদা ও সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ শান ও অবস্থা থাকে। তিনি কাউকে জীবনদান করেন, কারও মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন। কাউকে লাঞ্ছিত করেন কোন সুস্থকে অসুস্থ, কোন অসুস্থকে সুস্থ করেন। কোন বিপদগ্রস্তকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন, কোন ব্যথিত ও ক্রন্দনকারীর মুখে হাসি ফুটান, কোন প্রার্থনাকারীকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন। কারও পাপ মার্জনা করে তাকে জান্নাতের যোগ্য করে দেন। কোন জাতিকে সমুন্নত ও ক্ষমতায় আসীন করে দেন এবং কোন জাতিকে অধঃপতিত ও লাঞ্ছিত করে দেন। মোটকথা, প্রতিমুহূর্তে, প্রতি পলে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ শান থাকে।

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ—ثقلان শব্দটি ثقل এর দ্বি-বচন। যে বস্তুর ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত, আরবী ভাষায় তাকে ثقل বলা হয়। এখানে মানব ও জিন জাতিদ্বয় বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: انى تارك فيكم الثقلين অর্থাৎ আমি দুটি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্হ বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি। এগুলো তোমাদের জন্য সৎপথের দিশারী হয়ে থাকবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে كتاب الله وعترتى বলে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে كتاب الله وسنتى বলে উল্লিখিত বিষয় দুটি বর্ণিত হচ্ছে। উভয়ের সারমর্ম এক। কেননা, عترتى বলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশগত ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সন্তান-সন্ততি বোঝানো হয়েছে। কাজেই সাহাবায়ে কিরামও এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর দুটি বিষয় মুসলমানদের হিদায়াত ও সংশোধনের উপায় হবে—একটি আল্লাহ্র কিতাব কোরআন ও অপরটি সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের কর্মপদ্ধতি। যে হাদীসে 'সুন্নত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার সারমর্ম হচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এর শিক্ষা, যা সাহাবায়ে-কিরামের মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে পৌঁছেছে।

মোটকথা, এই হাদীসে ثقلين বলে দুটি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্হ বিষয় বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এই অর্থের দিকে দিয়েই ثقلان

বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে যত প্রাণী বসবাস করে, তাদের মধ্যে জিন ও মানব সর্বাধিক ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্হ। سنفرغ শব্দটি فراغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কর্মমুক্ত হওয়া। অভিধানে فراغ বিপরীত শব্দ হচ্ছে شغل অর্থাৎ কর্মব্যস্ততা فراغ শব্দ থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়—এক. পূর্বে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা এবং দুই. এখন সেই কাজ সমাপ্ত করে কর্মমুক্ত হওয়া। উভয় বিষয় সৃষ্ট জীবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। মানুষ কোন সময় এক কাজে ব্যস্ত থাকে এরপর তা থেকে মুক্ত হয়ে অবসর লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উভয় বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্য বাধা হয় না এবং তিনি মানুষের ন্যায় কাজ থেকে অবসর লাভ করেন না।

তাই আয়াতে سَنَفْرُغُ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী একথা বলা হয়েছে। কোন কাজের গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য বলা হয়ঃ আমি এই কাজের জন্য অবসর লাভ করেছি; অর্থাৎ এখন এ কাজেই পুরাপুরি মনোনিবেশ করব। কোন কাজে পূর্ণ মনোযোগ ব্যয় করাকে বাক পদ্ধতিতে এভাবে প্রকাশ করা হয়ঃ তার তো এছাড়া কোন কাজ নেই।

এর আগের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীব আল্লাহ্র কাছে তাদের অভাব-অনটন পেশ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করার ব্যাপারে সর্বদাই এক বিশেষ শানে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আবেদন ও আবেদন মঞ্জুর করা সম্পর্কিত সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন কাজ কেবল একটি থাকবে এবং শানও একটি হবে; অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও ইনসাফ সহকারে ফয়সালা প্রদান।—(রূহুল মা'আনী)

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ -

পূর্ববর্তী আয়াতে জিন ও মানবকে ثَقَلَيْن শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, কিয়ামতের দিন একটিই কাজ হবে; অর্থাৎ সকল জিন ও মানবের কাজকর্ম পরীক্ষা হবে এবং প্রতিটি কাজের প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, প্রতিদান দিবসের উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যুর কবল থেকে অথবা কিয়ামতের হিসাব থেকে গা বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই। এই আয়াতে ثَقَلَيْن এর পরিবর্তে জিন ও মানবের প্রকাশ্য নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং জিনকে অগ্রে রাখা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে হলে বিরাট শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের কাজের শক্তি মানুষের চাইতে বেশী দিয়েছেন। তাই জিনকে অগ্রে

উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ হে জিন ও মানবকুল, তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে মালাকুল-মওতের কবল থেকে গা বাঁচিয়ে যাবে অথবা হাশরের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে এস, শক্তি পরীক্ষা করে দেখ। যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তবে অতিক্রম করে দেখাও। এটা সহজ কাজ নয়। এর জন্য অসাধারণ শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন ও মানব কারও এরূপ শক্তি নেই। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে তাদের অক্ষমতা ব্যক্ত করা লক্ষ্য।

আয়াতে যদি মৃত্যু থেকে পলায়ন বোঝানো হয়ে থাকে, তবে এই দুনিয়াই এর দৃষ্টান্ত। এখানে ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশ পর্যন্ত সীমা ডিঙ্গিয়ে বাইরে চলে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। এসব সীমা ডিঙানোর উল্লেখও মানুষের ধারণা অনুযায়ী করা হয়েছে। নতুবা যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কেউ আকাশের সীমানা ডিঙ্গিয়ে বাইরে চলে গেল, তবে তাও আল্লাহ্র কুদরতের সীমানার বাইরে হবে না। পক্ষান্তরে যদি আয়াতে একথা বোঝানো হয়ে থাকে যে, হাশরের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহি থেকে পলায়ন অসম্ভব, তবে এর কার্যত উপায় কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কিয়ামতের দিনে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে সব ফেরেশতা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এসে যাবে এবং মানব ও ও জিনকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে নেবে। কিয়ামতের ভয়াবহ কাণ্ড দেখে মানব ও জিন বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করবে। অতঃপর চতুর্দিকে ফেরেশতাদের অবরোধ দেখে তারা স্বস্থানে ফিরে আসবে।—(রূহুল মা'আনী)

কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেটের সাহায্যে মহাশূন্য যাত্রার কোন সম্পর্ক এই আয়াতের সাথে নেই ঃ বর্তমান যুগে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমানা অতিক্রম করার এবং রকেটে চড়ে মহাশূন্যে পৌঁছার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এসব পরীক্ষা আকাশের সীমানার বাইরে নয়; বরং আকাশের ছাদের অনেক নীচে হচ্ছে। এর সাথে আকাশের সীমানা অতিক্রম করার কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞানীরা তো আকাশের সীমানার কাছেও পৌঁছতে পারে না—বাইরে যাওয়া দূরের কথা। কোন কোন সরলপ্রাণ মানুষ মহাশূন্য যাত্রার সম্ভাব্যতা ও বৈধতার পক্ষে এই আয়াতকেই পেশ করতে থাকে—এটা কোরআন সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ —হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ ধূম্রবিহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে شُوَاظ এবং অগ্নিবিহীন ধূম্রকুঞ্জকে نُحَاس বলা হয়। এই আয়াতেও জিন ও মানবকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ ছাড়ার কথা বর্ণনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামে অপরাধীদেরকে দুই প্রকার আযাব দেওয়া হবে। কোথাও ধূম্রবিহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে এবং কোথাও অগ্নিবিহীন ধূম্রকুঞ্জ হবে। কোন কোন

তফসীরবিদ এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিষ্ট ধরে নিয়ে এরূপ অর্থ করেছেন যে, হে জিন ও মানব! আকাশের সীমানা অতিক্রম করার সাধ্য তোমাদের নেই। তোমরা যদি এরূপ করতেও চাও, তাবে যেদিকেই পালাতে চাইবে, সেদিকেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে।—(ইবনে কাসীর)

فَلَا تَنْتَصِرَانِ—এটা انصار থেকে উদ্ভূত। অর্থ কাউকে সাহায্য করে বিপদ থেকে উদ্ধার করা। অর্থাৎ আল্লাহ্র আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য জিন ও মানবের মধ্য থেকে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ—অর্থাৎ সেদিন কোন মানব অথবা জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে কিয়ামতে এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ করেছ কি না? এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদি জ্ঞানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বরং প্রশ্ন এই হবে যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ কেন করলে? হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই তফসীর করেছেন। মুজাহিদ বলেন: অপরাধীদের শাস্তিদানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, তোমরা এই গোনাহ্ করেছ কিনা? এর প্রয়োজনই হবে না। কেননা, প্রত্যেক গোনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন অপরাধীদের চেহারায় ফুটে উঠবে। ফেরেশতাগণ এই চিহ্ন দেখে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেবে। পরবর্তী يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ আয়াতে এই বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে। উপরোক্ত উভয় তফসীরের সারমর্ম এই যে, হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ফয়সালার পর এই ঘটনা ঘটবে। সুতরাং তখন তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে কোন আলোচনা হবে না। তারা আলামত দ্বারা চিহ্নিত হয়েই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন: এটা তখনকার অবস্থা যখন একবার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে যাবে এবং অপরাধীরা অস্বীকার করবে ও কসম খাবে। তখন তাদের মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই তিনটি তফসীর কাছাকাছি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ—سيما শব্দের অর্থ আলামত চিহ্ন। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন: সেদিন অপরাধীদের আলামত হবে এই যে, তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষু নীলাভ হবে। দুঃখ ও কষ্টের কারণে চেহারা বিষণ্ণ হবে। এই আলামতের সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করবে।

نواصى শব্দটি ناصية এর বহুবচন। অর্থ কপালের চুল। কেশাগ্র ও পা ধরার এক অর্থ এই যে, কারও কেশাগ্র ধরে এবং কারও পা ধরে টানা হবে অথবা এক সময় এভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, কেশাগ্র ও পা একত্রে সাথে বেঁধে দেওয়া হবে।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ

تَجْرِيٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ

فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ

بَطَاۤىِٕنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ۗ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ ۝ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا

جَاۤنٌّ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۝

فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ هَلْ جَزَاۤءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝

فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۝

فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ مُدْهَاۤمَّتٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ ۝ فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ ۝ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاۤنٌّ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

مُتَّكِـِٔينَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

(৪৬) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। (৪৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। (৪৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫০) উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রস্রবণ। (৫১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫২) উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। (৫৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৪) তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকটে ঝুলবে। (৫৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৬) তথায় থাকবে আনতনয়না রমণিগণ, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করেনি। (৫৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৮) প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণিগণ। (৫৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬০) সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? (৬১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬২) এই দুটি ছাড়া আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। (৬৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৪) কালোমত ঘন সবুজ। (৬৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৬) তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ। (৬৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৮) তথায় আছে ফল-মূল, খর্জুর ও আনার। (৬৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণিগণ। (৭১) অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭২) তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। (৭৩) অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৪) কোন জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি। (৭৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। (৭৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৮) কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমময় ও মহানুভব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলোচ্য আয়াতসমূহে وَلِمَنْ خَافَ থেকে দুটি উদ্যানের এবং وَمِنْ دُونِهِمَا থেকে দুটি উদ্যানের উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয় বিশেষ নৈকট্যশীলদের জন্য এবং শেষোক্ত উদ্যানদ্বয় সাধারণ মু'মিনদের জন্য। এর প্রমাণ পরে বর্ণিত হবে। এখানে শুধু তফসীর লেখা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছিল। এখান থেকে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদের প্রতিদান বর্ণনা করা হচ্ছে। জান্নাতীগণ দুই ভাগে বিভক্ত-বিশেষ শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণী। অতএব) যে, ব্যক্তি (বিশেষ শ্রেণীর এবং) তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার (সর্বদা) ভয় রাখে। (এবং ভয় রেখে কুপ্রবৃত্তি ও পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, এটা বিশেষ শ্রেণীরই অবস্থা। কারণ সাধারণ শ্রেণী মাঝে মাঝে ভয় রাখে এবং মাঝে মাঝে পাপকর্মও করে ফেলে, যদিও তওবা করে নেয়। মোটকথা যে ব্যক্তি এরূপ আল্লাহ্‌ভীরু) তার জন্য (জান্নাতে) দুটি উদ্যান রয়েছে। (অর্থাৎ প্রতিজনের জন্য দুটি উদ্যান। এই একাধিক উদ্যান থাকার রহস্য সম্ভবত তাদের সম্মান ও বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করা, যেমন দুনিয়াতে ধনীদের কাছে অধিকাংশ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ একাধিক হয়ে থাকে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট হবে। (এতে ছায়ার ঘনত্ব ও ফল-ফুলের প্রাচুর্যের দিকে ইঙ্গিত আছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে থাকবে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফলের দুই প্রকার হবে। (এতে অধিক স্বাদ গ্রহণের সুযোগ আছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তারা তথায় রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। (নিয়ম এই যে, উপরের কাপড় আস্তরের তুলনায় উৎকৃষ্ট হয়। আস্তরই যখন রেশমের, তখন উপরের কাপড় কেমন হবে অনুমান করা যায়)। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। (ফলে দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট, শায়িত সর্বাবস্থায় অনায়াসে ফল হাতে আসবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তথায় (অর্থাৎ উদ্যানের প্রাসাদসমূহে) আনতনয়না রমণিগণ (অর্থাৎ হুরগণ) থাকবে, যাদেরকে তাদের (অর্থাৎ এই জান্নাতীদের) পূর্বে কোন জিন ও মানব ব্যবহার করেনি (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অব্যবহৃতা হবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার

করবে? (তাদের রূপলাবণ্য এত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হবে) যেন তারা প্রবাল ও পদ্মরাগ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার। (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (অতঃপর উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য বলা হচ্ছে ঃ) সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (তারা চূড়ান্ত আনুগত্য করেছে, তাই পুরস্কারও চূড়ান্ত পেয়েছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (এ হচ্ছে বিশেষ শ্রেণীর জান্নাতীদের উদ্যানের অবস্থা। এখন সাধারণ মু'মিনদের উদ্যান বর্ণিত হচ্ছে ঃ) এই দুটি উদ্যান ছাড়া নিম্ন-স্তরের আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। (প্রত্যেক সাধারণ মু'মিন দু দুটি করে পাবে। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যান ঘন সবুজ হবে। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে থাকবে উত্তাল দুই প্রস্রবণ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (উত্তাল হওয়া প্রস্রবণের স্বভাব। উপরের প্রস্রবণেরও একই অবস্থা। সেখানে অতিরিক্ত تَجْرِيَانِ বহমানও বলা হয়েছে। সুতরাং এটা ইঙ্গিত যে, এই প্রস্রবণ বহমান হওয়ার ব্যাপারে প্রথমোক্ত প্রস্রবণ-দ্বয়ের চাইতে কম এবং এই উদ্যানদ্বয় সেই উদ্যানদ্বয়ের চাইতে নিম্নস্তরের)। উভয় উদ্যানে আছে ফল-মূল খর্জুর ও আনার। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? সেখানে (অর্থাৎ সেখানকার প্রাসাদসমূহে) থাকবে সুশীলা, সুন্দরী রমণিগণ। (অর্থাৎ হুরগণ) অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তাঁবুতে সংরক্ষিতা লাবণ্যময়ী রমণিগণ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? এই জান্নাতী-দের পূর্বে কোন জিন ও মানব তাদেরকে ব্যবহার করেনি (অর্থাৎ অব্যবহৃতা হবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (সেখানে রমণিগণকে প্রবাল ও পদ্মরাগের সাথে তুলনা করা এবং এখানে শুধু حسان সুন্দরী বলা এ থেকেও বোঝা যায় যে, প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয় শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের চাইতে শ্রেষ্ঠ) তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এই উদ্যানদ্বয়ের বিছানা প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে। কেননা, সেখানে রেশমের ও আস্তরবিশিষ্ট হওয়ার কথা আছে, এখানে নেই। অতঃপর পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণিত হয়েছে। এতে সূরা

আর-রহমানে বিশদভাবে বর্ণিত বিষয়সমূহের সমর্থন ও তাকীদ আছে)। কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব। (নাম বলে গুণাবলী বোঝানো হয়েছে, যা সত্তা থেকে ভিন্ন নয়। কাজেই এই বাক্যের সারমর্ম হচ্ছে সত্তা ও গুণাবলী দ্বারা প্রশংসা)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে সৎ কর্মপরায়ণ মু'মিনদের উত্তম প্রতিদান ও অবদান বর্ণনা করা হচ্ছে। তন্মধ্যে জান্নাতীদের প্রথমোক্ত দুই উদ্যান ও তার অবদানসমূহ এবং শেষোক্ত দুই উদ্যান ও তাতে সরবরাহকৃত অবদানসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত দুই উদ্যান কাদের জন্য, একথা وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা এই দুই উদ্যানের অধিকারী হবে, যারা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ভয়ে ভীত থাকে। ফলে তারা কোন পাপকর্মের কাছেও যায় না। বলা বাহুল্য, এ ধরনের লোক বিশেষ নৈকট্যশীলগণই হতে পারে।

শেষোক্ত দুই উদ্যানের অধিকারী কারা হবে, এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু একথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই দুই উদ্যান প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে। وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এই উদ্যানদ্বয়ের অধিকারী হবে সাধারণ মু'মিনগণ, যারা মর্যাদায় নৈকট্যশীলদের চেয়ে কম।

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ আরও অনেক উক্তি করেছেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে উপরোক্ত তফসীরই অগ্রগণ্য মনে হয়। কেননা দুররে মনসূরের বরাত দিয়ে বয়ানুল কোরআনে এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ এবং وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন :

جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ لِلْمُقَرَّبِيْنَ وَجَنَّتَانِ مِنْ وَرِقٍ لِأَصْحَابِ الْيَمِيْنِ

অর্থাৎ স্বর্ণনির্মিত দুই উদ্যান নৈকট্যশীলদের জন্য এবং রৌপ্য নির্মিত দুই উদ্যান সাধারণ সৎ কর্মপরায়ণ মু'মিনদের জন্য। এছাড়া 'দুররে মনসূরে' হযরত বারা ইবনে আযেব থেকে

৩৩—

বর্ণিত আছে ঃ العينان التى تجريان خير من النضاختان অর্থাৎ প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের দুই প্রস্রবণ, যাদের সম্পর্কে تجريان তথা বহমান বলা হয়েছে, শেষোক্ত দুই উদ্যানের প্রস্রবণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে نضاختان তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা প্রস্রবণ মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রস্রবণ সম্পর্কে বহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত।

এ হচ্ছে প্রস্রবণ চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যেগুলো জান্নাতীগণ লাভ করবে। এখন আয়াতের ভাষা ও অর্থ দেখুন ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ——অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে مقام رب বলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হিসাবের জন্য উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। এই উপস্থিতির ভয় রাখার অর্থ এই যে, জনসমক্ষে ও নির্জনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় এই ধ্যান থাকা যে, আমাকে একদিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং ক্রিয়া-কর্মের হিসাব দিতে হবে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তির সদাসর্বদা এরূপ ধ্যান থাকবে, সে পাপ-কর্মের কাছে যাবে না।

কুরতুবী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ مقام رب এর এরূপ তফসীরও করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজ এবং গোপন ও প্রকাশ্য কর্ম দেখাশুনা করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর দৃষ্টির সামনে। আল্লাহ্ তা'আলার এই ধ্যানও মানুষকে পাপ কর্ম থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ——এটা প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের বিশেষণ। অর্থাৎ উদ্যান-দ্বয় ঘন শাখাপল্লব বিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, এগুলোর ছায়াও ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও বেশী হবে। পরবর্তীতে উল্লিখিত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়ের অভাব বোঝা যায়।

فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ——প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বিশেষণে مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এগুলোতে সর্বপ্রকার ফল থাকবে। এর বিপরীতে শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বর্ণনায় শুধু فَاكِهَةٌ বলা হয়েছে। زَوْجَانِ--এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফলের দুটি করে প্রকার হবে—শুষ্ক ও আর্দ্র। অথবা সাধারণ স্বাদযুক্ত ও অসাধারণ স্বাদ-যুক্ত।—(মাযহারী)

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ——طمث শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত

হয়। এর এক অর্থ হায়েযের রক্ত। যে নারীর হায়েয হয়, তাকে طامث বলা হয়। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও طمث বলা হয়। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. যেসব রমণী মানুষের জন্য নির্ধারিত, তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং যেসব রমণী জিনদের জন্য নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন জিন স্পর্শ করেনি। দুই. দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জিন ভর করে বসে, জান্নাতে এরূপ কোন আশংকা নেই।

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ—নেকট্যশীলদের উদ্যানদ্বয়ের কিছু বিবরণ পেশ করার পর ইরশাদ হয়েছে যে, সৎ কর্মের প্রতিদান উত্তম পুরস্কারই হতে পারে, এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। তারা সর্বদা সৎ কর্ম পালন করেছে, কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেও তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল, যা দেওয়া হয়েছে।

مُدْهَامَّتَانِ—ঘন সবুজের কারণে যে কাল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তাকে ادهمام বলা হয়। অর্থাৎ এই উদ্যানদ্বয়ের ঘন সবুজতা এদের কালোমত হওয়ার কারণ হবে। প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি বটে, কিন্তু ذَوَاتَا أَفْنَانٍ—বিশেষণে এই বিশেষণও শামিল আছে।

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ—خيرات—এর অর্থ চারিত্রিক দিক দিয়ে সুশীলা এবং حسان—এর অর্থ দেহাবয়বের দিক দিয়ে সুন্দরী। উভয় উদ্যানের রমণিগণ সমভাবে এই বিশেষণে বিশেষিতা হবে।

مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ—رفرف—এর অর্থ সবুজ রঙের রেশমী বস্ত্র।—(কামূস) এর দ্বারা বিছানা, বালিশ ও অন্যান্য বিলাসসামগ্রী তৈরী করা হয়। সিহাহ্ গ্রন্থে আছে, এর উপর বৃক্ষ ও ফুলের কারুকার্য করা হয়। عبقرى এর অর্থ সুশ্রী ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র।

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ—সূরা আর-রহমানে বেশীর ভাগ আল্লাহ্ তা'আলার অবদান ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে সার-সংক্ষেপ হিসাবে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা অনন্য। তাঁর নামও খুব পুণ্যময়। তাঁর নামের সাথেই এসব অবদান কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত আছে।

سورة الواقعة

সূরা ওয়াকিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৯৬, রুকু ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ (3)

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً

مُّنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً (7) فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا

أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ (9)

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ (10) أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ (11) فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ (12)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ (13) وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ (14) عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ (15)

مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ (16) يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ (17)

بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ (18) لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا

وَلَا يُنْزِفُوْنَ (19) وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا

يَشْتَهُوْنَ (21) وَحُوْرٌ عِيْنٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ (23) جَزَآءً

بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (24) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا (25) إِلَّا

قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا (26) وَأَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ (27) فِيْ

سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ (28) وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ (29) وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ (30) وَّمَآءٍ

مَّسْكُوْبٍ (31) وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ (32) لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ (33)

وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۝ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۝ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۝ عُرُبًا اَتْرَابًا ۝ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝ وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۝ فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۝ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۝ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ۝ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۝ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۝ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝ اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۝ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۝ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, (২) যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই। (৩) এটা নীচু করে দেবে, সমুন্নত করে দেবে। (৪) যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী (৫) এবং পর্বতমালা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে (৬) অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা (৭) এবং তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৮) যারা ডান দিকে, কত ভাগ্যবান তারা (৯) এবং যারা বাম দিকে, কত হতভাগা তারা। (১০) অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই (১১) তারাই নৈকট্যশীল, (১২) অবদানের উদ্যানসমূহে, (১৩) তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (১৪) এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে, (১৫) স্বর্ণখচিত সিংহাসনে (১৬) তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। (১৭) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চিরকিশোরেরা (১৮) পানপাত্র, কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, (১৯) যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। (২০) আর তাদের পছন্দমত ফল-মূল নিয়ে (২১) এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। (২২) তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ (২৩) আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায় (২৪) তারা যা

কিছু করত, তার পুরস্কারস্বরূপ। (২৫) তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না (২৬) কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম। (২৭) যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান! (২৮) তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে (২৯) এবং কাঁদি কাঁদি কলায়, (৩০) এবং দীর্ঘ ছায়ায় (৩১) এবং প্রবাহিত পানিতে, (৩২) ও প্রচুর ফল-মূলে, (৩৩) যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়, (৩৪) আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়। (৩৫) আমি জান্নাতী রমণিগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। (৩৬) অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, (৩৭) কামিনী, সমবয়স্ক (৩৮) ডান দিকের লোকদের জন্য। (৩৯) তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (৪০) এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে। (৪১) বাম পার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা! (৪২) তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে, (৪৩) এবং ধুম্রকুঞ্জের ছায়ায় (৪৪) যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। (৪৫) তারা ইতিপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল। (৪৬) তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপ-কর্মে ডুবে থাকত। (৪৭) তারা বলত : আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব? (৪৮) এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও? (৪৯) বলুন : পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, (৫০) সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। (৫১) অতঃপর হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারিগণ! (৫২) তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, (৫৩) অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে, (৫৪) অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি। (৫৫) পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। (৫৬) কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন কিয়ামত ঘটবে, যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই; (বরং তা ঘটা সম্পূর্ণ সত্য)। এটা (কতককে) নীচু করে দেবে এবং (কতককে) সমুন্নত করে দেবে। (অর্থাৎ সেদিন কাফিরদের লাঞ্ছনা এবং মু'মিনদের ইজ্জত প্রকাশ পাবে)। যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, অতঃপর তা হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা। তোমরা সবাই (যারা তখন বিদ্যমান থাকবে অথবা পূর্বে মারা গেছে, অথবা ভবিষ্যতে জন্মলাভ করবে) তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে [নৈকট্যশীল মু'মিন, সাধারণ মু'মিন ও কাফির। সূরা আর-রহমানেও এই তিন শ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী আয়াত-সমূহে নৈকট্যশীলদেরকে سابقون ও مقربون এবং সাধারণ মু'মিনকে اصحاب اليمين (ডান পার্শ্বস্থ লোক) ও কাফিরদেরকে اصحاب الشمال (বাম পার্শ্বস্থ লোক) বলা হয়েছে। আয়াত اذا وقعت থেকে ثلة পর্যন্ত কোন কোন ঘটনা প্রথম শিঙ্গা ফুঁকার সময়কার, যেমন رجت ও بست এবং কোন কোন ঘটনা

দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুঁকার সময়কার; যেমন خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ এবং كُنْتُمْ أَزْوَاجًا- অতঃপর প্রকারত্রয়ের বিধান আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে। তন্মধ্যে এক প্রকার এই যে] যারা ডানপার্শ্বের লোক, তারা কত ভাগ্যবান। (যাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তাদেরকে 'ডান পার্শ্বের লোক' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই গুণটি নৈকট্যশীলদের মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু এখানে কেবল এই গুণটি উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে অতিরিক্ত বিশেষ নৈকট্যের গুণ পাওয়া যায় না। ফলে এর উদ্দিষ্ট অর্থ হয়ে গেছে সাধারণ মু'মিনগণ। এতে সংক্ষেপে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা ভাগ্যবান। অতঃপর فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার এই যে) যারা বাম পার্শ্বের লোক, কত হতভাগা তারা। (যাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তাদেরকে 'বাম পার্শ্বের লোক' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফির সম্প্রদায়। এতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তারা হতভাগা। অতঃপর فِي سَمُومٍ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তৃতীয় প্রকার এই যে) যারা সর্বোচ্চ স্তরের, তারা তো সর্বোচ্চ স্তরেরই। তারাই (আল্লাহর) নৈকট্যশীল। (এতে সব সর্বোচ্চ স্তরের বান্দা দাখিল আছেন—নবী, ওলী, সিদ্দীক ও কামিল মু'মিন। এতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তাঁরা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। অতঃপর فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা) আরামের উদ্যানে থাকবে। عَلَىٰ سُرُرٍ আয়াতে এর আরও বিবরণ আসবে। মাঝখানে নৈকট্যশীলদের মধ্যে যে অনেক দল রয়েছে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে)। তাদের (নৈকট্যশীলদের) একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। [পূর্ববর্তী বলে আদম (আ) থেকে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত এবং পরবর্তী বলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তীদের মধ্যে বেশী সংখ্যক এবং পরবর্তীদের মধ্যে অল্প সংখ্যক হওয়ার কারণ এই যে, বিশেষ লোকদের সংখ্যা প্রতি যুগেই কম থাকে। হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সময় সুদীর্ঘ। উম্মতে মুহাম্মদীর আবির্ভাব কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে। কাজেই এ সময় কম। এমতাবস্থায় সুদীর্ঘ সময়ের বিশেষ লোকগণের তুলনায় কম সময়ের বিশেষ লোকগণের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই কম হবে। কেননা, সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে লাখ, দু'লাখ তো পয়গম্বরই ছিলেন। শেষ নবীর সময়ে বা তার পরে অন্য কোন নবী নেই। তাই নৈকট্যশীলদের বিরাট দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্যে হবে কম সংখ্যক। অতঃপর নৈকট্যশীলদের প্রতিদানসমূহের বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে :) তারা স্বর্ণখচিত সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে এবং

তাদের কাছে ঘোরাফিরা করবে চির-কিশোরেরা পানপাত্র, কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। এটা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। তাদের জন্য থাকবে আনতনয়না হুরগণ। (তাদের গায়ের রঙও হবে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ) আবরণে রক্ষিত মোতির মত। তারা যা কিছু করত, এটা তার পুরস্কারস্বরূপ। তারা তথায় কোন অর্থহীন বাজে কথা শুনবে না (অর্থাৎ সুরা পান করার কারণে অথবা এমনিতেও আনন্দ বিঘ্নিতকারী কোন কিছু থাকবে না)। শুধুমাত্র (চতুর্দিক থেকে) সালাম আর সালামের আওয়াজ আসবে। (অন্য আয়াতে আছে : وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم

এবং تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ এটা সম্মান ও সম্ভ্রমের দলীল! মোটকথা, আত্মিক ও দৈহিক সর্বপ্রকার আনন্দ ও বিলাসিতা থাকবে। এ পর্যন্ত নৈকট্যশীলদের পুরস্কার বর্ণিত হল। অতঃপর ডান পার্শ্বস্থ মু'মিনদের প্রতিদান বর্ণনা করা হচ্ছে :) যারা ডানদিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান! (মাঝখানে নৈকট্যশীলদের প্রতিদানসমূহ বর্ণিত হওয়ার কারণে এ বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করতে হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মু'মিনদের প্রতিদানসমূহের বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে :) তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যাতে থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষ, কাঁদি কাঁদি কলা, দীর্ঘ ছায়া, প্রবাহিত পানি এবং প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবার নয় (যেমন দুনিয়াতে মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়)। এবং নিষিদ্ধও নয় (যেমন দুনিয়াতে বাগানের মালিকরা নিষেধাজ্ঞা জারি করে)। আর থাকবে সমুন্নত শয্যা। (কেননা, এগুলো সমুন্নত স্তরে বিছানো থাকবে। এটা হবে বিলাস-ব্যসনের জায়গা। নারীর সঙ্গসুখ ব্যতীত বিলাস-ব্যসন পূর্ণ হয় না। এভাবে উপরোক্ত বিলাস-সামগ্রীর উল্লেখ দ্বারাই নারীর উপস্থিতিও জানা গেল। কাজেই অতঃপর أَنشَأْنَاهُنَّ এর স্ত্রী-বাচক সর্বনাম দ্বারা জান্নাতী নারীদের আলোচনা করা হচ্ছে :) আমি জান্নাতী রমণিগণকে (এতে জান্নাতের হুর এবং দুনিয়ার স্ত্রীগণ সবই শামিল রয়েছে; যেমন তিরমিযীতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে যেসব রমণীকে নতুনভাবে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, তারা সেসব রমণী, যারা দুনিয়াতে বৃদ্ধা অথবা কুৎসিত ছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে) বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি; অর্থাৎ তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, [অর্থাৎ সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে। 'দুররে-মনসূরে' আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-র হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত আছে] কামিনী, (অর্থাৎ তাদের উঠাবসা, চলার ধরন এবং রূপ-লাবণ্য সবকিছুই কামোদ্দীপক এবং তারা জান্নাতী-দের) সমবয়স্কা। এগুলো ডান দিকের লোকদের জন্য। (অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ডান দিকের লোকও বিভিন্ন প্রকার হবে; অর্থাৎ) তাদের এক বড় দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং এক দল পরবর্তীদের মধ্য থেকে; (বরং পরবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেশী হবে। হাদীসে আছে যে, এই উম্মতের মু'মিনদের সমষ্টি পূর্ববর্তী সকল উম্মতের মু'মিনদের সমষ্টির চাইতে বেশী হবে। ডান দিকের লোকদের মর্যাদা যখন নৈকট্যশীলদের চাইতে

কম, তখন তাদের পুরস্কারও কম হবে। নৈকট্যশীলদের বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে এমন সব বস্তুর প্রাধান্য রয়েছে, যেগুলো শহরবাসীরা পছন্দ করে এবং ডান দিকের লোকদের বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে এমন সব বস্তুর প্রাধান্য রয়েছে, যেগুলো গ্রামবাসীরা পছন্দ করে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, উভয় দলের মধ্যকার পার্থক্য শহরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যকার পার্থক্যের অনুরূপ। অতঃপর কাফির সম্প্রদায় ও তাদের শাস্তি বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) যারা বাম দিকের লোক, কত না হতভাগা তারা! (এর বিবরণ এই যে) তারা থাকবে আগুনে, উত্তপ্ত পানিতে, ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। (অর্থাৎ এই ছায়ায় কোন দৈহিক ও আত্মিক উপকার থাকবে না। সূরা আর-রহমানে نحاس বলে এই ধূম্রকুঞ্জই বোঝানো হয়েছিল। অতঃপর শাস্তির কারণ বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) তারা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল, (এর ফলে) তারা ঘোরতর পাপ কর্মে (অর্থাৎ কুফর ও শিরকে) ডুবে থাকত (অর্থাৎ ঈমান আনত না। অতঃপর তাদের কুফর বর্ণনা করা হচ্ছে, যা তাদের সত্যান্বেষণের পথে বড় বাধা ছিল)। তারা বলতঃ আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও? [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলেও কতক কাফির কিয়ামত অস্বীকার করত, তাই এ সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ] আপনি বলে দিনঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। অতঃপর (অর্থাৎ একত্রিত হওয়ার পর) হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারিগণ! তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। এর উপর পান করবে ফুটন্ত পানি। তোমরা পান করবে পিপাসার্ত উটের ন্যায়। (মোটকথা) কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ওয়াকিয়ার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বঃ অন্তিম রোগশয্যায় আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথনঃ ইবনে কাসীর ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ যখন অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনী (রা) তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন হয়, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলঃ

ওসমান গনী—ما تشتكى আপনার অসুখটা কি?

ইবনে মসউদ—ذنوبى আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।

ওসমান গনী—ما تشتهى আপনার বাসনা কি?

ইবনে মসউদ—رحمة ربى আমার পালনকর্তার রহমত কামনা করি।

ওসমান গনী—আমি আপনার জন্য কোন চিকিৎসক ডাকব কি?

ইবনে মসউদ— الطبيب امرضنى চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।

৩৪—

ওসমান গনী—আমি আপনার জন্য সরকারী বায়তুলমাল থেকে কোন উপঢৌকন পাঠিয়ে দেব কি?

ইবনে মসঊদ—لا حاجة لى فيها এর কোন প্রয়োজন নেই।

ওসমান গনী—উপঢৌকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

ইবনে মসউদ—আপনি চিন্তা করছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্র্য ও উপবাসে পতিত হবে। কিন্তু আমি এরূপ চিন্তা করি না। কারণ, আমি কন্যাদেরকে জোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করে। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি :

من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করবে, সে কখনও উপবাস করবে না।

ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর অন্যান্য সনদ ও কিতাব থেকেও এর সমর্থন পেশ করেছেন।

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ—ইবনে কাসীর বলেন : ওয়াক্বিয়া কিয়ামতের অন্যতম নাম। কেননা, এর বাস্তবতায় কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ—كاذبة শব্দটি عافية-এর ন্যায় একটি ধাতু। অর্থ এই যে, কিয়ামতের বাস্তবতা মিথ্যা হতে পারে না।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ—হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে এই বাক্যের তফসীর এই যে, কিয়ামতের ঘটনা অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল জাতি ও ব্যক্তিকে নীচ করে দেবে এবং অনেক নীচ ও হেয় জাতি ও ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত ভয়াবহ হবে এবং এতে অভিনব বিপ্লব সংঘটিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হলে দেখা যায় যে, উপরের লোক নীচে এবং নীচের লোক উপরে উঠে যায় এবং নিঃস্ব ধনবান আর ধনবান নিঃস্ব হয়ে যায়।—(রূহুল মা'আনী)

হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে : وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً

ইবনে কাসীর বলেন : কিয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক দল আরশের ডান পার্শ্বে থাকবে। তারা আদম (আ)-এর ডান পার্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতী।

দ্বিতীয় দল আরশের বামদিকে একত্রিত হবে। তারা আদম (আ)-এর বাম পার্শ্ব

থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী।

তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আরশাধিপতির সামনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নবী, রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও ওলীগণ। তাঁদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে।

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ—ইমাম আহমদ (র) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন: তোমরা জান কি, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র ছায়ার দিকে কারা অগ্রবর্তী হবে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন: আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন: তারাই অগ্রবর্তী হবে, যাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিলে কবূল করে, যারা প্রাপ্য চাইলে পরিশোধ করে এবং অন্যের ব্যাপারে তাই ফয়সালা করে। যা নিজের ব্যাপারে করে।

মুজাহিদ বলেন: سابقون তথা অগ্রবর্তিগণ বলে পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে সিরীন (রা)-এর মতে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ্—উভয় কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছে, তারা অগ্রবর্তিগণ। হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (রা) বলেন: প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী দল হবে। কারও কারও মতে যারা সবার আগে মসজিদে গমন করে, তারাই অগ্রবর্তী।

এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাসীর বলেন: এসব উক্তি স্ব স্ব স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, দুনিয়াতে যারা সৎ কাজে অন্যের চাইতে অগ্রে, পরকালেও তারা অগ্রবর্তীরূপে গণ্য হবে। কেননা, পরকালের প্রতিদান দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে দেওয়া হবে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ শব্দের অর্থ দল। যামাখশারীর মতে বড় দল।—(রূহুল মা'আনী)

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারা: আলোচ্য আয়াতসমূহে দু'জায়গায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর বিভাগ উল্লিখিত হয়েছে—নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায়। নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জায়গায় ثُلَّةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মু'মিনদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে।

এখন চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ দু'রকম উক্তি করেছেন। এক. হযরত আদম (আ)

থেকে শুরু করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত সব মানুষ পূর্ববর্তী এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষ পরবর্তী। মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে জরীর (র) প্রমুখ এই তফসীর করেছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপেও তাই নেওয়া হয়েছে। হযরত জাবের (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস এই তফসীরের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যখন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সম্পর্কে প্রথম আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ নাযিল হল, তখন হযরত ওমর (রা) বিস্ময় সহকারে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)! পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা বেশী এবং আমাদের মধ্যে কম হবে কি? অতঃপর এক বছর পর্যন্ত পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়নি। এক বছর পরে যখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ নাযিল হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

اسمع يا عمر ما قد انزل الله ثلة من الاولين و ثلة من الا خرين الا وان من ادم الى ثلة و امتى ثلة ـ

শোন হে ওমর, আল্লাহ্ নাযিল করেছেন—পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল হবে। মনে রেখ, আদম (আ) থেকে শুরু করে আমা পর্যন্ত এক বড় দল এবং আমার উম্মত অপর বড় দল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক হাদীস থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ আয়াতখানি যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কিরাম ব্যথিত হন যে আমরা পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় কম সংখ্যক হব। তখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ আয়াতখানি নাযিল হয়। তখন রসূলে করীম (সা) বললেন ঃ আমি আশা করি যে, তোমরা (অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী) জান্নাতে সমগ্র উম্মতের

মুকাবিলায় এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেক হবে। বাকী অর্ধেকের মধ্যেও তোমাদের কিছু অংশ থাকবে—(ইবনে কাসীর)। এর ফলশ্রুতি এই যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসদ্বয়কে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা নির্ভেজাল নয়। কেননা, প্রথম আয়াত وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং দ্বিতীয় আয়াত وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ তাদের বর্ণনায় নয়, বরং সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এর জওয়াবে 'রূহুল মা'আনী' গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ প্রথম আয়াত শুনে সাহাবায়ে কিরাম ও হযরত ওমর (রা) দুঃখিত হওয়ার কারণ এরূপ হতে পারে যে, তাঁরা মনে করেছেন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যে হার, সাধারণ মু'মিনদের মধ্যেও সেই হার অব্যাহত থাকবে। ফলে সমগ্র জান্নাতবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম হবে। কিন্তু পরের আয়াতে সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনা যখন ثُلَّةٌ (বড় দল) শব্দটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল, তখন তাঁদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং তাঁরা বুঝলেন যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তবে অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। এর বিশেষ কারণ এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে পয়গম্বরই রয়েছেন বিপুল সংখ্যক। কাজেই তাঁদের মুকাবিলায় উম্মতে মুহাম্মদী কম হলেও সেটা দুঃখের বিষয় নয়।

দুই. তফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে এই উম্মতেরই দু'টি স্তর বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে 'কুনে-উলা' তথা সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখদের যুগকে এবং পরবর্তী বলে তাঁদের পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর, আবু হাইয়ান, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি তফসীর গ্রন্থে এই দ্বিতীয় উক্তিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রথম উক্তির সমর্থনে হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন যে, এর সনদ অগ্রাহ্য। দ্বিতীয় উক্তির প্রমাণ হিসাবে তিনি কোরআন পাকের সেসব আয়াত পেশ করেছেন, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মদী শ্রেষ্ঠতম উম্মত, যেমন كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ইত্যাদি আয়াত। তিনি আরও বলেছেন যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই শ্রেষ্ঠতম উম্মতে কম হবে—এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। তাই এ কথাই অধিক সঙ্গত যে, পূর্ববর্তিগণের অর্থ এই উম্মতের প্রথম যুগের মনীষিগণ এবং পরবর্তিগণের অর্থ তাঁদের পরবর্তী লোকগণ। তাদের মধ্যে নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে।

এর সমর্থনে ইবনে কাসীর হাসান বসরী (র)-এর উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

পূর্ববর্তিগণ তো আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ইয়া আল্লাহ্, আমাদেরকে সাধারণ মু'মিন তথা আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি পূর্ববর্তিগণের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন :

من مضى من هذه الامة অর্থাৎ পূর্ববর্তিগণ হচ্ছে এই উম্মতেরই পূর্ববর্তী লোকগণ।

এমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রা) বলেন : আলিমগণ বলেন এবং আশা রাখেন যে, এই উম্মতের মধ্য থেকেই পূর্ববর্তিগণ ও পরবর্তিগণ হোক।—(ইবনে কাসীর)

রূহুল মা'আনীতে দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থনে হযরত আবু বকর (রা) এর রেওয়ায়েত-ক্রমে নিম্নোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে :

عن ابى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله سبحانه ثلة من الاولين وثلة من الاخرين قال هم جميعا من هذه الامة -

একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে—আল্লাহ্ তা'আলার এই উক্তির তফসীর প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলেন : তারা সবাই এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে।

এই তফসীর অনুযায়ী শুরুতে وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেই সম্বোধন করা হয়েছে এবং প্রকারত্রয় উম্মতে মুহাম্মদী হবে।—(রূহুল-মা'আনী)

তফসীরে মাযহারীতে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, কোরআন পাক থেকে সুস্পষ্ট-রূপে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মদী পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, কোন উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব তার ভিতরকার উচ্চস্তরের লোকদের সংখ্যাধিক্য দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে—এটা সুদূরপরা-হত। যেসব আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, সেগুলো এই :

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ এবং كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এক হাদীসে বলা হয়েছে :

انتم تتمون سبعين امة انتم اخرها واكرمها على الله تعالى

—তোমরা সত্তরটি উম্মতের পরিশিষ্ট হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তোমরা

জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে—এতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ কি? আমরা বললাম: নিশ্চয় আমরা এতে সন্তুষ্ট। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন: والذى نفسى بيده انى لارجوا ان تكونوا نصف اهل الجنة - যে সত্তার করায়ত্ত আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে।—(বুখারী, মাযহারী)

اهل الجنة مائة وعشرون صفا ثمانون منها من هذه الامة واربعون من سائر الامم -

জান্নাতীগণ মোট একশ' বিশ কাতারে থাকবে। তন্মধ্যে আশি কাতার এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে এবং অবশিষ্ট চল্লিশ কাতারে সমগ্র উম্মত শরীক হবে।

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের জান্নাতীদের পরিমাণ কোথাও এক-চতুর্থাংশ, কোথাও অর্ধেক এবং শেষ রেওয়ায়েতে দুই-তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুমান মাত্র। অনুমান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ হয়েই থাকে।

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ—ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, موضونة-এর অর্থ স্বর্ণখচিত বস্ত্র।

وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ—অর্থাৎ এই কিশোররা সর্বদা কিশোরই থাকবে। তাদের মধ্যে বয়সের কোন তারতম্য দেখা দেবে না। হূরদের ন্যায় এই কিশোরগণও জান্নাতেই পয়দা হবে এবং তারা জান্নাতীদের খিদমতগার হবে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একজন জান্নাতীর কাছে হাজারো খাদিম থাকবে।—(মাযহারী)

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ—اكواب শব্দটি كوب-এর বহুবচন। অর্থ গ্লাসের ন্যায় পানপাত্র। اباريق শব্দটি ابريق এর বহুবচন। এর অর্থ কুজা। كأس এর অর্থ সুরা পানের পিয়ালা। معين এর উদ্দেশ্য এই যে, এই একটি ঝরনা থেকে আনা হবে।

لَا يُصَدَّعُونَ—এটা صدع থেকে উদ্ভূত। অর্থ মাথাব্যথা। দুনিয়ার সুরা অধিক মাত্রায় পান করলে মাথাব্যথা ও মাথাঘোরা দেখা দেয়। জান্নাতের সুরা এই সুরার উপসর্গ থেকে পবিত্র হবে।

لَا يُنزِفُونَ—نزف এর আসল অর্থ কূপের সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করা। এখানে অর্থ জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলা।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ —অর্থাৎ রুচিসম্মত পাখীর গোশ্ত। হাদীসে আছে, জান্নাতীগণ যখন যেভাবে পাখীর গোশ্ত খেতে চাইবে, তখন সেভাবে প্রস্তুত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে।—(মাযহারী)

وَأَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا أَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ —মু'মিন, মুত্তাকী ও ওলীগণই প্রকৃতপক্ষে 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ডান পার্শ্বস্থ লোক। পাপী মুসলমানগণও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে—কেউ তো নিছক আল্লাহ্ তা'আলার কৃপায়, কেউ কোন নবী ও ওলীর সুপারিশের পর এবং কেউ আযাব ভোগ করবে, কিন্তু পাপ পরিমাণে আযাব ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে 'আসহাবুল ইয়ামীনের' অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, পাপী মু'মিনের জন্য জাহান্নামের অগ্নি প্রকৃতপক্ষে আযাব নয়, বরং আবর্জনা থেকে পবিত্র হওয়ার একটি কৌশল মাত্র। —(মাযহারী)

فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ —জান্নাতের অবদানসমূহ অসংখ্য, অদ্বিতীয় ও কল্পনাতীত। তন্মধ্যে কোরআন পাক মানুষের বোধগম্য ও পছন্দসই বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছে। আরবরা যেসব চিত্ত বিনোদন ও যেসব ফল-মূলকে পছন্দ করত, এখানে তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। سدر-এর অর্থ বদরিকা বৃক্ষ مخضود এর অর্থ যার কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে এবং ফলভারে বৃক্ষ নুয়ে পড়েছে। জান্নাতের বদরিকা দুনিয়ার বদরিকার ন্যায় হবে না; বরং এগুলো আকৃতিতে অনেক বড় এবং স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় হবে। طلح এর অর্থ কলা منضود-এর অর্থ কাঁদি কাঁদি ظل ممدود এর অর্থ দীর্ঘ ছায়া। হাদীসে আছে—অশ্বে আরোহণ করে শত শত বছরেও তা অতিক্রম করা যাবে না। ماء مسكوب -এর অর্থ মাটির উপর প্রবাহিত পানি।

فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ —প্রচুর ফল, অর্থাৎ ফলের সংখ্যাও বেশী হবে এবং প্রকারও অনেক হবে। لَا مَقْطُوْعَةٍ وَلَا مَمْنُوْعَةٍ —দুনিয়ার সাধারণ ফলের অবস্থা এই যে, মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। কোন ফল গ্রীষ্মকালে হয় এবং মওসুম শেষ হয়ে গেলে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার কোন ফল শীতকালে হয় এবং শীতকাল শেষ হয়ে গেলে ফলের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী হবে—কোন মওসুমের মধ্যে সীমিত থাকবে না। এমনিভাবে দুনিয়াতে বাগানের পাহারাদাররা ফল ছিঁড়তে নিষেধ করে কিন্তু জান্নাতের ফল ছিঁড়তে কোন বাধা থাকবে না।

وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ —فرش শব্দটি فراش এর বহুবচন। অর্থ বিছানা, ফরাশ। উচ্চ স্থানে বিছানো থাকবে বিধায় জান্নাতের শয্যা সমুন্নত হবে। দ্বিতীয়ত এই বিছানা

মাটিতে নয়, পালঙ্কের উপর থাকবে। তৃতীয়ত স্বয়ং বিছানাও খুব পুরু হবে। কারও কারও মতে এখানে বিছানা বলে শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা নারীকেও বিছানা বলে ব্যক্ত করা হয়। হাদীসে আছে الولد للفراش—পরবর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী নারীদের আলোচনাও এরই ইঙ্গিত—(মাযহারী) এই অর্থ অনুযায়ী مرفوعة এর অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত।

أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً—إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ । إنشاء শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। هُنّ সর্বনাম দ্বারা জান্নাতের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে فراش-এর অর্থ জান্নাতে নারী হলে তার স্থলেই এই সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শয্যা, বিছানা ইত্যাদি ভোগ-বিলাসের বস্তু উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি জান্নাতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। জান্নাতী হুরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জান্নাতেই প্রজনন ক্রিয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জান্নাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভঙ্গি এই যে, যারা দুনিয়াতে কুশ্রী, কৃষ্ণাঙ্গী অথবা বৃদ্ধা ছিল, জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী-যুবতী ও লাবণ্যময়ী করে দেওয়া হবে। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: যেসব নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, শ্বেত কেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন সৃষ্টি তাদেরকে সুন্দর, ষোড়শী যুবতী করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন: একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহে আগমন করলেন। তখন এক বৃদ্ধা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ কে? আমি আরয করলাম: সে আমার খালা সম্পর্ক হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রসচ্ছলে বললেন: لا تدخل الجنة عجوز—অর্থাৎ জান্নাতে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা বিষণ্ণ হয়ে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে কাঁদতে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্বীয় উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃদ্ধারা যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না, বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন।---(মাযহারী)

أَبْكَارًا—এটা بكر-এর বহুবচন। অর্থ কুমারী বালিকা। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের নারীদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে।

عُرُبًا—এটা عروبة—এর বহুবচন। অর্থ স্বামী-সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী।

أَتْرَابًا—এটা ترب-এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্ক। জান্নাতে পুরুষ ও নারী

সব এক বয়সের হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রত্যেকের বয়স তেত্রিশ বছর হবে।—(মাযহারী)

ثُلَّةٌ মন্দের অর্থ এবং ও اولين—ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ

اٰخرين-এর তফসীর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি اولين তথা পূর্ববর্তিগণ বলে হযরত আদম (আ) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত লোকগণ এবং اخرين তথা পরবর্তিগণ বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লোকগণ বোঝানো হয়, তবে এই আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা মু'মিন-মুত্তাকিগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উম্মতের মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে এবং একা উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে। এমতাবস্থায় এটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কম গৌরবের বিষয় নয় যে, তারা পূর্ববর্তী লক্ষ লক্ষ পয়গম্বরের উম্মতের সমান হয়ে যাবে; অথচ তাদের সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত। এছাড়া ثُلَّةٌ শব্দের মধ্যে এরূপ অবকাশও আছে যে, পরবর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যা পূর্ববর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী হবে।

পক্ষান্তরে যদি পূর্ববর্তিগণ এই উম্মতের মধ্য থেকেই হয়, তবে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মত শেষের দিকেও অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের থেকে বঞ্চিত থাকবে না; যদিও শেষ যুগে এরূপ লোকের সংখ্যা কম হবে। সাধারণ মু'মিন, মুত্তাকী ও ওলী তো এই উম্মতের শুরু ও শেষভাগে বিপুল সংখ্যক থাকবে এবং তাদের কোন যুগ 'আসহাবুল-ইয়ামীন' থেকে খালি থাকবে না। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: আমার উম্মতের একটি দল সদাসর্বদা সত্যের উপর কায়েম থাকবে। হাজারো বিরোধিতা ও বাধাবিপত্তির মধ্যেও তারা সৎ পথ প্রদর্শনের কাজ অব্যাহত রাখবে। কারও বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই দল স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবে।

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَاَنْتُمْ
تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ
وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ۝ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ۝ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

(৫৭) আমিই সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে। অতঃপর কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না? (৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে? (৫৯) তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই। (৬১) এ ব্যাপারে যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন করে দিই, যা তোমরা জান না। (৬২) তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৪) তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট। (৬৬) বলবে ঃ আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম; (৬৭) বরং আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়লাম। (৬৮) তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৯) তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? (৭০) আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (৭১) তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৭২) তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? (৭৩) আমিই সেই বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা এবং মরুবাসীদের জন্য সামগ্রী। (৭৪) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তোমাদেরকে (প্রথমবার) সৃষ্টি করেছি (যা তোমরাও স্বীকার কর)। অতঃপর তোমরা (তওহীদকে ও কিয়ামতকে) সত্য বলে বিশ্বাস কর না কেন? (অতঃপর সৃষ্টির বিবরণ দিয়ে উপদেশ দান করা হচ্ছে ঃ) তোমরা যে (নারীদের গর্ভাশয়ে) বীর্যপাত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (বলা-বাহুল্য, আমিই সৃষ্টি করি)। আমি তোমাদের মৃত্যুর (নির্দিষ্ট) কাল নির্ধারিত করেছি।

(উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টি করা এবং সৃষ্টিকে বিশেষ সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখা আমারই কাজ। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমাদের বর্তমান আকার-আকৃতি বাকী রাখাও আমারই কাজ এবং) আমি এ ব্যাপারে অক্ষম নই যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতি দিই, যা তোমরা জান না। (উদাহরণত জন্তু জানোয়ারের আকৃতি দান করি, যা তোমরা ধারণাও করতে পার না। অতঃপর এর দলীল বলা হচ্ছে ঃ) তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হয়েছ (যে, তা আমারই কাজ)। তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? (অনুধাবন করে এই অবদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তওহীদ স্বীকার কর এবং কিয়ামতে পুনরুজ্জীবনকে মেনে নাও)। তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্ন করি? (অর্থাৎ মাটিতে বীজ বপন করার মধ্যে তো তোমাদের কিছু হাত আছে, কিন্তু বীজকে অংকুরিত করা কার কাজ? অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মাটি থেকে ফসল উৎপন্ন করা যেমন আমার কাজ, তেমনি ফসল দ্বারা উপকার লাভ করাও আমার কুদরতের উপর নির্ভরশীল)। আমি ইচ্ছা করলে তাকে (উৎপাদিত ফসলকে) খড়কুটা করে দিতে পারি (অর্থাৎ দানা মোটেই হবে না, গাছ শুকিয়ে খড়কুটা হয়ে যাবে)। অতঃপর তোমরা আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করবে যে, (এবার তো) আমরা ঋণের চাপে পড়ে গেলাম। বরং আমরা সম্পূর্ণ হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়লাম। (অর্থাৎ সমগ্র সম্পদই গেল। অতঃপর আরও হুঁশিয়ার করা হচ্ছে ঃ তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা মেঘ থেকে বর্ষণ কর, না আমি বর্ষণ করি? (এরূপর এই পানিকে পানোপযোগী করা আমার অপর নিয়ামত)। আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না কেন? (তওহীদ বিশ্বাস ও কুফর বর্জনই বড় কৃতজ্ঞতা। অতঃপর আরও হুঁশিয়ার করা হচ্ছে ঃ) তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তার বৃক্ষকে (যা থেকে অগ্নি নির্গত হয় এমনিভাবে যেসব উপায়ে অগ্নি সৃষ্টি হয় সেসব উপায়কে) তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? আমি তাকে (জাহান্নামের অগ্নির অথবা আমার কুদরতের) স্মরণিকা এবং মুসাফিরদের জন্য সামগ্রী করেছি। (স্মরণিকা একটি পারলৌকিক উপকার এবং অগ্নি দ্বারা রন্ধন করা একটি জাগতিক উপকার। 'মুসাফিরের জন্য' বলার কারণ এই যে, সফরে অগ্নি দুর্লভ হওয়ার কারণে একটি দরকারী সামগ্রী হয়ে থাকে) অতএব (যার এমন শক্তি) আপনি আপনার (সেই) মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত হাশরে মানুষের তিন প্রকার এবং তাদের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পথভ্রষ্ট মানুষকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে, যারা মূলত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং পুনরুজ্জীবনেই বিশ্বাসী নয়। অথবা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে অপরকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। উদ্দেশ্য মানুষের সেই উদাসীনতা ও মূর্খতার মুখোস উন্মোচন করা, যে তাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত করে রেখেছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু বিদ্যমান আছে অথবা হচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে হবে,

এগুলোকে সৃষ্টি করা, স্থায়ী রাখা এবং মানুষের বিভিন্ন উপকারে নিয়োজিত করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও রহস্যের লীলা। যদি কারণাদির যবনিকা মাঝখানে না থাকে এবং মানুষ এসব বস্তুর সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে তবে সে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতকে পরীক্ষাগার করেছেন। তাই এখানে যা কিছু অস্তিত্ব ও বিকাশ লাভ করে সব কারণাদির অন্তরালে বিকাশ লাভ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও রহস্যের বলে কারণাদি ও ঘটনাবলীর মধ্যে এমন এক অটুট যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছেন যে, কারণ অস্তিত্ব লাভ করার সাথে সাথে ঘটনা অস্তিত্ব লাভ করে। কারণ ও ঘটনা যেন একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাহ্যদর্শী মানুষ কারণাদির এই বেড়াজালে আটকে যায় এবং সৃষ্টকর্মকে কারণাদির সাথেই সম্বন্ধযুক্ত মনে করতে থাকে। যবনিকার অন্তরাল থেকে যে আসল শক্তি কারণ ও ঘটনাবলীকে সক্রিয় করে, তার দিকে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি যায় না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে খোদ মানব সৃষ্টির স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, এরপর মানবীয় প্রয়োজনাদি সৃষ্টির মুখোস উন্মোচিত করেছেন। মানুষকে সম্বোধন করে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন এবং এসব প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক উত্তরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কেননা, প্রশ্নের মধ্যেই কারণাদির দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথম আয়াত একটি দাবী এবং পরবর্তী আয়াতগুলো এর স্বপক্ষে প্রমাণ। সর্বপ্রথম স্বয়ং মানব সৃষ্টি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। কারণ, গাফিল মানুষ প্রত্যহ দেখে যে, পুরুষ ও নারীর যৌন মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়। এরপর তা জননীর গর্ভাশয়ে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নয় মাস পর একটি পরিপূর্ণ মানবরূপে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কারণে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি এতই নিবদ্ধ থেকে যায় যে, পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক মিলনই মানব সৃষ্টির প্রকৃত কারণ। তাই প্রশ্ন করা হয়েছে : أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

—অর্থাৎ হে মানব! একটু ভেবে দেখ, সন্তান জন্মলাভ করার মধ্যে তোমার হাত এতটুকুই তো যে, তুমি এক ফোঁটা বীর্য বিশেষ স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছ। এরপর তোমার জানা আছে কি যে, বীর্যের উপর স্তরে স্তরে কি কি পরিবর্তন আসে? কি কি ভাবে এতে অস্থি ও রক্ত-মাংস সৃষ্টি হয়? এই ক্ষুদে জগতের অস্তিত্বের মধ্যে খাদ্য আহরণ করার, রক্ত তৈরী করার ও জীবাত্মা সৃষ্টি করার কেমন যন্ত্রপাতি কি কি ভাবে স্থাপন করা হয় এবং শ্রবণ, দর্শন, কথন, আস্বাদন ও অনুধাবন শক্তি নিহিত করা হয়, যার ফলে একটি মানুষের অস্তিত্ব একটি চলমান কারখানাতে পরিণত হয়? পিতাও কোন খবর রাখে না এবং যে জননীর উদরে এসব হচ্ছে, সেও কিছু জানে না। জ্ঞান-বুদ্ধি বলে কোন বস্তু দুনিয়াতে থেকে থাকলে সে কেন বুঝে না যে, কোন স্রষ্টা ব্যতীত মানুষের অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় সত্তা আপনা-আপনি তৈরী হয়ে যায়নি। কে সেই স্রষ্টা? পিতা-মাতা তো জানেও না যে, কি তৈরী হল, কিভাবে হল? প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তারা অনুমানও করতে পারে না যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ ছেলে

না মেয়ে? তবে কে সেই শক্তি, যে উদর, গর্ভাশয় ও ভ্রূণের উপরস্থ ঝিল্লি—এই তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এমন সুন্দর-সুশ্রী শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও অনুধাবনকারী সত্তা তৈরী করে দিয়েছেন? এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ —(সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ্ মহান) বলে উঠে না, সে জ্ঞান-বুদ্ধির শত্রু।

এরপরের আয়াতসমূহে এ কথাও বলা হয়েছে যে, হে মানব! তোমাদের জন্মগ্রহণ ও বিচরণশীল কর্মঠ মানুষ হয়ে যাওয়ার পরও অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও সকল কাজ-কারবারে তোমরা আমারই মুখাপেক্ষী। আমি তোমাদের মৃত্যুরও একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তোমাদের যে আয়ুষ্কাল রয়েছে, তাতে তোমরা নিজেদেরকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বীরূপে পেয়ে থাক। এটাও তোমাদের বিভ্রান্তি বৈ নয়। আমি এই মুহূর্তেই তোমাদেরকে নাস্তানাবুদ করে তোমাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। অথবা তোমাদেরকে ধ্বংস না করে অন্য কোন জীবের কিংবা জড় পদার্থের আকারে পরিবর্তিত করে দিতেও সক্ষম। নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও; বরং তোমাদের স্থায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এক বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধির বাহক করেছেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে পার। وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ এর সারমর্ম এই যে, কেউ আমার ইচ্ছাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আমি এই মুহূর্তেও যা চাই, তাই করতে পারি. اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের স্থলে তোমাদেরই মত অন্য কোন জাতি নিয়ে আসতে পারি وَنُنْشِئَكُمْ فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ —এবং তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যেতে পার অথবা অন্য কোন জন্তুর আকারেও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পার; যেমন বিগত উম্মতের মধ্যে আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে বানর ও শূকরে পরিণত হওয়ার আযাব এসে গেছে। তোমাদেরকে প্রস্তর ও জড় পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেওয়া যেতে পারে।

اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ —খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের প্রধান ভিত্তি। মানব সৃষ্টির গূঢ় তত্ত্ব উদঘাটিত করার পর এখন এই খাদ্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়েছে: তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? এই বীজ থেকে অংকুর বের

করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জওয়াব নেই যে, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে, সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাত্র, যাতে দুর্বল অংকুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র প্রচেষ্টা এই এক বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার হিফাযতে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্য থেকে চারা বের করে আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরী করেছে বলে দাবীও করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, মণের মণ মাটির স্তূপে পতিত বীজের মধ্য থেকে এই সুন্দর ও মহোপকারী বৃক্ষ কে তৈরী করল? জওয়াব এটাই যে, সেই পরম প্রভু, অপার শক্তিধর আল্লাহ্ তা'আলার অত্যাশ্চর্য কারিগরিই এর প্রস্তুতকারক।

এরপর যে পানির অপর নাম জীবন এবং যে অগ্নি দ্বারা মানুষ রান্না-বান্না করে ও শিল্প-কারখানা পরিচালনা করে, সেগুলোর সৃষ্টি সম্পর্কে একই ধরনের প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে সবগুলোর সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণিত হয়েছে :

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ - مقوين শব্দটি اقواء থেকে

এবং اقواء শব্দটিকে قواء থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ মরু। কাজেই قوى শব্দের অর্থ হবে মরুবাসী। এখানে মুসাফির বোঝানো হয়েছে, যে প্রান্তরে অবস্থান করে খানাপিনার ব্যবস্থাপনায় রত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সৃষ্টি আমারই শক্তি-সামর্থ্যের ফসল।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ-এর অবশ্যম্ভাবী ও যুক্তিভিত্তিক পরিণতি এই যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি ও তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে। এটাই তাঁর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা।

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾
إِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهٗٓ إِلَّا
الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ
أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَآ
إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾

تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ۝ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۝ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۝ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ۝ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

(৭৫) অতএব আমি তারকারাজির অস্তাচলের কসম খাচ্ছি, (৭৬) নিশ্চয় এটা এক মহা কসম —যদি তোমরা জানতে, (৭৭) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, (৭৮) যা আছে এক গোপন কিতাবে, (৭৯) যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না। (৮০) এটা বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? (৮২) এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (৮৩) অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয় (৮৪) এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, (৮৫) তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না। (৮৬) যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (৮৭) তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৮৮) যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয়; (৮৯) তবে তার জন্য আছে সুখ, উত্তম রিযিক এবং নিয়ামতে ভরা উদ্যান। (৯০) আর যদি সে ডান পার্শ্বস্থদের একজন হয়, (৯১) তবে তাকে বলা হবে: তোমার জন্য ডান পার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে সালাম। (৯২) আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয়, (৯৩) তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা। (৯৪) এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে। (৯৫) এটা ধ্রুব সত্য। (৯৬) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের বাস্তবতা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে, কিন্তু তোমরা কোরআন মান না। অতএব) আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি। তোমরা যদি চিন্তা কর, তবে এটা এক মহা শপথ। (এ বিষয়ে শপথ করছি যে) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, যা এক সংরক্ষিত কিতাবে (অর্থাৎ 'লওহে-মাহ্ফুযে' পূর্ব থেকে) আছে। (লওহে-মাহ্ফুয এমন যে গোনাহ্ থেকে) পাক পবিত্র ফেরেশতাগণ ব্যতীত কেউ (অর্থাৎ কোন শয়তান ইত্যাদি) একে স্পর্শ করতে পারে না। (এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া তো দূরের কথা। সুতরাং কোরআন 'লওহে-মাহ্ফুয' থেকে দুনিয়া পর্যন্ত ফেরেশতাদের মাধ্যমেই আগমন করেছে। এটাই নবুওয়ত। শয়তান কোরআনকে আনতেই পারে না যে,

একে অতীন্দ্রিয়বাদ বলে সন্দেহ করা যাবে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ

الْأَمِينُ এবং وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ এতে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন)

বিশ্ব-পালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (كَرِيمٌ শব্দের ইঙ্গিতার্থ এটাই ছিল। এখানে নক্ষত্ররাজির অস্তমিত হওয়ার শপথ করার অর্থ ও উদ্দেশ্য তাই, যা সূরা নজমের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে বর্ণিত সব শপথই সার্থকরূপে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। ফলে সবগুলো শপথই মহান। কিন্তু কোন কোন স্থানে উদ্দেশ্যকে গুরুত্বদানের জন্য মহান হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টত উল্লেখও করা হয়েছে)। তবুও কি তোমরা এই কালামের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? (অর্থাৎ একে সত্য বলে বিশ্বাস করাকে জরুরী মনে করবে না?) তদুপরি একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (ফলে তোমরা তওহীদ এবং কিয়ামতকেও অস্বীকার করছ)। অতএব (এই অস্বীকৃত যদি সত্য হয়, তবে) যখন (মরণোন্মুখ ব্যক্তির) প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা (বসে বসে অসহায়-ভাবে) তাকাতে থাক, তখন আমি তার (অর্থাৎ মরণোন্মুখ ব্যক্তির) তোমাদের অপেক্ষা অধিক নিকটে থাকি (অর্থাৎ তার অবস্থা সম্পর্কে তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত থাকি। কেননা, তোমরা শুধু তার বাহ্যিক অবস্থা দেখ। আর আমি তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞাত থাকি। কিন্তু (আমার এই জ্ঞানগত নৈকট্যকে মূর্খতা ও কুফরের কারণে) তোমরা বুঝ না। অতএব যদি (বাস্তবে) তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (যেমন তোমরা মনে কর) তবে তোমরা এই আত্মাকে (দেহে) ফিরাও না কেন? (তোমরা তো তখন তা কামনাও কর) যদি তোমরা (কিয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করার ব্যাপারে) সত্যবাদী হও? (উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যখন দেহে আত্মা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম নও তখন কিয়ামতে আত্মার পুনরুজ্জীবনকে রোধ করতে কিরূপে সক্ষম হবে? সুতরাং তোমা-দের অস্বীকৃতি অনর্থক। অতএব যখন প্রমাণিত হল যে, কিয়ামতের আগমন অবশ্যম্ভাবী, তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়) যে ব্যক্তি নৈকট্যশীলদের একজন হবে (যাদের কথা

পূর্বে وَالسَّابِقُونَ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে) তার জন্য আছে সুখ (স্বাচ্ছন্দ), খাদ্য

এবং আরামের জান্নাত। আর যে ব্যক্তি ডান পার্শ্বস্থদের একজন হবে, (যাদের কথা

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) তাকে বলা হবে: তোমার

জন্য (বিপদাপদ থেকে) শান্তি। কারণ, তুমি ডান পার্শ্বস্থদের একজন। (অনুকম্পা অথবা তওবার কারণে প্রথমেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে তাকে প্রথমেই এ কথা বলা হবে। পক্ষান্তরে শাস্তি-লাভের পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে একথা শেষে বলা হবে)। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারী-দের একজন হবে, তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা এবং সে প্রবেশ করবে জাহান্নামে।

নিশ্চয় এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) ধ্রুব সত্য। অতএব (যিনি এগুলো করেন) আপনি আপনার (সেই) মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি ও পার্থিব সৃষ্টির মাধ্যমে কিয়ামতে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শপথ সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ — قسم-এর শুরুতে অতিরিক্ত لا পদের ব্যবহার একটি সাধারণ বাকপদ্ধতি। যেমন বলা হয় لَا وَاللّٰهِ মূর্খতা যুগের কসমে لا وابيك সুবিদিত। কেউ কেউ বলেন যে, এরূপ স্থলে لا সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তোমার ধারণা ঠিক নয়; বরং এরপর শপথ করে যা বলা হচ্ছে তাই সত্য। مواقع শব্দটি موقع এর বহুবচন। এর অর্থ নক্ষত্রের অস্তাচল অথবা অস্তের সময়। এ আয়াতে নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে, যেমন সূরা নজমেও وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى বলে তাই করা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, অস্ত যাওয়ার সময় দিগন্তে নক্ষত্রের কর্ম সমাপ্তি দৃষ্টিগোচর হয় এবং তার চিহ্নের অবসান প্রত্যক্ষ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, নক্ষত্র চিরন্তন নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের মুখাপেক্ষী।

إِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيمٌ — যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করার উদ্দেশে পূর্ববর্তী আয়াতে শপথ করা হয়েছিল, এখান থেকে তাই বর্ণিত হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, কোরআন পাক সম্মানিত ও সংরক্ষিত কিতাব এবং মুশরিকদের এই ধারণা মিথ্যা যে, কোরআন কারও রচিত অথবা শয়তান কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট কালাম। নাউযুবিল্লাহ্।

كِتَابٍ مَّكْنُونٍ — অর্থাৎ গোপন কিতাব। একথা বলে লওহে মাহ্ফুয বোঝানো হয়েছে।

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ — এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তফসীরবিদগণ এসব বিষয়ে মতভেদ করেছেন। এক. ব্যাকরণিক দিক দিয়ে এই বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব অর্থাৎ 'লওহে মাহ্ফুযের'ই দ্বিতীয় বিশেষণ এবং لَا يَمَسُّهُ

এর সর্বনাম দ্বারা লওহে মাহ্ফুযই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, গোপন কিতাব অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুযকে পাক-পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এমতাবস্থায় مطهرون অর্থাৎ 'পাক-পবিত্র লোকগণ'—এর অর্থ ফেরেশতাগণই হতে পারে, যারা 'লওহে মাহ্ফুয পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। এ ছাড়া مس শব্দটিকে তার আসল অর্থে নেওয়া যায় না, বরং مس তথা স্পর্শ করার রূপক অর্থ নিতে হবে অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুযে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেননা, লওহে মাহ্ফুযকে হাতে স্পর্শ করা ফেরেশতা প্রমুখ সৃষ্ট জীবের কাজ নয়।—(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই তফসীর করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ এই যে, এ বাক্যটি إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ বাক্যে অবস্থিত 'সম্মানিত' শব্দটি কোরআনের বিশেষণ। এমতাবস্থায় لَا يَمَسُّهُ এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হবে। কোরআনের অর্থ হবে সেই কপি, যাতে কোরআন লিখিত আছে এবং مس শব্দটি হাতে স্পর্শ করার আসল অর্থে থাকবে। কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ আমি এই আয়াতের যত তফসীর শুনেছি, তন্মধ্যে এই তফসীরই উত্তম। এর মর্মও তাই, যা সূরা আবাসা-র নিম্নোক্ত আয়াত-সমূহের মর্ম ঃ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ (কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

এর সারমর্ম এই যে, আলোচ্য বাক্যটি كِتَابٍ مَّكْنُونٍ-এর বিশেষণ নয়, বরং কোরআনের বিশেষণ।

দুই. দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, مُطَهَّرُونَ অর্থাৎ 'পাক-পবিত্র' কারা? বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদের মতে এখানে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে, যাঁরা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। হযরত আনাস, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের ও ইবনে আব্বাস (রা) এই উক্তি করেছেন।—(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) ইমাম মালেক (র)-ও এই উক্তিই পছন্দ করেছেন।—(কুরতুবী)

কিছু সংখ্যক তফসীরবিদ বলেন ঃ কোরআনের অর্থ কোরআনের লিখিত কপি এবং مطهرون এর অর্থ এমন লোক, যারা 'হদসে আসগর' ও 'হদসে আকবর' থেকে পবিত্র। বে-ওযূ অবস্থাকে 'হদসে আসগর' বলা হয়। ওযূ করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েয ও নিফাসের অবস্থাকে 'হদসে আকবর' বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা জরুরী। এই তফসীর হযরত আতা, তাউস, সালেম ও বাকের (র) থেকে বর্ণিত আছে।—(রূহুল মা'আনী)।

এমতাবস্থায় لَا يَمَسُّهُ এই সংবাদসূচক বাক্যটির অর্থ হবে নিষেধসূচক। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্রতা ব্যতীত কোরআনের কপি স্পর্শ করা জায়েয নয়। পবিত্রতার অর্থ হবে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া, বে-ওযূ না হওয়া এবং বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা না হওয়া। কুরতুবী এই তফসীরকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন এবং তফসীরে মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি ভগ্নি ফাতেমাকে কোরআন পাঠরতা অবস্থায় পেয়ে কোরআনের পাতা দেখতে চান। ভগ্নী আলোচ্য আয়াত পাঠ করে কোরআনের পাতা তাঁর হাতে দিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা তিনি গোসল করে পাতাগুলো হাতে নিয়ে পাঠ করেন। এই ঘটনা থেকেও শেষোক্ত তফসীরের অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। যেসব হাদীসে অপবিত্র অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোকেও কেউ কেউ এই তফসীরের সমর্থনে পেশ করেছেন।

যেহেতু এই প্রশ্নে হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা) প্রমুখ সাহাবী মতভেদ করেছেন। তাই অনেক তফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থায় কোরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা সপ্রমাণ করার জন্য এই আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন না। তাঁরা এর প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মাত্র। হাদীসগুলো এই ঃ

হযরত আমর ইবনে হযমের নামে লিখিত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একখানি পত্র ইমাম-মালেক (র) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে একটি বাক্য এরূপও আছে ঃ لا يمس القرا ن الا طا هر —অর্থাৎ অপবিত্র ব্যক্তি যেন কোরআনকে স্পর্শ না করে।—(ইবনে কাসীর)

রূহুল মা'আনীতে এই রেওয়ায়েত মসনদে আবদুর রাযযাক, ইবনে আবী দাঊদ ও ইবনুল মুনযির থেকেও বর্ণিত আছে। তিবরানী ও ইবনে মরদুওয়াইহি বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا يمس القرا ن الا طا هر —(রূহুল মা'আনী)।

মাসআলা ঃ উল্লিখিত রেওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ উম্মত এবং ইমাম চতুষ্টয় এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাক স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা শর্ত। এর খিলাফ করা গোনাহ্। পূর্ববর্ণিত সকল পবিত্রতাই এতে দাখিল আছে। হযরত আলী, ইবনে মসউদ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, সায়ীদ ইবনে যায়দ, আতা, যুহরী, নাখয়ী, হাকাম, হাম্মাদ, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবূ হানীফা সবারই এই মাযহাব। উপরে যে মতভেদ বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল মাসআলার দলীলে, আসল মাসআলায় নয়। কেউ কেউ কোরআনের আয়াত এবং উল্লিখিত হাদীসের সমষ্টি দ্বারা এই মাসআলাটি সপ্রমাণ করেছেন এবং কেউ কেউ শুধু হাদীসকেই দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। সাহাবীদের মতভেদের কারণে তাঁরা আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

মাসআলা ঃ কোরআন পাকের যে গিলাফ মলাটের সাথে সেলাই করা, তাও ওযূ

ব্যতীত স্পর্শ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয। তবে আলাদা কাপড়ের গিলাফে কোরআন পাক বন্ধ থাকলে ওযূ ব্যতীত তাতে হাত লাগানো ইমাম আবূ হানীফার মতে জায়েয। ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে তাও না-জায়েয।—(মাযহারী)

মাসআলা ঃ বে-ওযূ অবস্থায় পরিধেয় কাপড়ের আস্তিন অথবা আঁচল দ্বারা কোরআন পাক স্পর্শ করাও জায়েয নয়, রুমাল দ্বারা স্পর্শ করা যায়।

মাসআলা ঃ আলিমগণ বলেন ঃ এই আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থায় এবং হায়েয ও নিফাসের অবস্থায় কোরআন পাক তিলাওয়াত করাও জায়েয নয়। গোসল করার পর জায়েয হবে। কারণ, কপিতে লিখিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হলে মুখে উচ্চারিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আরও বেশী ওয়াজিব হওয়া দরকার। কাজেই বে-ওযূ অবস্থায়ও তিলাওয়াত নাজায়েয হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস এবং মনসদে আহ্মদে বর্ণিত হযরত আলীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বে-ওযূ অবস্থায় তিলাওয়াত করেছেন। এ কারণে ফিকহ্‌বিদগণ এর অনুমতি দিয়েছেন।—(মাযহারী)

اِدْهَانٌ শব্দটি مُدْهِنُوْنَ — أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ

থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ তেল মালিশ করা। তেল মালিশ করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নরম ও শিথিল হয়। তাই এই শব্দটি অবৈধ ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এই শব্দটি কোরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা ও মিথ্যারোপ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ تَرْجِعُوْنَهَا إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ০

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা ও পরে নক্ষত্ররাজির কসম করে দু'টি বিষয় সপ্রমাণ করা হয়েছে। এক. কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম। এতে কোন শয়তান ও জিনের প্রভাব থাকতে পারে না। এর বিষয়বস্তু সত্য। দুই. কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে আল্লাহ্‌র সামনে নীত হবে। পরিশেষে এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের অস্বীকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

কিয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার কাফিরদের পক্ষ থেকে যেন এ বিষয়ের দাবী যে, তাদের প্রাণ ও আত্মা তাদেরই করায়ত্ত। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অপ-নোদনের জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে একজন মরণোন্মুখ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন তার আত্মা কণ্ঠাগত হয় তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে

তাকিয়ে থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্মা বের না হোক, তখন আমি জ্ঞান ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি। নিকটে থাকার অর্থ এই যে, তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ও সক্ষম থাকি। কিন্তু তোমরা আমার নৈকট্য ও মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে আমার করায়ত্ত—এ বিষয়টি চর্মচক্ষে দেখ না। সারকথা এই যে, তোমরা সবাই মিলে তার জীবন ও আত্মার হিফাযত করতে চাও, কিন্তু তোমাদের সাধ্যে কুলায় না। তার আত্মার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারে না। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমরা মনে কর যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করা যাবে না এবং তোমরা এমন শক্তিশালী ও বীরপুরুষ যে, আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে চলে গেছ, তবে এখানেই স্বীয় শক্তিমত্তা ও বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখ এবং এই মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মার নির্গমন রোধ কর কিংবা নির্গমনের পর তাকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে আন। তোমরা যখন এতটুকুও করতে পার না, তখন নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে মনে করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করা কতটুকু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয়ে কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং হিসাবের পর প্রতিদান ও শাস্তি সুনিশ্চিত। সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, প্রতিদান ও শাস্তির পর সবাই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকের প্রতিদান আলাদা আলাদা হবে। আলোচ্য আয়াতে তাই আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি নৈকট্যশীলদের একজন হলে সুখই সুখ এবং আরামই আরাম ভোগ করবে। আর যদি 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা সাধারণ মু'মিনদের একজন হয়, তবে সেও জান্নাতের অবদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি 'আসহাবে শিমাল' তথা কাফির ও মুশরিকদের একজন হয়, তবে জাহান্নামের অগ্নি ও উত্তপ্ত পানি দ্বারা তাকে আপ্যায়ন করা হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ—অর্থাৎ উল্লিখিত প্রতিদান ও শাস্তি ধ্রুব সত্য। এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ—সূরার উপসংহারে রসূলে করীম (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন। এতে নামাযের ভেতরের ও বাইরের সব তসবীহ্ দাখিল রয়েছে। খোদ নামাযকেও মাঝে মাঝে তসবীহ্ বলে ব্যক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় এটা নামাযের প্রতি গুরুত্ব দানেরও আদেশ হয়ে যাবে।

سورة الحديد

সূরা হাদীদ

মদীনায় অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ لَهٗ مُلْكُ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَ

اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ

تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ

ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর, প্রজ্ঞাময়। (২) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৩) তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৪) তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই

থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৫) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (৬) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রিতে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু (সৃষ্ট বস্তু) আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে কিংবা অবস্থার মাধ্যমে)। তিনি শক্তিধর ও প্রজ্ঞাময়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন ও (তিনিই) মৃত্যু ঘটান। তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান। তিনিই (সব সৃষ্টের) আদি এবং তিনিই (সবার ধ্বংস হওয়ার পর) অন্ত। (অর্থাৎ তিনি পূর্বে কখনও অনস্তিত্বশীল ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও কোনরূপে অনস্তিত্ব-শীল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই সবার শেষেও তিনিই)। তিনিই (স্বীয় অস্তিত্বে প্রমা-ণাদির আলোকে প্রকটভাবে) প্রকাশমান এবং তিনিই (সত্তার স্বরূপের দিক দিয়ে) অপ্রকাশ-মান। (অর্থাৎ কেউ তাঁর সত্তা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয়। যদিও সৃজিতরা একদিক দিয়ে তাঁকে জানে এবং একদিক দিয়ে জানে না, কিন্তু তিনি সব সৃজিতকে সব দিক দিয়ে জানেন)। তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি (এমন সক্ষম যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে (অর্থাৎ ছয় দিন পরিমিত সময়ে) অতঃপর আরশে (যা সিংহাসন সদৃশ, এমনভাবে) সমাসীন (ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তাঁর পক্ষে শোভনীয়)। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে (যেমন বৃষ্টি) ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় (যেমন উদ্ভিদ) এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয় (যেমন ফেরেশতারা। তাঁরা আকাশে উঠানামা করে ও বিধি-বিধান, যা অবতীর্ণ হয় এবং বান্দার আমল যা উত্থিত হয়। তিনি যেমন এসব বিষয় জানেন, তেমনি তোমাদের সব অবস্থাও তিনি জানেন। সেমতে) তিনি (জ্ঞাত হওয়ার দিক দিয়ে) তোমাদের সাথে থাকেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন? (অর্থাৎ তোমরা কোথাও তাঁর কাছ থেকে গোপন থাকতে পার না)। তোমরা যা কিছু কর, তিনি তা দেখেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সব বিষয় তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (অর্থাৎ কিয়ামতে পেশ হবে। এভাবে তওহী-দের সাথে কিয়ামতও প্রমাণিত হয়ে গেল)। তিনিই রাত্রিকে (অর্থাৎ রাত্রির অংশকে) দিনে প্রবিষ্ট করেন, (ফলে দিন বড় হয়ে যায় এবং) তিনিই দিনকে (অর্থাৎ দিনের অংশকে) রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। (ফলে রাত্রি বড় হয়ে যায়। এই শক্তি-সামর্থ্যের সাথে তাঁর জ্ঞান এমন যে) তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ যে পাঁচটি সূরার শুরুতে سبّح অথবা يسبّح আছে, সেগুলোকে হাদীসে مسبّحات তথা তসবীহযুক্ত সূরা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় হাশর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুম'আ এবং পঞ্চম তাগাবুন আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা

করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এসব সূরায় একটি আয়াত এমন আছে, যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে কাসীর বলেন : সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াত :

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

এই পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ হাদীদ, হাশর ও ছফে سَبَّحَ অতীত পদবাচ্য সহকারে এবং জুমু'আ ও তাগাবুনে يُسَبِّحُ ভবিষ্যত পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ্ ও যিকির অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়।—(মাযহারী)

শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিকার : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও।—(ইবনে কাসীর)

এই আয়াতের তফসীর এবং আউয়াল, আখের, যাহের ও বাতেনের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দশটিরও অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই—সবগুলোরই অবকাশ আছে। 'আউয়াল' শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট ; অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। কারো কারো মতে আখেরের অর্থ এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন : كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দুই প্রকার। এক, যা কার্যত বিলীন হয়ে যায়; যেমন, কিয়ামতের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। দুই, যা কার্যত বিলীন হয় না, কিন্তু সত্তাগতভাবে বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে বিদ্যমান অবস্থায়ও ধ্বংসশীল বলা যায়। এর উদাহরণ জান্নাত ও দোযখ এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভাল-মন্দ মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে না; কিন্তু বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহ্র সত্তাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অন্ত।

ইমাম গাযালী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার মারেফত সবার শেষে হয়। এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অন্ত। মানুষ জ্ঞান ও মারেফতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অর্জিত এসব স্তর আল্লাহ্র পথের বিভিন্ন মনযিল বৈ নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে আল্লাহ্র মারেফত।—(রূহুল-মা'আনী)

"যাহের" বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশ্যমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চাইতে অধিক কোন বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তি-সামর্থ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি কণায় কণায় দেদীপ্যমান।

স্বীয় সত্তার স্বরূপের দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা 'বাতেন' তথা অপ্রকাশমান। জ্ঞান-বুদ্ধি ও কল্পনা তাঁর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম নয়। কবি বলেন ঃ

اے برتر از قیاس و گمان خیال و وهم ۔
وز هرچه دیده ایم و شنیده ایم و خوانده ایم
اے برون از جمله قال و قیل من ۔
خاک بر فرق من و تمثیل من ○

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখা-নেই থাকনা কেন। এই 'সঙ্গের' স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানসীমার অতীত। কিন্তু এর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। এটা না হলে মানুষের টিকে থাকা এবং তার দ্বারা কোন কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্র ইচ্ছা ও শক্তি বলেই সবকিছু হয়। তিনি সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র মানুষের সঙ্গে আছেন।

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ
آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝

(৭) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (৮) তোমাদের কি হল না, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছ না, অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন? আল্লাহ্ তো পূর্বেই তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৯) তিনিই তাঁর দাসের প্রতি প্রকাশ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন, যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়ন করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (১০) তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহ্-ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (১১) কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্কে উত্তম ধার দেবে, এরপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং (বিশ্বাস করে) যে ধন-সম্পদে তিনি তোমাদেরকে অপরের উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে (তাঁর পথে) ব্যয় কর। (এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই ধন-সম্পদ তোমাদের পূর্বে অন্যের হাতে ছিল এবং এমনিভাবে তোমাদের পর অপরের হাতে চলে যাবে। সুতরাং এটা যখন চিরস্থায়ী সম্পদ নয়, তখন একে প্রয়োজনীয় খাতেও ব্যয় না করে আগলে রাখা নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি?) অতএব (এই আদেশ মুতাবিক) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং (বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না (এর মধ্যেই রসূলের প্রতি বিশ্বাসও দাখিল আছে)। অথচ (বিশ্বাস স্থাপন করার মজবুত কারণ বিদ্যমান রয়েছে। তা এই যে)

রসূল (যার রিসালত প্রমাণিত) তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি (তাঁরই শিক্ষা মুতাবিক) বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন এবং (দ্বিতীয় কারণ এই যে) স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলে বিশ্বাস স্থাপন করার) অঙ্গীকার নিয়েছেন (এর মোটামুটি প্রতিক্রিয়া তোমাদের স্বভাবেও বিদ্যমান রয়েছে এবং রসূলের আনীত মো'জেযা এবং প্রমাণাদিও তোমাদেরকে এই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। অতএব) যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে চাও, (তবে এসব কারণ যথেষ্ট। নতুবা এছাড়া আর কি কারণের অপেক্ষা করছ? যেমন আল্লাহ্ বলেন: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ অতঃপর এই বিষয়বস্তুর আরও ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে)।

(বিশেষ) বান্দা [মুহাম্মদ (সা)]-এর প্রতি প্রকাশ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, (যা তিনিই তার প্রাঞ্জলতা ও বিশেষ অলৌকিকতার কারণে উদ্দেশ্যকে সুন্দরভাবে বোঝায় যাতে (সেই বান্দা) তোমাদেরকে (কুফর ও মূর্খতার) অন্ধকার থেকে (ঈমান ও জ্ঞানের) আলোকে আনয়ন করেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন: لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (তিনি এমন অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়নকারী তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। এ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন না করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ছিল। এখন ব্যয় না করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে:) তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, অথচ (এরও একটা মজবুত কারণ আছে। তা এই যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিশেষে আল্লাহ্রই থেকে যাবে (অর্থাৎ যখন সব মালিক মরে যাবে এবং তিনিই থেকে যাবেন। সুতরাং সব ধন-সম্পদ যখন একদিন ছাড়তেই হবে, তখন খুশীমনে দিলেই তো সওয়াবও হয়। কোন সৃষ্ট জীব নভোমণ্ডলের মালিক নয়, তবুও নভোমণ্ডল উল্লেখ করে সম্ভবত এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি যেমন নভোমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি, তেমনি ভূমণ্ডলও অবশেষে বাহ্যিকভাবে তাঁরই অধিকারে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে তো বর্তমানেও তাঁরই মালিকানাভুক্ত। مُسْتَخْلَفِينَ শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হল। অতঃপর ব্যয়কারীদের মর্যাদার তারতম্য বর্ণিত হচ্ছে। বিশ্বাস স্থাপন করে ব্যয় করা প্রত্যেকের জন্যই সওয়াবের কারণ, কিন্তু এর মধ্যেও তারতম্য আছে। তা এই যে) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে (এবং যারা মক্কা বিজয়ের পর ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে) তারা (উভয়ই) সমান নয়; (বরং) তারা মর্যাদায় তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যারা (মক্কা বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে প্রত্যেককেই আল্লাহ্ তা'আলা কল্যাণের (অর্থাৎ সওয়াবের) ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা'আলা সব পরিজ্ঞাত

আছেন। (তাই উভয় সময়ের কর্মের জন্য সওয়াব দেবেন। অতএব যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করার সুযোগ পায়নি, আমি তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলি *) কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে উত্তম (অর্থাৎ আন্তরিকতা সহকারে) ধার দেবে। এরপরও আল্লাহ্‌ একে (অর্থাৎ প্রদত্ত সওয়াবকে) তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং (বহুগুণে বৃদ্ধি করার পরও) তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। ('বহুগুণে' বলে পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে এবং كريم বলে এর মানগত উৎকর্ষের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ—এর অর্থ আদিকালীন অঙ্গীকারও হতে পারে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা মখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই ভবিষ্যতে আগমনকারী সব আত্মাকে একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে তিনিই যে তাদের একমাত্র পালনকর্তা এ কথার স্বীকৃতির অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কোরআন পাকে أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى বলে এই অঙ্গীকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই অঙ্গীকারও হতে পারে, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও তাঁদের উম্মতের কাছ থেকে শেষ নবী (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁকে সাহায্য করা সম্পর্কে নিয়েছিলেন। কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এই অঙ্গীকারের উল্লেখ আছে :

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ○

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ—অর্থাৎ যদি তোমরা মু'মিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ কথাটি সেই কাফিরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মু'মিন না হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে 'তোমরা যদি মু'মিন হও' বলা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে ?

জওয়াব এই যে, কাফির ও মুশরিকরাও আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের দাবী করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এই : مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى

إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ — অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের দাবী যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য পথ অবলম্বন কর। এটা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে রসূলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে হতে পারে।

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ — مِيرَاث অভিধানে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক — মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনা-আপনি মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে مِيرَاث শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে যে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ্ তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবশত কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে করে দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না। সর্বতোভাবে আল্লাহ্রই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে আছে, তখন এ থেকে আল্লাহ্র নামে যা ব্যয় করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে। এভাবে যেন আল্লাহ্র পথে ব্যয়কৃত বস্তুর মালিকানা তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন: একদিন আমরা একটি ছাগল যবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বণ্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্য রাখলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: বণ্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে? আমি আরয করলাম: শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেন: গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। কেননা, গোটা ছাগলই আল্লাহ্র পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহ্র কাছে তোমার জন্য থেকে যাবে। যে হাতটি নিজে খাওয়ার জন্য রেখেছ, পরকালে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে।—(মাযহারী)

আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেওয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র পথে যা-কিছু যে কোন সময় ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু ঈমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশত সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছে: لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ — অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক. যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে, দুই. যারা মক্কা বিজয়ের পর মু'মিন হয়ে আল্লাহ্র পথে

ব্যয় করেছে। এই দুই শ্রেণীর লোক আল্লাহর কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় এক শ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জিহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী।

মক্কা বিজয়কে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদাভেদের মাপকাঠি করার রহস্য ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এক. যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং দুই. যারা মক্কা বিজয়ের পর এ কাজে শরীক হয়েছেন। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত সাহাবীগণের মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শেষোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশী।

মক্কা বিজয়কে উভয় শ্রেণীর মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠি করার এক বড় রহস্য তো এই যে, মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুসলমানদের টিকে থাকা ও বিলীন হয়ে যাওয়া, ইসলামের প্রসার লাভ ও বিলোপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিতে একই রূপ ছিল। যারা হুঁশিয়ার ও চালাক, তারা এমন কোন দলে অথবা আন্দোলনে যোগদান করে না, যার পরাজিত হওয়ার অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা সামনে থাকে। তারা পরিণামের অপেক্ষায় থাকে। যখন সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে তখনই তারা তড়িঘড়ি তাতে যোগদান করে। কিছুসংখ্যক লোক আন্দোলনকে সত্য ও ন্যায়ানুগ বিশ্বাস করলেও বিপক্ষ দলের নির্যাতনের ভয়ে ও নিজেদের দুর্বলতার কারণে তাতে যোগ-দান করতে সাহসী হয় না। অপরপক্ষে যারা অসম সাহসী ও দৃঢ়চেতা, তারা কোন মতবাদ ও বিশ্বাসকে সত্য এবং বিশুদ্ধ মনে করলে জয় ও পরাজয় এবং দলের সংখ্যাল্পতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা মুসলমান হয়েছিল, তাদের সামনে মুসলমানদের সংখ্যা-ল্পতা, শক্তিহীনতা ও মুশরিকদের নির্যাতনের এক জাজ্বল্যমান ইতিহাস ছিল। বিশেষত ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করা জীবনের ঝুঁকি নেওয়া এবং বাস্তু-ভিটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর ছিল। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাহায্য এবং ইসলামের সেবায় জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করেছে তাদের ঈমানী শক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার তুলনা চলে কি?

আস্তে আস্তে পরিস্থিতির পট পরিবর্তন হতে থাকে। অবশেষে মক্কা বিজিত হয়ে সমগ্র আরবের উপর ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়। তখন কোরআন পাকের ভাষায় দলে দলে লোকজন এসে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে (يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا) কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত তাদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং তাদেরকে কল্যাণ তথা ক্ষমা ও অনুকম্পার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে একথা বলে দিয়েছে যে, তাদের মর্যাদা পূর্ববর্তীদের সমান হতে পারে না। কারণ

তারা অসম সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তির কারণে বিরোধিতা ও নির্যাতন আশংকার উর্ধ্বে উঠে ইসলাম ঘোষণা করেছে এবং বিপদমুহূর্তে ইসলামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারকথা এই যে, সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তি পরিমাপ করার জন্য মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিস্থিতির ব্যবধান একটি মাপকাঠির মর্যাদা রাখে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই উভয় শ্রেণী সমান হতে পারে না।

সকল সাহাবীর জন্য মাগফিরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং অবশিষ্ট উম্মত থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার পারস্পরিক তারতম্য উল্লেখ করে শেষে বলা হয়েছে ঃ وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى — অর্থাৎ পারস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাত ও মাগফিরাতের ওয়াদা সবার জন্যই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে কিরামের সেই শ্রেণীদ্বয়ের জন্য, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে কিরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। কেননা, তাঁদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি খুবই দুর্লভ, যিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র পথে কিছুই ব্যয় করেন নি এবং ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলায় অংশগ্রহণ করেন নি। তাই মাগফিরাত ও রহমতের এই কোরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে।

ইবনে হাযম (র) বলেন ঃ এর সাথে সূরা আম্বিয়ার অপর একটি আয়াতকে মিলাও, যাতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ○
لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ○

অর্থাৎ যাদের জন্য আমি পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিয়েছি, তারা জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান করবে। জাহান্নামের কষ্টদায়ক আওয়াজও তাদের কানে পৌঁছবে না। তারা পছন্দমত অবদানে চিরকাল বসবাস করবে।

আলোচ্য আয়াতে وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى বলা হয়েছে এবং সূরা আম্বিয়ার এই আয়াতে যাদের জন্য কল্যাণের ওয়াদা করা হয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, কোরআন পাক এই নিশ্চয়তা দেয়—পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ যদি সারা জীবনে কোন গোনাহ্ করেও ফেলেন, তবে তিনি তার উপর কায়েম থাকবেন না—তওবা করে নেবেন। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (স)-র সংসর্গ, সাহায্য, ধর্মের মহান সেবামূলক কার্যক্রম এবং তাঁর অসংখ্য পুণ্যের খাতিরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। গোনাহ্ মাফ হয়ে শুদ্ধ-পবিত্র

হওয়া অথবা পার্থিব বিপদাপদ ও বেশীর বেশী কোন কষ্টের মাধ্যমে গোনাহের কাফফারা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটবে না।

কতক হাদীসে কোন কোন সাহাবীর মৃত্যুর পর আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই আযাব পরকাল ও জাহান্নামের আযাব নয়; বরং বরযখ তথা কবর-জগতের আযাব। এটা অসম্ভব নয় যে, কোন সাহাবী কোন গোনাহ্ করে ঘটনাচক্রে তওবা ব্যতীতই মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবর-জগতের আযাব দ্বারা পবিত্র করে নেওয়া হবে, যাতে পরকালের আযাব ভোগ করতে না হয়।

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা কোরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়—ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয়ঃ সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কিরাম সাধারণ উম্মতের ন্যায় নন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও উম্মতের মাঝখানে আল্লাহ্র তৈরী সেতু। তাঁদের মাধ্যম ব্যতীত উম্মতের কাছে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিক্ষা পৌঁছার কোন পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্যাদা ইতিহাস গ্রন্থের সত্য-মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নয়; বরং কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়।

তাঁদের দ্বারা কোন পদস্খলন বা ভ্রান্তিমূলক কোন কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভুল। যে কারণে সেগুলোকে গোনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না। বরং সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তদ্দ্বারা তাঁরা একটি সওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোন গোনাহ্ হয়েই যায়, তবে প্রথমত তা তাঁদের সারা জীবনের সৎকর্ম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার মুকাবিলায় শূন্যের কোটায় থাকে। দ্বিতীয়ত তাঁরা ছিলেন অসাধারণ আল্লাহ্-ভীরু। সামান্য গোনাহের কারণেও তাঁদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গোনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। কেউ নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন এবং তওবা কবূল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তদবস্থায়ই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলো দ্বারা গোনাহের কাফফারা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের মাগফিরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও করে দিয়েছেন। শুধু মাগ-ফিরাতই নয়, رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি অনুযায়ী অভিশপ্ত হওয়ার কারণ এবং ঈমানকে বিপন্ন করার শামিল।

আজকাল ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা ও গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য বর্ণনার ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক লোক সাহাবায়ে কিরামকে দোষারোপের শিকারে পরিণত করছে। প্রথমত যেসব বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁরা এসব লিখছেন, সেগুলোর ভিত্তিই অত্যন্ত দুর্বল। যদি কোন পর্যায়ে তাদের

সেসব ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মেনেও নেওয়া যায়, তবে কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার মুকাবিলায় তার কোন মর্যাদা নেই। কেননা, কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরাম সবাই ক্ষমাযোগ্য।

সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে সমগ্র উম্মতের সর্বসম্মত বিশ্বাস ঃ সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অন্তরে ভালবাসা পোষণ করা এবং তাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা ওয়াজিব। তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকা এবং যে কোন এক পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত না করা জরুরী। আকায়েদের সকল কিতাবে এই সর্বসম্মত বিশ্বাসের বর্ণনা আছে। ইমাম আহমদের এক পুস্তিকায় বলা হয়েছে ঃ

لا يجوز لا حد ا ن يذ كر شيئا من مسا بهم و لا يطعن على احد منهم بعيب و لا نقص فمن فعل ذالك وجب تا د يبه -

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের কোন দোষ বর্ণনা করা অথবা তাঁদের কাউকে দোষী ও ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করা কারও জন্য বৈধ নয়। কেউ এরূপ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব।—(শরহুল আকিদাতিল ওয়াসেতিয়্যা, ৩৮৯ পৃঃ)

ইবনে তাইমিয়া 'ছারেমুল মসলুল' গ্রন্থে সাহাবায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ করার পর বলেন ঃ

وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين اهل الفقه و اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. و التابعين لهم با حسان و سائر اهل السنة و الجماعة فا نهم مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم و الاستغفار لهم و الترحم عليهم و الترضى عنهم و اعتقاد محبتهم و موالاتهم و عقوبة من اساء فيهم القول -

অর্থাৎ আমাদের জানামতে এ ব্যাপারে আলিম, ফিকহবিদ, সাহাবী, তাবেয়ী ও আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। সবাই একমত যে, সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা, তাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টিবাক্য উচ্চারণ সহকারে তাঁদের উল্লেখ করা এবং তাঁদের প্রতি মহব্বত ও সহৃদয়তার মনোভাব পোষণ করা সকলের জন্য ওয়াজিব। তাঁদের ব্যাপারে কেউ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করলে তাকে শাস্তি দিতে হবে।

ইবনে তাইমিয়া 'শরহে আকিদায়ে ওয়াসেতিয়্যা' গ্রন্থে সমগ্র উম্মত তথা আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস বর্ণনা করে সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে লিখেন ঃ

ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون هذه الاثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما زيد فيها ونقص وغير وجهه

والصحيح منه هم فيه معذورون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون - وهم مع ذالک لا يعتقدون ان کل واحد من الصحابة معصوم من کبائر الاثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب فی الجملة ولهم من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم حتی انهم يغفرلهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم -

অর্থাৎ আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আত সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ ব্যাপারাদিতে নিশ্চুপ থাকেন। তাঁরা বলেন ঃ যেসব রেওয়ায়েত থেকে তাঁদের মধ্যকার কারো দোষ বোঝা যায়, সেগুলোর কতক সম্পূর্ণ মিথ্যা, কতক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত এবং যেগুলো সহীহ্ ও বিশুদ্ধ, সেগুলোর ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ক্ষমার্হ। কেননা, তাঁরা যা কিছু করেছেন, আল্লাহ্র ওয়াস্তে ইজতিহাদের মাধ্যমে করেছেন। এই ইজতিহাদে হয় তাঁরা অভ্রান্ত ছিলেন (তাহলে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী ছিলেন) না হয় ভ্রান্ত ছিলেন। (এমতাবস্থায়ও ক্ষমার্হ ও এক সওয়াবের অধিকারী ছিলেন)। এসব সত্ত্বেও আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন না যে, প্রত্যেক সাহাবী সর্বপ্রকার গোনাহ্ থেকে মুক্ত; বরং তাঁদের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাঁদের গুণ-গরিমা ও ইসলামের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষামূলক কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যেতে পারে, এমনকি তাঁদের এমন সব গোনাহ্ও মাফ হতে পারে, যা উম্মতের পরবর্তী লোকদের মাফ হবে না।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم بُشْرَىٰكُمُ الْيَوْمَ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَٰفِقُونَ وَالْمُنَٰفِقَٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِىُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ

مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ۚ هِيَ

مَوْلٰىكُمْ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾ اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ

قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ

اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۚ

وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿١٦﴾ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ

مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧﴾ اِنَّ

الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ

وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ

الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَاۤءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۚ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٩﴾

(১২) সেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখ ভাগে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে। বলা হবে ঃ আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য। (১৩) সেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নেব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে ঃ তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। (১৪) তারা মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজে-দেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহর আদেশ পৌঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে। (১৫) অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফিরদের কাছ থেকেও নয়। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল! (১৬) যারা মু'মিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার

সময় আসেনি ? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (১৭) তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ই ভূভাগকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের জন্য আয়াতগুলো ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বুঝ। (১৮) নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহ্কে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (১৯) আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কাফির ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সেদিনও স্মরণীয়) যে দিন আপনি মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখভাগে ও ডান পার্শ্বে ছুটোছুটি করবে। (পুলসিরাত অতিক্রম করার জন্য এই জ্যোতি তাদের সাথে থাকবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, বাম পার্শ্বেও থাকবে। বিশেষভাবে ডান পার্শ্ব উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এদিককার জ্যোতি অধিক উজ্জ্বল হবে এবং এটা আলামত হবে তাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়ার। সম্মুখভাগে জ্যোতি থাকা এরূপ স্থলে সাধারণ রীতি। তাদেরকে বলা হবে ঃ) আজ তোমাদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য (বাহ্যত এই শেষোক্ত বাক্যটিও তখনই বলা হবে। এখন সংবাদ হিসাবে বলা হয়েছে ঃ بُشْرٰى لَكُمْ কথাটি সম্ভবত ফেরেশতাগণ বলবে, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَنْ لَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا অথবা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন। এটা সেদিন) যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুসলমানদেরকে (পুলসিরাতে) বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য (একটু) অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের জ্যোতি থেকে একটু আলো নেব। (এটা তখন হবে, যখন মুসলমান ঈমান ও আমলের কল্যাণে অনেক অগ্রে চলে যাবে এবং মুনাফিকরা পুলসিরাতের উপর পেছনে অন্ধকারে থেকে যাবে। তাদের কাছে পূর্ব থেকেই জ্যোতি থাকবে না, কিংবা দুররে-মনসূরের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের কাছেও কিছুটা জ্যোতি থাকবে, কিন্তু তা নির্বাপিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতে বাহ্যিক কাজ-কর্মে তারা মুসলমানদের সাথে থাকত, এ কারণে তাদেরকে কিছুটা জ্যোতি দেওয়া হবে। কিন্তু অন্তরে তারা মুসলমানদের কাছ থেকে আলাদা থাকত, এ কারণে তাদের জ্যোতি বিলীন হয়ে যাবে। এছাড়া তাদের প্রতারণার শাস্তিও তাই যে, প্রথমে জ্যোতি পাবে ও পরে

তা বিলীন হয়ে যাবে)। তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হবেঃ (হয় ফেরেশতাগণ জওয়াব দেবে, না হয় মু'মিনগণ) তোমরা পেছনে ফিরে যাও ও (সেখানে) আলোর সন্ধান কর। (পেছনে বলে সেই স্থান বোঝানো হয়েছে যেখানে ভীষণ অন্ধকারের পর পুলসিরাতে আরোহণ করার সময় জ্যোতি বণ্টন করা হয়েছিল। অর্থাৎ যেখানে জ্যোতি বণ্টন করা হয় সেখানে চলে যাও। সেমতে তারা সেখানে যাবে এবং কিছু না পেয়ে আবার এখানে আসবে)। অতঃপর (মুসলমানদের কাছে পৌঁছতে পারবে না বরং) উভয় দলের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে, যার একটি দরজা (ও) হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে আযাব। (দুররে মনসুরের বর্ণনা অনুযায়ী এটাই আ'রাফের প্রাচীর। অভ্যন্তর ভাগ মু'মিনদের দিকে এবং বহির্ভাগ কাফিরদের দিকে থাকবে। রহমতের অর্থ জান্নাত এবং আযাবের অর্থ জাহান্নাম। দরজাটি সম্ভবত কথাবার্তা বলার জন্য হবে অথবা এটাই হবে জান্নাতের পথ। মোটকথা, যখন তাদের ও মুসলমানদের মাঝখানে প্রাচীর স্থাপিত হবে এবং তারা অন্ধকারে থেকে যাবে, তখন) তারা মুসলমানদেরকে ডেকে বলবেঃ আমরা কি (দুনিয়াতে) তোমাদের সাথে ছিলাম না? (অর্থাৎ কাজেকর্মে ও ইবাদতে তোমাদের সাথে শরীক ছিলাম। অতএব আজও সঙ্গে থাকা উচিত)। তারা (মুসলমানরা) বলবেঃ হ্যাঁ (ছিলে) কিন্তু (এরূপ থাকা কোন কাজের? তোমরা কেবল দৃশ্যত আমাদের সাথে ছিলে। তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল এই যে) তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে পথভ্রষ্ট করে রেখেছিলে (তোমরা পয়গম্বর ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে এবং তাদের উপর বিপদাপদ আসার) প্রতীক্ষা করেছিলে, (ইসলামের সত্যতায়) সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং মিথ্যা আশা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল, অবশেষে তোমাদের উপর আল্লাহর আদেশ পৌঁছে গেছে। (মিথ্যা আশা এই যে, ইসলাম মিটে যাবে, আমাদের ধর্ম সত্য ও মুক্তিদাতা ইত্যাদি। 'আল্লাহর আদেশ' মানে মৃত্যু। অর্থাৎ সারাজীবন এসব কুফরীতেই লিপ্ত ছিলে, তওবাও করনি)। মহাপ্রতারক (অর্থাৎ শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল। (একথা বলে যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। সারকথা এই যে, এসব কুফরীর কারণে তোমাদের বাহ্যত সঙ্গে থাকা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়)। অতএব আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফিরদের কাছ থেকেও নয়। (প্রথমত মুক্তিপণ দেওয়ার মত বস্তু তোমাদের কাছে নেই, যদি থাকত তবুও গ্রহণ করা হত না। কেননা এটা প্রতিদান জগৎ—কর্মজগৎ নয়)। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের (চির) সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!

(فاليوم الخ কথাটি হয় মু'মিনদের না হয় আল্লাহ্ তা'আলার। এই পুরোপুরি বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ঈমানে প্রয়োজনীয় ইবাদতের অভাব আছে, তা পূর্ণ নয়। তাই পরবর্তী আয়াতে ঈমান পূর্ণ করার জন্য শাসানোর ভঙ্গিতে মুসলমানদেরকে আদেশ করা হচ্ছেঃ) যারা মু'মিন, তাদের (মধ্যে যারা প্রয়োজনীয় ইবাদতে ত্রুটি করে, যেমন গোনাহ্‌গার মুসলমান তাদের) জন্য কি (এখনও) আল্লাহর উপদেশের এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার সামনে হৃদয়-বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? (অর্থাৎ তাদের

মনেপ্রাণে জরুরী ইবাদত পালনে এবং গোনাহ্ বর্জনে কৃতসংকল্প হওয়া উচিত)। তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে (ঐশী) কিতাব দেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের মত। তারাও তাদের কিতাবের দাবীর বিপক্ষে খেয়াল-খুশী ও গোনাহে লিপ্ত হয়েছিল)। অতঃপর তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয় (এবং তওবা করেনি)। ফলে তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে যায়। (ভুলক্রমেও তারা অনুতাপ করত না। অন্তরের এই কঠোরতার কারণে আজ) তাদের অধিকাংশই কাফির (কারণ, সদাসর্বদা গোনাহে লেগে থাকা, গোনাহ্‌কে ভাল মনে করা, সত্য নবীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করা, এসব বিষয় প্রায়ই কুফরের কারণ হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের শীঘ্রই তওবা করা উচিত। কারণ, মাঝে মাঝে পরে তওবা করার তওফীক হয় না এবং মাঝে মাঝে তা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমাদের অন্তরে গোনাহের কারণে কোন অনিষ্ট সৃষ্টি হয়ে থাকলে এই ধারণাবশত তওবা থেকে বিরত থেকো না যে, এখন তওবা করলে কি ফায়দা হবে? বরং তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলাই মাটিকে শুকিয়ে যাওয়ার পর সবুজ-সতেজ করেন। (এমনিভাবে তওবা করলে স্বীয় অনুগ্রহে মৃত অন্তরকে তিনি জীবিত করে দেন। অতএব নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কেননা) আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বুঝ। (অতঃপর পূর্বোল্লিখিত ব্যয়ের ফযীলত বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী যারা আল্লাহ্‌কে আন্তরিকতা সহকারে ধার দেয়, তাদের দান তাদের জন্য (সওয়াবের দিক দিয়ে) বহুগুণে বাড়ানো হবে এবং (এরপরও) তাদের জন্য রয়েছে পছন্দনীয় পুরস্কার। (অতঃপর উল্লিখিত ঈমানের ফযীলত বলা হচ্ছে) ঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে, তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ। (অর্থাৎ পূর্ণত্বের এসব স্তর পূর্ণ ঈমান দ্বারাই অর্জিত হয়। শহীদ তাকে বলা হয়, যে নিজের প্রাণকে আল্লাহ্‌র পথে পেশ করে দেয় যদিও নিহত না হয়। কারণ, নিহত হওয়া ইচ্ছা বহির্ভূত কাজ। তাদের জন্য জান্নাতে) রয়েছে তাদের (উপযুক্ত বিশেষ) পুরস্কার এবং (পুলসিরাতে রয়েছে বিশেষ) জ্যোতি। আর যারা কাফির ও আমার আয়াত অস্বীকারকারী, তারাই জাহান্নামী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে।

'সেদিন' বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেওয়ার ব্যাপারটি পুলসিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি নাতিদীর্ঘ। এতে আছে যে, আবু উমামা (রা) একদিন দামেশ্‌কে এক জানাযায় শরীক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে

মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেওয়া হল ঃ

অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিলে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেওয়া হবে। অপর এক মনযিলে সমবেত সব মু'মিন ও কাফিরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মু'মিনকে নূর দেওয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মু'মিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেওয়া হবে। ফলে কারও নূর পর্বতসম, কারও খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারও মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে; তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। —(ইবনে কাসীর)

অতঃপর হযরত আবু উমামা (রা) বলেন ঃ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে নূর দেওয়া হবে না। কোরআন পাক এই ঘটনা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেছে ঃ

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا - وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ -

তিনি আরও বলেন, মু'মিনদেরকে যে নূর দেওয়া হবে, তা দুনিয়ার নূরের মত হবে না। দুনিয়ার নূর দ্বারা আশেপাশের লোকেরাও আলো লাভ করতে পারে। অন্ধ ব্যক্তি যেমন চক্ষুমান ব্যক্তির চোখের জ্যোতি দ্বারা দেখতে পারে না তেমনি মু'মিনের নূর দ্বারা কোন কাফির ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে না।—(ইবনে কাসীর)

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা)-র এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, যে মনযিলে গভীর অন্ধকারের পর নূর বণ্টন করা হবে, সেই মনযিল থেকেই কাফির মুনাফিকরা নূর থেকে বঞ্চিত হবে, তারা কোন প্রকার নূর পাবেই না।

কিন্তু তিবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

পুলসিরাতের নিকটে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনকে নূর দান করবেন এবং প্রত্যেক মুনাফিককেও। কিন্তু পুলসিরাতে পৌঁছা মাত্রই মুনাফিকদের নূর ছিনিয়ে নেওয়া হবে।—(ইবনে কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, মুনাফিকদেরকেও প্রথমে নূর দেওয়া হবে। কিন্তু পুল-সিরাতে পৌঁছার পর তা বিলীন হয়ে যাবে। বাস্তবে যাই হোক, মুনাফিকরা তখন মু'মিনগণকে অনুরোধ করবে—একটু আস, আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা একটু উপকৃত হই। কারণ, দুনিয়াতেও নামায, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি কাজে আমরা তোমাদের অংশীদার ছিলাম। তাদের এই অনুরোধের নেতিবাচক জওয়াব দেওয়া হবে, যা পরে বর্ণিত হবে। প্রথমে মুনাফিকদেরকেও মুসলমানদের ন্যায় নূর দেওয়া এবং পরে তা ছিনিয়ে নেওয়াই তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ, তারা দুনিয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টায়ই লেগে থাকত। কাজেই কিয়ামতে তাদের সাথে তদ্রূপ ব্যবহারই করা হবে। তাদের সম্পর্কে কোরআন পাক বলেঃ يُخَادِعُونَ

اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহ্কে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে ধোঁকা দেন। ইমাম বগভী বলেনঃ এই ধোঁকার অর্থ তাই যে, প্রথমে তাদেরকে নূর দেওয়া হবে, এরপর ঠিক প্রয়োজন মুহূর্তে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এ সময়ে মু'মিনগণও তাদের নূর বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে। তাই তারা শেষ-পর্যন্ত নূর বহাল রাখার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এর উল্লেখ আছে ঃ

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا ـ

মুসলিম, আহমদ ও দারে-কুতনীতে বর্ণিত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র বর্ণিত হাদীসেও বলা হয়েছে ঃ প্রথমে মু'মিন ও মুনাফিক—উভয় সম্প্রদায়কে নূর দেওয়া হবে, এরপর পুলসিরাতে পৌঁছে মুনাফিকদের নূর বিলীন হয়ে যাবে।

উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে যেসব মুনাফিক ছিল, তারাই আসল মুনাফিক। তারা প্রথম থেকেই কাফিরদের ন্যায় নূর পাবে না। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের পরও এই উম্মতে মুনাফিক হবে। তবে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাদেরকে 'মুনাফিক' নাম দেওয়া যাবে না। অকাট্য ওহী ব্যতীত কাউকে মুনাফিক বলার অধিকার উম্মতের কারও নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জানেন কার অন্তরে ঈমান আছে এবং কার অন্তরে নেই। অতএব আল্লাহ্র জ্ঞানে যারা মুনাফিক হবে, তাদেরকে প্রথমে নূর দিয়ে পরে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

এই উম্মতে এ ধরনের মুনাফিক তারা, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোরআন ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করে।—(নাউযুবিল্লাহি মিনহু)

হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকার কি কি কারণে হবে ঃ তফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকারের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল ঃ

১. আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রা)-র রেওয়ায়েতে এবং ইবনে মাজা বর্ণিত হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যারা অন্ধকার রাত্রে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। এই বিষয়বস্তুরই রেওয়ায়েত হযরত সাহ্ল ইবনে সাদ, যায়দ ইবনে হারেসা, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, হারেসা ইবনে ওয়াহাব, আবূ উমামা, আবূদ্দারদা, আবূ সাঈদ, আবূ মূসা, আবূ হুরায়রা, আয়েশা সিদ্দীকা (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকেও বর্ণিত আছে।

২. মসনদে আহমদ ও তিবরানী বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من حافظ على الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাঞ্জেগানা নামায যথাসময়ে ও যথানিয়মে আদায় করে, কিয়ামতের দিন এই নামায তার জন্য নূর, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যথাসময়ে ও যথানিয়মে নামায আদায় করে না, তার জন্য নূর প্রমাণ ও মুক্তির কারণ কিছুই হবে না। সে কারূন, হামান ও ফিরাউনের সাথে থাকবে।

৩. তিবরানী বর্ণিত আবূ সায়ীদ (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য মক্কা মোকাররমা পর্যন্ত বিস্তৃত নূর হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে—যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হবে।

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআনের একটি আয়াতও তিলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন সেই আয়াত তার জন্য নূর হবে।—(মসনদে আহমদ)

৫. দায়লামী বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার প্রতি দরূদ পাঠ পুলসিরাতে নূরের কারণ হবে।

৬. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার হজ্জের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ হজ্জ ও ওমরার ইহ্রাম খোলার জন্য যে মাথা মুণ্ডন করা হয়, তাতে মাটিতে পতিত কেশ কিয়ামতের দিন নূর হবে।—(তিবরানী)

৭. হযরত ইবনে মসউদ (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, মিনায় কংকর নিক্ষেপ কিয়ামতের দিন নূর হবে।—(মসনদে-বাযযার)

৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি আছে যে, মুসলমান অবস্থায় যার মাথার চুল সাদা হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন সেই চুল তার জন্য নূর হবে।—(তিরমিযী)

৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদে একটি তীরও নিক্ষেপ করবে, কিয়ামতের দিন সেই তীর তার জন্য নূর হবে।—(বাযযার)

১০. হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি বাজারে আল্লাহ্র যিকির করে, সে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে কিয়ামতের দিন একটি নূর পাবে।—(বায়হাকী)

১১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ ও কষ্ট দূর করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য পুলসিরাতে নূরের দু'টি শাখা করে দেবেন, তদ্দ্বারা এক জাহান আলোকিত হয়ে যাবে।—(তিবরানী)

১২. বুখারী ও মুসলিম ইবনে ওমর (রা) থেকে, মুসলিম হযরত জাবের (রা) থেকে, হাকেম হযরত আবূ হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রা) থেকে এবং তিবরানী ইবনে যিয়াদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, اياكم و الظلم فانه هو الظلمات يوم القيامة অর্থাৎ তোমরা জুলুম ও নিপীড়ন থেকে বেঁচে থাক। জুলুমই কিয়ামতের দিন অন্ধকারের রূপ লাভ করবে।

نعوذ بالله من الظلمات ونسأله النور التام يوم القيامة

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ—অর্থাৎ যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে : আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা উপকৃত হই।

قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا— অর্থাৎ তাদেরকে বলা হবে : যেখানে নূর বন্টন হয়েছিল, সেখানে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান কর। এ কথা মু'মিনগণ বলবে অথবা ফেরেশতাগণ জওয়াব দেবে।

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ

الْعَذَابُ—অর্থাৎ মু'মিন অথবা ফেরেশতাগণের জওয়াব শুনে মুনাফিকরা সে স্থানে ফিরে গিয়ে কিছুই পাবে না। আবার এদিকে আসবে, কিন্তু তখন তারা মু'মিনগণের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তাদের ও মু'মিনগণের মাঝখানে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হবে। এর অভ্যন্তরভাগে মু'মিনদের জায়গায় থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে মুনাফিক-দের জায়গায় থাকবে আযাব।

রূহুল-মা'আনীতে ইবনে যায়েদ (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, এটা হবে মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যবর্তী আ'রাফের প্রাচীর। অপর কয়েকজনের মতে এটা ভিন্ন প্রাচীর হবে। এতে যে দরজা থাকবে, এটা হয় মু'মিন ও কাফিরদের পারস্পরিক কথাবার্তা বলার জন্য, না হয় মু'মিনগণ এই দরজা দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার পর তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

নূরের ব্যাপারে কোরআনে কাফিরদের কোন উল্লেখই হয়নি। কারণ তাদের নূর পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। মুনাফিকদের নূর সম্পর্কে বিবিধ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম থেকেই তারা নূর পাবে না কিংবা পাওয়ার পর পুলসিরাতে উঠতেই নিভিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাদের ও মু'মিনদের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে। এই সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, শুধু মু'মিনগণই পুলসিরাত দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করবে। কাফির ও মুশরিকরা পুলসিরাতে উঠবে না। তাদেরকে জাহান্নামের প্রবেশপথ দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মু'মিনগণ পুলসিরাতের পথ অতিক্রম করবে। পাপী মু'মিনগণকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ কিছু দিন জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। তারা পুলসিরাত থেকে নিম্নে পতিত হয়ে জাহান্নামে পৌঁছবে। অন্যান্য মু'মিন নিরাপদে পুলসিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।—(শাহ্ আঃ কাদের দেহলভী)

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ—অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকির এবং যে সত্য নাযিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্র ও বিগলিত হবে?

خشوع قلب—এর অর্থ অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবূল করা ও আনুগত্য করা।—(ইবনে কাসীর) কোরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি পালন করার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া।—(রূহুল-মা'আনী)

এটা মু'মিনদের জন্য হুঁশিয়ারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন মু'মিনের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ

করে এই আয়াত নাযিল করেন।—(ইবনে কাসীর) ইমাম আ'মাশ বলেন ঃ মদীনায় পৌঁছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোন কোন সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(রূহুল-মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে, এই হুঁশিয়ারি সংকেত কোরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাযিল হয়। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়।

মোটকথা, এই হুঁশিয়ারির সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎ-কর্মের জন্য তৎপর থাকার শিক্ষা দেওয়া এবং একথা ব্যক্ত করা যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎ কর্মের ভিত্তি।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা উঠিয়ে নেওয়া হবে।—(ইবনে কাসীর)

প্রত্যেক মু'মিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ? وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মু'মিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদাহ্ ও আমর ইবনে মায়মূন (রা) বলেন, যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দীক ও শহীদ।

হযরত বারা ইবনে আযেবের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ مؤمنوا متى شهداء অর্থাৎ আমার উম্মতের সব মু'মিন শহীদ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।—(ইবনে জরীর)

একদিন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র কাছে কিছু সংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ كلكم صديق و شهيد অর্থাৎ আপনারা প্রত্যেকেই সিদ্দীক ও শহীদ। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ আবূ হুরায়রা, আপনি এ কি বলছেন? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ আমার কথা বিশ্বাস না করলে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করুন ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ—

কিন্তু কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মু'মিন সিদ্দীক ও শহীদ নয়, বরং মু'মিনদের একটি উচ্চ শ্রেণীকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই ঃ

أُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ -

এই আয়াতে পয়গম্বরগণের সাথে মু'মিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে যথা—সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্। বাহ্যত এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন ঃ সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মু'মিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণীর লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণ-গরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মু'মিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মু'মিনকেও কোন-না-কোন দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাঁদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে।

রূহুল-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামিল ও ইবাদতকারী মু'মিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুনা যেসব মু'মিন অনবধান ও খেয়ালখুশীতে মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ اللعانون لا يكونون شهداء অর্থাৎ যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হযরত ওমর ফারূক (রা) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেন ঃ তোমাদের কি হল যে, তোমরা কাউকে অপরের ইয্যতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে কর না ? জনতা আরয করল ঃ আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইয্যতের উপর হামলা চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদের মুকাবিলায় সাক্ষ্য দেবে।—(রূহুল-মা'আনী)

তফসীরে মাযহারীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আয়াতে هُمُ الصِّدِّيقُونَ বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র সাহাবায়ে কিরামই সিদ্দীক, অন্য কোন মু'মিন নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরাম সকলেই পয়গম্বরসুলভ গুণ-গরিমার বাহক ছিলেন। যে ব্যক্তি একবার মু'মিন অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছে, সেই পয়গম্বরসুলভ গুণ-গরিমায় নিমজ্জিত হয়েছে।

اِعْلَمُوٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ

نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۗ وَفِي الْاٰخِرَةِ
عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۗ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾

(২০) তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীত বর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ বৈ কিছু নয়। (২১) তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য। এটা আল্লাহ্‌র কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্ মহান কৃপার অধিকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

জেনে রাখ, (পরকালের মুকাবিলায়) পার্থিব জীবন (কিছুতেই কাম্য হবার যোগ্য নয়। কেননা, এটা নিছক) ক্রীড়া-কৌতুক, (বাহ্যিক) সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা (অর্থাৎ শক্তি, সৌন্দর্য ও কলাকৌশল নিয়ে) এবং ধনে ও জনে পারস্পরিক প্রাচুর্য লাভের প্রয়াস ব্যতীত কিছু নয়। (অর্থাৎ পার্থিব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই ঃ শৈশবে ক্রীড়া-কৌতুক, যৌবনে জাঁকজমক ও অহমিকা এবং বার্ধক্যে ধন ও জনের প্রবল বড়াই থাকে। এসব উদ্দেশ্য ধ্বংসশীল ও কল্পনা বিশ্বাস মাত্র। এর দৃষ্টান্ত এরূপ) যেমন বৃষ্টি (বর্ষিত হয়), যার বদৌলতে উৎপন্ন ফসল কৃষককে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুষ্ক হয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীত বর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। (এমনিভাবে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী বসন্ত, এরপর পতন ও অনুশোচনা মাত্র। পক্ষান্তরে) পরকালে আছে (দুটি বিষয়, একটি কাফিরদের জন্য) কঠিন শাস্তি এবং (অপরটি মু'মিনদের জন্য) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। (এই উভয় বিষয় চিরস্থায়ী। সুতরাং পরকাল চিরস্থায়ী এবং)

পার্থিব জীবন নিছক (ধ্বংসশীল, যেমন মনে করে) প্রতারণার সামগ্রী। (সুতরাং পার্থিব সম্পদ যখন ধ্বংসশীল এবং পরকালের ধন চিরস্থায়ী, তখন তোমাদের উচিত) তোমাদের পালনকর্তার দিকে এবং এমন জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান (অর্থাৎ এর চাইতে কম নয়, বেশী হতে পারে) এটা প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের জন্য, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটা অর্থাৎ ক্ষমা ও সন্তুষ্টি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। (এতে ইঙ্গিত আছে যে, কেউ যেন নিজ আমলের কারণে গর্বিত না হয় এবং জান্নাত দাবী না করে বসে। জান্নাত নিছক আমার অনুগ্রহ, যা লাভ করা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর-শীল। কিন্তু আমি নিজ কৃপায় যারা এসব আমল করে, তাদের সাথে আমার ইচ্ছাকে জড়িত করেছি। ইচ্ছা না করাও আমার ক্ষমতাধীন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরকালীন চিরস্থায়ী অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের জন্য পরকালের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আযাবে গ্রেফতার হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তাতে নিমগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদা-সীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়।

পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই ঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজসজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

لعب শব্দের অর্থ এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার লক্ষ্য থাকে না; যেমন কচি শিশুদের অঙ্গ চালনা। لهو এমন খেলাধূলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন ও সময় ক্ষেপণ হলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোন উপকারও অর্জিত হয়ে যায়। যেমন বড় বালকদের ফুটবল, লক্ষ্যভেদ অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদ অর্জন ও সাঁতার অনুশীলনকে উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لعب এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لهو শুরু হয়, এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সম-সাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তরেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জ্ঞান করে। কিন্তু যখন এক স্তর ডিঙিয়ে অন্য স্তরে গমন করে, তখন বিগত স্তরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বালক-বালিকারা খেলাধূলাকে জীবনের সম্পদ ও সর্ববৃহৎ ধন মনে করে। কেউ তাদের খেলার সামগ্রী ছিনিয়ে নিলে

তারা এত ব্যথা পায়, যেমন বয়স্কদের ধনসম্পদ, কুঠি, বাংলো ছিনিয়ে নিলে তারা ব্যথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলে পরে তারা বুঝতে পারে যে, যেসব বস্তুকে তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থ-হীন বস্তু। যৌবনে সাজসজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকাই থাকে জীবনের লক্ষ্য। বার্ধক্যে ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু যৌবনে যেমন শৈশবের কার্যকলাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্ধক্যে পৌঁছেও তেমনি যৌবনের কার্যকলাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের সর্বশেষ মনযিল। এ মনযিলে ধন ও জনের প্রাচুর্য এবং জাঁকজমক ও পদের জন্য গর্ব জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোরআন পাক বলে যে, এই অবস্থাও সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর পরবর্তী দুটি স্তর বরযখ ও কিয়ামতের চিন্তা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর কোরআন পাক বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে ঃ

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا

غَيْثٍ—শব্দের অর্থ বৃষ্টি। كُفَّار শব্দটি মু'মিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোন কোন তফসীর-বিদ كُفَّار শব্দটিকে প্রসিদ্ধ অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফিররা আনন্দিত হয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ-শ্যামল ফসল দেখে কাফিররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসল-মানরাও হয়। জওয়াব এই যে, মু'মিনের আনন্দ ও কাফিরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মু'মিন আনন্দিত হলে তার চিন্তাধারা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এই সুন্দর ফসল আল্লাহ্র কুদরত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরত্ন পেয়েও মু'মিন কাফিরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে 'কাফির আনন্দিত হয়' বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ-শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফিররা খুবই আন-ন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীত বর্ণ হয়, এর পরে সম্পূর্ণ খড়কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য—পরকালের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ অর্থাৎ পরকালে মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে-কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফিরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য কঠোর আযাব রয়েছে। অপরটি মু'মিনদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এখানে প্রথমে আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রথম আয়াতে উল্লিখিত দুনিয়া নিয়ে মাতাল ও উদ্ধত হওয়ার পরিণামও কঠোর আযাব। কঠোর আযাবের বিপরীতে দুটি বিষয় ক্ষমা ও সন্তুষ্টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইঙ্গিত আছে যে, পাপ মার্জনা করা একটি নিয়ামত, যার পরিণতিতে মানুষ আযাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু পরকালে এতটুকুই হয় না; বরং আযাব থেকে বাঁচার পর মানুষ জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামত দ্বারাও ভূষিত হয়। এটা রিযওয়ান তথা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে : وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ — অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর পরকালের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশী করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে :

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোন ভরসা নেই; অতএব সৎ কাজে শৈথিল্য ও টালবাহানা করো না। এরূপ করলে কোন রোগ অথবা ওযর তোমার সৎ কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎ কাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌঁছতে পার।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎ কাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। হযরত আলী (রা) তাঁর উপদেশাবলীতে বলেন : তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমনকারী এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ বলেন : জিহাদে

সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্য অগ্রসর হও। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ জামা'আতের নামাযে প্রথম তকবীরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর।—(রূহুল-মা'আনী)

জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আলে-ইমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سموات বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ বোঝানো হয়েছে: অর্থ এই যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্র করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ ঐ পৃথিবীর আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী—عرض শব্দটি কোন সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতি বোঝা যায়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ—পূর্বের আয়াতে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জান্নাত ও তার অক্ষয় নিয়ামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্য যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জান্নাত লাভের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নিয়ামত লাভ করেছে, তার সারাজীবনের সৎ কর্ম এগুলোর বিনিময়ও হতে পারে না, জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামতরাজির মূল্য হওয়া দূরের কথা। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বুখারী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না—আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি।
—(মাযহারী)

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا
فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝
لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۭ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۝ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ
وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ

الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

(২২) পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না ; কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। (২৩) এটা এজন্য বলা হল, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না, (২৪) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না, কিন্তু তা (সবই) এক কিতাবে (অর্থাৎ লওহে মাহফুযে) লিপিবদ্ধ থাকে প্রাণসমূহকে সৃষ্টি করার পূর্বেই (অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল বিপদ পূর্ব-অবধারিত)। এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ কাজ। (সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তিনি লিপিবদ্ধ করে দেন। কারণ, তিনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। এটা এজন্য বলা হল) যাতে তোমরা যা হারাও (স্বাস্থ্য, সন্তান-সন্ততি অথবা ধনসম্পদ), তজ্জন্য (অতটুকু) দুঃখিত না হও, (যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষণে ও পরকালের কাজে মশগুল হওয়ার পথে বাধা হয়ে যায়। নতুবা স্বাভাবিক দুঃখ করলে কোন ক্ষতি নেই) এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, (সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় দিয়েছেন মনে করে) তজ্জন্য উল্লসিত না হও (কারণ, যার ব্যক্তি অধিকার আছে, সে-ই উল্লসিত হতে পারে। এখানে তো আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছায় ও নির্দেশে দিয়েছেন। কাজেই উল্লসিত হওয়ার কোন অধিকার নেই)। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না; (অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর কারণে অহংকার অর্থে مختال শব্দ এবং বাহ্যিক ধনসম্পদ, পদ ইত্যাদির কারণের অহংকার অর্থে প্রায়ই فخور শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতঃপর কৃপণতার নিন্দা করা হচ্ছে ঃ) যারা (দুনিয়ার মোহে) নিজেরাও (আল্লাহ্র পছন্দনীয় খাতে ব্যয় করতে) কৃপণতা করে (যদিও খেয়াল-খুশী ও পাপ কাজে ব্যয় করতে মুক্তহস্ত থাকে) এবং (এই পাপও করে যে) অপরকে কৃপণতার আদেশ দেয়। (الَّذِيْنَ —ব্যাকরণিক কায়দায় بدل , কিন্তু এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, শাস্তির আদেশ সবগুলো কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বরং প্রত্যেকটি মন্দ স্বভাবের জন্য শাস্তির আদেশ উচ্চারিত হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার মোহ এমন যে, এর সাথে অধিকাংশ মন্দ স্বভাবের সমাবেশ ঘটেই যায়—অহংকার, গর্ব, কৃপণতা ইত্যাদি) যে ব্যক্তি (সত্য ধর্ম থেকে, যার এক শাখা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি করে না। কারণ, তিনি (সকলের ইবাদত ও ধন-সম্পদ থেকে) অভাবমুক্ত, (এবং স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে) প্রশংসার্হ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দু'টি পার্থিব বিষয় মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফিল করে দেয়। এক. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। দুই. বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ ও আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا—অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে-মাহ্ফুযে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ—আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলা লওহে মাহ্ফুযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভালমন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী চিন্তাভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহ্র স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফিল হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোন কোন বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোন কোন বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব হাসিল করতে হবে।—(রূহুল-মা'আনী)

পরবর্তী আয়াতে সুখ ও ধনসম্পদের কারণে উদ্ধত ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে ঃ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ—অর্থাৎ আল্লাহ্ উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নিয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহ্র কাছে ঘৃণার্হ। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও

পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা করা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

(২৫) আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ জেনে নেবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (এই পরকাল সংশোধনের জন্য) আমার রসূলগণকে স্পষ্ট বিধানাবলীসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও (এতে বিশেষভাবে ন্যায়নীতি যা বান্দার হকের ব্যাপারে) ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে (এতে স্বল্পতা ও বাহুল্য বর্জিত সমগ্র শরীয়ত অন্তর্ভুক্ত আছে)। আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি (যাতে এর ভয়ে বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ হয়ে যায়) এবং (এছাড়া) মানুষের বহুবিধ উপকার। (সেমতে অধিকাংশ যন্ত্রপাতি লৌহনির্মিত হয়ে থাকে। আরও এজন্য লৌহ সৃষ্টি করা হয়েছে) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নেন কে (তাঁকে) না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে (অর্থাৎ ধর্মের কাজে) সাহায্য করে। (কেননা, লৌহ জিহাদেও কাজে আসে। এটা লোহার পারলৌকিক উপকার। জিহাদের নির্দেশ এজন্য নয় যে, তিনি এর মুখাপেক্ষী। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা (নিজে) শক্তিধর পরাক্রমশালী (বরং তোমাদের সওয়াবের জন্য এই নির্দেশ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঐশী কিতাব ও পয়গম্বর প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা : وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ

وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ -

بينات শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলীও হতে পারে, যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য মো'জেযা এবং রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে।—(ইবনে কাসীর) পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাযিলের আলাদা উল্লেখ বাহ্যত শেষোক্ত তফসীরের সমর্থক। অর্থাৎ بينات বলে মো'জেযা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্য কিতাব নাযিল করার কথা বলা হয়েছে।

কিতাবের সাথে 'মীযান' নাযিল করারও উল্লেখ আছে। মীযানের আসল অর্থ পরিমাপযন্ত্র। প্রচলিত দাঁড়িপাল্লা ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ওজন করার জন্য নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও 'মীযান'-এর অর্থে শামিল আছে; যেমন আজকাল আলো, উত্তাপ ইত্যাদি পরিমাপযন্ত্র প্রচলিত আছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মীযানের বেলায়ও নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গম্বরগণ পর্যন্ত পৌঁছা সুবিদিত। কিন্তু মীযান নাযিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তফসীরে রূহুল-মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মীযান নাযিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাযিল করা। কুরতুবী বলেন: প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আরবদের বাক-পদ্ধতিতে এর নযীর বিদ্যমান আছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ: اَنْزَلْنَا الْكِتَابَ وَوَضَعْنَا الْمِيْزَانَ অর্থাৎ আমি কিতাব নাযিল করেছি ও দাঁড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। সূরা আর-রহমানের وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে ميزان শব্দের সাথে وضع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, নূহ (আ)-এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নাযিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যে ওজন করে দায়দেনা পূর্ণ করতে হবে।

কিতাব ও মীযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাযিল করার মানে সৃষ্টি করা। কোরআন পাকের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাযিল

করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাযিল হয় না—পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহু পূর্বেই লওহে মাহ্‌ফুযে লিখিত ছিল—এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ—(রূহুল মা'আনী)।

আয়াতে লৌহ নাযিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। এক. এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে আল্লাহ্‌র বিধান ও ন্যায়-নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। দুই. এতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোন শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পয়গম্বরগণও আসমানী কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। 'মীযান' ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোন প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিতাব ও মীযানকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করেছে। কিতাব থেকে দেনা-পাওনা পরিশোধ ও তাতে হ্রাস-বৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় এবং মীযান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনার অংশ নির্ধারিত হয়। এই বস্তুদ্বয় নাযিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকল্পে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃত-পক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রের তরফ থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্য নয়; বরং পথের বাধা দূর করার জন্য বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে। চিন্তাধার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ — রূহুল মা'আনীতে আছে, এখানে و অব্যয়টি এই বাক্যকে একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ لِيَنْفَعَهُمْ — আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর দ্বারা শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্ জেনে নেন কে লৌহের সমরাস্ত্র দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে ও ধর্মের জন্য জিহাদ করে। আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। কিন্তু মানুষ কাজ করার পর তা আমলনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

(২৬) আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি। অতঃপর তাদের কতক সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে

এবং অধিকাংশই হয়েছে পাপাচারী। (২৭) অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে ও তাকে দিয়েছি ইঞ্জীল। আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (২৮) হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দেবেন, তোমাদেরকে দেবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২৯) যাতে কিতাবধারীরা জানে যে, আল্লাহ্র সামান্য অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই, দয়া আল্লাহ্রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (মানুষের এই পরকাল সংশোধনের জন্যই) নূহ ও ইবরাহীম (আ)-কে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং আমি তাদের বংশধরগণের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি (অর্থাৎ তাদের বংশধরগণের মধ্যেও কতককে পয়গম্বর এবং কতককে কিতাবধারী করেছি)। অতঃপর (যাদের কাছে পয়গম্বরগণ আগমন করেছেন) তাদের কতক সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। [উপরোক্ত পয়গম্বরগণ স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কিতাবধারীও ছিলেন; যেমন নূহ ও ইবরাহীম (আ) উভয়ের বংশধরের মধ্যে মূসা (আ) কেউ কেউ কিতাবধারী ছিলেন না, কিন্তু তাদের শরীয়ত স্বতন্ত্র ছিল; যেমন হূদ ও সালেহ (আ) মোটকথা, স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছি]। অতঃপর তাদের পশ্চাতে আরও রসূলগণকে (যারা স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী ছিলেন না) একের পর এক প্রেরণ করেছি [যেমন মূসা (আ)-র পর তওরাতের বিধানাবলী প্রয়োগ করার জন্য অনেক পয়গম্বর আগমন করেন] এবং তাদের অনুগামী করেছি (একজন স্বতন্ত্র শরীয়তধারী পয়গম্বরকে; অর্থাৎ) মরিয়ম-তনয় ঈসাকে এবং তাকে দিয়েছি ইঞ্জীল। (তার উম্মতে দুই প্রকার লোক ছিল —তার অনুগামী ও তাকে প্রত্যাখ্যানকারী)। যারা অনুসরণ করেছিল (অর্থাৎ প্রথম প্রকার আমি তাদের অন্তরে (পারস্পরিক) স্নেহ ও মমতা (যা প্রশংসনীয় গুণ) সৃষ্টি করে দিয়েছি (যেমন সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ কিন্তু তাদের শরীয়তে জিহাদ ছিল না বলে এর বিপরীতে أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ উল্লেখ করা হয়নি। মোটকথা স্নেহ-মমতাই তাদের মধ্যে প্রবল ছিল। আমি তাদেরকে কেবল বিধানাবলী

পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু অনুসারীদের কেউ কেউ এমন ছিল যে) তারা নিজেরাই সন্ন্যাসবাদ উদ্ভাবন করেছে। [বিবাহ এবং বৈধ ভোগ-বিলাস ও মেলামেশা ত্যাগ করাই ছিল তাদের সন্ন্যাসবাদের সারমর্ম। এটা উদ্ভাবনের কারণ ছিল এই যে, ঈসা (আ)-র পর যখন খৃস্টানরা আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে থাকে, তখন কিছুসংখ্যক সত্যপরায়ণ লোক নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করত। এটা প্রবৃত্তিপূজারীদের সহ্য করার কথা ছিল না। তাই তারা বাদশাহ্‌র কাছে অনুরোধ করল যে, এদেরকে আমাদের মতাবলম্বী হতে বাধ্য করা হোক। অতঃপর সত্যপরায়ণ লোকদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হলে তারা সন্ন্যাসবাদ অবলম্বন করতে বাধ্য হয় এবং সবার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে নির্জন প্রকোষ্ঠে বসে অথবা ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে।—(দুররে-মনসূর) এখানে তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সন্ন্যাসবাদ উদ্ভাবন করে]। আমি তাদের উপর এটা ফরয করিনি, কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য (ধর্মের হিফাযতের জন্য) এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা (অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই)। তা (অর্থাৎ সন্ন্যাসবাদ) যথাযথভাবে পালন করেনি। [অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা এটা অবলম্বন করেছিল কিন্তু এই উদ্দেশ্যের প্রতি তেমন যত্নবান হয়নি এবং বিধানাবলী পালন করেনি— কেবল দৃশ্যত সন্ন্যাসবাদ প্রকাশ করেছে। এভাবে সন্ন্যাসীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। বিধানাবলী যথাযথ পালনকারী ও বিধানাবলীতে শৈথিল্যকারী। তাদের মধ্যে যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমসাময়িক ছিল, তাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বিধানাবলী পালনের একটি শর্ত ছিল। তারা বিধানাবলী পালন করেছে। আর যারা এই শর্ত পালন করেনি, তারা যথাযথভাবে বিধানাবলী পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি]। তাদের মধ্যে যারা [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি] বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের (প্রাপ্য) পুরস্কার দিয়েছি (কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম) এবং তাদের অধিকাংশ ছিল পাপাচারী। [তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। যেহেতু অধিকাংশই অবিশ্বাসী ছিল। তাই فَمَا رَعَوْهَا বাক্যে যথাযথ পালন না করার বিষয়টি সবার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অল্পসংখ্যক যারা বিশ্বাসী ছিল, তাদের কথা আয়াতের শেষে فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত খৃস্টানদের মধ্যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দুই শ্রেণীরই উল্লেখ করা হল। অতঃপর বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে :) হে [ঈসা (আ)-এ বিশ্বাসী] মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং (এই ভয়ের দাবী অনুযায়ী) তাঁর রসূল (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি স্বীয় অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দেবেন (যেমন সূরা কাসাসে আছে, أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ এবং) তোমাদেরকে এমন জ্যোতি দেবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে। (অর্থাৎ এমন ঈমান দেবেন যা এখান থেকে পুলসিরাত পর্যন্ত সাথে থাকবে)। এবং তোমাদেরকে ক্ষমা

করবেন। (কারণ, ইসলাম গ্রহণ করলে কাফির থাকাকালীন সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (এসব ধন তোমাদেরকে এজন্য দেবেন) যাতে (কিয়ামতের দিন) কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপর ও (রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত) তাদের কোন ক্ষমতা নেই, (এবং আরও জেনে নেয় যে) দয়া আল্লাহ্র হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন (সেমতে তিনি মুসলমানদেরকে দান করেছেন)। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অহমিকা যেন চূর্ণ হয়ে যায়। তারা বর্তমান অবস্থাতেও নিজেদেরকে আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়ার পাত্র মনে করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পার্থিব হিদায়ত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পয়গম্বর প্রেরণ এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও মীযান অবতারণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁদের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আ)-র এবং পরে পয়গম্বরগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত পয়গম্বর ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তাঁরা সব এঁদেরই বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ নূহ (আ)-র সেই শাখাকে এই গৌরব অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে হযরত ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা সব ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর।

এই বিশেষ আলোচনার পর পয়গম্বরগণের সমগ্র পরম্পরাকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে : ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا অর্থাৎ এরপর তাঁদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আ)-র উল্লেখ করে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً —অর্থাৎ যারা হযরত ঈসা (আ) অথবা ইঞ্জীলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। رحمت ও رافت শব্দদ্বয়কে সমার্থবোধক মনে করা হয়। এখানে ভিন্নমুখী করে উল্লেখ করায় কেউ কেউ বলেন : رأفة এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ দয়ার চাইতে এতে যেন আতিশয্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : কারও প্রতি দয়া করার দু'টি অভ্যাসগত

কারণ থাকে। এক. সে কষ্টে পতিত থাকলে তার কষ্ট দূর করে দেওয়া। একে رأفة বলা হয়। দুই. কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে رحمت বলা হয়। মোটকথা رأفة এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং رحمت এর সম্পর্ক উপকার অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সবদিক দিয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই এই শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে رأفت-কে অগ্রে আনা হয়।

এখানে হযরত ঈসা (আ)-র সাহাবী তথা হাওয়ারীগণের দু'টি বিশেষ গুণ رأفت ও رحمت উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহাবায়ে কিরামের কয়েকটি বিশেষ গুণ সূরা ফাত্হ-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

কিন্তু এর আগে সাহাবায়ে কিরামের আরও একটি বিশেষ গুণ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ও বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ তাঁরা কাফিরদের প্রতি বজ্রকঠোর। পার্থক্যের কারণ এই যে, ঈসা (আ)-র শরীয়তে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান ছিল না। তাই কাফিরদের বিপক্ষে কঠোরতা প্রকাশ করার কোন স্থানই সেখানে ছিল না।

সন্ন্যাসবাদের অর্থ ও জরুরী ব্যাখ্যা : وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوهَا—رهبانية শব্দটি رهبان এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। رهبان ও راهب-এর অর্থ যে ভয় করে। হযরত ঈসা (আ)-র পর বনী ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত রাজন্যবর্গ ও শাসকশ্রেণী ইঞ্জীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক খাঁটি আলিম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাঁড়ালে তাঁদেরকে হত্যা করা হল। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তাঁরা দেখলেন যে, মুকাবিলার শক্তি তাদের নেই; কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাদের ধর্মও বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্য জরুরী করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দেবেন, বিয়ে করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দেবেন, যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তাঁরা আল্লাহ্র ভয়ে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তাই তাঁরা راهب অথবা رهبان তথা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হত এবং তাঁদের উদ্ভাবিত মতবাদ رهبانيت তথা সন্ন্যাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ করল।

তাদের এই মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারক হয়ে নিজেদের ধর্মের হিফাযতের জন্য ছিল। তাই এটা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোন বিষয়কে আল্লাহ্‌র জন্য নিজে-দের উপর অপরিহার্য করে নেওয়ার পর তাতে ত্রুটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুতর পাপ। উদা-হরণত মানত আসলে কারও উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোন ব্যক্তি নিজে কোন বস্তুকে মানত করে নিজের উপর হারাম অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরীয়তের আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা গোনাহ্ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কতক লোক সন্ন্যাসবাদের নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। কেননা, জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং হাদিয়া ও নযর-নিয়ায আগমন করতে থাকে। তাদের চারপাশে মানুষের ভীড় জমে উঠে। ফলে বেহায়াপনা ও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক এ বিষয়েই তাদের সমালোচনা করেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ-বিলাস বিসর্জন দেওয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল—আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফরয করা হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও ঠিকমত পালন করতে পারেনি।

তাদের এই কর্মপন্থা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-র হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি দল আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দলটি হযরত ঈসা (আ)-র পর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ ও ঐশ্বর্যশালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে রুখে দাঁড়ায়, সত্যের বাণী সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অশুভ শক্তির মুকা-বিলায় পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়। তাদের স্থলে অপর একদল দণ্ডায়মান হয়। তাদের মুকাবিলা করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, কিন্তু তারা জীবনপণ করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়। পরিণামে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। কতককে করাত দ্বারা চিরা হয় এবং কতককে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, এরপর তৃতীয় দল তাদের জায়গায় আসে। তাদের মধ্যে মুকাবিলারও শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে থেকে নিজেদের ধর্ম বরবাদ করারও তারা পক্ষপাতী ছিল না। তাই তারা জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ বেছে নেয় এবং সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা وَرَهْبَانِيَّةَنِ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সন্ন্যাসবাদ অবলম্বন করে তা যথাযথভাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে সবর করেছে, তারাও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতের এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, যে ধরনের সন্ন্যাসবাদ প্রথমে

তারা অবলম্বন করেছিল, তা নিন্দনীয় ও মন্দ ছিল না। তবে সেটা শরীয়তের বিধানও ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর তা জরুরী করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরী করার পর কেউ কেউ একে যথাযথভাবে পালন করেনি। এখান থেকেই এর নিন্দনীয় ও মন্দ দিক শুরু হয়। যারা পালন করেনি, তাদের সংখ্যাই বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই অধিকাংশের কাজকে সবার কাজ ধরে নিয়ে কোরআন গোটা বনী ইসরাঈল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, তারা যে সন্ন্যাসবাদকে নিজেদের উপর জরুরী করে নিয়েছিল তা যথাযথ পালন করেনি— فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

এ থেকে আরও জানা গেল যে, اِبْتَدَعُوْا শব্দটি بدعت থেকে উদ্ভূত হলেও এ স্থলে এর আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ উদ্ভাবন করা। এখানে পারিভাষিক বিদ'আত বোঝানো হয়নি, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে كل بدعة ضلالة অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা ফুটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাক্যের প্রতিই লক্ষ্য করুন ঃ

—وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ামত প্রকাশ করার জায়গায় বলেছেন ঃ আমি তাদের অন্তরে স্নেহ, দয়া ও সন্ন্যাসবাদ সৃষ্টি করেছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, স্নেহ ও দয়া যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনি তাদের অবলম্বিত সন্ন্যাসবাদও সত্তাগতভাবে নিন্দনীয় ছিল না। নতুবা এ স্থলে একে স্নেহ ও দয়ার সাথে উল্লেখ করার কোন কারণ ছিল না। এ কারণেই যারা সন্ন্যাসবাদকে সর্বাবস্থায় দূষণীয় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে বাক্যের সাথে رَهْبَانِيَّةً শব্দটির সংযুক্তির ব্যাপারে অনাবশ্যক ব্যাকরণিক হেরফেরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা বলেন যে, এখানে رَهْبَانِيَّةً শব্দের আগে اِبْتَدَعُوْا বাক্যটি উহ্য আছে। ইমাম কুরতুবী তাই বলেছেন। কিন্তু উপরোক্ত তফসীর অনুযায়ী এই হেরফেরের কোন প্রয়োজন থাকে না। এরপরও কোরআন পাক তাদের এই উদ্ভাবনের কোনরূপ বিরূপ সমালোচনা করেনি ; বরং সমালোচনা এ বিষয়ের কারণে করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের উদ্ভাবিত এই সন্ন্যাসবাদ যথাযথ পালন করেনি। এটাও اِبْتِدَاع শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে নিলেই সম্ভবপর। পারিভাষিক অর্থে হলে কোরআন স্বয়ং এর বিরূপ সমালোচনা করত। কেননা, পারিভাষিক বিদ'আতও একটি পথভ্রষ্টতা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর পূর্বোক্ত হাদীসেও সন্ন্যাসবাদ অবলম্বনকারী দলকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল গণ্য করা হয়েছে। তারা যদি পারিভাষিক বিদ'আতের অপরাধে অপরাধী হত, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়—পথভ্রষ্টদের মধ্যে গণ্য হত।

সন্ন্যাসবাদ সর্বাবস্থায়ই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ : বিশুদ্ধ কথা এই যে, رهبانية শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি স্তর আছে। এক. কোন অনুমোদিত ও হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করা। এই অর্থে সন্ন্যাসবাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ, এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি। কোরআন পাকের يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা ও অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে لَا تُحَرِّمُوا শব্দটিই ব্যক্ত করছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র হালালকৃত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পরিবর্তন ও বিকৃত করার নামান্তর।

দুই. অনুমোদিত কাজকর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করে না, কিন্তু কোন পার্থিব কিংবা ধারায় প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পার্থিব প্রয়োজন যেমন কোন রোগব্যাধির আশংকা করে কোন অনুমোদিত বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় প্রয়োজন—যেমন, পরিণামে কোন গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকায় কোন বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণত মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে মেলামেশাই বর্জন করে; কিংবা কোন কুস্বভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন পর্যন্ত কোন কোন বৈধ কাজ বর্জন করে তা ততদিন অব্যাহত রাখা, যতদিন কুস্বভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদকে কম আহার, কম নিদ্রা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ, এটা প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসবাদ নয়; বরং তাক্ওয়া যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে প্রমাণিত।

তিন. কোন্ অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আছে সেরূপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই সওয়াব ও উত্তম মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনেক হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে لا رهبانية فى الاسلام অর্থাৎ ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে যে সন্ন্যাসবাদের গোড়াপত্তন হয়, তা ধর্মের হিফাযতের প্রয়োজনে হলে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ তাকওয়ার মধ্যে দাখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্তর অর্থাৎ হালালকে হারাম করা পর্যন্ত পৌঁছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজের অপরাধী হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ—এই আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাসী কিতাবধারী মু'মিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন করাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি। ইহুদী ও খৃস্টানদের বেলায় 'আহলে-কিতাব' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-র প্রতি তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। কাজেই তারা الَّذِينَ آمَنُوا কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারণ রীতির বিপরীতে খৃস্টানদের জন্য الَّذِينَ آمَنُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এটাই হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক সওয়াব হযরত মূসা (আ) অথবা ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাঁদের শরীয়ত পালন করার এবং দ্বিতীয় সওয়াব শেষ নবী (সা)-র প্রতি ঈমান ও তাঁর শরীয়ত পালন করার। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কাফির ছিল এবং কাফিরদের কোন ইবাদত গ্রহণীয় নয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিগত শরীয়তানুযায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফির মুসলমান হয়ে গেলে তার কাফির অবস্থায় কৃত সব সৎ কর্ম বহাল করে দেওয়া হয়। ফলে সে দুই সওয়াবের অধিকারী হয়।

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ এখানে لا অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত বিধানাবলী এজন্য বর্ণনা করা হলো, যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা লাভের যোগ্য নয়। যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা আল্লাহ্র কৃপা লাভে সমর্থ হবে।

سورة المجادلة

সূরা মুজাদালা

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ ২২ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ
وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ
مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِيْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ
لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝ وَالَّذِيْنَ
يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ
قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ
لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَتِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ
اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্‌র

কাছে অভিযোগ করছে, আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ্ আপনাদের উভয়ের কথা-বার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (২) তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৩) যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফ্ফারা এই ঃ একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দেবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ হবে। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর। (৪) যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এজন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৫) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অপদস্থ হয়েছে, যেমন অপদস্থ হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (৬) সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, যা তারা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত আছে সব বস্তু।

অবতরণের হেতু ঃ একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত অবতরণের হেতু। হযরত আউস ইবনে সামেত (রা) একবার তাঁর স্ত্রী খাওলাকে বলে দিলেন ঃ انت على كظهر امى অর্থাৎ তুমি আমার পক্ষে আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়, মানে হারাম। ইসলাম-পূর্বকালে এই বাক্যটি চিরতরে হারাম করার জন্য স্ত্রীকে বলা হত, যা চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর। এই ঘটনার পর হযরত খাওলা (রা) শরীয়তসম্মত বিধান জানার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। তখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন ঃ ما اراك الا قد حرمت عليه অর্থাৎ আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছ। খাওলা একথা শুনে বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছি। এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল। আমি কোথায় যাব। আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ কিরূপে হবে। এক রেওয়ায়েতে খাওলার এ উক্তিও বর্ণিত আছে ঃ ما ذكر طلاقا অর্থাৎ আমার স্বামী তো তালাক উচ্চারণ করেনি। এমতাবস্থায় তালাক কিরূপে হয়ে গেল? অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, খাওলা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করলেন ঃ اللهم انى اشكوا اليك অর্থাৎ আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে অভিযোগ করছি। এক রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) খাওলাকে একথা বললেন ঃ

ما امرت فى شانك بشئى حتى الان অর্থাৎ তোমার মাস'আলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোন বিধান অবতীর্ণ হয়নি (এসব রেওয়ায়েতে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই সঠিক হতে পারে)। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। —(দুররে-মনসূর, ইবনে কাসীর) ফিকহ্র পরিভাষায় এই বিশেষ মাস'আলাটিকে 'জিহার' বলা হয়। এই সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে জিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাওলা (রা)-র ফরিয়াদ শুনে তার জন্য তার সমস্যা সহজ করে দিয়েছেন। তার খাতিরে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে এসব আয়াত নাযিল করেছেন। তাই সাহাবায়ে কিরাম এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রা) একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন। পথিমধ্যে এই মহিলা সামনে এসে দণ্ডায়মান হলে তিনি দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন। কেউ কেউ বলল: আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে রাখলেন। খলীফা বললেন: জান ইনি কে? এ সেই মহিলা, যার কথা আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশের উপরে শুনেছেন। অতএব আমি কি তাঁর কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহ্র কসম, তিনি যদি স্বেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তাঁর সাথে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম।—(ইবনে কাসীর)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে নারী তার স্বামী সম্পর্কে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল (এবং বলছিল: ما ذكر طلاقا অর্থাৎ সে তো তালাক উচ্চারণ করেনি। অতএব আমি কিরূপে হারাম হয়ে গেলাম?) এবং (নিজের দুঃখ ও কষ্টের জন্য) আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করছিল (এবং বলছিল: اللهم انى اشكوا اليك) আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ্ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (অতএব তার কথা শুনবেন না কেন? 'আল্লাহ্ শুনেছেন' কথার উদ্দেশ্য এই নারীর দুঃখ-কষ্ট দূর করা এবং তার অক্ষমতা মেনে নেওয়া আল্লাহ্র জন্য শ্রবণ সপ্রমাণ করা নয়)। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণের সাথে জিহার করে (এবং انت على كظهر امى বলে দেয়) সেই স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। (তাই এই কথা বলার কারণে এই মহিলারা তাদের মাতা হয়ে যায়নি যে, চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। চিরতরে হারাম হওয়ার অন্য কোন দলীলভিত্তিক কারণও নেই। অতএব তারা চিরতরে হারাম হবে না)। তারা (অর্থাৎ যারা স্ত্রীগণকে মাতা বলে দেয়) নিঃসন্দেহে অসঙ্গত ও মিথ্যা কথাই বলে। (তাই পাপ অবশ্যই হবে। এই পাপের ক্ষতিপূরণ করে দিলে তা মাফও হয়ে যাবে। কেননা) আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। (অতঃপর এই ক্ষতিপূরণের কতক উপায় বর্ণনা করা হচ্ছে:) যারা তাদের স্ত্রীগণের সাথে জিহার করে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে (অর্থাৎ স্ত্রী হারাম হোক এটা চায় না) তাদের কাফ্ফারা এই: (স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে) একে অপরকে

স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্ত করতে হবে। এটা (অর্থাৎ কাফ্ফারার বিধান) তোমাদের জন্য উপদেশ হবে; (কাফ্ফারা দ্বারা গোনাহ্ মার্জনা ছাড়া এই উপকারও হবে যে, ভবিষ্যতের জন্য তোমরা সতর্ক হবে। আল্লাহ্ তোমাদের সব ক্রিয়াকর্মের খবর রাখেন। (অর্থাৎ কাফ্ফারা সম্পর্কিত আদেশ তোমরা পুরোপুরি পালন কর কিনা, তা তিনি জানেন। সুতরাং কাফ্ফারার রহস্য দুটি। এক. পাপ মার্জনা, যার প্রতি لعفو غفور এ ইঙ্গিত আছে, দুই. সতর্ককরণ, যা توعظون বাক্যে বিধৃত হয়েছে। তিন প্রকার কাফ্ফারার মধ্যেই এই দ্বিতীয় রহস্য নিহিত আছে। কিন্তু দাস মুক্ত করাকে প্রথমে উল্লেখ করার কারণে একে এর সাথে বলে দেওয়া হয়েছে)। যার এ সামর্থ্য নেই (অর্থাৎ দাস মুক্ত করতে সক্ষম নয়) সে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে (স্বামী-স্ত্রী উভয়ে) পরস্পরে মেলামেশা করার পূর্বে। অতঃপর যে এতেও অক্ষম সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। (অতঃপর এই বিধান যে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে। কারণ, এই বিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মূর্খতা যুগের প্রাচীন প্রথাকে উচ্ছেদ করা। তাই ইরশাদ হচ্ছে:) এটা এজন্য (বর্ণিত হয়েছে), যাতে (এই বিধান সম্পর্কিত উপযোগিতাসমূহ অর্জন করা ছাড়াও) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর (অর্থাৎ এই বিধানের ব্যাপারে তাঁদেরকে সত্যবাদী মনে কর। অতঃপর আরও তাকীদ করার জন্য ইরশাদ হচ্ছে:) এগুলো আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধি)। কাফিরদের জন্য (যারা এসব বিধান মানে না) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (যারা আদেশ পালনে ত্রুটি করে, তাদের জন্যও সাধারণ শাস্তি হতে পারে। শুধু এই বিধানেরই বিশেষত্ব নেই, বরং) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে যে কোন বিধানে করুক, যেমন মক্কার কাফির সম্প্রদায়) তারা (দুনিয়াতেও) লাঞ্ছিত হবে, যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা লাঞ্ছিত হয়েছে। (সেমতে একাধিক যুদ্ধে এটা হয়েছে। শাস্তি কেন হবে না? কারণ) আমি সুস্পষ্ট বিধানাবলী অবতীর্ণ করেছি। (অতএব এগুলো না মানা অবশ্যই শাস্তির কারণ। এ শাস্তি দুনিয়াতে হবে) আর কাফিরদের জন্য (পরকালেও) অপমানজনক শাস্তি আছে (এই শাস্তি সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তারা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন আর তারা তা ভুলে গেছে (প্রকৃতই কিংবা নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়ার দিক দিয়ে) আল্লাহ্ সব বস্তু সম্পর্কে অবগত। (তাদের ক্রিয়াকর্ম হোক কিংবা অন্য কিছু)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قد سمع الله—পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব আয়াতে উল্লিখিত নারী হলেন হযরত আউস ইবনে সামেত (রা)-র স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামী তাঁর সাথে জিহার করেছিলেন। তিনি এই অভিযোগ নিয়ে রসূল করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সম্মান দান করে জওয়াবে এসব আয়াত নাযিল করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এসব আয়াতে কেবল জিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা এবং তাঁর কষ্ট দূর করার ব্যবস্থাই করেন নি; বরং তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য শুরুতেই বলে দিলেন: যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। একবার জওয়াব দেওয়া সত্ত্বেও মহিলা বারবার নিজের কষ্ট বর্ণনা করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আয়াতে একেই تجادلك বলা হয়েছে। কতক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) জওয়াবে খাওলাকে বললেন: তোমার ব্যাপারে আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিধান নাযিল হয়নি। তখন দুঃখিনীর মুখে একথা উচ্চারিত হল: আপনার প্রতি তো প্রত্যেক ব্যাপারে বিধান নাযিল হয়। আমার ব্যাপারে কি হল যে, ওহীও বন্ধ হয়ে গেল।—(কুরতুবী) এরপর খাওলা আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। এর প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন: সেই সত্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়াজ ও প্রত্যেকের আওয়াজ শুনলেন; খাওলা বিনতে সা'লাবা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোন কোন কথা শুনতে পারিনি। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সব শুনেছেন এবং বলেছেন: قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ—(বুখারী, ইবনে কাসীর)

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ—يظاهرون শব্দটি ظهار থেকে উদ্ভূত। স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে ظهار বলা হয়। এটা ইসলাম-পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। পদ্ধতিটি এই: স্বামী স্ত্রীকে বলে দেবে—انت على كظهر امى অর্থাৎ তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের মত হারাম। এখানে পেটই আসল উদ্দেশ্য, কিন্তু রূপকভঙ্গিতে পৃষ্ঠদেশের উল্লেখ করা হয়েছে। —(কুরতুবী)

জিহারের সংজ্ঞা ও বিধান: শরীয়তের পরিভাষায় জিহারের সংজ্ঞা এই: আপন স্ত্রীকে চিরতরে হারাম মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রমুখের এমন অঙ্গের সাথে তুলনা করা যা দেখা তার জন্য নাজায়েয। মাতার পৃষ্ঠদেশও এক দৃষ্টান্ত। মূর্খতা যুগে এই বাক্যটি চিরতরে হারাম বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হত এবং তালাক শব্দ অপেক্ষাও গুরুতর মনে করা হত। কারণ তালাকের পর প্রত্যাহার অথবা পুনর্বিবাহের মাধ্যমে আবার স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু জিহার করলে মূর্খতা যুগের প্রথা অনুযায়ী তাদের স্বামী-স্ত্রী হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত এই প্রথার দ্বিবিধ সংস্কার সাধন করেছে, প্রথমত স্বয়ং জিহারের প্রথাকেই অবৈধ ও গোনাহ্ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ কাম্য হলে তার বৈধ পন্থা হচ্ছে তালাক। সেটা অবলম্বন করা

দরকার। জিহারকে এ কাজের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা, স্ত্রীকে মাতা বলে দেওয়া একটা অসার ও মিথ্যা বাক্য। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ অর্থাৎ তাদের এই অসার উক্তির কারণে স্ত্রী মাতা হয়ে যায় না। মাতা তো সে-ই, যার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে ঃ এরপর বলেছে ঃ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا অর্থাৎ তাদের এই উক্তি মিথ্যা এবং পাপও। কারণ, বাস্তব ঘটনার বিপরীতে স্ত্রীকে মাতা বলছে।

দ্বিতীয় সংস্কার এই করেছে যে, যদি কোন মূর্খ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরীয়তে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তাকে দেওয়া হবে না। বরং তাকে জরিমানাস্বরূপ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফ্ফারা আদায় করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কাফ্ফারা আদায় না করলে স্ত্রী হালাল হবে না।

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا আয়াতের অর্থ তাই। এখানে لِمَا قَالُوا শব্দটি عَمَّا قَالُوا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আপন উক্তি প্রত্যাহার করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) يَعُودُونَ শব্দের অর্থ করেন يَنْدَمُونَ—অর্থাৎ একথা বলার পর তারা অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়।—(মাযহারী)

এই আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ জিহার কাফ্ফারার কারণ নয়। বরং জিহার করা এমন গোনাহ্, যার কাফ্ফারা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াতের শেষে إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তি যদি জিহার করার পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করা না-জায়েয। স্ত্রী দাবী করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা তালাক দিয়ে মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী স্বেচ্ছায় এরূপ না করলে স্ত্রী আদালতে রুজু হয়ে স্বামীকে এরূপ করতে বাধ্য করতে পারে।

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ—অর্থাৎ জিহারের কাফ্ফারা এই যে, একজন দাস অথবা

দাসীকে মুক্ত করবে। এরূপ করতে সক্ষম না হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশত অতগুলো রোযা রাখতেও সক্ষম না হলে ষাটজন মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে আহার করাবে। আহার করানোর পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে জন প্রতি একজনের ফিতরা পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওজনে একজনের ফিতরার পরিমাণ হচ্ছে পৌনে দুসের গম।

জিহারের বিস্তারিত বিধান ও কাফ্ফারার মাস'আলা ফিকহ্র কিতাবসমূহে দ্রষ্টব্য।

হাদীসে আছে, খাওলা বিনতে সা'লাবার ফরিয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আলোচ্য আয়াতসমূহে জিহারের বিধান অবতীর্ণ হল তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তার স্বামীকে ডাকলেন। দেখা গেল যে, সে একজন ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন বৃদ্ধ লোক। তিনি তাকে আয়াত ও কাফ্ফারার বিধান শুনিয়ে বললেনঃ একজন দাস অথবা দাসী মুক্ত করে দাও। সে বললঃ একজন দাস ক্রয় করে মুক্ত করার মত আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। তিনি বললেনঃ তা হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখ। সে বললঃ সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করেছেন—আমার অবস্থা এই যে, আমি দিনে দুতিন বার আহার না করলে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। তিনি বললেনঃ তা হলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে আরয করলঃ আপনি সাহায্য না করলে এরূপ করার সামর্থ্যও আমার নেই। অগত্যা রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কিছু গম দিলেন এবং অন্যরাও কিছু গম চাঁদা তুলে এনে দিল। এভাবে ষাটজন মিসকীনকে ফিতরার পরিমাণে গম দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা হলো।—(ইবনে কাসীর)

ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ—এই আয়াতে ঈমান বলে শরীয়ত ও বিধানাবলী পালন বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছেঃ কাফ্ফারা ইত্যাদির বিধান আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। এই সীমা ডিঙানো হারাম। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইসলাম বিবাহ, তালাক, জিহার ও অন্যান্য সব ব্যাপারে মূর্খতা যুগের প্রথা-পদ্ধতি বিলোপ করে সুষম ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। যারা এসব সীমা মানে না তথা কাফির, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ—পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্র সীমা ও ইসলামের বিধানাবলী পালন করার তাকীদ ছিল। এই আয়াতে বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এতে পার্থিব লাঞ্ছনা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যর্থতা এবং পরকালে কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ—এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে

পাপাচার করে যায় এবং তা তার স্মরণও থাকে না। স্মরণ না থাকার কারণ হচ্ছে একে মোটেই গুরুত্ব না দেওয়া। কিন্তু তার সব পাপাচার আল্লাহ্‌র কাছে লিখিত আছে। আল্লাহ্ তা'আলার সব স্মরণ আছে। এজন্য আযাব হবে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوٰى
ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ
وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ۖ
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ
لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝
يٰأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا إِذَا تَنٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنٰجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنٰجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ إِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا
وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝
يٰأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللّٰهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ ۙ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ يٰأَيُّهَا
الَّذِينَ اٰمَنُوا إِذَا نٰجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ
صَدَقَةً ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ۝ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

(৭) আপনি কি ভেবে দেখেন নি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৮) আপনি কি ভেবে দেখেন নি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুষা করে। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে, যদ্দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে সালাম করেন নি। তারা মনে মনে বলে ঃ আমরা যা বলি, তজ্জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই জায়গা! (৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না এবং অনুগ্রহ ও আল্লাহ্‌ভীতির ব্যাপারে কানাকানি করো। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (১০) এই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ; মু'মিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মু'মিনদের উচিত আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। (১১) হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় ঃ মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন। যখন বলা হয় ঃ উঠে যাও তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর। (১২) হে মু'মিনগণ! তোমরা রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদ্কা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদ্কা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? অতঃপর তোমরা যখন সদ্কা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর।

শানে-নুযূল ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ কয়েকটি ঘটনা। এক. ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু ইহুদীরা যখন কোন মুসলমানকে

দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে পরস্পরে কানাকানি শুরু করে দিত। মুসলমান ব্যক্তি মনে করত যে, তার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইহুদীদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা বিরত হল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

দুই. মুনাফিকরাও এমনিভাবে পরস্পরে কানাকানি করত। এর পরিপ্রেক্ষিতে اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا আয়াত নাযিল হয়। তিন. ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলে দুষ্টুমির ছলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার পরিবর্তে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলত। سَام শব্দের অর্থ মৃত্যু। চার. মুনাফিকরাও এমনিভাবে বলত। উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে কাসীর ইমাম আহমদ (র) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, ইহুদীরা এভাবে সালাম করে চুপিসারে বলত ঃ

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ—অর্থাৎ আমাদের এই গোনাহের কারণে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? পাঁচ. একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) সুফ্ফা মসজিদে অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদে অনেক লোক সমাগম ছিল। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থান পেলেন না। মজলিসের লোকজনও চেপে চেপে বসে স্থান করে দিল না। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই নির্বিকার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মুনাফিকরা 'এটা কেমন ইনসাফ' বলে আপত্তি জানাল। রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বললেন ঃ আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন, যে আপন ভাইয়ের জন্য জায়গা খালি করে দেয়। এরপর লোকেরা জায়গা খালি করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

—(ইবনে কাসীর) রেওয়ায়েতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে জায়গা খালি করে দেওয়ার কথা বলে থাকবেন। কেউ কেউ খালি করে দিল, যা পর্যাপ্ত ছিল না এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে উঠে যেতে বলেছেন, যা মুনাফিকদের মনঃপূত হয়নি। ছয়. কোন কোন বিত্তশালী লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কানকথা বলত। ফলে নিঃস্ব মুসলমানগণ কথাবার্তা বলে উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছেও ধনীদের দীর্ঘক্ষণ বসে কানকথা অপছন্দনীয় ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ الخ

আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফতহুল-বয়ানে বর্ণিত আছেঃ ইহুদী ও মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অনাবশ্যক কানকথা বলত। মুসলমানগণ কোন ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে কানকথা হচ্ছে ধারণা করে তা পছন্দ করত না। ফলে তাদেরকে নিষেধ করা হয়, যা نُهُوا عَنْهُ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু যখন তারা বিরত হল না, তখন إِذَا جَاءُوكَ

الرَّسُولَ আয়াত অবতীর্ণ হল। এর ফলশ্রুতিতে বাতিলপন্থীরা কানাকানি করা থেকে বিরত হয়। কারণ, অর্থ প্রীতির কারণে সদ্কা প্রদান করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল।

সাত. যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করার আদেশ হল, তখন অনেকে জরুরী কথাও বন্ধ করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে أَأَشْفَقْتُمْ আয়াত নাযিল হল। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেনঃ সদ্কা প্রদান করার আদেশে পূর্ব থেকেও فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا আয়াতে অসমর্থ লোকদের বেলায় আদেশ শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক সম্পূর্ণ অসমর্থও ছিল না এবং পুরোপুরি বিত্তশালীও ছিল না। কম সামর্থ্য এবং অক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহের কারণে সম্ভবত তাদের জন্যই সদ্কা প্রদান করা কষ্টকর হয়েছিল। তাই তারা সদ্কা প্রদান করতে পারেনি এবং নিজেদেরকে আদেশের আওতা-বহির্ভূতও মনে করেনি। আর কানকথা বলা ইবাদতও ছিল না যে, এটা ত্যাগ করলে নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। তাই তারা কানকথা বলা বন্ধ করেছিল।—(সবগুলো রেওয়ায়েতই দুররে-মনসূরে বর্ণিত আছে)। অবতরণের এসব হেতু জানার ফলে আয়াতসমূহের তফসীর বোঝা সহজ হবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি এ বিষয়ে ভেবে দেখেন নি (নিষিদ্ধ কানাঘুষা থেকে যারা বিরত হত না, এখানে তাদেরকে শোনানোই উদ্দেশ্য) যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের সবকিছু জানেন। (তাদের কানাকানিও এই 'সবকিছু'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত)। তিন ব্যক্তির এমন কোন কানাকানি হয় না, যাতে তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম (যেমন দুই অথবা চারজন) হোক বা বেশী (যেমন ছয় অথবা সাতজন) হোক, তিনি (সর্বাবস্থায়) তাদের সাথে থাকেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তারা যা করে তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে বলে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (এই আয়াতের বিষয়বস্তু সামগ্রিকভাবে পরবর্তী খুঁটিনাটি বিষয়বস্তুর ভূমিকা। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে যারা মিথ্যা কানাকানি করে তারা আল্লাহ্কে ভয় করে না। আল্লাহ্ সব খবর রাখেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেবেন। অতঃপর খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু বর্ণিত হচ্ছেঃ) আপনি কি তাদের বিষয় ভেবে দেখেন নি এবং তাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা

হয়েছিল, অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, জুলুম ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাকানি করে। (অর্থাৎ তাদের কানাকানি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে গোনাহ্ এবং মুসলমানদেরকে দুঃখিত করার উদ্দেশ্য থাকার কারণে জুলুম এবং রসূলের নিষেধ করার কারণে রসূলের অবাধ্যতাও; যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে)। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে যদ্দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে সালাম করেন নি। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ভাষা তো এরূপঃ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى এবং صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا আর তারা বলেঃ اَلسَّامُ عَلَيْكَ অর্থাৎ আপনার মৃত্যু হোক) তারা মনে মনে (অথবা পরস্পরে) বলেঃ (সে পয়গম্বর হলে) আমরা যা বলি (যাতে তার প্রতি পরিষ্কার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়) তজ্জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে (তাৎক্ষণিক) শাস্তি দেন না কেন? (তৃতীয় ও চতুর্থ ঘটনায় এর বর্ণনা আছে। অতঃপর তাদের এই দুষ্কর্মের জন্য শাস্তিবাণী এবং এই উক্তির জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, কোন কোন রহস্যের কারণে তাৎক্ষণিক শাস্তি না হলে সর্বাবস্থায় শাস্তি না হওয়া জরুরী হয় না)। জাহান্নাম তাদের জন্য যথেষ্ট (শাস্তি)। তারা তাতে (অবশ্যই) প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই ঠিকানা! (অতঃপর মু'মিনগণকে সম্বোধন করা হচ্ছে। এতে মুনাফিকদের অনুরূপ কাজ করতে তাদেরকেও নিষেধ করা হয়েছে এবং মুনাফিকদেরকেও একথা বলা উদ্দেশ্য যে, তোমরা মুখে ঈমান দাবী কর, অতএব ঈমান অনুযায়ী কাজ করা তোমাদের উচিত। ইরশাদ হয়েছেঃ) মু'মিনগণ, যখন তোমরা (কোন প্রয়োজনে) কানাকানি কর তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না এবং অনুগ্রহ ও আল্লাহ্‌ভীতির বিষয়ে কানাকানি কর। (بِرّ শব্দটি عدوان -এর বিপরীত। এর অর্থ অনুগ্রহ, যার উপকার অন্যে পায়। تقوى শব্দটি اثم ও معصية الرسول অর্থাৎ রসূলের অবাধ্যতার বিপরীত)। আল্লাহ্‌কে ভয় কর যার কাছে তোমরা সমবেত হবে। এই কানাকানি তো কেবল শয়তানের (প্ররোচনামূলক) কাজ, মু'মিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য (যেমন প্রথম ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে)। তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত যে তাদের (মুসলমানদের) কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (এটা মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি শয়তানের প্ররোচনায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করেও তবুও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। অতএব চিন্তা কিসের?) মু'মিনদের উচিত (প্রত্যেক কর্মে) আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা। (অতঃপর পঞ্চম ঘটনা অর্থাৎ মজলিসে কিছু লোক পরে আগমন করলে তাদের জন্য জায়গা খালি করে দেওয়ার আদেশ বর্ণিত হচ্ছেঃ) মু'মিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয়ঃ [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন অথবা পদস্থ ও গণ্যমান্য লোকগণ বলেন] মজলিসে জায়গা করে দাও (যাতে পরে আগমনকারীও জায়গা পায়), তখন তোমরা জায়গা করে দিও; আল্লাহ্ তোমাদেরকে (জান্নাতে) প্রশস্ত জায়গা দেবেন।

যখন (কোন প্রয়োজনে) বলা হয়ঃ (মজলিস থেকে) উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো (তা আগমনকারীকে জায়গা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হোক কিংবা সভাপতির কোন বিশেষ পরামর্শ, আরাম কিংবা ইবাদত ইত্যাদির কারণে নির্জনতার প্রয়োজনে বলা হোক, যা নির্জনতা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না বা পূর্ণ হতে পারে না। মোটকথা, সভাপতির আদেশ হলে উঠে যাওয়া উচিত। রসূল নয়—এমন ব্যক্তির বেলায়ও এই নির্দেশ ব্যাপক। সুতরাং প্রয়োজনের সময় কাউকে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ জারি করার অধিকার সভাপতির আছে। তবে যে ব্যক্তি পরে মজলিসে আসে, তার এরূপ অধিকার নেই যে, কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসে যাবে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে তাই বর্ণিত আছে। মোট কথা, আয়াতে সভাপতির আদেশে উঠে যাওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা (এই বিধান পালনের কারণে) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং (তাদের মধ্যে যারা ধর্মের) জ্ঞানপ্রাপ্ত, তাদের (পারলৌকিক) মর্যাদা (আরও অধিক) উচ্চ করে দেবেন। (অর্থাৎ এই বিধান পালনকারিগণ তিন প্রকার। এক. কাফির—যারা পার্থিব উপকারার্থে মেনে নেবে; যেমন মুনাফিকরাও তাই করবে। منكم শব্দের কারণে তারা এই ওয়াদার আওতা থেকে বের হয়ে গেছে। দুই. জ্ঞানপ্রাপ্ত নয়, এমন মু'মিনগণ। তাদের মর্যাদাই কেবল উচ্চ করা হবে। তিন. জ্ঞানপ্রাপ্ত মু'মিনগণ, তাদের মর্যাদা আরও অধিক উচ্চ করা হবে। কেননা, জ্ঞানের কারণে তাদের কর্ম অধিক ভীতিপূর্ণ ও অধিক আন্তরিক। এর ফলে কর্মের সওয়াব বেড়ে যায়)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কর্মের খবর রাখেন। (অর্থাৎ কার কর্ম ঈমানসহ এবং কার কর্ম ঈমান ব্যতীত; কার কর্মে আন্তরিকতা কম এবং কার কর্মে আন্তরিকতা বেশী, তা সবই তিনি জানেন। তাই প্রত্যেকের প্রতিদানে পার্থক্য রেখেছেন। অতঃপর প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনার সাথে সংযুক্ত ষষ্ঠ ঘটনা সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ) মু'মিনগণ, তোমরা যখন রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাও, তখন কানকথা বলার পূর্বে কিছু সদ্কা (ফকীর-মিসকীনকে) প্রদান করবে। (এর পরিমাণ আয়াতে উল্লেখ নেই। হাদীসে বিভিন্ন পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যত পরিমাণ অনির্দিষ্ট হলেও তা উল্লেখযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়)। এটা তোমাদের জন্য (সওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে) শ্রেয়ঃ এবং (গোনাহ্ থেকে) পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। (কেননা, ইবাদত গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে থাকে। বিত্তশালী মু'মিনদের বেলায় এই উপকারিতা। নিঃস্ব মু'মিনদের বেলায় উপযোগিতা এই যে, তারা আর্থিক উপকার লাভ করবে। 'সদ্কা' শব্দ থেকে তা জানা যায়। কেননা, সদ্কা নিঃস্বদের খাতেই ব্যয়িত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বেলায় উপযোগিতা এই যে, এতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি আছে এবং মুনাফিকদের কানাকানির ফলে তিনি যে কষ্ট অনুভব করতেন, তা থেকে মুক্তি আছে। কেননা, কানাকানির প্রয়োজন তাদের ছিল না; অতএব বিনা-প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল। সম্ভবত প্রকাশ্যে সদ্কা করার আদেশ ছিল, যাতে সদ্কা প্রদান না করে কেউ ধোঁকা দিতে সক্ষম না হয়। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, এই আদেশ সামর্থ্যবানদের জন্যঃ) অতঃপর যদি তোমরা সদ্কা প্রদান করতে সক্ষম না হও, (এবং কানাকানির প্রয়োজন থাকে) তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (তিনি তোমাদেরকে মাফ করবেন। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, আদেশটি ওয়াজিব ছিল, কিন্তু অক্ষমতার অবস্থা ব্যতিক্রমভুক্ত ছিল। অতঃপর ষষ্ঠ ঘটনার সাথে সংযুক্ত সপ্তম ঘটনা

সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদ্‌কা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে ? তোমরা যখন তা পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন, (আদেশটি সম্পূর্ণ রহিত করে মাফ করে দিলেন। কারণ, যে উপযোগিতার কারণে আদেশটি ওয়াজিব হয়েছিল, তা অর্জিত হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ্ যখন মাফ করে দিলেন) তখন তোমরা (অন্যান্য ইবাদত পালন কর, অর্থাৎ) নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। (উদ্দেশ্য এই যে, এই আদেশ রহিত হওয়ার পর তোমাদের নৈকট্য লাভ ও মুক্তির জন্য অন্যান্য বিধান পালনে দৃঢ়তা প্রদর্শনই যথেষ্ট)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কাজকর্মের (এবং তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার) পূর্ণ খবর রাখেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহ শানে-নুযূলে বর্ণিত বিশেষ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও কোরআনী নির্দেশসমূহ ব্যাপক হয়ে থাকে। এগুলোতে আকায়েদ, ইবাদত, পারস্পরিক লেনদেন ও সামাজিকতার যাবতীয় বিধি-বিধান বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও পারস্পরিক কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে এমনি ধরনের কতিপয় বিধান আছে।

গোপন পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ ঃ গোপন পরামর্শ সাধারণত বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকে, যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা এই গোপন রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে কারও প্রতি জুলুম করা, কাউকে হত্যা করা, কারও বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করা ইত্যাদি বিষয়েরও পরিকল্পনা করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিবেষ্টিত। তোমরা যেখানে যত আত্মগোপন করেই পরামর্শ কর, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ ও দৃষ্টির দিক দিয়ে তোমাদের কাছে থাকেন এবং তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনেন, দেখেন ও জানেন। যদি তাতে কোন পাপ কাজ কর, তবে শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এতে বলা উদ্দেশ্য তো এই যে, তোমরা যতই কম বা বেশী মানুষে পরামর্শ ও কানা-কানি কর না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। উদাহরণস্বরূপ তিন ও পাঁচের সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তিনজনে পরামর্শ কর, তবে বুঝে নাও যে, চতুর্থ জন আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে বিদ্যমান আছেন। আর যদি পাঁচজনে পরামর্শ কর, তবে ষষ্ঠজন আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্যমান আছেন। তিন ও পাঁচের সংখ্যা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, দলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বেজোড় সংখ্যা পছন্দনীয়। مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ আয়াতের সারমর্ম তাই।

কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ ঃ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا

عَنِ النَّجْوٰى —শানে নুযূলের ঘটনায় বলা হয়েছে, ইহুদী ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালাতে পারত না। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিত জিঘাংসা চরিতার্থ করার এক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিল। তা এই যে, তারা যখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে কাউকে কাছে আসতে দেখত, তখন পারস্পরিক কানাকানি ও গোপন পরামর্শের আকারে জটলা সৃষ্টি করত এবং আগন্তুক মুসলমানের দিকে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত করত। ফলে আগন্তুক ধারণা করত যে, তার বিরুদ্ধেই কোন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এতে সে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারত না। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইহুদীদেরকে এরূপ কানাকানি করতে নিষেধ করে দেন। نُهُوا عَنِ النَّجْوٰى বাক্যে এই নিষেধাজ্ঞাই বর্ণিত হয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মুসলমানদের জন্যও আইন হয়ে যায় যে, তারাও পরস্পরে এমনভাবে কানাকানি ও পরামর্শ করবে না, যদ্দ্বারা অন্য মুসলমান মানসিক কষ্ট পেতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس فان ذالك يحزنه -

অর্থাৎ যেখানে তোমরা তিনজন একত্রিত হও, সেখানে দুইজন তৃতীয় জনকে ছেড়ে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরও লোক না এসে যায়। কারণ, এতে সে মনঃক্ষুণ্ণ হবে, সে নিজেকে পর বলে ভাববে এবং তার বিরুদ্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে।—(মাযহারী)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى -

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদেরকে অবৈধ কানাকানির কারণে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব অবস্থা ও কথাবার্তা জানেন, তারা যেন তাদের কানাকানি ও পরামর্শের মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই লক্ষ্য রাখার সাথে তারা যেন চেষ্টা করে যাতে তাদের পরামর্শ ও কানকথার মধ্যে পাপাচার, জুলুম অথবা শরীয়তবিরুদ্ধ কোন প্রসঙ্গ না থাকে, বরং সৎ কাজের জন্যই যেন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে।

কাফিররা দুষ্টুমি করলেও নম্র ও ভদ্রসুলভ প্রতিরোধের নির্দেশ ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে

ইহুদী ও মুনাফিকদের এই দুষ্টুমি উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে السلام عليكم বলার পরিবর্তে السام عليكم বলত। سام শব্দের অর্থ মৃত্যু। উচ্চারণে তেমন পার্থক্য না থাকায় মুসলমানদের দৃষ্টিতে তা সহজে ধরা পড়ত না। একদিন হযরত আয়েশা (রা)-র উপস্থিতিতে যখন তারা السام عليكم বলল, তখন হযরত আয়েশা (রা) উত্তরে বললেন : السام عليكم ولعنكم الله و غضب عليكم অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমরা অভিশপ্ত ও আল্লাহ্র গযবে পতিত হও। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে এরূপ জওয়াব দিতে নিষেধ করে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীল কথাবার্তা পছন্দ করেন না। তোমার উচিত কটুকথা পরিহার করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। হযরত আয়েশা (রা) আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি শুনেন নি ওরা আপনাকে কি বলেছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, শুনেছি এবং এর সমান প্রতিশোধও নিয়েছি। আমি উত্তরে বলেছি : عليكم অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও। এটা জানা কথা যে, তাদের দোয়া কবূল হবে না এবং আমার দোয়া কবূল হবে। কাজেই তাদের দুষ্টুমির প্রত্যুত্তর হয়ে গেছে।—(মাযহারী)

মজলিসের কতিপয় শিষ্টাচার : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا মুসলমানদের সাধারণ মজলিসসমূহের বিধান এই যে, কিছু লোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টরা তাদের বসার জায়গা করে দেবে এবং চেপে চেপে বসবে। এরূপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য প্রশস্ততা সৃষ্টি করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এই প্রশস্ততা পরকালে তো প্রকাশ্যই, সাংসারিক জীবিকায় এই প্রশস্ততা হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এই আয়াতে মজলিসের শিষ্টাচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় নির্দেশ এই : إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْشُزُوا فَانْشُزُوا —অর্থাৎ যখন তোমাদের কাউকে মজলিস থেকে উঠে যেতে বলা হয়, তখন উঠে যাও। আয়াতে কে বলবে, তার উল্লেখ নেই। তবে সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং আগন্তুক ব্যক্তি নিজের জন্য জায়গা করার উদ্দেশ্যে কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিলে তা জায়েয হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : —لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه و لكن تفسحوا و توسعوا

অর্থাৎ একজন অপরজনকে দাঁড় করিয়ে তার জায়গায় বসবে না। বরং তোমরা চেপে বসে আগন্তকদের জন্য জায়গা করে দাও।—(বুখারী, মুসলিম, মসনদে আহমদ, ইবনে কাসীর)

এ থেকে বোঝা গেল যে, কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যাওয়ার জন্য বলা স্বয়ং আগন্তুকের জন্য জায়েয নয়। কাজেই একথা সভাপতি অথবা সভার ব্যবস্থাপকমণ্ডলী বলতে পারে। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই : যদি সভাপতি অথবা তাঁর নিযুক্ত ব্যবস্থাপক মণ্ডলী কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যেতে বলে, তবে উঠে যাওয়াই মজলিসের শিষ্টাচার। কারণ, মাঝে মাঝে স্বয়ং সভাপতি কোন প্রয়োজনে একান্তে থাকতে চায়; কিংবা বিশেষ লোকদের সাথে গোপন কথা বলতে চায়, কিংবা পরে আগমনকারীদের জন্য একমাত্র ব্যবস্থা এরূপ থাকতে পারে যে, কিছু জানাশোনা লোককে উঠিয়ে দিয়ে আগন্তুকদেরকে সুযোগ দেওয়া। যাদেরকে উঠানো হবে, তারা হয়ত অন্য সময়ও মজলিসে বসে উপকৃত হতে পারবে।

তবে সভাপতি ও ব্যবস্থাপকদের অবশ্য কর্তব্য হবে এমনভাবে উঠে যেতে বলা, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লজ্জিত না হয় এবং তার মনে কষ্ট না লাগে।

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তা এই : রসূলুল্লাহ্ (সা) সুফ্ফা মসজিদে অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদ জনাকীর্ণ ছিল। পরে কয়েকজন প্রধান সাহাবী সেখানে আগমন করেন। তাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিধায় অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন। কিন্তু জায়গা না থাকার কারণে বসার সুযোগ পেলেন না। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে সবাইকে চেপে বসে জায়গা করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। কোন কোন সাহাবীকে উঠে যেতেও বললেন। যাদেরকে উঠালেন, তারা হয়তো এমন লোক ছিলেন, যারা সর্বক্ষণ মজলিসে হাযির থাকতে পারেন। কাজেই তাদের উঠে যাওয়া তেমন ক্ষতিকর ছিল না। অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন চেপে বসতে আদেশ করলেন, তখন কেউ কেউ এই আদেশ পালন করেনি। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মজলিস থেকে উঠে যেতে বললেন।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে মজলিসের কয়েকটি শিষ্টাচার জানা গেল। এক. মজলিসে উপস্থিত লোকদের উচিত পরে আগমনকারীদের জন্য জায়গা করে দেওয়া। দুই. যারা পরে আগমন করে, তারা কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিতে পারবে না। তিন. প্রয়োজন মনে করলে সভাপতি কিছু লোককে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন। আরও কতিপয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরে আগমনকারীরা প্রথম থেকে উপবিষ্ট লোকদের ভেতরে অনুপ্রবেশ না করে শেষ প্রান্তে বসে যাবে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে তিনজন আগন্তুকের বর্ণনা আছে। তাদের মধ্যে একজন মজলিসে জায়গা না পেয়ে এক প্রান্তে বসে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রশংসা করেন।

মাস'আলা : মজলিসের অন্যতম শিষ্টাচার এই যে, দুই উপবিষ্ট ব্যক্তির মাঝখানে তাদের অনুমতি ব্যতীত বসা যাবে না। কেননা, তাদের একত্রে বসার মধ্যে কোন বিশেষ উপযোগিতা থাকতে পারে। আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত ওসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : لا يحل لرجل ان يفرق

يحل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما অর্থাৎ একত্রে উপবিষ্ট দুই ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ব্যতীত ব্যবধান সৃষ্টি করা তৃতীয় কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয়।—(ইবনে কাসীর)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ— রসূলুল্লাহ্ (সা) জনশিক্ষা ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয় বাণী শুনে উপকৃত হত। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেওয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টুমিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলমানও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই বোঝা হালকা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রসূলের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। কোরআনে এই সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আলী (রা) সর্বপ্রথম একে বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

একমাত্র হযরত আলী (রা) ই আদেশটি বাস্তবায়িত করেন, এরপর তা রহিত হয়ে যায় এবং আর কেউ বাস্তবায়নের সুযোগ পান নি: আশ্চর্যের বিষয়, আদেশটি জারি করার পর খুব শীঘ্রই রহিত করে দেওয়া হয়। কারণ, এর ফলে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। হযরত আলী (রা) প্রায়ই বলতেন: কোরআনে একটি আয়াত এমন আছে, যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি—আমার পূর্বেও না এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো জানা। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ এই যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, আগে সদকা প্রদান করার আলোচ্য আয়াতই সেই আয়াত।—(ইবনে কাসীর)

আদেশটি রহিত হয়ে গেছে ঠিক, কিন্তু এর ঈপ্সিত লক্ষ্য এভাবে অর্জিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ তো আন্তরিক মহব্বতের তাকীদেই এরূপ মজলিস দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত হয়ে গেল এবং মুনাফিকরা যখন দেখল যে, সাধারণ মুসলমানদের কর্মপন্থার বিপরীতে এরূপ করলে তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে এবং মুনাফিকী ধরা পড়বে, তখন তারা এ থেকে বিরত হয়ে গেল।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۭ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا

شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً
فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ لَنْ تُغْنِيَ
عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَٰبُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا
يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَٰذِبُونَ ۝
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَٰنُ فَأَنْسَٰهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَٰنِ ۚ أَلَا إِنَّ
حِزْبَ الشَّيْطَٰنِ هُمُ الْخَٰسِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ
فِي الْأَذَلِّينَ ۝ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(১৪) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি, যারা আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (১৫) আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখে-ছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ। (১৬) তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছে, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে, অতএব তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (১৭) আল্লাহ্‌র কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী। (১৯) শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে

নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। (২০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। (২১) আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন—আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২২) যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি (অর্থাৎ মুনাফিকদের প্রতি) যারা আল্লাহ্র গযবে নিপতিত (অর্থাৎ ইহুদী ও কাফির) সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? (মুনাফিকরা ইহুদী ছিল, তাই তাদের বন্ধুত্ব ইহুদীদের সাথে এবং কাফিরদের সাথেও সুবিদিত ছিল)। তারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা পুরোপুরি) মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং (পুরোপুরি) তাদের (অর্থাৎ ইহুদীদেরও) দলভুক্ত নয়। (বরং তারা বাহ্যত তোমাদের সাথে আছে এবং বিশ্বাসগতভাবে কাফিরদের সাথে আছে)। তারা মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (অর্থাৎ শপথ করে বলে যে, তারা মুসলমান; যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ) এবং নিজেরাও জানে (যে, তারা মিথ্যাবাদী। অতঃপর তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (কারণ) নিশ্চিতই তারা যা করে, খুবই মন্দ। (কুফর ও নিফাক থেকে মন্দ কাজ আর কি হবে? এসব মন্দ কাজের মধ্যে একটি মন্দ কাজ এই যে) তারা তাদের (এসব মিথ্যা) শপথকে (আত্মরক্ষার জন্য) ঢাল করে রেখেছে, (যাতে মুসলমান তাদেরকে মুসলমান মনে করে এবং জান ও মালের ক্ষতি না করে) অতঃপর তারা (অন্যদেরকেও) আল্লাহ্র পথ (অর্থাৎ ধর্ম) থেকে নিবৃত্ত রাখে (অর্থাৎ বিভ্রান্ত করে); অতএব (এ কারণে) তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (অর্থাৎ শাস্তি যেমন কঠোর হবে; তেমনি অপমানজনকও হবে। যখন এই শাস্তি শুরু হবে, তখন) আল্লাহ্র কবল (অর্থাৎ আযাব) থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। (এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, সেই কঠোর ও অপমানজনক শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম)। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (এই শাস্তি সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকে (অন্যান্য সৃষ্ট জীবসহ) পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্র সামনেও

(মিথ্যা) শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে (মুশরিকদের মিথ্যা শপথ কোরআনের এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ) এবং তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। (কাজেই মিথ্যা শপথের বদৌলতে বেঁচে থাকে)। সাবধান, ওরাই তো মিথ্যাবাদী।(কারণ, ওরা আল্লাহ্‌র সামনেও মিথ্যা বলতে দ্বিধা করেনি। ওদের উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের কারণ এই যে) শয়তান তাদেরকে পুরোপুরি বশীভূত করে নিয়েছে (ফলে তারা এখন শয়তানের কথামতই কাজ করছে) অতঃপর আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। (অর্থাৎ তারা তাঁর বিধি-বিধান ত্যাগ করে বসেছে। বাস্তবিকই) তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দল অবশ্যই বরবাদ হবে; (পরকালে তো অবশ্যই, মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও। তাদের এই অবস্থা কেন হবে না, তারা তো আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী। নীতি এই যে) যারা আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই (আল্লাহ্‌র কাছে) লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। (আল্লাহ্‌র কাছে যখন তারা লাঞ্ছিত, তখন উপ-রোক্ত পরিণতি হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যেমন লাঞ্ছনা অবধারিত করে রেখেছেন, তেমনি অনুগতদের জন্য সম্মান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। কেননা, তারা আল্লাহ্ ও রসূলগণের অনুসারী)। আল্লাহ্ তা'আলা (আদি নির্দেশনামায়) লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার রসূলগণ বিজয়ী হব। (এটাই সম্মানের স্বরূপ। এখানে রসূলগণের বিজয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য; কিন্তু রসূলগণের সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকেও জুড়ে দিয়ে-ছেন। সুতরাং রসূলগণ যখন সম্মানিত, তখন তাঁদের অনুসারিগণও সম্মানিত। বিজয়ী হওয়ার অর্থ সূরা মায়েদা ও সূরা মু'মিনে বর্ণিত হয়েছে)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (তাই তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন। অতঃপর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে মুনাফিকদের বিপরীতে মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে (পুরোপুরি) বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদের (অন্তরকে) শক্তিশালী করেছেন স্বীয় ফয়য দ্বারা ('ফয়য' বলে নূর বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ হিদায়ত অনুযায়ী বাহ্যিক কর্ম এবং অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি। فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ আয়াতে এই নূরই উল্লিখিত হয়েছে। এই নূর অর্থগত জীবনের কারণ। তাই একে রূহ্ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। মু'মিনগণ এই সম্পদ দুনিয়াতে লাভ করবে এবং পরকালে) তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে; (যেমন অন্য আয়াতে أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ এরপর أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ বলা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم —এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেসব লোকের দুরবস্থা ও পরিণামে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ্র শত্রু কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইহুদী, খৃস্টান অথবা অন্য যে-কোন প্রকার কাফিরের সাথে কোন মুসলমানের বন্ধুত্ব রাখা জায়েয নয়। এটা যুক্তিগতভাবে সম্ভব-পরও নয়। কেননা, মু'মিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্র মহব্বত। কাফির আল্লাহ্র দুশমন। যার অন্তরে কারও প্রতি সত্যিকার মহব্বত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শত্রুর প্রতিও মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফিরদেরই দলভুক্ত মনে করার শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

কাফিরদের সাথে সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে দাখিল নয়। এগুলো কাফিরদের সাথেও করা জায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রকাশ্য কাজ-কারবার এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের জন্য ক্ষতিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিল্য সৃষ্টি না করে এবং অন্য মুসলমানদের জন্যও ক্ষতিকর না হয়।

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ — কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন : এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ, দেহাবয়ব বেঁটে, গোধূম বর্ণ এবং সে ছিল হাল্কা শ্মশ্রুমণ্ডিত। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন : তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেয় কেন? সে শপথ করে বলল : আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন।—(কুরতুবী)

মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব কাফিরের সাথে হতে পারে না : لَا تَجِدُ قَوْمًا

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا

آبَاءَهُمْ الآية প্রথম আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের প্রতি আল্লাহ্র গযব ও কঠোর শাস্তির বর্ণনা ছিল। এই আয়াতে তাদের বিপরীতে খাঁটি মুসলমানদের

অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র শত্রু অর্থাৎ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না, যদিও সেই কাফির তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয়ও হয়।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) সবারই এই অবস্থা ছিল। এ স্থলে তফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কোন কথা শুনে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং কতককে হত্যাও করেছেন।

একবার সাহাবী আবদুল্লাহ (রা)-র সামনে তাঁর মুনাফিক পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করল। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন না। একবার হযরত আবূ বকর (রা)-এর সামনে তাঁর পিতা আবূ কোহাফা রসূলে করীম (সা) সম্পর্কে কিছু ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করলে দয়ার প্রতীক হযরত আবূ বকর (রা) ক্রোধান্ধ হয়ে পিতাকে সজোরে চপেটাঘাত করেন। ফলে আবূ কোহাফা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। খবর শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ভবিষ্যতে এরূপ করো না। হযরত আবূ ওবায়দা (রা)-র পিতা জাররাহ্ ওহুদ যুদ্ধে কাফিরদের সঙ্গী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সে বারবার হযরত আবূ ওবায়দা (রা)-র সামনে আসত কিন্তু তিনি এড়িয়ে যেতেন। এরপরও যখন সে নিবৃত্ত হল না এবং পুত্রকে হত্যা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখল, তখন হযরত আবূ ওবায়দা (রা) বাধ্য হয়ে পিতাকে হত্যা করলেন। সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরতুবী)

মাস'আলা ঃ পাপাসক্ত ফাসিক-ফাজির ও কার্যত ধর্মবিমুখ মুসলমানদের বেলায়ও অনেক ফিকহ্বিদ এই বিধান রেখেছেন যে, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয হতে পারে না। কাজকর্মের প্রয়োজনে সহযোগিতা অথবা প্রয়োজন মাফিক সাহচর্য ভিন্ন কথা, যার মধ্যে ফিস্ক তথা পাপাসক্তির বীজাণু বিদ্যমান আছে, একমাত্র তার অন্তরেই কোন ফাসিক ও পাপাসক্তের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকতে পারে। তাই রসূলে করীম (সা) তাঁর দোয়ায় বলতেন ঃ اللهم لا تجعل لفا جر على يدا অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে কোন পাপাসক্ত ব্যক্তির কাছে ঋণী করো না। অর্থাৎ তার কোন অনুগ্রহ যেন আমার উপর না থাকে। কেননা, সম্ভ্রান্ত মানুষ স্বভাবগত গুণের কারণে অনুগ্রহকারীর প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখতে বাধ্য হয়। কাজেই ফাসিকদের অনুগ্রহ কবুল করা তাদের প্রতি মহব্বতের সেতু। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই সেতু নির্মাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।—(কুরতুবী)

وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ — এখানে কেউ কেউ রূহ্-এর তফসীর করেছেন নূর, যা মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সৎকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এই প্রশান্তি একটি বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ রূহ্-এর তফসীর করেছেন কোরআন ও কোরআনের প্রমাণাদি। কারণ, এটাই মু'মিনের আসল শক্তি।—(কুরতুবী)

سورة الحشر

সূরা হাশর

মদীনায় অবতীর্ণ, ২৪ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ ○ وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ○

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (২) তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে প্রথমবার একত্র করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন।

তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৩) আল্লাহ্ যদি তাদের জন্য নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। (৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্রই আদেশে এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন।

যোগসূত্র ও শানে-নুযূল ঃ পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিক ও ইহুদীদের বন্ধুত্বের নিন্দা করা হয়েছিল। এই সূরায় ইহুদীদের দুনিয়াতে নির্বাসনদণ্ড ও পরকালে জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীদের বৃত্তান্ত এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করার পর ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এক গোত্র ছিল বনূ নুযায়ের। তারাও শান্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসলমান-ইহুদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইহুদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সেমতে তিনি বনূ নুযায়ের গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, পয়গম্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল ঃ আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর তারা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও ভারী পাথর তাঁর উপর ছেড়ে দেবে, যাতে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু রাখে আল্লাহ্ মারে কে? রসূলুল্লাহ্ (সা) তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বলে পাঠালেন ঃ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লংঘন করেছ। অতএব তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেওয়া হল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এ স্থানে দৃষ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। বনূ নুযায়ের মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বলল ঃ তোমরা এখানেই থাক। অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দেবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দেবে না। রূহুল মা'আনীতে আছে এ ব্যাপারে ওদিয়া ইবনে মালিক, সুয়ায়দ এবং রায়েস ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর সাথে শরীক ছিল। বনূ নুযায়ের তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সদর্পে বলে পাঠাল ঃ আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে বনূ নুযায়ের গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনূ নুযায়ের দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে

রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খর্জুর বৃক্ষে আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড মেনে নিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাবপত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোন অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবে না। এগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। সেমতে বনূ নুযায়েরের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খায়বরে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসাধারণ মোহের কারণে তারা গৃহের কড়ি কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইহুদীর সাথে খায়বর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনদ্বয়ই 'প্রথম সমাবেশ ও দ্বিতীয় সমাবেশ' নামে অভিহিত।—(যাদুল মা'আদ)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (তাঁর মহত্ত্ব, শক্তি-সামর্থ্য ও প্রজ্ঞার এক প্রভাব এই যে, তিনিই কাফির কিতাবধারীদেরকে অর্থাৎ বনূ নুযায়েরকে) তাদের বসতবাড়ী থেকে প্রথমবার একত্র করে বহিষ্কার করেছেন। [যুহরী বলেন ঃ তারা প্রথমবার এই বিপদে পতিত হয়েছিল, যা ছিল তাদের দুষ্কর্মের ফলশ্রুতি। এতে পুনরায় তাদের এই বিপদে পতিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। সেমতে হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে পুনরায় তাদেরকে আরবভূমি থেকে বহিষ্কার করেন। তাদের বাস্তুভিটা থেকে বহিষ্কার করা মুসলমানদের শক্তি ও প্রাধান্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল। মুসলমানগণ, তাদের সাজসরঞ্জাম ও জাঁকজমক দেখে] তোমরা ধারণা করতে পারনি যে, তারা (কখনও তাদের বাস্তুভিটা থেকে) বের হবে এবং (খোদ) তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ তারা তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গের কারণে নিশ্চিত ছিল। তাদের মনে কোন সময় অদৃশ্য প্রতিশোধের আশংকাও জাগত না। অতঃপর আল্লাহ্র শাস্তি তাদের উপর এমন জায়গা থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। (অর্থাৎ তারা মুসলমানদের হাতে বহিষ্কৃত হল, যাদের নিরস্ত্রতার প্রতি লক্ষ্য করলে এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না, এই নিরস্ত্র লোকেরা সশস্ত্রদের বিপক্ষে বিজয়ী হবে।) তাদের অন্তরে (আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের) ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। (এই ত্রাসের কারণে তারা বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল। তখন তাদের অবস্থা ছিল এই যে,) তারা তাদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। (অর্থাৎ কড়িকাঠ, তক্তা ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেরাও গৃহ ধ্বংস করছিল এবং মুসলমানরাও তাদের অন্তর ব্যথিত করার জন্য ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত করছিল।) অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, (এ অবস্থা দেখে) শিক্ষা গ্রহণ কর। (আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও শোচনীয় হয়ে থাকে)। আল্লাহ্ যদি তাদের ভাগ্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন তবে তাদেরকে দুনিয়াতেই (হত্যার) শাস্তি দিতেন (যেমন তাদের পরে বনী কোরায়যার

ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। দুনিয়াতে যদিও তারা শাস্তির কবল থেকে বেঁচে গেছে, কিন্তু) পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা (তাদের এই বিরুদ্ধাচরণ দ্বিবিধ প্রকারে হয়েছে। এক. চুক্তি ভঙ্গ করা, যে কারণে নির্বাসনদণ্ড হয়েছে এবং দুই. আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা। এটা পরকালীন আযাবের কারণ। ইহুদীরা বলেছিল ঃ বৃক্ষ কর্তন করা ও বৃক্ষে অগ্নি সংযোগ করা অসমর্থের শামিল। অনর্থ নিন্দনীয়। এ ছাড়া কিছুসংখ্যক মুসলমান মনে করেছিল যে, এসব বৃক্ষ ভবিষ্যতে মুসলমানদেরই হয়ে যাবে। কাজেই এগুলো কর্তন না করাই উত্তম। সেমতে তারা কর্তন করেনি। আবার কেউ কেউ ইহুদীদের অন্তর ব্যথিত করার উদ্দেশ্যে কর্তন করেছে। অতঃপর এসব বিষয়ের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। জওয়াবের সাথে উভয় কাজকে সঠিক বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ তোমরা যে কতক খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ (এমনিভাবে যে কিছু পুড়িয়ে দিয়েছে) এবং কতক না কেটে কাণ্ডের উপর দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছ, তা তো (অর্থাৎ উভয় কাজই) আল্লাহ্র আদেশ (-ও সন্তুষ্টি) অনুযায়ীই, তাতে তিনি কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করেন। (অর্থাৎ উভয় কাজের মধ্যে উপযোগিতা আছে। ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেও মুসলমানদের এক সাফল্য এবং কাফিরদেরকে বিক্ষুব্ধ করার ফায়দা আছে। কারণ, এগুলো মুসলমানরা ভোগ করবে। পক্ষান্তরে কর্তন করা ও পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে মুসলমানদের অপর সাফল্য অর্থাৎ তাদের প্রাধান্য প্রকাশ পাওয়া এবং কাফিরদেরকে বিক্ষুব্ধ করার ফায়দা আছে। অতএব উভয় কাজ প্রজ্ঞাভিত্তিক হওয়ার কারণে এগুলোতে কোন দোষ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বনূ নুযায়ের গোত্রের ইতিহাস ঃ সমগ্র সূরা হাশর ইহুদী বনূ নুযায়ের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।—(ইবনে ইসহাক) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই সূরার নামই সূরা বনূ নুযায়ের বলতেন।—(ইবনে কাসীর) বনূ নুযায়ের হযরত হারূন (আ)-এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটি ইহুদী গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ তওরাতের পণ্ডিত ছিলেন। তওরাতে খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সংবাদ, হুলিয়া ও আলামত বর্ণিত আছে এবং তাঁর মদীনায় হিজরতের কথাও উল্লিখিত আছে। এই পরিবার শেষ নবী (সা)-র সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক তওরাতের পণ্ডিত ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেষ নবী (সা)। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, শেষ নবী হযরত হারূন (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষ নবী প্রেরিত হয়েছেন বনী ইসরাঈলের পরিবর্তে বনী ইসমাঈলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। এতদসত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত যে, ইনিই শেষ নবী। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর স্বীকারোক্তি তাদের মুখে শোনাও গিয়েছিল,

কিন্তু এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়কে সত্য ও মিথ্যা চেনার মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বল ভিত্তি। ফলে ওহুদ যুদ্ধের প্রথমদিকে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দিল এবং কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টলটলায়মান হয়ে গেল। এরপরই তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে দিল।

এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্রসমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শান্তি চুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল। 'সীরত ইবনে হিশামে' এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমনিভাবে বনূ নুযায়েরসহ ইহুদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনূ নুযায়েরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগবাগিচা ছিল।

ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্যত এই শান্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের পর তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দুরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনূ নুযায়েরের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশজন ইহুদীকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহুদ যুদ্ধ ফেরত কোরায়শী কাফিরদের সাথে সাক্ষাৎ করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশজন ইহুদীসহ এবং প্রতিপক্ষের আবূ সুফিয়ান চল্লিশজন কোরায়শী নেতাসহ কা'বা গৃহে প্রবেশ করে এবং বায়তুল্লাহ্র গিলাফ স্পর্শ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে।

চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং সাহাবী মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) তাকে হত্যা করেন।

এরপর বনূ নুযায়েরের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) অবহিত হতে থাকেন। তন্মধ্যে একটি উপরে শানে-নুযূলে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাৎক্ষণিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা, যে গৃহের নীচে তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বসিয়েছিল তার ছাদে চড়ে একটি প্রকাণ্ড ভারী পাথর তাঁর মাথায় ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, তার নাম ওমর ইবনে জাহ্হাশ। আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযতের কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

একটি শিক্ষা : আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী পর্যায়ে বনূ নুযায়েরের সবাই নির্বাসিত হয়ে মদীনা ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদীনাতেই

নিরাপদ জীবন যাপন করতে থাকে। তাদের একজন ছিল এই ওমর ইবনে জাহ্হাশ, দ্বিতীয় জন তার পিতৃব্য ইয়ামীন ইবনে আমর ইবনে কা'ব।—(ইবনে কাসীর)

আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর ঘটনা ঃ শানে-নুযুলের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই হত্যাকাণ্ডের রক্ত বিনিময় সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। এ ব্যাপারেই বনূ নুযায়েরের চাঁদা আদায়ের জন্য তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর লিখেন ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও উৎপীড়নের কাহিনী নাতিদীর্ঘ। তন্মধ্যে বীরে-মাউনার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিদিত।একবার কিছুসংখ্যক মুনাফিক ও কাফির তাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সত্তরজন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিছক একটা চক্রান্ত ছিল। কাফিররা মুসলমানগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সফলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আমর ইবনে যমরী (রা) কোনরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এই মাত্র কাফিরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর উনসত্তর জন সঙ্গীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন, কাফিরদের মুকাবিলায় তাঁর মনোবৃত্তি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে মদীনায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তিনি দুইজন কাফিরের মুখোমুখি হন। তিনি কালবিলম্ব না করে উভয়কে হত্যা করে দেন। পরে জানা যায় যে, তারা ছিল বনী আমের গোত্রের লোক, যাদের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শান্তি চুক্তি ছিল।

আজকালকার রাজনৈতিক চুক্তিসমূহে প্রথমেই চুক্তিভঙ্গের পথ খুঁজে নেওয়া হয়। কিন্তু রসূলে করীম (সা)-এর চুক্তি এরূপ ছিল না। এখানে যা কিছু মুখ অথবা কলম দিয়ে বের হয়ে যেত, তা ধর্মীয় ও আল্লাহ্র নির্দেশের মর্যাদা রাখত এবং তা যথাযথ পালন করা অপরিহার্য হয়ে যেত। আমরের এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) শরীয়তের আইনানুযায়ী নিহত ব্যক্তিদের রক্ত বিনিময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং চাঁদার ব্যাপারে তাঁকে বনূ নুযায়ের গোত্রেও গমন করতে হয়।

ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা বর্তমান রাজনীতিকদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার ঃ আজকালকার বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণকল্পে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন, এর জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং বিশ্বে মানবাধিকারের হর্তাকর্তা কথিত হন। প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত ঘটনার প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। বনূ নুযায়েরের উপর্যুপরি চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা, রসূল হত্যার পরিকল্পনা ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক রসূলে করীম (সা)-এর গোচরে আসতে থাকে। যদি এসব ঘটনা আজকালকার কোন মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধানের গোচরীভূত হত তবে ইনসাফের সাথে বলুন তারা এহেন লোকদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন? আজকাল তো জীবিত লোকদের উপর পেট্রোল ঢেলে ময়দান পরিষ্কার করে দেওয়া কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিরও মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু গুণ্ডা, দুষ্কৃতকারী

সংঘবদ্ধ হয়ে অনায়াসে এ কাজ সমাধা করে ফেলে। রাজকীয় রাগ ও গোসার লীলাখেলা এর চাইতে বেশীই হয়ে থাকে।

কিন্তু এই রাষ্ট্র আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসূল (সা)-এর বনূ নুযায়েরের বিশ্বাসঘাতকতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনও তিনি তাদের গণহত্যার সংকল্প করেন নি। তাদের মাল ও আসবাবপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার কোন পরিকল্পনা করা হয়নি; বরং তিনি—(১) সব আসবাবপত্র নিয়ে কেবল শহর খালি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; (২) এর জন্যও তাদেরকে দশ দিনের সময় দেন, যাতে অনায়াসে সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে। বনূ নুযায়ের এরপরেও যখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল, তখন জাতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়; তাই (৩) কিছু খর্জুর বৃক্ষ কাটা হয় এবং কিছু বৃক্ষে অগ্নি সংযোগ করা হয়, যাতে তারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু দুর্গে অগ্নি সংযোগ অথবা গণহত্যার নির্দেশ তখনও জারি করা হয়নি; (৪) অতঃপর তারা যখন বেগতিক হয়ে শহর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, তখন সামরিক অভিযান সত্ত্বেও এক ব্যক্তি এক উটের পিঠে যে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যেতে পারে সে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হল। ফলে তারা গৃহের কড়িকাঠ, তক্তা এবং দরজার কপাট পর্যন্ত উটের পিঠে তুলে নিল; (৫) তারা সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন মুসলমান তাদের প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকান নি। শান্ত ও মুক্ত পরিবেশে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ অবস্থায় তারা আসবাবপত্র নিয়ে বিদায় হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) যে সময় শত্রুর কাছ থেকে ষোল আনা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সেই সময় বনূ নুযায়েরের প্রতি তিনি এহেন উদারতা প্রদর্শন করেন। এই বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রী শত্রুদের সাথে তাঁর এহেন উদার ব্যবহার, সেই ব্যবহারের নযীর, যা তিনি মক্কা বিজয়ের পর তাঁর পুরাতন শত্রুদের সাথে করেছিলেন।

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ—বনূ নুযায়েরের এই নির্বাসনকে কোরআন পাক 'আউয়ালে হাশর' তথা প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা এক জায়গায় বসবাস করত। স্থানান্তর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল।* এর আরও একটি কারণ এই যে, ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রকৃত নির্দেশ ছিল আরব উপদ্বীপকে অমুসলিমদের থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে দ্বিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এটা হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খায়বরে বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিক দিয়ে বনূ নুযায়েরের এই নির্বাসন প্রথম সমাবেশ এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন দ্বিতীয় সমাবেশ নামে অভিহিত হয়।

فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا — এর শাব্দিক অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা কল্পনাও করেনি। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্র আগমন করার অর্থ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশবাহক ফেরেশতা আগমন করা।

يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ — গৃহের দরজা, কপাট ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য মুসলমানগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ

وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ — لِيْنَةٌ শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ। বনূ নুযায়েরের খর্জুর বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলমান তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্য তাদের কিছু খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নি সংযোগ করে খতম করে দিল। অপর কিছুসংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ্ বিজয় তাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগবাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তাঁরা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হল। এতে উভয় দলের কার্যক্রমকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে।

রসূলের নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই নির্দেশ : হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি : এই আয়াতে বৃক্ষ কর্তন, পোড়ান ও অক্ষত ছেড়ে দেওয়ায় উভয় প্রকার কার্যক্রমকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ কোরআনের কোন আয়াতে এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন কর্মের আদেশ উল্লেখ করা হয়নি। অতএব বাহ্যত বোঝা যায় যে, উভয় দল নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে এ কাজ করেছে। বেশীর বেশী তারা হয় তো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে এর অনুমতি নিয়ে থাকবে, কিন্তু কোরআন এই অনুমতি তথা হাদীসকে আল্লাহ্র ইচ্ছা প্রতিপন্ন করে ব্যক্ত করেছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে এবং তিনি যে আদেশ জারি করবেন, তা আল্লাহ্রই আদেশ বলে গণ্য হবে। এই আদেশ পালন করা কোরআনের আয়াত পালন করার মত ফরয।

ইজতিহাদী মতভেদে কোন পক্ষকে গোনাহ্ বলা যাবে না : এই আয়াত থেকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান এই জানা গেল যে, যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন, কোন ব্যাপারে

তাদের ইজতিহাদ ভিন্নমুখী হলে অর্থাৎ একদলে জায়েয ও অন্যদলে নাজায়েয বললে আল্লাহ্‌র কাছে উভয়টিই শুদ্ধ হবে। উভয় ইজতিহাদের মধ্যে কোনটিকে গোনাহ্ বলা যাবে না। এ কারণে তাদের উপর দুষ্টের দমন আইন প্রযোজ্য হবে না। কেননা, তাদের মধ্যে কোন এক পক্ষও শরীয়তানুযায়ী অশিষ্ট নয়। وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ বাক্যে বৃক্ষ কর্তন ও অগ্নি সংযোগের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা অনর্থ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে এটা সওয়াবের কাজ।

মাস'আলা ঃ যুদ্ধাবস্থায় কাফিরদের গৃহ বিধ্বস্ত করা, অগ্নি সংযোগ করা এবং বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা জায়েয কি না, এ সম্পর্কে ফিকহ্‌বিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ যুদ্ধাবস্থায় এসব কাজ জায়েয। কিন্তু শায়খ ইবনে হুমাম (র) বলেন ঃ এটা তখন জায়েয, যখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সুদূর পরাহত হয় অথবা যখন মুসলমানদের বিজয় অনিশ্চিত হয়। কাফিরদের শক্তি চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিজয় অর্জিত না হলে তাদের ধনসম্পদ বিনষ্ট করে তাদেরকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তখন এসব কাজ জায়েয হবে।—(মাযহারী)

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

(৬) আল্লাহ্ বনূ নুযায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৭) আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্র, রসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (৮) এই ধনসম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্য, যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধনসম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। (৯) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১০) আর এই সম্পদ তাদের জন্য, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা ! নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বনূ নুযায়েরের জীবন সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এখন তাদের মাল সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ বনূ নুযায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, (তাতে তোমাদের কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি) তোমরা তজ্জন্য (অর্থাৎ তা হাসিল করার জন্যে) ঘোড়া ও উটে চড়ে যুদ্ধ করনি। [উদ্দেশ্য এই যে, মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে সফরও করতে হয়নি এবং যুদ্ধ করারও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। মুকাবিলা যা হয়েছে, তা নেহায়েত অনুল্লেখযোগ্য।—(রূহুল-মা'আনী) তাই এই মালে তোমাদের বণ্টন ও মালিকানার অধিকার নেই—

গনীমতের মালে যেরূপ হয়ে থাকে]। কিন্তু (আল্লাহ্‌র রীতি এই যে) তিনি তাঁর রসূলগণকে (শত্রুদের মধ্য থেকে] যার উপর ইচ্ছা, কর্তৃত্ব দান করেন (অর্থাৎ শত্রুকে ত্রাসের মাধ্যমে পরাস্ত করে দেন, যাতে কোন রকম কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। সেমতে রসূলগণের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা)-কে বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদের উপর এমনিভাবে কর্তৃত্ব দান করেছেন। কাজেই এতে তোমাদের কোন অধিকার নেই ; বরং একে মালিকসুলভ ব্যবহার করার পূর্ণ ক্ষমতা রসূলেরই আছে)। আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সুতরাং তিনি যেভাবে ইচ্ছা, শত্রুদেরকে পরাস্ত করবেন এবং যেভাবে ইচ্ছা, তাঁর রসূলকে ক্ষমতা দেবেন। বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদের ক্ষেত্রে যেমন এই বিধান, তেমনিভাবে) আল্লাহ্ তা'আলা (এই পন্থায়) অন্যান্য জনপদের (কাফির) অধিবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, (যেমন ফদকের বাগান এবং খায়বরের অংশ বিশেষ এই পন্থায়ই করতলগত হয়েছিল, তাতেও তোমাদের কোন মালিকানার অধিকার নেই ; বরং) তা আল্লাহ্‌র হক, (তিনি যেভাবে ইচ্ছা, তা ব্যয় করার আদেশ দেবেন) রসূলের (হক ; আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী এই মাল ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন) এবং (তাঁর) আত্মীয়-স্বজনের (হক) এবং ইয়াতীমদের (হক) এবং নিঃস্বদের (হক) এবং মুসাফিরদের [হক অর্থাৎ তারা সবাই রসূলের বিবেচনা অনুসারে এই মাল ব্যয় করার পাত্র। শুধু তারাই নয় রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের মতে যাকেই দিতে চান, সে-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের যখন এই মালে কোন অধিকার নেই, তখন উপরোক্ত প্রকার লোকগণ, যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরও এই মালে কোন অধিকার থাকবে না—এই সন্দেহ নিরসনের জন্য সম্ভবত উপরোক্ত প্রকার লোকদের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতে ইয়াতীম, নিঃস্ব, মুসাফির ইত্যাদি বিশেষ গুণসহ তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা এসব গুণের কারণে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইচ্ছাক্রমে এই মাল পেতে পারে। জিহাদে যোগদান করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আত্মীয়-স্বজন হওয়াও উপরোক্ত গুণসমূহের অন্যতম। তাঁদেরকে এই মাল দেওয়ার কারণ এই যে, তাঁরা সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহায্যকারী ছিলেন এবং বিপদ মুহূর্তে কাজে লাগতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের সাথে সাথে তাঁদের এই অংশ রহিত হয়ে যায়। সূরা আনফালের আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান এ জন্য] যাতে তা (অর্থাৎ এই ধনসম্পদ) কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়ে যায় ; (যেমন মূর্খতা যুগে গনীমতের মাল ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সব বিত্তবানরা হজম করে ফেলত এবং অভাবগ্রস্তরা বঞ্চিত থাকত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বিষয়টি রসূলের মতামতের উপর ন্যস্ত করেছেন এবং ব্যয় করার খাতও বলে দিয়েছেন। যাতে মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি অভাবগ্রস্তদের মধ্যে এবং উপযোগিতার স্থলে ব্যয় করবেন। যখন জানা গেল যে, রসূলের ইখতিয়ারে থাকাই মঙ্গলজনক, তখন) রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা (নিতে) নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক (অন্যান্য) যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও তাই বিধান এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ (বিরুদ্ধাচরণের কারণে) কঠোর শাস্তিদাতা। (উপরোক্ত ধনসম্পদে এমনিতে সব অভাবগ্রস্তরই হক আছে, কিন্তু) মুহাজির অভাবগ্রস্তদের (বিশেষভাবে) এতে হক আছে, যাদেরকে তাদের বাস্তুভিটা ও

ধনসম্পদ থেকে (জোরজবরে অন্যায়ভাবে) বহিষ্কার করা হয়েছে, (অর্থাৎ কাফিরদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তারা বাস্তুভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে। এই হিজরত দ্বারা) তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (অর্থাৎ জান্নাত) ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, (কোন পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য হিজরত করেনি) এবং তারা আল্লাহ্ ও রসূলের (ধর্মের) সাহায্য করে। তারাই (ঈমানে) সত্যবাদী (এই সম্পদ তাদের জন্যও) যারা দারুল-ইসলামে (অর্থাৎ মদীনায়) ও ঈমানে মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে স্থিতিশীল ছিল। (এখানে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। তাঁরা ছিলেন মদীনার বাসিন্দা। তাই তাঁরা পূর্বেই মদীনায় স্থিতিশীল ছিলেন। ঈমানের পূর্বে স্থিতিশীল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সব আনসারের ঈমান সব মুহাজিরের ঈমানের অগ্রে ছিল। বরং অর্থ এই যে, মুহাজিরগণের মদীনায় আগমনের পূর্বেই তাঁরা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন)। তাঁরা মুহাজিরগণকে ভালবাসে এবং মুহাজিরগণকে (গনীমতের মাল ইত্যাদি) যা দেওয়া তজ্জন্য তাঁরা (আনসাররা) অন্তরে কোন ঈর্ষা পোষণ করে না। (বরং আরও বেশী ভালবাসে) নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও (পানাহার ইত্যাদিতে) তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। (অর্থাৎ মাঝে মাঝে নিজেরা না খেয়ে মুহাজির ভাইকে খাইয়ে দেয়। বাস্তবিকই) যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত (যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লোভ-লালসা ও তদনুযায়ী কাজ করা থেকে মুক্ত রেখেছেন), তারাই সফলকাম। (আর এই সম্পদ তাদের জন্যও) যারা (দারুল ইসলাম অথবা হিজরতে অথবা দুনিয়াতে) তাদের (অর্থাৎ উপরোক্ত মুহাজিরদের) পরে আগমন করেছে, (কিংবা আগমন করবে)। তারা দোয়া করে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর (শুধু ঈমানে অগ্রণী কিংবা হিজরতের উপর নির্ভরশীল কামিল ঈমানে অগ্রণী যাই হোক না কেন)। এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে কোন হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। (এই দোয়ায় সমসাময়িকগণও শামিল রয়েছে)। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَفَاءَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ — فَاعْسَوْمَا أَفَاءَ শব্দটি فَيْءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও فَيْءٌ বলা হয়। কাফিরদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের স্বরূপ এই যে, কাফিররা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধনসম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে যায়। তাই এগুলো অর্জনকে أَفَاءَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধনসম্পদকেই فَيْءٌ বলা হত। কিন্তু যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দখল থাকে। তাই এই প্রকার ধনসম্পদকে 'গনীমত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ—কিন্তু যে ধনসম্পদ অর্জনে যুদ্ধ ও জিহাদের প্রয়োজন পড়ে না, তাকে فَيْءٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ধনসম্পদ যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আইনানুযায়ী বন্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন, দেবেন অথবা নিজের জন্য রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার হকদার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদের বন্টন সীমিত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى—এখানে اَهْلِ قُرٰى বলে বনূ নুযায়ের এবং তাদের মত বনূ কোরায়যা ইত্যাদি গোত্র বোঝানো হয়েছে, যাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অর্জিত হয়েছিল। এরপর পাঁচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব আয়াতে উপরোক্ত প্রকার ধনসম্পদের বিধান, হকদার ও হকদারদের মধ্যে বন্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালের শুরুতে গনীমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদের ফলশ্রুতিতে যে ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনীমতের মাল এবং যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে যা অর্জিত হয়, তা ফায়-এর মাল। কাফিররা যে ধন-সম্পদ রেখে পলায়ন করে কিংবা যা সম্মতিক্রমে জিযিয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যাক্সের আকারে প্রদান করে, সবই ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত।

এর কিঞ্চিত বিবরণ মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে সূরা আনফালের শুরুতে এবং আরও কিছু বিবরণ সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সূরা আনফালের ৪১ নংআয়াতে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে ফায়-এর সম্পর্কে প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা আনফালে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

উভয় আয়াতে ছয় প্রকার হকদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—আল্লাহ্, রসূল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তা'আলা তো ইহকাল, পরকাল এবং সমগ্র সৃষ্ট জগতের আসল মালিক। অংশ বর্ণনায় তাঁর নাম নিছক বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে ইঙ্গিত হয়ে যায় যে, এই ধনসম্পদ অভিজাত, হালাল ও পূত-পবিত্র। এক্ষেত্রে অধিকাংশ তফসীরবিদের বক্তব্য তাই।—(মাযহারী)

আল্লাহ্ তা'আলার নাম উল্লেখ করার ফলে এই ধনসম্পদের আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্র হওয়ার দিকে কিভাবে ইঙ্গিত হল, এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আনফালের তফসীরে প্রদান করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে অর্জিত সদকার মাল হালাল করেন নি। ফায় ও গনীমতের মাল কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত হয়। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই মাল পয়গম্বরগণের জন্য কিরূপে হালাল হল? এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলার নাম উল্লেখ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বস্তুর মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি কৃপাবশত বিশেষ আইনের অধীনে মানুষকে মালিকানা দান করেছেন। কিন্তু যে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যায়, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রথমে পয়গম্বরগণকে ঐশী নির্দেশসহ প্রেরণ করা হয়েছে। যারা এতেও সঠিক পথে আসে না, তাদেরকে কমপক্ষে ইসলামী আইনের বশ্যতা স্বীকার করে নির্ধারিত জিযিয়া, খারাজ ইত্যাদি আদায় করে বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যারা এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে, তাদের মুকাবিলায় জিহাদ ও যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাদের জান ও মাল সম্মানার্হ নয়। তাদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র সরকারে বাজেয়াপ্ত। জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয়, তা কোন মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়—বরং তা সরাসরি আল্লাহ্র মালিকানায় ফিরে যায়। 'ফায়' শব্দের মধ্যে এই ফিরে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিতও আছে। কারণ, এর আসল অর্থ ফিরে যাওয়া। সত্যিকার মালিক আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানায় ফিরে যাওয়ার কারণেই এই সম্পদকে 'ফায়' বলা হয়। এখন এতে মানুষের মালিকানার কোন দখল নেই। যেসব হকদারকে এ থেকে অংশ দেওয়া হবে; তা সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। কাজেই এই ধনসম্পদ আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এবং স্বউদগত ঘাসের ন্যায় আল্লাহ্র দান হিসাবে মানুষের জন্য হালাল ও পবিত্র হবে।

সারকথা এই যে, এ স্থলে আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার। তাঁর পক্ষ থেকে হকদারদেরকে প্রদান করা হয়। এটা কারও সদকা খয়রাত নয়।

এখন সর্বমোট হকদার পাঁচ রয়ে গেল—রসূল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির। গনীমতের পঞ্চমাংশের হকদারও তারাই, যা সূরা আনফালে বর্ণিত হয়েছে। গনীমত ও ফায় উভয় প্রকারের বিধান এই যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সম্পূর্ণ ইখতিয়ারে থাকবে। তাঁরা ইচ্ছা করলে এগুলো কাউকে না দিয়ে মুসলিম জনগণের স্বার্থে বায়তুলমালে জমা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে বণ্টনও করতে পারেন। তবে বণ্টন করলে তা উপরোক্ত পাঁচ প্রকার হকদারের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে।—(কুরতুবী)

খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের কর্মধারাদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে তো ফায়-এর মাল তাঁর ইখতিয়ারে ছিল। তিনি যেখানে ভাল বিবেচনা করতেন ব্যয় করতেন। তাঁর ওফাতের পর এই মাল খলীফাগণের ইখতিয়ারে ছিল।

এই মালে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যে অংশ ছিল তা তাঁর ওফাতের পর মওকুফ হয়ে যায়। তাঁর আত্মীয়বর্গকে এই মাল থেকে অংশ দেওয়ার দ্বিবিধ কারণ ছিল। এক. তাঁরা ইসলামী কর্মকাণ্ডে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহায্য করতেন। তাই বিত্তশালী আত্মীয়বর্গকেও এ থেকে অংশ দেওয়া হত।

দুই. রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বজনদের জন্য সদকার মাল হারাম করা হয়েছিল। তাই তাঁদের নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তগণকে ফায়-এর মাল থেকে এর পরিবর্তে অংশ দেওয়া হত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর সাহায্য খতম হয়ে যায়। ফলে বিত্তশালী স্বজনদের অংশও রসূল (সা)-এর অংশের ন্যায় মওকুফ হয়ে যায়। তবে অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনের অংশ অভাবগ্রস্ততার কারণে অব্যাহত রয়েছে। তারা অন্য অভাবগ্রস্তদের মুকাবিলায় অগ্রগণ্য হবেন।—(হিদায়া)

كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ—যে সম্পদ পরস্পরে আদান-প্রদান হয়, তাকে دُولَةً বলা হয়।—(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই যে, উপরোক্ত ধনসম্পদের হকদার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিত্তশালী-দের মধ্যকার পুঞ্জীভূত সম্পদ না হয়ে যায়। এতে মূর্খতা যুগের একটি কু-প্রথার মূলোৎ-পাটনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কু-প্রথা ছিল এই যে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অংশ থাকত না।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার প্রতি ইসলামী আইনের মরণাঘাত ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব পালক। তাঁর সৃজিত হওয়ার দিক দিয়ে মানবিক প্রয়োজনের সম্পদরাজিতে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। এতে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যেও কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। অতএব পরিবারগত ও শ্রেণীগত এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য রাখার তো প্রশ্নই উঠে না। বায়ু, শূন্যমণ্ডল, সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের আলো, শূন্যমণ্ডলে সৃষ্ট মেঘমালা, বৃষ্টি—এগুলো মানুষের সহজাত ও আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী। এগুলো ব্যতীত মানুষ সামান্যক্ষণও জীবিত থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো স্বহস্তে রেখে এভাবে বণ্টন করেছেন, যাতে প্রতি স্তর ও প্রতি ভূখণ্ডের দুর্বল ও সবল মানুষ এগুলো দ্বারা সমভাবে উপকৃত হতে পারে। এ ধরনের দ্রব্য সামগ্রীকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রজ্ঞা বলে সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়া ও একচ্ছত্র অধিকারের উর্ধ্বে রেখেছেন। ফলে এগুলোর উপর ব্যক্তিগত দখল প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য কারও নেই। এগুলো ওয়াক্ফে আম। কোন বৃহত্তর সরকার ও পরাশক্তি এগুলোকে কুক্ষিগত করতে সক্ষম নয়। সৃষ্ট জীব সর্বত্রই এগুলো সমভাবে লাভ করে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দ্বিতীয় কিস্তি হচ্ছে ভূগর্ভ থেকে উদগত পানি ও আহার্য বস্তু। এগুলো যদিও সাধারণ ওয়াক্ফ নয়, কিন্তু ইসলামী আইনে পাহাড়, অনাবাদী জঙ্গল ও প্রাকৃতিক জলস্রোতকে সাধারণ ওয়াক্ফ রেখে এগুলোর কতকাংশের উপর বিশেষ বিশেষ লোকের বৈধ মালিকানার অধিকারও দেওয়া হয়। অপরদিকে অবৈধ দখল প্রতিষ্ঠা-কারীরাও ভূমির উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে নেয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কোন বৃহত্তর পুঁজিপতি

ও দরিদ্র, কৃষক ও শ্রমিকদেরকে সাথে না নিয়ে ভূগর্ভে নিহিত সম্পদরাজি অর্জন করতে পারে না। কাজেই দখল প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও পুঁজিপতিরা অপরাপর দরিদ্রদেরকে অংশীদার করতে বাধ্য থাকে।

তৃতীয় কিস্তি হচ্ছে স্বর্ণ, রৌপ্য ও টাকা-পয়সা। এগুলো আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর তালিকাভুক্ত নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অর্জনের উপায় করেছেন। খনি থেকে উত্তোলন করার পর বিশেষ আইনের অধীনে এগুলো উত্তোলনকারীর মালিকানাধীন হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন পন্থায় অন্য লোকদের দিকে মালিকানা স্থানান্তরিত হতে থাকে। যদি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে এগুলো যথাযথ পন্থায় আবর্তিত হয়, তবে কোন মানুষ ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ এগুলো দ্বারা কেবল নিজেই উপকৃত হতে চায়, অন্যান্য লোকও উপকৃত হোক, তা চায় না। এই কার্পণ্য ও লালসা দুনিয়াতে সম্পদ ও পুঁজি আহরণের নতুন ও পুরাতন অনেক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যার ফলে সম্পদের আবর্তন কেবল পুঁজিপতি ও বিত্তশালীদের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এর অশুভ প্রতিক্রিয়াই আজ দুনিয়াতে কমিউনিজম ও সোশ্যালিজমের মত অযৌক্তিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে।

ইসলামী আইন একদিকে ব্যক্তি মালিকানার প্রতি এতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেছে যে, এক ব্যক্তির সম্পদকে তার প্রাণের সমান এবং প্রাণকে বায়তুল্লাহ্র সমান গুরুত্ব দান করেছে। এর উপর কারও অবৈধ হস্তক্ষেপকে কঠোরভাবে বারণ করেছে। অপরদিকে যে হাত অবৈধ পন্থায় এই সম্পদের দিকে অগ্রসর হয় সেই হাত কেটে দিয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে দ্রব্যসামগ্রীর উপর কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

অর্থোপার্জনের প্রচলিত পন্থাসমূহের মধ্যে সুদ সট্টা ও জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ সংকুচিত হয়ে কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। ইসলাম এগুলোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা ইত্যাদি কাজ-কারবারে এগুলোর মূল কেটে দিয়েছে। যে অর্থ-সম্পদ কোন ব্যক্তির কাছে বৈধ পন্থায় সঞ্চিত হয়, তাতেও যাকাত, ওশর, ফিতরা, কাফ্ফারা ইত্যাদি ফরয কর্মের আকারে এবং অতিরিক্ত স্বেচ্ছামূলক দানের আকারে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এসব ব্যয়বহনের পরও মৃত্যুর সময় ব্যক্তির কাছে যে অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায়, তা এক বিশেষ প্রজ্ঞাভিত্তিক নীতিমালা অনুযায়ী মৃতের নিকট থেকে নিকটতম স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। ইসলাম এই ত্যাজ্য সম্পদ সাধারণ দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করার আইন রচনা করেনি। কারণ, এরূপ করলে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই তার সম্পদ অযথা ব্যয় করে নিঃশেষ করে দিতে স্বভাবগত কারণেই আগ্রহী হত। এখন তারই আত্মীয় ও প্রিয়জন পাবে দেখে তার অন্তরে এই প্রেরণা লালিত হবে না।

অর্থোপার্জনের অপর পন্থা হচ্ছে যুদ্ধ ও জিহাদ। এই পন্থায় অর্জিত ধনসম্পদ সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য ইসলাম যে নীতিমালা অবলম্বন করেছে, তার কিয়দংশ সূরা আনফালে এবং

কিয়দংশ এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেমন জ্ঞানপাপী তারা, যারা ইসলামের এহেন ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ছেড়ে নতুন ইজম অবলম্বন করে বিশ্ব শান্তির পায়ে কুঠারাঘাত করছে।

এই—وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ

আয়াত ফায়-এর মাল বণ্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর উপযুক্ত অর্থ এই যে, ফায়-এর মাল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা হকদারদের শ্রেণী বর্ণনা করেছেন ঠিক; কিন্তু তাদের মধ্যে কাকে কতটুকু দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুবিবেচনার উপর রেখে দিয়েছেন। তাই এই আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে যে পরিমাণ দেন, তা সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেষ্টা করো না।

অতঃপর اتَّقُوا اللّٰهَ বলে এই নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ভ্রান্ত ছলচাতুরির মাধ্যমে অতিরিক্ত আদায় করে নিলেও আল্লাহ্ তা'আলা সব খবর রাখেন। তিনি এজন্য শাস্তি দেবেন।

রসূলের নির্দেশ কোরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয়ঃ কিন্তু আয়াতের ভাষা ধন সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং শরীয়তের বিধি-বিধানও এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপক ভঙ্গিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যে কোন নির্দেশ অথবা ধনসম্পদ অথবা অন্য কোন বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা দরকার।

অনেক সাহাবায়ে কিরাম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রত্যেক নির্দেশকে কোরআনের নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করেছেন। কুরতুবী বলেনঃ আয়াতে آتَى শব্দের বিপরীতে نَهَى শব্দ ব্যবহার করায় বোঝা যায় যে, এখানে آتَى শব্দের অর্থ أَمَرَ অর্থাৎ যা আদেশ করেন। কারণ এটাই نَهَى এর বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ। তবে কোরআন পাক এর পরিবর্তে آتَى শব্দ এজন্য ব্যবহার করেছে যাতে 'ফায়'-এর মাল বণ্টন সম্পর্কিত বিষয়বস্তুও এতে শামিল থাকে। কারণ, এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি আনা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) জনৈক ব্যক্তিকে ইহ্রাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। লোকটি বললঃ আপনি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত বলতে পারেন কি, যাতে সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, এ সম্পর্কে আয়াত আছে; অতঃপর তিনি وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ আয়াতটি পাঠ করে দিলেন। ইমাম শাফেয়ী একবার

উপস্থিত লোকজনকে বললেন ঃ আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াব কোরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞাসা কর যা জিজ্ঞাসা করতে চাও। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ এক ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেয়ী (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন।—(কুরতুবী)

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ—রুকূর শেষ পর্যন্ত এই কয়েকটি আয়াতে দরিদ্র মুহাজির, আনসার ও তাঁদের পরবর্তী সাধারণ উম্মত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাকরণিক দিক দিয়ে للفقراء-শব্দটি لذى القربى থেকে بدل হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতে আছে।—(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণ ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্ততার কারণে ফায়-এর মালের হকদার গণ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকীন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ, তাঁদের ধর্মীয় খিদমত এবং ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত।

সদকার মালে ধর্মপরায়ণ ও দীনের খিদমতে নিয়োজিত অভাবগ্রস্তদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ঃ এ থেকে বোঝা গেল যে, সদকার মাল বিশেষত ফায়-এর মাল সাধারণ অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করার জন্য হলেও তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, ধার্মিক, বিশেষত দীনের খিদমতে নিয়োজিত তালিবে-ইলম ও আলিম, তাদেরকে অন্যদের চাইতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষা, প্রচার ও জনসংস্কারের কাজে নিয়োজিত আলিম, মুফতী ও বিচারকগণকে ফায়-এর মাল থেকে খোরপোশ দেওয়ার প্রচলন ছিল। কেননা, আলোচ্য আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামকেও প্রথমে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এক. মুহাজির, যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য অভূতপূর্ব ত্যাগ স্বীকার করেন এবং ইসলামের জন্য ঘোরতর বিপদাপদ হাসিমুখে বরণ করে নেন। অবশেষে সহায়-সম্পত্তি স্বদেশ ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেন। দুই. আনসার যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথী মুহাজিরগণকে মদীনায় ডেকে এনে সারা দুনিয়ার মানুষকে নিজেদের শত্রুতে পরিণত করেন এবং তাঁদের এমন আতিথেয়তা করেন, যার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দুই শ্রেণীর পর তৃতীয় শ্রেণী সেসব মুসলমানের সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা সাহাবায়ে কিরামের পর ইসলাম গ্রহণ করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই তিন শ্রেণীর কিছু শ্রেষ্ঠত্ব, গুণ গরিমা ও দীনের খিদমত বর্ণনা করা হয়েছে।

মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ أُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

এতে মুহাজিরগণের প্রথম গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্বদেশ ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমর্থক ও সাহায্যকারী, শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফিররা তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধনসম্পদ ও বাস্তুভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীতবস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট থেকে আত্ম রক্ষা করতেন।—(মাযহারী, কুরতুবী)

মুসলমানদের ধনসম্পদের উপর কাফিরদের দখল সম্পর্কিত বিধান : আলোচ্য আয়াতে মুহাজিরগণকে ফকীর বলা হয়েছে। ফকীর সেই ব্যক্তি, যার মালিকানায় কিছু না থাকে অথবা নিসাব পরিমাণ কোন কিছু না থাকে। মক্কায় তাঁদের অধিকাংশই ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্বলের অধিকারী ছিলেন। হিজরতের পরও যদি সেই ধনসম্পদ তাঁদের মালিকানায় থাকত, তবে তাঁদেরকে ফকীর ও নিঃস্ব বলা ঠিক হত না। কোরআন পাক তাঁদেরকে ফকীর বলে ইঙ্গিত করেছে যে, হিজরতের পর তাঁদের মক্কায় পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁদের মালিকানা থেকে বের হয়ে কাফিরদের দখলে চলে গেছে।

এ কারণেই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মালেক (র) বলেন : যদি মুসল-মান কোন জায়গায় হিজরত করে চলে যায় এবং তাদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি কাফিররা দখল করে নেয় অথবা আল্লাহ্ না করুন কোন দারুল-ইসলাম কাফিররা অধিকার করে মুসলমানদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবে এসব ধনসম্পদ কাফিরদের পুরোপুরি দখলের পর তাদের মালিকানায় চলে যায়। এগুলো বেচাকেনা ইত্যাদি কার্যকলাপ আইনসিদ্ধ হয়। বিভিন্ন হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ স্থলে তফসীরে মাযহারীতে সেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাজিরগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا অর্থাৎ তাঁরা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন নি এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধনসম্পদ ত্যাগ করেন নি বরং কেবলামাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। فضل শব্দটি প্রায়শ পার্থিব নিয়ামতের জন্য এবং رضوان শব্দটি পারলৌকিক নিয়ামতের জন্য ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাঁদের সাবেক ঘরবাড়ী, বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নিয়ামত কামনা করছেন।

মুহাজিরগণের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে : وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসূলকে সাহায্য করার জন্য তাঁরা উপরোক্ত সবকিছু করেছেন। আল্লাহ্কে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা বিস্ময়কর।

তাঁদের চতুর্থ গুণ হচ্ছে أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ অর্থাৎ তাঁরাই কথা ও কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কলেমা পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী বলে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অস্বীকার করার কারণে মুসলমান হতে পারে না। নাউযুবিল্লাহ্। রাফেযী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লংঘন। রসূলে করীম (সা) এই ফকীর মুহাজিরগণের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতেন। এতেই বোঝা যায় যে, হযুরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল।—(মাযহারী)

আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ

تَبَوُّء শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ করা। دار বলে হিজরতের স্থান তথা মদীনা তাইয়েবা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত ইমাম মালিক (র) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার যেসব শহরে ইসলাম পৌঁছেছে ও প্রসার লাভ করেছে, সেগুলো জিহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে; এমনকি, মক্কা মোকাররমাও। একমাত্র মদীনা শহরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঈমান ও ইসলামকে বুকে ধারণ করেছে।—(কুরতুবী)

আয়াতে تَبَوَّءُوا ক্রিয়াপদের পর دار এর সাথে ঈমানও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অবস্থান গ্রহণ কোন স্থান ও জায়গায় হতে পারে। ঈমান কোন জায়গা নয় যে, এতে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে خلصوا অথবা تمكنوا ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, ঈমানে খাঁটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। এখানে এরূপও হতে পারে যে, ঈমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। مِن قَبْلِهِمْ অর্থাৎ মুহাজির-গণের পূর্বে। এতে আনসারগণের একটি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তা এই যে, যে শহর আল্লাহ্র কাছে 'দারুল-হিজরত' ও 'দারুল-ঈমান' হওয়ার ছিল, তাতে তাঁদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা ঈমান কবুল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনসারগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ অর্থাৎ তাঁরা তাদেরকে ভালবাসেন

যারা হিজরত করে তাঁদের শহরে আগমন করেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থী। সাধারণত লোকেরা এহেন ভিটা-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেওয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাঁদেরকে স্থানই দেন নি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধনসম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইয্যত ও সম্ভ্রমের সাথে তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেওয়ার জন্য এক সাথে কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমেও এর নিষ্পত্তি করতে হয়েছে।—(মাযহারী)

তাঁদের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً

مِّمَّا أُوتُوا এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বনূ নুযায়েরের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল।

বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদ বণ্টনের ঘটনা ঃ যে সময় বনূ নুযায়ের গোত্রের ফায়-এর ধনসম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টনের ইখতিয়ার রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেওয়া হয়, তখন মুহাজিরগণ ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। তাঁদের না ছিল নিজস্ব কোন বাড়ী-ঘর এবং না ছিল বিষয়-সম্পত্তি। তাঁরা আনসারগণের গৃহে বাস করতেন এবং তাঁদেরই বিষয়-সম্পত্তিতে মেহনত মজদুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফায়-এর সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারগণের সর্দার সাবেত ইবনে কায়স (রা)-কে ডেকে বললেন ঃ তুমি আনসারগণকে আমার কাছে ডেকে আন। সাবেত জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার নিজের গোত্র খাযরাজের আনসারগণকে ডাকব, না সব আনসারকে ডাকব? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ না, সবাইকে ডাকতে হবে। অতঃপর তিনি আনসারগণের এক সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। হামদ ও সালাতের পর তিনি মদীনার আনসারগণের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন ঃ আপনারা আপনাদের মুহাজির ভাইদের সাথে যে ব্যবহার করেছেন, তা নিঃসন্দেহে অনন্য সাধারণ সাহসিকতার কাজ। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদ আপনাদের করতলগত করে দিয়েছেন। যদি আপনারা চান, তবে আমি এই সম্পদ মুহাজির ও আনসার সবার মধ্যে বণ্টন করে দেব এবং মুহাজিরগণ পূর্ববৎ আপনাদের গৃহেই বসবাস করবে। পক্ষান্তরে আপনারা চাইলে আমি এই সম্পদ কেবল গৃহহীন ও সহায়-সম্বলহীন মুহাজিরগণের মধ্যেই বণ্টন করে দেব এবং এরপর তারা আপনাদের গৃহ ত্যাগ করে আলাদা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে নেবে।

এই বক্তৃতা শুনে আনসারগণের দুই জন প্রধান নেতা সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) দণ্ডায়মান হলেন এবং আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)! আমাদের অভিমত এই যে, এই ধনসম্পদ আপনি সম্পূর্ণই কেবল মুহাজির ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিন এবং তাঁরা এরপরও পূর্ববৎ আমাদের গৃহে বসবাস করুন। নেতাদ্বয়ের এই উক্তি

শুনে উপস্থিত আনসারগণ সমস্বরে বলে উঠলেন ঃ আমরা এই সিদ্ধান্তে সম্মত ও আনন্দিত। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সকল আনসার ও তাঁদের সন্তানগণকে দোয়া দিলেন এবং ধনসম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আনসারগণের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি অর্থাৎ সহল ইবনে হানীফ ও আবু দুজানাকে অত্যধিক অভাবগ্রস্ততার কারণে অংশ দিলেন। গোত্রনেতা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা)-কে ইবনে আবী হাকীকের একটি বিখ্যাত তরবারি প্রদান করা হল।—(মাযহারী)

উল্লিখিত আয়াতে حَاجَةً বলে প্রয়োজনের বস্তু এবং مِمَّا أُوتُوا এর সর্বনাম দ্বারা মুহাজিরগণকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, এই বণ্টনে যা কিছু মুহাজিরগণকে দেওয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন ; যেন তাঁদের এসব জিনিসের কোন প্রয়োজনই ছিল না। মুহাজিরগণকে দেওয়াকে খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর মুকাবিলায় যখন বাহরাইন বিজিত হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রাপ্ত ধনসম্পদ সম্পূর্ণই আনসারগণের মধ্যে বিলিবণ্টন করে দিতে চাইলেন ; কিন্তু তাঁরা তাতে রাযী হলেন না, বরং বললেন ঃ আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধনসম্পদ থেকে অংশ না দেওয়া হয়।—(বুখারী, ইবনে কাসীর)

আনসারগণের চতুর্থ গুণ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ — خَصَاصَةٌ শব্দের অর্থ দারিদ্র্য ও উপবাস। إِيثَار -এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রে রাখা। আয়াতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন, যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ছিলেন।

সাহাবীগণের, বিশেষত আনসারগণের আত্মত্যাগের কয়েকটি ঘটনা ঃ আয়াতের তফসীরের জন্য ঘটনাবলী বর্ণনা করা জরুরী নয়, কিন্তু এসব ঘটনা মানুষকে উৎকৃষ্ট মানবতা শিক্ষা দেয় এবং জীবনে বিপ্লব আনয়ন করে। তাই তফসীরবিদগণ এ স্থলে এসব ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এখানে তফসীরে কুরতুবী থেকে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হল।

তিরমিযীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, জনৈক আনসারীর গৃহে রাত্রিবেলায় একজন মেহমান আগমন করল। তাঁর কাছে এই পরিমাণ খাদ্য ছিল, যা তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তানগণ খেতে পারেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন ঃ বাচ্চাদেরকে কোনরূপে শুইয়ে দাও। অতঃপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে মেহমানের সামনে

আহার্য রেখে কাছাকাছি বসে যাও, যাতে মেহমান মনে করে যে, আমরাও খাচ্ছি; কিন্তু আসলে আমরা খাব না। এভাবে মেহমান পেট ভরে খেতে পারবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ আয়াতখানি নাযিল হয়।

তিরমিযীতেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমি ক্ষুধায় অতিষ্ঠ। তিনি একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে জওয়াব আসল ঃ আমার কাছে এক্ষণে পানি ব্যতীত কিছুই নেই। অন্য একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে সেখানে থেকেও তাই জওয়াব আসল। অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ এমনকি, সকল বিবির কাছে খোঁজ নেওয়া হলে সবার কাছ থেকে একই জওয়াব পাওয়া গেল যে, পানি ব্যতীত গৃহে কিছুই নেই। অগত্যা রসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ কে আছ, যে এই ব্যক্তিকে আজ রাত অতিথি করে নেবে? জনৈক আনসারী আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমি করব। অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং গৃহে পৌঁছে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিছু খাবার আছে কি? উত্তর হল ঃ আমাদের বাচ্চারা খেতে পারে, এই পরিমাণ খাদ্য আছে। আনসারী বললেন ঃ বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দাও। অতঃপর মেহমানের সামনে খাবার রেখে আমরাও সাথে বসে যাব। এরপর বাতি নিভিয়ে দেবে, যাতে মেহমান আমাদের না খাওয়ার বিষয় জানতে না পারে। সেমতে মেহমান আহার করল। সকালে আনসারী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ গতরাতে তুমি মেহমানের সাথে যে ব্যবহার করেছ, তা আল্লাহ্ তা'আলা অত্যধিক পছন্দ করেছেন।

মেহদভী হযরত সাবেত ইবনে কায়সের সাথে জনৈক আনসারীর এমনি ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতে প্রত্যেক ঘটনার সাথে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

কুশায়রী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মান্যবর সাহাবীর কাছে এক ব্যক্তি একটি বকরীর মাথা উপঢৌকন পেশ করেন। সাহাবী মনে করলেন আমার অমুক ভাই ও তাঁর বাচ্চারা আমার চাইতে বেশী অভাবগ্রস্ত। সেমতে তিনি মাথাটি তার কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও এমনি-ভাবে তৃতীয় জনের কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে সাতটি গৃহে যাওয়ার পর মাথাটি আবার প্রথম সাহাবীর গৃহে ফিরে এল। এই ঘটনার পরি-প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। সা'লাবী হযরত আনাস (রা) থেকেও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে কিছু চাইল। তাঁর গৃহে তখন একটি মাত্র রুটি ছিল এবং তিনি সেদিন রোযা রেখেছিলেন। তিনি পরিচারিকাকে বললেন ঃ এই রুটি তাকে দিয়ে দাও। পরিচারিকা বলল ঃ এই রুটি দিয়ে দিলে আপনার ইফতার করার কিছু থাকবে না। হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ না থাক, তুমি দিয়ে দাও। পরিচারিকা বর্ণনা করে—যখন সন্ধ্যা হল, তখন উপঢৌকন

প্রেরণে অভ্যস্ত নয়—এমন এক ব্যক্তি হযরত আয়েশার কাছে একটি আস্ত ভাজা করা বকরী উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করল। তার উপর ময়দার আটার আবরণী ছিল। আরবে একে সর্বোত্তম খাদ্য মনে করা হত। হযরত আয়েশা (রা) পরিচারিকাকে ডেকে বললেন : খাও, এটা তোমার সেই রুটি থেকে উত্তম।

নাসায়ী বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর অসুস্থ অবস্থায় আঙুর খাও-য়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে এক দিরহামের বিনিময়ে এক গুচ্ছ আঙুর কিনে আনা হয়। ঘটনা-ক্রমে তখন এক মিসকীন এসে উপস্থিত হল এবং কিছু চাইল। অসুস্থ ইবনে ওমর বললেন : আঙুরের গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দাও। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি গোপনে মিসকীনের পেছনে পেছনে গেল এবং গুচ্ছটি তার কাছ থেকে কিনে হযরত ইবনে ওমরের সামনে পেশ করল। কিন্তু ভিক্ষুকটি আবার আসল এবং কিছু চাইল। হযরত ইবনে ওমর পুনরায় গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দিলেন। আবার এক ব্যক্তি গোপনে ভিক্ষুকের পেছনে পেছনে যেয়ে এক দিরহামের বিনিময়ে গুচ্ছটি কিনে আনল এবং হযরত ইবনে ওমরের কাছে পেশ করল। ভিক্ষুকটি আবার ধরনা দিতে চাইলে সবাই তাকে নিষেধ করল। হযরত ইবনে ওমর যদি জানতে পারতেন যে, এটা সেই সদকায় দেওয়া গুচ্ছ, তবে কিছুতেই তা খেতেন না। কিন্তু তিনি বাজার থেকে আনা হয়েছে ভেবে তা ব্যবহার করলেন।

ইবনে মুবারক নিজ সনদে বর্ণনা করেন, একবার খলীফা উমর ফারূক (রা) একটি থলিয়ায় চার শ' দীনার ভরে থলিয়াটি চাকরের হাতে দিয়ে বললেন : এটি আবূ ওবায়দা ইবনে জাররাহের কাছে নিয়ে যাও এবং বল : খলীফার পক্ষ থেকে এই হাদিয়া কবূল করে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করুন। তিনি চাকরকে আরও বলে দিলেন : হাদিয়া পেশ করার পর তুমি কিছুক্ষণ দেরী করবে এবং দেখবে যে, আবূ ওবায়দা কি করেন। চাকর নির্দেশ অনুযায়ী থলিয়াটি হযরত আবূ ওবায়দা (রা)-র কাছে পেশ করে কিছুক্ষণ দেরী করল। আবূ ওবায়দা (রা) থলিয়া হাতে নিয়ে দোয়া করলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ওমরের প্রতি রহম করুন এবং তাকে উত্তম বিনিময় দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ দাসীকে ডেকে বললেন : নাও, এই সাত অমুককে এবং পাঁচ অমুককে দিয়ে এস। এভাবে গোটা চার শ' দীনার তিনি তখনই বণ্টন করে দিলেন।

চাকর ফিরে এসে ঘটনা বর্ণনা করল। হযরত উমর (রা) এমনিভাবে আরও চার শ' দীনার অপর একটি থলিয়ায় ভর্তি করে চাকরের হাতে দিয়ে বললেন : এটি মুয়ায ইবনে জবলকে দিয়ে এস এবং কিছুক্ষণ দেরী করে লক্ষ্য কর তিনি কি করেন। চাকর নিয়ে গেল। হযরত মুয়ায ইবনে জবল থলিয়া হাতে নিয়ে হযরত উমর (রা)-র জন্য দোয়া করলেন। তিনিও থলিয়া খুলে কালবিলম্ব না করে বণ্টনে বসে গেলেন। তিনি দীনারগুলো অনেক ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন গৃহে প্রেরণ করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ব্যাপার দেখে যাচ্ছিলেন। অবশেষে বললেন : আমিও তো মিসকীনই। আমাকেও কিছু দিন না কেন? তখন থলিয়াতে মাত্র দু'টি দীনার অবশিষ্ট ছিল। সেমতে তাই তাঁকে দিয়ে দিলেন। চাকর এই দৃশ্য দেখে ফিরে এল এবং খলীফার কাছে বর্ণনা করল। খলীফা বললেন : এরা সবাই ভাই ভাই। সবার স্বভাব একই রূপ।

হযায়ফা আদভী বলেন ঃ আমি ইয়ারমুক যুদ্ধে আমার চাচাত ভাইয়ের খোঁজে শহীদদের লাশ দেখার জন্য বের হলাম। সাথে কিছু পানি নিলাম, যাতে তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখলে পান করিয়ে দিতে পারি। তার নিকটে পৌঁছে দেখলাম যে, প্রাণের স্পন্দন এখনও নিঃশেষ হয়নি। আমি বললাম ঃ আপনাকে পানি পান করাব কি? তিনি ইঙ্গিতে 'হ্যাঁ' বললেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কাছে থেকে অন্য একজন শহীদের আহ্ আহ্ শব্দ কানে এল। আমার ভাই বললেন ঃ এই পানি তাকে দিয়ে দাও। আমি তার কাছে পৌঁছে পানি দিতে চাইলে তৃতীয় একজনের কাতরানোর আওয়াজ কানে এল। সে-ও এই তৃতীয়জনকে পানি দিয়ে দিতে বলল। এমনিভাবে একের পর এক করে সাতজন শহীদের সাথে একই ঘটনা সংঘটিত হল। আমি যখন সপ্তম শহীদের কাছে গেলাম, তখন সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। সেখান থেকে আমি আমার ভাইয়ের কাছে এসে দেখি তিনিও খতম হয়ে গেছেন।

কিছু আনসারগণের এবং কিছু মুহাজিরগণের মিলিয়ে এই কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল। অধিকাংশ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। কারণ, যে ধরনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় যদি সেই ধরনের অন্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়, তবে বলে দেওয়া হয় যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃত সত্য এই যে, সবগুলো ঘটনাই আয়াত অবতরণের কারণ।

একটি সন্দেহ নিরসন ঃ সাহাবায়ে কিরামের উপরোক্ত আত্মত্যাগের ঘটনাবলী সম্পর্কে হাদীসদৃষ্টে একটি সন্দেহ দেখা দেয়। তা এই যে, রসূলে করীম (সা) মুসলমানগণকে তাদের সম্পূর্ণ ধনসম্পদ সদকা করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে আছে জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে একটি ডিম্ব পরিমাণ স্বর্ণের টুকরা সদকার জন্য পেশ করলে তিনি তা লোকটির দিকে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ তোমাদের কেউ কেউ তার যথাসর্বস্ব সদকা করার জন্য নিয়ে আসে। এরপর অভাবগ্রস্ত হয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত পাতে।

এসব রেওয়ায়েত থেকেই এই সন্দেহের জওয়াব পাওয়া যায় যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। প্রত্যেক অবস্থার জন্য আলাদা বিধানও হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ধনসম্পদ দান করার নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্য ও উপবাস দেখা দিলে সবর করতে সক্ষম নয় এবং কৃতদানের জন্য আফসোস করে অথবা মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যারা অসম সাহসিক ও দৃঢ়চেতা, সবকিছু ব্যয় করার পর দারিদ্র্য ও উপবাসের কারণে পেরেশান হয় না; বরং সাহসিকতার সাথে সবর করতে সক্ষম, তাদের জন্য সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দেওয়া জায়েয। উদাহরণত এক জিহাদের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর যথা-সর্বস্ব চাঁদা হিসাবে পেশ করে দিয়েছিলেন। উপরোক্ত ঘটনাবলী এরই নযীর। এহেন দৃঢ়চেতা লোকগণ তাঁদের সন্তান-সন্ততিকেও সবর ও দৃঢ়তায় অভ্যস্ত করে রেখেছিলেন। ফলে এতে তাদেরও কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হত না। স্বয়ং সন্তানদের হাতে ধনসম্পদ থাকলে তারাও তাই করত।—(কুরতুবী)

মুহাজিরগণের পক্ষ থেকে আনসারগণের ত্যাগের বিনিময় : দুনিয়াতে কোন সংঘবদ্ধ মহতী উদ্যোগ একতরফা উদারতা ও আত্মত্যাগ দ্বারা কায়েম থাকতে পারে না, যে পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে এমনি ধরনের ব্যবহার না হয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) যেমন মুসলমানদেরকে পরস্পরে উপঢৌকন আদান-প্রদান করে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেছেন, তেমনি যাকে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তাকেও উপঢৌকন দাতার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : যদি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকে, তবে আর্থিক প্রতিদান, নতুবা দোয়ার মাধ্যমেই তার অনুগ্রহের বিনিময় দান কর। অর্বাচীনের ন্যায় কারও অনুগ্রহের বোঝা মাথায় নিতে থাকা ভদ্রতা ও সাধু চরিত্রের পরিপন্থী।

মুহাজিরগণের ব্যাপারে আনসারগণ অপূর্ব আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। নিজেদের গৃহে, দোকানে, কাজ-কারবারে ও শস্যক্ষেত্রে তাঁদেরকে অংশীদার করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন মুহাজিরগণকে সচ্ছলতা দান করলেন তখন তাঁরাও আনসারগণের অনুগ্রহের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করেন নি।

কুরতুবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত ছিলেন এবং মদীনার আনসারগণ বিষয়সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আনসারগণ তাঁদেরকে সব বস্তুই অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দেন এবং বাগানের অর্ধেক ফল বাৎসরিক তাঁদেরকে দিতে থাকেন। হযরত আনাস (রা)-এর জননী উম্মে সুলায়ম নিজের কয়েকটি খর্জুর বৃক্ষ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিয়েছিলেন। তিনি তা উসামা ইবনে যায়দের জননী উম্মে আয়মনকে দান করে দেন।

ইমাম যুহরী বলেন : আমাকে হযরত আনাস (রা) জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর যুদ্ধ থেকে বিজয়ীবেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন, তখন প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানগণ লাভ করেন। এ সময় সকল মুহাজিরই আনসারগণের দান হিসাব করে তাঁদেরকে প্রত্যর্পণ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জননীর খর্জুর বৃক্ষ উম্মে আয়মনের কাছ থেকে নিয়ে আমার জননীর হাতে প্রত্যর্পণ করেন। উম্মে আয়মনকে এর পরিবর্তে নিজের বাগান থেকে বৃক্ষ দিলেন।

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ—আনসারগণের আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্র পথে সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসাবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ্র কাছে সফলকাম। شُحّ ও بُخْل শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থবোধক। তবে شُحّ শব্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে। ফলে এর অর্থ অতিশয় কৃপণতা। যাকাত, ফিতরা, ওশর, কুরবানী ইত্যাদি আল্লাহ্র ওয়াজিব হক আদায়ে অথবা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ, অভাবগ্রস্ত পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বান্দার ওয়াজিব হক আদায়ে কৃপণতা করা হলে তা নিশ্চিতরূপে হারাম। যে কৃপণতা মুস্তাহাব বিষয় ও দান খয়রাতের ফযীলত অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়, তা মকরূহ ও নিন্দনীয় এবং যা প্রথাগত কাজে প্রতিবন্ধক হয়, তা শরীয়তের আইনে কৃপণতা নয়।

কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। কোরআন ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্য সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে আনসারগণের যে গুণাবলী উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাঁরা কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র হওয়া জান্নাতী হওয়ার আলামত : ইমাম আহ্মদ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

আমরা একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন : এক্ষণি তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে। সেমতে কিছুক্ষণ পরই জনৈক আনসারী আগমন করলেন। তাঁর দাড়ি থেকে ওযুর পানি টপকে পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে জুতা জোড়া ছিল। দ্বিতীয় দিনও এমনি ঘটনা ঘটল এবং সেই ব্যক্তি একই অবস্থায় আগমন করলেন। তৃতীয় দিনও তাই হল এবং এই ব্যক্তি উল্লিখিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। এ দিন রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মজলিস ত্যাগ করলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) এই ব্যক্তির পেছনে লাগলেন (যাতে তাঁর জান্নাতী হওয়ার ভেদ জানতে পারেন)। তিনি আনসারীকে বললেন : পারিবারিক কলহের কারণে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তিন দিন নিজের গৃহে যাব না। আপনি যদি অসুবিধা মনে না করেন, তবে তিন দিন আমাকে নিজের বাড়ীতে থাকতে দিন। আনসারী সানন্দে এই প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর তিন রাত্রি তাঁর বাড়ীতে অতিবাহিত করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আনসারী রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য 'গাত্রোত্থান' করেন না। তবে নিদ্রার জন্য শয্যা গ্রহণের পূর্বে কিছু আল্লাহ্র যিকির করেন। এরপর ফজরের নামাযের জন্য উঠেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বলেন : তবে এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁর মুখে ভাল কথা ছাড়া কিছু শুনিনি। এভাবে তিন রাত্রি কেটে গেল। আমার অন্তরে যখন তাঁর আমল সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব বদ্ধমূল হওয়ার উপক্রম হল, তখন আমি তাঁর কাছে আমার আগমনের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দিলাম এবং বললাম : আমার গৃহে কোন কলহ-বিবাদ ছিল না। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখে তিন দিন পর্যন্ত শুনলাম যে, তোমাদের কাছে এখন একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে। এরপর তিন দিনই আপনি আসলেন। তাই আমার ইচ্ছা হল যে, আপনার সাথে থেকে দেখব কি আমলের কারণে আপনি এই ফযীলত অর্জন করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি আপনাকে কোন বড় আমল করতে দেখলাম না। অতএব, কি বিষয়ের দরুন আপনি এই স্তরে উন্নীত হয়েছেন? তিনি বললেন : আপনি যা দেখলেন, এছাড়া আমার কাছে অন্য কোন আমল নেই। আমি একথা শুনে প্রস্থানোদ্যত হলে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন : হ্যাঁ, একটি বিষয় আছে। তা এই যে, আমি আমার অন্তরে কোন মুসলমানদের প্রতি জিঘাংসা ও কুধারণা খুঁজে পাই না এবং এমন কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করি না, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কল্যাণ দান করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন : ব্যস, এ গুণটিই আপনাকে এই উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে।

ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন : ইমাম নাসায়ীও 'আমলুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ্' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ্।

মুহাজির ও আনসারগণের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমান : وَالَّذِينَ جَاءُوا

مِن بَعْدِهِمْ এই আয়াতের অর্থে সাহাবায়ে কিরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছে এবং এই আয়াত তাদের সবাই-কে ফায়-এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করেন নি ; বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াক্ফ হিসাবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব সম্পত্তির আমদানী ইসলামী বায়তুলমালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বন্টন করে দেওয়ার আবেদন করলে তিনি এই আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার করতাম, তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম ; যেমন রসূ-লুল্লাহ্ (সা) খায়বরের সম্পত্তি বন্টন করে দিয়েছিলেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্য কি অবশিষ্ট থাকবে? —(মালিক, কুরতুবী)

সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসা ও মাহাত্ম্য অন্তরে পোষণ করা মুসলমানদের সত্যপন্থী হওয়ার পরিচায়ক : এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও আনসারগণের বিশেষ গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বও এ স্থলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কিরামের ঈমানে অগ্রগামিতা এবং তাদের কাছে ঈমান পৌঁছানোর মাধ্যম হওয়ার গুণটিকে সম্যক বুঝে এবং সবার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। এছাড়া নিজেদের জন্যও এরূপ দোয়া করে : আল্লাহ্ আমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান ও ইস-লাম কবূল হওয়ার শর্ত হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের মাহাত্ম্য ও ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা। যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই হযরত মুসাব ইবনে সা'দ (রা) বলেন : উম্মতের সকল মুসলমান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার। এখন সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মহব্বত পোষণকারী এক শ্রেণী বাকী

রয়ে গেছে। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কোন আসন কামনা কর, তবে এই তৃতীয় শ্রেণীতে দাখিল হয়ে যাও।

হযরত হুসাইন (রা)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে (তাঁর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর) প্রশ্ন করেছিল। তিনি পাল্টা প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত? সে নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন: তবে কি আনসারগণের একজন? সে বলল: না। হযরত হুসাইন (রা) বললেন: এখন তৃতীয় আয়াত اَلَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْۢ بَعْدِهِمْ বাকী রয়ে গেছে। তুমি যদি হযরত ওসমান গনী (রা) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করতে চাও, তবে এই তৃতীয় শ্রেণী থেকেও খারিজ হয়ে যাবে।

কুরতুবী বলেন: এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা রাখা আমাদের জন্য ওয়াজিব। ইমাম মালেক (র) বলেন: যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের ফায়-এর মালে তাঁর কোন অংশ নেই। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ফায়-এর মালে প্রত্যেক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তার ইসলাম ও ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা সকল মুসলমানকে সাহাবায়ে কিরামের জন্য ইস্তিগফার ও দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্ জানতেন যে, তাঁদের পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহও হবে। তাই তাঁদের পারস্পরিক বাদানুবাদের কারণে তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি কুধারণা পোষণ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন: আমি তোমাদের নবী (সা)-র মুখে শুনেছি—এই উম্মত ততদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, যতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা না করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বলেন: তুমি যদি কাউকে দেখ যে, কেউ কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বল: যে তোমাদের মধ্য থেকে অধিক মন্দ তার উপর আল্লাহ্র লানত হোক। বলা বাহুল্য, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না—যে তাঁকে মন্দ বলে সে-ই হবে। সারকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা লানতের কারণ।

আওয়াম ইবনে হাওশব বলেন: এই উম্মতের পূর্ববর্তিগণ মানুষকে সাহাবায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে তাঁদের ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আমি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে একনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তাঁরা আরও বলতেন: সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে মতবিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করো না, করলে মানুষের ধৃষ্টতা বেড়ে যাবে। —(কুরতুবী)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا
أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝
لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ
نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ۝ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً
فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَا
يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ
بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَعْقِلُونَ ۝ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا
كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ فَكَانَ عَا
قِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝

(১১) আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে বলেঃ তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও; তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিষ্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফিররা কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (১৪) তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড

হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধা বিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রদায়। (১৫) তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট পূর্বে নিজেদের কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৬) তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফির হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফির হয়, তখন শয়তান বলে : তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করি। (১৭) অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালিমদের শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি মুনাফিকদেরকে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রমুখকে) দেখেন নি? ওরা তাদের (সহধর্মী) কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে বলে : (অর্থাৎ বলত। কেননা, এই সূরা বনূ নুযায়েরের নির্বাসন ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয়েছে)। আল্লাহ্র কসম, (আমরা সর্বাবস্থায় তোমাদের সাথে আছি)। যদি তোমরা (তোমাদের মাতৃভূমি থেকে জোর জবরে বহিষ্কৃত হও, তবে আমরাও) তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। অর্থাৎ তোমাদের সাথে আসার ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করে যে যতই বোঝাক না কেন, আমরা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। (এটা তাদের মিথ্যাবাদিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অতঃপর বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে :) আল্লাহ্র কসম, যদি কিতাবধারী কাফিররা বহিষ্কৃত হয় তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না। আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে ওরা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। যদি (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) তাদেরকে সাহায্যও করে (এবং যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ করে) তবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর (তাদের পলায়নের পর) কিতাবধারী কাফিররা কোন সাহায্য পাবে না। (অর্থাৎ সাহায্যকারী যারা ছিল, তারা তো পলায়ন করেছে। অন্য কোন সাহায্যকারীও হবে না। সুতরাং অবশ্যই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে। মোটকথা, মুনাফিকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সহধর্মী ভাইদের উপর কোন বিপদ আসতে না দেওয়া। এই উদ্দেশ্য অর্জনে তারা সর্বতোভাবে ব্যর্থ মনোরথ হবে। বাস্তবে তাই হয়েছিল। পরিশেষে যখন বনূ নুযায়ের বহিষ্কৃত হয়, তখন মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগী হয়নি এবং প্রথম যখন তাদেরকে অবরোধ করা হয়, যাতে যুদ্ধের আশংকা ছিল, তখনও তারা কোন সাহায্য করেনি। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে 'যদি বহিষ্কৃত হয়' ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করার এক কারণ অতীত ঘটনাকে উপস্থিত বিদ্য-মান ধরে নেওয়া, যাতে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও তাদের অসহায় থেকে যাওয়া দৃষ্টির সামনে ভাসমান হয়ে যায়। দ্বিতীয় কারণ ভবিষ্যৎ সাহায্যের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া। অতঃপর তাদের সাহায্য না করার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে :) নিশ্চয় তোমরা তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। (অর্থাৎ ঈমান দাবী করে তারা আল্লাহ্র ভয় করে বলে প্রকাশ করে, এটা মিথ্যা। নতুবা তারা কুফরী

ছেড়ে দিত। আর তোমাদেরকে ওরা বাস্তবিকই ভয় করে। এই ভয়ের কারণে তারা বনূ নুযায়েরের সাথে সহযোগিতা করতে পারে না)। এটা (অর্থাৎ তোমাদেরকে ভয় করা এবং আল্লাহ্‌কে ভয় না করা) এ কারণে যে, তারা (কুফরের কারণে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে) এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (ইহুদী ও মুনাফিকরা আলাদা আলাদা-ভাবে তো তোমাদের মুকাবিলা করতেই পারে না) তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে। (পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত হোক কিংবা দুর্গ ইত্যাদি দ্বারা। এতে জরুরী হয় না যে, কখনও এরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং মুনাফিকরা কোন সুরক্ষিত স্থান ও দুর্গ থেকে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কারণ, উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন সময় ইহুদী কিংবা মুনাফিকরা আলাদা আলাদা অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তোমাদের মুকাবিলা করতে আসেও, তবুও তাদের মুকাবিলা সুরক্ষিত দুর্গে অথবা শহর-প্রাচীরের আড়ালে থেকে হবে। সেমতে বনী কুরায়যা ও খায়বরের ইহুদীরা এমনিভাবে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কিন্তু মুনাফিকরা তাদের সাথে সহযোগিতা করেনি এবং প্রকাশ্যে মুসলমানদের মুকাবিলায় আসতে কখনও সাহস করেনি। এতে মুসলমানদের মনোবলও বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, তারা যেন ওদের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশংকা না করে। মুনাফিকদের কোন কোন গোত্র যেমন আউস ও খাযরাজের পারস্পরিক যুদ্ধ দেখে আশংকা করা উচিত নয় যে, তারা মুসলমানদের মুকাবিলায় এমনিভাবে আসতে পারবে। আসল ব্যাপার এই যে) তাদের যুদ্ধ পরস্পরের মধ্যেই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। (মুসলমানদের মুকাবিলায় তারা কিছুই নয়। তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারবে—এরূপ আশংকা করাও ঠিক নয়। কেননা) তুমি তাদেরকে (বাহ্যত) ঐক্যবদ্ধ মনে করবে, অথচ তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন। (অর্থাৎ তারা মুসলমানদের শত্রুতায় অভিন্ন ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যেও তো বিশ্বাসগত বিরোধের কারণে বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা রয়েছে। সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে :

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ الخ —অতঃপর এই অনৈক্যের কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে:)

এটা (অর্থাৎ অন্তরের অনৈক্য) এ কারণে যে, তারা (ধর্মের ব্যাপারে) এক কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রদায়। (তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আদর্শ ও লক্ষ্য বিভিন্ন হলে আন্তরিক বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এখানে তাদের অনৈক্যের কারণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। ফলে বে-দীনদের মধ্যেও কোন কোন সময় ঐক্য হতে পারে। অতঃপর বনূ নুযায়ের ও মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা সাহায্যের ওয়াদা করে ধোঁকা দিয়েছে এবং যথাসময়ে সাহায্য করেনি। তাদের সমষ্টির দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে—একটি বনূ নুযায়েরের ও অপরটি মুনাফিকদের। বনূ নুযায়েরের দৃষ্টান্ত এই যে) তারা সেই লোকদের মত, যারা (দুনিয়াতে ও) তাদের নিকট পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে এবং (পরকালেও) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [এখানে বনূ কায়নুকার ইহুদী সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তাদের ঘটনা এই : বদর যুদ্ধের পর তারা দ্বিতীয় হিজরীতে চুক্তিভঙ্গ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদেশে তারা দুর্গ

থেকে বের হয়ে এলে তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়। এরপর আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাকুতি-মিনতির কারণে মদীনা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার শর্তে তাদের প্রাণ রক্ষা করা হয়। সেমতে তারা সিরিয়ার আযরুয়াতে চলে যায় এবং তাদের ধনসম্পত্তি যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ হিসাবে বন্টন করা হয়।—(যাদুল-মা'আদ) মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত এই যে] তারা শয়তানের মত যে, (প্রথমে) মানুষকে কাফির হতে বলে অতঃপর যখন সে কাফির হয়ে যায়, (এবং দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কুফরের শাস্তিতে পতিত হয়) তখন (পরিষ্কার জওয়াব দিয়ে দেয় এবং) বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করি। (দুনিয়াতে এরূপ সম্পর্কচ্ছেদের কাহিনী সূরা আন-ফালে এবং পরকালে সম্পর্কচ্ছেদের কথা একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)। অতঃপর উভয়ের (অর্থাৎ বনূ নুযায়ের ও মুনাফিকদের) শেষ পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। এটাই জালিমদের শাস্তি। (সুতরাং শয়তান যেমন প্রথমে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, এরপর বিপদমুহূর্তে চম্পট দেয়, ফলে উভয়েই বিপদগ্রস্ত হয়, তেমনি মুনাফিকরা প্রথমে বনূ নুযায়েরকে কুপরামর্শ দিয়েছে যে, তোমরা দেশত্যাগ করো না। এরপর যখন বনূ নুযায়ের বিপদের সম্মুখীন হল, তখন মুনাফিকদের পাত্তা পাওয়া গেল না। ফলে বনূ নুযায়ের নির্বাসনের বিপদে এবং মুনাফিকরা অকৃতকার্যতার অপমানে পতিত হল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا الخ—এটা বনূ নুযায়েরের দৃষ্টান্ত। اَلَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلِهِمْ কারা? এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (র) বলেনঃ এরা হচ্ছে বদরের কাফির যোদ্ধা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ এরা ইহুদী বনূ কায়নুকা। উভয়েরই অশুভ পরিণতি তথা নিহত, পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা তখন জনসমক্ষে ফুটে উঠেছিল। কেননা, বনূ নুযায়েরের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় এবং বনূ কায়নুকার ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদরে মুশরিক-দের সত্তরজন নেতা নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।

অতএব, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-র উক্তি অনুযায়ী فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ বাক্যের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে। এটা পর-কালের আগে দুনিয়াতেই তারা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত মুজাহিদ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ইহুদী বনূ কায়নুকা হলে তাদের ঘটনাও তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

বনূ কায়নুকার নির্বাসনঃ রসূলে করীম (সা) মদীনায় আগমন করার পর মদীনার পার্শ্ববর্তী সবগুলো ইহুদী গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই

যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের কোন শত্রুকে সাহায্য করবে না। বনূ কায়নুকাও এই শান্তিচুক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা চুক্তির বিপরীত কাজকর্ম শুরু করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কাফিরদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন কোরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনের পর যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা দেখা দেয়, তবে আপনি তাদের শান্তিচুক্তি ভণ্ডুল করে দিতে পারেন। বনূ কায়নুকা নিজেরাই বিশ্বাস-ঘাতকতা করে এই চুক্তি ভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন এবং হযরত হামযা (রা)-র হাতে পতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হযরত আবূ লুবাবা (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত করে তিনি নিজেও জিহাদে রওয়ানা হলেন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে বনূ কায়নুকা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনর দিন অবরুদ্ধ থাকার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন—তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, মুকাবিলা ফলপ্রসূ হবে না। অগত্যা তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বলল ঃ আমাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) যে সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরা তাতেই সম্মত আছি।

রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক বাদ সাধল। সে চূড়ান্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাল। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করলেন ঃ তারা বসতি ত্যাগ করে চলে যাবে এবং তাদের ধনসম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। এই মীমাংসা অনুযায়ী বনূ কায়নুকা মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার আমরুয়াত এলাকায় চলে গেল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ধনসম্পত্তি বণ্টন করে এক ভাগ বায়তুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম বায়তুলমালে গনীমতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমা হল। এই ঘটনা হিজরতের বিশ মাস পর ১৫-ই শাওয়াল তারিখে সংঘটিত হয়।

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ—এটা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত, যারা বনূ নুযায়েরকে নির্বাসনের আদেশ অমান্য করতে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ যখন তাদেরকে অবরোধ করে নেয়, তখন কোন মুনাফিক সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। কোরআন পাক শয়তানের একটি ঘটনা দ্বারা তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান মানুষকে কুফর করতে প্ররোচিত করেছিল এবং তার সাথে নানা রকম ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কুফরে লিপ্ত হল, তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

আল্লাহ্ জানেন শয়তানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা তো স্বয়ং কোরআনে সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ

এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এতে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের মুকাবিলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু যখন বাস্তবিকই মুকাবিলা শুরু হয়, তখন সাহায্য করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে যদি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনায় শয়তান বাহ্যত কুফর করার আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফির ছিল। শয়তান কেবল তাদেরকে মুকাবিলায় একত্রিত হতে বলেছিল। এই আপত্তির জওয়াব এই যে, কুফরে অটল থাকতে বলা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলাও কুফর করতে বলারই অনুরূপ।

তফসীরে মাযহারী, কুরতুবী, ইবনে কাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে শয়তানের এই দৃষ্টান্তের ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বনী ইসরাঈলের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও যোগীকে শয়তান কর্তৃক বিপথগামী করে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। উদাহরণত বনী ইসরাঈলের জনৈক সন্ন্যাসী যোগী সদাসর্বদা উপাসনালয়ে যোগসাধনায় রত থাকত এবং দশ দিন অন্তর মাত্র একবার ইফতার করে রোযা রাখত। সত্তর বছর এমনিভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর অভিশপ্ত শয়তান তার পেছনে লাগে। সে তার সর্বাধিক ধূর্ত ও চালাক অনুচরকে তার কাছে সন্ন্যাসী যোগী বেশে প্রেরণ করে। সে তার কাছে পৌঁছে তার চাইতেও বেশী যোগসাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। এভাবে সন্ন্যাসী তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠে।

অবশেষে কৃত্রিম সন্ন্যাসী আসল সন্ন্যাসীকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিল, যদ্দ্বারা জটিল রোগীও আরোগ্য লাভ করত। এরপর সে অনেক লোককে নিজের প্রভাব দ্বারা রোগগ্রস্ত করে আসল সন্ন্যাসীর কাছে পাঠিয়ে দিত। যখন সন্ন্যাসী রোগীদের উপর দোয়া পাঠ করত, তখন শয়তান তার প্রভাব সরিয়ে নিত। ফলে রোগীরা আরোগ্য লাভ করত। সুদীর্ঘ-কাল পর্যন্ত এই কারবার অব্যাহত রাখার পর সে জনৈক ইসরাঈলী সরদারের পরমা সুন্দরী কন্যার উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করল এবং তাকে রোগগ্রস্ত করে সন্ন্যাসীর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিল। শেষ পর্যন্ত সে বালিকাটিকে সন্ন্যাসীর মন্দিরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হল এবং কালক্রমে তাকে বালিকার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত করতেও কামিয়াব হয়ে গেল। এর ফলে বালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেল। অপমানের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শয়তান বালিকাকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। হত্যার পর শয়তান নিজেই ব্যভিচার ও হত্যার কাহিনী ফাঁস করে জনগণকে সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। অতঃপর জনগণ মন্দির বিধ্বস্ত করে সন্ন্যাসীকে শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। তখন শয়তান সন্ন্যাসীর কাছে যেয়ে বলল ঃ এখন তোমার প্রাণরক্ষার কোন উপায় নেই। তবে তুমি যদি আমাকে সিজদা

কর, তবে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব। সন্ন্যাসী পূর্বেই অনেক পাপ কর্ম করেছিল। ফলে কুফরের পথ অবলম্বন করা তার জন্য মোটেই কঠিন ছিল না। সে শয়তানকে সিজদা করল। তখন শয়তান পরিষ্কার বলে দিল ঃ আমি তোমাকে কুফরীতে লিপ্ত করার জন্যই এসব অপকৌশল অবলম্বন করেছিলাম। এখন আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি না।

তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا
اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي
أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ
أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَ
سْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

(১৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী-কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য। (২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম। (২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর

অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা (২৩) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আল্লাহ্, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! (অবাধ্যদের পরিণাম তোমরা শুনলে, অতএব) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের (অর্থাৎ কিয়ামতের) জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। (অর্থাৎ সৎ কর্ম অর্জনে ব্রতী হওয়া যা পরকালের সম্পদ। সৎ কর্ম অর্জনে যেমন আল্লাহ্‌কে ভয় করতে বলা হয়েছে, তেমনি মন্দ কাজ ও গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে তোমাদেরকে আদেশ করা হচ্ছে যে) আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (সুতরাং গোনাহ্ করলে শাস্তির আশংকা আছে। প্রথমে اتَّقُوا اللهَ সৎ কর্ম সম্পর্কে এবং এর ইঙ্গিত হচ্ছে قَدَّمَتْ لِغَدٍ এবং দ্বিতীয় اتَّقُوا اللهَ পাপ কর্ম সম্পর্কে এবং এর ইঙ্গিত হচ্ছে خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে। (অর্থাৎ তাঁর বিধি বিধান পালন করে না—আদেশের বিপরীত করে এবং নিষেধ মান্য করে না। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন অর্থাৎ তারা বুদ্ধি-বিবেকের এমন শত্রু হয়ে গেছে যে, নিজেদের সত্যিকার স্বার্থ বুঝেওনা এবং তা অর্জনও করে না)। তারাই অবাধ্য। (এবং অবাধ্যদের শাস্তি ভোগ করবে। উপরোল্লিখিত আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বনকারী ও বিধানাবলী অমান্যকারী দুই দলের মধ্য থেকে একদল জান্নাতের অধিবাসী এবং এক দল জাহান্নামের অধিবাসী) জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়; (বরং) যারা জান্নাতের অধিবাসী তারাই সফলকাম। (পক্ষান্তরে জাহান্নামীরা অকৃতকার্য; যেমন أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ দ্বারা জানা যায়। অতএব তোমাদের জান্নাতের অধিবাসী হওয়া উচিত—জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া উচিত নয়। যে কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে এসব উপদেশ শোনানো হয়, তা এমন যে) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের

উপর অবতীর্ণ করতাম (এবং তাতে বোধশক্তি রাখতাম এবং খেয়াল-খুশি অনুসরণের শক্তি না রাখতাম) তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্র ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (অর্থাৎ কোরআন এমনি প্রভাবশালী ও ক্রিয়াশীল, কিন্তু মানুষের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি প্রবল হওয়ার কারণে মানুষের সে যোগ্যতা বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে সে প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব সৎ কর্ম অর্জন ও পাপ কর্ম বর্জনের মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে দমন করা উচিত, যাতে মানুষ কোরআনী উপদেশাবলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং বিধানাবলী পালনে দৃঢ়তা অর্জিত হয়)। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের (উপকারের) জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে (এবং উপকৃত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাঁর মাহাত্ম্য অন্তরে বদ্ধমূল হওয়ার কারণে বিধানাবলী পালন করা সহজ হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন (যোগ্য) উপাস্য নেই ; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যকে জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (তওহীদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় তাকীদার্থে পুনশ্চ বলা হচ্ছে ঃ) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন (যোগ্য) উপাস্য নেই ; তিনি বাদশাহ, (সকল দোষ থেকে) পবিত্র, মুক্ত, (অর্থাৎ অতীতেও তাঁর মধ্যে কোন দোষ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও এর সম্ভাবনা নেই। বান্দাদেরকে ভয়ের বিষয় থেকে) নিরাপত্তাদাতা, (বান্দাদেরকে ভয়ের বিষয় থেকে) আশ্রয়দাতা (অর্থাৎ বিপদও আসতে দেন না এবং আগত বিপদও দূর করেন) পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। মানুষ যে শিরক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। তিনিই (সত্য) আল্লাহ্, স্রষ্টা, সঠিক উদ্ভাবক, (অর্থাৎ সবকিছু রহস্য অনুযায়ী তৈরী করেন) রূপ (আকৃতি)-দাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। (এসব নাম উত্তম গুণাবলীর পরিচায়ক)। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই (কথার মাধ্যমে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সুতরাং এমন মহান সত্তার নির্দেশাবলী অবশ্য পালনীয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাশরে শুরু থেকে কিতাবী, কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করার পর সূরার শেষ পর্যন্ত মু'মিনদেরকে হুঁশিয়ারি ও সৎ কর্মপরায়ণতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লিখিত প্রথম আয়াতে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে পরকালের চিন্তা ও তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ আছে। বল হয়েছে ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরকালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক আয়াতে কিয়ামত বোঝাতে গিয়ে غد শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রথম. সমগ্র ইহকাল পরকালের মুকাবিলায় স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ এক দিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা, পরকাল চিরন্তন, যার কোন শেষ ও অন্ত নেই। মানব-বিশ্বের বয়স তো কয়েক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না।

এক হাদীসে আছে الدنيا يوم ولنا فيه صوم — সারা দুনিয়া একদিন এবং এই দিনে আমাদের রোযা আছে। মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করা হোক কিংবা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে, চিন্তা করলে উভয়টিই মানুষের জন্য গুরুত্ববহ নয়; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়া তার বয়সের বছর ও দিনগুলোই। এই বছর ও দিনগুলো পরকালের তুলনায় কত যে তুচ্ছ ও নগণ্য, তা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত; যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। এমনিভাবে দুনিয়ার পরে কিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়—খুব নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও খুব নিকটবর্তী।

কিয়ামত দুই প্রকার—সমগ্র বিশ্বের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশেষের কিয়ামত। প্রথমোক্ত কিয়ামতের অর্থ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধ্বংসপ্রাপ্তি। এটা লাখো বছর পরে হলেও পারলৌকিক সময়কালের তুলনায় নিকটবর্তীই। শেষোক্ত কিয়ামত ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর সাথে সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছে : من مات فقد قامت قيامته অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারা যায়, তার কিয়ামত তখনই কায়েম হয়ে যায়। কারণ, কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়ে যায় এবং আযাব ও সওয়াবের নমুনা সামনে এসে যায়। কবরজগৎ যার অপর নাম বরযখ, এটা দুনিয়ার 'ওয়েটিং রুম' (বিশ্রামাগার) সদৃশ। 'ওয়েটিং রুম' ফার্স্ট ক্লাস থেকে নিয়ে থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। অপরাধীদের ওয়েটিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেলখানা। এই বিশ্রামাগার থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের নিজস্ব কিয়ামত এসে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মৃত্যুকে একটি ধাঁ-ধাঁর রূপ দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণও এর নিশ্চিত সময় নিরূপণ করতে পারে না, বরং প্রতিটি মুহূর্তেই মানুষ আশংকা করতে থাকে যে, পরের ঘণ্টাটি তার জীবদ্দশায় অতিবাহিত নাও হতে পারে, বিশেষত বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলী একে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছে।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে উদাসীন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশী দূরে মনে করো না। কিয়ামত আগামীকালের মত নিকটবর্তী; এমনকি আগামীকালের পূর্বেও এসে যাওয়া সম্ভবপর।

আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এতে মানুষকে

চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, নিশ্চিত ও নিকটবর্তী কিয়ামতের জন্য তুমি কি সম্বল প্রেরণ করেছ, তা ভেবে দেখ। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের আসল বাসস্থান হচ্ছে পরকাল। দুনিয়াতে সে মুসাফিরদের ন্যায় বসবাস করে। আসল বাসস্থানে অনন্তকাল অবস্থান করার জন্য এখান থেকেই কিছু সম্বল প্রেরণ করা জরুরী। দুনিয়াতে আসার আসল উদ্দেশ্যই এই যে, এখানে থেকে কিছু উপার্জন করবে, এরপর তা পরকালের দিকে পাঠিয়ে দেবে। বলা বাহুল্য, এখান থেকে দুনিয়ার আসবাবপত্র, ধনদৌলত ইত্যাদি কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। বরং তা পাঠাবার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। দুনিয়াতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা-পয়সা নিয়ে যাওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি এই যে, এই দেশের ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে অন্য দেশে প্রচলিত মুদ্রা অর্জন করতে হয়। পরকালের ব্যাপারেও একই পদ্ধতি চালু আছে। দুনিয়াতে যা কিছু আল্লাহ্‌র পথে ও আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে ব্যয় করা হয়, তা আসমানী সরকারের ব্যাংকে (স্টেট ব্যাংক) জমা হয়ে যায়। এরপর সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা তার নামে লিখে দেওয়া হয়। পরকালে পৌঁছার পর দাবী-দাওয়া ব্যতিরেকেই এই সওয়াব তার হস্তগত হয়ে যায়।

مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ—বলে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার কর্ম বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এরপর اِتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ তাকীদ করা এবং অপর সম্ভাব্য কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, প্রথমে اِتَّقُوا اللّٰهَ বলে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পালন করে পরকালের জন্য সম্বল প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় বার اِتَّقُوا اللّٰهَ বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ কর, তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল কি না, তা দেখে নাও। পরকালে অচল সম্বল তাই, যা দৃশ্যত সৎ কর্ম, কিন্তু তা খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না। বরং নাম-যশ অথবা কোন মানসিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করা হয় অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যত ইবাদত হলেও ধর্মে তার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা। অতএব দ্বিতীয় اِتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্য কেবল দৃশ্যত ? সম্বল যথেষ্ট নয়, বরং তা অচল কিনা তা দেখে প্রেরণ কর।

فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ—অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই আত্মভোলা হয়ে গেছে। ফলে ভাল-মন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ—এটা একটা দৃষ্টান্ত অর্থাৎ যদি কোরআন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও ভারী জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হত এবং পাহাড়কে মানুষের ন্যায় জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনা দেওয়া হত, তবে পাহাড়ও কোরআনের মাহাত্ম্যের সামনে নত—বরং ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ খেয়াল-খুশি ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কোরআন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব এটা যেন এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। কারণ, বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। কেউ কেউ বলেন : পাহাড়, বৃক্ষ, ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই এটা কাল্পনিক নয়—বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টান্ত।—(মাযহারী)

পরকালের চিন্তা ও কোরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে আল্লাহ্ তা'আলার কতিপয় পূর্ণত্ববোধক গুণ উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দৃশ্য-অদৃশ্য ও উপস্থিত-অনুপস্থিত বিষয় পুরোপুরি জানেন। اَلْقُدُّوْسُ—এমনি সত্তা, যিনি প্রত্যেক দোষ থেকে মুক্ত এবং অশালীন বিষয়াদি থেকে পবিত্র। اَلْمُؤْمِنُ—এই শব্দটি মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাসী। আল্লাহ্র জন্য ব্যবহার করলে অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধায়ক অর্থাৎ তিনি ঈমানদারগণকে সর্বপ্রকার আযাব ও বিপদ থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন।

اَلْمُهَيْمِنُ—এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ (র) তাই বলেছেন।—(মাযহারী , কামূস)

اَلْجَبَّارُ—প্রতাপশালী মহান। এই শব্দটি جبر থেকেও উদ্ভূত হতে পারে, যার অর্থ ভাঙা হাড় ইত্যাদি সংযোগ করা। এ কারণেই ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার পর যে পট্টি বাঁধা হয়, তাকে جبيرة বলা হয়। অতএব অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙা ও অকেজো বস্তুর সংস্কারক।—(মাযহারী)

اَلْمُتَكَبِّرُ—এটা كبرياء ও تكبر থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বড়ত্ব, প্রত্যেক বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। তিনি কোন বিষয়ে কারও মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী, সে বড় হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্য এই শব্দটি দোষ ও গোনাহ্। কারণ, সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্ব দাবী করা মিথ্যা এবং আল্লাহ্র বিশেষ গুণে শরীক হওয়ার দাবী। তাই এটা আল্লাহ্র জন্য পূর্ণত্বের গুণ এবং অন্যের জন্য মিথ্যা দাবী।

الْمُصَوِّرُ—অর্থাৎ রূপ দানকারী। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি দান করেছেন, যদ্দরুন এক বস্তু অপর বস্তু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়েছে। আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল সৃষ্ট বস্তু বিশেষ আকারের মাধ্যমেই পরিচিত হয়। সৃষ্ট বস্তুর অসংখ্য প্রকারের আলাদা আলাদা আকার-আকৃতি। মানুষের একই শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ ও নারীর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য, কোটি কোটি নারী ও পুরু-ষের চেহারায় এমন স্বাতন্ত্র্য যে, একজনের মুখাবয়ব অন্যজনের সাথে মিলে না—এটা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই অপার শক্তির কারসাজি। এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। বড়ত্ব যেমন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য বৈধ নয় এবং এটা একমাত্র তাঁরই গুণ, তেমনি চিত্র ও আকার-আকৃতি নির্মাণ অন্যের জন্য বৈধ নয়। এটাও আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণে তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব দাবী করার নামান্তর।

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার উত্তম উত্তম নাম আছে। কোরআন পাকে এসব নামের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। সহীহ্ হাদীসসমূহে ৯৯-টি নাম বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক হাদীসে সবগুলোই উল্লিখিত হয়েছে।

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ—এই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা অবস্থার মাধ্যমে হলে তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়; কেননা, সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও তার অন্তর্নিহিত কারিগরি এবং আকার-আকৃতি নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে অহর্নিশ স্রষ্টার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মশগুল আছে। সত্যিকার উক্তির মাধ্যমে তসবীহ্ পাঠও হতে পারে। কেননা, সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনুভূতিসম্পন্ন। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার সর্বপ্রথম দাবী হচ্ছে স্রষ্টাকে চিনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর সত্যিকার তসবীহ্ পাঠ করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজ কানে তা শুনি না। এ কারণেই কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে: وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ অর্থাৎ তোমরা তাদের তসবীহ্ শোন না, বুঝ না।

সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াতসমূহের উপকারিতা ও কল্যাণ: তিরমিযীতে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: যে ব্যক্তি সকালে তিনবার أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পাঠ করার পর সূরা হাশরের هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্তবা লাভ করবে। —(মাযহারী)

سورة الممتحنة

সূরা মুমতাহিনা

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৩ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ
إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُونَ
الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا
فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ
بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِيلِ ۝ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ
أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ
وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا
بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ
لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ

إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফির হয়ে যাও। (৩) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৪) তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সংগীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেন ঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। (৫) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬) তোমরা যারা আল্লাহ্ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ বেপরোয়া, প্রশংসার মালিক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (অর্থাৎ আন্তরিক বন্ধুত্ব না হলেও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারও করো না)। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে তা অস্বীকার করে।

(এতে বোঝা যায় যে, তারা আল্লাহ্‌র শত্রু)। তারা রাসূল (সা)-কে ও তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। (এতে বোঝা যায় যে, তারা কেবল আল্লাহ্‌রই শত্রু নয়—তোমাদেরও শত্রু। মোটকথা, এদের সাথে বন্ধুত্ব করো না)। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য (নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে) বের হয়ে থাক, তবে (কাফিরদের বন্ধুত্বের জন্য যার সারমর্ম কাফিরদের সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর উপযুক্ত কাজকর্মের পরিপন্থী) কেন তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্বের কথাবার্তা বলছ? (অর্থাৎ প্রথমত বন্ধুত্বই মন্দ, এরপর গোপন বার্তা প্রেরণ করা যা বিশেষ সম্পর্কের পরিচায়ক, তা আরও মন্দ)। অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। (অর্থাৎ উপরোক্ত বাধাসমূহের অনুরূপ 'আমি সব জানি' এটাও তাদের বন্ধুত্বের পথে বাধা হওয়া উচিত। অতঃপর এর জন্য শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছেঃ) তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (আর বিচ্যুতদের পরিণাম তো জানাই আছে। তারা তো তোমাদের এমন শত্রু যে) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা (তৎক্ষণাৎ) শত্রুতা প্রকাশ করতে থাকে এবং (সেই শত্রুতা প্রকাশ এই যে,) মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করে (এটা পার্থিব ক্ষতি) এবং (ধর্মীয় ক্ষতি এই যে,) এরা চায় যে, তোমরা কাফিরই হয়ে যাও। (সুতরাং এরূপ লোক বন্ধুত্বের যোগ্য নয়। বন্ধুত্বের ব্যাপারে যদি তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা কর, তবে খুব বুঝে নাও,) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন তোমাদের (কোন) উপকারে আসবে না। তিনিই তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। [সুতরাং প্রত্যেক কর্মের সঠিক ফয়সালা করবেন। তোমাদের কর্ম শাস্তির কারণ হলে সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন এই শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। এমতাবস্থায় তাদের খাতিরে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করা খুবই গর্হিত কাজ। এ থেকে আরও স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, ধনসম্পদ খাতির করার যোগ্য নয়। অতঃপর উল্লিখিত আদেশ পালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনার অবতারণা করা হচ্ছেঃ] তোমাদের জন্য ইবরাহীম (আ) ও তাঁর (ঈমান ও আনুগত্যে) সমমনাদের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। [অর্থাৎ এ ব্যাপারে কাফিরদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা উচিত, যেরূপ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারিগণ করেছেন]। তারা (বিভিন্ন সময়ে) তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ['বিভিন্ন সময়ে' বলার কারণ এই যে, ইবরাহীম (আ) যখন প্রথমবার সম্প্রদায়কে একথা বলেছিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন। এরপর যে-ই তাঁর অনুসরণ করেছে, সে-ই কাফিরদের সাথে কথায় ও কাজে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। অতঃপর এই সম্পর্কচ্ছেদের রূপরেখা বর্ণনা করা হচ্ছেঃ] আমরা তোমাদেরকে (অর্থাৎ কাফির ও তাদের উপাস্যদেরকে) মানি না (অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাস ও উপাস্যদের ইবাদত মানি না। এরপর লেনদেন ও ব্যবহারের দিক দিয়ে সম্পর্কচ্ছেদ এই যে) আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চিরন্তন শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে (কেননা, শত্রুতার ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাসগত বিরোধ। এখন এটা বেশী ফুটে উঠার কারণে শত্রুতাও ফুটে উঠেছে। এই শত্রুতা চিরকাল থাকবে) যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।

[মোটকথা, ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারিগণ কাফিরদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করলেন]। কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে, (এই আদর্শের ব্যতিক্রম। এতে বাহ্যত কাফিরদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব বোঝা যাচ্ছিল)। তিনি বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য (ক্ষমা প্রার্থনার বেশী) আল্লা-হ্র কাছে আমার কিছু করার নেই। [অর্থাৎ দোয়া কবুল করাতে পারি না অথবা বিশ্বাস স্থাপন না করা সত্ত্বেও তোমাকে আযাব থেকে রক্ষা করব, তা পারি না। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) এর এতটুকু কথার অর্থ কেউ কেউ এরূপ বুঝে নিয়েছে যে, এটা ক্ষমা প্রার্থনাই। অথচ এখানে ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ অন্যরূপ। অর্থাৎ পিতার জন্য এরূপ দোয়া করা যে, সে বিশ্বাস স্থাপন করে ক্ষমার যোগ্য হয়ে থাকে। সবাই এরূপ করতে পারে। বাস্তবে এটা সম্পর্ক-ছেদের পরিপন্থী নয়। কিন্তু দৃশ্যত এতে সম্পর্ক স্থাপন ও ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ থাকায় একে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সম্প্রদায়ের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথাবার্তা বর্ণিত হল। অতঃপর আল্লাহ্র কাছে দোয়ার বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তিনি এ সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে আরয করলেন ঃ] হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা (কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও শত্রুতা ঘোষণা করার ব্যাপারে) আপনার উপর ভরসা করেছি এবং (আপনিই আমাদেরকে সকল বিপদাপদ ও শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করবেন। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে) আপনার দিকেই মুখ করেছি। (আমাদের বিশ্বাস এই যে) আপনারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। সুতরাং এই বিশ্বাসের কারণে আমরা আন্তরিকতার সাথে কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছি। এতে কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। হে আমাদের পালনকর্তা। আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র করবেন না। (অর্থাৎ এই সম্পর্কচ্ছেদের কারণে কাফিররা যেন আমাদের উপর জুলুম করতে না পারে)। হে আমাদের পালনকর্তা। আমাদের পাপ মার্জনা করুন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের জন্য অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র (অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে যাওয়ার) এবং কিয়ামতের (আগমনের) বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য তাঁদের মধ্যে [অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে] উত্তম আদর্শ রয়েছে। যে ব্যক্তি (এই আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে তার নিজের ক্ষতি করে, কেননা) আল্লাহ্ বেপরোয়া (এবং পূর্ণতাগুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে) প্রশংসার্হ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরার শুরুভাগে কাফির ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল ঃ তফসীর কুরতুবীতে কুশায়রী ও সা'লাবীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নাম্নী একজন গায়িকা নারী প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বলল ঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করা হল ঃ তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তা হলে কি উদ্দেশ্যে

আগমন করেছ? সে বলল ঃ আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। আমি ঘোর বিপদে পড়ে ও অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করে? সে বলল ঃ বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফিররা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাহ্নে মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতায়া (রা)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত এবং মক্কায় এসে বসবাস অবলম্বন করেছিলেন। মক্কায় তাঁর স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণও মক্কায় ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফিররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কোনরূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করলেন।

হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফিরদেরকে জানিয়ে দিই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলেপেলেদের হিফাযত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন।—(কুরতুবী, মাযহারী)

এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এ সময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে, আবূ মুরসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ দিলেন ঃ অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মক্কাবাসীদের

নামে হাতেব ইবনে আবী বালতায়ার পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমরা নির্দেশমত দ্রুতগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) যে স্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে স্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম, পত্রটি বের কর। সে বলল ঃ আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললাম, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম ঃ হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দেব।

অগত্যা সে নিরুপায় হয়ে পায়জামার ভেতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে চলে এলাম। হযরত উমর (রা) ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নি-শর্মা হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেন ঃ এই ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফিরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতেব আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ঈমানে এখনও কোন তফাত হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনের হিফাযত করে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হাতেবের জবানবন্দি শুনে বললেন ঃ সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত উমর (রা) ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাঁকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ্ তা'আলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত উমর (রা) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই আসল সত্য জানেন।—(ইবনে কাসীর) কোন কোন রেওয়ায়েতে হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে, আমি এ কাজ ইসলাম ও মুসলমান-দের ক্ষতি করার জন্য করিনি। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুমতাহিনার শুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে উপরোক্ত ঘটনার জন্য হুঁশিয়ার করা হয় এবং কাফিরদের সাথে মুসলমান-দের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ — অর্থাৎ মু'মিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের

শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করবে। এতে উল্লিখিত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের পত্র কাফিরদের কাছে লিখা বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করারই নামান্তর। আয়াতে 'কাফির' শব্দ বাদ দিয়ে 'আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু' বলে প্রথমত এই নির্দেশের কারণ ও দলীল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহ্‌র শত্রুর কাছে বন্ধুত্ব আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়। অতএব এ থেকে বিরত থাক। দ্বিতীয়ত এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফির যে পর্যন্ত কাফির থাকবে, সে কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। সে আল্লাহ্‌র দুশমন। অতএব যে মুসলমান আল্লাহ্‌র মহব্বত দাবী করে, তার সাথে কাফিরের বন্ধুত্ব কিরূপে সম্ভবপর?

وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ

تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ —এখানে حق বলে কোরআন অথবা ইসলাম বোঝানো হয়েছে। এই আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুফর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শত্রুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রসূলকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছে। এই বহিষ্কারের কারণ কোন পার্থিব বিষয় নয়। বরং একমাত্র তোমাদের ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব একথা আর গোপন রইল না যে, তোমরা যে পর্যন্ত মু'মিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। হাতেব মনে করেছিল যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তার পরিবার-পরিজনের হিফাযত করবে। তার এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শত্রু। আল্লাহ্ না করুন, তোমাদের ঈমান বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্বের আশা করা ধোঁকা বৈ নয়।

اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ছিল, তবে আল্লাহ্‌র শত্রু কাফিরদের কাছে এই আশা কিরূপে রাখা যায় যে, তারা তোমাদের খাতির করবে?

تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ

এতে আরও বলা হয়েছে যে, যারা কাফিরদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব রাখে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজকর্মের খবর রাখেন; যেমন উল্লিখিত ঘটনায় তিনি তাঁর রসূলকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করে চক্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছেন।

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ

بِالسُّوءِ—অর্থাৎ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তোমাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, তাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। তারা যখনই তোমাদের উপর প্রাধান্য হাসিল করবে, তখনই তাদের বাহু ও রসনা তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া কোন দিকে প্রসারিত হবে না।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ—এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে, তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের ঈমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা সেদিন এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। সন্তানরা পিতামাতার কাছ থেকে ও পিতামাতারা সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হযরত হাতেবের ওযর খণ্ডন করা হয়েছে যে, যে সন্তানদের মহব্বতে তুমি এ কাজ করেছিলে, মনে রেখ, কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্র কাছে কোন কিছু গোপন নয়।

পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের সমর্থনে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত জাতিগোষ্ঠী মুশরিক ছিল। তিনি সবার সাথে শুধু সম্পর্কচ্ছেদই নয়—শত্রুতাও ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ যে পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করবে এবং শিরক থেকে বিরত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতার প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকবে।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ থেকে حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উত্তম আদর্শ ও সুন্নত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন বলেও প্রমাণিত আছে। সূরা তওবায় এর

উল্লেখ আছে। অতএব সন্দেহ হতে পারত যে, মুশরিক পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করা ইবরাহিমী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা জায়েয হওয়া উচিত। তাই ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্য সব বিষয়ে ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ জরুরী কিন্তু তাঁর এই কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়। إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ আয়াতের মর্ম তাই।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওযর সূরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে আল্লাহ্র দুশমন, তখন এ বিষয় থেকে নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন। فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

কোন কোন তফসীরবিদ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ-কে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, ইবরাহীম (আ) যে পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন, এটা তাঁর আদর্শের পরিপন্থী নয়। কেননা, তিনি পিতা মুসলমান হয়ে গেছে —এই ধারণায় বশবর্তী হয়ে দোয়া করেছিলেন। এরপর যখন তিনি আসল সত্য জানতে পারেন, তখন দোয়া ছেড়ে দেন এবং সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। এরূপ করা এখনও জায়েয। কোন কাফির সম্পর্কে যদি কারও প্রবল ধারণা থাকে যে, সে মুসলমান, তবে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করায় কোন দোষ নেই।—(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বিত হয়েছে।

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَ

ظٰهَرُوْا عَلٰۤى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

(৭) যারা তোমাদের শত্রু, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ্ সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৮) ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (৯) আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালিম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যেহেতু কাফিরদের শত্রুতার কথা শুনে মুসলমানরা চিন্তান্বিত হতে পারত এবং সম্পর্কচ্ছেদের কারণে স্বভাবত তাদের মনে দুঃখ লাগতে পারত, তাই সুসংবাদের ভঙ্গিতে অতঃপর ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে যে) যারা তোমাদের শত্রু, সম্ভবত (অর্থাৎ ওয়াদা এই যে) আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন (যদিও কিছু সংখ্যকের সাথে অর্থাৎ তাদেরকে মুসলমান করে দেবেন। ফলে শত্রুতা বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়ে যাবে)। এবং (একে অসম্ভব মনে করো না। কেননা) আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। (সেমতে মক্কা বিজয়ের দিন অনেকেই মুসলমান হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্কচ্ছেদ চিরকালের জন্য হলেও তা আদিষ্ট বিষয় হওয়ার কারণে অবশ্য পালনীয় ছিল। কিন্তু যখন তা স্বল্পকালের জন্য এবং মুসলমান হওয়ার ফলে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, তখন চিন্তান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এ পর্যন্ত কেউ যদি এই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে এবং পরে তওবা করে থাকে তবে) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (এ পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতঃপর অনুগ্রহমূলক সম্পর্ক রাখার বিবরণ দেওয়া হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে সদাচরণ ও ইনসাফ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি। (এখানে যিম্মী অথবা শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কাফিরদেরকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ জায়েয। অবশ্য ন্যায় ও সুবিচারের জন্য যিম্মী ও চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া শর্ত নয়। এটা প্রত্যেক কাফির এমনকি জন্তু-জানোয়ারের সাথেও ওয়াজিব। কিন্তু আয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ বলে অনুগ্রহমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে। তাই বিশেষভাবে যিম্মী ও চুক্তিতে আবদ্ধ কাফিরের মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (অবশ্য)

আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব (ও অনুগ্রহ) করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, (কার্যক্ষেত্রে অথবা ইচ্ছার মাধ্যমে) তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং (বহিষ্কৃত না করলেও) বহিষ্কার-কার্যে (বহিষ্কারকারীদেরকে) সাহায্য করেছে। অর্থাৎ তাদের সাথে শরীক রয়েছে, কার্যত কিংবা বহিষ্কার করার ইচ্ছার মাধ্যমে। যেসব কাফিরের সাথে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি অথবা বশ্যতা স্বীকারের বন্ধন ছিল না, তারা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সাথে অনুগ্রহ-মূলক কাজ-কারবার জায়েয নয়; (বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই কাম্য)। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব (অর্থাৎ অনুগ্রহমূলক ব্যবহার) করবে, তারাই পাপিষ্ঠ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে; যদিও সেই কাফির আত্মীয়তায় খুবই নিকটবর্তী হয়। সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপারে নিজেদের খাহেশ ও আত্মীয়-স্বজনের পরোয়া করতেন না। তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞাও বাস্তবায়িত করলেন। ফলে দেখা গেল যে, ঘরে ঘরে পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। বলা বাহুল্য, মানবপ্রকৃতি ও স্বভাবের জন্য এ কাজ সহজ ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াত-সমূহে আল্লাহ্ তা'আলা এই সংকটকে অতিসত্বর দূর করার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন।

কোন কোন হাদীসে আছে, আল্লাহ্র কোন বান্দা যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের কোন প্রিয় বস্তুকে বিসর্জন দেয়, তখন প্রায়ই আল্লাহ্ তা'আলা সেই বস্তুকেই হালাল করে তার কাছে পৌঁছিয়ে দেন এবং অনেক সময় এর চাইতেও উত্তম বস্তু প্রদান করেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, আজ যারা কাফির, ফলে তারা তোমাদের শত্রু ও তোমরা তাদের শত্রু, সত্বরই হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা এই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পর্যবসিত করে দেবেন অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের তওফীক দিয়ে তোমাদের পারস্পরিক সুসম্পর্ককে নতুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী মক্কা বিজয়ের সময় বাস্তব রূপ লাভ করে। ফলে নিহতদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল কাফির মুসলমান হয়ে যায়।—(মাযহারী) কোরআন পাকের এক আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا অর্থাৎ তারা দলে দলে আল্লাহ্র দীন ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে; বাস্তবেও তাই হয়েছে।

বুখারী ও মসনদে আহ্মদের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রা)-র জননী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর স্ত্রী কবীলা হুদায়বিয়া সন্ধির পর কাফির অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্য কিছু উপঢৌকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্তু হযরত আসমা (রা) সেই উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার জননী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন,

কিন্তু তিনি কাফির। আমি তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন: জননীর সাথে সদ্ব্যবহার কর। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়:

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রা)-র জননী কবীলাকে হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম পূর্বকালেই তালাক দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর অপর স্ত্রী উম্মে রোমানের গর্ভজাত ছিলেন। উম্মে রোমান মুসলমান হয়ে যান।—(ইবনে কাসীর, মাযহারী)

যেসব কাফির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কারেও অংশগ্রহণ করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাফিরের সাথেও জরুরী। এতে যিম্মী কাফির, চুক্তিতে আবদ্ধ কাফির এবং শত্রু কাফির সবই সমান বরং ইসলামে জন্তু-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব অর্থাৎ তাদের পৃষ্ঠে সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না এবং ঘাস-পানি ও বিশ্রামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

মাস'আলা: এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল দান-খয়রাত যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কাফিরকেও দেওয়া যায়। কেবল শত্রুদেশের কাফিরকে দেওয়া নিষিদ্ধ।

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ—এই আয়াতে সেই সব কাফিরের বর্ণনা আছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে এবং মুসলমানদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কারে অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন। এতে অনুগ্রহমূলক কাজ-কারবার করতে নিষেধ করা হয়নি, বরং শুধু আন্তরিক বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কেবল যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেই নয়, বরং যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের সাথেও জায়েয নয়। এ থেকে তফসীরে-মাযহারীতে মাস'আলা বের করা হয়েছে যে, যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে ন্যায় ও সুবিচার করা তো জরুরীই, নিষিদ্ধ নয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেও জায়েয। তবে অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে এর জন্য শর্ত এই যে, তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহারের কারণে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতি হওয়ার আশংকা যেন না থাকে। আশংকা থাকলে জায়েয নয়। তবে ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেকের সাথে সর্বাবস্থায় জরুরী ও ওয়াজিব।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى

الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا

تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ

ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِن فَاتَكُمْ

شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَا

جُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا

النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ

شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ

بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ

فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ

الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ۝

(১০) হে মু'মিনগণ। যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্য হালাল নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহ্র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১১) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফির-দের কাছে থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার

প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (১২) হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (১৩) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফিররা নিরাশ হয়ে গেছে।

শানে-নুযূলের ঘটনা : আলোচ্য আয়াতগুলোও একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সূরা ফাত্‌হ-এর শুরুতে এই সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সন্ধির যেসব শর্ত ছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি কাফিরদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। পরন্তু কাফিরদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। সেমতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাফিরদের মধ্য থেকে আগমন করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর কয়েকজন নারী মুসলমান হয়ে আগমন করে। তাদের কাফির আত্মীয়রা তাদেরকে প্রত্যর্পণের আবেদন জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো হুদায়বিয়ায় অবতীর্ণ হয়। এতে নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সন্ধিপত্রের ব্যাপকতা সংকুচিত ও রহিত হয়ে গেছে। এ ধরনের নারীদের ব্যাপারে কিছু বিশেষ বিধানও নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর সাথে এমন নারীদের ব্যাপারেও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে, যারা প্রথমে মুসলমানদের সাথে বিবাহিতা ছিল ; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মক্কাতেই থেকে যায়। মুসলমান হওয়াই এই নারীদের বেলায় আসল ভিত্তি বিধায় তাদের ঈমান পরীক্ষা করার পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা (দারুল-হরব থেকে) হিজরত করে আগমন করে, [দারুল-ইসলাম মদীনায় আসুক কিংবা দারুল-ইসলামের পর্যায়ভুক্ত হুদায়বিয়ার সেনা ছাউনিতে আসুক—(হিদায়া)] তখন তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও (যে, সত্যিই মুসলমান কিনা। পরবর্তী يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ আয়াতে এই পরীক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বাহ্যিক পরীক্ষাকেই যথেষ্ট মনে কর। কেননা) তাদের (সত্যিকার) ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন। (তোমরা প্রকৃত অবস্থা জানতেই পার না)। যদি তোমরা (এই পরীক্ষার আলোকে) জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। (কেননা) তারা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা তাদের জন্য হালাল নয়। (কারণ, মুসলমান নারীর বিবাহ কাফির

পুরুষের সাথে কোন অবস্থাতেই বজায় থাকে না। এমতাবস্থায়) কাফিররা (মোহরানা বাবদ তাদের পেছনে) যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে দিয়ে দাও। তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। (মুসলমানগণ) তোমরা কাফির নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখো না। (অর্থাৎ তোমাদের যেসব স্ত্রী শত্রুদেশে কাফির অবস্থায় রয়ে গেছে, তোমাদের সাথে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কের কোন চিহ্ন বাকী আছে বলে মনে করো না। এমতাবস্থায়) তোমরা (সেই নারীদের মোহরানা বাবদ) যা ব্যয় করেছ, তা (কাফিরদের কাছ থেকে) চেয়ে নাও এবং (এমনিভাবে) কাফিররাও চেয়ে নেবে যা (মোহরানা বাবদ) তারা ব্যয় করেছে। এটা (অর্থাৎ যা বলা হল) আল্লাহ্র বিধান। (এর অনুকরণ কর)। তিনি তোমাদের মধ্যে (এমনি উপযুক্ত) ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী উপযুক্ত বিধান নির্ধারণ করেন)। যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কাফিরদের মধ্যে থেকে যাওয়ার কারণে (সম্পূর্ণই) তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় (অর্থাৎ তাকেও পাওয়া না যায়। এরপর কাফিরদেরকে) তোমাদের (পক্ষ থেকে মোহরানা দেওয়ার) সুযোগ হয় অর্থাৎ (কোন কাফিরের মোহরানা তোমাদের উপর পরিশোধযোগ্য হয়) তবে (তোমরা সেই মোহরানা কাফিরকে দিও না, বরং) যেসব মুসলমানের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের (স্ত্রীদের উপর) ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ (সেই পরিশোধযোগ্য মোহরানা থেকে) দিয়ে দাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (জরুরী বিধি-বিধানে ত্রুটি করো না। অতঃপর বিশেষ সম্বোধনে ঈমান পরীক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) হে পয়গম্বর (সা)! মুসলমান নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না (মূর্খতা যুগে) কোন কোন নারী অপরের সন্তান এনে নিজ স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দিত অথবা জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বলে দিত। এতে ব্যভিচারের গোনাহ্ তো আছেই; পরন্তু অপরের সন্তানকে স্বামীর সন্তান দাবী করার পাপও আছে। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত আছে।—(আবূ দাউদ, নাসায়ী)। এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যখন এসব বিধানকে সত্য এবং অবশ্য পালনীয় মনে করার বিষয় প্রকাশ করে, তখন তাদেরকে মুসলমান মনে করুন। স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অতীত সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়, তবুও এখানে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ মাগফিরাতের লক্ষণ হাসিল করার জন্য অথবা এটা ঈমান কবুলের দোয়া, যদ্দ্বারা মাগফিরাত হাসিল হয়)। মু'মিনগণ, আল্লাহ্ যাদের প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে (-ও) বন্ধুত্ব করো না। (এখানে ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে, যেমন সূরা মায়িদায় বলা হয়েছেঃ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ)

তারা পরকালের (কল্যাণ ও সওয়াবের) ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে ; যেমন কবরস্থ কাফিররা (পরকালের সওয়াব ও কল্যাণ থেকে) নিরাশ হয়ে গেছে। [যে কাফির মারা যায়, সে পরকাল প্রত্যক্ষ করে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা নিশ্চিতরূপে জেনে নেয়। সে বুঝতে পারে যে, তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না। ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও নবুয়ত-বিরোধীদের কাফির হওয়ার বিষয়টি খুব জানত, কিন্তু লজ্জা ও বিদ্বেষের কারণে তাঁর অনুসরণ করত না। কাজেই তারাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত যে, তারা পরকালে মুক্তি পাবে না। অতএব তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা মোটেই জরুরী নয়। মদীনায় ইহুদীদের সংখ্যা বেশী ছিল এবং তারা দুষ্টও ছিল খুব বেশী। তাই এখানে বিশেষভাবে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির কতিপয় শর্ত বিশ্লেষণ ঃ সূরা ফাত্‌হ-তে হুদায়বিয়ার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এতে অবশেষে মক্কার কাফির ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে একটি দশ বছর মেয়াদী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির কতিপয় শর্ত এমন ছিল যে, এতে কাফিরদের কাছে মুসলমানদের মাথা নত করা ও বাহ্যিক পরাজয় মেনে নেওয়ার ভাব পরিস্ফুট ছিল। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা চাপা অসন্তোষ ও ক্ষোভের ভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে অনুভব করছিলেন যে, এই ক্ষণস্থায়ী পরাজয় অবশেষে চিরস্থায়ী প্রকাশ্য বিজয়েরই পূর্বাভাস হবে। তাই তিনি শর্তগুলো মেনে নেন এবং সাহাবায়ে কিরামও অতঃপর আর উচ্চবাচ্য করেন নি।

এই শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি মদীনায় চলে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন যদিও সে মুসলমান হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কোরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যত অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কোন মুসলমান পুরুষ অথবা নারী মক্কা থেকে চলে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ফেরত পাঠাবেন।

এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুদায়বিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন, তখন মুসলমানদের জন্য অগ্নিপরীক্ষাতুল্য একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হযরত আবূ জন্দল (রা)-এর। কোরাইশরা তাঁকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁকে ফেরত পাঠানো উচিত, কিন্তু আমরা আমাদের একজন নির্যাতিত ভাইকে জালিমদের হাতে পুনরায় তুলে দেব—এটা কিরূপে সম্ভব ?

কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি শরীয়তের নীতিমালার হিফাযত ও তৎপ্রতি দৃঢ়তা এক ব্যক্তির কারণে বিসর্জন দিতে পারতেন না। এর সাথে সাথে তাঁর দূরদর্শী অন্তর্দৃষ্টি সত্বরই এই নির্যাতিতদের বিজয়ীসুলভ মুক্তিও যেন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্বভাবগত কারণেই তিনিও আবূ জন্দল (রা)-কে ফেরত প্রত্যর্পণে দুঃখিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু চুক্তি পালনের খাতিরে তাঁকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বিদায় করে দিলেন।

এর সাথে সাথেই দ্বিতীয় একটি ঘটনা সংঘটিত হল। মুসলমান সাঈদা বিনতে হারেস (রা) কাফির সায়ফী ইবনে আনসারের পত্নী ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে সায়ফীর নাম মুসাফির মখযুমী বলা হয়েছে। তখন পর্যন্ত মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এই মুসলমান মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে হুদায়-বিয়ায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হাযির। সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে দাবী জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তিপত্রের কালি এখনও শুকায়নি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান নারী হিজরত করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছে গেলে তাকে কাফিরদের হাতে ফেরত দেওয়া হবে না—সে পূর্ব থেকেই মুসলমান হোক; যেমন উল্লিখিত সাঈদা অথবা হিজরতের সময় তার মুসলমানিত্ব প্রমাণিত হোক। তাকে ফেরত না দেওয়ার কারণ এই যে, সে তার কাফির স্বামীর জন্য হালাল নয়। তফসীরে কুরতুবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এই ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

মোট কথা, উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, চুক্তিপত্রের উপরোক্ত শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলমান আগমন করুক, তাকে ফেরত দিতে হবে। বরং এই শর্তটি ব্যাপক, কেবল পুরুষ-দের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়—নারীদের ক্ষেত্রে নয়। নারীদের ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, যে নারী মুসলমান হয়ে হিজরত করে, তার কাফির স্বামী মোহরানার আকারে যা কিছু তার পেছনে ব্যয় করেছে, তা তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এসব আয়াতের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিপত্রে উল্লিখিত এই শর্তের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সাঈদা (রা)-কে কাফিরদের কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম বিনতে ওতবা মক্কা থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়। তার পরিবারের লোকেরা শর্তের ভিত্তিতে তাকে ফেরত দানের দাবী জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম আমর ইবনে আস (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী তখনও মুসলমান ছিল না। উম্মে কুলসুম ও তাঁর দুই ভাই মক্কা থেকে পলায়ন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে চলে যান। সাথে সাথেই তাঁদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবী উঠে। রসূলুল্লাহ্ (সা) শর্ত অনুযায়ী আম্মারা ও ওলীদ ভ্রাতৃদ্বয়কে ফেরত পাঠিয়ে দেন; কিন্তু উম্মে কুলসুমকে ফেরত দেন নি। তিনি বললেন : এই শর্ত পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়। এর পরি-প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এমনি ধরনের আরও কয়েকজন নারীর ঘটনা রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য, এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লিখিত শর্ত থেকে নারীদের ব্যতিক্রম চুক্তি ভঙ্গের শামিল নয়; বরং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একটি শর্তের ব্যাখ্যা মাত্র ঃ কুরতুবীর উল্লিখিত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, চুক্তির উপরোক্ত ধারার ভাষা যদিও ব্যাপক ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মতে তাতে নারীরা শামিল ছিল না। তাই তিনি হুদায়বিয়াতেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেন এবং এরই সত্যায়নে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শর্তটিকে ব্যাপক ভিত্তিতেই মেনে নিয়েছিলেন এবং তাতে নারীরাও শামিল ছিল। কিন্তু আলোচ্য আয়াত-সমূহ অবতরণের ফলে ব্যাপকতা রহিত হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) তখনই কাফির-দেরকে অবহিত করে দেন যে, মহিলারা এই শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেমতে তিনি কোন নারীকে ফেরত পাঠান নি। এ থেকে বোঝা গেল যে, এটা চুক্তির বরখেলাফ কাজ ছিল না এবং চুক্তি খতম করে দেওয়াও ছিল না; বরং একটি শর্তের ব্যাখ্যা ছিল মাত্র। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য পূর্ব থেকেই এরূপ ছিল কিংবা আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি শর্ত-টিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে সীমিত রাখার জন্য প্রতিপক্ষকে বলে দিয়েছিলেন। সর্বাবস্থায় এই ব্যাখ্যার পরও চুক্তিপত্রটি উভয় পক্ষ বহাল রাখে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা বাস্তব রূপ লাভ করতে থাকে। এই শান্তিচুক্তির ফলশ্রুতিতেই রাস্তাঘাট বিপদমুক্ত হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশ্বের রাজন্যবর্গের নামে পত্র লিখেন। এরই সুবাদে আবু সুফিয়ানের কাফিলা নিশ্চিন্তে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে। সেখানে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে রাজদরবারে ডেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করেন।

সারকথা এই যে, এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক। নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়টি পূর্ব থেকেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টিতে ছিল কিংবা আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি নারীদেরকে শর্ত থেকে খারিজ করে দেন। উভয় অবস্থাতেই কাফির ও মুসলমান-দের মধ্যে এই চুক্তি এরপরও পূর্ণাঙ্গরূপে বলবৎ ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পালিত হয়। কাজেই এই ব্যাখ্যাকে চুক্তিভঙ্গকরণ অথবা চুক্তি খতমকরণরূপে গণ্য করা যায় না। অতঃপর ভাষাদৃষ্টে আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করুন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ

أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ — আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নারীদের মুসলমান ও মু'মিন হওয়াই সন্ধির শর্ত থেকে তাদের ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়ার কারণ। মক্কা থেকে মদীনায় আগমন-কারিণী নারীদের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনাও ছিল যে, তাদের কেউ ইসলাম ও ঈমানের খাতিরে নয়, বরং স্বামীর সাথে ঝগড়া করে অথবা মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে হিজরত করেছে। এরূপ নারী আল্লাহ্র কাছে এই শর্তের ব্যতিক্রম-ভুক্ত নয়; বরং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাকে ফেরত পাঠানো জরুরী। তাই মুসলমান-গণকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেসব নারী হিজরত করে মদীনায় আসে, তাদের ঈমান

পরীক্ষা করে নাও। এর সাথেই বলা হয়েছে ঃ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যিকার ও আসল ঈমানের সম্পর্ক তো অন্তরের সাথে, যার খবর আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। তবে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লক্ষণাদি দৃষ্টে ঈমান সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সুতরাং মুসলমানগণকে এ বিষয়েরই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন ঃ মুহাজির নারীকে শপথ করানো হত যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোন পাথিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি বরং একান্তভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা ও সন্তুষ্টিলাভের জন্য আগমন করেছে। যে নারী এই শপথ করত, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন।—(কুরতুবী)

তিরমিযীতে হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বলা হয়েছে ঃ নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ — মুহাজির নারীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে আয়াতে বর্ণিত বিষয়সমূহের শপথ করত। এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রথমে তাদেরকে সেসব বাক্যও উচ্চারণ করানো হত, যেগুলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা) -এর রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে। এরপর আয়াতে বর্ণিত শপথ দ্বারা তা পূর্ণ করা হত।

فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ — অর্থাৎ পরীক্ষার পর যদি তারা মু'মিন প্রতিপন্ন হয়, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ নয়।

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ — অর্থাৎ এই নারীরা কাফির পুরুষদের জন্য হালাল নয় এবং কাফির পুরুষরা তাদের জন্য হালাল নয় যে, তাদেরকে পুনর্বিবাহ করবে।

এই আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, যে নারী কোন কাফিরের বিবাহাধীনে ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিবাহ কাফিরের সাথে আপনা-আপনি ভঙ্গ হয়ে গেছে, তারা একে অপরের জন্য হারাম। নারীদেরকে সন্ধির শর্ত থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত রাখার কারণ এটাই।

وَاٰتُوْهُمْ مَّا اَنْفَقُوْا — অর্থাৎ মুহাজির মুসলমান নারীর কাফির স্বামী বিবাহে

মোহরানা ইত্যাদি বাবদ যা ব্যয় করেছে, তা সবই তার স্বামীকে ফেরত দাও। কেননা, নারীকে ফেরত দেওয়াই কেবল সন্ধি-শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত ছিল, যা হারাম হওয়ার কারণে সম্ভবপর নয়, কিন্তু স্বামীর প্রদত্ত ধনসম্পদ শর্ত অনুযায়ী ফেরত দেওয়া উচিত। মুহাজির নারীকে সরাসরি এই ধনসম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি বরং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ফেরত দাও। কারণ, স্বামী প্রদত্ত ধনসম্পদ খতম হয়ে যাওয়ার আশংকাই প্রবল। ফলে নারীদের কাছ থেকে ফেরত দেওয়ানো সম্ভবপর নয় বিধায় বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। যদি বায়তুলমাল থেকে দেওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেখান থেকে নতুবা মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে দেওয়া হবে।—(কুরতুবী)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ —পূর্বের আয়াত থেকে বোঝা গেছে যে, মুহাজির মুসলমান নারীর বিবাহ তার কাফির স্বামীর সাথে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এই আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখন মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হতে পারে, যদিও প্রাক্তন কাফির স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাকও না দেয়।

কাফির পুরুষের স্ত্রী মুসলমান হয়ে গেলে তাদের পারস্পরিক বিবাহ বন্ধন যে ছিন্ন হয়ে যায়, এ কথা পূর্বের আয়াত থেকে জানা গেছে। কিন্তু অন্য একজন মুসলমানের সাথে তার বিবাহ কখন জায়েয হবে, এ সম্পর্কে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন : আসল বিধি এই যে, যে কাফির পুরুষের স্ত্রী মুসলমান হয়, ইসলামী বিচারক তাকে ডেকে বলবে : যদি তুমিও মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমাদের বিবাহ বহাল থাকবে নতুবা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এরপরও যদি সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তখন মুসলমান নারী কোন মুসলমান পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। বলা বাহুল্য, ইসলামী রাষ্ট্রেই ইসলামী বিচারক কাফির স্বামীকে আদালতে হাযির করতে পারে। কাফির দেশে কিংবা শত্রুদেশে এরূপ ঘটনা ঘটলে সেখানে স্বামীকে ইস-লাম গ্রহণ করতে বলা সম্ভবপর নয়। ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা হতে পারবে না। তাই এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ তখন সম্পন্ন হবে, যখন মুসলমান নারী হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে অথবা মুসলমানদের সেনা ছাউনিতে চলে আসে। উপরোক্ত ঘটনাবলীতে দারুল ইসলামের আসা মদীনায় পৌঁছার মাধ্যমে হতে পারে এবং সেনা ছাউনীতে আসা হুদায়বিয়ায় পৌঁছার মাধ্যমে হতে পারে। কারণ, তখন হুদায়-বিয়ায় মুসলিম বাহিনী অবস্থানরত ছিল। ফিকাহ্ বিদগণের পরিভাষায় একে 'ইখতিলাফে-দারাইন' বলা হয়েছে অর্থাৎ যখন কাফির পুরুষ ও তার মুসলমান স্ত্রীর মধ্যে দুই দেশের ব্যবধান হয়ে যায়—একজন কাফির দেশে ও অন্যজন মুসলিম দেশে থাকে, তখন তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে নারী অপরকে বিবাহ করার জন্য মুক্ত হয়ে যায়। —(হিদায়া)

আলোচ্য আয়াতে إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ বাক্যটি শর্তরূপে উল্লিখিত

হয়েছে অর্থাৎ তোমরা এই নারীদেরকে মোহরানা দিয়ে দেওয়ার শর্তে বিবাহ করতে পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়। কেননা, সবার মতেই বিবাহ মোহরানা আদায় করার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে বিবাহের কারণে মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব অবশ্যই। এখানে একে শর্তরূপে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এই মাত্র এক মোহরানা কাফির স্বামীকে ফেরত দেওয়ানো হয়েছে। কাজেই বিবাহকারী মুসলমান মনে করতে পারে যে, নতুন মোহরানা দেওয়ার আর আবশ্যকতা নেই। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্য বলা হয়েছে যে, বিগত মোহরানার সম্পর্ক বিগত বিবাহের সাথে ছিল। এটা নতুন বিবাহ। কাজেই এর জন্য নতুন মোহরানা অপরিহার্য।

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ—عصم শব্দটি عصمة-এর বহুবচন। এর আসল অর্থ সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহ বন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণ যোগ্য বিষয় বোঝানো হয়েছে। كوافر শব্দটি كافرة-এর বহুবচন। এখানে মুশরিক রমণী বোঝানো হয়েছে। কেননা, কিতাবী কাফির রমণীকে বিবাহ করা কোরআনে সিদ্ধ রাখা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্যন্ত মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ছিল, তা খতম করে দেওয়া হল। এখন কোন মুসলমানের বিবাহ মুশরিক নারীর সাথে বৈধ নয়। পূর্বে যে বিবাহ হয়েছে, তাও খতম হয়ে গেছে। এখন কোন মুশরিক নারীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখা হালাল নয়।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যে সাহাবীর বিবাহে কোন মুশরিক নারী ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর বিবাহে দুইজন মুশরিক নারী ছিল। হিজরতের সময় তারা মক্কায় থেকে গিয়েছিল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন।—(মাযহারী) এখানে তালাকের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা। পারিভাষিক তালাকের এখানে প্রয়োজনই নেই। কেননা, আয়াতবলেই তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়।

وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا—অর্থাৎ যখন মুসলমান নারীকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে না এবং তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত দেওয়া হবে, এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান নারী ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কায় চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফির থাকার কারণে মুসলমান স্বামীর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলমান স্বামীকে তার মোহরানা ফেরত দেওয়া কাফিরদের দায়িত্ব হয়, তখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব লেনদেনের মীমাংসা করে নেওয়া কর্তব্য। উভয় পক্ষ যে মোহরানা ইত্যাদি দিয়েছে তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী লেনদেন করে নেওয়া উচিত।

এই আদেশ মুসলমানগণ সানন্দে পালন করেছে। কারণ, কোরআনের আদেশ পালন করা তাদের কাছে ফরয। কাজেই যে যে নারী হিজরত করে এসেছিল, তাদের সবার মোহরানা ইত্যাদি কাফির স্বামীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মক্কার

কাফিররা কোরআনে বিশ্বাস না থাকার কারণে এই আদেশ পালন করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে পবরর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ الاية—عاقبتم

শব্দটি معاقبة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রতিশোধ নেওয়াও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থও হতে পারে।—(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই হবে যে, মুসলমানদের কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোক যদি কাফিরদের হাতে থেকে যায়, তবে তাদের মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ইত্যাদি ফেরত দেওয়া কাফিরদের জন্য জরুরী ছিল, যেমন, মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুহাজির নারীদের কাফির স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাফিররা এরূপ করল না এবং মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দিল না। এখন তোমরা যদি এর প্রতিশোধ নাও এবং কাফিরদের প্রাপ্য মোহরানা তোমাদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক কর, তবে এর বিধান এই যে, فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا اَنْفَقُوْا অর্থাৎ তোমরা মুহাজির নারীদের দেয় আটককৃত মোহরানা থেকে সেই মুসলমান স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রী কাফিরদের হাতে রয়ে গেছে।

عاقبتم-এর অপর অর্থ যুদ্ধে সম্পদ হাসিল করাও হয়ে থাকে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যেসব মুসলমানের স্ত্রী কাফিরদের হাতে চলে গেছে এবং শর্ত অনুযায়ী কাফিররা মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা দেয়নি, এরপর মুসলমানেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেছে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকেই মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য দিতে হবে।—(কুরতুবী)

কিছু মুসলমান নারী ধর্মত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল কি? এই আয়াতে যে ব্যাপারে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, তার ঘটনা কারও কারও মতে মাত্র একটিই সংঘটিত হয়েছিল। তা এই যে, হযরত আয়ায ইবনে গানাম কোরায়শীর স্ত্রী উম্মুল হাকাম বিনতে আবূ সুফিয়ান ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সে ফিরে এসেছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এছাড়া আরও পাঁচজন নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা হিজরতের সময়েই মক্কায় কাফিরদের সাথে থেকে গিয়েছিল এবং পূর্ব থেকেই কাফির ছিল। কোরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে যখন মুসলমান পুরুষ ও কাফির নারীর বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়, তখনও তারা ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। ফলে তারাও সেই নারীদের মধ্যে গণ্য হয়, যাদের মোহরানা কাফিরদের কাছে মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য ছিল। কাফিররা যখন এই প্রাপ্য পরিশোধ করল না, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে পরিশোধ করে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা থেকে মক্কায় চলে যাওয়ার ঘটনা মাত্র একটিই ছিল। অবশিষ্ট পাঁচজন নারী পূর্ব থেকেই কাফির ছিল এবং কাফির থাকার কারণে আয়াতের ভিত্তিতে মুসলমানদের সাথে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। যে নারী ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল, সেও পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। —(কুরতুবী) বগভী (র) বর্ণনা করেন যে, অবশিষ্ট পাঁচজনও পরে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল।—(মাযহারী)

নারীদের আনুগত্যের শপথঃ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ -এ আয়াতে মুসলমান নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আকায়িদসহ শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করারও অঙ্গীকার রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াত দৃষ্টে যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলমান নারীর জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ করেছে। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ওমায়মা বর্ণনা করেনঃ আমি আরও কয়েকজন মহিলাসহ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেন এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করান فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ অর্থাৎ আমরা এসব বিষয় পালনের অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়। ওমায়মা এরপর বলেনঃ এ থেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্নেহ মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশী ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকারই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে না।—(মাযহারী)

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) এই শপথ সম্পর্কে বলেনঃ মহিলাদের এই শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে—হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হত। বস্তুত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাত কখনও কোন গায়র মাহ্রাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।—(মাযহারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হুদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয় বরং বারবার হয়েছে। এমনকি, মক্কা বিজয়ের দিনও রসূলুল্লাহ্ (সা) পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ সমাপ্ত করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত উমর (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাক্যাবলী নিচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন।

তখন যারা আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সে প্রথমে লজ্জাবশত নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসা করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।—(মাযহারী)

পুরুষদের শপথ সংক্ষেপে এবং নারীদের শপথ বিশদরূপে হয়েছে ঃ পুরুষদের কাছ থেকে সাধারণত ইসলাম ও জিহাদের শপথ নেওয়া হয়েছে। এতে কার্যগত বিধি-বিধানের বিশদ বিবরণ ছিল না কিন্তু মহিলাদের শপথে তা ছিল। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, পুরুষদের কাছ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের শপথ নেওয়ার মধ্যে এসব বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। নারীরা সাধারণত বুদ্ধি-বিবেচনায় পুরুষদের অপেক্ষা কম হয়ে থাকে। তাই বিস্তারিত বিবরণ সমীচীন মনে করা হয়েছে এবং নারীদের কাছ থেকে এই শপথ নেওয়ার সূচনা করা হয়েছে। এরপর পুরুষদের কাছ থেকেও এসব বিষয়েরই শপথ নেওয়ার কথা হাদীস থেকে জানা যায়।—(কুরতুবী) এ ছাড়া নারীদের কাছ থেকে যেসব বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে, নারীরা সাধারণত এসব বিষয়ে বিচ্যুতির শিকার হয়ে থাকে। এ কারণেও তাদের আনুগত্যের শপথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ — এতে প্রথম বিষয় হচ্ছে ঈমান অবলম্বন করা এবং শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সাধারণ পুরুষদের শপথেও থাকে। দ্বিতীয় বিষয় চুরি না করা। অনেক নারীই স্বামীর ধনসম্পদ চুরি করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। তাই এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয় ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা। এতে নারীরা পাক-পবিত্র হলে পুরুষদের জন্যও আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে যায়। চতুর্থ বিষয় নিজ সন্তানকে হত্যা না করা।

মূর্খতা যুগে কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করার প্রচলন ছিল। আয়াতে একে রোধ করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপ না করা। এই নিষেধাজ্ঞার সাথে এ কথাও আছে যে, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ — অর্থাৎ নিজের হাত ও পায়ের মাঝখানে যেন অপবাদ আরোপ না করে। এর কারণ এই যে, কিয়ামতের দিন মানুষের হস্তপদই তার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের পাপ কর্ম করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আমি চারজন সাক্ষীর মাঝখানে এই কাজ করছি। এরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

এখানে স্বামীর প্রতি অথবা অন্য যে কারও প্রতি অপবাদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, কাফিরের প্রতিও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হারাম। এমতাবস্থায় স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা আরও বেশী কঠোর গোনাহ্ হবে। স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপের এক প্রকার এই যে, স্ত্রী অন্য কোন ব্যক্তির সন্তানকে স্বামীর সন্তানরূপে প্রকাশ করে এবং তার বংশভুক্ত করে দেয়। আরেক প্রকার এই যে, নাউযুবিল্লাহ্, ব্যভিচারের ফলে যে গর্ভ সঞ্চার হয়, তাকে স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দেয়।

ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে একটি সাধারণ বিধি। তা এই যে وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ অর্থাৎ তারা ভাল কাজে আপনার আদেশ অমান্য করবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) যে কোন কাজের আদেশ দেবেন, তা ভাল না হয়ে পারে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চিত অসম্ভব। এমতাবস্থায় 'ভাল কাজে' কথাটি যুক্ত করার কারণ কি? এর এক কারণ তো এই যে, মুসলমানরা যেন ভাল করে বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্র আদেশের বিপরীতে কোন মানুষের আনুগত্য করা জায়েয নয়। এমনকি, সেই মানুষটি যদি রসূলও হন, তবুও নয়। তাই রসূলের আনুগত্যের সাথেও এই শর্তটি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে ব্যাপার নারীদের। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কোন আদেশেরই খেলাফ করবে না, এরূপ ব্যাপক আনুগত্যের কারণে শয়তান কারও মনে পথ-ভ্রষ্টতার কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারত। এই পথ বন্ধ করার জন্য শর্তটি যুক্ত করা হয়েছে।

سورة الصف

সূরা সাফ্‌ফ

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৪ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ يٰۤاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ
تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ
سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ
يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْۤا
اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ وَاِذْ
قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِي
اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ
وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ
بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে।

তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (২) হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? (৩) তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অসন্তোষজনক। (৪) আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর। (৫) স্মরণ কর, যখন মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলল : হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৬) স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ) বলল : হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল : এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। (৭) যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তার চাইতে অধিক জালিম আর কে? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৮) তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্‌র আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (৯) তিনিই তাঁর রসূলকে পথ-নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে), তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (অতএব, তাঁর প্রত্যেক আদেশ মেনে নেওয়া জরুরী। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে জিহাদের আদেশ, যা এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এই সূরা অবতরণের কারণ এই যে, একবার কয়েকজন মুসলমান পরস্পরে আলোচনা করল যে, আমরা যদি এমন কোন আমল জানতে পারি, যা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই প্রিয়, তবে আমরা তা বাস্তবায়িত করব। ইতিপূর্বে ওহুদ যুদ্ধে কোন কোন মুসলমান পলায়ন করেছিল। এ ছাড়া জিহাদের আদেশ নাযিল হওয়ার সময় কেউ কেউ একে দুরূহ মনে করেছিল। সূরা নিসায় এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ইরশাদ নাযিল হল :) মু'মিন-গণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অসন্তোষজনক। আল্লাহ্ তা'আলা তো তাদেরকে (বিশেষভাবে) পছন্দ করেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর (অর্থাৎ সীসা গালানো প্রাচীর যেমন মজবুত, অপরাজেয় হয়ে থাকে, তেমনি তারা শত্রুর মুকাবিলায় পশ্চাদপদ হয় না। উদ্দেশ্য এই যে, বল, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি যদি আমরা জানতাম। শুনে নাও, সেই আমল হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ নাযিল হওয়ার সময় তোমরা কেন একে দুরূহ মনে করেছিলে এবং ওহুদ যুদ্ধে কেন পলায়ন করেছিলে? এসব বিষয় সত্ত্বেও বড় বড় দাবী করা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অশোভনীয় ও অপছন্দনীয়। অতএব,

আয়াতে বৃথা আস্ফালন ও মিথ্যা দাবীর কারণে শাসানো হয়েছে। আমলবিহীন উপদেশ আয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর কাফিররা যে হত্যা ও লড়াইয়ের যোগ্য পাত্র, এর কারণ অর্থাৎ রসূলকে কষ্টদান, মিথ্যারোপ ও বিরোধিতা বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মিল রেখে হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ঃ স্মরণ কর) যখন মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল। (তাঁর সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে তাঁকে কষ্ট দিত। তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। অবাধ্যতা ও বিরোধিতাই সব ঘটনার সারমর্ম)। অতঃপর (একথা বলার পরও) যখন তারা বক্রতাই অবলম্বন করল (এবং সুপথে এল না) তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরকে (আরও বেশী) বক্র করে দিলেন। (অর্থাৎ নাফরমানী ও বিরোধিতা আরও বেড়ে গেল। সদাসর্বদা পাপ করলে আল্লাহ্র প্রতি অন্তরের ঝোঁক ও তাঁর আনুগত্যের প্রেরণা হ্রাস পাওয়াই নিয়ম)। আল্লাহ্ তা'আলা এমন পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (এটাই তাঁর রীতি। তাঁরাও আল্লাহ্র রসূলকে বিভিন্ন প্রকার বিরোধিতা করে কষ্ট প্রদান করে। তাই তাদের বক্রতা ও পাপাচার আরও বেড়ে যায়। এখন সংশোধনের আর আশা নেই। অতএব, তাদের অনিষ্ট দূর করার জন্য জিহাদের আদেশ উপযুক্ত হয়েছে। এমনিভাবে সে সময়টিও স্মরণীয়) যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ) বলল ঃ হে বনী-ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল। আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। এই সুসংবাদ যে ঈসা (আ) থেকে বর্ণিত আছে, তা স্বয়ং খৃস্টানদের বর্ণনা দ্বারা হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে। সেমতে খায়েনে আবূ দাউ-দের রেওয়ায়েতক্রমে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, বাস্তবিকই হযরত ঈসা (আ) এই পয়গম্বরেরই সুসংবাদ দিয়েছিলেন। নাজ্জাশী খৃস্টধর্ম সম্পর্কে সুপণ্ডিতও ছিলেন। খায়েনেই তিরমিযী থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গুণাবলী উল্লিখিত আছে এবং একথাও আছে যে, ঈসা (আ) তাঁর সাথে সমাধিস্থ হবেন। ঈসা (আ) তওরাতের প্রচারক ছিলেন, তাই এটা যেন ঈসা (আ) থেকেই বর্ণিত আছে। মাওলানা রহমতুল্লাহ্ সাহেব 'এযহারুল হকে' তওরাতের বর্তমান কপি থেকে একাধিক সুসংবাদ উদ্ধৃত করেছেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬৪ পৃ. কনস্টান্টিনোপলে মুদ্রিত) বর্তমান ইঞ্জীলে এসব বিষয়বস্তু না থাকা মোটেই ক্ষতিকর নয়, কারণ সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতদের মতে বর্তমান ইঞ্জীল অবিকৃত নয়। এতদসত্ত্বেও যা আছে, তাতেও এ ধরনের বিষয়বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। সেমতে ইউহান্নার ইঞ্জীলের (যার আরবী অনুবাদ ১৮৩১ ও ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়,) চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে ঃ আমার চলে যাওয়াই তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা, আমি না গেলে 'ফারকিলিত' তোমা-দের কাছে আসবেন না। আমি গেলেই তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। 'ফারকিলিত' শব্দটি 'আহমদেরই' অনুবাদ। কিতাবীরা অনুবাদ করতে গিয়ে নামেরও অনুবাদ করত। ঈসা (আ) হিব্রু ভাষায় আহমদ বলেছিলেন। এরপর যখন গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হল, তখন 'বিরকলুতুস' লিখে দেওয়া হল। এর অর্থ আহমদ অর্থাৎ বহুল প্রশংসিত, খুব

প্রশংসাকারী। এরপর গ্রীক ভাষা থেকে হিব্রুতে অনুবাদ করতে গিয়ে একেই 'ফারকিলিত' করে দেওয়া হল। হিব্রু ভাষার কোন কোন কপিতে এখন পর্যন্ত 'আহমদ' নাম বিদ্যমান রয়েছে। এই 'ফারকিলিত' সম্পর্কে ইউহান্নার ইঞ্জীলে বলা হয়েছে : তিনি তোমাদেরকে সবকিছু শিখিয়ে দেবেন। এই জাহানের নেতা আসবেন। তিনি এসে দুনিয়াকে পাপের কারণে এবং সততা ও ন্যায়বিচারের খেলাফ করার কারণে শাস্তি দেবেন। এসব বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি স্বতন্ত্র পয়গম্বর হবেন।—(তফসীরে-হাক্কানী) মোটকথা, ঈসা (আ) তাদেরকে উপরোক্ত কথা বললেন। অতঃপর যখন (এসব বিষয়বস্তু বলে নিজের নবুয়ত সুপ্রমাণ করার জন্য) সে অর্থাৎ ঈসা (আ)) তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা (এসব প্রমাণ ও মো'জেযা সম্পর্কে) বলল : এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। [তারা যাদু বলে নবুয়ত অস্বীকার করল। এমনিভাবে ঈসা (আ)-এর পর আবার বর্তমান কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত অস্বীকার করল। এটা মহা অন্যায় ও জুলুম। এই জুলুমের সংক্রমণ রোধ করার জন্য জিহাদের আদেশ সমীচীন হয়েছে। বাস্তবিকই] যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তার চাইতে অধিক জালিম আর কে? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলা এই যে, তারা নবুয়ত অবিশ্বাস করেছে। যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়, তা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত করা এবং যা বাস্তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, তা অস্বীকার করা—উভয়ই আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলার শামিল। وَهُوَ يُدْعَىٰ বলায় কাজটি আরও বেশী মন্দ হওয়া বোঝা যায়। অর্থাৎ সতর্ক করার পরও সে নিজে সতর্ক হয়নি। وَاللَّهُ لَا يَهْدِي বলায় বোঝা যায় যে, তাদের অবস্থা সংশোধনের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই যুদ্ধের শাস্তিই উপযুক্ত হয়েছে। সে মতে যে ব্যক্তি এখনও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে তার অস্বীকৃতি বাহ্যত নৈরাশ্যের আলামত। এখন তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা সিদ্ধ। অতঃপর জিহাদে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সাহায্য, সত্যের প্রাধান্য ও মিথ্যার পরাজয় সম্পর্কিত ওয়াদা বর্ণনা করা হচ্ছে :) তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্র আলো (অর্থাৎ ইসলামকে) নিভিয়ে দিতে চায় (অর্থাৎ কর্মগত কৌশলের সাথে সাথে মুখ থেকেও আপত্তিজনক কথাবার্তা এই উদ্দেশ্যে বলে, যাতে সত্য ধর্ম প্রসার লাভ করতে না পারে। মাঝে মাঝে মৌখিক প্রোপাগাণ্ডাও কার্যকর হয়ে যায়। অথবা এটা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যেন ফুঁৎকারে আল্লাহ্র আলো নিভিয়ে দিতে চায়)। অথচ আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান করে ছাড়বেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (সেমতে) তিনিই তাঁর রসূলকে (আলো পূর্ণ করার জন্য) পথ নির্দেশ (অর্থাৎ কোরআন) ও সত্য ধর্ম দিয়ে (দুনিয়াতে) প্রেরণ করেছেন, যাতে একে (আলোরূপ ইসলামকে অবশিষ্ট) সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন (এটাই পূর্ণতা দান করা) যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল : তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

একদল সাহাবায়ে কিরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্টি, আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। বগভী (র) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জন্য জান ও মাল সব বিসর্জন করতাম।—(মাযহারী)

ইবনে কাসীর মসনদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য প্রেরণ করতে চাইলেন কিন্তু কারও সাহস হল না। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। [ফলে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন]। তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে সমগ্র সূরা সাফ্ফ পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাযিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জিহাদ। তাঁরা এ সম্পর্কে যেসব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবী উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সূরায় সাথে সাথে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন মু'মিনের জন্য এ ধরনের বুলি আওড়ানো দুরস্ত নয়। কারণ, যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পারবে কিনা, তা তার জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাধীন নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আন্তরিক সংকল্পও তার কব্জায় নয়। এ কারণেই কোরআন পাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আগামীকালের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে ইনশাআল্লাহ্ অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ চান বলে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছে :

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ —সাহাবায়ে

কিরামের নিয়ত ও ইচ্ছা বুলি আওড়ানো না হলেও দৃশ্যত তাই বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহ্র কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কোন কাজ করার বড় গলায় দাবী করবে, ইনশাআল্লাহ্ বলা ব্যতীত। মোটকথা, তাঁদের হুঁশিয়ার করার জন্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা করার দাবী কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বোঝা গেল, যা করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তরে নেই। কারণ, এটা একটা মিথ্যা দাবী বৈ নয়, যা নাম ও যশ অর্জনের খাতিরে

হতে পারে। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কিরাম যে দাবী করেছিলেন, তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত যে, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে কোন কাজ করার দাবী করা দাসত্বের পরিপন্থী। প্রথমত তা বলারই প্রয়োজন নেই। কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কোন উপযোগিতা-বশত বলার দরকার হলেও ইন্শাআল্লাহ্‌সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবী থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যে কাজ করার ইচ্ছাই নেই, সে কাজের দাবী করা কবীরা গোনাহ্ এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ। যে ক্ষেত্রে অন্তরে কাজটি করার ইচ্ছা থাকে, সেখানেও নিজের শক্তি ও ক্ষমতার উপর ভরসা করে দাবী করা নিষিদ্ধ ও মকরূহ্।

দাবী ও দাওয়াতের পার্থক্য ঃ উপরোক্ত তফসীর থেকে জানা গেল যে, দাবীর সাথে এসব আয়াত সম্পৃক্ত অর্থাৎ মানুষ যে কাজ করবে না, তা করার দাবী করা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অসন্তোষজনক। মানুষ যে সৎ কাজ নিজে করে না, সেই সৎ কাজের দাওয়াত, প্রচার ও উপদেশ অন্যকে দেওয়ার বিষয়টি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ সম্পর্কিত বিধিবিধান অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। উদাহরণত কোরআন বলে ঃ

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ — অর্থাৎ তোমরা মানুষকে তো সৎ কাজের আদেশ কর, কিন্তু নিজেকে ভুলে যাও অর্থাৎ নিজে এই সৎ কাজ কর না। এই আয়াত সৎ কাজের আদেশ ও ওয়ায উপদেশ দাতাদেরকে লজ্জা দিয়েছে যে, অন্যকে তো সৎ কাজ করার দাওয়াত দাও, কিন্তু নিজে তা কর না, এটা লজ্জার কথা। উদ্দেশ্য এই যে, অপরকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজেকে উপদেশ দাও এবং অপরকে যে কাজ করতে বল, নিজেও তা কর।

কিন্তু একথা বলা হয়নি যে, নিজে যখন কর না, তখন অপরকেও করতে বলো না। এ থেকে জানা গেল যে, যে সৎ কাজ নিজে করার সাহস ও তওফীক নেই, তার প্রতি অপরকে উদ্বুদ্ধ করতে ও উপদেশ দিতে ত্রুটি করা উচিত নয়। আশা করা যায় যে, এই উপদেশের কল্যাণে কোন সময় তার নিজেরও এ কাজ করার তওফীক হয়ে যাবে। বিস্তর অভিজ্ঞতা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে সে কাজটি যদি ওয়াজিব অথবা সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ্ পর্যায়ের হয়, তবে উপরোক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে মনে মনে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়াও ওয়াজিব। মোস্তাহাব পর্যায়ের হলে অনুতাপ করাও মোস্তাহাব।

পরের আয়াতে এই সূরা অবতরণের আসল কারণ বিবৃত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্‌টি? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ —

অর্থাৎ যুদ্ধের সেই কাতার আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়, যা আল্লাহ্‌র শত্রুদের মুকাবিলায় তাঁর

বাণী সমুন্নত করার জন্য কায়েম করা হয় এবং মুজাহিদদের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার কারণে তা একটি সীসা গলানো দুর্ভেদ্য প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে।

এরপর হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র আল্লাহ্র পথে জিহাদ এবং শত্রুদের নির্যাতন সহ্য করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় মুসলমানদেরকে জিহাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র ঘটনাবলীতেও অনেক শিক্ষাগত ও কর্মগত উপকারিতা এবং দিক-নির্দেশ রয়েছে। হযরত ঈসা (আ)-র কাহিনীতে আছে যে, তিনি যখন বনী ইসরাঈলকে তাঁর নবুয়ত মেনে নেওয়ার ও আনুগত্য করার দাওয়াত দেন, তখন বিশেষভাবে দুটি বিষয় উল্লেখ করেন। এক. তিনি কোন অভিনব রসূল নন এবং অভিনব বিষয় নিয়ে আগমন করেন নি; বরং এমন সব বিষয় নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এ পর্যন্ত বলে এসেছেন এবং পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবে উল্লিখিত আছে। পরে যে সর্বশেষ পয়গম্বর আগমন করবেন; তিনিও এ ধরনের দিক-নির্দেশ নিয়ে আসবেন।

এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে তওরাতের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বনী ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ নিকটতম কিতাব এটিই ছিল। নতুবা পয়গম্বরগণ পূর্ববর্তী সব কিতাবেরই সত্যায়ন করেছেন। এ ছাড়া এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা (আ)-র শরীয়ত যদিও স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু তার অধিকাংশ বিধিবিধান মূসা (আ)-র শরীয়ত ও তওরাতের অনুরূপ। স্বল্প সংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র।

হযরত ঈসা (আ) দ্বিতীয় বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরে আগমনকারী রসূলের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর দিক-নির্দেশও তদনুরূপ হবে। তাই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বুদ্ধি এবং সততার দাবী।

সাথে সাথে তিনি বনী ইসরাঈলকে পরে আগমনকারী রসূলের নামঠিকানাও ইঞ্জীলে বলে দিয়েছেন। এভাবে বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যখন আগমন করবেন, তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ — বাক্যে তাই বর্ণিত হয়েছে। এতে সেই রসূলের নাম বলা হয়েছে আহ্মদ। আমাদের প্রিয় শেষ নবী (সা)-র মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। কিন্তু ইঞ্জীলে তাঁর নাম আহমদ উল্লেখ করার উপযোগিতা সম্ভবত এই যে, আরবে প্রাচীনকাল থেকেই মুহাম্মদ নাম রাখার প্রচলন ছিল। ফলে এই নামের আরও লোক আরবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আহমদ নাম আরবে প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল না। এটা একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশেষ নাম ছিল।

ইঞ্জীলে রসূলে করীম (সা)-এর সুসংবাদঃ একথা সুবিদিত এবং স্বয়ং ইহুদী ও খৃস্টানরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্জীলের বিষয়বস্তু বিকৃত হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই কিতাবদ্বয়ে এত বেশি পরিবর্তন হয়েছে যে, এখন প্রকৃত কালাম চিনাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বর্তমান বিকৃত ইঞ্জীলের ভিত্তিতে আজকালকার খৃস্টানরা কোরআনের

এই বক্তব্য স্বীকার করে না যে, ইঞ্জীলে কোথাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম আহমদ উল্লেখ করে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে।

বিস্তারিত জওয়াবের জন্য হযরত মাওলানা 'রহমতুল্লাহ্' কেরানভীর কিতাব 'এযহারুল হক' পাঠ করা দরকার। এটা খৃস্টধর্মের স্বরূপ, ইঞ্জীলে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুসংবাদ ইঞ্জীলে বিদ্যমান থাকা সম্পর্কেও একটা নযীরবিহীন কিতাব। বড় বড় খৃস্টান পণ্ডিতদের এই উক্তিও মুদ্রিত আছে যে, এই কিতাব প্রকাশিত হতে থাকলে কখনও খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হতে পারবে না।

এই কিতাব আরবী ভাষায় লিখিত হয়েছিল। পরে তুর্কী এবং ইংরেজী ভাষায়ও এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি দারুল উলূম করাচী থেকে এর উর্দু অনুবাদও তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ
أَلِيمٍ ۝ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ
مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَأُخْرَىٰ
تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ
فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ
آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ۝

(১০) হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? (১১) তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবনপণ

করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। (১২) তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। (১৩) এবং আরও একটি অনুগ্রহ দেবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন। (১৪) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়ম তার শিষ্যবর্গকে বলেছিল, আল্লাহ্র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যবর্গ বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাফির হয়ে গেল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় শক্তি যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রথমে জিহাদের পরকালীন ফলাফল ও পরে ইহকালীন ফলাফলের ওয়াদা করে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে ঃ) মু'মিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? (তা এই যে) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (এরূপ করলে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যা চিরকাল বসবাসের উদ্যানে (নির্মিত) হবে। এটা মহাসাফল্য। (এই সত্যিকার পরকালীন ফলাফল ছাড়াও) আরও একটি (ইহকালীন) ফলাফল আছে, যা তোমরা (বিশেষভাবে) পছন্দ কর (অর্থাৎ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। (এটা পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে দ্রুত ফলাফল কামনা করে। হে পয়গম্বর, আপনি) মু'মিনগণকে এর সুসংবাদ দান করুন। [সাহায্য ও বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী একের পর এক ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর ঈসা (আ)-র শিষ্যবর্গের কাহিনী বর্ণনা করে ধর্মের সাহায্যের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে ঃ] মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্র (দীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও (অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে)। যেমন [ঈসা (আ)-র শিষ্যবর্গ দীনের সাহায্যকারী হয়েছিল। তখন বহু সংখ্যক লোক ঈসা (আ)-র শত্রু ছিল]। ঈসা ইবনে মরিয়ম তাঁর শিষ্যবর্গকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্র পথে কে আমার সাহায্যকারী? শিষ্যবর্গ বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহ্র (দীনের) সাহায্যকারী। সে মতে তারা দীন প্রচারে চেষ্টা করে দীনের সাহায্য করেছিল। অতঃপর (এই চেষ্টার পর) বনী ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাফির হয়ে গেল। (এরপর তাদের মধ্যে শত্রুতা ও গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে অথবা ধর্মীয় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে) অতএব, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হল। (তোমরাও এমনিভাবে দীনে মুহাম্মদীর জন্য চেষ্টা ও জিহাদ কর। উপরোক্ত গৃহযুদ্ধের

সূচনা যদি কাফিরদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে এতে খৃস্টধর্মে জিহাদের অস্তিত্ব জরুরী হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ

এই আয়াতে ঈমান এবং ধনসম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ, বাণিজ্যে যেমন কিছু ধনসম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহ্র পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নিয়ামত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার গোনাহ্ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস ব্যসনের সরঞ্জাম থাকবে। অতঃপর পরকালীন নিয়ামতের সাথে কিছু ইহকালীন নিয়ামতেরও ওয়াদা করা হয়েছে ঃ

نعمت- শব্দটি أُخْرَىٰ—وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নিয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই, ইহকালেও একটি নগদ নিয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়।, অর্থাৎ শত্রুদেশ বিজিত হওয়া। এখানে قَرِيبٌ শব্দটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত قَرِيبٌ ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খায়বর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। تُحِبُّونَهَا অর্থাৎ তোমরা এই নগদ নিয়ামত খুব পছন্দ কর। কারণ, মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا অর্থাৎ মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালীন নিয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নিয়ামত তো তাদের প্রিয় কাম্যই কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নিয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেওয়া হবে।

—كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ

حَوَارِيِّين শব্দটি حَوَارِي -এর বহুবচন। এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। যারা ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে حَوَارِي বলা হত। সূরা আল-ইমরানে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল বারজন। এই আয়াতে ঈসা (আ)-র আমলের একটি ঘটনা

উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যের জন্য তৈরী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ) শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেনঃ

مَنْ أَنْصَارِيْ إِلَى اللهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দীন প্রচারে কে আমার সাহায্যকারী হবে? প্রত্যুত্তরে বারজন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং খৃস্টধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব, মুসলমানদেরকেও আল্লাহ্‌র দীন প্রচারে সাহায্যকারী হওয়া উচিত।

সাহাবায়ে কিরাম এই আদেশ পালনে বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য নযীর স্থাপন করেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও দীনের খাতিরে সারা বিশ্বের শত্রুতা বরণ করে নেন, অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেন এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন বিসর্জন দেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে বিজয় ও সাহায্য দ্বারা ভূষিত করেন এবং শত্রুদের মুকাবিলায় প্রাধান্য দান করেন। বহু শত্রুদেশ তাঁদের করতলগত হয় এবং তাঁরা রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতাও অর্জন করেন।

فَآمَنَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّائِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ -

খৃস্টানদের তিন দলঃ বগভী (র) এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আ) আসমানে উত্থিত হওয়ার পর খৃস্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল বললঃ তিনি আল্লাহ্ ছিলেন এবং আসমানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বললঃ তিনি আল্লাহ্ ছিলেন না বরং আল্লাহ্‌র পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ্ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শত্রুদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ ও সত্য কথা বলল। তারা বললঃ তিনি আল্লাহ্‌ও ছিলেন না, আল্লাহ্‌র পুত্রও ছিলেন না বরং আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শত্রুদের কবল থেকে হিফাযত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্য আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারাই ছিল সত্যিকার ঈমানদার। প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণও যোগদান করে এবং পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফির দল মু'মিনদের মুকাবিলায় প্রবল হয়ে উঠে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ পয়গম্বর (সা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি মু'মিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পরিণামে মু'মিন দল যুক্তিপ্রমাণের নিরিখে বিজয়ী হয়ে যায়। —(মাযহারী)

এই তফসীর অনুযায়ী اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا বলে ঈসা (আ)-র উম্মতের মু'মিন-গণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহায্য ও সমর্থনে বিজয়-গৌরব অর্জন করবে।—(মাযহারী) কেউ কেউ বলেনঃ ঈসা (আ)-র আসমানে উত্থিত হওয়ার পর

খৃস্টানদের মধ্যে দুই দল হয়ে যায়। একদল ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্‌র পুত্র আখ্যায়িত করে মুশরিক হয়ে যায় এবং অপর দল বিশুদ্ধ ও খাঁটি দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল মান্য করে। এরপর মুশরিক ও মু'মিন দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে কাফির দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। কিন্তু একথাই প্রসিদ্ধ যে, ঈসা (আ)-র ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধের বিধান ছিল না। তাই মু'মিন দলের যুদ্ধ করার কথা অবান্তর মনে হয়। —(রূহুল-মা'আনী) উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর জওয়াবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্ভবত যুদ্ধের সূচনা কাফির খৃস্টানদলের পক্ষ থেকে হয়েছিল এবং মু'মিনরা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা প্রকৃতপক্ষে জিহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পড়ে না।

سورة الجمعة

সূরা জুমু'আ

মদীনায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ
الْحَكِيْمِ ۝١ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ۝٢ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٣ ذٰلِكَ
فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٤ مَثَلُ
الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۚ
بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ۝٥ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ
مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٦ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ
اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٧ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ
الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٨ ع

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে। (২) তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য

থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। (৩) এই রসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্য, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪) এটা আল্লাহ্র কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্ মহাকৃপাশীল। (৫) যাদেরকে তওরাত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬) বলুন—হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহ্র বন্ধু—অন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৭) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (৮) বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন সেই সব কর্ম, যা তোমরা করতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে। তিনিই (আরবের) নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই (সম্প্রদায়ের) মধ্য থেকে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে (ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুচরিত্র থেকে) পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন (সব ধর্মীয় জরুরী জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত)। ইতিপূর্বে (অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে) তারা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল। (অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত ছিল। মানে অধিকাংশ লোক লিপ্ত ছিল। কেননা, মূর্খতা যুগেও কিছুসংখ্যক একত্ববাদী বিদ্যমান ছিল)। এই রসূল অন্য আরও লোকদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, যারা (মুসলমান হয়ে) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি (ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে অথবা তারা এখনও জন্মগ্রহণই করেনি। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আরব-অনারব সব লোক অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মুসলমান সব ইসলামের সম্পর্কে এক ও অভিন্ন, তাই তাদেরকে مِنْهُمْ বলা হয়েছে।—(খাযেন) তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (তাই এমন নবী প্রেরণ করেছেন)। এটা (অর্থাৎ রসূলের মাধ্যমে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়ে কিতাব ও হিদায়তের দিকে আসা) আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আল্লাহ্ মহাকৃপাশীল। (সবাইকে দিলেও দিতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাবলে যাকে ইচ্ছা দেন এবং বঞ্চিত রাখেন। উপরে নিরক্ষরদের মু'মিন হওয়া এবং ইহুদী আলিমদের মু'মিন না হওয়া থেকে এ কথা সুস্পষ্ট। অতঃপর রিসালত অমান্যকারীদের নিন্দায় বলা হচ্ছে ঃ) যাদেরকে তওরাত মেনে চলতে বলা

৫৫—

হয়েছিল, অতঃপর তারা তা মেনে চলেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে (কিন্তু পুস্তকের উপকার পায় না। তেমনিভাবে জ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য ও উপকার হচ্ছে তদনুযায়ী কাজ করা। এটা না হলে জ্ঞানার্জন পণ্ডশ্রম মাত্র। জন্তুদের মধ্যে গাধা প্রসিদ্ধ বেওকুফ। তাই বিশেষভাবে একে উল্লেখ করে অধিক ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে)। যারা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা বলে তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট (যেমন এই ইহুদীরা)। আল্লাহ্ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।] কারণ তারা জেনে-বুঝে হঠকারিতা করে। হঠকারিতা ত্যাগ করলেই তাদের পথপ্রদর্শন হবে। তওরাত মেনে চলার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। সুতরাং বিশ্বাস স্থাপন না করা তওরাত অমান্য করার নামান্তর। যদি তারা বলে যে, তারা এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্র প্রিয়, তবে] আপনি বলুন ঃ হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহ্র বন্ধু—অন্য মানুষ নয়, তবে (এর সত্যায়নের জন্য) তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা (এই দাবীতে) সত্যবাদী হও। (আমি সাথে সাথে এ কথাও বলে দিচ্ছি যে) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে (অর্থাৎ শাস্তির ভয়ে) কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (বিচারের দিন আসলে অপরাধের বিবরণ শুনিয়ে শাস্তির আদেশ দেবেন। শাস্তির এই প্রতিশ্রুতিকে জোরদার করার জন্য আপনি একথাও) বলুন ঃ তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর, (এবং বন্ধুত্ব দাবী করা সত্ত্বেও শাস্তির ভয়ে যা কামনা কর না) সেই মৃত্যু (একদিন) অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্র কাছে নীত হবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন (এবং শাস্তি দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ—কোরআন পাকে যেসব সূরা يُسَبِّحُ ও سَبَّحَ শব্দ দ্বারা শুরু হয়, সেগুলোকে 'মুসাব্বাহাত' বলা হয়। এসব সূরায় নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর জন্য আল্লাহ্র পবিত্রতা পাঠ সপ্রমাণ করা হয়েছে। অবস্থার মাধ্যমে এই পবিত্রতা পাঠ সবারই বোধগম্য। কারণ, সৃষ্ট জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তার প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও অপার শক্তি-সামর্থ্যের সাক্ষ্যদাতা। এটাই তার পবিত্রতা পাঠ। নির্ভুল সত্য এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আক্ষরিক অর্থেও পবিত্রতা পাঠ করে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে তার সাধ্যানুযায়ী চেতনা ও অনুভূতি রেখেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতির অপরিহার্য দাবী হচ্ছে পবিত্রতা পাঠ। কিন্তু এসব বস্তুর পবিত্রতা পাঠ মানুষ শ্রবণ করে না। তাই কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ—অধিকাংশ

সূরার শুরুতে অতীত পদবাচ্যে سَبَّحَ বলা হয়েছে। কেবল সূরা জুমু'আ ও সূরা তাগাবুনে ভবিষ্যৎ পদবাচ্যে يُسَبِّحُ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ভাষাগত অলংকার এই যে, অতীত পদবাচ্যে নিশ্চয়তা বোঝায়। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ব্যবহৃত হয়েছে। ভবিষ্যৎ পদবাচ্য সদাসর্বদা হওয়া বোঝায়। এই অর্থ বোঝাবার জন্য দুই জায়গায় এই পদ ব্যবহার করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا—اُمِّيِّيْن। শব্দটি اُمِّى এর বহুবচন। এর অর্থ নিরক্ষর। আরবরা এই পদবীতে সুবিদিত। কারণ, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। লেখাপড়া জানা লোক খুব কম ছিল। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তি প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে আরবদের জন্য এই পদবী অবলম্বন করা হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, প্রেরিত রসূলও তাদেরই একজন অর্থাৎ নিরক্ষর। কাজেই এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, গোটা জাতি নিরক্ষর এবং তাদের কাছে যে রসূল প্রেরিত হয়েছেন, তিনিও নিরক্ষর। অথচ যেসব কর্তব্য এই রসূলকে সোপর্দ করা হয়েছে, সেগুলো সবই এমন শিক্ষামূলক ও সংস্কারমূলক যে, কোন নিরক্ষর ব্যক্তি এগুলো শিক্ষা দিতে পারে না এবং কোন নিরক্ষর জাতি এগুলো শিখার যোগ্য নয়।

একে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিবলে রসূলে করীম (সা)-এর অলৌকিক ক্ষমতাই আখ্যা দেওয়া যায় যে, তিনি যখন শিক্ষা ও সংস্কারের কাজ শুরু করেন, তখন এই নিরক্ষরদের মধ্যেই এমন সুপণ্ডিত ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটল, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও কুশলতা এবং উৎকৃষ্ট কর্মপ্রতিভা সারা বিশ্বের স্বীকৃতি ও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পয়গম্বর প্রেরণের তিন উদ্দেশ্য ঃ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ—এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ এক. কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত, দুই. উম্মতকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, তিন. কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেওয়া।

এই তিনটি বিষয়ই উম্মতের জন্য যেমন আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত, তেমনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেরও অন্তর্ভুক্ত।

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ — تلو ও تلا-এর আসল অর্থ অনুসরণ করা। পরিভাষায় শব্দটি আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ايات বলে কোরআনের আয়াত বোঝানো হয়েছে। عليهم শব্দে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য এই যে, তিনি মানুষকে কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য يُزَكِّيهِمْ — এটা تَزْكِيَة থেকে উদ্ভূত। অর্থ পবিত্র করা। অভ্যন্তরীণ দোষ থেকে পবিত্র করার অর্থে অধিকতর ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কুফর, শিরক ও কুচরিত্রতা থেকে পবিত্র করা। কোন সময় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পবিত্রতার জন্যও ব্যবহৃত হয়। এখানে এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য।

তৃতীয় উদ্দেশ্য يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ — 'কিতাব' বলে কোরআন পাক এবং 'হিকমত' বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে। তাই অনেক তফসীরকার এখানে হিকমতের তফসীর করেছেন সুন্নাহ্।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, তিলাওয়াতের পরই কিতাব শিক্ষাদানের কথা এবং এরপর পবিত্র করার কথা উল্লেখ করা বাহ্যত সঙ্গত ছিল। কেননা, এই বিষয়-ত্রয়ের স্বাভাবিক ক্রম তাই। প্রথমে তিলাওয়াত অর্থাৎ ভাষা ও অর্থ সত্তার শিক্ষা দেওয়া হয়। এর পরিণতিতে কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের পালা আসে। কোরআন পাকে এই আয়াত কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করে তিলাওয়াত ও শিক্ষাদানের মাঝখানে তাযকিয়া তথা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

রূহল-মা'আনীতে এর জওয়াবে বলা হয়েছে, যদি স্বাভাবিক ক্রম অবলম্বন করা হত, তবে এই বিষয়ত্রয় মিলে এক-একটি স্বতন্ত্র বিষয় হত, যেমন চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রে কয়েক প্রকার ঔষধের সমষ্টিকে একই ঔষধ বলা হয়ে থাকে। এখানেও এই সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এই বিষয়ত্রয়ে আলাদাভাবে স্বতন্ত্র নিয়ামত এবং পৃথক পৃথকভাবে রিসালতের কর্তব্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। ক্রম পরিবর্তন করার ফলে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে।

সূরা বাকারায় এই আয়াতের বিস্তারিত তফসীর অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়সহ বর্ণিত হয়েছে।

اٰخَرِيْنَ — وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

এর শাব্দিক অর্থ অন্য লোক। لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ -এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের অর্থাৎ নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে প্রথম কাতারের মু'মিন অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের সাথে সংযুক্ত মনে করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে পরবর্তী মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ — (রূহল-মা'আনী)

কেউ কেউ اٰخَرِيْنَ শব্দটিকে اُمِّيِّيْنَ -এর উপর عطف করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে নিরক্ষরদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার বিষয়টি বোধগম্য কিন্তু যারা এখনও দুনিয়াতে আগমনই

করেনি, তাদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার মানে কি? বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রেরণ করার অর্থ তাদের জন্য প্রেরণ করা فى শব্দটি আরবী ভাষায় এই অর্থেও আসে।

কেউ কেউ آخرين শব্দের عطف মেনেছেন يعلمهم -এর সর্বনামের উপর। এর অর্থ এই হবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শিক্ষা দেন নিরক্ষরদেরকে এবং তাদেরকে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।—(মাযহারী)

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় সূরা জুমু'আ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনান। তিনি وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ পাঠ করলে আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা কারা? তিনি নিরুত্তর রইলেন। দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার প্রশ্ন করার পর তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট সালমান ফারসী (রা)-র গায়ে হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে।—(মাযহারী)

এই রেওয়ায়েতেও পারস্যবাসীদের কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না বরং এতটুকু বোঝা যায় যে, তারাও آخرين অর্থাৎ অন্য লোকদের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসে অনারবদের যথেষ্ট ফযীলত ব্যক্ত হয়েছে।—(মাযহারী)

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

اسفار শব্দটি سفر -এর বহুবচন। এর অর্থ বড় পুস্তক। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাব ও নবুয়ত এবং তাঁকে প্রেরণ করার তিনটি উদ্দেশ্য যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তওরাতেও তা প্রায় একই ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখামাত্রই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইহুদীদের উচিত ছিল। কিন্তু পার্থিব জাঁকজমক ও ধনৈশ্বর্য তাদেরকে তওরাত থেকে বিমুখ করে রেখেছে। ফলে তারা তওরাতের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তওরাতের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তওরাতের বাহক করা হয়েছিল অর্থাৎ অযাচিতভাবে আল্লাহ্র এই নিয়ামত দান করা হয়েছিল, তারা যথাযথভাবে একে বহন করেনি অর্থাৎ তারা তওরাতের নির্দেশাবলীর পরোয়া করেনি। ফলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহদাকার গ্রন্থ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই গর্দভ সেই বোঝা বহন তো করে কিন্তু তার বিষয়বস্তুর কোন খবর রাখে না এবং তাতে তার কোন উপকারও হয় না। ইহুদীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্য তওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাঁকজমক ও প্রতিপত্তি লাভ করতে চায় কিন্তু এর দিক-নির্দেশ দ্বারা কোন উপকার লাভ করে না।

তফসীরবিদগণ বলেনঃ যে আলিম তার ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে না, তার দৃষ্টান্তও ইহুদীদের দৃষ্টান্তের অনুরূপ।

نه محقق بود نه دانشمند
چار پائے بروکتابے چند

আমলহীন আলিম চিন্তাবিদ ও সুধীজন কোনটাই নয়—সে কয়েকটি কিতাব বহনকারী চতুষ্পদ জন্তু মাত্র।

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

ইহুদীরা তাদের কুফর, শিরক ও চরিত্রহীনতা সত্ত্বেও দাবী করত যে, نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَأَحِبَّاءُهُ অর্থাৎ আমরা তো আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়জন। তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে জান্নাতের যোগ্য অধিকারী মনে করত না বরং তাদের বক্তব্য ছিলঃ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا—অর্থাৎ ইহুদী না হয়ে কেউ জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না। তারা যেন নিজেদেরকে পরকালের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করত এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহকে তাদের ব্যক্তিগত জায়গীর মনে করত। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, পরকালের নিয়ামতসমূহ ইহকালের নিয়ামত অপেক্ষা হাজারো গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সে আরও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরই সে এসব মহান ও চিরন্তন নিয়ামত অবশ্যই লাভ করবে, তার মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলে সে অবশ্যই মনেপ্রাণে মৃত্যু কামনা করবে। তার আন্তরিক বাসনা হবে যে, মৃত্যু শীঘ্র আসুক, যাতে সে দুনিয়ার মলিন ও দুঃখ-বিষাদে পূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অকৃত্রিম সুখ ও শান্তির চিরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে পারে।

তাই আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঃ আপনি ইহুদীদেরকে বলুন, যদি তোমরা দাবী কর যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একমাত্র তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু ও প্রিয়পাত্র এবং পরকালের আযাব সম্পর্কে তোমরা মোটেই কোন আশংকা না কর, তবে জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী এই যে, তোমরা মৃত্যু কামনা কর এবং মৃত্যুর জন্য আগ্রহান্বিত থাক।

এরপর কোরআন নিজেই বলেঃ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ, তারা পরকালের জন্য কুফর, শিরক ও কুকর্ম ব্যতীত আর কিছুই পায়নি। অতএব তারা ভালরূপে জানে যে, পরকালে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিই অবধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র প্রিয়জন হওয়ার যে দাবী করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা লাভ করার জন্য তারা এ ধরনের দাবী করে। তারা আরও জানে যে, যদি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে, তবে তা অবশ্যই কবুল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা মৃত্যু কামনা করতেই পারে না।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যদি এক্ষণে তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হত।—(রূহুল-মা'আনী)

মৃত্যু কামনা জায়েয কি না ঃ সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ এই যে, দুনিয়াতে কারও এরূপ বিশ্বাস করার অধিকার নেই যে, সে মৃত্যুর পর অবশ্যই জান্নাতে যাবে এবং কোন প্রকার শাস্তির আশংকা নেই। এমতাবস্থায় মৃত্যু কামনা করা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করারই নামান্তর।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ — অর্থাৎ ইহুদীরা উপরোক্ত দাবী সত্ত্বেও মৃত্যু কামনা থেকে বিরত থাকত। এর সারমর্ম মৃত্যু থেকে পলায়ন করা বৈ নয়। অতএব আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর, তা অবশ্যই আসবে। আজ নয় তো কিছুদিন পর। সুতরাং মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্পূর্ণত কারও সাধ্যে নেই।

মৃত্যুর কারণাদি থেকে পলায়নের বিধান ঃ যেসব বিষয় স্বভাবত মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে পলায়ন জ্ঞান-বুদ্ধি ও শরীয়তের পরিপন্থী নয়। একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি কাত হয়ে পড়া প্রাচীরের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত চলে যান। কোথাও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে সেখান থেকে পলায়ন না করা বিবেক ও শরীয়ত উভয়ের পরিপন্থী। কিন্তু আয়াতে যে মৃত্যু থেকে পলায়নের নিন্দা করা হয়েছে, এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকে এবং জানে যে, মৃত্যুর সময় এলে তা থেকে পলায়ন নিষ্ফল। যেহেতু তার জানা নেই যে, এই অগ্নি অথবা বিষ অথবা অন্য কোন মারাত্মক বস্তুর মধ্যে নির্দিষ্টভাবে তার মৃত্যু লিখিত আছে কি না, তাই এ থেকে পলায়ন মৃত্যু থেকে পলায়ন নয়, যার নিন্দা করা হয়েছে।

কোন জনপদে প্লেগ অথবা মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করা জায়েয কিনা, এটা একটা স্বতন্ত্র মাস'আলা। ফিকহ্ ও হাদীসগ্রন্থে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। তফসীরে রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের তফসীরেও এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তা উদ্ধৃত করার অবকাশ নেই।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى

ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

(৯) হে মু'মিনগণ ! জুমু'আর দিনে যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (১০) অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুন ঃ আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, জুমু'আর দিনে যখন (জুমু'আর) নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের (অর্থাৎ নামায ও খোতবার) পানে ত্বরা করে চল এবং বেচাকেনা (এমনিভাবে প্রতিবন্ধক কর্মব্যস্ততা) বন্ধ কর। (অধিক গুরুত্বদানের জন্য বিশেষভাবে বেচাকেনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বেচাকেনা বর্জন করাকে উপকার বর্জন করা মনে করা হয়)। এটা (অর্থাৎ বেচাকেনা ও কর্মব্যস্ততা ত্যাগ করে নামাযের দিকে ত্বরা করা) তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (কেননা, এর উপকারিতা চিরস্থায়ী এবং বেচাকেনা ইত্যাদির উপকারিতা ক্ষণস্থায়ী)। অতঃপর (জুমু'আর) নামায সমাপ্ত হয়ে গেলে (ইস-লামের প্রথমদিকে খোতবা পরে পাঠ করা হত। এমতাবস্থায় নামায সমাপ্ত হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ সমাপ্ত হওয়া অর্থাৎ নামায ও খোতবা উভয়ই সমাপ্ত হওয়া, তখন তোমাদের জন্য অনুমতি আছে যে) তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর (অর্থাৎ তখন পার্থিব কাজকর্মের জন্য হাটে-বাজারে ছড়িয়ে পড়ার অনুমতি আছে) এবং (এ সময়েও) আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ কর (অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ ও জরুরী ইবাদত থেকে গাফিল হয়ে পার্থিব কাজকর্মে মশগুল হয়ো না) যাতে তোমরা সফলকাম হও। (কারও কারও অবস্থা এই যে) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে, তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তৎপ্রতি ছুটে যায়। বলুন ঃ আল্লাহ্র কাছে যা (অর্থাৎ

সওয়াব ও নৈকট্য) আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (যদি তা থেকে রিযিক বৃদ্ধির লালসা থাকে, তবে বুঝে নাও যে) আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা। (তাঁর জরুরী ইবাদতে মশগুল থাকলে তিনি নির্ধারিত রিযিক দান করেন। এমতাবস্থায় তাঁর আদেশ কেন বর্জন করা হবে ?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ -

يَوْمِ الْجُمُعَةِ এই দিনটি মুসলমানদের সমাবেশের দিন। তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুমু'আ' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সমস্ত জগতকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয়দিনের শেষ দিন ছিল জুমু'আর দিন। এই দিনেই আদম (আ) সৃজিত হন, এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। কিয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে, যাতে মানুষ যে দোয়াই করে, তাই কবূল হয়। এসব বিষয় সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্য এই দিন রেখেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইহুদীরা 'ইয়াওমুস সাবত' তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং খৃস্টানরা রবিবারকে। আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকেই তওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে। —(ইবনে কাসীর) মূর্খতা যুগে শুক্রবারকে 'ইয়াওমে আরূবা' বলা হত। আরবে কা'ব ইবনে লুঈ সর্বপ্রথম এর নাম 'ইয়াওমুল জুমু'আ' রাখেন। এই দিনে কোরায়েশদের সমাবেশ হত এবং কা'ব ইবনে লুঈ ভাষণ দিতেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পাঁচশ ষাট বছর পূর্বের ঘটনা।

কা'ব ইবনে লুঈ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্বপুরুষদের অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা মূর্খতা যুগেও তাকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং একত্ববাদের তওফীক দান করেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের সুসংবাদও মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কোরায়েশ গোত্র তাঁকে একজন মহান ব্যক্তি হিসাবে সম্মান করত। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) নবুয়ত লাভের পাঁচশ ষাট বছর পূর্বে যেদিন তার মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই কোরায়েশরা তাদের বছর গণনা শুরু করে। শুরুতে কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন থেকে আরবদের বছর গণনা আরম্ভ করা হত। কা'ব ইবনে লুঈ-এর মৃত্যুর পর তার মৃত্যুদিবস থেকেই বছর গণনা প্রচলিত হয়ে যায়। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের বছর যখন হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন এদিন থেকেই তারিখ গণনা আরম্ভ হয়। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে

লুঈ-এর আমলে শুক্রবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমু'আর দিন রেখেছিলেন।—(মাযহারী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে মদীনার আনসারগণ হিজরত ও জুমু'আর নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই স্বকীয় মতামতের মাধ্যমে জুমু'আর দিনে সমাবেশ ও ইবাদতের ব্যবস্থা করত।—(মাযহারী)

نداء صلوة—نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ বলে আযান বোঝানো হয়েছে। سعى শব্দের এক অর্থ দৌড়া এবং অপর অর্থ কোন কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ, নামাযের জন্য দৌড়ে আসতে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: শান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে নামাযের জন্য গমন কর। আয়াতের অর্থ এই যে, জুমু'আর দিনে জুমু'আর আযান দেওয়া হলে আল্লাহ্র যিকিরের দিকে ত্বরা কর। অর্থাৎ নামায ও খোতবার জন্য মসজিদে যেতে যত্নবান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোমরাও তেমনি আযানের পর নামায ও খোতবা ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না।—(ইবনে কাসীর) ذكر الله বলে জুমু'আর নামায এবং এই নামাযের অন্যতম শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)

وَذَرُوا الْبَيْعَ—অর্থাৎ বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এতে বোঝা যায় যে, জুমু'আর আযানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে। এই আদেশ পালন করা বিক্রেতা ও ক্রেতা সবার উপর ফরয। বলা বাহুল্য, দোকানপাট বন্ধ করে দিলেই ক্রয়-বিক্রয় আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্য: জুমু'আর আযানের পর কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমসহ সকল কর্মব্যস্ততা নিষিদ্ধ করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কোরআন পাক কেবল বেচাকেনার কথা উল্লেখ করেছেন। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ছোট ও বড় শহরের অধিবাসীদেরকে জুমু'আর নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট গ্রাম ও অনাবাদ জায়গায় জুমু'আ হবে না। তাই শহরবাসীদের সাধারণ কর্মব্যস্ততা ও বেচাকেনাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফিকহ্বিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে বেচাকেনা বলে এমন প্রত্যেক কাজ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা জুমু'আর নামাযে গমনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অতএব আযানের পর পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, কারও সাথে কথা বলা, অধ্যয়ন করা ইত্যাদি সব নিষিদ্ধ। কেবল জুমু'আর প্রস্তুতি সম্পর্কিত কাজকর্ম করা যেতে পারে।

শুরুতে জুমু'আর আযান একটি ছিল, যা খোতবার পূর্বে ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়া হত। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর আমল পর্যন্ত এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেল এবং মদীনার চতুষ্পার্শ্বে ছড়িয়ে পড়ল তখন সেই আযান দূর পর্যন্ত শুনা যেত না। তখন হযরত ওসমান

(রা) মসজিদের বাইরে নিজ বাসগৃহ যাওরায় আরও একটি আযানের ব্যবস্থা করলেন। এই আযান সমগ্র মদীনা শহরে শুনা যেত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ এই নতুন ব্যবস্থায় আপত্তি করেন নি। ফলে এই প্রথম আযান সাহাবায়ে কিরামের ইজমা দ্বারা সিদ্ধ হয়ে গেল। আযানের পর বেচাকেনা ও অন্যান্য কর্মব্যস্ততা নিষিদ্ধ হওয়ার যে আদেশ খোতবার আযানের পর কার্যকর ছিল, তা এখন থেকে প্রথম আযানের পরই কার্যকর হয়ে গেল। হাদীস, তফসীর ও ফিকহ্‌র কিতাবাদিতে এসব বিষয় কোন প্রকার মতবিরোধ ছাড়াই বর্ণিত আছে।

সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, জুমু'আর দিন যোহরের পরিবর্তে জুমু'আর নামায ফরয। তারা এ ব্যাপারেও একমত যে, জুমু'আর নামায সাধারণত পাঞ্জেগানা নামাযের মত নয়, এর জন্য কিছু অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে। পাঞ্জেগানা নামায একাকী জমা'আত ছাড়াও পড়া যায় এবং দুইজনেও পড়া যায়, কিন্তু জুমু'আর নামায জামা'আত ব্যতীত আদায় হয় না। জামা'আতের সংখ্যায় ফিকহ্‌বিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। এমনিভাবে পাঞ্জেগানা নামায নদী, পাহাড়, জঙ্গল সর্বত্র আদায় হয়, কিন্তু জুমু'আর নামায এসব জায়গায় কারও মতে আদায় হয় না। নারী, রোগী ও মুসাফিরের উপর জুমু'আর নামায ফরয নয়। তারা জুমু'আর পরিবর্তে যোহর পড়বে। কি ধরনের জনপদে জুমু'আ ফরয, এ সম্পর্কে ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। ইমাম শাফেয়ী (র)-র মতে যে জনপদে চল্লিশ জন মুক্ত, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ বাস করে, সেখানে জুমু'আ হতে পারে। এর কম হলে জুমু'আ হবে না। ইমাম মালেক (র)-এর মতে জুমু'আর জন্য এমন জনপদ জরুরী, যার গৃহ সংলগ্ন এবং যাতে বাজারও আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র মতে জুমু'আর জন্য ছোট বড় শহর অথবা বড় গ্রাম হওয়া শর্ত, যাতে অলিগলি ও বাজার আছে এবং পারস্পরিক ব্যাপারাদি মীমাংসা করার জন্য কোন বিচারক আছে।

সারকথা এই যে, উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উম্মতের অধিকাংশ আলিম একমত যে, সর্বাবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের উপর জুমু'আ ফরয নয়; বরং সবার মতে কিছু কিছু শর্ত আছে। শর্তগুলো কি কি, কেবল সে ব্যাপারেই মতবিরোধ আছে। তবে যাদের উপর ফরয, তাদের উপর গুরুত্ব ও তাকীদ সহকারেই ফরয। তাদের মধ্যে কেউ শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতিরেকে জুমু'আ ছেড়ে দিলে তার জন্য সহীহ্ হাদীসসমূহে কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শর্তাদি সহকারে জুমু'আর নামায আদায় করে, তাদের জন্য বিশেষ ফযীলত ও বরকতের ওয়াদা আছে।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ পূর্বের আয়াতসমূহে জুমু'আর আযানের পর বেচাকেনা ইত্যাদি পার্থিব কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আয়াতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, জুমু'আর নামায সমাপ্ত হলে ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং রিযিক হাসিলের চেষ্টা সবাই করতে পারে।

জুমু'আর পরে ব্যবসায়ে বরকত ঃ হযরত এরাক ইবনে মালেক (র) যখন জুমু'আর নামাযান্তে বাইরে আসতেন তখন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيْضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا اَمَرْتَنِىْ فَارْزُقْنِىْ مِنْ فَضْلِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ -

হে আল্লাহ্! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি, তোমার ফরয নামায পড়েছি এবং তোমার আদেশ মত নামাযান্তে বাইরে যাচ্ছি। অতএব তুমি স্বীয় কৃপায় আমাকে রিযিক দান কর। তুমি উত্তম রিযিকদাতা।—(ইবনে কাসীর)

কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমু'আর পরে ব্যবসায়িক কাজ-কারবার করে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সত্তরবার বরকত নাযিল করেন। —(ইবনে কাসীর)

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا نِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

এই আয়াতে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যারা জুমু'আর খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কারবারে মনোযোগ দিয়েছিল। ইবনে কাসীর বলেন : এই ঘটনা তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর নামাযের পর জুমু'আর খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামাযে অদ্যাবধি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এক জুমু'আর দিনে রসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বল্পসংখ্যক সাহাবীসহ মসজিদে থেকে যান। তাদের সংখ্যা বারজন বর্ণিত আছে।—(আবূ দাউদ) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন : যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে মদীনার উপত্যকা আযাবের অগ্নিতে পূর্ণ হয়ে যেত—(ইবনে কাসীর)

তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল দেহ্ইয়া ইবনে খলফ্ কলবীর। সে সিরিয়া থেকে মাল-সম্ভার নিয়ে এসেছিল। তার কাফেলায় সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই দৌড়ে কাফেলার কাছে যেত। দেহ্ইয়া ইবনে খলফ্ তখন পর্যন্ত মুসলমান ছিল না; পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাসান বসরী ও আবূ মালেক (র) বলেন : এই কাফেলার আগমনের সময় মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল।—(মাযহারী) এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম বাণিজ্যিক কাফেলার আওয়ায শুনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। ফরয নামায শেষ হয়ে গিয়েছিল। খোতবা সম্পর্কে তাঁদের জানা ছিল না যে, এটাও ফরয। দ্বিতীয়ত

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং তৃতীয়ত বাণিজ্যিক কাফেলার উপর সবার ঝাঁপিয়ে পড়া—এসব কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, দেরীতে গেলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাবে না।

এসব কারণেই সাহাবায়ে কিরামের পদস্খলন হয় এবং উল্লিখিত হাদীসে তাঁদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে তাঁদেরকে লজ্জা দেওয়া ও হুঁশিয়ার করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) নিয়ম পরিবর্তন করে জুমু'আর নামাযের পূর্বে খোতবা দেওয়া শুরু করেন। বর্তমানে তাই সুন্নত।—(ইবনে কাসীর)

আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কাছে যে সওয়াব আছে, তা এই বাণিজ্য থেকে উত্তম। এটাও অবান্তর নয় যে, যারা নামায ও খোতবার খাতিরে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ বরকত নাযিল হবে, যেমন পূর্বে এমনি এক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

سورة المنافقون

সূরা মুনাফিকূন

মদীনায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ اتَّخَذُوْٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۖ أَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ۗ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝ يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। (৩) এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কাফির হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। (৪) আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ্ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (৫) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা এস, আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৭) তারাই বলে ঃ আল্লাহ্‌র রসূলের সাহচর্যে যারা আছে, তাদের জন্য ব্যয় করো না; পরিণামে তারা আপনা আপনি সরে যাবে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্‌রই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। (৮) তারা বলে ঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন বলে ঃ আমরা (মনেপ্রাণে) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল (সা)। আল্লাহ্ তো জানেন যে, আপনি অবশ্যই তাঁর রসূল। (এ ব্যাপারে তাদের উক্তিকে মিথ্যা বলা যায় না) এবং (এতদসত্ত্বেও) আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা (এ কথায়) অবশ্যই মিথ্যাবাদী (যে, তারা মনেপ্রাণে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কারণ, তাদের এই সাক্ষ্য নিছক মৌখিক—আন্তরিক নয়)। তারা তাদের শপথসমূহকে (জান ও মাল বাঁচানোর জন্য) ঢালরূপে ব্যবহার করে। (কেননা, কুফর প্রকাশ করলে তাদের অবস্থাও অন্যান্য কাফিরের মত হত—তারাও জিহাদের সম্মুখীন হত, নিহত ও লুণ্ঠিত হত)। অতঃপর (এই অনিষ্টের সাথে একটি সংক্রামক অনিষ্টও রয়েছে। তা এই যে) তারা (অপরকেও) আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। এটা (অর্থাৎ তাদের কর্ম খুবই মন্দ বললাম) এজন্য যে, তারা (প্রথমে বাহ্যত) বিশ্বাস করেছে, অতঃপর (তাদের শয়তানদের কাছে যেয়ে إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ —এই কুফরী বাক্য বলে) কাফির হয়ে গেছে। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের কপটতার কারণে

তাদের কর্মকে মন্দ বলা হয়েছে। কারণ, কপটতা জঘন্যতম কুফর)। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা (সত্য বিষয়) বুঝে না। (তারা বাহ্যত এমন চটপটে যে,) আপনি তাদেরকে দেখলে (বাহ্যিক শান-শওকতের কারণে) তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হবে আর (কথায় এমন যে) যদি কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা (প্রাঞ্জল ও মিষ্টি হওয়ার কারণে) শুনেন, (কিন্তু যেহেতু অন্তঃসারশূন্য, তাই বাহ্যিক অঙ্গসৌষ্ঠবের সাথে অভ্যন্তরীণ গুণাবলী থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে তাদের দৃষ্টান্ত এই যে) তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। (এই কাঠ দৈর্ঘ্য প্রস্থে বিশাল বপু, কিন্তু নিষ্প্রাণ। সাধারণ রীতি এই যে, যে কাঠ আপাতত কাজে লাগে না, তা দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এরূপ কাঠ মোটেই উপকারী নয়। এমনিভাবে মুনাফিকরা দেখতে বেশ শানদার, কিন্তু ভেতর থেকে সম্পূর্ণ বেকার। ঈমান ও আন্তরিকতার অভাব হেতু তারা সর্বদা এই আশংকায় থাকে যে, মুসলমানরা কোন সময় আভাসে-ইঙ্গিতে অথবা ওহীর মাধ্যমে তাদের অবস্থা জেনে ফেলবে এবং অন্যান্য কাফিরের ন্যায় তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হবে। এই ধারণায় তারা এতটুকু শংকিত থাকে যে,) প্রত্যেক শোরগোলকে (তা যে কারণেই হোক) তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই মনে করতে থাকে। (প্রকৃতপক্ষে) তারাই (তোমাদের প্রকৃত) শত্রু। অতএব আপনি তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। (অর্থাৎ তাদের কোন কথায় আস্থা স্থাপন করবেন না)। ধ্বংস করুন আল্লাহ্ তাদেরকে। তারা (সত্য ধর্ম থেকে) কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (অর্থাৎ রোজই দূরে সরে যাচ্ছে)। এবং (তাদের অহংকার ও দুষ্টুমির অবস্থা এই যে) যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে] এসো, আল্লাহ্‌র রসূল (সা) তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (তাদের কুফরের যখন এই অবস্থা, তখন) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি আপনার কাছে আসতও এবং আপনি তাদের বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করতেন, তবুও তাদের কোন উপকার হত না। তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা এই যে) আল্লাহ্ তা'আলা এহেন পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। তারাই বলেঃ যারা আল্লাহ্‌র রসূল (সা)-এর সাহচর্যে আছে, তাদের জন্য কিছুই ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। (তাদের এই উক্তি নিরেট মূর্খতা; কেননা) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্ তা'আলারই কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। (তারা শহরবাসীদের দান-খয়রাতকেই রিযিকের একমাত্র পথ মনে করে)। তারা বলেঃ আমরা যদি এখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। (অর্থাৎ আমরা সেই প্রবাসী লোকদেরকে বহিষ্কার করব। এটা তাদের নির্বুদ্ধিতা যে, তারা নিজেদেরকে সবল এবং মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে; বরং) শক্তি তো আল্লাহ্‌র (সরাসরিভাবে) তাঁর রসূল (সা)-এর (আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে) এবং মু'মিনদেরই (আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে)। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না। (তারা ধ্বংসশীল বিষয়সমূহকে শক্তির উৎস মনে করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা ঃ এই ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ ও ওরওয়া (র)-র রেওয়ায়েত অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে 'বনিল-মুস্তালিক' যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়।—(মাযহারী) ঘটনা এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পান যে, 'মুস্তালিক' গোত্রের সরদার হারেস ইবনে যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারেস ইবনে যেরার হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিবিদের অন্তর্ভুক্ত হন। হারেস ইবনে যেরারও পরে মুসলমান হয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে রসূলে করীম (সা) একদল মুজাহিদসহ তাদের মুকাবিলা করার জন্য বের হন। এই জিহাদে গমনকারী মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মুনাফিকও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার হওয়ার লোভে রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাফির হলেও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্র সাহায্যে তিনি এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছুলেন, তখন 'মুরাইসী' নামে খ্যাত একটি কূপের কাছে হারেস ইবনে যেরারের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয় পক্ষ সারিবদ্ধ হয়ে তীর বর্ষণের মাধ্যমে মুকাবিলা হল। মুস্তালিক গোত্রের বহু লোক হতাহত হল এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধনসম্পদ এবং কয়েকজন পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। এভাবে এই জিহাদের সমাপ্তি ঘটল।

দেশ ও বংশগত জাতীয়তার ভিত্তিতে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা কুফর ও মূর্খতা যুগের শ্লোগান ঃ কিন্তু এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছে সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারস্পরিক যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্য মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে অকুস্থলে পৌঁছে গেলেন এবং ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন ঃ

ما بال دعوى الجاهلية — অর্থাৎ এ কি মূর্খতা যুগের আহবান ! দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও প্রতিরক্ষার কারবার হচ্ছে কেন ? তিনি আরও বললেন ঃ دعوها فانها منتنة এই শ্লোগান বন্ধ কর। এটা দুর্গন্ধময় শ্লোগান। তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানদের সাহায্য করা—সে জালিম হোক অথবা মজলুম। মজলুমকে সাহায্য করার অর্থ তো জানাই যে, তাকে জুলুম থেকে রক্ষা করা। জালিমকে সাহায্য করার অর্থ তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করা। এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে জালিম ও কে মজলুম।

৫৭—

এরপর মুহাজির, আনসারী, গোত্র ও বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং জালিমের হাত চেপে ধরা—সে আপন সহোদর ভাই হোক অথবা পিতা হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মূর্খতাসুলভ দুর্গন্ধময় শ্লোগান। এর ফল জঞ্জাল বাড়ানো ছাড়া কিছুই হয় না।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই বক্তৃতা শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহ্জাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার মুকাবিলায় সিনান ইবনে ওবরা আনসারী (রা) আহত হয়েছিলেন। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী জালিম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে আগমন করেছিল, তারা মনে মনে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত কিন্তু পার্থিব স্বার্থের খাতিরে নিজেদেরকে মুসলমান জাহির করত। তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাফিক-দের এক মজলিসে, যাতে মু'মিনদের মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলল : তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথা চড়িয়েছ, নিজেদের ধনসম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে সবলরা দুর্বলদেরকে বহিষ্কার করে দেবে।

সবল বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং দুর্বল বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন : আল্লাহ্র কসম, তুই-ই দুর্বল, লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলমানদের ভালবাসার জোরে সফলকাম।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে বিপদ দেখলে সে তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দেবে। তাই সে স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু যায়েদ ইবনে আরকামের ক্রোধ দেখে তার সম্বিৎ ফিরে এল। পাছে তার কুফর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে হযরত যায়েদের কাছে ওযর পেশ করে বলল : আমি তো এ কথাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না।

যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) মজলিস থেকে উঠে সোজা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা তাঁকে বলে শোনালেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) অল্প বয়স্ক সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন : বৎস! দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেন : না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রসূলুল্লাহ্

(সা) আবার বললেন : তোমার কোনরূপ বিভ্রান্তি হয়নি তো? যায়েদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সরদারের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ। যায়েদ (রা) বললেন : আল্লাহ্র কসম, সমগ্র খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গোচরীভূত করতাম।

অপরদিকে হযরত ওমর (রা) এসে আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে হযরত ওমর (রা) এ কথা বলেছিলেন : আপনি ওব্বাদ ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মস্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর এই কথা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর পুত্র জানতে পারলেন। তাঁর নামও আবদুল্লাহ্ ছিল। তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করবার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মস্তক কেটে আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাযির করব। তিনি আরও আরয করলেন : সমগ্র খাযরাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের মধ্যে কেউ আমা অপেক্ষা অধিক পিতামাতার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোন বিষয় সহ্য করতে পারব না। আমার আশংকা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃ-হন্তাকে চোখের সামনে চলাফেরা করতে দেখে আত্মসম্মানবোধের বশবর্তী হয়ে হত্যা করে দিতে পারি। এটা আমার জন্য আযাবের কারণ হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ের সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কসওয়া' উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কিরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেন : তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছ? সে অনেক কসম খেয়ে বলল : আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এই বালক (যায়েদ ইবনে আরকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সম্ভবত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই একথা বলেনি।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওযর কবূল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরস্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র মুজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রখর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেলাকে এক জায়গায় থামিয়ে দিলেন। পূর্ণ এক দিন এক রাত সফরের ফলে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবায়ে কিরাম মনযিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পেছনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে উদ্ভূত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্য-দিকে সরিয়ে নেওয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় সফর করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবনে সামেত (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে উপদেশচ্ছলে বললেন ঃ তুই এক কাজ কর। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। তিনি তোর জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এতে তোর মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। হযরত ওবাদা (রা) তখনই বললেন ঃ আমার মনে হয়, তোর এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বারবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। অতএব, আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তাঁর শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উষ্ট্রী বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। যায়েদ (রা) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়েদ (রা) বলেন ঃ আমার সওয়ারী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন ঃ

يا غلام صدق الله حديثك ونزلت سورة المنافقين فى ابن ابى من اولها الى اخرها -

অর্থাৎ হে বালক, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকুন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, সূরা মুনাফিকুন সফরের মধ্যেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু বগভী (র)-র রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় পৌঁছে যান এবং

যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) অপমানের ভয়ে গৃহে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরা নাযিল হয়েছে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনার নিকটবর্তী আকীক উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন ইবনে উবাইয়ের মু'মিন পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং খুঁজতে খুঁজতে পিতা ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌঁছে তার উষ্ট্রীকে বসিয়ে দেন। তিনি উষ্ট্রীর হাঁটুতে পা রেখে পিতাকে বললেনঃ আল্লাহ্র কসম, তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত 'সবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে'—এ কথার ব্যাখ্যা না কর। এই বাক্যে 'সবল' কে?—রসূলুল্লাহ্ (সা), না তুমি? পুত্র পিতার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল এবং যারা এ পথ অতিক্রম করছিল তারা পুত্র আবদুল্লাহ্কে তিরস্কার করছিল যে, পিতার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করছ কেন? অবশেষে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উষ্ট্রী তাদের কাছে আসল, তখন তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বললঃ আবদুল্লাহ্ এই বলে তার পিতার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) দেখলেন যে, মুনাফিক ইবনে উবাই বেগতিক হয়ে পুত্রের কাছে বলে যাচ্ছেঃ আমি তো ছেলেপিলে ও নারীদের চাইতেও অধিক লাঞ্ছিত। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) পুত্রকে বললেনঃ তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদীনায় যেতে দাও।

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের পটভূমি এতটুকুই। এই কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধের জন্য আসলে উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা হারেস ইবনে যেরার দায়ী ছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-কে ইসলাম গ্রহণ এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পত্নী হওয়ার গৌরব দান করেন। তাঁর পিতা হারেসও পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ ঘটনা মসনদে আহমদ, আবূ দাউদ ইত্যাদি কিতাবে এভাবে বর্ণিত আছে যে, মুস্তালিক গোত্র পরাজিত হলে তাদের কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীও মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী সব কয়েদী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। কয়েদীদের মধ্যে হারেস ইবনে যেরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। তিনি সাবেত ইবনে কায়েস (রা)-এর ভাগে পড়েন। সাবেত (রা) জুয়ায়রিয়াকে কিতাবতের প্রথায় মুক্ত করে দিতে চাইলেন। এর অর্থ এই যে, দাস অথবা দাসী মেহনত-মজুরি করে অথবা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে মালিককে দিলে সে মুক্ত হয়ে যেত।

জুয়ায়রিয়ার যিম্মায় মোটা অংকের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা পরিশোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেনঃ আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ্ এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রসূল। অতঃপর নিজের ঘটনা শুনালেন যে, সাবেত ইবনে কায়েস (রা) আমার সাথে কিতাবতের চুক্তি করেছে। কিন্তু কিতাবতের অর্থ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে মুক্ত করে

বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জুয়ায়রিয়ার জন্য এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারত! তিনি সানন্দে প্রস্তাব মেনে নিলেন। এ ভাবে তিনি পুণ্যময়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উম্মুল-মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) বর্ণনা করেন ঃ "রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধে গমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, ইয়াসরিবের (মদীনার) দিক থেকে চাঁদ রওয়ানা হয়ে আমার কোলে এসে লুটিয়ে পড়েছে। তখন আমি এই স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু এখন তার ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।"

তিনি ছিলেন গোত্রপতির কন্যা। তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুণ্যময়ী বিবিদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন, তখন এর শুভ প্রতিক্রিয়া তাঁর গোত্রের উপরও প্রতিফলিত হয়। তাঁর সাথে বন্দিনী অন্য নারীরাও এই শুভ বিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেননা, এই বিবাহের কথা জানাজানি হওয়ার পর যে যে মুসলমানের কাছে তাঁর আত্মীয় কোন বন্দিনী ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ বন্দিনী তাঁর সাথে মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তাঁর পিতাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি মো'জেযা দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এই ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ ঃ উপরোক্ত ঘটনা সূরা মুনাফিকুনের তফসীর বোঝার পক্ষে যেমন সহায়ক, তেমনি এতে প্রসঙ্গত নৈতিক চরিত্র, রাজনীতি ও সামাজিকতা সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ এবং সমস্যার সমাধানও নিহিত রয়েছে। তাই এখানে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সঙ্গত মনে করা হচ্ছে। দিকনির্দেশগুলো এই ঃ

ইসলামে বর্ণ, বংশ, ভাষা এবং দেশী ও বিদেশীর পার্থক্য মূল্যহীন ঃ বনিল মুস্তালিক যুদ্ধে সংঘটিত একজন আনসার ও একজন মুহাজিরের ঝগড়া এবং উভয় পক্ষ থেকে আনসার ও মুহাজির সম্প্রদায়কে আহ্বান করার সমগ্র ব্যাপারটি ছিল বিলীয়মান জাহিলিয়াত যুগের একটি প্রভাব বিশেষ। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অপপ্রভাবের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন এবং যে কোন স্থানের অধিবাসী, যে কোন বর্ণ, ভাষা, বংশ ও সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরকে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় ভ্রাতৃবন্ধনের অনুভূতিতে উদ্বেলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে নিয়মিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে তাদেরকে অভিন্ন ইসলামী সমাজে গ্রথিত করেছিলেন। কিন্তু শয়তান তার চিরাচরিত জালে মানুষকে আবদ্ধ করে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের সময় সম্প্রদায়, দেশ, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদিকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ভিত্তিরূপে প্রকট করে তোলে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী মাপকাঠি ন্যায় ও সুবিচার মানুষের চিন্তাধারা থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু গোষ্ঠী ও জাতীয়তার ভিত্তিতে একে অপরকে সাহায্য করার নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে শয়তান মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত করে। উপরোক্ত ঝগড়ার ঘটনায়ও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) যথাসময়ে অকুস্থলে পৌঁছে এই অনর্থের অবসান ঘটান এবং বলেন যে, এটা মূর্খতা ও কুফরের দুর্গন্ধযুক্ত অনুভূতি। এ থেকে বিরত হও। অতঃপর তিনি সবাইকে কোরআনী সহযোগিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এই নীতি হচ্ছে ঃ

—تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য কাউকে সাহায্য করা ও কারও কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার মাপ-কাঠি এই যে, যে ব্যক্তি ন্যায় ও সুবিচারে অবিচল, তাকে সাহায্য কর, যদিও সে বংশ, পরিবার, ভাষা ও দেশগতভাবে তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে, তাকে কখনও সাহায্য করো না, যদিও সে তোমার পিতা ও ভ্রাতা হয়। এই যৌক্তিক ও ন্যায়ভিত্তিক মাপকাঠিই ইসলাম কায়েম করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতি পদক্ষেপে এ নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন ও সবাইকে এর অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি বিদায় হজ্জের সর্বশেষ ভাষণে ঘোষণা করেন ঃ মূর্খতা যুগের সকল কুপ্রথা আমার পদতলে পিষ্ট হয়েছে। এখন আরব, অনারব, কৃষ্ণকায়, শ্বেতকায় এবং দেশী ও বিদেশীর প্রতিমা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী ভিত্তি একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ। সবাইকে এর অনুগামী হতে হবে।

এই ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাও দিয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরা আজ থেকে নয়---আদিকাল থেকেই মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য গোষ্ঠীগত ও দেশগত জাতীয়তার অস্ত্র ব্যবহার করেছে। তারা যখন ও যে মুহূর্তে সুযোগ পায়, এই অস্ত্র ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

পরিতাপের বিষয়, দীর্ঘকাল থেকে মুসলমানরা আবার এই শিক্ষা ভুলে গেছে এবং বিজাতীয় শত্রুরা মুসলমানদের ইসলামী ঐক্য খণ্ড-বিখণ্ড করার কাজে আবার সে শয়তানী চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছে। ধর্ম ও ধর্মীয় মূলনীতির প্রতি উদাসীনতার কারণে আজকের যুগের মুসলমানরা এই জালে আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে গেছে এবং কুফর ও ধর্মদ্রোহিতার মুকাবিলায় তাদের একক শক্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেবল আরব ও অনারবই নয়, মিসরীয়, সিরীয়, হেজাযী, ইয়ামনীও আজ পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ নয়। এ উপমহাদেশেও পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধী, হিন্দী, পাঠান এবং বেলুচরাও পারস্পরিক কলহের শিকার হয়ে গেছে। ইসলামের শত্রুরা আমাদের মধ্যকার তুচ্ছ বৈষয়িক কলহ-বিবাদ নিয়ে খেলায় মেতেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে এবং আমরা সর্বত্রই পরাজিত ও দাসসুলভ চিন্তাধারার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে তাদের কাছেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাহ্ করুন, আজও যদি মুসলমানরা কোরআনের মূলনীতি ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দিকনির্দেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, বিজাতির ভরসায় জীবন ধারণ করার পরিবর্তে স্বয়ং ইসলামী সমাজকে সুসংহত করে এবং বর্ণ, বংশ, ভাষা ও স্ব স্ব ভৌগোলিক সীমারেখার প্রতিমাকে আবার একবার ভেঙ্গে মিসমার করে দেয়, তবে আজও তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সমর্থন খোলা চোখেই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে।

ইসলামী মূলনীতিতে সাহাবায়ে কিরামের অপূর্ব দৃঢ়তা ঃ উপরোক্ত ঘটনা এ কথাও ব্যক্ত করেছে যে, যদিও শয়তান সাময়িকভাবে কিছু লোককে মূর্খতা যুগের শ্লোগানে লিপ্ত করে দিয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। সামান্য হুঁশিয়ারি পেয়ে সবাই ভ্রান্ত ধারণা থেকে তওবা করে নেয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ও রসূলের মহব্বত

এবং সম্ভ্রম এমনই বদ্ধমূল ছিল, যাতে আত্মীয়তা ও জাতীয়তা সম্পর্কে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। এর প্রমাণ এই ঘটনায় প্রথমে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর বিবৃতি থেকে ফুটে উঠেছে। তিনি নিজেও ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক এবং ইবনে উবাই ছিল গোত্রের সরদার। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-ও তার সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু যখন মাননীয় সরদারের মুখে মু'মিন, মুহাজির ও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কথাবার্তা উচ্চারিত হল, তখন তিনি সহ্য করতে পারলেন না। সেই মজলিসেই সরদারকে দাঁতভাঙা জওয়াব দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অভিযোগ করলেন। আজ-কালকার গোষ্ঠী প্রীতি হলে তিনি কখনও আপন গোত্র সরদারের এই কথা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছাতেন না।

এই ঘটনায় স্বয়ং ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা)-র আচরণ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছে যে, তার মহব্বত ও সম্ভ্রম কেবল আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি যখন পিতার মুখে বিরুদ্ধাচরণের কথাবার্তা শুনলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হাযির হয়ে নিজ হাতে পিতার মস্তক কেটে আনার প্রস্তাব রাখলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করে দিলে মদীনার সন্নিকটে পৌঁছে পিতার সওয়ারী বসিয়ে দিলেন এবং মদীনায় প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে পিতাকে এ কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করলেন যে, সম্মানের অধিকারী একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সে নিজে হেয় ও লাঞ্ছিত। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুমতি লাভের পূর্বে পিতার পথ খুলে দিলেন না। এই দৃশ্য দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখে উচ্চারিত হয় :

تو نخل خوش ثمر کیستی کہ سرو و سمن
ہمہ ز خویش برید ند و با تو پیو ستند

এ ছাড়া বদর, ওহুদ ও আহযাবের যুদ্ধগুলো তো তরবারির মাধ্যমে এই সম্প্রদায় প্রীতি ও স্বদেশ প্রীতির প্রতিমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে দিয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোন সম্প্রদায়, দেশ, বর্ণ ও ভাষার মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই। যারা আল্লাহ্ ও রসূলকে মানে না, তারা সত্যিকার ভাই ও পিতা হলেও দুশমন।

ہزار خویش کہ بیگا نہ از خدا باشد
خدائے یک تن بیگا نہ کا شنا باشد

মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদেরকে ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করার গুরুত্ব : এই ঘটনা আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, যে কাজ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বৈধ, কিন্তু তা বাস্তবায়নে মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশংকা থাকে অথবা শত্রুরা ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করে, সেই কাজ না করাই কর্তব্য। উদাহরণত রসূলুল্লাহ্ (সা) মুনাফিক সরদার ইবনে উবাইয়ের কপটতা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠার পরও হযরত ওমর (রা)-এর এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নি যে, তাকে হত্যা করা হোক।

কেননা, এতে আশংকা ছিল যে, শত্রুরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করবে এবং বলবে : রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকেও হত্যা করেন।

কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, যে সব কাজ শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য নয়, সে সব কাজ মোস্তাহাব হলেও ভুল বোঝাবুঝির আশংকার কারণে বর্জন করা যায়। কিন্তু শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যকে এ ধরনের আশংকার কারণে ত্যাগ করা যায় না; বরং এরূপ ক্ষেত্রে আশংকা অবসানের চেষ্টা করতে হবে এবং কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে। এখন সূরার বিশেষ বিশেষ বাক্যের ব্যাখ্যা দেখুন :

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ—মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সূরা মুনাফিকূন নাযিল হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কসম সবই মিথ্যা। এই মুনাফিক সরদারের হিতাকাঙ্ক্ষায় কেউ কেউ তাকে বলল : তুই জানিস কোরআনে তোর সম্পর্কে কি নাযিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হাযির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রসূলুল্লাহ্ (সা) তোর জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বলল : তোমরা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছিলে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্থ-সম্পদের যাকাত দিতে বলেছিলে, আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকী রইল? আমি কি মুহাম্মদ (সা)-কে সিজদা করব? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যখন তার অন্তরে ঈমানই নেই, তখন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা উপকারী হতে পারে না।

এই ঘটনার পর ইবনে উবাই মদীনায় পৌঁছে বেশীদিন জীবিত থাকেনি—শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।—(মাযহারী)

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا—জাহ্জাহ্ মুহাজির ও সিনান আনসারীর ঝগড়ার সময় ইবনে উবাই-ই একথা বলেছিল। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এর এই জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্র হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির পরিচায়ক। তাই কোরআন পাক এ স্থলে لَا يَفْقَهُوْنَ বলে ব্যক্ত করেছে যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওকুফ ও নির্বোধ।

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ—

৫৮—

এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। এই উক্তির ভাষা অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ছিল না যে, সে নিজেকে এবং মদীনার আনসারগণকে শক্তিশালী ও ইযযতদার এবং এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরামকে দুর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে মদীনার আনসারগণকে উত্তেজিত করেছিল, যাতে তারা এই দুর্বল ও 'হেয়' লোকদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছেন যে, যদি ইযযত ওয়ালারা 'হেয়' লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কেননা, ইযযত তো আল্লাহ্র, তাঁর রসূলের এবং মু'মিনদের প্রাপ্য। কিন্তু মূর্খতার কারণে তোমরা এ সম্পর্কে বেখবর। এখানে কোরআন لَا يَعْلَمُوْنَ এবং এর আগে لَا يَفْقَهُوْنَ শব্দ ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, কোন মানুষ নিজেকে অন্যের রিযিকদাতা মনে করলে এটা নিরেট জ্ঞান বুদ্ধির পরিপন্থী এবং নির্বুদ্ধিতার আলামত। পক্ষান্তরে ইযযত ও অপমান দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে লাভ করে। তাই এতে বিভ্রান্তি হলে সেটা বেখবর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে لَا يَعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

(৯) হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (১০) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (অর্থাৎ দুনিয়ার সবকিছু) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ (ও আনুগত্য অর্থাৎ গোটা দীন) থেকে গাফেল না করে (অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে এমন মগ্ন হয়ো না যাতে দীনের ক্ষতি হয়)। যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (কারণ দুনিয়ার উপকার তো ধ্বংস হয়ে যাবে; পরকালের ক্ষতি দীর্ঘ অথবা চিরস্থায়ী থেকে যাবে। لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ এর ব্যাপক বিষয়বস্তু থেকে একটি বিশেষ আর্থিক ইবাদত অর্থাৎ সদকার আদেশ করা হচ্ছেঃ) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (জরুরী প্রাপ্য) মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে (পরিতাপ করে) বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (তার এই বাসনা ও পরিতাপ মোটেই উপকারী হবে না। কারণ) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন (খতম হয়ে) আসে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত (কাজেই যেমন করবে, তেমনি ফল পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ—এই সূরার প্রথম রুকূতে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এ সব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পেছনে ব্যয় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর পশ্চাতেও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় রুকূতে খাঁটি মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দুটি সর্ববৃহৎ—ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয়---ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহ্‌র স্মরণের' অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে পাঞ্জেগানা নামায, কারও মতে হজ্ব ও যাকাত এবং কারও মতে কোরআন। হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত। এই অর্থ সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত।---(কুরতুবী)

সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ তথা ইবাদত থেকে মানুষকে গাফেল করে না, এতটুকু পর্যন্ত সাংসারিক বিষয়াদিতে ব্যাপৃত থাকার অনুমতি আছে। সাংসারিক বিষয়াদিতে

এতটুকু ডুবে যাওয়া উচিত নয় যে, ফরয ও ওয়াজিব কর্মে বিঘ্ন দেখা দেয় অথবা হারাম ও মকরূহ কাজে লিপ্ত হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। যারা সাংসারিক কাজে এরূপ মগ্ন হয়ে পড়ে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ অর্থাৎ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, তারা পরকালের মহান ও চিরন্তন নিয়ামতসমূহের পরিবর্তে দুনিয়ার নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত অবলম্বন করে। এর চাইতে বড় ক্ষতি আর কি হবে!

وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ — এই আয়াতে মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকা অবস্থায় তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে পরকালের পুঁজি করে নাও। নতুবা মৃত্যুর পর এই ধনসম্পদ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহ্‌র স্মরণের' অর্থ যাবতীয় ইবাদত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধনসম্পদ ব্যয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার দুটি কারণ হতে পারে। এক. আল্লাহ্ ও তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকারী সর্ববৃহৎ বস্তু হচ্ছে-ধনসম্পদ। তাই যাকাত, ওশর, হজ্জ ইত্যাদি আর্থিক ইবাদত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। দুই. মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামাযগুলো পড়ে নেবে, কাযা হজ্জ আদায় করবে অথবা কাযা রোযা রাখবে। কিন্তু ধনসম্পদ সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েই যায় যে, এখন এই ধন তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনও তাড়াতাড়ি ধনসম্পদ ব্যয় করে আর্থিক ইবাদতের ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া দান-খয়রাত যাবতীয় আপদ-বিপদ দূর করার ব্যাপারেও কার্যকর।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল : কোন্ সদকায় সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন : যে সদকা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে —অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়। তিনি আরও বললেন : আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না, যখন আত্মা তোমার কণ্ঠনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বল : এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় কর।

فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ — হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতের তফসীরে বলেন : যে ব্যক্তির যিম্মায় যাকাত ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ্জ ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে : আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই

অর্থাৎ মৃত্যু আরও কিছু বিলম্বে আসুক যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরয কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাই। أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ—অর্থাৎ কিছু অবকাশ পেলে এমন সৎ কর্ম করে নেব, যদ্দ্বারা সৎ কর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরয বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মকরূহ্ কাজ করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নিরর্থক।

سورة التغابن

সূরা তাগাবুন

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৮ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۡ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ① هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ
مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ② خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③ يَعْلَمُ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ④ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ
ز فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑤ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ
تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا وَ
تَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ⑥ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ
وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑦ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۚ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑧ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ
التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ
وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ
اَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑨ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৩) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন। (৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (৫) তোমাদের পূর্বে যারা কাফির ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তি। (৬) এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী-সহ আগমন করলে তারা বলত ঃ মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কাফির হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না। আল্লাহ্ পরওয়াহীন, প্রশংসার্হ। (৭) কাফিররা দাবী করে যে, কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (৮) অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৯) সেদিন অর্থাৎ সমাবেশের দিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এ দিন হার জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। (১০) আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্ত-কাল থাকবে। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল এটা!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর সর্ব-শক্তিমান। (এটা পরবর্তী বর্ণনার ভূমিকা অর্থাৎ যিনি এমন পূর্ণতাগুণে গুণান্বিত, তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব এবং অবাধ্যতা গোনাহ্)। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন (এ কারণে সবারই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল)। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের (ঈমান ও কুফরের) কাজকর্ম দেখেন। (সুতরাং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)। তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবে (অর্থাৎ প্রজ্ঞাপূর্ণ ও উপকারিতা পূর্ণরূপে) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। (কেননা

মানবাকৃতির সমান কোন জীবের আকৃতিতে সৌষ্ঠব নেই)। তাঁর কাছে (সবার) প্রত্যাবর্তন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি সব জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জাত। (এসব বিষয়ের দাবী এই যে, তোমরা তাঁর আনুগত্য কর। এছাড়াও) তোমাদের পূর্বে যারা কাফির ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? (এসব বৃত্তান্তও তোমাদের আনুগত্যকে ওয়াজিব করে)। অতঃপর তারা তাদের কর্মের শাস্তি (দুনিয়াতেও) আস্বাদন করেছে এবং (এ ছাড়া পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব। এটা (অর্থাৎ ইহকাল ও পর-কালের শাস্তি) এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ প্রকাশ্যে নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করলে তারা (রসূলগণের সম্পর্কে) বলাবলি করত—মানুষই কি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে (অর্থাৎ মানুষ কি কখনও পয়গম্বর ও পথপ্রদর্শক হতে পারে)? মোটকথা, তারা কাফির হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের পরোয়া করলেন না (বরং পর্যুদস্ত করে দিলেন)। আল্লাহ্ (সবকিছু থেকে) পরোয়াহীন (এবং) প্রশংসার্হ। (কারও অবাধ্যতায় তাঁর কোন ক্ষতি হয় না এবং আনুগত্যে উপকার হয় না। স্বয়ং অনুগত ও অবাধ্যেরই লাভ লোকসান হয়)। কাফিররা (لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ বাক্যে পরকালীন আযাবের কথা শুনে) দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না (যার পর عذاب أليم হওয়ার কথা) আপনি বলে দিন, অবশ্যই হবে; আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে (এবং তদনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে)। এটা (অর্থাৎ পুনরুত্থান ও প্রতিদান) আল্লাহ্র পক্ষে (সর্বশক্তিমান হওয়ার কারণে) সম্পূর্ণ সহজ। অতএব (ঈমানের এসব কারণ উপস্থিত আছে বলে) তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং আমার অবতীর্ণ নূরের অর্থাৎ কোর-আনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (স্মরণ কর) যেদিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সমাবেশ দিবসে একত্র করবেন। এদিনই লাভ লোক-সান জাহির হওয়ার দিন। (অর্থাৎ মুসলমানদের লাভ এবং কাফিরদের লোকসান এই দিনে কার্যত জাহির হবে। এর বর্ণনা এই যে,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে (জান্নাতের) উদ্যানে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। এটা মহাসাফল্য। আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহা-ন্নামের অধিবাসী। তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। এটা খুব মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থান।

আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয়

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন হয়ে গেছে। এখানে فَمِنْكُمْ এর ف অব্যয়টি এই অর্থ জাপন করে যে, প্রথমে সৃষ্টি করার সময় কোন কাফির

ছিল না। এই কাফির ও মু'মিনের বিভেদ পরে সেই ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীনে হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে দান করেছেন। এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার কারণেই মানুষের উপর গোনাহ্ ও সওয়াব আরোপিত হয়। এক হাদীসেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه —অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান নির্মল স্বভাব-ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে (যার ফলে তার মু'মিন হওয়া স্বাভাবিক ছিল)। কিন্তু এরপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খৃস্টান ইত্যাদিতে পরিণত করে।—(কুরতুবী)

দ্বিজাতি তত্ত্ব : কোরআন পাক এ স্থলে মানব জাতিকে দুই দলে বিভক্ত করেছে—কাফির ও মু'মিন। এতে বোঝা যায় যে, আদম সন্তানরা সবই এক গোষ্ঠীভুক্ত এবং বিশ্বের সমস্ত মানুষ এই গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গ। এই গোষ্ঠীকে ছিন্নকারী এবং আলাদা দল সৃষ্টিকারী বিষয় হচ্ছে একমাত্র কুফর। যে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়, সে মানবগোষ্ঠীর এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে। এভাবে সমগ্র বিশ্বে মানুষের দলাদলি একমাত্র ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে হতে পারে। বর্ণ, ভাষা, বংশ, পরিবার ও দেশ ইত্যাদির মধ্য থেকে কোনটিই মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে পারে না। এক পিতার সন্তানরা যদি বিভিন্ন শহরে বসবাস করে অথবা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে অথবা তাদের বর্ণ বিভিন্ন রূপ হয়, তবে তারা আলাদা আলাদা দল হয়ে যায় না। এসব বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা সবাই পরস্পরে ভাই ভাই গণ্য হয়। কোন বুদ্ধিমান মানুষ তাদেরকে বিভিন্ন আখ্যা দিতে পারে না।

মূর্খতা যুগে বংশ ও গোত্রের বিভেদকে জাতীয়তা ও দলাদলির ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছিল। এমনিভাবে দেশ ও মাতৃভূমির ভিত্তিতে কিছু দলাদলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে রসূলুল্লাহ্ (সা) এসব প্রতিমাকে ভেঙে দেন। তাঁর মতে মুসলমান যে কোন দেশ, যে কোন ভূখণ্ড, যে কোন বর্ণ ও পরিবারের হোক, তারা এক গোষ্ঠীভুক্ত। কোরআন বলে : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ মু'মিনগণ সবাই পরস্পরে ভাই ভাই। এমনিভাবে কাফির যে কোন দেশ অথবা সম্প্রদায়ের হোক, তারা সবাই এক মিল্লাত ও এক জাতি।

কোরআন পাকের উপরোক্ত আয়াতও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এতে সমগ্র আদম সন্তানকে মু'মিন ও কাফির—এই দুই দলে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্ণ ও ভাষার বিভেদকে কোরআন আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং মানুষের জীবিকা সম্পর্কিত অনেক উপকার অর্জনের ভিত্তি হওয়ার কারণে একটি মহান অবদান আখ্যা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একে মানব জাতির মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির উপায় হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়নি।

ঈমান ও কুফরের কারণে দুই জাতির বিভেদ একটি ইচ্ছাধীন বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল। কেননা ঈমান ও কুফর উভয়টিই মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কেউ এক জাতীয়তা

يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(১১) আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (১২) তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছিয়ে দেওয়া। (১৩) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। অতএব মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুক। (১৪) হে মু'মিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৫) তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা-স্বরূপ। আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (১৬) অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্‌কে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১৭) যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল। (১৮) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কুফর যেমন পরকালীন সাফল্যের পথে পুরাপুরি বাধা, তেমনি ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ইত্যাদিতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে ত্রুটি করাও এক পর্যায়ে পরকালীন সাফল্যের পথে বাধা। তাই বিপদাপদে এরূপ মনে করা উচিত যে ;) কোন বিপদ আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতিরেকে আসে না। (এরূপ মনে করে সবর ও সন্তুষ্টি অবলম্বন করা উচিত)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে, তিনি তার অন্তরকে (সবর ও সন্তুষ্টির) পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (কে সবর ও সন্তুষ্টি অবলম্বন করল, কে করল না, তিনি সব জানেন এবং প্রত্যেককে তদনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেন। সার কথা এই যে, বিপদাপদসহ প্রত্যেক ব্যাপারে) আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূল (সা)-এর আনুগত্য কর। যদি তোমরা (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (মনে রেখ,) আমার রসূল (সা)-এর দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছিয়ে দেওয়া। (এই দায়িত্ব তিনি সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তাই তাঁর কোন ক্ষতি হবে না—ক্ষতি তোমাদেরই হবে। আল্লাহ্‌র ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই, তাই এখানে তা বর্ণনা করা হয়নি। তোমাদের এবং বিশেষভাবে বিপদগ্রস্তদের এরূপ মনে করা উচিত যে,) তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের (ধর্মের)

দুশমন (যদি তারা নিজেদের ইহলৌকিক উপকারের জন্য এমন বিষয়ের আদেশ করে, যাতে তোমাদের পারলৌকিক অনিষ্ট আছে।) অতএব তোমরা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক (এবং তাদের উক্তরূপ আদেশ পালনে বিরত থাক।) যদি (তোমরা এরূপ ফরমায়েশের কারণে রাগ করে তাদের প্রতি কঠোরতা কর এবং তারা ক্ষমা চেয়ে তওবা করে নেয়, তবে এরপর যদি) তোমরা (তাদের তখনকার ত্রুটি) মার্জনা কর (অর্থাৎ শাস্তি না দাও), উপেক্ষা কর (অর্থাৎ বেশী তিরস্কার না কর) এবং ক্ষমা কর (অর্থাৎ তা মনে ও মুখে ভুলে যাও) তবে আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের গোনাহের জন্য) ক্ষমাশীল, (তোমাদের অবস্থার প্রতি) করুণাময়। (এতে ক্ষমা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। শাস্তি দিলে নির্ভীক হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকলে ক্ষমা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন কোন সময় ক্ষমা করা মোস্তাহাব। অতঃপর ধনসম্পদ সম্পর্কে সন্তান-সন্ততির ন্যায় বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। (উদ্দেশ্য এটা দেখা যে, কে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্কে ভুলে যায় এবং কে স্মরণ রাখে। যে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ রাখে, তার জন্য) আল্লাহ্র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। অতএব (এসব কথা শুনে) তোমরা যথা-সাধ্য আল্লাহ্কে ভয় কর, (তার আদেশ-নিষেধ) শুন, আনুগত্য কর এবং (বিশেষভাবে যেখানে ব্যয় করতে বলা হয়েছে, সেখানে) ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। (সম্ভবত এটা সুকঠিন বলে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।) যারা মনের লালসা থেকে মুক্ত, তারাই (পরকালে) সফলকাম। (অতঃপর এই সফলতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে,) যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম (আন্তরিকতাপূর্ণ) ঋণ দান কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী (সৎকর্ম গ্রহণ করেন এবং) সহনশীল (গোনাহ্ করলে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না)। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (شكور থেকে حكيم পর্যন্ত বিষয়বস্তু সূরার বিষয়বস্তুর কারণ স্বরূপ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কারও উপর কোন বিপদ আসে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোথাও সামান্যতম বস্তুও নড়াচড়া করতে পারে না। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোন ক্ষতি এবং উপকার করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তকদীরে বিশ্বাসী নয়, বিপদ মুহূর্তে তার জন্য কোন স্থিরতা ও শান্তির উপকরণ থাকে না। সে বিপদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে হাহুতাশ ও ছটফট করতে থাকে। এর বিপরীতে তকদীরে বিশ্বাসী মু'মিনের অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাসী করে দেন যে, যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছাক্রমে হয়েছে। যে বিপদ তাকে স্পর্শ করেছে, তা অবধারিত ছিল, কেউ একে টলাতে পারত না এবং যে বিপদ থেকে সে মুক্ত রয়েছে, তা থেকে মুক্ত থাকাই অবধারিত ছিল। তাকে এই বিপদে জড়িত থাকার

শব্দটি صيغة مجهول এ ব্যবহৃত হয় এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান জ্ঞাপন করার জন্য باب سمع থেকে ব্যবহৃত হয়। تغابن শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্য বলা হয় অর্থাৎ একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে। কিন্তু আয়াতে একতরফা লোকসান প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। এই শব্দের এই ব্যবহারও খ্যাত ও সুবিদিত। কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার কারণ এই যে, সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য পরকালে দুইটি গৃহ নির্মাণ করেছেন—একটি জাহান্নামে অপরটি জান্নাতে। জান্নাতীদেরকে জান্নাতে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে, যা ঈমান ও সৎকর্মের অবর্তমানে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, যাতে সেই গৃহ দেখার পর জান্নাতের গৃহের যথার্থ কদর তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলার অধিক কৃতজ্ঞ হয়। এমনিভাবে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে যা ঈমান ও সৎকর্ম বর্তমান থাকলে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল যাতে তাদের পরিতাপ আরও বাড়ে। জাহান্নামে জান্নাতীদের যেসব গৃহ ছিল, সেগুলোও জাহান্নামীদের ভাগে পড়বে। পক্ষান্তরে কাফির, পাপাচারী ও হতভাগাদের যেসব গৃহ জান্নাতে ছিল, সেগুলোও জান্নাতীদের অধিকারে চলে যাবে। তখন জাহান্নামীরা তাদের লাভ-লোকসান সত্যি সত্যি অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, তারা কি ছাড়ল এবং কি পেল। এসব রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে।

মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা জান, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন: যার কাছে ধন-সম্পদ নেই, আমরা তাকে নিঃস্ব মনে করি। তিনি বললেন: আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিঃস্ব, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির পুঁজি নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল, কাউকে প্রহার কিংবা হত্যা করেছিল এবং কারও ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, হাশরের মাঠে তারা সবাই উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ দাবী পেশ করবে। কেউ তার নামায নিয়ে যাবে, কেউ রোযা, কেউ যাকাত এবং কেউ অন্যান্য সৎকর্ম নিয়ে যাবে। যখন তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন তার হাতে উৎপীড়িত লোকদের গোনাহ্ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রাপ্য চুকানো হবে। এর পরিণতিতে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

বুখারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সা) বলেন: যে ব্যক্তির কাছে কারও কোন পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুবা কিয়ামতের দিন দিরহাম ও দীনার থ কবে না। কারও কোন দাবী থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ্ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।—(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরোক্ত কারণই বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফির,

পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না ; বরং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হায়! আমরা যদি আরও বেশী সৎকর্ম করতাম, তবে জান্নাতের সুউচ্চ মর্তবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্য পরিতাপ করবে, যা অযথা ব্যয় করেছে। হাদীসে আছে ঃ من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه كان عليه حسرة يوم القيامة —যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং সমগ্র মজলিসে আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করে, কিয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে।

কুরতুবীতে আছে প্রত্যেক মু'মিনও সেদিন সৎকর্ম ত্রুটির কারণে স্বীয় লোকসান অনুভব করবে। সূরা মরিয়মে কিয়ামতের নাম يوم الحسرة ঃ পরিতাপ দিবস বলে বর্ণিত হয়েছে। তারই অনুরূপ এখানে লোকসান দিবস নাম রাখা হয়েছে।

সূরা মরিয়মে বলা হয়েছে ঃ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ—

রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের তফসীরে বলা হয়েছে, সেদিন জালিম ও দুষ্কর্মীরা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পরিতাপ করবে এবং কর্মকে অধিকতর সুন্দর করতে সচেষ্ট হয়নি—এমন সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও পরিতাপ করবে। এভাবে কিয়ামতের দিন সবাই নিজ নিজ ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হবে এবং কম আমল করার কারণে লোকসান অনুভব করবে। তাই একে লোকসান দিবস বলা হয়েছে।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن

ত্যাগ করে অন্য জাতীয়তা অবলম্বন করতে চাইলে অতি সহজেই তা করতে পারে অর্থাৎ নিজের বিশ্বাস ও মতবাদ পরিবর্তন করে অন্য দলে শামিল হতে পারে। এর বিপরীতে বংশ, পরিবার, বর্ণ, ভাষা ও দেশ কোন মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। কেউ নিজের বংশ ও বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে না। ভাষা ও দেশ যদিও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু যেসব জাতি ভাষা ও দেশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তারা স্বভাবত অন্য ভাষাভাষী ও অন্য দেশের অধিবাসীকে নিজেদের মধ্যে সাদরে গ্রহণ করতে সম্মত হয় না, যদিও সে তাদের ভাষা বলতে শুরু করে এবং তাদের দেশে বসবাস অবলম্বন করে।

এই ইসলামী গোষ্ঠী ও ঈমানী ভ্রাতৃত্বই অল্পদিনের মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের এবং কৃষ্ণকায়, শ্বেতকায়, আরব ও আজমে অসংখ্য ব্যক্তিকে এক সূতায় গ্রথিত করে দিয়েছিল। এই শক্তির মুকাবিলা বিশ্বের জাতিসমূহ করতে পারেনি। তাই তারা সেই প্রতিমাগুলোকে পুনরায় জীবিত করার প্রয়াস পেল, যেগুলোকে রসূলুল্লাহ্ (সা) খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের মহান ঐক্য শক্তিকে দেশ, ভাষা, বর্ণ, বংশ ও পরিবারের বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে তাদেরকে পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত করে দিল। এভাবে শত্রুদের হীন মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ এরই অশুভ পরিণতি চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে মুসলমান একদা এক জাতি ও এক প্রাণ ছিল, তারা এখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। অপরপক্ষে শয়তানী শক্তিগুলো পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও মুসলমানদের মুকাবিলায় এক জাতিই প্রতীয়মান হয়।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ—তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুশ্রী করেছেন। আকৃতি তৈরী করা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্রষ্টার বিশেষ গুণ। এজন্যই আল্লাহ্র নামসমূহের মধ্যে مصور অর্থাৎ আকৃতিদাতা বর্ণিত আছে। চিন্তা করুন, সৃষ্ট জগতে কত বিভিন্ন জাতি রয়েছে, প্রত্যেক জাতিতে কত বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে লাখো বিভিন্ন ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজনের আকৃতি অপরজনের আকৃতির সাথে খাপ খায় না। একই মানব শ্রেণীর মধ্যে দেশ ও ভূখণ্ডের বিভিন্নতার কারণে এবং বংশ ও জাতির বিভিন্নতার কারণে আকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তদুপরি তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখাবয়ব অন্য সবার থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিস্ময়কর কারিগরি ও ভাস্কর্য দেখে জ্ঞানবুদ্ধি দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষের চেহারা ছয়-সাত বর্গইঞ্চির অধিক নয়। কোটি কোটি মানুষের একই ধরনের চেহারা সত্ত্বেও একজনের আকার অন্যজনের সাথে পুরোপুরি মিলে না যে, চেনা কঠিন হয়। আলোচ্য আয়াতে আকার নির্মাণের নিয়ামত উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অর্থাৎ তিনি মানবাকৃতিকে সমগ্র সৃষ্ট জগত ও সৃষ্ট জীবের আকৃতি অপেক্ষা অধিক সুন্দর

ও সুষম করেছেন। কোন মানুষ তার দলের মধ্যে যতই কুৎসিত ও কদাকার হোক না কেন, অবশিষ্ট সকল জীবজন্তুর আকৃতির তুলনায় সে-ও সুশ্রী।

فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا—بَشَر -শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থ দেয়। তাই يَهْدُوْنَ বহুবচন ক্রিয়াপদ তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মানবত্বকে নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী মনে করাও কাফিরদের একটি অলীক ধারণা ছিল। কোরআনে স্থানে স্থানে এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ এমন দেখা যায়, যারা নবী করীম (সা)-এর মানবত্ব অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে ? মানব হওয়া নবুয়তেরও পরিপন্থী নয় এবং রিসালতের উচ্চমর্যাদারও প্রতিকূলে নয়। রসূল (সা) নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূরও এবং মানবও। তাঁর নূরকে প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্রের নূরের নিরিখে বিচার করা ভুল।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا—(বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি, যা আমি নাযিল করেছি)। এখানে নূর বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কারণ, নূরের স্বরূপ এই যে, সে নিজেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কোরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণাদি, বিধি-বিধান, শরীয়ত এবং পরজগতের সঠিক তথ্যাবলী উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো জানা মানুষের জন্য জরুরী।

কিয়ামতকে লোকসানের দিন বলার কারণ ঃ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ —যেদিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্র করবেন একত্র করার দিবসে। এই দিনটি হবে লোকসানের। يَوْمُ الْجَمْعِ একত্রিত হওয়ার দিবস ও يَوْمُ التَّغَابُنِ লোকসানের দিবস—এই উভয়টি কিয়ামতের নাম। একত্রিত হওয়ার দিন এ কারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্য একত্র করা হবে। পক্ষান্তরে تَغَابُن শব্দটি غَبْن থেকে ব্যুৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে غَبْن বলা হয়। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কোরআনে বলেন ঃ আর্থিক লোকসান জ্ঞাপন করার জন্য এই

সাধ্য কারও ছিল না। এই ঈমান ও বিশ্বাসের ফলে পরকালের সওয়াবের ওয়াদাও তার সামনে থাকে, যদ্দ্বারা দুনিয়ার বৃহত্তম বিপদও সহজ হয়ে যায়।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

—অর্থাৎ মুসলমানগণ, তোমাদের কতক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা কর। তিরমিযী, হাকেম প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত সেই মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হিজরত করে চলে যেতে মনস্থ করে, কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়।
— (রূহুল-মা'আনী)

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কা থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয ছিল। আলোচ্য আয়াতে এরূপ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে মানুষের শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, তার চাইতে বড় শত্রু মানুষের কেউ হতে পারে না, যে তাকে চিরকালীন আযাব ও জাহান্নামের অগ্নিতে লিপ্ত করে দেয়।

হযরত আতা ইবনে আবূ রাবাহ (রা) বর্ণনা করেন, এই আয়াত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মদীনায় ছিলেন এবং যখনই কোন যুদ্ধ ও জিহাদের সুযোগ আসত, তিনি তাতে যোগদান করার ইচ্ছা করতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা এই বলে ফরিয়াদ শুরু করে দিত : আমাদেরকে কার কাছে ছেড়ে যাবে। তিনি তাদের ফরিয়াদে প্রভাবান্বিত হয়ে সংকল্প ত্যাগ করতেন।—(ইবনে কাসীর)

উপরোক্ত উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। উভয় ঘটনা আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। কেননা, হিজরত হোক কিংবা জিহাদ, যে স্ত্রী ও সন্তান আল্লাহ্র ফরয পালনে বাধ সাধে, তারা শত্রু।

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ—পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার ইচ্ছা করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের এই অংশে বলা হয়েছে : যদিও এই স্ত্রী ও সন্তানরা তোমাদের জন্য শত্রুর ন্যায় কাজ করেছে এবং তোমাদেরকে ফরয পালনে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করো না, বরং মার্জনা, উপেক্ষা ও ক্ষমার ব্যবহার কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার অভ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা।

গোনাহ্গার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও বিদ্বেষ রাখা অনুচিত : আলিমগণ আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, পরিবার-পরিজনের কেউ কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্য বদদোয়া করা উচিত নয়।—(রূহুল-মা'আনী)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ—فتنة শব্দের অর্থ পরীক্ষা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের পরীক্ষা নেন যে, এ সবের মহব্বতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহ্র বিধানাবলীকে উপেক্ষা করে না, মহব্বতকে যথাসীমায় রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।

ধনসম্পদ সন্তান-সন্ততি মানুষের জন্য বিরাট পরীক্ষা : সত্য বলতে কি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত মানুষের জন্য একটি অগ্নিপরীক্ষা। মানুষ অধিকাংশ সময় তাদের মহব্বতের কারণেই গোনাহে—বিশেষত অবৈধ--উপার্জনে লিপ্ত হয়। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যাকে দেখে অন্যেরা বলবে : اكل عياله حسناته অর্থাৎ তার পুণ্যগুলোকে তার পরিজনেরা খেয়ে ফেলেছে। —(রূহুল-মা'আনী) এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) সন্তানদের সম্পর্কে বলেন : مبخلة مجبنة অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি হচ্ছে মানুষের কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ। তাদের মহব্বতের কারণে মানুষ আল্লাহ্র পথে টাকা-পয়সা ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে এবং তাদেরই মহব্বতের কারণে জিহাদে যোগদান করা থেকে গা বাঁচিয়ে চলে।* জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন : العيال سوس الطاعات অর্থাৎ পরিবার-পরিজন মানুষের পুণ্য-সমূহের জন্য ঘুণ বিশেষ। ঘুণ যেমন শস্যকে খেয়ে ফেলে, তেমনি পরিবার-পরিজনও মানুষের পুণ্যসমূহকে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ—অর্থাৎ যথাসাধ্য তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন কর। এর আগে কোরআন পাকে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল : اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্কে এমন ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর প্রাপ্য। এই আয়াত সাহাবায়ে করামের কাছে খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হয়। কারণ, আল্লাহ্র প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় করার সাধ্য কার আছে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে কোন কিছু করার আদেশ করেন না। কাজেই তাকওয়া ও সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব বুঝতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাকওয়া অর্জনে কেউ তার পূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করলেই আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে।—(রূহুল-মা'আনী—সংক্ষেপিত)

বাহ্যিক হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ। এরপর তাকীদের জন্য বলা হচ্ছে ঃ) এটা (অর্থাৎ যা বর্ণিত হল) আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে ব্যক্তি (এসব ব্যাপারে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও) আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করেন (যা সর্ববৃহৎ বিপদমুক্তি) এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন (যা সর্ববৃহৎ উপকার লাভ। অতঃপর আবার তালাকপ্রাপ্তাদের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ অর্থাৎ ইদ্দতে স্ত্রীদের আরও অধিকার আছে। তা এই যে) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। (অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তাকে ইদ্দতে বাসগৃহ দেওয়াও ওয়াজিব তবে বাইন তালাকে উভয়ের এক গৃহে নির্জনবাস জায়েয নয়, বরং উভয়ের মধ্যে অন্তরাল থাকা জরুরী)। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে (বাসগৃহের ব্যাপারে) সংকটাপন্ন করো না (উদাহরণত এমন কিছু করো না, যাতে সে উত্যক্ত হয়ে বের হয়ে যায়)। যদি তালাকপ্রাপ্তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের (পানাহারের) ব্যয়ভার বহন করবে। (গর্ভবতী নয় —এমন স্ত্রীদের বিধান এরূপ নয়। তাদের ভরণ-পোষণের মেয়াদ তিন হায়েয অথবা তিন মাস। এসব বিধান ইদ্দত সম্পর্কে বর্ণিত হল। ইদ্দতের পর) যদি তারা (পূর্ব থেকে সন্তানওয়ালী হোক কিংবা সন্তান প্রসবের পর ইদ্দত শেষ হোক) তোমাদের সন্তানদেরকে (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) স্তন্যদান করে তবে তাদেরকে (নির্ধারিত) পারিশ্রমিক দেবে এবং (পারিশ্রমিক সম্পর্কে) পরস্পরে সংযতভাবে পরামর্শ করবে। (অর্থাৎ স্ত্রী বেশী দাবী করবে না যে, স্বামী অন্য ধাত্রী খোঁজ করতে বাধ্য হয় এবং স্বামীও এত কম পারিশ্রমিক দিতে চাইবে না, যাতে স্ত্রীর কাজ না চলে। বরং উভয়ই যথাসম্ভব চেষ্টা করবে, যাতে মাতাই সন্তানকে স্তন্যদান করে। এটা সন্তানের জন্য বেশী উপকারী) তোমরা যদি পরস্পরে জিদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে। (অর্থাৎ তখন অন্য নারী খুঁজে নাও—মাতাকে বাধ্য করো না এবং পিতাকেও না। এই খবরসূচক বাক্যে পুরুষকে অল্প পারিশ্রমিক দিতে চাওয়ার কারণে শাসানো হয়েছে যে, কোন-না-কোন নারী তো স্তন্যদান করবে এবং সে-ও সম্ভবত কম পারিশ্রমিক নেবে না। এমতাবস্থায় মাতাকেই কম দিতে চাও কেন? স্ত্রীকেও বেশী পারিশ্রমিক চাওয়ার কারণে শাসানো হয়েছে যে, তুমি স্তন্যদান না করলে অন্য কেউ স্তন্যদান করবে। দুনিয়াতে তুমিই তো একা নও যে, এত বেশী পারিশ্রমিক দাবী কর। অতঃপর সন্তানের ভরণ-পোষণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী (সন্তানের জন্য) ব্যয় করবে। যার আমদানী কম সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। (অর্থাৎ গরীব ব্যক্তি গরীবানা মতে ব্যয় করবে। কেননা) আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। (গরীব ব্যক্তি যেন ভয় না করে যে, ব্যয় করলে কিছুই থাকবে না, যেমন কেউ কেউ এই ভয়ে সন্তানকে হত্যা করে দেয়। তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা কষ্টের পর সুখ দেবেন (যদিও তা প্রয়োজন মাফিকই হয়)। এর অনুরূপ অন্য আয়াতে আছে ঃ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিবাহ ও তালাকের শরীয়তসম্মত মর্যাদা ও প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থা : সূরা বাকারার তফসীরে এই শিরোনামেই এ বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া উচিত। সংক্ষেপে তা এই যে, বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারটি প্রত্যেক ধর্মে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ লেনদেন নয় যে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যেভাবে ইচ্ছা করে নেবে বরং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী লোকই স্মরণাতীতকাল থেকে এ বিষয়ে একমত যে, এসব ব্যাপার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে বিশেষ পবিত্র এবং ধর্মের নির্দেশানুযায়ীই এসব কাজ সম্পন্ন হওয়া উচিত। কিতাবধারী ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায় তো একটি ঐশী ধর্ম ও ঐশী কিতাবের সাথে সম্পর্কযুক্তই। তাতে শত শত পরিবর্তন সত্ত্বেও তারা আজও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় বিধি-বিধানের অনুসরণ করে। কাফির ও মুশরিক সম্প্রদায় কোন ঐশী কিতাব ও ঐশী ধর্মের অধিকারী নয় কিন্তু কোন-না-কোন প্রকারে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করে। যেমন হিন্দু, আর্য, শিখ, অগ্নিপূজারী, নক্ষত্রপূজারী সম্প্রদায়। তারাও বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারাদিকে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ লেনদেন মনে করে না। তারাও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান পালনকে অপরিহার্য জ্ঞান করে। ধর্মের এসব নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ীই সকল ধর্মাবলম্বী পারিবারিক আইন চালু থাকে।

কেবল নাস্তিক ও আল্লাহ্ অস্বীকারকারী এক সম্প্রদায় আছে যারা আল্লাহ্ ও ধর্মের সাথেই সম্পর্কচ্ছেদ করে রয়েছে। তারা এসব ব্যাপারকেও ইজারার অনুরূপ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নিষ্পন্ন করে থাকে। বলা বাহুল্য, এর লক্ষ্য তাদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিতাপের বিষয়, আজকাল বিশ্বে এই মতবাদই ব্যাপক প্রসার লাভ করছে, যা মানুষকে জংলী-জানোয়ারদের কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী শরীয়ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পবিত্র জীবনব্যবস্থার নাম। এতে বিবাহকে কেবল একটি লেনদেন ও চুক্তি নয় বরং এক প্রকার ইবাদতের মর্যাদা দান করা হয়েছে। এই ইবাদতের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার পক্ষ থেকে মানবচরিত্রে গচ্ছিত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উত্তম ও পবিত্র উপকরণও রয়েছে এবং নারী ও পুরুষের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত বংশবৃদ্ধি ও সন্তান পালনের সুষম ও প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাও বিদ্যমান আছে।

বৈবাহিক ব্যাপারাদির সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার উপর সাধারণ মানবগোষ্ঠীর সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া নির্ভরশীল। তাই কোরআন পাক বৈবাহিক ও পারিবারিক বিষয়াদিকে অন্যসব বিষয় অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। কোরআন পাঠে গভীর মনোনিবেশকারী ব্যক্তি এটা প্রত্যক্ষ করবে যে, বিশ্বের অর্থনৈতিক বিষয়াদির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার-ইজারা ইত্যাদি। কোরআন পাক এসব বিষয়ের কেবল নীতিই ব্যক্ত করেছে। এগুলোর শাখাগত ব্যাপারাদির বর্ণনা কোরআন পাকে খুবই বিরল। কিন্তু কোরআন পাক বিবাহ ও তালাকের শুধু মূলনীতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং এসবের অধিকাংশ শাখাগত মাস'আলা ও খুঁটিনাটি ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে নাযিল করেছেন।

এসব মাস'আলা কোরআনের অধিকাংশ সূরায় বিচ্ছিন্নভাবে এবং সূরা নিসায় অধিক

সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের বায়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পরে সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পরে জিদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে। (৭) বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ কষ্টের পর সুখ দেবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে পয়গম্বর (সা)। (আপনি লোকদেরকে বলে দিন ঃ) তোমরা যখন (এমন) স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, (যাদের সাথে নির্জনবাস হয়েছে। কেননা, এমন স্ত্রীদের সাথেই ইদ্দতের বিধান সম্পৃক্ত ; যেমন অন্য এক আয়াতে আছে ঃ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ) তখন তাদেরকে ইদ্দতকালের (অর্থাৎ হায়েযের) পূর্বে (অর্থাৎ পবিত্র থাকা অবস্থায়) তালাক দাও। (সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই অবস্থায় তালাকের পূর্বে সহবাসও না হওয়া চাই)। এবং (তালাক দেওয়ার পর তোমরা) ইদ্দতের হিসাব রাখ। (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী সবাই হিসাব রাখবে। তবে নারীরা সাধারণত ভুলে যায় বিধায় বিশেষভাবে পুরুষদেরকে হিসাব রাখতে বলা হয়েছে)। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (অর্থাৎ এসব অধ্যায়ে তাঁর যেসব বিধান রয়েছে, সেগুলো লংঘন করো না ; উদাহরণত এক দফায় তিন তালাক দিয়ো না, হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়ো না এবং ইদ্দতকালে স্ত্রীদেরকে) তাদের (বসবাসের) গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। (কারণ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরও বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় বসবাসের অধিকার রয়েছে)। এবং তারাও যেন নিজেরা বের না হয় (কারণ, বসবাসের অধিকার কেবল স্বামী প্রদত্ত হক নয় যে, সে ইচ্ছা করলে তা রহিত হয়ে যাবে ; বরং এটা শরীয়ত প্রদত্ত হক)। যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। (লিপ্ত হলে তা ভিন্ন কথা। উদাহরণত তারা ব্যভিচার অথবা চৌর্য কর্মে লিপ্ত হলে শাস্তিস্বরূপ বহিষ্কার করা হবে। কোন কোন আলিম বলেন ঃ কটুভাষিণী হলে এবং সার্বক্ষণিক কলহে লিপ্ত হলেও তাদেরকে বহিষ্কার করা জায়েয)। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে, (উদাহরণত স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করে দেয়) সে নিজেরই ক্ষতি করে অর্থাৎ গোনাহ্‌গার হয়। অতঃপর তালাকদাতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, বিভিন্ন তালাকের মধ্যে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেওয়াই উত্তম। ইরশাদ হয়েছে ঃ হে তালাকদাতা) তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় (তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি) করে দেবেন (যেমন তালাকের জন্য অনুতপ্ত হবে। তখন প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হলে ক্ষতিপূরণ সহজ হবে)। অতঃপর তারা (অর্থাৎ প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তা

স্ত্রীরা) যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে (এবং ইদ্দত শেষ না হয়), তখন (তোমাদের দু'রকম ক্ষমতা আছে, হয়) তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় (প্রত্যাহার করত) বিবাহে রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে (অর্থাৎ ইদ্দতের শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করবে না। উদ্দেশ্য এই যে, তৃতীয় পথ অবলম্বন করবে না যে, রাখাও উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ইদ্দত দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে স্ত্রীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে প্রত্যাহার করে নেবে)। এবং (যাই কর, রাখ অথবা ছাড়, তার জন্য) তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। [এটা মোস্তাহাব (হিদায়া, নিহায়া) প্রত্যাহারের বেলায় এজন্য সাক্ষী রাখতে হবে, যাতে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রী ভিন্নমত ব্যক্ত না করে এবং ছেড়ে দেওয়ার বেলায় এজন্য, যাতে নিজের মনই দুষ্টুমিতে প্রবৃত্ত না হয় এবং প্রত্যাহার করেছিল বলে মিথ্যা দাবী না করে বসে। হে সাক্ষিগণ, যদি সাক্ষ্য দানের প্রয়োজন হয়, তবে] তোমরা ঠিক ঠিক আল্লাহ্‌র উদ্দেশে (কোনরূপ খাতির না করে) সাক্ষ্য দেবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। (উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বাসী ব্যক্তিই উপদেশ দ্বারা লাভবান হয়। নতুন উপদেশ সবার জন্য ব্যাপক। এখন উপরে নির্দেশিত তাকওয়ার কয়েকটি ফযীলত বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথম এই যে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জন্য (ক্ষয়ক্ষতি থেকে) নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং (অনেক উপকার দান করেন। তন্মধ্যে একটি বড় উপকার হচ্ছে রিযিক। অতএব) তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক পৌঁছান, যা তার ধারণাও থাকে না। (তাকওয়ার অপর শাখা হচ্ছে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। এর বৈশিষ্ট্য এই যে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার (কার্যোদ্ধারের) জন্য তিনিই যথেষ্ট। (অর্থাৎ তিনি নিজে যথেষ্ট হওয়ার প্রতিক্রিয়া কার্যোদ্ধারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। নতুবা তিনি সারা বিশ্বের জন্য যথেষ্ট। এই কার্যোদ্ধারও ব্যাপক—অনুভূত হোক কিংবা অননুভূত হোক। কেননা) আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় কাজ (যেভাবে চান) পূর্ণ করে ছাড়েন। (এমনিভাবে কার্যোদ্ধারের সময়ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেননা) আল্লাহ্‌ তা'আলা সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ (স্বীয় জ্ঞানে) স্থির করে রেখেছেন। (তদনুযায়ী তা বাস্তবায়িত করাই প্রজ্ঞাভিত্তিক হয়ে থাকে। অতঃপর আবার বিধানাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ উপরে ইদ্দত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছিল। এখন বিস্তারিত বিবরণ এই যে) তোমাদের (তালাকপ্রাপ্তা) স্ত্রীদের মধ্যে যারা (বেশী বয়স হওয়ার কারণে) ঋতুবতী হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের (ইদ্দত কি হবে, সে) ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হলে (যেমন বাস্তবে সন্দেহ হয়েছিল এবং প্রশ্ন উঠেছিল) তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও হায়েযের বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ (তিন মাস) ইদ্দত হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত (সন্তান পূর্ণাঙ্গ প্রসব হোক কিংবা অপূর্ণাঙ্গ। যদি কোন অঙ্গ এমনকি, একটি অঙ্গুলিও গঠিত হয়ে থাকে। তাকওয়া নিজেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া উল্লিখিত পার্থিব ব্যাপারাদি সম্পর্কিত বিধানাবলী সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারে যে, পার্থিব ব্যাপারের সাথে ধর্মের কি সম্পর্ক? যেভাবে ইচ্ছা করে নিলেই চলবে। তাই অতঃপর আবার তাকওয়ার বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে:) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তার প্রত্যেক কাজ সহজ করে দেন। (সেটা ইহকালের কাজ হোক কিংবা পরকালের

سورة الطلاق

সূরা তালাক

মদীনায় অবতীর্ণ, ১২ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝١ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝٢ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝٣ وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝٤ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ

يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ۝ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ

سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ

اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ

فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ

فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ۝ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ

رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ

سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। (২) অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। (৩) এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ স্বীয় কাজ পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (৪) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন। (৫) এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন। (৬) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে

বিস্তারিত বিবরণসহ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য 'সূরা তালাকে' বিশেষভাবে তালাক, ইদ্দত ইত্যাদির বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে একে 'সূরা নিসা সুগরা' অর্থাৎ 'ছোট সূরা নিসা' বলা হয়েছে।—(কুরতুবী)

ইসলামী মূলনীতির গতিধারা এই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে ইসলামী নীতি অনুযায়ী স্থাপিত বৈবাহিক সম্পর্ক অটল ও আজীবন স্থায়ী সম্পর্ক হতে হবে, যাতে উভয়ের ইহকাল ও পরকাল সংশোধিত হয় এবং তাদের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তান-সন্ততির কর্মধারা এবং চরিত্রও সংশোধিত হয়। এ কারণেই বিবাহের ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে ইসলামের দিকনির্দেশ এই যে, এই সম্পর্ককে সকল প্রকার তিক্ততা ও মন কষাকষি থেকে পবিত্র রাখতে হবে। যদি কোন সময় তিক্ততা হয়ে যায়, তবে তা নিরসনের জন্য পুরো-পুরি চেষ্টা ইসলামে করা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার মধ্যেই উভয় পক্ষের জীবনের সাফল্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেসব ধর্মে তালা-কের বিধান নেই, সেগুলোতে এরূপ পরিস্থিতিতে নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হতে হয় এবং মাঝে মাঝে চরম কুফল সামনে আসে। তাই ইসলাম বিবাহ আইনের সাথে সাথে তালাকের বিধি-বিধানও নির্ধারিত করেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলেছে যে, তালাক আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খুবই ঘৃণার্হ অপছন্দনীয় কাজ। যথাসম্ভব এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক ঘৃণার্হ বিষয় হচ্ছে তালাক। হযরত আলী (রা)-র বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন:

تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه عرش الرحمن—অর্থাৎ বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না। কেননা, তালাকের কারণে আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠে। হযরত আবূ মূসা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: কোন ব্যভিচার ব্যতিরেকে স্ত্রীদেরকে তালাক দিও না। কারণ, যেসব পুরুষ ও নারী কেবল স্বাদ আস্বাদন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন না।—(কুরতুবী) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সা) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে দাসদেরকে মুক্ত করা আল্লাহ্র কাছে প্রিয় এবং পৃথিবীতে সৃষ্ট বিষয়াদির মধ্যে তালাক সর্বাপেক্ষা ঘৃণার্হ ও অপছন্দনীয়।—(কুরতুবী)

সারকথা, ইসলাম যদিও তালাক দিতে উৎসাহিত করেনি বরং যথাসাধ্য বারণ করেছে কিন্তু কোন কোন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কতিপয় বিধি-বিধানের অধীনে অনুমতি দিয়েছে। এসব বিধি-বিধানের সারমর্ম এই যে, বৈবাহিক সম্পর্ক খতম করাই অপরিহার্য হলে তা সুন্দরভাবে ও যথোপযুক্ত পন্থায় নিষ্পন্ন হতে হবে—একে নিছক মনের ঝাল মিটানো ও প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার খেলায় পরিণত করা যাবে না। আলোচ্য সূরায় তালাকের বিধান শুরু করে প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'হে নবী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র)-র বর্ণনা অনুযায়ী যেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধান সকল উম্মতের জন্য ব্যাপক হয়ে থাকে, সেসব ক্ষেত্রেই এই সম্বোধন ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে কোন বিধান বিশেষভাবে রসূলের সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, সেখানে 'হে রসূল' বলে সম্বোধন করা হয়।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ—বাক্যের দাবী ছিল এই যে, এরপরেও একবচনের বিধান বর্ণনা করা হত। কিন্তু এখানে বহুবচন ব্যবহার করে إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ বলা হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু বহুবচনে সম্বোধন করার মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে এবং এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্য নয়—সমগ্র উম্মতের জন্য।

কেউ কেউ এ স্থলে বাক্য উহ্য সাব্যস্ত করে এরূপ তফসীর করেছেন যে, হে নবী! আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন যে, তারা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়, তখন যেন পরে বর্ণিত আইন পালন করে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর তালাকের কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিধান—فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ—عدت-এর শাব্দিক অর্থ গণনা করা। শরীয়তের পরিভাষায় সেই সময়কালকে ইদ্দত বলা হয়, যাতে স্ত্রী এক স্বামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাধীন থাকে। কোন স্বামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার উপায় দু'টি। এক. স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে। এই ইদ্দতকে 'ইদ্দতে-ওফাত' বলা হয়। গর্ভবতী নয়—এমন মহিলাদের জন্য এই ইদ্দত চার মাস দশ দিন। দুই. বিবাহ থেকে বের হওয়ার দ্বিতীয় উপায় তালাক। গর্ভবতী নয়—এমন মহিলাদের জন্য তালাকের ইদ্দত ইমাম আবূ হানীফা (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ণ তিন হায়েয। ইমাম শাফেয়ী (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে তালাকের ইদ্দত তিন তোহ্র (পবিত্রতাকাল)। সারকথা, এর জন্য কোন দিন ও মাস নির্ধারিত নেই; বরং যত মাসে তিন হায়েয অথবা তিন তোহর পূর্ণ হয়, তাই তালাকের ইদ্দত। যেসব নারীর বয়সের স্বল্পতা হেতু এখনও হায়েয হয় না অথবা বেশী বয়স হওয়ার কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিধান পরে আলাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতও পরে বর্ণিত হচ্ছে। এতে ওফাতের ইদ্দত ও তালাকের ইদ্দত একই রূপ।

সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতকে فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ পাঠ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ও এক রেওয়ায়েতে فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ বর্ণিত আছে। —(রূহুল-মা'আনী)

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা) একথা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোচরীভূত করলে তিনি খুব নারাষ হয়ে বললেন:

ليرا جعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فا ن بد الا فليطلقها طا هرا قبل ا ن يمسها فتلك العد ة التى ا مرها الله تعا لى ا ن يطلق بها النسا ء ـ

তার উচিত হায়েয অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং স্ত্রীকে বিবাহে রেখে দেওয়া। এই হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হায়েয হবে এবং তা থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। এই ইদ্দতের আদেশই আল্লাহ্ তা'আলা (আলোচ্য) আয়াতে দিয়েছেন।

এই হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়—এক. হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। দুই. কেউ এমতাবস্থায় তালাক দিলে সেই তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া ওয়াজিব [যদি প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হয়। ইবনে ওমর (রা)-এর ঘটনায় তদ্রূপই ছিল]। তিন. যে তোহ্রে তালাক দেবে, সেই তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস না হওয়াই চাই। চার. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতের তফসীর তাই।

উপরোক্ত কেরাতদ্বয় এবং হাদীসদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে ইদ্দত শুরু হওয়ার পূর্বে তালাক দিতে হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র মতে হায়েয থেকে ইদ্দত শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে তোহরে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, সেই তোহরে সহবাস করবে না এবং তোহরের শেষ ভাগে হায়েয আসার পূর্বে তালাক দেবে। ইমাম শাফেয়ী (র) প্রমুখের মতে ইদ্দত তোহ্র থেকে শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোহ্রের শুরুতেই তালাক দেবে। ইদ্দত তিন হায়েয হবে, না তিন তোহর হবে—এই আলোচনা সূরা বাকারার ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ বাক্যে করা হয়েছে।

সারকথা, এই আয়াত থেকে তালাক সম্পর্কে প্রথম সর্বসম্মত বিধান এই জানা গেল যে, হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম এবং যে তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে, সেই তোহরে তালাক দেওয়াও হারাম। উভয় ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার কারণ হল স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়া যা তার জন্য কষ্টকর। কেননা, যে হায়েযে তালাক দেবে, সেই হায়েয তো ইদ্দতে গণ্য হবে না বরং হায়েযের দিনগুলো অতিবাহিত হবে। এরপর হানাফী মযহাব অনুযায়ী পরবর্তী তোহ্রও অযথা অতিবাহিত হয়ে দ্বিতীয় হায়েয থেকে ইদ্দতের গণনা শুরু হবে। এভাবে দীর্ঘদিন পর ইদ্দত শেষ হবে। শাফেয়ী মযহাব অনুযায়ীও ইদ্দতের পূর্বে অতিবাহিত হায়েযের অবশিষ্ট দিনগুলো কমপক্ষে বেশী হবে। তালাকের এই প্রথম বিধানই দিকনির্দেশ

করে যে, তালাক কোন রাগ মিটানোর অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয় নয় বরং এটা অপারক অবস্থায় উভয় পক্ষের সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা। তাই তালাক দেওয়ার সময়েই এদিক খেয়াল রাখা জরুরী যে, স্ত্রীকে যেন দীর্ঘদিন ইদ্দত অতিবাহিত করার অহেতুক কষ্ট ভোগ করতে না হয়। এই বিধান কেবল সেই স্ত্রীদের জন্য, যাদের পক্ষে হায়েয অথবা তোহর দ্বারা ইদ্দত অতিবাহিত করা জরুরী। পক্ষান্তরে যে স্ত্রীর সাথে এখনও স্বামীর নির্জনবাসই হয়নি, তার যেহেতু কোন ইদ্দতই নেই, তাই তাকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েয। এমনিভাবে যেসব স্ত্রীর স্বল্প বয়স অথবা বেশী বয়স হেতু হায়েয আসে না, তাদেরকে যে কোন অবস্থায় এমনকি সহবাসের পরে তালাক দেওয়া জায়েয। কেননা তাদের ইদ্দত মাসের হিসাবে তিন মাস হবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে একথা বর্ণিত হবে।—(মাযহারী)

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ । احصاء শব্দের অর্থ গণনা করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, ইদ্দতের দিনগুলো সযত্নে স্মরণ রেখো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই শেষ মনে করে নেওয়ার মত ভুল করো না। ইদ্দতের দিনগুলো স্মরণে রাখার এই দায়িত্ব পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের। কিন্তু আয়াতে পুরুষবাচক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, সাধারণভাবে যেসব বিধান পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অভিন্ন, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত পুরুষবাচক পদই ব্যবহার করা হয়, স্ত্রীরা প্রসঙ্গত তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত বিশেষ রহস্যও থাকতে পারে যে, স্ত্রীরা অধিক আনমনা, তাই সরাসরি পুরুষদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় বিধান হচ্ছে لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ—অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তাতে তাদের বসবাস বহাল রাখা কোন কৃপা নয় বরং প্রাপ্য আদায়। বসবাসের হকও স্ত্রীর অন্যতম হক। আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, এই হক কেবল তালাক দিলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না বরং ইদ্দতের দিনগুলোতে এই গৃহে বসবাস করার অধিকার স্ত্রীর আছে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জুলুম ও হারাম। এমনিভাবে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় বের হয়ে যাওয়াও হারাম, যদিও স্বামী এর অনুমতি দেয়। কেননা, এই গৃহেই ইদ্দত অতিবাহিত করা স্বামীরই হক নয় আল্লাহ্‌রও হক, যা ইদ্দত পালনকারিণীর উপর ওয়াজিব। হানাফী মযহাব তাই।

চতুর্থ বিধান হচ্ছে إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ—অর্থাৎ ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রী কোন প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হারাম নয়। এটা তৃতীয় বিধানের ব্যতিক্রম। প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে।

এক. নির্লজ্জ কাজ বলে খোদ গৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা দৃশ্যত ব্যতিক্রম, যার উদ্দেশ্য গৃহ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া নয় বরং নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরদার করা। উদাহরণত এরূপ বলা যে, এই কাজ করা কারও উচিত নয় সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে মনুষ্যত্বই বিসর্জন দেয় অথবা তুমি তোমার জননীকে গালি দিও না এটা ব্যতীত যে, তুমি জননীর সম্পূর্ণই অবাধ্য হয়ে যাও। বলা বাহুল্য, প্রথম দৃষ্টান্তে ব্যতিক্রম দ্বারা সেই কাজের বৈধতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নয় এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে জননীর অবাধ্যতার বৈধতা প্রমাণ করা লক্ষ্য নয় বরং বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তার আরও বেশী অবৈধতা ও মন্দ হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, আয়াতের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ এই হল যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহ থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি তারা অশ্লীলতায়ই মেতে উঠে ও বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এর অর্থ বের হয়ে যাওয়ার বৈধতা নয় বরং আরও বেশী নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। নির্লজ্জ কাজের এই তফসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) সুদ্দী, ইবনে সায়েব, নাখয়ী (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।—(রূহুল মা'আনী)

দুই. নির্লজ্জ কাজ বলে ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যতিক্রম যথার্থ অর্থেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ব্যভিচার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য অবশ্যই তাকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বের করা হবে। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ, হাসান বসরী, শা'বী, যায়েদ ইবনে আসলাম, যাহ্হাক, ইকরিমা (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইউসুফ এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।

তিন. নির্লজ্জ কাজ বলে কটু কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি তারা কটুভাষিণী ও ঝগড়াটে হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যাবে। এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতে হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর কেরাত এরূপ اِلَّا اَنْ يُّفْحِشْنَ এই শব্দের বাহ্যিক অর্থ অশ্লীল কথাবার্তা বলা। এই কেরাত থেকেও সর্বশেষ তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।—(রূহুল মা'আনী) এই অবস্থায়ও ব্যতিক্রম আক্ষরিক অর্থে থাকবে।

এ পর্যন্ত তালাক সম্পর্কে চারটি বিধান বর্ণিত হল। পরে আরও বিধান বর্ণিত হবে। কিন্তু মাঝখানে বর্ণিত বিধানসমূহের প্রতি জোর দেওয়া এবং বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কতিপয় উপদেশ বাক্যের অবতারণা করা হচ্ছে। কোরআন পাকের বিশেষ পদ্ধতি এই যে, প্রত্যেক বিধানের পর আল্লাহ্র ভয় এবং পরকালের চিন্তা স্মরণ করিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ রুদ্ধ করা হয়। এখানেও তাই করা হয়েছে। কেননা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং পারস্পরিক প্রাপ্য পূর্ণরূপে আদায় করার ব্যবস্থা কোন আইনের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ভীতি ও পরকাল চিন্তাই প্রকৃষ্ট উপায়।

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ - لَا تَدْرِیْ لَعَلَّ

اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا —حُدُوْدُ اللّٰهِ বলে শরীয়তের নির্ধারিত আইন-কানুন বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো লংঘন করে অর্থাৎ আইন-কানুনের বিরোধিতা করে, সে নিজের উপর জুলুম করে অর্থাৎ আল্লাহ্ অথবা শরীয়তের কোন ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। এই ক্ষতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই হতে পারে। পারলৌকিক ক্ষতি তো শরীয়ত বিরোধী কাজের গোনাহ্ ও পরকালের শাস্তি এবং ইহলৌকিক ক্ষতি এই যে, যে ব্যক্তি শরীয়তের নির্দেশাবলীর তোয়াক্কা না করে স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে অধিকাংশ সময় তিন তালাক পর্যন্ত পৌঁছে ক্ষান্ত হয়, যার পর পারস্পরিক প্রত্যাহার অথবা পুনর্বিবাহও হতে পারে না। মানুষ প্রায়ই তালাক দিয়ে অনুতাপ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয় বিশেষ করে সন্তান-সন্ততি থাকলে। অতএব তালাকের বিপদ দুনিয়াতেই তার ঘাড়ে চেপে বসে। অনেকেই স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার নিয়তে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়। এরূপ তালাকের কষ্ট স্ত্রীও ভোগ করে। কিন্তু পুরুষের জন্য এটা জুলুমের উপর জুলুম এবং দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হয়ে যায়। এক. আল্লাহ্র নির্ধারিত আইন-কানুন লংঘন করার শাস্তি এবং দুই. স্ত্রীর উপর জুলুম করার শাস্তি। এর স্বরূপ এই :

پنداشت ستمگر جفا بر ما کرد
برگردن وے بماند و بر ماگذشت

لَا تَدْرِیْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا অর্থাৎ তুমি জান না সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা এই রাগ-গোসার পর অন্য কোন অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন অর্থাৎ স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আরাম, সন্তানের লালন-পালন এবং গৃহের সহজ ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করে তুমি তাকে পুনরায় বিবাহে রাখার ইচ্ছা করতে পার। এমতাবস্থায় আবার বিবাহে থাকা তখন সম্ভবপর হবে, যখন তুমি তালাক দেওয়ার সময় শরীয়তের আইন-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং অহেতুক বাইন তালাক না দিয়ে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দাও। এরূপ তালাক দেওয়ার পর প্রত্যাহার করে নিলে পূর্ব বিবাহ যথারীতি বহাল থাকে। তুমি তিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে তালাক দিও না, যার প্রত্যাহারের অধিকার থাকে না এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি সত্ত্বেও পরস্পরে পুনর্বিবাহও হালাল হয় না।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

—এখানে اجل শব্দের অর্থ ইদ্দত এবং اجل পর্যন্ত পৌঁছার অর্থ ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়া।

তালাক সম্পর্কে পঞ্চম বিধান ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তখন স্থির মস্তিষ্কে পুনরায় চিন্তা করে দেখ যে, বিবাহ বহাল রাখা উত্তম, না সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করে দেওয়া ভাল। এ চিন্তার জন্য এ সময়টি উত্তম। কারণ, তত দিনে পুরুষের সাময়িক রাগ-গোসা দমিত হয়ে যায়। যদি স্ত্রীকে বিবাহে রাখা স্থির হয়, তবে রেখে দাও। পরবর্তী আয়াতের ইঙ্গিত এবং হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, মুখে বলে দাও আমি তালাক প্রত্যাহার করলাম। অতঃপর এর জন্য দু'জন সাক্ষী রাখ।

পক্ষান্তরে যদি বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়াই সিদ্ধান্ত হয়, তবে স্ত্রীকে সুন্দর পন্থায় মুক্ত করে দাও অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হতে দাও। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলেই স্ত্রী মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়।

ষষ্ঠ বিধান ঃ ইদ্দত সমাপ্ত হলে স্ত্রীকে রাখার সিদ্ধান্ত হোক অথবা মুক্ত করে দেওয়ার— উভয় অবস্থাতে কোরআন পাক তা মারূফ অর্থাৎ যথোপযুক্ত পন্থায় সম্পন্ন করতে বলেছে। 'মারূফ' শব্দের অর্থ পরিচিত পন্থা। উদ্দেশ্য এই যে, যে পন্থা শরীয়ত ও সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত এবং মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে খ্যাত, সেই পন্থা অবলম্বন কর। তা এই যে, বিবাহে রাখা এবং তালাক প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হলে স্ত্রীকে মুখে অথবা কাজেকর্মে কষ্ট দিও না, তার উপর অনুগ্রহ রেখো না এবং তার যে কর্মগত ও চরিত্রগত দুর্বলতা তালাকের কারণ হচ্ছিল, অতঃপর নিজেও তজ্জন্য সবর করার সংকল্প কর, যাতে পুনরায় সেই তিক্ততা সৃষ্টি না হয়। পক্ষান্তরে মুক্ত করা সিদ্ধান্ত হলে তার বিদিত ও সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে অথবা গালমন্দ দিয়ে গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় কর। কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তাকে কোন বস্ত্রজোড়া দিয়ে বিদায় করা কমপক্ষে মোস্তাহাব এবং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিবও। ফিকহ্র কিতাবাদিতে এর বিবরণ পাওয়া যাবে।

সপ্তম বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে বিবাহে রাখা অথবা মুক্ত করে দেওয়ার দ্বিবিধ ক্ষমতা দেওয়া থেকে এবং পূর্ববর্তী لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا আয়াত থেকে প্রসঙ্গক্রমে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তালাক যদি দিতেই হয়, তবে এমন তালাক দেবে, যাতে প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে। এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, পরিষ্কার ভাষায় কেবল এক তালাক দেবে এবং সাথে সাথে রাগ-গোসা প্রকাশার্থে এমন কোন বাক্য বলবে না, যা বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার অর্থ জ্ঞাপন করে। উদাহরণত এরূপ বলবে না, আমার বাড়ী থেকে বের হয়ে যাও, তোমাকে খুব শক্ত তালাক দিচ্ছি, এখন তোমার সাথে আমার কোন বৈবাহিক সম্পর্ক রইল না। এ ধরনের বাক্য পরিষ্কার তালাকের সাথে বলে দিলে অথবা তালাকের নিয়তে কেবল এ ধরনের বাক্য বলে দিলেও প্রত্যাহারের অধিকার বাতিল হয়ে যায় এবং শরীয়তের পরিভাষায় 'বাইন' তালাক হয়ে যায়। ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক তাৎক্ষণিক-ভাবে ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রত্যাহারের ক্ষমতা থাকে না। তদপেক্ষা কঠোর তালাক হচ্ছে তালাককে তিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া। এর ফলশ্রুতিতে স্বামীর প্রত্যাহার ক্ষমতাই কেবল রহিত হয় না বরং ভবিষ্যতে পুরুষ ও নারী উভয়ে সম্মত হয়ে বিবাহ করতে চাইলেও নতুন বিবাহ হতে পারে না। সূরা বাকারার আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ

তিন তালাক একযোগে দেওয়া হারাম, কিন্তু কেউ দিলে তিন তালাকই হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) আছে ঃ আজকাল ধর্ম ও ধর্মীয় বিধানাবলীর প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীন্য ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ছে। মূর্খদের তো কথাই নেই, অনেক লেখাপড়া জানা দলীল লেখকরাও তিন তালাকের কম তালাককে যেন তালাকই মনে করে না। অথচ দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করা হয় যে, যারা তিন তালাক দেয়, তারা পরে অনুতাপ করে এবং স্ত্রী যাতে কোনক্রমেই হাতছাড়া না হয়, সে চিন্তায়ই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। ইমাম নাসায়ী (র) মাহমূদ ইবনে লবীদ-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একযোগে তিন তালাক দেওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন। এ কারণেই সমগ্র উম্মতের ইজমাবলে একযোগে তিন তালাক দেওয়া হারাম ও নাজায়েয। যদি কোন ব্যক্তি তিন তোহ্‌রে আলাদা আলাদা তিন তালাক দেয়, তবে তাও অপছন্দনীয়। এ বিষয়টি উম্মতের ইজমা এবং কোরআনী আয়াতসমূহের ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত। তবে এটাও হারাম ও বিদ'আতী তালাকের মধ্যে দাখিল কিনা, শুধু এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক (র)-এর মতে এটা হারাম। ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) হারাম বলেন না কিন্তু তাঁদের মতেও এটা অপছন্দনীয় ও সুন্নত বিরোধী কাজ। এর বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারার তফসীরে দেখুন।

কিন্তু একযোগে তিন তালাক দেওয়া হারাম—এ ব্যাপারে যেমন সমগ্র উম্মতের ইজমা রয়েছে, তেমনি হারাম হওয়া সত্ত্বেও কেউ এরূপ করলে তিন তালাক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও সমগ্র উম্মতের ইজমা রয়েছে। তিন তালাক একযোগে দেওয়ার পর ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নতুন বিবাহও হালাল হবে না। সমগ্র উম্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক আহলে হাদীস সম্প্রদায় এবং শিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত গোটা মযহাব চতুষ্টয় এ ব্যাপারে একমত যে, তিন তালাক একযোগে দিলেও তা কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা কোন কাজ হারাম হলে তার প্রতিক্রিয়ার কার্যকারিতা প্রভাবিত হয় না। যেমন কেউ কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যা করা হারাম হওয়া সত্ত্বেও যাকে হত্যা করা হয়, সে সর্বাবস্থায় মরেই যাবে। এমনিভাবে একযোগে তিন তালাক দেওয়া যদিও হারাম, তথাপি এর বাস্তবতা অপরিহার্য। কেবল মযহাব চতুষ্টয়ই নয় বরং সাহাবায়ে কিরাম ও হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন বলে বর্ণিত আছে। এ বিষয়েরও বিশদ বর্ণনা প্রথম খণ্ডে দেখুন।

وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ—অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী করে নাও এবং তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সঠিক সাক্ষ্য কায়েম কর।

অষ্টম বিধান ঃ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার সময় প্রত্যাহার করা সিদ্ধান্ত হোক কিংবা মুক্ত করা, উভয় অবস্থাতে এই কাজের জন্য দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে এই বিধানটি মোস্তাহাব, এর

উপর প্রত্যাহার নির্ভরশীল নয়। প্রত্যাহারের অবস্থায় সাক্ষী করার তাৎপর্য এই যে, পরবর্তীকালে স্ত্রী যাতে প্রত্যাহার অস্বীকার করে বিবাহ চূড়ান্তরূপে ভঙ্গ হওয়ার দাবী না করে বসে। মুক্ত করার অবস্থায় এ জন্য সাক্ষী করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে স্বয়ং স্বামীই দুষ্টুমিচ্ছলে অথবা স্ত্রীর ভালবাসায় পরাভূত হয়ে দাবী না করে বসে যে, সে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই প্রত্যাহার করেছিল। সাক্ষীদ্বয়ের জন্য ذَوَىْ عَدْلٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী সাক্ষীদ্বয়ের নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরী। অন্যথায় তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কোন বিচারক ফয়সালা দেবে না। أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ বাক্যে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোন প্রত্যাহার কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনার সাক্ষী হও এবং বিচারকের এজলাসে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে কারও মুখ চেয়ে অথবা বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণে সত্য সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয়ো না।

ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ—অর্থাৎ উপরোক্ত বিষয়বস্তু দ্বারা সে ব্যক্তিকে উপদেশ দান করা হচ্ছে, যে আল্লাহ্ ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এতে বিশেষভাবে পরকাল উল্লেখ করার কারণ এই যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার আদায় আল্লাহ্‌ভীতি ও পরকাল চিন্তা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

অপরাধ ও শাস্তির আইন-কানুনে কোরআন পাকের অভূতপূর্ব প্রভাবভিত্তিক ও মুরুব্বীসুলভ নীতি ঃ বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে আইন-কানুন ও অপরাধসমূহের দণ্ডবিধি প্রণয়নের প্রাচীন পদ্ধতি চালু আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং দেশে আইন-কানুন ও দণ্ডবিধির পুস্তক রচনা করা হয়। কোরআন পাকও আল্লাহ্ তা'আলার আইন পুস্তক। কিন্তু এর বর্ণনাভঙ্গি সারা বিশ্বের আইন পুস্তক থেকে পৃথক ও অভূতপূর্ব। এর প্রত্যেকটি আইনের অগ্রে-পশ্চাতে আল্লাহ্‌ভীতি ও পরকাল চিন্তা দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে দেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেক মানুষ কোন পুলিশ ও পরিদর্শকের ভয়ে নয় বরং আল্লাহ্‌র ভয়ে আইন মেনে চলে এবং কেউ দেখুক কিংবা না দেখুক, নির্জনে ও জনসমক্ষে সর্বাবস্থায় আইন মেনে চলাকে জরুরী মনে করে। একমাত্র এ কারণেই যারা কোরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান রাখে, তাদের মধ্যে কঠোরতর আইন প্রয়োগ করাও তেমন কঠিন হয় না। এজন্য ইসলামী সরকারকে পুলিশ, স্পেশাল পুলিশ ও তদুপরি গোয়েন্দা পুলিশের জাল বিস্তৃত করার প্রয়োজন হয় না।

কোরআন পাকের এই মুরুব্বীসুলভ নীতি সকল আইনের ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কিত আইনসমূহে এই নীতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা, এই সম্পর্কই এমন যে, এতে প্রত্যেক কাজে কোন সাক্ষ্য সংগৃহীত হতে পারে না এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে না। এটা সম্পূর্ণতই খোদ স্বামী-স্ত্রীরই অন্তর ও তাদের ক্রিয়াকর্মের উপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই বিবাহের খুতবায়

কোরআন পাকের যে তিনটি আয়াত পাঠ করা সুন্নতরূপে প্রমাণিত আছে, সেই আয়াতত্রয় আল্লাহ্‌ভীতির আদেশ দ্বারা শুরু ও সমাপ্ত হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা বিবাহ করে, তাদেরও এখন থেকেই বুঝে নিতে হবে যে, কেউ দেখুক বা না দেখুক, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজকর্ম, এমনকি গোপন চিন্তাধারা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল আছেন। আমরা পারস্পরিক অধিকার আদায়ে ত্রুটি করলে, একে অপরকে কষ্ট দিলে আলিমুল গায়েব আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এমনিভাবে সূরা তালাকে তালাকের কয়েকটি বিধান বর্ণনা করতে যেয়ে প্রথম বিধানের পরেই وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ বলে আল্লাহ্‌ভীতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর চারটি বিধান উল্লেখ করার পর—وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এসব বিধান অমান্য করে, সে অন্য কারও উপর নয়, নিজের উপরই জুলুম করে। এর অশুভ পরিণতি তাকেই ছারখার করে দেবে। এরপর আরও চারটি প্রাসঙ্গিক বিধান ও আইন উল্লেখ করার পর ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ বলে সেই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অতঃপর এক আয়াতে আল্লাহ্‌ভীতির ফযীলত ও তার ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ বর্ণনা করে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার কল্যাণ বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আবার ইদ্দতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণনা করে পরবর্তী দুই আয়াতে আল্লাহ্‌ভীতির আরও কল্যাণ ও ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আবার বিবাহ ও তালাকের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও সন্তানকে স্তন্যদানের বিধান বর্ণিত হয়েছে। তালাক, ইদ্দত এবং স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ, স্তন্যদান ইত্যাদি বিধানের মধ্যে বারবার কোথাও পরকাল চিন্তা, কোথাও আল্লাহ্‌ভীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ এবং কোথাও তাওয়াক্কুলের কল্যাণ ও কিছু বিধান বর্ণনা করে আল্লাহ্‌ভীতির বিষয়বস্তু দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার উল্লেখ করা বাহ্যত বেখাপ্পা মনে হয়। কিন্তু কোরআনের উপরোক্ত মুরুব্বীসুলভ নীতির রহস্য বুঝে নেওয়ার পর এর গভীর মিল সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবার আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ—

অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকট ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত রিযিক দান করেন।

تقوى শব্দের আসল অর্থ আত্মরক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত হলে এর অনুবাদ করা হয় আল্লাহ্‌কে ভয় করা। উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও ভয় করা।

আলোচ্য আয়াতে تقوى তথা আল্লাহ্‌ভীতির দু'টি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে—এক. আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বনকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিষ্কৃতির পথ করে দেন। কি থেকে নিষ্কৃতি? এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, দুনিয়ার যাবতীয় সংকট ও বিপদ থেকে এবং পরকালের সব বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতি। দুই. তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা কল্পনায়ও থাকে না। এখানে রিযিকের অর্থও ইহকাল এবং পরকালের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু। এই আয়াতে মু'মিন-মুত্তাকীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার এই ওয়াদা ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তার প্রত্যেক সমস্যাও সহজসাধ্য করেন এবং তার অভাব-অনটন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এমন পথে তার প্রয়োজনাদি সরবরাহ করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না—(রূহুল মা'আনী)

স্থানের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে কোন কোন তফসীরবিদ এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন: তালাকদাতা স্বামী ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উভয়ই অথবা তাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সকল সংকট ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন। পুরুষকে তার যোগ্য স্ত্রী এবং স্ত্রীকে তার উপযুক্ত স্বামী দান করবেন। বলা বাহুল্য, আয়াতের যে আসল অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অর্থও তাতে শামিল আছে।—(রূহুল মা'আনী)

আয়াতের শানে-নুযূল: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: আমার পুত্র সালেমকে শত্রুরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তার মা খুবই উদ্বিগ্না। এখন আমার কি করা উচিত? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন: আমি তোমাকে ও ছেলের মাকে বেশী পরিমাণে 'লা হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্' পাঠ করার আদেশ দিচ্ছি। তারা উভয়েই আদেশ পালন করলেন। এরই প্রভাবে গ্রেফতারকারী শত্রুরা একদিন কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে সুযোগ বুঝে ছেলেটি পলায়ন করে এবং ফেরার পথে শত্রুদের কয়েকটি ছাগল হাঁকিয়ে পিতার কাছে নিয়ে আসে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে শত্রুদের একটি উট পেয়ে সে তাতে সওয়ার হয়ে যায় এবং আরও কয়েকটি উট এর সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে আসে। তাঁর পিতা এই সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জ্ঞাত করান। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি এই প্রশ্নও করেন যে, ছেলেটি যেসব উট ও ছাগল নিয়ে এসেছে, এগুলো আমার জন্য হালাল, না হারাম? এর পরিপ্রেক্ষিতে وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ ا لخ আয়াতখানি নাযিল হয়।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, পুত্রের বিরহ যখন আওফ ইবনে মালেক (রা) ও তাঁর স্ত্রীকে অস্থির করে তুলল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বনের

আদেশ দিলেন। এটা অসম্ভব নয় যে, তাকওয়ার আদেশের সাথে সাথে 'লা-হাওলা' পাঠ করারও আদেশ দিয়েছিলেন।— (রূহুল মা'আনী)

এই শানে-নুযূল থেকেও একথা জানা গেল যে, আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাপক।

মাস'আলা : এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান যদি কাফিরদের হাতে বন্দী হয় এবং সে তাদের কিছু ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে আসে, তবে সেই ধনসম্পদ গনীমতের মালরূপে গণ্য হবে এবং হালাল হবে। গনীমতের মালের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এই ধনসম্পদের এক-পঞ্চমাংশ সরকারী বায়তুলমালে দেওয়াও জরুরী নয়, যেমন হাদীসের ঘটনায় তা নেওয়া হয়নি। ফিকহ্‌বিদগণ বলেন : কোন মুসলমান গোপনে ছাড়পত্র ছাড়াই দারুল হরব তথা শত্রুদেশে চলে গেলে যদি সেখান থেকে কাফিরদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তবে তা-ও হালাল। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি আজকাল প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ভিসা নিয়ে শত্রুদেশে যায়, তবে তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের কোন ধনসম্পদ নিয়ে আসা তার জন্য জায়েয নয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি বন্দী হয়ে তাদের দেশে যায়, অতঃপর কোন কাফির তার কাছে কোন অর্থ গচ্ছিত রাখে, সেই গচ্ছিত অর্থ নিয়ে আসাও হালাল নয়। কারণ, ভিসা নিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে একটি অলিখিত চুক্তি হয়ে গেছে। অতএব, তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করা চুক্তির বরখেলাফ কাজ। শেষোক্ত মাস'আলায়ও আমানতকারী ব্যক্তির সাথে তার কার্যগত চুক্তি থাকে। অতএব যখন সে চাইবে, তখন গচ্ছিত অর্থ তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এটা ফেরত না দেওয়া আত্মসাৎ ও চুক্তিভঙ্গের শামিল, যা শরীয়তে হারাম।—(মাযহারী)

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হিজরতের পূর্বে অনেক কাফির অর্থ-সম্পদ আমানত রাখত। হিজরতের সময় তাঁর হাতে এমন কিছু আমানত ছিল। তিনি এসব আমানত মালিককে প্রত্যর্পণের জন্য হযরত আলী (রা)-কে পশ্চাতে রেখে যান।

বিপদাপদ থেকে মুক্তি এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র : উপরোক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) আওফ ইবনে মালেক (রা)-কে বিপদ থেকে মুক্তি ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বেশী পরিমাণে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ পাঠ করতে বলেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) বলেন : ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার বিপদ ও ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা এবং উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য বেশী পরিমাণে এই কালেমা পাঠ একটি পরীক্ষিত আমল। হযরত মুজাদ্দিদের বর্ণনা অনুযায়ী এই বেশীর পরিমাণ হচ্ছে দৈনিক পাঁচশ বার এবং এর শুরুতে ও শেষে একশ বার করে দরূদ পাঠ করে উদ্দেশ্যের জন্য দোয়া করতে হবে।—(মাযহারী) হযরত আবূ যর (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا আয়াতটি বারবার তিলাওয়াত করতে থাকেন। অতঃপর তিনি বললেন : আবূ যর, যদি সব মানুষ কেবল এই আয়াতটি অবলম্বন করে নেয়, তবে এটা সবার জন্য যথেষ্ট। —(রূহুল মা'আনী)

অর্থাৎ সকল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্য কামিয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا — অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ তার মুশকিল কাজের জন্য যথেষ্ট। কেননা, আল্লাহ্ তাঁর কাজ যেভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করে ছাড়েন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তদনুযায়ী সবকাজ সম্পন্ন হয়। তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو اخماصا وتروح بطانا -

যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে পশু-পক্ষীর ন্যায় রিযিক দান করতেন। পশু-পক্ষী সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে।—(মাযহারী)

অবশ্য তাওয়াক্কুলের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট উপায়াদি ত্যাগ করা নয় বরং উদ্দেশ্য এই যে, ইচ্ছাধীন উপায়াদি অবশ্যই অবলম্বন করবে কিন্তু উপায়াদির উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে। কারণ, তাঁর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজ হতে পারে না। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ভীতি ও তাওয়াক্কুলের ফযীলত এবং বরকত বর্ণনা করার পর তালাক ও ইদ্দতের আরও কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَالّٰٓئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓئِيْ لَمْ يَحِضْنَ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -

এই আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দতের আরও বিবরণ আছে। এতে ইদ্দতের সাধারণ বিধি থেকে ভিন্ন তিন প্রকার স্ত্রীদের ইদ্দতের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের ইদ্দত সম্পর্কিত নবম বিধান : সাধারণ অবস্থায় তালাকের ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েয। কিন্তু যেসব মহিলার বয়োবৃদ্ধি অথবা কোন রোগ ইত্যাদির কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনিভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েয আসা শুরু হয়নি, তাদের ইদ্দত আলোচ্য আয়াতে তিন হায়েযের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যত দিনেই হোক।

اِنِ ارْتَبْتُمْ—অর্থাৎ যদি তোমাদের সন্দেহ হয়। সাধারণ ইদ্দত হায়েয দ্বারা গণনা করা হয় কিন্তু এসব মহিলার হায়েয বন্ধ, অতএব তাদের ইদ্দত কিভাবে গণনা করা হবে—এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাকেই আয়াতে সন্দেহ বলা হয়েছে।

অতঃপর আবার আল্লাহ্‌ভীতির ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করা হচ্ছে : وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا—অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া ও পরকালের কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এরপর আবার তালাক ও ইদ্দতের বর্ণিত বিধানাবলী পালন করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে :

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗ اِلَيْكُمْ—এটা আল্লাহ্‌র বিধান, যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। এরপর তাকওয়ার আরও একটি ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে :

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا—অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করেন এবং তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহ্‌ভীতির পাঁচটি কল্যাণ : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ভীতির পাঁচটি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে—১. আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য ইহকাল ও পরকালের বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন। ২. তার জন্য রিযিকের এমন দ্বার খুলে দেন, যা কল্পনায়ও থাকে না। ৩. তার সব কাজ সহজ করে দেন। ৪. তার পাপসমূহ মোচন করে দন। ৫. তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্‌ভীতির এই কল্যাণও বর্ণিত হয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহ্‌ভীরুর পক্ষে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় সহজ হয়ে যায়।

اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا—আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর আবার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দত, তাদের ভরণ-পোষণ এবং সাধারণ স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে :

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ

এই আয়াত উপরে বর্ণিত প্রথম বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এই আয়াতে তার ইতিবাচক দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাসের জায়গা দাও। তোমরা যে গৃহে থাক, সেই গৃহের কোন অংশে তাদেরকে রাখ। প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে

থাকলে কোন প্রকার পর্দা করারও প্রয়োজন নেই। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অবশ্য বিবাহ ছিন্ন হওয়ার কারণে তালাকদাতা স্বামীর কাছে পর্দা সহকারে সেই গৃহে বাস করতে হবে।

দশম বিধান ঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে ইদ্দতকালে উত্ত্যক্ত করো না ঃ لَا تُضَارُّوْ

هُنَّ—এর অর্থ এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা যখন ইদ্দতকালে তোমাদের সাথে থাকবে, তখন তিরস্কার করে অথবা তার অভাব পূরণে কৃপণতা করে তাকে উত্ত্যক্ত করো না, যাতে সে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ—অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।

একাদশ বিধান ঃ তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে তার ভরণ-পোষণ সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্বামীর উপর ওয়াজিব। এ কারণেই এ ব্যাপারে সমগ্র উম্মত একমত। তবে যে স্ত্রী গর্ভবতী নয়, তাকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে তার ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণও উম্মতের ইজমা দ্বারা স্বামীর উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তাকে 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অথবা সে খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করিয়ে থাকলে, তার ভরণ-পোষণ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম আযম (র)-এর মতে তার ভরণ-পোষণ তখনও স্বামীর উপর ওয়াজিব। তিনি বলেন ঃ বসবাসের অধিকার যেমন সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, তেমনি ভরণ-পোষণও সর্বপ্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, যা তালাকদাতা স্বামী আদায় করবে। তাঁর দলীল পূর্বোক্ত এই আয়াত ঃ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ—কেননা, এই আয়াতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর কিরাত এরূপ ঃ

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُّجْدِكُمْ—সাধারণত এক কিরাত অন্য কিরাতের তফসীর করে। অতএব প্রসিদ্ধ কিরাতে যদিও اَنْفِقُوْا শব্দটি উল্লিখিত নেই কিন্তু তা উহ্য আছে। প্রসিদ্ধ কিরাত যেভাবে বসবাসের অধিকার স্বামীদের উপর ওয়াজিব করেছে, তেমনি ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণও স্বামীদের যিম্মায় অপরিহার্য করে দিয়েছে। হযরত উমর ফারূক (রা) ও অন্য কয়েকজন সাহাবীর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা)-কে তার স্বামী তিন তালাক

দিয়েছিল। তিনি হযরত উমর (রা)-এর কাছে বলেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তার ভরণ-পোষণ তার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেন নি। হযরত উমর (রা) ও কয়েকজন সাহাবী ফাতেমার এই কথা খণ্ডন করে বলেছিলেন : আমরা এই বর্ণনার ভিত্তিতে আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নতকে বর্জন করতে পারি না। এতে আল্লাহ্র কিতাব বলে বাহ্যত এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, হযরত উমর (রা)-এর মতে ভরণ-পোষণও আয়াতের মধ্যে দাখিল। রসূলের সুন্নত বলে তাহাভী, দারে-কুতনী ও তিবরানী বর্ণিত সেই হাদীসকে বোঝানো হয়েছে, যাতে স্বয়ং হযরত উমর (রা) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শুনেছি, তিনি তিন তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যও ভরণ-পোষণ এবং বসবাসের অধিকার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেছেন।

সারকথা এই যে, গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ এই আয়াত পরিষ্কারভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে উম্মতের ইজমা আছে। এমনিভাবে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক-প্রাপ্তার বিবাহ ভঙ্গ না হওয়ার কারণে তার ভরণ-পোষণও সবার মতে ওয়াজিব। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তাদের ব্যাপারে ফিকহ্‌বিদগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আযম (র)-এর মতে তাদের ভরণ-পোষণও ওয়াজিব। এর পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মাযহারীতে দেখুন।

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ —অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে এবং সন্তান প্রসব হয়ে গেলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তাই তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব থাকে না। কিন্তু প্রসূত সন্তানকে যদি তালাকপ্রাপ্তা মা স্তন্যদান করে, তবে স্তন্যদানের বিনিময় নেওয়া ও দেওয়া জায়েয।

দ্বাদশ বিধান : স্তন্যদানের পারিশ্রমিক : যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহাধীন থাকে, সে পর্যন্ত সন্তানদেরকে স্তন্যদান করা স্বয়ং জননীর যিম্মায় কোরআনের আদেশ বলে ওয়াজিব। বলা হয়েছে : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ — যে কাজ কারও দায়িত্বে এমনিতেই ওয়াজিব, সেই কাজের জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া ঘুষের শামিল, যা নেওয়া দেওয়া উভয়ই নাজায়েয। এ ব্যাপারে ইদ্দতকালও বিবাহের মধ্যে গণ্য। কেননা, বিবাহ অবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যেমন স্বামীর উপর ওয়াজিব, ইদ্দতকালেও তেমনি ওয়াজিব। তবে সন্তান প্রসবের পর যখন ইদ্দত খতম হয়ে যায়, তখন তার ভরণ-পোষণও স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে না। এখন যদি সে প্রসূত সন্তানকে স্তন্যদান করে, তবে আলোচ্য আয়াত এর পারিশ্রমিক নেওয়া ও দেওয়া জায়েয সাব্যস্ত করেছে।

ত্রয়োদশ বিধান : وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ —এর শাব্দিক অর্থ পরামর্শ করা এবং একজন অন্যজনের কথা মেনে নেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, স্তন্যদানের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীকে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যেন সাধারণ পারিশ্রমিক অপেক্ষা বেশী না চায় এবং স্বামী সাধারণ পারিশ্রমিক দিতে যেন অসম্মত না হয় এবং এ ব্যাপারে তারা যেন একে অপরের সাথে উদার ব্যবহার করে।

চতুর্দশ বিধান : وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى —অর্থাৎ স্তন্যদান করার ব্যাপারটি যদি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে মীমাংসা না হয় অথবা স্ত্রী যদি তার সন্তানকে পারিশ্রমিক নিয়েও স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে আইনত তাকে বাধ্য করা যাবে না বরং মনে করতে হবে যে, সন্তানের প্রতি জননীর সর্বাধিক মায়া-মমতা সত্ত্বেও যখন অস্বীকার করছে, তখন কোন বাস্তব ওযর আছে। কিন্তু যদি বাস্তবে ওযর না থাকে, কেবল রাগ-গোসার কারণে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহ্র কাছে সে গোনাহ্গার হবে। তবে বিচারক তাকে স্তন্যদান করতে বাধ্য করবে না।

এমনিভাবে যদি স্বামী দারিদ্র্যের কারণে পারিশ্রমিক দিতে অক্ষম হয় এবং অন্য কোন মহিলা বিনাপারিশ্রমিকে অথবা কম পারিশ্রমিকে স্তন্যদান করতে সম্মত হয়, তবে স্বামীকে জননীর দাবী মেনে নিয়ে তার স্তন্য পান করাতেই বাধ্য করা হবে না বরং উভয় অবস্থাতে অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো যেতে পারে। হ্যাঁ, যদি অন্য মহিলা জননীর সমান পারিশ্রমিক দাবী করে, তবে সব ফিকহ্বিদের ঐকমত্যে অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো স্বামীর জন্য জায়েয নয়।

মাস'আলা : অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো স্থির হলে স্তন্যদাত্রী মহিলা সন্তানকে তার জননীর কাছে রেখে স্তন্যদান করবে, এটা জরুরী। জননীর কাছ থেকে আলাদা করে স্তন্যদান করানো জায়েয নয়। কেননা, সহীহ্ হাদীসদৃষ্টে 'হিযানত' তথা লালন-পালন ও দেখাশোনায় রাখা জননীর হক। এই হক ছিনিয়ে নেওয়া জায়েয নয়।—(মাযহারী)

পঞ্চদশ বিধান : স্ত্রীর ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ধারণে স্বামীর আর্থিক সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ

অর্থাৎ বিত্তশালী ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার রিযিক সীমিত, সে আমদানী অনুযায়ী ব্যয় করবে। এ থেকে জানা গেল যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থা ধর্তব্য হবে না বরং স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। স্বামী বিত্তবান হলে বিত্তবানসুলভ ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালিনী না হয় বরং দরিদ্র ও ফকীর হয়। স্বামী দরিদ্র হলে দারিদ্র্যসুলভ ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালিনী হয়। ইমাম আযম (র)-এর মযহাব তাই। কোন কোন ফিকাহ্বিদের উক্তি এর বিপরীত।—(মাযহারী)

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا —এটা

আগের বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কাজের দায়িত্ব দেন না। তাই দরিদ্র ও নিঃস্ব স্বামীর উপর তারই অবস্থা অনুযায়ী ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে। এরপর স্ত্রীকে দারিদ্র্যসুলভ ভরণ-পোষণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার ও সবর করার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছেঃ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا — অর্থাৎ কারো এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, বর্তমান দারিদ্র্য চিরকাল বজায় থাকবে বরং দারিদ্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহ্র হাতে। তিনি দারিদ্র্যের পর স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

জ্ঞাতব্যঃ এই আয়াতে সেই স্বামীরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে বলে ইঙ্গিত আছে, যারা যথাসাধ্য স্ত্রীদের ওয়াজিব ভরণ-পোষণ আদায় করতে সচেষ্ট থাকে এবং স্ত্রীকে কষ্টে রাখার মনোবৃত্তি পোষণ না করে।—(রূহুল মা'আনী)

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَّسُولًا يَّتْلُوا عَلَيْكُمْ آيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۚ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَّأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

(৮) অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তাঁর রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিসাবে পাকড়াও করেছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি

দিয়েছিলাম। (৯) অতঃপর তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিই ছিল। (১০) আল্লাহ্ তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব, হে বুদ্ধিমান লোকগণ, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উপদেশ নাযিল করেছেন, (১১) একজন রসূল, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়ন করেন। যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাকে উত্তম রিযিক দেবেন। (১২) আল্লাহ্ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তাঁর রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছে, অতঃপর আমি তাদের (কাজকর্মের) কঠোর হিসাব নিয়েছি (অর্থাৎ তাদের কোন কুফরী কর্মই ক্ষমা করিনি বরং প্রত্যেকটির শাস্তি দিয়েছি। এখানে হিসাব বলে জিজ্ঞাসাবাদ বোঝানো হয়নি)। এবং আমি তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছি (অর্থাৎ শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছি)। তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে এবং তাদের পরিণাম ক্ষতিই ছিল। (এ হচ্ছে দুনিয়াতে এবং পরকালে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (অবাধ্যতার পরিণাম যখন এই) অতএব হে বুদ্ধিমান লোকগণ, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (ঈমানও তাই চায়। ভয় কর অর্থাৎ আনুগত্য কর। এই আনুগত্যের পন্থা বলে দেওয়ার জন্য) আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উপদেশনামা প্রেরণ করেছেন (এবং এই উপদেশনামা দিয়ে) একজন রসূল (সা) (প্রেরণ করেছেন), যিনি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট বিধানাবলী পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে (কুফর ও মূর্খতার) অন্ধকার থেকে (ঈমান ও সৎ কর্মের) আলোকে আনয়ন করেন। [উদ্দেশ্য এই যে, এই রসূল (সা)-এর মাধ্যমে যে উপদেশ পৌঁছে, তা মেনে চলাও আনুগত্য। অতঃপর আনুগত্য অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের জন্য ওয়াদা করা হচ্ছে যে] যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তাকে দাখিল করবেন (জান্নাতের) এমন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাদেরকে) উত্তম রিযিক দিয়েছেন। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য অবশ্য পালনীয়। কারণ আল্লাহ্ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও তদনুরূপ (সাতটি সৃষ্টি করেছেন। তিরমিযীতে আছে, এক পৃথিবীর নিচে দ্বিতীয় পৃথিবী, তার নিচে তৃতীয় পৃথিবী, এভাবে সপ্ত পৃথিবী সৃজিত হয়েছে)। এসবের (অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর) মধ্যে তাঁর (আইনগত; সৃষ্টিগত অথবা উভয় প্রকার) বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়, (এসব কথা এজন্য বলা হয়েছে) যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ সবকিছুকে (স্বীয়) জ্ঞানের পরিধিতে বেষ্টন করে রেখেছেন (এতেই বোঝা যায় যে, তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا — আয়াতে উল্লিখিত এসব জাতির হিসাব ও আযাব পরকালে হবে কিন্তু এখানে একে অতীত পদবাচ্যে ব্যক্ত করার কারণ এর নিশ্চিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা, যেন হয়েই গেছে।—(রূহুল মা'আনী) আর এরূপ হতে পারে যে; এখানে হিসাবের অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ নয় বরং শাস্তি নির্ধারণ করা। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে। এটাও হতে পারে যে, কঠোর হিসাব যদিও পরকালে হবে কিন্তু আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। একেই হিসাব করা হয়েছে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আযাবের অর্থ ইহকালীন আযাব, যা অনেক পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের উপর নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا — বাক্যে বর্ণিত আযাব কেবল পরকালে হবে।

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا — এই আয়াতের সহজ ব্যাখ্যা এই যে, أَرْسَلَ শব্দ উহ্য মেনে এই অর্থ করা যে, নাযিল করেছেন কোরআন এবং প্রেরণ করেছেন রসূল (সা)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই করা হয়েছে। অন্যরা অন্য ব্যাখ্যাও লিখেছেন। উদাহরণত 'যিকর'-এর অর্থ স্বয়ং রসূল (সা) এবং অধিক যিকরের কারণে তিনি নিজেই যেন যিকর হয়ে গেছেন।—(রূহুল মা'আনী)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ **সপ্ত পৃথিবীর কোথায় কোথায় কিভাবে আছে**

وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ — এই আয়াত থেকে এতটুকু বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, আকাশ যেমন সাতটি, পৃথিবীও তেমনি সাতটি। এখন এই সপ্ত পৃথিবী কোথায় ও কি আকারে আছে, উপরে নিচে স্তরে স্তরে আছে, না প্রত্যেক পৃথিবীর স্থান ভিন্ন ভিন্ন? যদি উপরে নিচে স্তরে স্তরে থাকে, তবে সপ্ত আকাশের মধ্যে প্রত্যেক দুই আকাশের মাঝখানে যেমন বিরাট ব্যবধান আছে এবং প্রত্যেক আকাশে আলাদা আলাদা ফেরেশতা আছে, তেমনি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মাঝখানেও ব্যবধান, বায়ুমণ্ডল, শূন্যমণ্ডল ইত্যাদি আছে কি না, তাতে কোন সৃষ্ট জীব আছে কি না অথবা সপ্ত পৃথিবী পরস্পরে গ্রথিত কি না? এসব প্রশ্নের ব্যাপারে কোরআন পাক নীরব। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সেসব হাদীসের অধিকাংশ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ এগুলোকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং কেউ মিথ্যা ও মনগড়া পর্যন্ত বলে দিয়েছেন। উপরে যেসব সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তির নিরিখে সবগুলোই সম্ভবপর। বলতে কি, এসব তথ্যানুসন্ধানের উপর আমাদের কোন ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। কবরে অথবা হাশরে আমাদেরকে এ সম্পর্কে

প্রশ্নও করা হবে না। তাই নিরাপদ পন্থা এই যে, আমরা ঈমান আনব এবং বিশ্বাস করব আকাশের ন্যায় পৃথিবীও সাতটিই। সবগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কোরআনের বর্ণনা এতটুকুই, যে বিষয় বর্ণনা করা কোরআন জরুরী মনে করেনি, আমরাও তার পেছনে পড়ব না। এ জাতীয় বিষয়াদিতে পূর্ববর্তী মনীষিগণের কর্মপন্থা তাই ছিল। তাঁরা বলেছেন : ابهموا ما ابهمه الله অর্থাৎ যে বিষয়কে আল্লাহ্ তা'আলা অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বিশেষত বহমান তফসীর সর্বসাধারণের জন্য লিখিত হয়েছে। জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়—এমন নির্ভেজাল শিক্ষণীয় বিরোধপূর্ণ আলোচনা এতে সন্নিবেশিত করা হয়নি।

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবীর মাঝখানে অবতীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহ্‌র আদেশ দ্বিবিধ—(১) আইনগত, যা আল্লাহ্‌র আদিষ্ট বান্দাদের জন্য ওহী ও পয়গম্বরগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীতে মানব ও জিনের জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতাগণ এই আইনগত আদেশ পয়গম্বরগণের কাছে নিয়ে আসে। এতে আকায়েদ, ইবাদত, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন, সামাজিক বিধি ইত্যাদি থাকে। এগুলো মেনে চললে সওয়াব এবং অমান্য করলে আযাব হয়। (২) দ্বিতীয় প্রকার আদেশ সৃষ্টিগত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তকদীর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধি-বিধান। এতে জগত সৃষ্টি, জগতের ক্রমোন্নতি, হ্রাসবৃদ্ধি এবং জীবন ও মরণ দাখিল আছে। এসব বিধি-বিধান সমগ্র সৃষ্ট বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। তাই যদি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মধ্যস্থলে শূন্যমণ্ডল, ব্যবধান এবং তাতে কোন সৃষ্ট জীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে সেই সৃষ্ট জীব শরীয়তের বিধি-বিধানের অধীন না হলেও তার প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ অবতীর্ণ হতে পারে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিগত আদেশ তাতেও ব্যাপ্ত।

سورة التحريم

সূরা তাহ্‌রীম

মদীনায় অবতীর্ণ, ১২ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ

اَزْوَاجِكَ ۗ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ

اَيْمَانِكُمْ ۚ وَ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝٢ وَ اِذْ اَسَرَّ

النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَ اَظْهَرَهُ

اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَ اَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ

قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۗ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝٣ اِنْ تَتُوْبَاۤ

اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَ اِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ

هُوَ مَوْلٰىهُ وَ جِبْرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ

ظَهِيْرٌ ۝٤ عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا

مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ

ثَيِّبٰتٍ وَّ اَبْكَارًا ۝٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য তা নিজের জন্য হারাম করছেন কেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ

তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩) যখন নবী তার একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সেই বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেন : কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন : যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। (৪) তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ্, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ তার সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবত তার পালনকর্তা তাকে পরিবর্তে দেবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে নবী, আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি (কসম খেয়ে) তা নিজের জন্য হারাম করছেন কেন (তাও আবার) আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য? (অর্থাৎ কোন বৈধ কাজ না করা যদিও বৈধ এবং কোন উপযোগিতার কারণে তাকে কসম দ্বারা জোরদার করাও বৈধ কিন্তু উত্তমের বিপরীত অবশ্যই, বিশেষ করে তার কারণও যদি দুর্বল হয় অর্থাৎ অনাবশ্যক বিষয়ে স্ত্রীদেরকে খুশী করা)। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। [তিনি গোনাহ্ পর্যন্ত মাফ করে দেন, আপনি তো কোন গোনাহ্ করেন নি। তাই এটা আপনার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ নয় বরং স্নেহবশে আপনাকে বলা হচ্ছে যে, আপনি একটি বৈধ উপকার বর্জন করে এই কষ্ট করলেন কেন? রসূলুল্লাহ্ (সা) কসম খেয়েছিলেন, তাই সাধারণ সম্বোধন দ্বারা কসমের কাফফারা সম্পর্কে বলা হচ্ছে :] আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য কসম খোলা (অর্থাৎ কসম ভঙ্গ করার পর তার কাফফারা দানের পন্থা) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের সহায়। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (তাই তিনি স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা তোমাদের উপযোগিতা ও প্রয়োজনাদি জেনে তোমাদের অনেক সংকট সহজ করে দেওয়ার পন্থা নির্ধারণ করে দেন। সেমতে কাফফারার মাধ্যমে কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় করে দিয়েছেন। অতঃপর স্ত্রীদেরকে বলা হচ্ছে যে, সেই সময়টি স্মরণীয়,) যখন নবী করীম (সা) তাঁর একজন বিবির কাছে একটি কথা গোপনে বললেন। (কথাটি ছিল এই : আমি আর মধু পান করব না কিন্তু কারও কাছে একথা বলো না)। অতঃপর বিবি যখন তা (অন্য বিবিকে) বলে দিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে (ওহীর মাধ্যমে) তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী (এই গোপন কথা প্রকাশকারিণী) বিবিকে কিছু কথা তো বললেন (যে, তুমি আমার কথা অন্যের কাছে বলে দিয়েছ) এবং কিছু বললেন না (অর্থাৎ নবীর ভদ্রতা এতটুকু যে, আদেশ পালন না করার কারণে বিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যেয়েও কথিত বাক্যগুলো পূর্ণরূপে বললেন না যে, তুমি আমার এই কথা বলে দিয়েছ, সেই কথা বলে দিয়েছ বরং কিছু অংশ উল্লেখ করলেন এবং কিছু অংশ উল্লেখ করলেন না, যাতে

বিবি মনে করে যে, তিনি এতটুকু বিষয়ই জানেন—এর বেশী জানেন না। এতে লজ্জা কম হবে)। অতএব নবী যখন তা বিবিকে বললেন, তখন বিবি বললেন : কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন : আমাকে সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল আল্লাহ্ অবহিত করেছেন। [বিবি-গণকে একথা শোনানোর কারণ সম্ভবত এই যে, তারা যখন জানতে পারবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পূর্ণ গোপন জানেন, তখন তাঁর ভদ্রতাসুলভ আচরণ দেখে তারা আরও বেশী লজ্জিত হবে এবং তওবা করবে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে বিবিগণকে তওবা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে :] তোমরা উভয়েই (অর্থাৎ পয়গম্বরের দুই বিবি) যদি আল্লাহ্র কাছে তওবা কর, তবে (খুব ভাল কথা। কেননা, তওবার কারণ বিদ্যমান আছে। তা এই যে,) তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের দিকে) ঝুঁকে পড়েছে। (তোমরা পয়গম্বরকে অন্য বিবিগণ থেকে সরিয়ে একান্তভাবে নিজেদের করে নিতে চাও। এটা রসূলপ্রীতির লক্ষণ হিসাবে যদিও মন্দ নয় কিন্তু এর কারণে অন্য বিবি-গণের অধিকার হরণ এবং অন্তর ব্যথিত হয়। এই হিসাবে এটা মন্দ ও তওবা করার যোগ্য)। আর যদি (এমনিভাবে) নবীর বিরুদ্ধে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ, নবীর সহায় আল্লাহ্, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানগণ। উপরন্তু ফেরেশতা-গণও তাঁর সাহায্যকারী। (উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের এসব কারসাজিতে নবীর কোন ক্ষতি হবে না—ক্ষতি তোমাদেরই হবে। কারণ, যে ব্যক্তির এমন সহায়, তাঁর রুচির বিরুদ্ধে তৎপরতার পরিণাম মন্দই মন্দ হবে। কোন কোন শানে-নুযূল অনুযায়ী এ কাজে হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা) ব্যতীত অন্যান্য বিবিও শরীক ছিলেন, যেমন হযরত সওদা ও সফিয়্যা (রা) প্রমুখ, তাই অতঃপর বহুবচন ব্যবহার করে সম্বোধন করা হচ্ছে যে, তোমরা এই কল্পনাকে মনে স্থান দিয়ো না যে, পুরুষ যখন, তখন বিবিদের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আর আমাদের চাইতে উত্তম বিবি কোথায়? তাই সর্বাবস্থায় আমাদের সবকিছুই সহ্য করা হবে। অতএব মনে রেখ) যদি নবী তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেন, তবে সম্ভবত তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দেবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে মুসলমান, ঈমানদার, আনুগত্যকারিণী, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, কতক অকুমারী ও কতক কুমারী। (কোন কোন উপযোগিতাদৃষ্টে বিধবা নারীও কাম্য হয়ে থাকে, যেমন অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা, সমবয়স্কতা ইত্যাদি। তাই একেও উল্লেখ করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল : সহীহ্ বুখারী ইত্যাদি কিতাবে হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল বিবির কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নব (রা)-এর কাছে একটু বেশী সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হযরত হাফসা (রা)-র সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সে-ই বলবে : আপনি 'মাগাফীর' পান করেছেন। ('মাগাফীর' এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়)। সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : না, আমি তো মধু পান করেছি। সেই বিবি বললেন : সম্ভবত কোন মৌমাছি 'মাগাফীর' বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল। এ কারণেই

মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতেন। তাই তিনি অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। হযরত যয়নব (রা) মনঃক্ষুণ্ণ হবেন চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যও বলে দিলেন। কিন্তু সেই বিবি বিষয়টি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে হযরত হাফ্সা (রা) মধু পান করিয়েছিলেন এবং হযরত আয়েশা, সওদা ও সফিয়্যা (রা) পরামর্শ করেছিলেন। কতক রেওয়ায়েতে ঘটনাটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটা অমূলক নয় যে, একাধিক ঘটনার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।—(বয়ানুল কোরআন)

আয়াতসমূহের সার-সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি হালাল বস্তু অর্থাৎ মধুকে কসমের মাধ্যমে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। এ কাজ কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে হলে জায়েয—গোনাহ্ নয় কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় এমন কোন প্রয়োজন ছিল না যে, এর কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট স্বীকার করে নেবেন এবং একটি হালাল বস্তু বর্জন করবেন। কেননা, এ কাজ রসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল বিবিগণকে খুশী করার জন্য করেছিলেন। এরূপ ব্যাপারে বিবিগণকে খুশী করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য অপরিহার্য ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সহানুভূতিচ্ছলে বলেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ—এই আয়াতেও কোরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম নিয়ে সম্বোধন না করে 'হে নবী' বলা হয়েছে। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রম। এরপর বলা হয়েছে যে, স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আপনি নিজের জন্য একটি হালাল বস্তুকে হারাম করেছেন কেন? বাক্যটি যদিও সহানুভূতিচ্ছলে বলা হয়েছে কিন্তু দৃশ্যত এতে জওয়াব তলব করা হয়েছে। এ থেকে ধারণা হতে পারত যে, সম্ভবত তিনি খুব বড় ভুল করে ফেলেছেন। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে : وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ— অর্থাৎ গোনাহ্ হলেও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মাস'আলা : তিন প্রকারে কোন হালাল বস্তুকে নিজের উপর হারাম করা যায়। এর বিশদ বর্ণনা সূরা মায়িদার তফসীরে উল্লিখিত হয়েছে। তা সংক্ষেপে এই যে, কেউ কোন হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে না করে কিন্তু যদি কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকেই কসম খেয়ে হারাম করে নেয়, তবে তা গোনাহ্ হবে। কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে হলে জায়েয কিন্তু উত্তমের খেলাফ। তৃতীয় প্রকার এই যে, বিশ্বাসগতভাবেও হারাম মনে করে না এবং কসম খেয়েও হারাম করে না কিন্তু কার্যত তা চিরতরে বর্জন করার সংকল্প পোষণ করে। এই সংকল্প সওয়াব মনে করে করলে বিদ'আত ও বৈরাগ্য হবে, যা শরীয়তে নিন্দনীয়। আর যদি কোন দৈহিক অথবা আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থে করে তবে জায়েয। যেমন কোন সূফী বুযুর্গ থেকে ভোগ-সম্ভোগ বর্জনের যেসব গল্প বর্ণিত আছে, সেগুলো এই পর্যায়েরই।

উল্লিখিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) কসম খেয়েছিলেন। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এই কসম ভঙ্গ করেন এবং কাফফারা আদায় করেন। দুররে মনসূরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাফফারা হিসাবে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন। —(বয়ানুল কোরআন)

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ অর্থাৎ যেক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ করা জরুরী অথবা উত্তম বিবেচিত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা সেক্ষেত্রে তোমাদের কসম ভঙ্গ করে কাফফারা আদায় করার পথ করে দিয়েছেন। অন্যান্য আয়াতে এর বিশদ বর্ণনা আছে।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا—অর্থাৎ নবী যখন তাঁর কোন এক বিবির কাছে গোপন কথা বললেন। সহীহ্ ও অধিকাংশ রেওয়ায়েত দৃষ্টে এই গোপন কথা ছিল এই যে, হযরত যয়নব (রা)-এর কাছে মধু পান করার কারণে অন্য বিবিগণ যখন মনঃক্ষুণ্ণ হল, তখন তাদেরকে খুশী করার জন্য তিনি মধু পান না করার কসম খেলেন এবং বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্য বলে দিলেন, যাতে যয়নব (রা) মনে কষ্ট না পান। কিন্তু সেই বিবি এই গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন। এই গোপন কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় বিষয় বর্ণিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ও সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহে তাই আছে, যা লিখিত হল।

فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ—অর্থাৎ সেই বিবি যখন গোপন কথাটি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিলেন এবং আল্লাহ্ রসূল (সা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন, তখন তিনি সেই বিবির কাছে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ তো করলেন, কিন্তু পূর্ণ কথা বললেন না। এটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভদ্রতা। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ কথা বললে সে অধিক লজ্জিত হবে। কোন্ বিবির কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কার কাছে ফাঁস করা হয়েছিল, কোরআন পাক তা বর্ণনা করেনি। অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত হাফসা (রা)-র কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে তা ফাঁস করে দেন। এ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীর হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা পরে উল্লেখ করা হবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) হাফসা (রা)-কে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করে তাঁকে তালাক থেকে বিরত রাখেন এবং বলে দেন যে, হাফসা (রা) অনেক নামায পড়ে অনেক রোযা রাখে। তার নাম জান্নাতে আপনার বিবিগণের তালিকায় লিখিত আছে।—(মাযহারী)

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا —উপরোক্ত ঘটনার পশ্চাতে যে দুইজন বিবি সক্রিয় ছিলেন তাঁরা কে, এ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে তিনি বলেন : যে দুইজন নারী সম্পর্কে কোরআন পাকে إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ বলা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা)-কে প্রশ্ন করার ইচ্ছা বেশ কিছুকাল পর্যন্ত আমার মনে ছিল। অবশেষে একবার তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে সুযোগ বুঝে আমিও সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি ওযূ করছিলেন এবং আমি পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম, তখন প্রশ্ন করলাম : কোরআনে যে দুইজন নারী সম্পর্কে إِنْ تَتُوبَا বলা হয়েছে, তাঁরা কে? হযরত ওমর (রা) বললেন : আশ্চর্যের বিষয়, আপনি জানেন না, এঁরা দুজন হলেন, হাফসা ও আয়েশা (রা)। অতঃপর এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজের একটি দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করলেন। এতে এই ঘটনার পূর্ববর্তী কিছু অবস্থাও বর্ণনা করলেন। তফসীরে-মাযহারীতে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত দুজন বিবিকে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : যদি তোমাদের অন্তর অন্যায়ের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে বলে তোমরা তওবা কর, তবে ভাল কথা। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মহব্বত ও সন্তুষ্টি কামনা প্রত্যেক মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তোমরা উভয়ে পরস্পরে পরামর্শ করে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছ, যদ্দরুন তিনি ব্যথিত হয়েছেন। কাজেই এই গোনাহ্ থেকে তওবা করা জরুরী। অতঃপর বলা হয়েছে :

وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ —এতে বলা হয়েছে : যদি তোমরা তওবা করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খুশি না কর, তবে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আল্লাহ্, জিবরাঈল ও সমস্ত নেক মুসলমান তাঁর সহায়। সকল ফেরেশতা তাঁর সেবায় নিয়োজিত। অতএব তাঁর ক্ষতি করার সাধ্য কার? ক্ষতি যা হবার, তোমাদেরই হবে। অতঃপর তাঁদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে :

عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ —এতে বিবিগণের এই ধারণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তালাক দিয়ে দিলে তাদের মত স্ত্রী সম্ভবত তিনি পাবেন না। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সামর্থ্যের বাইরে কোন কিছু নেই। তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মতই নয়, বরং তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নারী তাঁকে দান করবেন। এতে জরুরী হয় না যে, তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট নারী তখন বিদ্যমান ছিল। হতে পারে যে, তখন ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য নারীদেরকে তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট করে দিতে পারেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিবিগণের কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষার বর্ণনা আছে। অতঃপর সাধারণ মু'মিনগণকেও এ ব্যাপারে আদেশ করা হচ্ছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝٦ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٧

(৬) হে মু'মিনগণ। তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (৭) হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, (যখন রসূলের বিবিগণেরও সৎ কর্ম ও আনুগত্য ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং রসূলকেও তাঁর বিবিগণকে উপদেশ দিয়ে সৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে, তখন অবশিষ্ট সব উম্মতের উপরও এই কর্তব্য আরও জোরদার হয়ে গেছে যে, তারা যেন তাদের পরিবার-পরিজনের কর্ম ও চরিত্র গঠনে শৈথিল্য না করে। তাই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে) তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর (নিজেদেরকে রক্ষা করার অর্থ বিধি-বিধান মেনে চলা এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার অর্থ তাদেরকে আল্লাহ্র বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া ও তা পালন করানোর জন্য মুখে ও হাতে যথাসম্ভব চেষ্টা করা। অতঃপর সেই অগ্নির অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যাতে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। (তারা কারও প্রতি দয়া করে না এবং কেউ তাদের মুকাবিলা করে বাঁচতে পারে না)। তারা আল্লাহ্ যা আদেশ করেন, তা (সামান্যও) অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, (তৎক্ষণাৎ) তাই করে। (মোটকথা, জাহান্নামে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ কাফিরদেরকে জাহান্নামে দাখিল করে ছাড়বে। তখন কাফিরদেরকে বলা হবে ঃ) হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। (কারণ, এটা নিষ্ফল) তোমাদেরকে তো তারই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ—এ আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে ঃ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোন শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোর প্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম 'যবানিয়া'।

اَهْلِيْكُمْ। শব্দের মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, গোলাম-বাঁদী সবই দাখিল আছে। এমনকি, সার্বক্ষণিক চাকর-নওকরও এতে দাখিল থাকা অবান্তর নয়। এক রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত নাযিল হলে পর হযরত ওমর (রা) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্। নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি তো বুঝে আসে (যে, আমরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকব এবং আল্লাহ্র বিধি-বিধান পালন করব) কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আমরা কিভাবে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এর উপায় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে। —(রূহুল মা'আনী)

স্ত্রী সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য ঃ ফিকহ্‌বিদগণ বলেন ঃ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফরয কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। একথা আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বলে ঃ হে আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি! তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা, তোমাদের যাকাত, তোমাদের ইয়াতীম, তোমাদের মিসকীন, তোমাদের প্রতিবেশী, আশা করা যায় আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে তোমাদের সাথে জান্নাতে সমবেত করবেন। 'তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা' ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখ, এতে শৈথিল্য না হওয়া উচিত। 'তোমাদের মিসকীন, তোমাদের ইয়াতীম' ইত্যাদি বলার অর্থ এই যে, তাদের প্রাপ্য খুশি মনে আদায় কর। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাবে থাকবে, যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে মূর্খ ও উদাসীন হবে।—(রূহুল মা'আনী)

মু'মিনদেরকে উপদেশ দানের পর يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আয়াতে কাফিরদেরকে বলা হয়েছে ঃ এখন তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সামনে আসছে। এখন তোমাদের কোন ওযর কবুল করা হবে না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ
رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ
تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰ
نِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَ
ٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۝ ضَرَبَ ٱللَّهُ
مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا
عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ۝
وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ
رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ
وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ
ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ
بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ ۝

(৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর—আন্তরিক তওবা। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্, নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৯) হে নবী!

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান। (১০) আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই ধর্মপরায়ণ বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ্ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্র কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল ঃ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। (১১) আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য ফিরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। (১২) আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান-তনয়া মরিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীদের একজন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলোচ্য আয়াতসমূহে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এ পন্থাই পরিবার-পরিজনকে বলে তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করা যায়। পন্থা এই ঃ) মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্র সামনে সত্যিকার তওবা কর। (অর্থাৎ অন্তরে গোনাহের কারণে পুরোপুরি অনুতাপ থাকবে এবং ভবিষ্যতে তা না করার দৃঢ় সংকল্প থাকবে। এতে সকল ফরয-ওয়াজিব বিধানও দাখিল আছে। কেননা, এগুলো পালন না করা গোনাহ্ এবং যাবতীয় হারাম এবং মকরূহ বিষয়ও দাখিল আছে কেননা, এগুলো করা গোনাহ্)। আশা (অর্থাৎ ওয়াদা) আছে যে, তোমাদের পালনকর্তা (এই তওবার কারণে) তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। (এটা সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ্ নবী এবং তাঁর মুসলমান সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা দোয়া করবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এই নূর শেষ পর্যন্ত রাখুন (অর্থাৎ পথিমধ্যে যেন নিভে না যায়) এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান (এই দোয়ার কারণ হবে এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মু'মিন কিছু না কিছু নূর প্রাপ্ত হবে। পুলসিরাতে পৌঁছে যখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে, যা সূরা হাদীদে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন মু'মিনগণ এই দোয়া করবে, যাতে মুনাফিকদের ন্যায় তাদের নূরও নিভে না যায়)। হে নবী! কাফিরদের সাথে (তরবারির মাধ্যমে) এবং মুনাফিকদের সাথে (মুখে ও বর্ণনার মাধ্যমে) জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। (দুনিয়াতে তো তারা এই শাস্তির যোগ্য হয়েছে এবং পরকালে) তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান। (অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরকালে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার নিজের ঈমানই কাজে আসবে। কাফিরকে তার কোন আত্মীয়-স্বজনের ঈমান রক্ষা করতে পারবে না। এমনিভাবে মু'মিনের আত্মীয়-স্বজন কাফির হলে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না)। আল্লাহ্ তা'আলা

কাফিরদের (শিক্ষার) জন্য নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা আমার দুইজন সৎকর্মপরায়ণ বান্দার বিবাহিতা ছিল। অতঃপর তারা উভয়েই তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। (অর্থাৎ নবী হওয়ার কারণে বিশ্বাস ছিল যে, তারা তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ধর্মের ব্যাপারে তাঁদের আনুগত্য করবে, কিন্তু তারা তা করেনি) ফলে নূহ ও লূত আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তাদের কোন কাজে আসেনি। তাদেরকে (কাফির হয়ে যাওয়ার কারণে আদেশ করা হয়েছে ঃ তোমরা উভয়েই জাহান্নামে প্রবেশ-কারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর। (অতঃপর মুসলমানদের প্রশান্তির জন্য বলা হয়েছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের (সান্ত্বনার) জন্য ফিরাউন-পত্নীর (অর্থাৎ হযরত আছিয়ার) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন, যখন সে দোয়া করল ঃ হে আমার পালনকর্তা ! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরাউন (-এর অনিষ্ট) থেকে এবং তার দুষ্কর্ম থেকে (অর্থাৎ কুফরের ক্ষতি ও প্রভাব থেকে) মুক্ত রাখুন। আমাকে জালিম (অর্থাৎ কাফির) সম্প্রদায়ের (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখুন। (মুসল-মানদের সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ্) ইমরান-তনয়া মরিয়মের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। সে তার সতীত্বকে (হালাল ও হারাম উভয় প্রকার কর্ম থেকে) বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি (জিবরাঈলের মাধ্যমে) তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে প্রাণ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী (যা ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছেছিল) এবং কিতাবসমূহকে (অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জীলকে) সত্যায়ন করেছিল। এতে তার আকায়িদ বর্ণিত হয়েছে)। সে ছিল আনুগত্যকারীদের একজন (এতে তার সৎ কর্ম বর্ণিত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا—তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। উদ্দেশ্য গোনাহ্ থেকে ফিরে আসা। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় তওবার অর্থ বিগত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার ধারে-কাছে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা। نصوح শব্দটিকে যদি نصح থেকে উদ্ভূত ধরা হয়, তবে এর অর্থ খাঁটি করা। আর যদি نصاحة থেকে উৎপন্ন ধরা হয়, তবে এর অর্থ বস্ত্র সেলাই করা ও তালি দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে تَوْبَةً نَّصُوحًا-এর অর্থ এমন তওবা, যা রিয়া ও নাম-যশ থেকে খাঁটি—কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে এবং গোনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে গোনাহ্ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে نصوح শব্দটি এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্য হবে যে, তওবা গোনাহের কারণে সৎ কর্মের ছিন্নবস্ত্রে তালি সংযুক্ত করে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ বিগত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করাই تَوْبَةً نَّصُوحٌ—কলবী (র) বলেন ঃ تَوْبَةً نَّصُوحٌ হল মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা, অন্তরে অনুশোচনা করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভবিষ্যতে সেই গোনাহ্ থেকে দূরে রাখা।

হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল তওবা কি? তিনি বললেন: ছয়টি বিষয়ের একত্র সমাবেশ হলে তওবা হবে—(১) অতীত মন্দ কর্মের জন্য অনুতাপ; (২) যে সব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাযা করা; (৩) কারও ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা; (৪) কাউকে হাতে অথবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তজ্জন্য ক্ষমা নেওয়া; (৫) ভবিষ্যতে সেই গোনাহের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হওয়া; এবং (৬) নিজেকে যেমন আল্লাহ্‌র নাফরমানী করতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুগত্য করতে দেখা। —(মাযহারী)

হযরত আলী (রা) বর্ণিত তওবার উপরোক্ত শর্তসমূহ সবার কাছে স্বীকৃত। তবে কেউ সংক্ষেপে এবং কেউ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ—عَسٰى শব্দের অর্থ আশা আছে; কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য ওয়াদা। ওয়াদাকে আশা বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের তওবা অথবা অন্য কোন সৎ কর্ম হোক, কোনটিই জান্নাত ও মাগফিরাতের মূল্য হতে পারে না। নতুবা ইনসাফের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র জন্য জরুরী হয়ে পড়ে যে, যে ব্যক্তি সৎ কর্ম করবে, তাকে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করতে হবে। সৎ কর্মের এক প্রতিদান তো প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে প্রাপ্ত নিয়ামতের আকারে পেয়ে যায়। এর বিনিময়ে আইনের দৃষ্টিতে জান্নাত পাওয়া জরুরী নয়। এটা কেবল আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভরশীল। বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: তোমাদের কাউকে শুধু তার সৎ কর্ম মুক্তি দিতে পারে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা কৃপা ও রহমতের ব্যবহার না করেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন: ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনাকেও মুক্তি দিতে পারে না? তিনি বললেন: হ্যাঁ আমাকেও। —(মাযহারী)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ—সূরার শেষভাগে আল্লাহ্ তা'আলা চারজন নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। প্রথম নারীদ্বয় দুইজন পয়গম্বরের পত্নী। তারা ধর্মের ব্যাপারে আপন আপন স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং গোপনে কাফির ও মুশরিকদেরকে সাহায্য করেছিল। ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্‌র প্রিয় পয়গম্বরগণের বৈবাহিক সাহচর্যও তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদের একজন হযরত নূহ (আ)-র পত্নী, তার নাম 'ওয়াগেলা' বর্ণিত আছে। অপরজন লূত (আ)-এর পত্নী, তার নাম 'ওয়ালেহা' কথিত আছে। —(কুরতুবী) তৃতীয় জন সর্ববৃহৎ কাফির, আল্লাহ্‌র দাবীদার ফিরাউনের পত্নী ছিলেন, কিন্তু হযরত মূসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মহান মর্যাদা দান করেছেন এবং দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের আসন দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর ফিরাউনত্ব তাঁর পথে মোটেই প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। চতুর্থ জন হযরত মরিয়ম। তিনি কারও পত্নী নন, কিন্তু ঈমান ও সৎ কর্মের বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের গুণাবলী দান করেছেন, যদিও অধিকাংশ আলিমের মতে তিনি নবী নন।

এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, একজন মু'মিনের ঈমান তার কোন কাফির স্বজন ও আত্মীয়ের উপকারে আসতে পারে না এবং একজন কাফিরের কুফর তার কোন মু'মিন স্বজনের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তাই নবী ও ওলীগণের পত্নীরা যেন নিশ্চিন্ত না হয় যে, তারা তাদের স্বামীদের কারণে মুক্তি পেয়েই যাবে এবং কোন কাফির পাপাচারীর পত্নী যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয় যে, স্বামীর কুফর ও পাপাচার তার জন্য ক্ষতিকর হবে, বরং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের ঈমান ও সৎ কর্মের চিন্তা করা উচিত।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ —এটা ফিরাউন-পত্নী হযরত আছিয়া বিন্‌তে মুযাহিমের দৃষ্টান্ত। মূসা (আ) যখন যাদুকরদের মুকাবিলায় সফল হন এবং যাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়, তখন বিবি আছিয়া তাঁর ঈমান প্রকাশ করেন। ফিরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইল। কতক রেওয়ায়েতে আছে, ফিরাউন তাঁর চার হাত পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর ভারী পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র কাছে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দোয়া করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ফিরাউন উপর থেকে একটি ভারী পাথর তাঁর মাথার উপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে তিনি এই দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আত্মা কবজ করে নেন এবং পাথরটি নিষ্প্রাণ দেহের উপর পতিত হয়। তিনি দোয়ায় বলেন: হে আমার পালনকর্তা! আপনি নিজের সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের গৃহ দেখিয়ে দেন।—(মাযহারী)

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ —كَلِمَاتِ رَبِّ বলে পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র সহীফা বোঝানো হয়েছে এবং كُتُب বলে প্রসিদ্ধ ঐশী গ্রন্থ ইঞ্জীল, যবুর ও তওরাত বোঝানো হয়েছে।

وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ —قَانِتِيْنَ শব্দটি قَانِت এর বহুবচন। এর অর্থ নিয়মিত ইবাদতকারী, এটা হযরত মরিয়মের বিশেষণ। হযরত আবূ মূসা (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামিল ও সিদ্ধ পুরুষ হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফিরাউন-পত্নী আছিয়া এবং ইমরান-তনয়া মরিয়ম সিদ্ধি লাভ করেছেন।—(মাযহারী) বাহ্যত এখানে নবুয়তের গুণাবলী বোঝানো হয়েছে, যা নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্জন করেছেন।—(মাযহারী)

سورة الملك

সূরা মুল্‌ক

মক্কায় অবতীর্ণ, ৩০ আয়াত, ২ রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۙ ۝ الَّذِىْ

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ

الْغَفُوْرُ ۙ ۝ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ

مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ

كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝ وَلَقَدْ زَيَّنَّا

السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ

عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ

الْمَصِيْرُ ۝ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ۙ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ

مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ

نَذِيْرٌ ۝ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ

اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ۖۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ

اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْۤ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ

فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ

مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ

بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾ هُوَ
الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ
رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ
الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ
حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ
مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾ اَمَّنْ هٰذَا
الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ
اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ
لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ﴿٢١﴾ اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى
اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾
قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُوْلُوْنَ
مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪
وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ
عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۤؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। (৩) তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন তফাৎ দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (৪) অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ—তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৫) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্য ক্ষেপণাস্ত্র করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। (৬) যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান। (৭) যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। (৮) ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? (৯) তারা বলবে: হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আল্লাহ্ কোন কিছু নাযিল করেন নি। তোমরা মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। (১০) তারা আরও বলবে: যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। (১১) অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। (১২) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত। (১৫) তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তাঁর কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (১৬) তোমরা কি ভাবনা-মুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর কাঁপতে থাকবে। (১৭) না, তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। (১৮) তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কত কঠোর হয়েছিল আমার অস্বীকৃতি। (১৯) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি—পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ্-ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয় দেখেন। (২০) রহমান আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন

সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা বিভ্রান্তিতেই পতিত আছে। (২১) তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দেবে? বরং তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতায় ডুবে রয়েছে। (২২) যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎ পথে চলে, না সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে? (২৩) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (২৪) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে। (২৫) কাফিররা বলেঃ এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (২৬) বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ্র কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৭) যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবেঃ এটাই তো তোমরা চাইতে। (২৮) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ—যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাফিরদেরকে কে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (২৯) বলুন, তিনি পরম করুণাময়, আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। সত্বরই তোমরা জানতে পারবে কে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় আছে। (৩০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পুণ্যময় (আল্লাহ্) তিনি, যাঁর কব্জায় সমস্ত রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। (কর্ম সুন্দর হওয়ার মধ্যে মৃত্যুর প্রভাব এই যে, মৃত্যু চিন্তার কারণে মানুষ দুনিয়াকে ধ্বংসশীল এবং কিয়ামতের বিশ্বাসের ফলে পরকালকে অক্ষয় মনে করতে পারে এবং পরকালের সওয়াব অর্জন ও পরকালের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার্থে কর্মতৎপর হতে পারে। জীবনের প্রভাব এই যে, জীবন না হলে কর্ম কখন করবে। অতএব কর্ম সুন্দর হওয়ার জন্য মৃত্যু যেন শর্ত এবং জীবন যেন পাত্র। নিছক না থাকাই যেহেতু মৃত্যু নয়, তাই এটা সৃজিত হতে পারে)। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। (কাজেই অসুন্দর কর্মের শাস্তি এবং সুন্দর কর্মের জন্য ক্ষমা ও সওয়াব দান করেন)। তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। (সহীহ্ হাদীসে আছে, এক আকাশের উপরে অনেক দূরত্বে দ্বিতীয় আকাশ অবস্থিত। এমনিভাবে আরও আকাশ রয়েছে। অতঃপর আকাশের মজবুতী বর্ণনা করা হচ্ছে যে হে দর্শক) তুমি আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন তফাৎ দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিপাত কর—কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (অর্থাৎ অগভীর দৃষ্টিতে তো অনেকবার দেখেছ। এবার গভীর দৃষ্টিতে দেখ) অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ—তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (কিন্তু কোন চিড় দৃষ্টিগোচর হবে না। সুতরাং আল্লাহ্ যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। আকাশকে এমন মজবুত করে সৃষ্টি

করেছেন যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও এতে কোন ত্রুটি দেখা যায় না। মোট-কথা তাঁর সব রকম ক্ষমতা আছে। আমার শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ এই যে) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা (অর্থাৎ নক্ষত্ররাজি) দ্বারা সুশোভিত করেছি, এগুলোকে (অর্থাৎ নক্ষত্ররাজিকে) শয়তানের জন্য ক্ষেপণাস্ত্র করেছি (সূরা হাজরে এর স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে) এবং আমি তাদের (অর্থাৎ শয়তানদের) জন্য (দুনিয়ার এই ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া পরকালে কুফরের কারণে) জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। যারা তাদের পালনকর্তাকে (অর্থাৎ তাঁর তওহীদ) অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান! যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। (হয় আল্লাহ্ তার মধ্যে উপলব্ধি ও ক্রোধ সৃষ্টি করে দেবেন, ফলে সে-ও কাফিরদের প্রতি ক্রোধান্বিত হবে, না হয় দৃষ্টান্তস্বরূপ এ কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেমন কেউ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়, তেমনি জাহান্নাম তীব্র উত্তেজনাবশত জোশ মারতে থাকবে।) যখনই তাতে কোন (কাফির) সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তাদেরকে তার রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করেনি? (যে তোমা-দেরকে এই শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করত এবং ফলে তোমরা এ থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করতে? এই প্রশ্ন শাসানোর উদ্দেশ্যে করা হবে। অর্থাৎ পয়গম্বর তো অবশ্যই আগমন করেছিল। প্রত্যেক নবাগত সম্প্রদায়কে এই প্রশ্ন করা হবে। কেননা, কুফর ভেদে কাফিরদের সব সম্প্রদায় একের পর এক জাহান্নামে যাবে)। তারা (অপরাধ স্বীকার করে) বলবে: হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করেছিল। অতঃপর (দুর্ভাগ্য-ক্রমে) আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আল্লাহ্ (বিধি-বিধান ও কিতাব ধরনের) কোন কিছু নাযিল করেন নি। তোমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। তারা (ফেরেশতাদের কাছে) আরও বলবে: যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামীদের মধ্যে থাকতাম না। মোটকথা, তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীদের প্রতি অভিশাপ। নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, (ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করে) তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। তোমরা গোপনে কথা বল অথবা প্রকাশ্যে (তিনি সব জানেন। কেননা) তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত। এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর নিরঙ্কুশ স্রষ্টা। অতএব তোমাদের কর্ম এবং কথাবার্তারও স্রষ্টা। জ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তু সৃষ্টি করা যায় না। তাই আল্লাহ্র জন্য প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান অপরিহার্য। এখানে কেবল কথাবার্তা সম্পর্কিত জ্ঞানই উদ্দেশ্য নয়, বরং কর্মও এতে দাখিল আছে। তবে কর্মের তুলনায় কথাবার্তা বেশী বিধায় বিশেষ করে কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা, তিনি সব জানেন এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন। তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। (ফলে তোমরা অনায়াসে যত্রতত্র গমনাগমন করতে পার) অতএব তোমরা তার বুকের উপর বিচরণ কর এবং (পৃথিবীতে সৃষ্ট) আল্লাহ্র রিযিক আহার কর (পান কর) এবং (পানাহার করে তাঁকে স্মরণ কর। কেননা) তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (সুতরাং তাঁর নিয়ামতসমূহের শোকর আদায়, যা ঈমান ও আনুগত্য)। তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে

(সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে) আছেন, তিনি তোমাদেরকে (কারূনের ন্যায়) ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে (ফলে তোমরা আরও নীচে চলে যাবে এবং ভূমি তোমাদের উপরে এসে যাবে) না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে (সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে) আছেন, তিনি তোমাদের উপর (আদ সম্প্রদায়ের ন্যায়) ঝন্‌ঝাবায়ু প্রেরণ করবেন (ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমাদের কুফরের উপযুক্ত শাস্তি এটাই)। অতএব (কোন উপযোগিতাবশত দুনিয়ার শাস্তি টলে গেলেই কি) সত্বরই (মৃত্যুর পরই) তোমরা জানতে পারবে (আযাব থেকে) আমার সতর্কবাণী কেমন (নির্ভুল) ছিল। (যদি দুনিয়ার শাস্তি ব্যক্তি ব্যতীত তারা কুফরের অপকারিতা বুঝতে সক্ষম না হয়, তবে এর নমুনাও বিদ্যমান আছে। সেমতে) তাদের পূর্ববর্তীরা (সত্য ধর্মের প্রতি) মিথ্যা আরোপ করেছিল। অতএব (দেখে নাও তাদের প্রতি) আমার শাস্তি কেমন হয়েছিল। (এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কুফর গর্হিত। সুতরাং কোন কারণে দুনিয়াতে শাস্তি না হলেও পরজগতে শাস্তি হবে। خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ আয়াতে আকাশ সম্পর্কিত তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে এবং هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ আয়াতে পৃথিবী সম্পর্কিত প্রমাণাদি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর শূন্যমণ্ডল সম্পর্কিত প্রমাণাদি ব্যক্ত করা হচ্ছেঃ) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি—পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? (উভয় অবস্থাতে ভারী ও ওজনবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলে অবাধে বিচরণ করে—মাটিতে পতিত হয় না)। দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তাদেরকে স্থির রাখে না। তিনি সবকিছু দেখেন। (যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেন। আল্লাহ্‌র ক্ষমতা তো শুনলে, এখন বল) রহমান আল্লাহ্ ব্যতীত কে তোমাদের সৈন্য-বাহিনী হয়ে (বিপদাপদ থেকে) তোমাদেরকে রক্ষা করবে? কাফিররা (যারা তাদের উপাস্য সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করে তারা) তো নিরেট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছে। (আরও বল) তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দেবে? (কিন্তু তারা এতেও প্রভাবান্বিত হয় না) বরং তারা অবাধ্যতা ও (সত্যের প্রতি) বিমুখতায় ডুবে রয়েছে। (সারকথা এই যে, তোমাদের মিথ্যা উপাস্যরা কোন অনিষ্ট দূর করতে সক্ষম নয়, يَنْصُرُكُمْ আয়াতে তাই বলা হয়েছে এবং কোন উপকার পৌঁছাতেও সমর্থ নয়, يَرْزُقُكُمْ আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের আরাধনা করা নিরেট বোকামী। উপরে বর্ণিত কাফিরদের অবস্থা শুনে এখন চিন্তা কর যে) যে ব্যক্তি (অসমতল রাস্তার কারণে হোঁচট খেয়ে খেয়ে) উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে, না সে ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সমতল সড়কে চলে? (মু'মিন ও কাফিরের অবস্থা তদ্রূপই। মু'মিনের চলার পথ সরল ধর্ম এবং সে চলেও সোজা হয়ে স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে আত্মরক্ষা করে। পক্ষান্তরে কাফিরের চলার পথ বক্রতা এবং পথভ্রষ্টতাপূর্ণ এবং চলার মধ্যেও সর্বদা বিপদাপদে পতিত হয়। এমতাবস্থায়

সে পর্যন্ত কিরূপে পৌছবে ? উপরে তওহীদের জগত সম্পর্কিত প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে, অতঃপর আত্মা সম্পর্কিত প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) বলুন, তিনিই (এমন সক্ষম ও নিয়ামতদাতা যিনি) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন (কিন্তু) তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (আরও) বলুন, তিনিই তোমা-দেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং (কিয়ামতের দিন) তোমরা তাঁরই কাছে সমবেত হবে। কাফিররা (যখন কিয়ামতের কথা শুনে, তখন) বলে ঃ এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে, যদি তোমরা (অর্থাৎ পয়গম্বর ও তাঁর অনুসারীরা) সত্যবাদী হও, (তবে বল) বলুন ঃ এর (নির্দিষ্ট) জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। আমি তো কেবল (সংক্ষেপে কিন্তু) প্রকাশ্য সতর্ককারী। অতঃপর যখন তারা একে (অর্থাৎ কিয়ামতের আযাবকে) আসন্ন দেখবে, তখন (দুঃখ্যাতিশয্যে) কাফিরদের মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে পড়বে (অন্য আয়াতে আছে, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ) এবং (তাদেরকে বলা হবে ঃ এটাই তো তোমরা চাইতে। [তোমরা বলতে আযাব আন, আযাব আন। কাফিররা তওহীদ, পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়বস্তু শুনে এমন কথাবার্তা বলত, যা ছিল প্রকারান্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মৃত্যু কামনা এবং তাঁকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা। তাই অতঃপর এর জওয়াব শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এতে কাফিরদের আযাব এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুও সংযুক্ত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ] বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ—যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সংগীদেরকে (তোমাদের কামনা অনুযায়ী) ধ্বংস করেন অথবা (আমাদের আশা ও স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী) আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে (তোমাদের কি, তোমরা তো কাফিরই এবং) কাফির-দেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে ? (অর্থাৎ আমাদের যা হবে, দুনিয়াতে হবে এবং এর পরিণাম সর্বাবস্থায় শুভ। কিন্তু তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা কর। তোমাদের দিকে যে মহাবিপদ এগিয়ে আসছে তাকে কে প্রতিরোধ করবে ? আমাদের পার্থিব বিপদাপদ দ্বারা তোমাদের সেই মহাবিপদ টলে যাবে না। অতএব নিজের চিন্তা ছেড়ে আমাদের বিপদ কামনা করা অনর্থক বৈ নয়। আপনি তাদেরকে আরও) বলুন, তিনি আমাদের প্রতি করুণাময়, আমরা (তাঁর আদেশ অনুযায়ী) তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। (সুতরাং ঈমানের বরকতে তিনি আমাদেরকে পরকালের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন এবং ভরসার বরকতে তিনি আমাদেরকে পার্থিব বিপদাপদ থেকে বাঁচাবেন অথবা সহজ করে দেবেন। অতএব সত্বরই তোমরা জানতে পারবে (যখন নিজেদেরকে আযাবে পতিত এবং আমাদেরকে মুক্ত দেখবে) প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় কে লিপ্ত আছে ? (অর্থাৎ তোমরাই আছ না আমরা আছি। উপরে বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তি থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। যদি কাফিররা মনে করে যে, তাদের মিথ্যা উপাস্য তাদেরকে রক্ষা করবে, তবে এই ধারণার নিরসনকল্পে আপনি) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের (কূপের) পানি নিম্নে (নেমে) অদৃশ্যই হয়ে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে স্রোতের পানি (অর্থাৎ কে কূপে স্রোত প্রবাহিত করবে এবং ভূগর্ভের গভীর থেকে পানি উপরে আনবে। কেউ যদি খনন করার স্পর্ধা দেখায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা পানি আরও নীচে গায়েব করে দিতে সক্ষম। যখন

আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় এতটুকু করতেও কেউ সক্ষম নয়, তখন পরকালে আযাব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে কিরূপে)?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুলকের ফযীলত ঃ এই সূরাকে হাদীসে ওয়াকিয়া ও মুনজিয়া বলা হয়েছে। 'ওয়াকিয়া' শব্দের অর্থ রক্ষাকারী এবং 'মুনজিয়া' শব্দের অর্থ মুক্তিদানকারী। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ هى المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر অর্থাৎ এই সূরা আযাব রোধ করে এবং আযাব থেকে মুক্তি দেয়। যে এই সূরা পাঠ করে, তাকে এই সূরা কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে।—(কুরতুবী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, সূরা মুলক প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে থাকুক। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাবে একটি সূরা আছে, যার আয়াত তো মাত্র ত্রিশটি কিন্তু কিয়ামতের দিন এই সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করবে সেটা সূরা মুলক। —(কুরতুবী)

تبارك—تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

শব্দটি بركت থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বেশী হওয়া। এই শব্দটি আল্লাহ্‌র শানে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সর্বোচ্চ ও মহান। بِيَدِهِ الْمُلْكُ—আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে রাজত্ব। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে আল্লাহ্‌র জন্য হাত অর্থে يد শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বহু ঊর্ধ্বে। তাই এটা একটা متشابه শব্দ। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কিন্তু এর অবস্থা ও স্বরূপ কারও জানার বিষয় নয়। এর পিছনে পড়া অবৈধ। রাজত্ব বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহকাল ও পরকালের রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য চারটি গুণ দাবী করা হয়েছে। এক. তিনি বিদ্যমান আছেন, দুই. তিনি চরম পূর্ণত্ব গুণের অধিকারী এবং সবার ঊর্ধ্বে, তিন. তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এবং চার. তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই দাবীর যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে, যা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলেই ফুটে উঠে। তাই পরের আয়াতসমূহে সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্ট বস্তুর বিভিন্ন প্রকার দ্বারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ এবং তাঁর জ্ঞান ও শক্তিমত্তা সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টির সেরা মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহ্‌র কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি করে বলা হয়েছে ঃ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ—এরপর

কয়েক আয়াতে আকাশ সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রমাণ এনে বলা হয়েছে : اَلَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ—এরপর هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا থেকে দুই আয়াতে পৃথিবী সৃজন ও তার উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে শূন্যমণ্ডলে বসবাসকারী সৃষ্ট জীব পক্ষীদের উল্লেখ করে اَوَلَمْ یَرَوْا اِلَی الطَّیْرِ বলা হয়েছে। মোটকথা, সমগ্র সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা। প্রসঙ্গক্রমে কাফিরদের শাস্তি, মু'মিনদের প্রতিদান ইত্যাদি বিষয়বস্তুও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির যেসব প্রমাণ মানুষের মধ্যে রয়েছে দুইটি শব্দের মাধ্যমে সেগুলো নির্দেশ করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের স্বরূপ : خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ—অর্থাৎ তিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে এখানে কেবল মরণ ও জীবন এই দুইটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এই দুইটি অবস্থাই মানব জীবনের যাবতীয় হাল ও ক্রিয়াকর্মে পরিব্যাপ্ত। জীবন একটি অস্তিবাচক বিষয় বিধায় এর জন্য 'সৃষ্টি' শব্দ যথার্থই প্রযোজ্য। কিন্তু মৃত্যু বাহ্যত নাস্তিবাচক বিষয়। অতএব একে সৃষ্টি করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক স্পষ্ট উক্তি এই যে, মৃত্যু নিরেট নাস্তিকে বলা হয় না, বরং মৃত্যুর সংজ্ঞা হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা। এটা অস্তিবাচক বিষয়। মোটকথা, জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, মৃত্যুও তেমনি একটি অবস্থা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্য কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, মরণ ও জীবন দুইটি শরীরী সৃষ্টি। মরণ একটি ভেড়ার আকারে এবং জীবন একটি ঘোটকীর আকারে বিদ্যমান আছে। বাহ্যত একটি সহীহ্ হাদীসের সাথে সুর মিলিয়ে এই উক্তি করা হয়েছে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে এবং পুলসিরাতের সন্নিকটে যবাই করে ঘোষণা করা হবে : এখন যে যে অবস্থায় আছে অনন্তকাল সেই অবস্থায়ই থাকবে। এখন থেকে কারও মৃত্যু হবে না। কিন্তু এই হাদীস থেকে দুনিয়াতে মৃত্যুর শরীরী হওয়া জরুরী হয় না, বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক অবস্থা ও কর্ম যেমন কিয়ামতের দিন শরীরী ও সাকার হয়ে যাবে, যা অনেক সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের মৃত্যুরূপী অবস্থাও কিয়ামতে শরীরী হয়ে ভেড়ার আকার ধারণ করবে এবং তাকে যবাই করা হবে।—(কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, মৃত্যু নাস্তি হলেও নিরেট নাস্তি নয়; বরং এমন বস্তুর নাস্তি, যা কোন সময় অস্তি লাভ করবে। এ ধরনের সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার

জড় অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 'আলমে মিছালে' (সাদৃশ্য জগতে) বিদ্যমান থাকে। এগুলোকে 'আ'য়ানে সাবেতা' তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তুনিচয় বলা হয়। এসব আকারের কারণে এগুলোর অস্তিত্ব লাভের পূর্বেও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে। এরপর তফসীরে মাযহারীতে 'আলমে মিছাল' সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনেক হাদীস থেকে প্রমাণাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের বিভিন্ন স্তর ঃ তফসীরে মাযহারীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেককে এক প্রকার জীবন দান করেছেন। সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন মানবকে দান করা হয়েছে। এতে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ করার যোগ্যতাও নিহিত রেখেছেন। এই পরিচয়ই মানুষকে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের অধীন করার ভিত্তি এবং এই পরিচয়ই সেই আমানতের গুরুভার, যা বহন করতে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং মানব আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে বহন করতে সক্ষম হয়। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে।

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ —অর্থাৎ কাফিরকে মৃত এবং মু'মিনকে জীবিত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ, কাফির তার উপরোক্ত পরিচয় বিনষ্ট করে দিয়েছে। সৃষ্টির কোন কোন প্রকারের মধ্যে জীবনের এই স্তর নেই, কিন্তু চেতনা ও গতিশীলতা বিদ্যমান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াতে আছে ঃ

كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ —এখানে জীবনের অর্থ অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতাও নেই, কেবল বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা আছে, যেমন সাধারণ বৃক্ষ ও উদ্ভিদ এ ধরনের জীবনের অধিকারী। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا আয়াতে আছে। এই তিন প্রকার জীবন মানব, জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমিত। এগুলো ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে এই প্রকার জীবন নেই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ —কিন্তু এতদসত্ত্বেও জড় পদার্থের মধ্যেও অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন বিদ্যমান আছে। এই জীবনের প্রভাবই কোরআন পাকে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ —অর্থাৎ এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্

তা'আলার প্রশংসা-কীর্তন করে না। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আয়াতে মৃত্যুকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণও ফুটে উঠেছে। মূলত মৃত্যুই অগ্রে। অস্তিত্ব লাভ করে—এমন প্রত্যেক বস্তুই পূর্বে মৃত্যুজগতে থাকে। পরে তাকে জীবন দান করা হয়। এ কথাও বলা যায় যে, পরবর্তী لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا আয়াতে মরণ ও জীবন সৃষ্টি করার কারণ মানুষের পরীক্ষা নির্ণয় করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপস্থিত জ্ঞান করবে, সে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা আছে। কারণ, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে অক্ষম এবং আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মৃত্যুচিন্তা কর্ম সংশোধন ও সৎকর্ম সম্পাদনে সর্বাধিক কার্যকর।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنى অর্থাৎ মৃত্যু উপদেশের জন্য এবং বিশ্বাসই ধনাঢ্যতার জন্য যথেষ্ট।—(তিবরানী) উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষকরণ সবচাইতে বড় উপদেশদাতা। যারা এই দৃশ্য দেখে প্রভাবান্বিত হয় না, অন্য কোন কিছু দ্বারা তাদের প্রভাবান্বিত হওয়া সুদূরপরাহত। আল্লাহ্ যাকে ঈমান ও বিশ্বাসরূপী ধন দান করেছেন, তার সমতুল্য কোন ধনাঢ্য ও অমুখাপেক্ষী নেই। রবী ইবনে আনাস (রা) বলেন : মৃত্যু মানুষকে সংসারের সাথে সম্পর্কহীন করা ও পরকালের প্রতি আগ্রহান্বিত করার জন্য যথেষ্ট।

أَحْسَنُ عَمَلًا এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে জড়িত মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভাল। একথা বলেন নি যে, কার কর্ম বেশী। এ থেকে বোঝা যায় যে, কারও কর্মের পরিমাণ বেশী হওয়া আল্লাহ্র কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়; বরং কর্মটি ভাল, নির্ভুল ও মকবুল হওয়াই ধর্তব্য। এ কারণেই কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম গণনা করা হবে না; বরং ওজন করা হবে। এতে কোন কোন এক কর্মের ওজনই হাজারো কর্ম অপেক্ষা বেশী হবে।

ভাল কর্ম কি? হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে أَحْسَنُ عَمَلًا পর্যন্ত পৌঁছে বললেন : সেই ব্যক্তি ভাল কর্মী, যে আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়াদি থেকে সর্বাধিক বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য সদাসর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে।—(কুরতুবী)

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ—এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায়

যে, দুনিয়ায় মানুষ আকাশকে চোখে দেখতে পারে এবং উপরে যে নীলাভ শূন্যমণ্ডল পরি-দৃষ্ট হয়, তাই আকাশ হবে, এটা জরুরী নয়। বরং এটা সম্ভবপর যে, আকাশ আরও অনেক অনেক উপরে অবস্থিত হবে। উপরে যে নীলাভ রঙ দেখা যায়, এটা বায়ু ও শূন্য মণ্ডলের রঙ। দার্শনিকগণ তাই বলে থাকেন। কিন্তু এ থেকে এটাও জরুরী হয় না যে, আকাশ মানুষের দৃষ্টিগোচরই হবে না। এটা সম্ভবপর যে, এই নীলাভ শূন্যমণ্ডল কাঁচের মত স্বচ্ছ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আকাশ দেখার পথে অন্তরায় নয়। যদি এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আকাশকে চোখে দেখা যেতে পারে না, তবে এই আয়াতে দেখার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা।—(বয়ানুল কোরআন)

—وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ

مصابيح বলে নক্ষত্ররাজি বোঝানো হয়েছে। নিম্নতম আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করার জন্য এটা জরুরী নয় যে, নক্ষত্ররাজি আকাশের গায়ে অথবা তার উপরে সংযুক্ত থাকবে, বরং নক্ষত্ররাজি আকাশের বহু নিম্নে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এই আলোকসজ্জা হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। নক্ষত্ররাজিকে শয়তান বিতাড়িত করার জন্য অঙ্গার করে দেওয়ার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নক্ষত্ররাজি থেকে কোন আগ্নেয় উপাদান শয়তানদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নক্ষত্ররাজি স্ব-স্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নক্ষত্রের ন্যায় গতিশীল দেখা যায়। তাই একে তারকা খসে যাওয়া এবং আরবীতে انقضاض الكوكب বলে দেওয়া হয়।—(কুরতুবী)

এ থেকে আরও জানা গেল যে, ঐশী সংবাদাদি চুরি করার জন্য শয়তানরা যখন ঊর্ধ্ব গগনে আরোহণ করে, তখন তাদেরকে নক্ষত্ররাজির নীচেই বিতাড়িত করে দেওয়া হয়।—(কুরতুবী) এ পর্যন্ত বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ থেকে সাত আয়াত পর্যন্ত কাফিরদের শাস্তি ও অনুগত মু'মিনদের সওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর পুনরায় জ্ঞান ও শক্তির বর্ণনা আছে।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا — ذلول এর শাব্দিক অর্থ বাধ্য ও অনুগত। যে জন্তু আরোহণের সময় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে না, তাকে ذلول বলা হয়। مناكب শব্দটি منكب-এর বহুবচন। এর অর্থ কাঁধ। যে কোন জন্তুর কাঁধ আরো-হণের স্থান নয়, বরং কোমর অথবা ঘাড় আরোহণের জায়গা হয়ে থাকে। যে জন্তু আরোহীর জন্য নিজের কাঁধও পেশ করে দেয়, সে খুবই বাধ্য, অনুগত ও বশীভূত হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে, আমি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য এমন বশীভূত করে দিয়েছি

যে, তোমরা তার কাঁধে চড়ে অবাধে বিচরণ করতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি ও কর্দমের ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। ভূপৃষ্ঠ এরূপ হলে তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হত না। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠকে লৌহ ও প্রস্তরের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন করা যেত না, কূপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন, যাতে এর উপর দালান-কোঠা স্থির থাকে এবং চলাচলকারীরা হোঁচট না খায়।

وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ — আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে ভূপৃষ্ঠের আনাচে-কানাচে বিচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর বলেছেন : আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক আহার কর। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ এবং পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রফতানী আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক হাসিল করার দরজা। وَإِلَيْهِ النُّشُورُ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভ করার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যেয়ো না, পরিণামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। ভূপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় পরকালের প্রস্তুতিতে লেগে থাক। পরবর্তী আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহ্র আযাব আসতে পারে। ইরশাদ হয়েছে :

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

তোমরা কি এ বিষয়ে ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং ভূগর্ভ তোমাদেরকে গিলে ফেলবে? অর্থাৎ যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না, কিন্তু তিনি একে এরূপও করে দিতে সক্ষম যে, এই ভূপৃষ্ঠই তার উপরে বসবাসকারীদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। পরের আয়াতে অন্য এক প্রকার আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

অর্থাৎ তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন? তখন তোমরা এই সতর্কবাণীর পরিণতি জানতে পারবে। কিন্তু তখন জানা নিষ্ফল হবে। আজ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তা কর। এরপর দুনিয়াতে আযাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ

কর। وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ আয়াতের মর্মার্থ তাই। অতঃপর সূরার মূল বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে সৃষ্টির হাল-অবস্থা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণ আনা হয়েছে। স্বয়ং মানব-সত্তা, আকাশ, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর শূন্য পরিমণ্ডলে উড়ন্ত পক্ষীকুলের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ—অর্থাৎ তারা কি পক্ষীকুলকে মাথার উপর উড়তে দেখে না, যারা কখনও পাখা বিস্তার করে এবং কখনও সংকুচিত করে। এদের ব্যাপারে চিন্তা কর, এরা ভারী দেহবিশিষ্ট। সাধারণ নিয়মদৃষ্টে ভারী বস্তু উপরে ছাড়া হলে তা মাটিতে পড়ে যাওয়া উচিত। বায়ু সাধারণভাবে তা আটকাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পক্ষীকুলকে বায়ুমণ্ডলে স্থির থাকার মত করে সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে ভর দেওয়া এবং তাতে সন্তরণ করে বিচরণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পাখা বিস্তার ও সংকোচনের মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বায়ুর মধ্যে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করা যেরূপ পাখা তৈরী করা এবং পাখার মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়া—এগুলো সব আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিরই ফলশ্রুতি।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির হাল-অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, তওহীদ এবং নজীরবিহীন জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো নিয়ে সামান্যও চিন্তা-ভাবনা করে, তার জন্য আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত কাফির ও পাপাচারীদেরকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। প্রথমে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করতে চান, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি তার গতিরোধ করতে পারে না। তোমাদের সেনাবাহিনী, সিপাই-সান্ত্রী তোমাদেরকে সেই আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ—এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং ভূমি থেকে শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার যে রিযিক পাচ্ছ, এটা তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়; বরং আল্লাহ্র দান ও বখশিস। তিনি তা বন্ধও করে দিতে পারেন। اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর কাফিরদের জন্য পরিতাপ করা হয়েছে, যারা নিজেরাও

আল্লাহ্র নির্দেশাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং বর্ণনাকারীর বর্ণনাও শুনে না।

بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ —অর্থাৎ তারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় বেড়েই চলেছে।

অতঃপর কিয়ামতের মাঠে কাফির ও মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের মাঠে কাফিররা উপুড় হয়ে মস্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন—কাফিররা মুখে ভর দিয়ে কিরূপে চলবে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন: যে আল্লাহ্ তাদেরকে পায়ে ভর দিয়ে চালনা করেছেন, তিনি কি মুখমণ্ডল ও মস্তকের উপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? নিম্নোক্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে:

أَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ أَهْدٰىٓ أَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ —অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখমণ্ডলে ভর দিয়ে চলে, সে বেশী হিদায়তপ্রাপ্ত, না যে সোজা চলে? শেষোক্ত ব্যক্তিই মু'মিন। সে-ই হিদায়ত পেতে পারে। অতঃপর আবার মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও জ্ঞানের কতিপয় বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে:

قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ —অর্থাৎ আপনি বলুন, আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর বানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরের বৈশিষ্ট্য: আয়াতে মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে তিনটি অঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর উপর জ্ঞান, অনুভূতি ও চেতনা নির্ভরশীল। দার্শনিকগণ জ্ঞান ও অনুভূতির পাঁচটি উপায় বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। এগুলো হচ্ছে শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ। ঘ্রাণের জন্য নাক আস্বাদনের জন্য জিহ্বা তৈরী করা হয়েছে এবং স্পর্শশক্তি সমস্ত দেহে নিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শ্রবণ করার জন্য কর্ণ এবং দেখার জন্য চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করেছেন—কর্ণ ও চক্ষু। কারণ এই যে, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শের মাধ্যমে খুব কম বিষয়ের জ্ঞান মানুষ অর্জন করতে পারে। মানুষের জানা বিষয়সমূহের বিরাট অংশ শ্রবণ ও দর্শনের মধ্যে সীমিত। এতদুভয়ের মধ্যেও শ্রবণকে অগ্রে আনা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মানুষ সারাজীবনে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে শোনা বিষয়সমূহের সংখ্যা দেখা বিষয়সমূহের তুলনায় বহুগুণ বেশী। অতএব, মানুষের অধিকাংশ জানা বিষয় এই দুই পথে অর্জিত হয় বিধান এখানে

শক ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বস্তু অন্তর হচ্ছে আসল ভিত্তি ও জ্ঞানের কেন্দ্র। কানে শোনা ও চোখে দেখা বিষয়সমূহের জ্ঞানও অন্তরের উপর নির্ভরশীল। অন্তর যে জ্ঞানের কেন্দ্র এর পক্ষে কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয়। এর বিপরীতে দার্শনিকগণ ম[illegible]ককে জ্ঞানের কেন্দ্র মনে করেন।

এরপর আবার কাফিরদের প্রতি হুঁশিয়ারী ও শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে : : তোমরা যারা পৃথিবীতে বসবাস কর, ভূপৃষ্ঠকে খনন করে কূপ তৈরী কর এবং সেই পানি দ্বারা নিজেদের পান ও শস্য উৎপাদনের কাজ কর, তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, এগুলো তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়, আল্লাহ্র দান। তিনিই পানি বর্ষণ করেছেন এবং সেই পানিকে বরফের সাগরে পরিণত করে পঁচন রোধ করার জন্য পর্বতশৃঙ্গে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর এই বরফকে আস্তে আস্তে গলিয়ে পর্বতের শিরা-উপশিরার পথে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে নামিয়ে দিয়েছেন। এরপর কোন পাইপলাইনের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই পানিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা যেখা ইচ্ছা মাটি খনন করে পানি বের করতে পার। তিনি এই পানি মৃত্তিকার উপরের স্তরেই রেখে দিয়েছেন যা কয়েক ফুট মাটি খনন করেই বের করা যায়। এটা স্রষ্টার দান। তিনি ইচ্ছা করলে একে নিম্নের স্তরে তোমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ -

অর্থাৎ তারা ভেবে দেখুক, তারা যে পানি কূপের মাধ্যমে অনায়াসে বের করে পান করছে, তা যদি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কোন্ শক্তি পানির এই স্রোতধারাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? হাদীসে আছে, এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর বলা উচিত الله رب العالمين অর্থাৎ বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই পুনরায় এই পানি আনতে পারেন— আমাদের শক্তি নেই।

سورة القلم

সূরা কালাম

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَآ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ وَإِنَّ
لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ فَسَتُبْصِرُ
وَيُبْصِرُونَ ۝ بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهٖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۝ وَدُّوا لَوْ
تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۝ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ
بِنَمِيمٍ ۝ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيمٍ ۝
أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِينَ ۝ إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝
سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُومِ ۝ إِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ
إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۝ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ۝ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ
مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ۝ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۝ فَتَنَادَوْا
مُصْبِحِينَ ۝ أَنِ اغْدُوا عَلٰى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِينَ ۝
فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ۝ أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِينٌ ۝
وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا إِنَّا لَضَآلُّونَ ۝ بَلْ
نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۝

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

يَّتَلَاوَمُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝ عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَ

لَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ۝ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ

رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۝

مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝ اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ۝ اِنَّ لَكُمْ

فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ۝ اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ

اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ۝ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ۝ اَمْ لَهُمْ

شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝ يَوْمَ يُكْشَفُ

عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝ خَاشِعَةً

اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ

سٰلِمُوْنَ ۝ فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ

مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ

اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ

مَكْظُوْمٌ ۝ لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ

مَذْمُوْمٌ ۝ فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ

لَمَجْنُونٌ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۞

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নূন—শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে, (২) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন। (৩) আপনার জন্য অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৪) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (৫) সত্বরই আপনি দেখে নেবেন এবং তারাও দেখে নেবে। (৬) কে তোমাদের মধ্যে বিকারগ্রস্ত। (৭) আপনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎপথপ্রাপ্ত। (৮) অতএব, আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। (৯) তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। (১০) যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না, (১১) যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে, (১২) যে ভাল কাজে বাধা দেয়, যে সীমালংঘন করে, যে পাপিষ্ঠ, (১৩) কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত; (১৪) এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (১৫) তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে : সেকালের উপকথা। (১৬) আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দেব। (১৭) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, (১৮) 'ইনশাআল্লাহ্' না বলে। (১৯) অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিদ্রিত ছিল। (২০) ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণসম। (২১) সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, (২২) তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (২৩) অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে, (২৪) অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। (২৫) তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হল। (২৬) অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বলল : আমরা তো পথ ভুলে গেছি। (২৭) বরং আমরা তো কপালপোড়া। (২৮) তাদের উত্তম ব্যক্তি বলল : আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছ না কেন? (২৯) তারা বলল : আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। (৩০) অতঃপর তারা একে অপরকে ভৎর্সনা করতে লাগল। (৩১) তারা বলল : হায়! দুর্ভোগ আমাদের, আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী। (৩২) সম্ভবত আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দেবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী। (৩৩) শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর; যদি তারা জানত! (৩৪) মুত্তাকীদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জান্নাত। (৩৫) আমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব? (৩৬) তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? (৩৭) তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, যা তোমরা পাঠ কর— (৩৮) তাতে তোমরা যা পছন্দ কর, তাই পাও? (৩৯) না তোমরা আমার কাছ থেকে

কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কোন শপথ নিয়েছ যে, তোমরা তাই পাবে যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? (৪০) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন—তাদের কে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল? (৪১) না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়। (৪২) গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হবে, অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। (৪৩) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হত। (৪৪) অতএব যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না। (৪৫) আমি তাদেরকে সময় দিই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবুত। (৪৬) আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়েছে? (৪৭) না তাদের কাছে গায়েবের খবর আছে? অতঃপর তারা তা লিপিবদ্ধ করে। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল। (৪৯) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তবে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত। (৫০) অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। (৫১) কাফিররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলেঃ সে তো একজন পাগল। (৫২) অথচ এই কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ বৈ নয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নূন—(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। শপথ কলমের (যদ্দারা লওহে মাহ্ফুযে সৃষ্টির ভাগ্য লিখা হয়েছে) এবং (শপথ) তাদের (ফেরেশতাদের) লিখার [যারা আমলনামা লিখে—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ তফসীরই করেছেন], আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি উন্মাদ নন (যেমন কাফিররা তাই বলে। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি সত্য নবী। এই দাবীর পক্ষে শপথগুলো খুবই উপযুক্ত। কেননা, কোরআন অবতরণও ভাগ্যলিপির অংশ-বিশেষ। সুতরাং আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, আপনার নবুয়ত আল্লাহ্‌র জ্ঞানে পূর্ব থেকেই অবধারিত। কাজেই এটা নিশ্চিত সত্য। যারা এই সত্যকে স্বীকার করে এবং যারা অস্বীকার করে, তাদের আমলনামা ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করছে। সুতরাং অস্বীকারের কারণে শাস্তি হবে। এই শাস্তিকে ভয় করে ঈমান আনা ওয়াজিব)। নিশ্চয়ই আপনার জন্য (এই প্রচারকার্যের জন্য) রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (এতেও নবুয়তের উপর জোর দিয়ে শত্রুদের বিদ্রূপ উপেক্ষা করতে বলা হয়েছে এবং সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কিছুকাল সবর করুন, এর পরিণাম মহাপুরস্কার লাভ)। আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী (আপনার প্রত্যেকটি কাজ সমতাগুণে গুণান্বিত এবং মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিমণ্ডিত। উন্মাদ ব্যক্তি কি পূর্ণ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে? এটাও পূর্বোক্ত দোষারোপের জওয়াব।

অতঃপর সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা যে বাজে প্রলাপোক্তি করে আপনি এজন্য দুঃখ করবেন না। কেননা) সত্বরই আপনি দেখে নেবেন এবং তারাও দেখে নেবে যে, কে (সত্যিকার) পাগল ছিল? (অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাওয়াই পাগলামীর স্বরূপ। জ্ঞানবুদ্ধির লক্ষ্য হচ্ছে লাভ-লোকসান অনুধাবন করা এবং চিরন্তন লোকসানই প্রকৃত লোকসান। সুতরাং কিয়ামতে তারাও জানতে পারবে যে, সত্যের অনুগামীরাই বুদ্ধিমান ছিল, যারা এই লাভ অর্জন করেছে পরন্তু তারাই পাগল ছিল, যারা এই লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে চিরন্তন লোকসানকে বরণ করে নিয়েছে)। আপনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎপথপ্রাপ্ত। (তাই প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। প্রতিদান ও শাস্তির যৌক্তিকতা তখন তারাও বুঝে নেবে যখন বুদ্ধিমান ও পাগলের কে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। যখন আপনি সত্যের উপর ও তারা মিথ্যার উপর আছে, তখন) আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। (যেমন এ পর্যন্ত করেন নি। পরবর্তী আয়াতে তাদের আনুগত্যের বিষয়বস্তু জানা যায়। অর্থাৎ) তারা চায় যদি আপনি (নাউযুবিল্লাহ্ স্বীয় কর্তব্য কর্মে অর্থাৎ ধর্ম প্রচারে) নমনীয় হন তবে তারাও নমনীয় হবে। [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নমনীয় হওয়ার অর্থ প্রতিমাপূজার নিন্দা না করা এবং তাদের নমনীয় হওয়ার অর্থ ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ না করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই তফসীরই বর্ণনা করেছেন]। আপনি (বিশেষভাবে) এরূপ ব্যক্তির আনুগত্য করবেন না, যে কথায় কথায় শপথ করে, (উদ্দেশ্য মিথ্যা শপথকারী। অধিকাংশে মিথ্যাবাদীই কথায় কথায় শপথ করে এবং স্বীয় কুকাণ্ডের কারণে আল্লাহ্র কাছে ও মানুষের কাছে) যে লাঞ্ছিত, (অন্তরে ব্যথা দেওয়ার জন্য) যে বিদ্রূপকারী, যে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে, যে ভাল কাজে বাধা দান করে, যে (সমস্তার) সীমালংঘন করে, যে পাপিষ্ঠ, কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। [অর্থাৎ জারজ সন্তান। সারকথা এই যে, প্রথমত মিথ্যারোপকারীদের, অতঃপর বিশেষভাবে মিথ্যারোপকারীরা যদি উপরোক্ত মন্দ বিশেষণে বিশেষিত হয়, তবে তাদের আনুগত্য করবেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কতিপয় প্রধান মিথ্যারোপকারী এরূপই ছিল এবং উপরোক্ত নমনীয়তার প্রস্তাবে শরীক বরং এর উদগাতা ছিল। মোটকথা, আপনি তাদের আনুগত্য করবেন না এবং তাও কেবল] এ কারণে যে, সে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (অর্থাৎ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী। তার আনুগত্য করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, তার অভ্যাস হচ্ছে) যখন আমার আয়াতসমূহ তার কাছে পাঠ করা হয়, তখন সে বলে: সেকালের উপকথা। (অর্থাৎ আয়াতসমূহের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব মিথ্যারোপ করাই নিষেধ করার আসল কারণ। তবে এই নিষেধাজ্ঞাকে জোরদার করার জন্য আরও কতিপয় বদঅভ্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এরূপ ব্যক্তির শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে) আমি নাসিকা দাগিয়ে দেব (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল ও নাকের উপর কুফরের কারণে অপমান ও পরিচয়ের আলামত লাগিয়ে দেব। ফলে সে খুব লাঞ্ছিত হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে)। অতঃপর মক্কার লোকদেরকে একটি কাহিনী শুনিয়ে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। আমি (মক্কার লোকদেরকে ভোগসামগ্রী দিয়ে রেখেছি, যদ্দরুন তাদের স্পর্ধার অন্ত নেই। এতে করে আমি) তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, (যে, তারা নিয়ামতের শোকর করে ঈমান আনে, না অকৃতজ্ঞ হয়ে কুফর করে) যেমন (তাদের

পূর্ব নিয়ামত দিয়ে) পরীক্ষা করেছিলাম বাগানওয়ালাদেরকে [হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই বাগান আবিসিনিয়ায় ছিল, সায়ীদ ইবনে যুবায়র (র) বলেন, ইয়ামেনে ছিল। মক্কাবাসীদের মধ্যে এই ঘটনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। এই বাগানের মালিকদের পিতা তার আমলে বাগানের আমদানীর সিংহভাগ গরীব-মিসকীনদের জন্য ব্যয় করত। তার মৃত্যুর পর ছেলেরা বলল : আমাদের পিতা নির্বোধ ছিল। তাই আমদানীর বিরাট অংশ মিসকীনকে দান করে দিত। সম্পূর্ণ আমদানী আমাদের হাতে থাকলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অন্ত থাকবে না। সেমতে আয়াতে তাদের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এই ঘটনা তখন সংঘটিত হয়েছিল) যখন তারা (অর্থাৎ অধিকাংশ অথবা কতক যেমন قَالَ أَوْسَطُهُمْ বলা হয়েছে) পরস্পরে শপথ করেছিল যে, তারা অবশ্যই সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে এবং (এতদূর আস্থা ছিল যে) তারা ইনশাআল্লাহ্-ও বলল না। অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানের উপর এক বিপদ এসে পতিত হল (সেটা ছিল এক অগ্নি—নির্ভেজাল অথবা বায়ু মিশ্রিত) এবং তারা ছিল নিদ্রিত। ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল যেমন কর্তিত ক্ষেত। (অর্থাৎ ফসল থেকে সম্পূর্ণ খালি। কিন্তু তারা এই বিপদ সম্পর্কে কিছুই জানত না)। অতঃপর সকালে (ঘুম থেকে উঠে) তারা একে অপরকে ডেকে বলল : তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (ক্ষেত রূপক অর্থে বলা হয়েছে, অথবা তাতে কাণ্ডহীন উদ্ভিদ যেমন আঙুর ইত্যাদিও ছিল, অথবা বাগানের সংলগ্ন ক্ষেতও ছিল)। অতঃপর তারা পরস্পরে চুপিসারে কথা বলতে বলতে চলল যে, অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। তারা (স্বস্থানে) নিজেদেরকে না দিতে সক্ষম মনে করে যাত্রা করল (যে সব ফল বাড়ীতে নিয়ে আসবে এবং কাউকে দেবে না)। অতঃপর যখন তারা (সেখানে পৌঁছল এবং) বাগানকে (তদবস্থায়) দেখল তখন বলল : নিশ্চয় আমরা পথ ভুলে গেছি (এবং অন্যত্র চলে এসেছি ; কারণ এখানে তো বাগান বলতে কিছু নেই। এরপর যখন তারা চতুঃসীমা দেখে বিশ্বাস করল যে, এটাই সেই জায়গা, তখন বলল : আমরা পথ ভুলিনি ;) বরং আমরা কপালপোড়া (তাই বাগানের এই দশা হয়েছে)। তাদের মধ্যে যে (কিছুটা) ভাল লোক ছিল, সে বলল : আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম (যে, এরূপ নিয়ত করো না। মিসকীনদেরকে দিলে বরকত হয়। এরূপ কথা বলার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে 'ভাল লোক' বলেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে-ও মনে মনে এটা অপছন্দ করা সত্ত্বেও সবার সাথে শরীক ছিল। তাই আমি 'কিছুটা' শব্দটি যোগ করে দিয়েছি। অতঃপর প্রথম কথা স্মরণ করিয়ে লোকটি বলল :) এখনও তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছ না কেন? (যাতে পাপ মার্জনা করা হয় এবং আরও বেশী বিপদ না আসে)। তারা (তওবাস্বরূপ) বলল : আমাদের পালনকর্তা পবিত্র। (এটা তসবীহ্)। নিশ্চিতই আমরা দোষী। (এটা ইস্তেগফার)। অতঃপর তারা একে অপরকে ভৎসনা করতে লাগল। (কাজ নষ্ট হলে অধিকাংশ লোকের অভ্যাস এই যে, তারা একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করে। অতঃপর তারা সবাই একমত হয়ে) বলল : নিশ্চয়ই আমরা (সবাই) সীমালংঘনকারী ছিলাম। (একা কারও দোষ ছিল না। কাজেই একে অপরকে দোষারোপ করা অনর্থক। সবাই মিলে তওবা করা দরকার)। সম্ভবত (তওবার বরকতে) আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে

উত্তম বাগান আমাদেরকে দেবেন। (এখন) আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরছি [অর্থাৎ তওবা করছি। পরিবর্তে উত্তম বাগান দুনিয়াতেও হতে পারে, পরকালেও হতে পারে। বাহ্যত বোঝা যায় যে, বাগানের মালিকরা মু'মিন গোনাহ্গার ছিল। এই বাগানের বিনিময়ে দুনিয়াতে তারা কোন বাগান পেয়েছিল কিনা, তা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়নি। তবে রূহুল মা'আনীতে হযরত ইবনে মসউদ (রা)-এর অসমর্থিত উক্তি লিখিত আছে যে, তাদেরকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাগান দান করা হয়েছিল। অতঃপর কাহিনীর নির্যাস বর্ণনা করা হয়েছে :) শাস্তি এভাবেই আসে। (অর্থাৎ হে মক্কাবাসীরা, তোমরাও এরূপ বরং এর চাইতে বেশী শাস্তির যোগ্য। কেননা এই শাস্তি ছিল গোনাহের কারণে আর তোমরা কেবল গোনাহ্গার নও—কাফিরও) পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর। যদি তারা জানত (তবে ঈমান আনত। অতঃপর কাফিরদের মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলত : لَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে। আমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অবাধ্যদের ন্যায় গণ্য করব? (অর্থাৎ কাফিররা মুক্তি পেলে বাধ্য ও অবাধ্যদের মধ্যে কি পার্থক্য বাকী থাকবে, যদ্দ্বারা বাধ্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে? অন্য আয়াতে আছে : اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ) তোমাদের কি হল, তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? তোমাদের কাছে কি কোন (ঐশী) কিতাব আছে, যাতে তোমরা পাঠ কর যে, তোমরা যা পছন্দ কর, তাই তোমরা পাবে? (অর্থাৎ সেই কিতাবে লিখিত আছে যে, তোমরা পরকালে নিয়ামত পাবে)? না আমার দায়িত্বে তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কোন শপথ লিখিত আছে (যার বিষয়বস্তু এই) যে, তোমরা তাই পাবে, যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? (অর্থাৎ সওয়াব ও জান্নাত) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, এ বিষয়ে কে তাদের দায়িত্বশীল? না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে, (যে তাদেরকে সওয়াব দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছে)? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয় (মোটকথা, এই বিষয়বস্তু কোন ঐশী কিতাবে নেই এবং অন্যান্য পন্থায়ও আমার শপথের অনুরূপ কোন ওয়াদা নেই, এমতাবস্থায় তারা কেউ অথবা তাদের কোন শরীক উপাস্য এ বিষয়ে দায়িত্ব নিতে পারে না। অতএব কিসের ভিত্তিতে দাবী করা হয়? অতঃপর কিয়ামতে তাদের লাঞ্ছনার কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই দিন স্মরণীয়) সেদিন গোছার জ্যোতি প্রকাশ করা হবে এবং সিজদা করতে আহ্বান করা হবে। (বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এর ঘটনা এরূপ বর্ণিত আছে : কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় গোছা প্রকাশ করবেন। এটা আল্লাহ্‌র বিশেষ কোন গুণ, যাকে কোন মিলের কারণে গোছা বলা হয়েছে। কোরআনে এর অনুরূপ আল্লাহ্‌র হাতের কথা আছে। এগুলোকে مُتَشَابِهَات রূপে অভিহিত করা হয়। এই হাদীসেই আছে, এই তাজাল্লী দেখে মু'মিন নর-নারী সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়াতে লোক দেখানো সিজদা করত, তার কোমর তক্তার ন্যায় সোজা থেকে যাবে—সে সিজদা করতে সক্ষম হবে না।

এখানে সিজদা করতে আহ্বান জানানোর অর্থ সিজদার আদেশ করা নয়, বরং এই তাজাল্লীর প্রভাবে সকলেই বাধ্য হয়ে সিজদা করতে চাইবে। তাদের মধ্যে মু'মিনগণ তা করতে সক্ষম হবে এবং লোক দেখানো ইবাদতকারীরা ও কপট বিশ্বাসীরা সক্ষম হবে না। সুতরাং কাফির-রা যে সক্ষম হবে না, তা বলাই বাহুল্য। কাফিররাও সিজদা করতে চাইবে। অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি (লজ্জাবশত) অবনত থাকবে এবং তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে। (এর কারণ এই যে) তারা (দুনিয়াতে) যখন সহী সালামতে ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হত। [অর্থাৎ ঈমান এনে ইবাদত করতে বলা হত। ঈমান ও ইবাদত ইচ্ছাধীন কাজ। দুনিয়াতে এই আদেশ পালন না করার কারণে আজ কিয়ামতে তাদের এই লাঞ্ছনা হয়েছে। অন্য আয়াতে দৃষ্টি উপরে উত্থিত থাকার কথা আছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, মাঝে মাঝে বিস্ময়ের আতিশয্যে দৃষ্টি উপরে থাকবে এবং মাঝে মাঝে লজ্জার আতিশয্যে দৃষ্টি অবনত থাকবে। আযাবে বিলম্বকে কাফিররা তাদের প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রমাণ মনে করত। অতঃপর তাদের এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উপরের আয়াত থেকে যখন জানা গেল যে, তারা আযাবের যোগ্য, তখন] যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন (অর্থাৎ আযাবের বিলম্ব দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না)। আমি ক্রমে ক্রমে তাদেরকে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাচ্ছি, তারা টেরও পায় না। আমি (দুনিয়াতে তাদেরকে আযাব না দিয়ে) তাদেরকে সময় দিই। নিশ্চয় আমার কৌশল বলিষ্ঠ। (অতঃপর তারা যে নবুয়ত অস্বীকার করে, সেজন্য বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে) আপনি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চান? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা চেপেছে (তাই আপনার আনুগত্য করতে চাইছে না)। না তাদের কাছে গায়েবের খবর আছে, অতঃপর তারা তা (সংরক্ষিত রাখার জন্য) লিপিবদ্ধ করছে? (অর্থাৎ তারা কি আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ অন্য কোন পন্থায় জেনে নেয়, যদ্দরুন পয়গম্বরের মুখাপেক্ষী নয়। বলা বাহুল্য উভয় বিষয় নেই। এমতাবস্থায় নবুয়ত অস্বীকার করা বিস্ময়কর ব্যাপার। অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। যখন জানা গেল যে, তারা কাফির, আযাবের যোগ্য এবং ঢিলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সময় দেওয়া হচ্ছে। প্রতিশ্রুত সময়ে অবশ্যই আযাব হবে, তখন) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং (বিষণ্ণ মনে) মাছওয়ালা (ইউনুস পয়গম্বর)-এর মত হবেন না [যে আযাব নাযিল না হওয়ার কারণে বিষণ্ণ মনে কোথাও চলে গিয়েছিল। একাধিক জায়গায় এই ঘটনা আংশিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ইউনুস (আ)-এর সাথে তুলনায় বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে। এখন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছেঃ সেই সময়টি স্মরণীয়] যখন ইউনুস (আ) দুঃখাকুল মনে দোয়া করেছিল। [এই দুঃখ ছিল একাধিক দুঃখের সমষ্টি—এক. সম্প্রদায়ের ঈমান না আনার, দুই. আযাব টলে যাওয়ার, তিন. আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতিরেকে স্থানান্তরে গমন করার, এবং চার. মাছের পেটে আবদ্ধ হওয়ার। দোয়া ছিল এইঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي

كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ —এর উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমা ও আটকাবস্থা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করা। সে মতে আল্লাহ্র অনুগ্রহে ইউনুস (আ) মাছের পেট থেকে মুক্তিলাভ করেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তবে সে (যে প্রান্তরে মাছের পেটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সেই) জনশূন্য প্রান্তরে নিন্দিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হত। (সামাল দেওয়ার অর্থ তওবা কবুল করা এবং নিন্দিত অবস্থার অর্থ তার ইজতিহাদী ভুলের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সে নিন্দিত হয়েছিল। এই আয়াত এবং সূরা সাফফাতের আয়াতের সারমর্ম এই যে, তওবা কবুল না হলে মাছের পেট থেকে মুক্তি সম্ভবপর ছিল না। যদি তওবা করত এবং আল্লাহ্ তা'আলা কবুল না করতেন, তবে তওবার পার্থিব বরকতস্বরূপ মাছের পেট থেকে মুক্তি তো হয়ে যেত, কিন্তু প্রান্তরে যে ভাবে পূর্বে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, মুক্তির পরও সেভাবে নিক্ষিপ্ত হত এবং তা নিন্দিত অবস্থায় হত। কিন্তু এখন নিন্দিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়নি। কারণ তওবা কবুলের পর ভুলের কারণে নিন্দা করা হয় না)। অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে (আরও বেশি) মনোনীত করলেন এবং তাকে (অধিক) সৎ কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। [পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, ইজতিহাদ অনুযায়ী কাজ করার কারণে ইউনুসের ক্ষতি হয়েছে এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করার কারণে উপকার হয়েছে। অতএব, আযাবের ব্যাপারে আপনিও নিজের মতানুসারে তাড়াহুড়া করবেন না, বরং আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। এর পরিণাম শুভ হবে। কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাগল বলত। সূরার শুরুতে এক ভঙ্গিতে তা খণ্ডন করা হয়েছে। এখন ভিন্ন ভঙ্গিতে তা খণ্ডন করা হচ্ছেঃ] কাফিররা যখন কোরআন শুনে, তখন (শত্রুতার আতিশয্যে) এমন মনে হয় যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে (এটা একটা বিশেষ বাকপদ্ধতি, যেমন বলা হয়ঃ অমুক ব্যক্তি এমন দৃষ্টিতে দেখে যেন খেয়ে ফেলবে। রূহুল মা'আনীতে আছেঃ نظر الى نظر يكاد يصرعنى او يكاد يا كلنى উদ্দেশ্য এই যে, ক্রোধের আতিশয্যে তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনিষ্টের দৃষ্টিতে দেখে এবং (শত্রুতাবশত তাঁর সম্পর্কে) তারা বলেঃ সে তো একজন পাগল (নাউযুবিল্লাহ্) অথচ এই কোরআন তো (যা আপনি পাঠ করেন) বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (পাগল ব্যক্তি এমন ব্যাপক উপদেশের কথাবার্তা বলতে পারে না। এতে তাদের দোষারোপের জওয়াব হয়ে গেছে। শত্রুতাবশত বলে এ কথাটি যুক্ত হওয়ার কারণেও প্রমাণিত হয় যে, তাদের দোষারোপের ভিত্তি দুর্বল। কেননা, শত্রুতার আতিশয্যে যে কথা বলা হয়, তা ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুলকে সৃষ্ট জগতের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণাদি বিবৃত হয়েছে। সূরা কলমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কাফিরদের দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। তাদের সর্বপ্রথম দোষারোপ ছিল এই যে, তারা

আল্লাহ্ প্রেরিত পূর্ণ বুদ্ধিমান, পূর্ণ জ্ঞানী ও সর্বগুণে গুণান্বিত রসূলকে (নাউযুবিল্লাহ্) উন্মাদ ও পাগল বলত। এর কারণ হয় এই ছিল যে, ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ ওহীর সময় তার প্রতিক্রিয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র অঙ্গে ফুটে উঠত। এরপর তিনি ওহী থেকে প্রাপ্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাতেন। এই গোটা ব্যাপারটি কাফিরদের জ্ঞানও অনুভূতির ঊর্ধ্বে ছিল। তাই তারা একে পাগলামি আখ্যা দিত। না হয় এর কারণ ছিল এই যে, তিনি স্বজাতি ও সারা বিশ্বে বিদ্যমান ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে এই দাবী করেন যে, আরাধনার যোগ্য আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই। তারা যেসব স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে খোদা মনে করত, সেগুলো যে জ্ঞান ও চেতনা থেকে মুক্ত এবং কারও উপকার বা ক্ষতি করতে অক্ষম, একথা তিনি প্রকাশ্যে বর্ণনা করেন। এই নতুন ধর্মবিশ্বাসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন সাথী ছিল না। তিনি একাই এই দাবী নিয়ে আত্মরক্ষার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই সারা বিশ্বের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে যান। বাহ্য দর্শীদের দৃষ্টিতে এই উদ্দেশ্যে সাফল্য প্রাপ্ত করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই এরূপ দাবী নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়াকে পাগলামী মনে করা হয়েছে। এছাড়া দোষারোপের উদ্দেশ্যেও তো দোষারোপ হতে পারে। এমতাবস্থায় কোন কারণ ছাড়াই কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাগল বলত। সূরার প্রথম আয়াতসমূহে তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা শপথ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ — নূন অক্ষরটি একটি খণ্ড বর্ণ। কোরআন পাকের অনেক সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের খণ্ড বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ ও রসূল ব্যতীত এগুলোর অর্থ কারও জানা নেই। এ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে উম্মতকে নিষেধ করা হয়েছে।

কলমের অর্থ এবং কলমের ফযীলত : এখানে কলমের অর্থ সাধারণ কলমও হতে পারে। এতে ভাগ্যলিপির কলম এবং ফেরেশতা ও মানবের লেখার কলম দাখিল আছে। এখানে বিশেষত ভাগ্যলিপির কলমও বোঝানো যেতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি তাই। এই বিশেষ কলম সম্পর্কে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার আদেশ করেন। কলম আরয করল : কি লিখব? তখন আল্লাহ্‌র তকদীর লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করা হল। কলম আদেশ অনুযায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির তকদীর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিলেন।

হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন : কলম আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি বড় নিয়ামত। কেউ কেউ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম তকদীরের কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টির তকদীর লিপিবদ্ধ করেছে। এরপর দ্বিতীয় কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম দ্বারা পৃথিবীর অধিবাসীরা লেখে এবং লেখবে। সূরা ইকরার عَلَّمَ بِالْقَلَمِ আয়াতে এই কলমের উল্লেখ আছে।

আয়াতে কলম বলে যদি সর্বপ্রথম সৃষ্টি তকদীরের কলম উদ্দেশ্য হয়, তবে এর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কাজেই এর শপথ করা উপযুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি তকদীরের কলম, ফেরেশতাদের কলম ও মানুষের কলমসহ সাধারণ কলম উদ্দেশ্য হয়, তবে এর শপথ করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে বড় বড় কাজ কলমের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। দেশ বিজয়ে তরবারির চাইতে কলম যে অধিক কার্যকর হাতিয়ার, এ কথা সর্বজনবিদিত। আবূ হাতেম বস্তী (র) এই বিষয়বস্তুই দুটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন :

اذا اقسم الابطال يوما بسيفهم
وعدوه مما يكسب المجد والكرم
كفى قلم الكتاب عزا ورفعة
مدى الدهر ان الله اقسم بالقلم

অর্থাৎ যদি বীর পুরুষরা কোনদিন তাদের তরবারির শপথ করে এবং একে সম্মান ও গৌরবের কারণ মনে করে, তবে লেখকদের কলম ও তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব চিরতরে বৃদ্ধি করার জন্য যথেষ্ট। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কলমের শপথ করেছেন।

সারকথা, আয়াতে কলম এবং কলম দ্বারা যা কিছু লেখা হয়, তার শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের দোষারোপ খণ্ডন করে বলেছেন : مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ অর্থাৎ আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ ও কৃপায় কখনও পাগল নন।

এখানে بِنِعْمَةِ رَبِّكَ যোগ করে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেওয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, সে কিরূপে পাগল হতে পারে? তাকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল।

আলিমগণ বলেন : কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তুর শপথ করেন, তা শপথের বিষয়বস্তুর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়ে থাকে। এখানে مَا يَسْطُرُونَ বলে বিশ্ব-ইতিহাসের যা কিছু লেখা হয়েছে এবং লেখা হচ্ছে, তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্ব-ইতিহাসের পাতা খুলে দেখ, এমন মহান চরিত্র ও কর্মের অধিকারী ব্যক্তি পাগল হতে পারে কি? এরূপ ব্যক্তি তো অপরের জ্ঞান-বুদ্ধির সংস্কারক হয়ে থাকে। অতঃপর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর সমর্থনে বলা হয়েছে :

إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ — অর্থাৎ আপনার জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, আপনার যে কাজকে তারা পাগলামি বলছে, সেটা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয় কাজ। এর জন্য আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারও এমন, যা কখনও নিঃশেষ হবে না—চিরন্তন। জিজ্ঞাসা করি, কোন পাগলকে তার কর্মের জন্য পুরস্কৃত করা হয় কি? অতঃপর আরেকটি বাক্য দ্বারা এই বিষয়বস্তুর আরও সমর্থন করা হয়েছে :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ—এতে রসূলে করীম (সা)-র উত্তম চরিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে : জ্ঞানপাপীরা, তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ, দুনিয়াতে যারা পাগল ও উম্মাদ, তাদের চরিত্র ও কর্ম কি এরূপ হয়ে থাকে?

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মহৎ চরিত্র : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ ধর্ম। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন ধর্ম নেই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : স্বয়ং কোরআন রসূলে করীম (সা)-এর মহৎ চরিত্র অর্থাৎ কোরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। হযরত আলী (রা) বলেন : মহৎ চরিত্র বলে কোরআনের শিষ্টাচার বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ যেসব শিষ্টাচার কোরআন শিক্ষা দিয়েছে। সব উক্তির সারমর্ম প্রায় এক। রসূলে করীম (সা)-এর সত্তায় আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় উত্তম চরিত্র পূর্ণ মাত্রায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন : بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ অর্থাৎ আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।—(আবূ হাইয়ান)

হযরত আনাস (রা) বলেন : আমি সুদীর্ঘ দশ বছরকাল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমত করেছি। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি যেসব কাজ করেছি, সে সম্পর্কে তিনি কখনও বলেন নি যে, কাজটি এভাবে কেন করলে, অমুক কাজটি করলে না কেন? অথচ দশ বছর সময়ের মধ্যে অনেক কাজ তাঁর রুচি বিরুদ্ধও হয়ে থাকবে।—(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আনাস (রা) আরও বলেন : তাঁর উত্তম চরিত্রের কথা কি বলব, মদীনার কোন বাঁদীও তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত।—(বুখারী)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও স্বহস্তে কাউকে প্রহার করেন নি। তবে জিহাদের ময়দানে কাফিরদেরকে আঘাত করা ও হত্যা করা প্রমাণিত আছে। এছাড়া তিনি কোন খাদিমকে অথবা স্ত্রীকে প্রহার করেন নি। তাদের মধ্যে কারও কোন ভুলভ্রান্তি হলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে কেউ আল্লাহর আদেশ লংঘন করলে তাকে শরীয়তসম্মত শাস্তি দিয়েছেন।—(মুসলিম)

হযরত জাবের (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সওয়ালের জওয়াবে কখনও 'না' বলেন নি।—(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (সা) অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশ্লীলতার ধারে-কাছেও যেতেন না। তিনি বাজারে হট্টগোল করতেন না এবং মন্দ ব্যবহারের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করতেন না, বরং ক্ষমা ও মার্জনা করে দিতেন। হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন : রসূলে করীম (সা)-এর উক্তি এই যে, আমলের দাঁড়ি-পাল্লায় উত্তম চরিত্রের সমান

কোন আমলের ওজন হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা গালিগালাজকারী মন্দভাষী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

হযরত আয়েশার বাচনিক রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : মুসলমান তার সচ্চরিত্রতার গুণ দ্বারাই সেই ব্যক্তির মর্তবা লাভ করে, যে সারা রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকে এবং সারাদিন রোযা রাখে।—(আবু দাউদ)

হযরত মা'আয (রা) বলেন : (আমাকে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করার সময়) ঘোড়ার জিনের সাথে সংলগ্ন লোহার আংটিতে যখন আমি এক পা রাখলাম তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সর্বশেষ উপদেশ দিয়ে বললেন :

يا معاذ أحسن خلقك للناس —হে মা'আয, জনগণের প্রতি সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করবে।—(মালেক)

এসব রেওয়ায়েত তফসীরে মাযহারী থেকে উদ্ধৃত করা হল।

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ —শীঘ্রই আপনিও দেখে নেবেন এবং কাফিররাও দেখে নেবে যে, কে বিকারগ্রস্ত। مفتون শব্দের অর্থ এ স্থলে বিকারগ্রস্ত—পাগল। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি পাগল বলে দোষারোপকারীদের উক্তি প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছিল। এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই এ তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) পাগল ছিলেন, না যারা তাঁকে পাগল বলত, তারাই পাগল ছিল। সেমতে অল্পদিনের মধ্যেই বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে বিশ্ববাসীর চোখের সামনে এসে যায় এবং পাগল আখ্যাদানকারীদের মধ্য থেকেই হাজার হাজার লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়ে রসূলে করীম (সা)-এর অনুসরণ ও মহব্বতকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতে থাকে। অপরদিকে তওফীক থেকে বঞ্চিত অনেক হতভাগা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে যায়।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ - وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ —অর্থাৎ আপনি মিথ্যারোপকারীদের কথা মানবেন না। তারা তো চায় যে, আপনি প্রচারকার্যে কিছুটা নমনীয় হলে এবং শিরক ও প্রতিমাপূজায় তাদেরকে বাধা না দিলে তারাও নমনীয় হয়ে যাবে এবং আপনার প্রতি বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নির্যাতন ত্যাগ করবে। —(কুরতুবী)

মাস'আলা : এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, 'আমরা তোমাদেরকে কিছু বলব না, তোমরাও আমাদেরকে কিছু বলো না'—কাফির ও পাপাচারীদের সাথে এই মর্মে কোন চুক্তি করা দীনের ব্যাপারে শৈথিল্যের নামান্তর ও হারাম।—(মাযহারী) অর্থাৎ বেগতিক না হলে এরূপ চুক্তি না-জায়েয।

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ —আপনি আনুগত্য করবেন না এমন ব্যক্তির, যে কথায় কথায় শপথ করে, লাঞ্ছিত, যে দোষারোপ করে, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে সৎ কাজে বাধাদান করে, যে সীমালংঘন করে, যে অত্যধিক পাপাচার করে, যে কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। زنيم শব্দের অর্থ পিতৃ-পরিচয়হীন —জারজ। আয়াতে যে ব্যক্তির এসব বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, সে জারজই ছিল।

প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফিরদের আনুগত্য না করার এবং ধর্মের ব্যাপারে কোন-রূপ নমনীয়তা অবলম্বন না করার ব্যাপক আদেশ ছিল। এই আয়াতে বিশেষ করে দুষ্টমতি কাফির ওলীদ ইবনে-মুগীরার কুস্বভাব বর্ণনা করে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ও তার আনুগত্য না করার বিশেষ আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর পরও কয়েক আয়াতে এই ব্যক্তির মন্দ চরিত্র ও অবাধ্যতা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন তার নাসিকা দাগিয়ে দেব। ফলে পূর্ববর্তী সব লোকের সামনে তার লাঞ্ছনা ফুটে উঠবে। خرطوم শব্দটি বিশেষভাবে হাতী অথবা শূকরের শুঁড়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে ওলীদের নাসিকাকে ঘৃণা প্রকাশার্থে خرطوم শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَاۤ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ —অর্থাৎ আমি মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন উদ্যানের মালিকদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। পূর্বের আয়াত-সমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি মক্কাবাসী কাফিরদের দোষারোপের জওয়াব ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা বিগত যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন। মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বর্ণিতব্য কাহিনীতে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতরাজি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, তারা কৃতঘ্নতা করেছিল। ফলে তাদের উপর আযাব পতিত হয়েছিল এবং নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদেরকেও নিয়ামতরাজি দান করেছেন। তাদের সর্ববৃহৎ নিয়ামত তো এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের মধ্যেই পয়দা করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করেছেন এবং তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছেন। এসব নিয়ামত মক্কাবাসীদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আল্লাহ্ দেখতে চান যে, তারা এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিনা এবং আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি না। যদি তারা কুফর ও অবাধ্যতায় অটল থাকে, তবে উদ্যানের মালিকদের কাহিনী থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এই আয়াতগুলোকে মক্কায় অবতীর্ণ মনে করা হলেও এই তফসীর সঠিক। কিন্তু অনেক তফসীরবিদ এই আয়াতগুলোকে

মদীনায় অবতীর্ণ মনে করেন এবং আয়াতে বর্ণিত পরীক্ষার অর্থ করেন দুর্ভিক্ষের আযাব, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বদ-দোয়ার ফলে মক্কাবাসীর উপর আপতিত হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় তারা ক্ষুধার তাড়নায় মৃত জন্তু ও বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা হিজরতের পরবর্তী ঘটনা।

উদ্যানের মালিকদের কাহিনী ঃ হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের ভাষ্য অনুযায়ী এই উদ্যান ইয়ামনে অবস্থিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে যুবায়র-এর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর 'সানআ' থেকে ছয় মাইল দূরে এই উদ্যান অবস্থিত ছিল। কারও কারও মতে এটা আবিসিনিয়ায় ছিল—(ইবনে কাসীর) উদ্যানের মালিকরা ছিল আহলে-কিতাব। ঈসা (আ)-র আকাশে উত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে এই ঘটনা ঘটে।—(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে 'আসহাবুল-জান্নাত' তথা উদ্যানওয়ালা নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু থেকে জানা যায় যে, তাদের মালিকানাধীন কেবল উদ্যানই ছিল না, চাষাবাদের ক্ষেতও ছিল। তবে উদ্যানের প্রসিদ্ধির কারণে উদ্যানওয়ালা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোহাম্মদ ইবনে মারওয়ানের বাচনিক হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এই ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

ইয়ামনের 'সানআ' থেকে ছয় মাইল দূরে 'যরওয়ান' নামক একটি উদ্যান ছিল। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি এই উদ্যানটি তৈরী করেছিলেন। তিনি ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকীর মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। তারা সেখান থেকে খাদ্যশস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনিভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভূষির মধ্যে থেকে যেত, সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এই নিয়ম অনুযায়ী উদ্যানের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করার সময় যেসব ফল নিচে পড়ে যেত, সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এ কারণেই ফসল কাটা ও ফল আহরণের সময় বিপুল সংখ্যক ফকীর-মিসকীন সেখানে সমবেত হত। এই সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যান ও ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল ঃ আমাদের পরিবার-পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফসলের উৎপাদন কম। তাই এখন ফকীর মিসকীনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, পুত্রত্রয় উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ন্যায় বলল ঃ আমাদের পিতা বেওকুফ ছিল। তাই বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য ও ফল মিসকীনদের জন্য রেখে দিত। অতএব আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বন্ধ করে দেওয়া। অতঃপর তাদের কাহিনী স্বয়ং কোরআনের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ—অর্থাৎ তারা পরস্পরে শপথ করে বলল ঃ এবার আমরা সকাল-সকালই যেয়ে ক্ষেতের ফসল কেটে আনব, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের না পায় এবং পেছনে পেছনে না চলে। এই পরিকল্পনায়

প্রতি তাদের এতটুকু দৃঢ় আস্থা ছিল যে, 'ইনশাআল্লাহ্' বলারও প্রয়োজন মনে করল না। আগামীকালের কোন কাজ করার কথা বলার সময় 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল এ কাজ করব' বলা সুন্নত। তারা এই সুন্নতের পরওয়া করল না। কোন কোন তফসীরবিদ لَا يَسْتَثْنُونَ-এর এরূপ অর্থ করেছেন যে, আমরা সম্পূর্ণ খাদ্যশস্য ও ফল নিয়ে আসব এবং ফকীর-মিসকীনদের অংশ বাদ দেব না।—(মাযহারী)

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ—অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এই ক্ষেতে ও উদ্যানে এক বিপদ হানা দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, একটি অগ্নি এসে সমস্ত তৈরী ফসলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। وَهُمْ نَائِمُونَ—অর্থাৎ এই আযাব রাত্রিবেলায় তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তারা সবাই নিদ্রামগ্ন।

كَالصَّرِيمِ—صرم শব্দের অর্থ ফল ইত্যাদি কর্তন করা। صريم—এর অর্থ কর্তিত। উদ্দেশ্য এই যে, ফসল কেটে নেওয়ার পর ক্ষেত যেমন সাফ ময়দান হয়ে যায়, অগ্নি এসে ক্ষেতকে সেইরূপ করে দিল। صريم-এর অর্থ কালো রাত্রিও হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, ফসলও কালো রাত্রির ন্যায় কালো ভস্ম হয়ে গেল। —(মাযহারী)

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ—অর্থাৎ তারা অতি প্রত্যুষেই একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল: যদি ফসল কাটতে চাও, তবে সকাল সকালই ক্ষেতে চল। وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ অর্থাৎ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় তারা চুপিসারে কথাবার্তা বলছিল, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের পেয়ে সাথে না চলে।

حرد—وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ শব্দের অর্থ নিষেধ করা ও রাগা, গোস্বা দেখানো। উদ্দেশ্য এই যে, তারা ফকীর-মিসকীনকে কিছু না দিতে সক্ষম, এরূপ ধারণা নিয়ে রওয়ানা হল। যদি কোন ফকীর এসেও যায়, তবে তাকে হটিয়ে দেবে।

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ—যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ক্ষেত-বাগান

কিছুই দেখতে পেল না, তখন প্রথমে বলল ঃ আমরা পথ ভুলে অন্যত্র এসে গেছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী স্থান ও আলামত দেখে বুঝতে পারল যে, গন্তব্যস্থলেই এসেছে; কিন্তু ক্ষেত পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন তারা বলল ঃ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ —আমরা এই ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ —তাদের মধ্যে যে মাঝারি ব্যক্তি ছিল, অর্থাৎ পিতার ন্যায় সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে আনন্দ লাভকারী ছিল, সে বলল ঃ আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করনা কেন? অর্থাৎ তোমরা মনে কর যে, ফকীর-মিসকীনকে ধন-সম্পদ দিয়ে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা এর পরিবর্তে ধন-সম্পদ দেবেন না, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয় পবিত্র। যারা তাঁর পথে ব্যয় করে, তিনি নিজের কাছ থেকে তাদেরকে আরও বেশী দিয়ে দেন।—(মাযহারী)

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ —তখন এই ব্যক্তির কথা কেউ না শুনলেও এখন সবাই স্বীকার করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল ত্রুটি ও অভাব থেকে পবিত্র এবং তারা নিজেরাই জালিম। কারণ, তারা ফকীর-মিসকীনের অংশও হজম করতে চেয়েছিল।

এই মধ্যপন্থী ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল এবং সে অন্যদের চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দুষ্টদের সঙ্গী হয়ে তাদেরই মতানুসারে কাজ করতে সম্মত হয়ে গিয়েছিল। তাই তার দশাও তাদের মতই হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে পাপ কাজে নিষেধ করে, অতঃপর তাদেরকে বিরত না হতে দেখে নিজেও তাদের সাথে শরীক হয়ে যায়, সেও তাদের অনুরূপ। তার উচিত নিজেকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ —অর্থাৎ তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করার পরও একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, তুই-ই প্রথমে ভ্রান্ত পথ দেখিয়েছিলি, যদ্দরুন এই আযাব এসেছে। অথচ তাদের কেউ একা অপরাধী ছিল না; বরং সবাই অথবা অধিকাংশ অপরাধে শরীক ছিল।

আজকাল এই বিপদটি ব্যাপকাকারে দেখা যায়। অনেকগুলো দলের সমষ্টিগত কর্মের ফলে কোন ব্যর্থতা অথবা বিপদ আসলে একে অপরকে দোষী করে সময় নষ্ট করাও একটি বিপদ হয়ে দেখা দেয়।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ —অর্থাৎ প্রথমে একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করার পর যখন তারা চিন্তা করল, তখন সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল যে, আমরা সবাই অবাধ্য ও গোনাহ্‌গার। তাদের এই অনুতপ্ত স্বীকারোক্তি তওবার মূলাভিষিক্ত ছিল। এ কারণেই তারা আশাবাদী হতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম উদ্যান দান করবেন।

ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন: আমি খবর পেয়েছি যে, তাদের খাঁটি তওবার বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সেই বাগানের এক-একটি আঙুর-গুচ্ছ এক খচ্চরের বোঝা হয়ে যেত।—(মাযহারী)

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ —মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষরূপী আযাবের সংক্ষিপ্ত এবং উদ্যান মালিকদের ক্ষেত জ্বলে যাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার পর সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌র আযাব আসে, তখন এমনিভাবেই আসে। দুনিয়ার এই আযাব আসার পরও তাদের পরকালের আযাব দূর হয়ে যায় না; বরং পরকালের আযাব ভিন্ন এবং তদপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে।

পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে সৎ আল্লাহ্‌ভীরুদের প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরে মক্কার মুশরিকদের একটি মিথ্যা দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। মুশরিকরা দাবী করত যে, প্রথমত কিয়ামত হবে না এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের কাহিনী উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। দ্বিতীয়ত যদি এরূপ হয়েও যায়, তবে সেখানেও আমরা দুনিয়ার ন্যায় নিয়ামত ও অগাধ ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হব। কয়েক আয়াতে এই দাবীর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে: আল্লাহ্ তা'আলা সৎ ও অপরাধীদেরকে সমান করে দেবেন—এ কেমন উদ্ভট ও অভিনব সিদ্ধান্ত! এর পক্ষে না আছে কোন প্রমাণ, না আছে ঐশী কিতাব থেকে কোন সাক্ষ্য এবং না আছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ওয়াদা। এমতাবস্থায় কেমন করে এরূপ দাবী করা হয়?

কিয়ামতের একটি যুক্তি: আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ হওয়া এবং সৎ-অসতের প্রতিদান ও শাস্তি হওয়া যুক্তিগতভাবে অবশ্যম্ভাবী। কেননা, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে সাধারণত যারা পাপাচারী, কুকর্মী, চোর-ডাকাত, তারাই সুখে থাকে এবং মজা লুটে। একজন চোর ও ডাকাত মাঝে মাঝে এক রাত্রিতে এই পরিমাণ ধন-সম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন ভদ্র ও সাধু ব্যক্তি সারা জীবনেও উপার্জন করতে পারে না। তদুপরি সে আল্লাহ্ ও পরকালের ভয় কাকে বলে, জানে না এবং কোন লজ্জা-শরমের বাধাও মানে না; যেভাবে ইচ্ছা মনের কামনা-বাসনা পূর্ণ করে যায়। পক্ষান্তরে সৎ ও ভদ্র ব্যক্তি প্রথমত আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যদি তাও না থাকে, তবে সামাজিক লজ্জা ও শরমের চাপে দমিত

হয়ে থাকে। সারকথা এই যে, দুনিয়ার কারখানায় দুষ্কর্মী ও বদমায়েশেরা সফল এবং সৎ ও ভদ্র ব্যক্তি ব্যর্থ মনোরথ দৃষ্টিগোচর হয়। এখন সামনেও যদি এমন সময় না আসে যাতে সৎ ব্যক্তি উত্তম পুরস্কার পায় এবং অসাধু ব্যক্তি শাস্তি লাভ করে, তবে প্রথমত কোন মন্দকে মন্দ এবং গোনাহ্‌কে গোনাহ্‌ বলা অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ এতে একজন মানুষকে অহেতুক তার কামনা থেকে বিরত রাখা হয়। দ্বিতীয়ত ন্যায় ও সুবিচারের কোন অর্থ থাকে না। যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তারা এই প্রশ্নের কি জওয়াব দেবে যে, আল্লাহ্‌র ইনসাফ কোথায় গেল ?

দুনিয়াতে প্রায়ই অপরাধী ধরা পড়ে, লাঞ্ছিত হয় এবং সাজা ভোগ করে। এতে করে সৎ লোকের স্বাতন্ত্র্য দুনিয়াতেই ফুটে উঠে। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের মাধ্যমে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং কিয়ামতের প্রয়োজন কি ? উপরোক্ত বক্তব্যে এ ধরনের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। কেননা, প্রথমত সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় রাষ্ট্রের দেখা শুনা সম্ভবপর নয়। যেখানে অপরাধী ধরা পড়ে, সেখানেও আদালতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি সর্বত্র সংগৃহীত হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি পাওয়া গেলেও ঘুষ, সুপারিশ ও চাপ সৃষ্টির অনেক চোর দরজা দিয়ে অপরাধী নাগালের বাইরে চলে যায়। বর্তমান যুগে প্রচলিত আইন-আদালতের অপরাধ ও শাস্তি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, এ যুগে কেবল সেসব বেওকুফ, নির্বোধ ও অসহায় ব্যক্তি শাস্তি পায়, যারা চালাকী করে কোন চোর দরজা বের করতে পারে না এবং যার কাছে ঘুষের টাকা নেই বা কোন বড় লোক সুপারিশকারী নেই অথবা যে নির্বুদ্ধিতার কারণে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারে না। এ ছাড়া সব অপরাধীই স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে বিচরণ করে।

কোরআন পাকের أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ বাক্যটি এই সত্য ফুটিয়ে তুলেছে যে, যুক্তিগতভাবে এরূপ সময় আসা জরুরী যেখানে সবার হিসাব-নিকাশ হবে, যেখানে অপরাধীদের জন্য কোন চোর-দরজা থাকবে না, যেখানে ইনসাফই ইনসাফ হবে এবং সৎ ও অসতের পার্থক্য দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠবে। এটা না হলে দুনিয়াতে কোন মন্দ কাজ মন্দ নয়, কোন অপরাধ অপরাধ নয় এবং আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার ও ইনসাফের কোন অর্থ থাকে না।

যখন প্রমাণিত হল যে, কিয়ামতের আগমন ও ক্রিয়া কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি নিশ্চিত, তখন অতঃপর কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ অবস্থা ও অপরাধীদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কিয়ামতের দিন كَشْفِ سَاقٍ অর্থাৎ গোছা উন্মোচিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। এর স্বরূপ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ—অর্থাৎ যারা কিয়ামতের কথা অবিশ্বাস করে, আপনি তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। এরপর দেখুন আমি কি করি। এখানে 'ছেড়ে দিন' কথাটি একটি বাক পদ্ধতির অনুসরণে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র

উপর ভরসা করা। এর সারমর্ম এই যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে বারবার এই দাবীও পেশ করা হত, যদি আমরা বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী হয়ে থাকি এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে আযাব দিতে সক্ষম হন, তবে এই মুহূর্তেই আমাদেরকে আযাব দেন না কেন? তাদের এসব বেদনাদায়ক দাবীর কারণে কখনও কখনও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মনেও এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে এবং সম্ভবত তিনি কোন সময় দোয়াও করে থাকবেন যে, এদের উপর এই মুহূর্তেই আযাব এসে গেলে অবশিষ্ট লোকদের সংশোধনের পথ হয়ত সুগম হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে ঃ আমার রহস্য আমিই ভাল জানি। আমি তাদেরকে একটি সীমা পর্যন্ত সময় দিই; তাৎক্ষণিক আযাব প্রেরণ করি না। এতে করে তাদের পরীক্ষাও হয় এবং ঈমান আনার জন্য অবকাশও হয়। পরিশেষে হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ইউনুস (আ) কাফিরদের দাবীতে অতিষ্ঠ হয়ে আযাবের দোয়া করেছিলেন। আযাবের আলামত সামনেও এসে গিয়েছিল এবং ইউনুস (আ) আযাবের জায়গা থেকে অন্যত্র সরেও গিয়েছিলেন; কিন্তু এরপর সমগ্র সম্প্রদায় কাকুতি-মিনতি ও আন্তরিকতা সহকারে তওবা করেছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে আযাব সরিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর ইউনুস (আ) সম্প্রদায়ের কাছে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতিরেকে সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন না করার পথ বেছে নেন। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হুঁশিয়ার করার জন্য সামুদ্রিক ভ্রমণে মাছের পেটে চলে যাওয়ার ঘটনা ঘটান। অতঃপর ইউনুস (আ) হুঁশিয়ার হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাঁর প্রতি নিয়ামত ও অনুগ্রহের দরজা খুলে দেন। সূরা ইউনুস ও অন্যান্য সূরায় এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি কাফিরদের দাবীর কাছে নত হবেন না এবং তাদের প্রতি দ্রুত আযাব প্রেরণের আকাঙ্ক্ষাও করবেন না। আমার নিগূঢ় রহস্য এবং বিশ্ববাসীর যথার্থ উপযোগিতা আমিই সম্যক জানি। আমার উপর ভরসা করুন।

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ—এখানে হযরত ইউনুস (আ)-কে صاحب حوت 'মাছওয়ালা' বলা হয়েছে। কেননা, তিনি কিছুকাল মাছের পেটে ছিলেন।

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ—يزلقون শব্দটি ازلاق থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হোচট দেওয়া, ভূপাতিত করা।—(রাগিব)

উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা আপনাকে ক্রুদ্ধ ও তির্যক দৃষ্টিতে দেখে এবং আপনাকে স্বস্থান থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণ করার সময় তাদের এই অবস্থা হয়। তারা বলে ঃ এ তো পাগল। وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ—অথচ এই কালাম বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ এবং তাদের সংশোধন ও সাফল্য প্রতিশ্রুত। এরূপ

কালামের অধিকারী ব্যক্তি কখনও পাগল হতে পারে কি? সূরার শুরুতে কাফিরদের যে দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছিল, উপসংহারে অন্য ভঙ্গিতে তারই জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

ইমাম বগভী প্রমুখ তফসীরবিদ এসব আয়াতের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মক্কায় জনৈক ব্যক্তি নযর লাগানোর কাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সে উট ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ারকে নযর লাগালে তৎক্ষণাৎ সেটি মরে যেত। মক্কার কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করত। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নযর লাগানোর উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল। সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নযর লাগানোর চেষ্টা করল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরের হিফাযত করলেন। ফলে তাঁর কোন ক্ষতি হল না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ আয়াতে এই নযর লাগার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য, নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য। সহীহ্ হাদীসসমূহে এর সত্যতা সমর্থিত হয়েছে। আরবেও এটা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : নযর লাগা ব্যক্তির গায়ে وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁ দিলে নযর লাগার অশুভ প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়।—(মাযহারী)

سورة الحاقة

সূরা হাক্কা

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫২ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَآقَّةُ ۝ مَا الْحَآقَّةُ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ۝ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ
وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ۝ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝ وَاَمَّا عَادٌ
فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ
اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ
خَاوِيَةٍ ۝ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ۝ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ
وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً
رَّابِيَةً ۝ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۝ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ
تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝ فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝
وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝ فَيَوْمَئِذٍ
وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝ وَّالْمَلَكُ
عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ؕ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝١٧
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ
بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۝ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ
حِسَابِيَهْ ۝ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ قُطُوْفُهَا

دَانِيَةٌ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۵ فَيَقُولُ يٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ

كِتٰبِيَهْ ۝ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝

مَآ أَغْنٰى عَنِّي مَالِيَهْ ۝ هَلَكَ عَنِّي سُلْطٰنِيَهْ ۝ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا

فَاسْلُكُوهُ ۝ إِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ ۝ وَلَا يَحُضُّ

عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيمٌ ۝ وَلَا طَعَامٌ

إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝ لَّا يَأْكُلُهٗٓ إِلَّا الْخٰطِئُونَ ۝ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝ إِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ

شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۝ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا

تَذَكَّرُونَ ۝ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ۝ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا

بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا

مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِينَ ۝ وَإِنَّهٗ

لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ۝

وَإِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝ وَإِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۝ فَسَبِّحْ

بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু

(১) সুনিশ্চিত বিষয়। (২) সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৩) আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৪) 'আদ ও সামূদ গোত্র মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল। (৫) অতঃপর সামূদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা

(৬) এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, (৭) যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। (৮) আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি? (৯) ফিরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল। (১০) তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করলেন। (১১) যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম, (১২) যাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্য স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রূপে গ্রহণ করে। (১৩) যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে—একটি মাত্র ফুৎকার (১৪) এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, (১৫) সেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। (১৬) সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে (১৭) এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের ঊর্ধ্বে বহন করবে। (১৮) সেই দিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (১৯) অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবেঃ নাও তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। (২০) আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (২১) অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে, (২২) সুউচ্চ জান্নাতে। (২৩) তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। (২৪) বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। (২৫) যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবেঃ হায়! আমায় যদি আমার আমলনামা দেওয়া না হতো! (২৬) আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! (২৭) হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। (২৮) আমার ধনসম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। (২৯) আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (৩০) ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ ধর একে, গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও, (৩১) অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। (৩২) অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (৩৩) নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না। (৩৪) এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না। (৩৫) অতএব আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নেই। (৩৬) এবং কোন খাদ্য নেই ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত। (৩৭) গোনাহ্‌গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না। (৩৮) তোমরা যা দেখ, আমি তার শপথ করছি (৩৯) এবং যা তোমরা দেখ না, তার—(৪০) নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের আনীত (৪১) এবং এটা কোন কবির কালাম নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর। (৪২) এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। (৪৩) এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। (৪৪) সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, (৪৫) তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, (৪৬) অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। (৪৭) তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। (৪৮) এটা আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য অবশ্যই একটি উপদেশ। (৪৯) আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যারোপ

করবে। (৫০) নিশ্চয় এটা কাফিরদের জন্য অনুতাপের কারণ। (৫১) নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য। (৫২) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সুনিশ্চিত বিষয়। সুনিশ্চিত বিষয় কি? আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (এই বাক্যের উদ্দেশ্য কিয়ামতের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বর্ণনা করা) সামূদ ও 'আদ সম্প্রদায় এই খটখট শব্দকারী (মহাপ্রলয়)-কে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর সামূদকে তো প্রচণ্ড শব্দে ধ্বংস করা হয়েছে এবং আদকে এক ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা নির্মূল করা হয়েছে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর সপ্ত রাত্রি ও অষ্ট দিবস অবিরাম চড়াও করে রাখেন। অতএব (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি (তখন সেখানে উপস্থিত থাকলে) তাদেরকে দেখতে যে, তারা অন্তঃসারশূন্য খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে (কারণ, তারা অত্যন্ত দীর্ঘদেহী ছিল)। তুমি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাও কি? (অর্থাৎ তাদের কেউ বেঁচে নেই। অন্য আয়াতে আছে : هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

এমনিভাবে) ফিরাউন, তার পূর্ববর্তীরা (কওমে নূহ, 'আদ ও সামূদ সবাই এতে দাখিল আছে)। এবং (লূত সম্প্রদায়ের) সংলগ্ন বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল (অর্থাৎ কুফর ও শিরক করেছিল। তাদের কাছে রসূল প্রেরণ করা হয়েছিল) তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল (কুফর ও শিরক থেকে বিরত না হয়ে কিয়ামতকে মিথ্যা বলেছিল)। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করেছিলেন। (তন্মধ্যে 'আদ ও সামূদের কাহিনী তো এইমাত্র বিবৃত হল। কওমে লূত ও ফিরাউনের পরিণতি অনেক আয়াতে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং কওমে নূহের শাস্তি পরে বর্ণিত হচ্ছে)। যখন (নূহের আমলে)। জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষ মু'মিনদেরকে, কারণ তাদের মুক্তি তোমাদের অস্তিত্বের কারণ হয়েছে) নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং অবশিষ্টদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম) যাতে এই ব্যাপারকে আমি তোমাদের জন্য স্মৃতি করে দিই এবং কান একে স্মরণ রাখে। (কান স্মরণ রাখে —কথাটি রূপকভাবে বলা হয়েছে। সারকথা, এই ঘটনা স্মরণ রেখে যেন শাস্তির কারণ থেকে বেঁচে থাকে। অতঃপর কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণিত হচ্ছে :) তখন সিংগায় একমাত্র ফুৎকার দেওয়া হবে, (অর্থাৎ প্রথম ফুঁক) এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা (স্বস্থান থেকে) উত্তোলিত হবে এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, সেইদিন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে (অর্থাৎ এখন আকাশ মজবুত ও ফাটলবিহীন হলেও সেদিন এরূপ থাকবে না, বরং তা দুর্বল ও বিদীর্ণ হয়ে যাবে)। এবং ফেরেশতাগণ (যারা আকাশে ছড়িয়ে আছে, যখন আকাশ ফাটতে থাকবে, তখন তারা) আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে। (এ থেকে জানা যায় যে, আকাশ মধ্যস্থল থেকে বিদীর্ণ হয়ে চতুর্দিকে সংকুচিত হবে। তাই ফেরেশতাগণও মধ্যস্থল থেকে প্রান্তদেশে চলে যাবে।

এসব ঘটনা প্রথম ফুৎকারের সময়কার। দ্বিতীয় ফুৎকারের সময়কার ঘটনা এই যে) সেদিন আটজন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উপরে বহন করবে। (হাদীসে আছে, বর্তমানে চারজন ফেরেশতা আরশকে বহন করছে। কিয়ামতের দিন আটজনে বহন করবে। সারকথা, আটজন ফেরেশতা আরশকে বহন করে কিয়ামতের ময়দানে আনবে এবং হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। অতঃপর তাই বর্ণিত হচ্ছেঃ) সেইদিন তোমাদেরকে (হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ্‌র সামনে) উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু (আল্লাহ্‌র সামনে) গোপন থাকবে না। অতঃপর (আমলনামা উঠিয়ে হাতে দেওয়া হবে, তখন) যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে (আনন্দের আতিশয্যে আশেপাশের লোকদেরকে) বলবেঃ নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি (পূর্ব থেকেই) জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (অর্থাৎ আমি কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী ছিলাম। আমি ঈমানদার ছিলাম। এর বরকতে আল্লাহ্ আমাকে পুরস্কৃত করেছেন)। সে সুখী জীবনযাপন করবে অর্থাৎ সুউচ্চ বেহেশতে থাকবে, যার ফলসমূহ (এতটুকু) অবনমিত থাকবে (যে, যেভাবে ইচ্ছা আহরণ করতে পারবে। আদেশ হবেঃ) বিগত দিনে (অর্থাৎ দুনিয়ায় থাকাকালে) তোমরা যেসব কাজ-কর্ম করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। যার আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে, সে (নিদারুণ অনুতাপ সহকারে) বলবেঃ হায়, আমাকে যদি আমার আমলনামা দেওয়া না হত, আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম! হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত (এবং পুনরুজ্জীবিত না হতাম) আমার ধনসম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (অর্থাৎ ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সব নিষ্ফল হল। এরূপ ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবেঃ) ধর একে এবং গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে এবং শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (এই গজ কতটুকু, তা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কেননা, এটা পরজগতের গজ। অতঃপর এই আযাবের কারণ বলা হচ্ছেঃ) সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না (অর্থাৎ পয়গম্বরদের শিক্ষানুযায়ী জরুরী ঈমান অবলম্বন করেনি) এবং (নিজে দেওয়া তো দূরের কথা,) মিসকীনকে আহার্য দিতে (অপরকে) উৎসাহিত করত না। (সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক সম্পর্কিত ইবাদতের মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও সৃষ্টির প্রতি দয়া। এই ব্যক্তি উভয়টি বর্জন ও অস্বীকার করেছিল বিধায় তার এই আযাব হয়েছে)। অতএব আজ এখানে তার কোন সুহৃদ নেই এবং কোন খাদ্য নেই ক্ষতধৌত পানি ব্যতীত, (উদ্দেশ্য, সুখাদ্য পাবে না)। যা গোনাহ্গার ব্যতীত কেউ খাবে না। (অতঃপর কোরআনের সত্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে, যার মধ্যে কিয়ামতের প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোরআনকে মিথ্যা বলাই উল্লিখিত আযাবের কারণ)। অতঃপর তোমরা যা দেখ এবং যা দেখ না, আমি তার শপথ করছি, (কেননা কোন কোন সৃষ্টি কার্যত অথবা ক্ষমতাগতভাবে দেখার শক্তি রাখে এবং কোন কোন সৃষ্টি এই শক্তি রাখে না। উদ্দেশ্যের সাথে এই শপথের বিশেষ সম্পর্ক এই যে, কোরআন পাক নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতা তাদের দৃষ্টিগোচর হত না এবং যার কাছে কোরআন অবতীর্ণ হত, তিনি দৃষ্টিগোচর হতেন। অতএব এখানে সমগ্র সৃষ্টির

শপথ বোঝানো হয়েছে)। নিশ্চয় এই কোরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতার আনীত (আল্লাহ্‌র) কালাম (অতএব যার প্রতি এই কালাম অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি অবশ্যই রসূল) এটা কোন কবির রচনা নয় [কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলত; কিন্তু] তোমরা কমই বিশ্বাস কর। (এখানে 'কম' বলে নাস্তি বোঝানো হয়েছে) এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা নয় (কোন কোন কাফির এরূপ বলত; কিন্তু) তোমরা কমই অনুধাবন কর (এখানেও 'কম' বলে নাস্তি বোঝানো হয়েছে। সারকথা, কোরআন কবিতাও নয়—অতীন্দ্রিয়বাদও নয়; বরং) এটা বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (অতঃপর এর সত্যতার একটি যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে:) যদি সে (অর্থাৎ পয়গম্বর) আমার নামে কোন (মিথ্যা) কথা রচনা করত (অর্থাৎ যা আমার কালাম নয়, তাকে আমার কালাম বলত এবং মিথ্যা নবুয়ত দাবী করত) তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, অতঃপর তার কণ্ঠশিরা কেটে দিতাম এবং তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। (কণ্ঠশিরা কেটে দিলে মানুষ মারা যায়। তাই অর্থ হত্যা করা)। এই কোরআন আল্লাহ্‌-ভীরুদের জন্য উপদেশ। (অতঃপর মিথ্যারোপকারীদের প্রতি শাস্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে যে) আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যারোপকারীও রয়েছে। (আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। এ দিক দিয়ে) এই কোরআন কাফিরদের জন্য অনুশোচনার কারণ। (কেননা, মিথ্যারোপের কারণে এটা তাদের আযাবের কারণ)। এই কোরআন নিশ্চিত সত্য। অতএব (এই কোরআন যাঁর কালাম) আপনি আপনার (সেই) মহান পালনকর্তার পবিত্রতা (ও প্রশংসা) বর্ণনা করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী, কাফির ও পাপাচারীদের শাস্তি এবং মু'মিন আল্লাহ্‌ভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পাকে কিয়ামতকে হাক্কাহ্, কারিয়া, ওয়াকিয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

حَاقَّة শব্দের এক অর্থ সত্য এবং দ্বিতীয় অর্থ অপরাপর বিষয়কে সত্য প্রতিপন্নকারী। কিয়ামতের জন্য এই শব্দটি উভয় অর্থে খাটে। কেননা, কিয়ামত নিজেও সত্য, এর বাস্তবতা প্রমাণিত ও নিশ্চিত এবং কিয়ামত মু'মিনদের জন্য জান্নাত এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নাম প্রতিপন্ন করে। এখানে কিয়ামতের এই নাম উল্লেখ করে বারবার প্রশ্ন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত সকল প্রকার অনুমানের ঊর্ধ্বে এবং বিস্ময়কররূপে ভয়াবহ।

قَارِعَة শব্দের অর্থ খটখট শব্দকারী। কিয়ামত যেহেতু সব মানুষকে অস্থির ও ব্যাকুল করে দেবে এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে, তাই একে قَارِعَة বলা হয়েছে।

طَاغِيَة শব্দটি طُغْيَان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এমন কঠোর শব্দ, যা সারা দুনিয়ার শব্দসমূহের সীমার বাইরে ও বেশী। মানুষের মন

ও মস্তিষ্ক এই শব্দ বরদাশত করতে পারে না। সামূদ গোত্রের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের উপর এই শব্দের আকারেই আযাব এসেছিল। এতে সারা বিশ্বের বজ্রনিনাদ ও সারা বিশ্বের শব্দসমূহের সমষ্টি সন্নিবেশিত ছিল। ফলে তাদের হৃদপিণ্ড ফেটে গিয়েছিল।

رِيحٍ صَرْصَرٍ—এর অর্থ অত্যধিক শৈত্যসম্পন্ন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু।

سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ—এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, বুধবারের সকাল থেকে এই ঝঞ্ঝাবায়ুর আযাব শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এভাবে দিন আটটি ও রাত্রি সাতটি হয়েছিল।

حُسُومًا—শব্দটি حاسم এর বহুবচন। এর অর্থ মূলোৎপাটন করে দেওয়া।

مؤتفكات এর অর্থ পরস্পরে মিশ্রিত ও মিলিত। হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহকে مؤتفكات বলা হয়েছে। এর এক কারণ এই যে, তাদের বস্তিগুলো পরস্পরে মিলিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আযাব আসার পর তাদের বস্তিগুলো তছনছ হয়ে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ—তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে আছে صور শিং-এর আকারের কোন বস্তুকে বলা হয়। কিয়ামতের দিন এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ এর অর্থ হঠাৎ একযোগে এই শিংগার আওয়াজ শুরু হবে এবং সবার মৃত্যু পর্যন্ত একটানা আওয়াজ অব্যাহত থাকবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা কিয়ামতে শিংগার দুইটি ফুৎকার প্রমাণিত আছে। প্রথম ফুৎকারকে نفخة صعق বলা হয়। এ সম্পর্কে কোরআনে আছে : فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ—অর্থাৎ এই ফুৎকারের ফলে আকাশের অধিবাসী ফেরেশতা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী মানব, জিন ও সমস্ত জীব-জন্তু অজ্ঞান হয়ে যাবে। (অতঃপর এই অজ্ঞান অবস্থায় সবার মৃত্যু ঘটবে)। দ্বিতীয় ফুৎকারকে نفخة بعث বলা হয়। بعث শব্দের অর্থ উঠা। এই ফুৎকারের মাধ্যমে সকল মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এ সম্পর্কে কোরআনে আছে : ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ

يَنْظُرُونَ—অর্থাৎ পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। ফলে অকস্মাৎ সব মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দেখতে থাকবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে এই দুই ফুৎকারের পূর্বে তৃতীয় একটি ফুৎকারের উল্লেখ আছে। এর নাম نَفْخَةُ فزع কিন্তু রেওয়ায়েতের সমষ্টিতে চিন্তা করলে জানা যায় যে, এটা প্রথম ফুৎকারই। শুরুতে একে نَفْخَةُ فزع বলা হয়েছে এবং পরিণামে এটাই نَفْخَةُ صعق হয়ে যাবে।—(মাযহারী)

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার আরশকে বহন করবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিয়ামতের পূর্বে চারজন ফেরেশতা এই দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের সাথে আরও চারজন মিলিত হবে।

আল্লাহ্র আরশ কি? এর স্বরূপ ও প্রকৃত আকার-আকৃতি কি? ফেরেশতারা কিভাবে একে বহন করছে? এসব প্রশ্নের সমাধান মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি দিতে পারে না এবং এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করার অনুমতি নেই। এ ধরনের যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ্র উদ্দেশ্য সত্য এবং স্বরূপ অজ্ঞাত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ—অর্থাৎ সে দিন সবাই পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হবে। কোন আত্মগোপনকারী আত্মগোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে আজ দুনিয়াতেও কেউ আত্মগোপন করতে পারে না। সেই দিনের বিশেষত্ব সম্ভবত এই যে, হাশরের ময়দানে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ একটি সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হবে। গর্ত, পাহাড়, ঘরবাড়ী, বৃক্ষ ইত্যাদি আড়াল বলতে কিছুই থাকবে না। দুনিয়াতে এসব বস্তুর পশ্চাতে আত্মগোপনকারীরা আত্মগোপন করে। কিন্তু সেখানে কিছুই থাকবে না। ফলে কেউ আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না।

هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ—هَاؤُم শব্দের অর্থ নাও। উদ্দেশ্য এই যে, যার আমলনামা ডান হাতে আসবে, সে আহলাদে আটখানা হয়ে আশেপাশের লোকজনকে বলবে: নাও, আমার আমলনামা পাঠ করে দেখ।

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ—سلطان শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও আধিপত্য। তাই রাষ্ট্রকে সুলতানাত এবং রাষ্ট্রনায়ককে সুলতান বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে অন্যদের উপর

আমার ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল। আমি সবার বড় একজন। আজ সেই রাজত্ব ও প্রাধান্য কোন কাজে আসল না। سلطان-এর অপর অর্থ প্রমাণ, সনদও হতে পারে। তখন অর্থ হবে, হায়! আজ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার হাতে কোন সনদ নেই।

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ—অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবেঃ এই অপরাধীকে ধর এবং তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এই আদেশ উচ্চারিত হলে সব প্রাচীর ইত্যাদি সব বস্তু তাকে ধরার জন্য দৌড় দেবে।

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ—অতঃপর তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে গ্রথিত করে দাও। শৃঙ্খলিত করার অর্থও রূপকভাবে নেওয়া যায়। কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে মোতি অথবা তসবীহ্‌র দানা গ্রথিত করার ন্যায় শিকল দেহে বিদ্ধ করে অপর দিক থেকে বের করে দেওয়া। কোন কোন হাদীসে এই আক্ষরিক অর্থেরও সমর্থন আছে।—(মাযহারী)

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ—حميم এর অর্থ সুহৃদ। غسلين সেই পানি, যদ্দ্বারা জাহান্নামীদের ক্ষতের পুঁজ ইত্যাদি ধৌত করা হবে। আয়াতের অর্থ এই যে, আজ তার কোন সুহৃদ তাকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারবে না এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার খাদ্য জাহান্নামীদের ক্ষত ধৌত নোংরা পানি ব্যতীত কিছু হবে না। 'কিছু হবে না' এর অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বলা হয়েছে যে, কোন সুখাদ্য হবে না। ক্ষত ধৌত পানির অনুরূপ অন্য কোন নোংরা খাদ্য হতে পারবে; যেমন অন্য আয়াতে জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরিত্য নাই।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ—অর্থাৎ সে সব বস্তুর শপথ যা তোমরা দেখ অথবা দেখতে পার এবং যা তোমরা দেখ না ও দেখতে পার না। এতে সমগ্র সৃষ্টি এসে গেছে। কেউ কেউ বলেন ঃ 'যা দেখ না' বলে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ যা দেখ বলে দুনিয়ার বস্তুসমূহ এবং 'যা দেখ না' বলে পরকালের বিষয়সমূহ বোঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا—تقول শব্দের অর্থ কথা রচনা করা। وتين হৃদয় থেকে নির্গত সেই শিরাকে বলা হয়, যার মাধ্যমে আত্মা মানবদেহে বিস্তার লাভ করে। এই শিরা কেটে দিলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়ে যায়।

কাফিরদের কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি এবং তাঁর কালামকে কবিতা, কেউ তাঁকে অতীন্দ্রিয়তাবাদী এবং তাঁর কালামকে অতীন্দ্রিয়বাদ বলত। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের এসব অনর্থক ধারণা খণ্ডন করা হয়েছিল। كاهن তথা অতীন্দ্রিয়বাদী এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শয়তানদের কাছ থেকে কিছু সংবাদ পেয়ে এবং কিছু নক্ষত্রবিদ্যার মাধ্যমে জেনে নিয়ে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে আনুমানিক কথাবার্তা বলে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যারা কবি অথবা অতীন্দ্রিয়বাদী বলত, তাদের দোষারোপের সারমর্ম ছিল এই যে, তিনি যে কালাম শুনান, তা আল্লাহ্র কালাম নয়। তিনি নিজেই নিজের কল্পনা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদীদের ন্যায় শয়তানদের কাছ থেকে কিছু কথাবার্তা সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোকে আল্লাহ্র কালাম বলে প্রচার করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অন্য এক পন্থায় অত্যন্ত জোরেসোরে খণ্ডন করেছেন যে, যদি রসূল আমার নামে মিথ্যা কথা রচনা করত, তবে আমি কি তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতাম এবং তাঁকে মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার সুযোগ দিতাম? কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করতে পারে না। তাই আয়াতে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে: যদি এই রসূল একটি কথাও আমার নামে মিথ্যা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত ধরে তার প্রাণশিরা কেটে দিতাম। এরপর আমার শাস্তির কবল থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। এখানে এই কঠোর ভাষা মূর্খ কাফিরদেরকে শুনানোর জন্য অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে। ডান হাত ধরার কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, কোন অপরাধীকে হত্যা করার সময় হত্যাকারী তার বিপরীতে দণ্ডায়মান হয়। ফলে হত্যাকারীর বাম হাতের বিপরীতে থাকে অপরাধীর ডান হাত। হত্যাকারী নিজের বাম হাত দিয়ে অপরাধীর ডান হাত ধরে নিজের ডান হাত দ্বারা তাকে হামলা করে।

এ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ না করুন, রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার নামে কোন মিথ্যা কথা প্রচার করলে তাঁর সাথে এরূপ ব্যবহার করা হত। এখানে কোন সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়নি যে, যে ব্যক্তিই মিথ্যা নবুয়ত দাবী করবে, তাকে সর্বদা ধ্বংসই করা হবে। এ কারণেই দুনিয়াতে অনেকেই মিথ্যা নবুয়ত দাবী করেছে; কিন্তু তাদের উপর এরূপ কোন আযাব আসেনি।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ—এর আগের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলেন না। তিনি আল্লাহ্র কালামই বলেন। এই কালাম আল্লাহ্ভীরুদের জন্য উপদেশ। কিন্তু আমি এ কথাও জানি যে, এসব অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়াদি জানা সত্ত্বেও অনেক লোক মিথ্যারোপ করতে থাকবে। এর পরিণাম হবে পরকালে তাদের অনুশোচনা ও সার্বক্ষণিক আযাব। অবশেষে বলা হয়েছে:

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ—অর্থাৎ এটা পুরোপুরি সত্য ও নিশ্চিত। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। সবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে:

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ-এতে ইঙ্গিত আছে যে, আপনি এই হঠকারী কাফিরদের কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না এবং দুঃখিতও হবেন না বরং আপনার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণায় নিজেকে নিয়োজিত করুন। এটাই সব দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়। অন্য এক আয়াতে এর অনুরূপ বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ—অর্থাৎ আমি জানি আপনি কাফিরদের অর্থহীন কথাবার্তায় মনঃক্ষুণ্ণ হন। এর প্রতিকার এই যে, আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসায় মশগুল হয়ে যান এবং সিজদাকারীদের দলভুক্ত হয়ে যান। কাফিরদের কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

আবু দাউদে হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেন, যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ একে তোমাদের রুকূতে রাখ। অতঃপর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন তিনি বললেন ঃ একে তোমাদের সিজদায় রাখ। এ কারণেই সর্বসম্মতভাবে রুকূ ও সিজদায় এই দু'টি তসবীহ্ পাঠ করা হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে এগুলো তিনবার পাঠ করা সুন্নত। কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন।

سورة المعارج

সূরা মা'আরিজ

মক্কায় অবতীর্ণ : 44 আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ مِّنَ

اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۗ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ

كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۗ يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ

كَالْمُهْلِ ۙ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۙ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۚۖ

يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۢ بِبَنِيْهِ ۙ

وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۙ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ ۙ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ

جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۙ كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ۙ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۚۖ تَدْعُوْا

مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۙ وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۙ

اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۙ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۙ اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۙ

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ فِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ

مَّعْلُوْمٌ ۙ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ وَ

الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۚ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ

مَاْمُوْنٍ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ
عَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ
هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۝
فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ۝ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
الشِّمَالِ عِزِينَ ۝ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۝
كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۝ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ
وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۝ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ
بِمَسْبُوقِينَ ۝ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي يُوعَدُونَ ۝ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ
نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۝ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ
الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) একব্যক্তি চাইল, সেই আযাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত—(২) কাফিরদের জন্য, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। (৩) তা আসবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি সমুন্নত মর্তবার অধিকারী। (৪) ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। (৫) অতএব আপনি উত্তম সবর করুন। (৬) তারা এই আযাবকে সুদূরপরাহত মনে করে, (৭) আর আমি একে আসন্ন দেখছি। (৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত। (৯) এবং পর্বতসমূহ হবে রঙিন পশমের মত (১০) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না। (১১) যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহ্‌গার ব্যক্তি মুক্তিপণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, (১২) তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, (১৩) তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত (১৪) এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। (১৫) কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান

অগ্নি, (১৬) যা চামড়া তুলে দিবে। (১৭) সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, (১৮) সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল। (১৯) মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে। (২০) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হাহুতাশ করে। (২১) আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। (২২) তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী। (২৩) যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে (২৪) এবং যাদের ধনসম্পদে নির্ধারিত হক আছে (২৫) যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের (২৬) এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। (২৭) এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-কম্পিত। (২৮) নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না (২৯) এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে, (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না, (৩১) অতএব যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী (৩২) এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে (৩৩) এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল—নিষ্ঠাবান (৩৪) এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, (৩৫) তারাই জান্নাতে সম্মানিত। (৩৬) অতএব কাফিরদের কি হল যে, তারা আপনার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে (৩৭) ডান ও বাম দিক থেকে দলে দলে। (৩৮) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতের জান্নাতে দাখিল করা হবে? (৩৯) কখনই নয়, আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে। (৪০) আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম (৪১) তাদের পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর মানুষ সৃষ্টি করতে এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়। (৪২) অতএব আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে। সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে—যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। (৪৪) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এক ব্যক্তি (অস্বীকারের ছলে) চায় সেই আযাব সংঘটিত হোক, যা কাফিরদের জন্য অবধারিত (এবং) যার কোন প্রতিরোধকারী নেই (এবং) যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হবে, যিনি সিঁড়িসমূহের (অর্থাৎ আকাশসমূহের) মালিক। (যেসব সিঁড়ি বেয়ে) ফেরেশতাগণ এবং (ঈমানদারদের) রূহ্ তাঁর কাছে ঊর্ধ্বারোহন করে। (তাঁর কাছে অর্থ ঊর্ধ্ব জগত, যা তাদের ঊর্ধ্ব গমনের শেষ সীমা। এই ঊর্ধ্ব গমনের পথ আকাশ, তাই আকাশকে সিঁড়ি বলা হয়েছে। সেই আযাব) এমন একদিনে হবে, যার পরিমাণ (পার্থিব) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (উদ্দেশ্য, কিয়ামতের দিন কিছুটা আসল পরিমাণের কারণে এবং কিছুটা ভয়াবহতার কারণে দিনটি কাফিরদের কাছে এত দীর্ঘ মনে হবে। কুফর ও অবাধ্যতার পার্থক্য হেতু এই দিনের ভয়াবহতা ও দৈর্ঘ বিভিন্নরূপ হবে—কারও জন্য অনেক বেশী এবং কারও জন্য কম। তাই এক আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এটা কেবল কাফিরদের জন্যই। হাদীসে আছে,

মু'মিনদের জন্য দিনটি এক ফরয নামায পড়ার সমান ছোট মনে হবে)। অতএব (আযাব যখন আসবেই) আপনি (তাদের বিরোধিতার মুখে) সবর করুন, এমন ছবর, যাতে অভিযোগ নেই। (অর্থাৎ তাদের কুফরের কারণে এমন মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না যে, মুখে অভিযোগ উচ্চারিত হয়ে যায়, বরং তাদের শাস্তি হবে—এই মনে করে সহ্য করে যান। তাদের অস্বীকার করার কারণ এই যে) তারা (কিয়ামতে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে) এই আযাবকে (অর্থাৎ এর বাস্তবতাকে) সুদূর পরাহত মনে করে, আর আমি (এর বাস্তবতা নিশ্চিতরূপে জানি বলে) একে আসন্ন দেখছি। (এই আযাব সেদিন সংঘটিত হবে) যেদিন আকাশ (রং-এ) তেলের তলানীর মত হবে (অন্য এক আয়াতে كَالدِّهَانِ অর্থাৎ লাল চামড়ার ন্যায় বলা হয়েছে। লাল গাঢ় হওয়ার কারণেও কালো মত রং হয়ে যায়। সুতরাং লাল ও কালো উভয়টিই শুদ্ধ। অথবা প্রথমে এক রং হবে, অতঃপর তা পরিবর্তিত হয়ে অন্য রং হবে। কোন কোন তফসীরবিদের ন্যায় যদি এর তফসীরেও যয়তুনের তলানী বলা হয়, তবে উভয়ের অর্থ এক হয়ে যাবে। সারকথা, আকাশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করবে এবং বিদীর্ণ হয়ে যাবে) এবং পর্বত-সমূহ হয়ে যাবে রঙিন (ধুন করা) পশমের ন্যায় (যেমন অন্য আয়াতে كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ বলা হয়েছে অর্থাৎ উড়তে থাকবে। পর্বতও বিভিন্ন রং-এর হয়ে থাকে। তাই রঙিন বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে আছে : وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ) এবং (সেদিন) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না (যেমন অন্য আয়াতে আছে لَا يَتَسَاءَلُونَ) যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে অর্থাৎ (একে অপরকে দেখবে কিন্তু কেউ কারও প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না। সূরা সাফ্ফাতে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদের কথা মতানৈক্যের স্থলে আছে, সহানুভূতির স্থলে নয়। তাই এই আয়াত সেই আয়াতের পরিপন্থী নয়। সেদিন) অপরাধী (অর্থাৎ কাফির) মুক্তিপণ-স্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, স্ত্রীকে, ভ্রাতাকে, গোষ্ঠীকে, যাদের মধ্যে সে থাকত এবং পৃথিবীর সবকিছুকে। অতঃপর নিজেকে (আযাব থেকে) রক্ষা করতে চাইবে। (অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। কাল পর্যন্তও যার জন্য জীবন উৎসর্গ করত, আজ তাকে নিজের স্বার্থে আযাবে সোপর্দ করে দিতে প্রস্তুত হবে কিন্তু) এটা কখনও হবে না। (অর্থাৎ কিছুতেই আযাব থেকে রক্ষা পাবে না বরং) এটা লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া (পর্যন্ত) তুলে দিবে। সে (নিজে) সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে (দুনিয়াতে সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং (ইবাদতে) বিমুখ হয়েছিল এবং

(অপরের প্রাপ্য আত্মসাৎ করে অথবা লালসাবশত) সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর তা আগলিয়ে রেখেছিল। (উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক নষ্ট করেছিল অথবা বিশ্বাস ও চরিত্র ভ্রষ্টতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ডাকা আক্ষরিক অর্থেও হতে পারে। অতঃপর আযাবের কারণ হয়, এরূপ অন্যান্য মন্দ স্বভাব; তা থেকে মু'মিনদের ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রমের ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ) মানুষ ভীরু সৃজিত হয়েছে। (মানুষ বলে এখানে কাফির মানুষ বোঝানো হয়েছে। সৃজিত হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, প্রথম সৃষ্টির সময় থেকেই সে এরূপ বরং অর্থ এই যে, তার স্বভাবে এমন উপকরণ রাখা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে এসব মন্দ স্বভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং স্বভাবগত ভীরুতা নয় বরং ভীরুতার ইচ্ছাধীন মন্দ প্রতিক্রিয়া বোঝানো হয়েছে। অতঃপর এসব প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে (বৈধ সীমার বাইরে) হাহুতাশ করতে থাকে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন (জরুরী হক আদায়ে) কৃপণ হয়ে যায়। (এ হচ্ছে مَنْ أَدْبَرَ থেকে বর্ণিত আযাবের কারণসমূহের পরিশিষ্ট)। কিন্তু নামাযী (অর্থাৎ মু'মিন আযাবের কারণসমূহের ব্যতিক্রম ভুক্ত) যে তার নামাযের প্রতি ধ্যান রাখে (অর্থাৎ নামাযে বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে অন্য দিকে ধ্যান দেয় না)। এবং যার ধনসম্পদে যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের হক আছে এবং যে প্রতিফল দিবসে বিশ্বাস করে এবং যে তার পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত থাকে। নিশ্চয়ই তার পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না। এবং যে তার যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে কিন্তু তার স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় (সংযত রাখে না); কেননা তাদের বেলায় এতে কোন দোষ নেই। অতএব যারা এদের ছাড়া (অন্য জায়গায় যৌনবাসনা চরিতার্থ করতে) চায়, তারাই (শরীয়তের) সীমালংঘনকারী। এবং যে তার আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যে তার সাক্ষ্যদানে সরল—নিষ্ঠাবান। (তাতে কমবেশী করে না)। এবং যে তার (ফরয) নামাযে যত্নবান। তারাই জান্নাতে সম্মানিত। (অতঃপর কাফিরদের আশ্চর্যজনক অবস্থা এবং কিয়ামতের অনস্বীকার্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে অর্থাৎ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণসমূহ যখন পরিষ্কাররূপে সপ্রমাণ হয়েছে, তখন) কাফিরদের কি হল যে, (এসব বিষয়বস্তুর প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য) তারা আপনার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে ছুটে আসছে। (অর্থাৎ এসব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করা উচিত ছিল কিন্তু তারা তা না করে সংঘবদ্ধ হয়ে এগুলোর প্রতি মিথ্যারোপ ও ঠাট্টাবিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে আসে। সেমতে নবুয়তের খবর শুনে শুনে তারা এ উদ্দেশ্যেই আগমন করত এবং ইসলামকে মিথ্যা ও নিজেদের সত্যপন্থী মনে করত। এর ভিত্তিতে তারা নিজেদেরকে জান্নাতের যোগ্য পাত্রও মনে করত, যেমন বলত : وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ

তাই এ বিষয়টি অস্বীকারের ছলে বলা হচ্ছে :) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতের জান্নাতে দাখিল করা হবে? কখনই নয়। (কেননা জাহান্নামের কারণাদির উপস্থিতিতে তারা জান্নাত কিরূপে পেতে পারে? কাফিররা এ প্রসঙ্গে কিয়ামতকেও অস্বীকার করত ও অসম্ভব মনে করত। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তাদের এই অসম্ভব মনে করা নির্বুদ্ধিতা

ছাড়া কিছুই নয়। কেননা) আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারাও জানে। (অর্থাৎ তারা জানে যে, বীর্য থেকে মানব সৃজিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, নির্জীব বীর্য ও সজীব মানবের যতটুকু ব্যবধান মৃতের অংশ ও পুনরুজ্জীবিত মানবের মধ্যে ততটুকু ব্যবধান নেই। কেননা, মৃতের অংশ পূর্বে একবার সজীব ছিল। সুতরাং কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করা নির্বুদ্ধিতা। অতঃপর অন্যভাবে কিয়ামতের অসম্ভাব্যতা দূর করার জন্য বলা হচ্ছেঃ) আমি শপথ করছি পূর্বাচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার (শপথের জওয়াব এইঃ) নিশ্চয়ই আমি তাদের পরিবর্তে (দুনিয়াতেই) উৎকৃষ্টতর মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়। (সুতরাং অধিকতর গুণসম্পন্ন নতুন মানব সৃষ্টি করা যখন সহজ, তখন তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? সত্য সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা বিরত হয় না, তখন) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়াকৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়। সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে যেন কোন এক উপাসনালয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি থাকবে (লজ্জায়) অবনমিত এবং তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেই দিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হত। (এখন তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سَأَلَ سَائِلٌ—سال سؤال শব্দটি কখনও তথ্যানুসন্ধানের অর্থে আসে। তখন আরবী ভাষায় এর সাথে عن অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং কখনও আবেদন ও কোন কিছু চাওয়ার অর্থে আসে। আয়াতে এই অর্থে আসার কারণে এর সাথে باء অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি আযাব চাইল। নাসায়ীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নযর ইবনে হারেস এই আযাব চেয়েছিল। সে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি মিথ্যারোপ করতে যেয়ে ধৃষ্টতাসহকারে বলেছিলঃ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم হে আল্লাহ্! যদি এই কোরআনই আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রেরণ করুন। (মাযহারী) আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শাস্তি দেন। (মাযহারী) সে আল্লাহ্র কাছে যে আযাব চেয়েছিল, অতঃপর তার কিছু স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এই আযাব কাফিরদের জন্য দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কিংবা উভয় জাহানে অবধারিত। একে প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, যিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই শেষ বাক্যটি প্রথম বাক্যের প্রমাণ। কারণ, যে আযাব মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে, তাকে প্রতিহত করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

معارج শব্দটি معرج এর বহুবচন। এটা عروج থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ঊর্ধ্বারোহণ করা। معراج ও معرج সেই সিঁড়িকে বলা হয়, যাতে নিচে থেকে উপরে আরোহণ করার জন্য অনেকগুলো স্তর থাকে। আয়াতে আল্লাহর বিশেষণ ذى المعارج এই অর্থে আনা হয়েছে যে, তিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই সুউচ্চ মর্তবা হচ্ছে উপরে-নিচে সপ্ত আকাশ। হযরত ইবনে মসউদ (রা) ذى المعارج-এর অর্থ করেছেন আকাশসমূহের মালিক।

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ—অর্থাৎ উপরে নিচে স্তরে স্তরে সাজানো এই মর্তবাসমূহের মধ্যে ফেরেশতাগণ ও 'রুহুল আমীন' অর্থাৎ জিবরাঈল আরোহন করেন জিবরাঈল ফেরেশতাগণেরই একজন। কিন্তু তার বিশেষ সম্মানের কারণে তাঁর পৃথক নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ—অর্থাৎ উল্লিখিত আযাব সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ আমার প্রাণ যে সত্তার করায়ত্ত, তাঁর শপথ করে বলছি —এই দিনটি মু'মিনের জন্য একটি ফরয নামায পড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে। —(মাযহারী)

হযরত আবূ হুরায়রা থেকে নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত আছেঃ يكون على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصر—অর্থাৎ এই দিনটি মু'মিনদের জন্য জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ের মত হবে।—(মাযহারী)

এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, পঞ্চাশ হাজার বছর হওয়া একটি আপেক্ষিক ব্যাপার অর্থাৎ কাফিরদের জন্য এতটুকু দীর্ঘ এবং মু'মিনদের জন্য এতটুকু খাট হবে।

কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য এক হাজার বছর, না পঞ্চাশ হাজার বছর? আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর এবং সূরা তানযীলের আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। আয়াতটি এইঃ

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ আল্লাহর কাজকর্ম পরিচালনা করে আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত, অতঃপর তাঁর দিকে ঊর্ধ্ব গমন করেন এমন এক দিকে যা তোমাদের হিসাব

অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। বাহ্যত উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। উপরোক্ত হাদীস দৃষ্টে এর জওয়াব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের দিক দিয়ে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফিরদের জন্য পঞ্চাশ হাজার বছর এবং মু'মিনদের জন্য এক নামা-যের ওয়াক্তের সমান হবে। তাদের মাঝখানে কাফিরদের বিভিন্ন দল থাকবে। সম্ভবত কোন কোন দলের জন্য এক হাজার বছরের সমান থাকবে। অস্থিরতা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সময় দীর্ঘ ও খাট হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। অস্থিরতা ও কষ্টের এক ঘণ্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশী মনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত অনুভূত হয়।

যে আয়াতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এই আয়াতে পার্থিব একদিন বোঝানো হয়েছে। এই দিনে জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, যা মানুষে অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগত। কেননা সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পাঁচশ বছরের ব্যবধান আছে। অতএব পাঁচশ বছর নিচে আসার এবং পাঁচশ বছর ঊর্ধ্ব গমনের ফলে মোট এক হাজার বছর মানুষের গতির দিক দিয়ে হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ এই দূরত্ব খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করেন। সুতরাং সূরা তানযীলের আয়াতে পার্থিব হিসাবেই 'একদিন' বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মা'আরিজে কিয়ামতের দিন বিধৃত হয়েছে, যা পার্থিব দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্য তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরূপ অনুভূত হবে।

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا—এখানে স্থান ও কালের দিক দিয়ে দূর ও নিকট বোঝানো হয়নি বরং সম্ভাব্যতার ও বাস্তবতার দূরবর্তিতা বোঝানো হয়েছে। আয়া-তের অর্থ এই যে, তারা কিয়ামতের বাস্তবতা—বরং সম্ভাব্যতাকেও সুদূর পরাহত মনে করে আর আমি দেখছি যে, এটা নিশ্চিত।

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ—حَمِيمٌ শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম বন্ধু। কিয়ামতের দিন কোন বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না —সাহায্য করা তো দূরের কথা। জিজ্ঞাসা না করার কারণ সামনে না থাকা নয় বরং আল্লাহ্র কুদরতে তাদের সবাইকে একে অপরের সামনেও করে দিবে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকবে যে, কেউ অপরের কষ্ট ও সুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে পারবে না।

كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى—لَظَى শব্দের অর্থ অগ্নির লেলিহান শিখা। شَوَى শব্দটি شَوَاةٌ -এর বহুবচন। অর্থ মাথা ও হাত-পায়ের চামড়া। অর্থাৎ

জাহান্নামের অগ্নি একটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা হবে, যা মস্তিষ্ক অথবা হাত-পায়ের চামড়া খুলে ফেলবে।

تَدْعُوا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى وَجَمَعَ فَاَوْعٰى—এই অগ্নি নিজে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, বিমুখ হয় এবং ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে এবং তা আগলিয়ে রাখে। পুঞ্জীভূত করার অর্থ অবৈধ পন্থায় পুঞ্জীভূত করা এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ ফরয ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। সহীহ্ হাদীসে তাই অর্থ করা হয়েছে।

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا—هلوع-এর শাব্দিক অর্থ লোভী, অধৈর্য, ভীরু ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এখানে অর্থ সেই ব্যক্তি, যে হারাম ধনসম্পদের লোভ করে। সায়ীদ ইবনে যুবায়র (রা) বলেন ঃ এর অর্থ কৃপণ এবং মুকাতিল বলেন ঃ এর অর্থ সংকীর্ণমনা ধৈর্যহীন ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকাছি। স্বয়ং কোরআনের ভাষায় هلوع শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দোষযুক্ত অবস্থায়, তখন তাকে অপরাধী কেন সাব্যস্ত করা হয়? জওয়াব এই যে, এখানে মানব-স্বভাবে নিহিত প্রতিভা ও উপকরণ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানব-স্বভাবে সৎ কাজের প্রতিভাও নিহিত রেখেছেন, তাকে জ্ঞান-গরিমাও দান করেছেন। কিতাব এবং রসূলের মাধ্যমে প্রত্যেক ভাল-মন্দ কাজের পরিণতিও বলে দিয়েছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় মন্দ উপকরণ অবলম্বন করে এবং স্বেচ্ছাকৃত মন্দ কর্মের কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। জন্মলগ্নে গচ্ছিত মন্দ উপ-করণের কারণে অপরাধী হয় না। هلوع শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোরআন পাক স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াকর্মই উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে ঃ

اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا—অর্থাৎ মানুষ এত ভীরু ও বে-সবর যে, যখন সে কোন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন হাহুতাশ শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে যখন কোন সুখ-শান্তি ও আরাম লাভ করে, তখন কৃপণ হয়ে যায়। এখানে শরীয়তের সীমার বাইরে হাহুতাশ বোঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কৃপণতা বলে ফরয ও ওয়াজিব কর্তব্য পালনে ত্রুটি বোঝানো হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মানুষের এই বদ অভ্যাস থেকে সৎকর্মী মু'মিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে তাদের সৎ ক্রিয়াকর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ থেকে শুরু করে عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে مصلين শব্দ বলে مؤمنين বুঝিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামায মু'মিনের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ আলামত। যারা নামাযী, তারাই মু'মিন বলার যোগ্য

হতে পারে। অতঃপর তাদের গুনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ —অর্থাৎ যে নামাযী তার সমগ্র নামাযে নামাযের দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে, এদিক-সেদিক তাকায় না। ইমাম বগভী (র) বর্ণিত রেওয়ায়েতে আবুল খায়র বলেনঃ আমি সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াতের অর্থ কি এই যে, যারা সর্বক্ষণ নামায পড়ে? তিনি বললেনঃ না, এই অর্থ নয় বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাযের দিকেই নিবিষ্ট থাকে এবং ডানে-বামে ও আগেপিছে তাকায় না। অতঃপর وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ বাক্যে নামায ও নামাযের আদবসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বিষয়বস্তুতে পুনরুক্তি নেই। এর পরে উল্লিখিত মু'মিনদের গুণাবলী প্রায় তাই, যা সূরা মু'মিনূনে বর্ণিত হয়েছে।

যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত তা হ্রাসবৃদ্ধি করার ক্ষমতা কারও নেইঃ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ——এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে। তাই যাকাতের নেসাব ও পরিমাণ উভয়টি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে স্থিরীকৃত। কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে এগুলো পরিবর্তিত হতে পারে না।

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ—এর পূর্বের আয়াতে যৌনকামনা চরিতার্থ করার বৈধ পাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ও মালিকানাধীন বাঁদী উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে এগুলো ছাড়া যৌনকামনা চরিতার্থ করার প্রত্যেক প্রকারকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হস্তমৈথুন করা হারামঃ অধিকাংশ ফিকাহবিদ হস্তমৈথুনকেও উপরোক্ত আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত করে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে জুরায়জ বলেনঃ আমি হযরত আতাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি মকরূহ বললেন। তিনি আরও বললেনঃ আমি শুনেছি, হাশরের ময়দানে কিছু এমন লোক আসবে, যাদের হাত গর্ভবতী হবে। আমার মনে হয় এরাই হস্তমৈথুনকারী। হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়র (রা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করেছেন, যারা হস্তমৈথুনে লিপ্ত ছিল।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ ملعون من نكح يده অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে হাতকে বিবাহ করে। এই হাদীসের সনদ অগ্রাহ্য।—(মাযহারী)

وَالَّذِينَ هُمْ :সব আল্লাহ্‌র হক ও সব বান্দার হক আমানতের অন্তর্ভুক্তঃ

لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ—এই আয়াতে আমানত শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য এক আয়াতেও তদ্রূপ করা হয়েছে। আয়াতটি এইঃ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا—উভয় আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমানত কেবল সেই অর্থকেই বলে না, যা কেউ আপনার হাতে সোপর্দ করে বরং যেসব ওয়াজিব হক আদায় করা আপনার দায়িত্বে ফরয, সেগুলো সবই আমানত। এগুলোতে ত্রুটি করা খিয়ানত। এতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহ্‌র হকও দাখিল আছে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হক আপনার উপর ওয়াজিব করা হয়েছে অথবা কোন লেনদেন ও চুক্তির মাধ্যমে আপনি যেসব হক নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন, সেগুলোও দাখিল আছে। এগুলো আদায় করা ফরয এবং এতে ত্রুটি করা খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত।—(মাযহারী)

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ—এখানেও শাহাদত শব্দটিকে বহুবচন আনার কারণে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'শাহাদত' তথা সাক্ষ্যের অনেক প্রকার আছে এবং প্রত্যেক প্রকার সাক্ষ্য কায়েম রাখা ওয়াজিব। এতে ঈমান, তওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্যও দাখিল এবং রমযানের চাঁদ, শরীয়তের বিচার-আচার ও পারস্পরিক লেনদেনের সাক্ষ্যও দাখিল আছে। এসব সাক্ষ্য গোপন করা ও এতে কমবেশী করা হারাম। বিশুদ্ধভাবে এগুলোকে কায়েম করা আয়াত দৃষ্টে ফরয।—(মাযহারী)

سورة نوح

সূরা নূহ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২৮ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۝ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ قَالَ
رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا
فِرَارًا ۝ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي
آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝ ثُمَّ إِنِّي
دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم
مِّدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل
لَّكُمْ أَنْهَارًا ۝ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝
أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ
نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝ ثُمَّ

يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ
عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾
وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ۙ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا
كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ
أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ
أَنصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ
دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا
فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আমি নূহ্‌কে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি একথা বলে ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসার আগে। (২) সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। (৩) এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (৪) আল্লাহ্ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্দিষ্টকাল যখন উপস্থিত হবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে! (৫) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি ; (৬) কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। (৭) আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। (৮) অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, (৯) অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। (১০) অতঃপর বলেছি ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (১১) তিনি

তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, (১২) তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (১৩) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছ না। (১৪) অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি করেছেন। (১৫) তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন (১৬) এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে (১৭) আল্লাহ্ তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদ্গত করেছেন। (১৮) অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুত্থিত করবেন। (১৯) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিছানা (২০) যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে। (২১) নূহ্ বলল : হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করছে এমন লোককে, যার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। (২২) আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। (২৩) তারা বলছে : তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে। (২৪) অথচ এরা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব আপনি জালিমদের পথভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে দিন। (২৫) তাদের গোনাহ্ সমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর দাখিল করা হয়েছে জাহান্নামে। অতঃপর তারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। (২৬) নূহ্ আরও বলল : হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। (২৭) যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফির। (২৮) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে —তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং জালিমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি নূহ্ (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের প্রতি (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছিলাম একথা বলে : তুমি তোমার সম্প্রদায়কে (কুফরের শাস্তি থেকে) সতর্ক কর তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসার আগে (অর্থাৎ তাদেরকে বল : আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে—দুনিয়াতে মহাপ্লাবন কিংবা পরকালে জাহান্নাম) সে (তার সম্প্রদায়কে) বলল : হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। (আমি বলি :) তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর (অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন কর), তাঁকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। তিনি তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন এবং তোমাদেরকে নির্দিষ্ট (অর্থাৎ মৃত্যুর) সময় পর্যন্ত (বিনা শাস্তিতে) অবকাশ দিবেন (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন না করলে মৃত্যুর পূর্বে যে শাস্তির ওয়াদা করা হয়, বিশ্বাস স্থাপন করলে তা আসবে না। এছাড়া মৃত্যুর তো) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় (আছে) যখন (তা) আসবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না। (অর্থাৎ মৃত্যুর আগমন সর্বাবস্থায় জরুরী—ঈমান অবস্থায়ও,

কুফর অবস্থায়ও। কিন্তু উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, এক অবস্থায় পরকালের আযাব ছাড়া দুনিয়াতেও আযাব হবে এবং এক অবস্থায় উভয় জাহানে আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে)। খুব চমৎকার হত যদি তোমরা (এসব বিষয়) বুঝতে! (যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত এসব উপদেশ সম্প্রদায়ের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারল না, তখন) নূহ্ (আ) দোয়া করলেন: হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত্রি (সত্যধর্মের প্রতি) দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। (পলায়ন এভাবে করেছে যে) আমি যতবারই তাদেরকে (সত্যধর্মের প্রতি) দাওয়াত দিয়েছি, যাতে (ঈমানের কারণে) আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে (যাতে সত্য কথা কানে প্রবেশও না করে; এটা চরম ঘৃণা)। মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে যাতে সত্য ভাষণদাতা দেখাও না যায় এবং সে-ও তাদেরকে না দেখে (তারা কুফরে) জেদ করেছে এবং (আমার আনুগত্যের প্রতি চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে)। অতঃপর (এই ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও আমি বিভিন্নভাবে উপদেশ দিতে থাকি। সেমতে) আমি তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে দাওয়াত দিয়েছি (অর্থাৎ সাধারণ বক্তৃতা ও ওয়ায করেছি, যাতে স্বভাবতই আওয়াজ উচ্চ হয়ে যায়)। অতঃপর আমি তাদেরকে (বিশেষ সম্বোধনস্বরূপ) ঘোষণা-সহকারে বুঝিয়েছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। (অর্থাৎ সম্ভাব্য সব পন্থায়ই বুঝিয়েছি। এ ব্যাপারে) আমি বলেছি: তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর (অর্থাৎ ঈমান আন, যাতে গোনাহ্ ক্ষমা করা হয়)। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (তোমরা ঈমান আনলে পারলৌকিক নিয়ামত ক্ষমা ছাড়া তিনি ইহলৌকিক নিয়ামতও দান করবেন। সেমতে) তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (অধিকাংশ মন নগদ ও দ্রুত নিয়ামত অধিক তলব করে, তাই এসব নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন: তারা সংসারের প্রতি লোভী ছিল, তাই এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আমি তাদেরকে আরও বলেছি:) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী হচ্ছ না। অথচ (শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হওয়ার কারণ বিদ্যমান আছে। তা এই যে) তিনি তোমাদেরকে নানাভাবে সৃষ্টি করেছেন। উপাদান-চতুষ্টয় দ্বারা তোমাদের খাদ্য, খাদ্য থেকে বীর্য, বীর্য থেকে জমাট রক্ত, মাংসপিণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে তোমরা পরিপূর্ণ মানব হয়েছ। এটা মানবসত্তার প্রমাণ, অতঃপর বিশ্বচরাচরের প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে: তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং তথায় চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে? আল্লাহ্ তা'আলা তোমা-দের মৃত্তিকা থেকে উদ্গত করেছেন। (হয় এভাবে যে, হযরত আদম [আ] মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছেন, না হয় এভাবে যে, মানুষ বীর্য থেকে সৃজিত হয়েছে, বীর্য খাদ্য থেকে, খাদ্য উপাদান-চতুষ্টয় থেকে এবং উপাদান-চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকাই প্রবল)। অতঃপর তাতে (মৃত্যুর পর) ফিরিয়ে নিবেন এবং (কিয়ামতে) আবার (মৃত্তিকা থেকে) পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা (সদৃশ) করেছেন, যাতে তোমরা তার প্রশস্ত পথে চলাফেরা কর। (এসব কথা নূহ্ [আ] আল্লাহ্ তা'আলার কাছে

ফরিয়াদ করে বললেন। অবশেষে) নূহ্ (আ) বললেনঃ হে আমার পালনকর্তা, তারা আমাকে অমান্য করেছে আর এমন লোকদের অনুসরণ করছে, যাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে, (এখানে সম্প্রদায়ের অনুসৃত সরদারবর্গ বোঝানো হয়েছে। এই সরদারদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিই তাদের অবাধ্যতার কারণ ছিল। ক্ষতি করা এই অর্থেই বলা হয়েছে। তাদের অনুসৃত সরদাররা এমন) যারা (সত্যকে মিটা-নোর কাজে) ভয়ানক চক্রান্ত করেছে। তারা (অনুসারীদেরকে) বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে কখনও ত্যাগ করো না এবং (বিশেষভাবে) ত্যাগ করোনা ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে (সমধিক প্রসিদ্ধির কারণে এসব দেবদেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। এরা অনেককে পথহারা করেছে। (এই পথভ্রষ্ট করাই ছিল ভয়ানক চক্রান্ত। আপনার বক্তব্য لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ থেকে আমার বুঝতে বাকী নেই যে, এরা ঈমান আনবে না। তাই দোয়া করি) আপনি এই জালিমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন, (যাতে ওরা ধ্বংস হওয়ার যোগ্য পাত্র হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, দোয়ার উদ্দেশ্য অধিক পথভ্রষ্টতা নয় বরং ধ্বংসের যোগ্য পাত্র হওয়ারই দোয়া করা হয়েছে। ওদের শেষ পরিণতি এই হয় যে) ওদের এসব গোনাহ্র কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর (অর্থাৎ নিমজ্জিত করার পর) জাহান্নামে দাখিল করা হয়েছে। অতঃপর তারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। নূহ্ (আ) আরও বললেনঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না, (বরং সবাইকে ধ্বংস করে দিন। অতঃপর এর কারণ বর্ণিত আছেঃ) আপনি যদি ওদেরকে রেহাই দেন, তবে (لَنْ يُّؤْمِنَ—বক্তব্য অনুযায়ী) তারা আপনার বান্দা-দেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং (পরেও) তাদের কেবল পাপাচারী ও কাফির সন্তানই জন্মগ্রহণ করবে। (কাফিরদের জন্য বদদোয়া করার পর মু'মিনদের জন্য নেক দোয়া করলেনঃ) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যারা মু'মিন অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করে, তাদেরকে (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুত্র কেনান ব্যতীত পরিবার-পরিজনকে) এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন। (এ স্থানে উদ্দেশ্য যেহেতু কাফির-দের জন্য বদদোয়া ছিল, তাই পরিশেষে আবার বদদোয়াই করা হচ্ছেঃ) এবং জালিম-দের ধ্বংস আরও বাড়িয়ে দিন। [অর্থাৎ ওদের উদ্ধারের যেন কোন উপায় না থাকে এবং ধ্বংসই যেন প্রাপ্ত হয়। এই দোয়ার আসল উদ্দেশ্য এটাই ছিল। বাহ্যত জানা যায় যে, নূহ্ (আ)-র পিতামাতা মু'মিন ছিলেন। এর বিপরীত প্রমাণিত হলে দূরবর্তী পিতৃ ও মাতৃপুরুষ বুঝানো হবে]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ—مِنْ অব্যয়টি প্রায়শ কতক অর্থ জ্ঞাপন করার

জন্য ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের কতক গোনাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র হক সম্পর্কিত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কেননা, বান্দার হক মাফ হওয়ার জন্য ঈমান আনার পরও একটি শর্ত আছে। তা এই যে, হকটি আদায়যোগ্য হলে তা আদায় করতে হবে, যেমন আর্থিক দায়-দেনা এবং আদায়যোগ্য না হলে তা মাফ নিতে হবে, যেমন মুখে কিংবা হাতে কাউকে কষ্ট দেওয়া।

হাদীসে বলা হয়েছে, ঈমান আনলে পূর্ববর্তী সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। এতেও বান্দার হক আদায় করা অথবা মাফ নেওয়া শর্ত। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আয়াতে من অব্যয়টি অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ দৃষ্টে উল্লিখিত শর্তটি অপরিহার্য।

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى — أجل مسمى এর অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। অর্থাৎ বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে তোমাদেরকে কোন পার্থিব আযাবে ধ্বংস করবেন না। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, ঈমান না আনলে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই তোমা-দেরকে আযাবে ধ্বংস করে দেওয়ারও আশংকা আছে। বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের মাঝে মাঝে এরূপ শর্ত থাকে যে, সে অমুক কাজ করলে উদাহরণত তার বয়স আশি বছর হবে এবং না করলে ষাট বছর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এমনিভাবে অকৃতজ্ঞতার কাজে বয়স হ্রাস পাওয়া এবং কৃতজ্ঞতার কাজে বয়স বৃদ্ধি পাওয়াও সম্ভবপর। পিতা মাতার আনুগত্য ও সেবা-যত্নের ফলে বয়স বেড়ে যাওয়াও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

মানুষের বয়স হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা : তফসীরে মাযহারীতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : তকদীর দুই প্রকার—১. চূড়ান্ত অকাট্য এবং ২. শর্তযুক্ত। অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুযে এভাবে লিখা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্য করলে তার বয়স উদাহরণত ষাট বছর হবে এবং আনুগত্য না করলে পঞ্চাশ বছর বয়সে খতম করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় প্রকার তকদীরে শর্তের অনুপস্থিতিতে পরিবর্তন হতে পারে।

উভয় প্রকার তকদীর কোরআন পাকের এই আয়াতে উল্লিখিত আছে।

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লওহে-মাহ্ফুযে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে থাকেন এবং তাঁর কাছে রয়েছে আসল কিতাব। 'আসল কিতাব' বলে সেই কিতাব বুঝানো হয়েছে, যাতে অকাট্য তকদীর লিখিত আছে। কেননা, শর্তযুক্ত তকদীরে লিখিত শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ ব্যক্তি শর্ত পূর্ণ করবে কি করবে না। তাই চূড়ান্ত তকদীরে অকাট্য ফয়সালা লিখা হয়।

হযরত সালমান ফারসীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد فى العمر الا البر —অর্থাৎ দোয়া ব্যতীত কোন কিছু আল্লাহ্র ফয়সালা রোধ করতে পারে না এবং পিতামাতার বাধ্যতা ব্যতীত কোন কিছু বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না। এই হাদীসের মতলব এটাই যে, শর্তযুক্ত তকদীরে এসব কর্মের কারণে পরিবর্তন হতে পারে। সার কথা, আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়াকে তাদের ঈমান আনার উপর নির্ভরশীল করে তাদের বয়স সম্পর্কে শর্তযুক্ত তকদীর বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা হয়ত নূহ্ (আ)-কে এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকবেন। এ কারণে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলে দিলেন, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যে আসল বয়স নির্ধারণ করেছেন, সেই পর্যন্ত তোমরা অবকাশ পাবে এবং কোন পার্থিব আযাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা ঈমান না আন, তবে এই আসল বয়সের পূর্বেই আল্লাহ্র আযাব তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। এমতাবস্থায় পরকালের আযাব ভিন্ন হবে। অতঃপর আরও বলে দিলেন যে, ঈমান আনলেও চিরতরে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে না বরং অকাট্য তকদীরে তোমাদের যে বয়স লিখিত আছে, সেই বয়সে মৃত্যু আসা অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে এই বিশ্ব-চরাচরকে চিরস্থায়ী করেন নি এখানকার প্রত্যেক বস্তু অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এ তে ঈমান ও আনুগত্য এবং কুফর ও গোনাহের কারণে কোন পার্থক্য হয় না। إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে।

অতঃপর স্বজাতির সংশোধন ও ঈমানের জন্য নূহ্ (আ)-র বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বিরামহীন-ভাবে নিয়োজিত থাকা এবং সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে নিরাশ হয়ে বদদোয়া করা এবং সমগ্র জাতির নিমজ্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছেঃ নূহ্ (আ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন এবং কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও চেষ্টায় ক্লান্ত হননি এবং কোন দিন নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি সবর করেন।

যাহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেনঃ তাঁর সম্প্রদায়ের প্রহা-রের চোটে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাঁকে একটি কম্বলে জড়িয়ে গৃহে রেখে যেত। তারা মনে করত, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী দিন যখন চৈতন্য ফিরে আসত, তখন আবার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিতেন এবং প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ওবায়দ ইবনে আস-রেশী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর গলা টিপে দিত। ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলতেন। পুনরায় চেতনা ফিরে এলে তিনি এই দোয়া করতেনঃ رب اغفر لقومى انهم لا يعلمون —অর্থাৎ হে আমার

পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। কারণ, ওরা অবুঝ। তাদের এক পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তিনি দ্বিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। দ্বিতীয় পুরুষের পর তৃতীয় পুরুষের ব্যাপারেও এমনি আশাবাদী হয়ে তিনি কর্তব্য-পালনে মশগুল থাকতেন। কারণ, তাদের পুরুষানুক্রমিক বয়স হযরত নূহ্ (আ)-এর বয়সের ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। তিনি মো'জেযা হিসেবে দীর্ঘ বয়স প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন সম্প্রদায়ের একের পর এক পুরুষ অতিক্রান্ত হতে থাকে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যৎ পুরুষ বিগত পুরুষ অপেক্ষা অধিক দুষ্টমতি প্রমাণিত হতে থাকে, তখন হযরত নূহ্ (আ) সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন এবং বললেন ঃ আমি ওদেরকে দিবা-রাত্রি দলবদ্ধভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে, প্রকাশ্যে ও সংগোপনে —সারকথা, সর্বতোভাবে পথে আনার চেষ্টা করেছি। কখনও আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছি, কখনও জান্নাতের নিয়ামতরাজির লোভ দেখিয়েছি। আরও বলেছি—ঈমান ও সৎ কর্মের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন এবং কখনও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী পেশ করে বুঝিয়েছি কিন্তু তারা কিছুতেই কর্ণপাত করল না। অপর দিকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ)-কে বলে দিলেন ঃ আপনার সমগ্র সম্প্র-দায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। اَنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ আয়াতের মতলব তাই। এমনি নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে হযরত নূহ্ (আ)-র মুখে বদদোয়া উচ্চারিত হল। ফলে সমগ্র সম্প্রদায় নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। তবে মু'মিনগণ রক্ষা পেল। তাদেরকে একটি জলযানে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে যেয়ে নূহ্ (আ) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইস্তেগফার অর্থাৎ ঈমান এনে বিগত গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দাওয়াত দেন এবং এর পার্থিব উপকার এই বর্ণনা করেন যে,

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ—এ থেকে অধিকাংশ আলিম বলেন যে, গোনাহ্ থেকে তওবা ও ইস্তেগফার করলে আল্লাহ্ তা'আলা যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে দেন না এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। কোথাও কোন রহস্যের কারণে খিলাফও হয় কিন্তু তওবা ইস্তেগফারের ফলে পার্থিব বিপদাপদ দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র প্রচলিত রীতি। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا—এই আয়াতে তওহীদ ও কুদরতের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সাজানোর কথা এবং তাতে চন্দ্রের আলোকোজ্জ্বল হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

এতে فِيهِنَّ বলায় বাহ্যত বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশগাত্রে অবস্থিত। কিন্তু আধুনিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত। এ সম্পর্কে সূরা ফোরকানের جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا আয়াতের তফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নূহ্ (আ) আরও বললেন ঃ

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا—অর্থাৎ তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিজেরাতো উৎপীড়ন করতই, উপরন্তু জনপদের গুণ্ডা ও দুষ্ট লোকদেরকেও নূহ্ (আ)-র পিছনে লেলিয়ে দিত। তারা পরস্পরে এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا অর্থাৎ আমরা আমাদের দেবদেবী বিশেষত এই পাঁচজনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লিখিত শব্দগুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, এই পাঁচজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম ও নূহ্ (আ)-র আমলের মাঝামাঝি। তাঁদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাঁদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্র ইবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল ঃ তোমরা যে সব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সামনে রেখে নও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল ঃ তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল। তারা এই মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিমাপূজার সূচনা হয়ে গেল। উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় পারস্পরিক চুক্তিতে তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا — অর্থাৎ এই জালিমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাতিকে সৎ পথ প্রদর্শন করা পয়গম্বরগণের কর্তব্য। নূহ্ (আ) তাদের পথভ্রষ্টতার দোয়া করলেন কিভাবে? জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে নূহ্ (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান হবে না। সে মতে পথভ্রষ্টতা ও কুফরের উপর তাদের মৃত্যুবরণ নিশ্চিত ছিল। নূহ্ (আ) তাদের পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেওয়ার দোয়া করলেন, যাতে সত্বরই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا — অর্থাৎ তারা তাদের গোনাহ্ অর্থাৎ কুফর ও শিরকের কারণে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়েছে। পানিতে ডুবা ও অগ্নিতে প্রবেশ করা বাহ্যত পরস্পর বিরোধী আযাব হলেও আল্লাহ্র কুদরতের পক্ষে অবাস্তব নয়। বলা বাহুল্য, এখানে জাহান্নামের অগ্নি বোঝানো হয়নি। কেননা, তাতে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর প্রবেশ করবে বরং এটা বরযখী অগ্নি। কোরআন পাক এই বরযখী অগ্নিতে প্রবেশ করার খবর দিয়েছে।

কবরের আযাব কোরআন দ্বারা প্রমাণিত : এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, বরযখ জগতে অর্থাৎ কবরে বাস করার সময়ও মৃতদের আযাব হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, কবরে যখন কু-কর্মীর আযাব হবে, তখন সৎকর্মীরাও কবরে সুখ ও নিয়ামত-প্রাপ্ত হবে। সহীহ্ ও মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে কবর অভ্যন্তরে আযাব ও সওয়াব হওয়ার বর্ণনা এত অধিক ও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা হয়েছে এবং এটা স্বীকার করা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা-আতের আলামত।

سورة الجن

সূরা জিন্ন

মক্কায় অবতীর্ণঃ ২৮ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝
وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝ وَأَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ
وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ
بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن
يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا
وَشُهُبًا ۝ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ
الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۝ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي
الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا
دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ۝ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي
الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ۝ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن
يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ
وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝ وَأَمَّا

الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝١٥ وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ
لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۝١٦ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ
يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝١٧ وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ
اَحَدًا ۝١٨ وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝١٩
قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا ۝٢٠ قُلْ اِنِّيْ لَآ
اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ۝٢١ قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ
وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۝٢٢ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ
وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۝٢٣
حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ
عَدَدًا ۝٢٤ قُلْ اِنْ اَدْرِيْۤ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ
رَبِّيْۤ اَمَدًا ۝٢٥ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا ۝٢٦ اِلَّا مَنِ
ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ
خَلْفِهٖ رَصَدًا ۝٢٧ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ
بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝٢٨

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুনঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছেঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি, (২) যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না (৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেন নি এবং তার কোন সন্তান নেই। (৪) আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। (৫) অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা

বলতে পারে না। (৬) অনেক মানুষ অনেক জিন্ন্-এর আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিন্ন্দের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (৭) তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। (৮) আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (৯) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। (১০) আমরা জানি না পৃথিবী-বাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন। (১১) আমাদের কেউ কেউ সৎ কর্ম পরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (১২) আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাকে অপারক করতে পারব না। (১৩) আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করে না। (১৪) আমাদের কিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। (১৫) আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। (১৬) আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম (১৭) যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে উদীয়মান আযাবে পরিচালিত করবেন (১৮) এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্কে স্মরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে ডেকোনা। (১৯) আর যখন আল্লাহ্র বান্দা তাকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল, তখন অনেক জিন্ন্ তার কাছে ভিড় জমাল। (২০) বলুনঃ আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না। (২১) বলুনঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। (২২) বলুনঃ আল্লাহ্র কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (২৩) কিন্তু আল্লাহ্র বাণী পৌঁছানো ও তার পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ্ ও তার রসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) এমন কি যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে, কার সাহায্য-কারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম। (২৫) বলুনঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্য কোন মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন। (২৬) তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না (২৭) তার মনোনীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন, (২৮) যাতে আল্লাহ্ জেনে নেন যে, রসূলগণ তাদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছিয়েছেন কি না। রসূল-গণের কাছে যা আছে, তা তার জ্ঞানগোচর। তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে নুযূল ঃ আয়াতসমূহের তফসীরের পূর্বে কয়েকটি ঘটনা জানা দরকার। প্রথম ঘটনা এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পূর্বে শয়তানরা আকাশে পৌঁছে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পর উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে তাদের গতিরোধ করা হল। এই অভাবিত ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে একদল জিন্ন্ রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সূরা আহকাফে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা এই ঃ মূর্খতা যুগে মানুষ সফরে থাকা অবস্থায় যখন কোন জঙ্গলে অথবা বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন জিন্ন্দের সরদারের হিফাযত পাওয়ার বিশ্বাস নিয়ে এই কথাগুলো উচ্চারণ করত ঃ

اعوذ بعزيز هذا الوادى من شر سفهاء قومه—অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের সরদারের আশ্রয় গ্রহণ করছি তার সম্প্রদায়ের নির্বোধ দুষ্টদের থেকে। তৃতীয় ঘটনা এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বদদোয়ার ফলে মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। চতুর্থ ঘটনা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত শুরু করলে বিরোধী কাফিররা তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। প্রথমোক্ত দুটি ঘটনা তফসীরে দুররে মনসূর থেকে এবং শেষোক্ত দুটি ঘটনা তফসীরে ইবনে কাসীর থেকে নেওয়া হয়েছে।

আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ আমার কাছে ওহী এসেছে যে, জিন্ন্দের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর (স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে) তারা বলেছে ঃ আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (বিষয়বস্তু দেখে কোরআন প্রতিপন্ন হয়েছে এবং মানব রচিত কালাম-সদৃশ নয় দেখে বিস্ময়কর প্রতিপন্ন হয়েছে)। আমরা (এখন থেকে) কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। (এটা 'বিশ্বাসস্থাপন করেছি' কথারই ব্যাখ্যা)। এবং (তারা নিম্নোদ্ধৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কেও পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করল ঃ) আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার শান উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। (কেননা এটা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব। এটা 'শরীক করব না' কথার ব্যাখ্যা)। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। (অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থাকা ইত্যাদি কথাবার্তা)। অথচ আমরা পূর্বে মনে করতাম মানুষ ও জিন্ন্ কখনও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে না। (কেননা, এটা চরম ধৃষ্টতা। এতে তারা তাদের মুশরিক হওয়ার কারণ বর্ণনা করছে। অর্থাৎ অধিকাংশ জিন্ন্ ও মানব শিরক করত। এতে আমরা মনে করলাম যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে এর অধিক লোক মিথ্যা বলবে না। সে মতে আমরাও সে পথ অবলম্বন করলাম। অথচ যে কোন মানবগোষ্ঠীর ঐকমত্য সত্যতার প্রমাণ নয় এবং প্রত্যেক ঐকমত্যের অনুসরণ ওযর হতে পারে না। উপরোক্ত শিরক ছিল অভিন্ন ও ব্যাপক। এছাড়া কিছু সংখ্যক মানুষের একটি বিশেষ শিরক ছিল, যার ফলে জিন্ন্দের কুফর ও ঔদ্ধত্য বেড়ে যায়। তা এই যে,) অনেক মানুষ অনেক জিন্ন্-এর আশ্রয় গ্রহণ করত। ফলে তারা জিন্ন্দের আত্মম্ভরিতা আরও

বাড়িয়ে দিত। (তারা এই অহমিকায় লিপ্ত হত যে, আমরা জিন্ন্‌দের সর্দার তো পূর্ব থেকেই ছিলাম, এখন মানুষও আমাদেরকে বড় মনে করে। এতে তাদের আত্মম্ভরিতা চরমে পৌঁছে এবং কুফর ও হঠকারিতায় আরও বাড়াবাড়ি শুরু করে। এপর্যন্ত তওহীদ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর রিসালত সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ অর্থাৎ জিন্ন্‌রা পরস্পরে আলোচনা করল) আমরা (পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী) আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী (অর্থাৎ প্রহরারত ফেরেশতা) ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (অর্থাৎ এখন প্রহরা বসেছে, যাতে জিন্ন্‌রা ঐশী সংবাদ নিয়ে যেতে না পারে এবং কেউ গেলে উল্কাপিণ্ড দ্বারা বিতাড়িত করা হয়। ইতিপূর্বে) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। (এসব ঘাঁটি আকাশগাত্রে কিংবা বায়ুমণ্ডলে কিংবা মহাশূন্যে হতে পারে। জিন্ন্‌রা অতিশয় সূক্ষ্ম এবং তাদের কোন ওজন নেই। তাই তারা এসব ঘাঁটিতে অবস্থান করতে সক্ষম, যেমন কতক পক্ষী বায়ুমণ্ডলে চলতে চলতে নিশ্চল হয়ে অবস্থান করতে পারে)। এখন কেউ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। [উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে সূরা হিজরের দ্বিতীয় রুকূতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রিসালত সম্পর্কিত এই বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মোহাম্মদ (সা)-কে রিসালত দান করেছেন এবং বিভ্রান্তি দূর করার জন্য অতীন্দ্রিয়বাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। সংবাদ চুরি বন্ধ হওয়ার কারণেই এই জিন্ন্‌রা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছেছিল। প্রথম ঘটনা তাই বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উল্লিখিত বিষয়বস্তু সমূহের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হচ্ছেঃ] আমরা জানি না (এই নতুন পয়গম্বর প্রেরণ দ্বারা) পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদেরকে হিদায়ত করার ইচ্ছা রাখেন? (অর্থাৎ পয়গম্বর প্রেরণের সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য জানা নেই। কারণ রসূলের অনুসরণ করলে সঠিক দিক নির্দেশ পাওয়া যায় এবং বিরোধিতা করলে ক্ষতি ও শাস্তি ভোগ করতে হয়। ভবিষ্যতে অনুসরণ হবে, না বিরোধিতা হবে তা আমাদের জানা নেই। ফলে পয়গম্বর প্রেরণ করে জাতিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য, না হিদায়ত করা উদ্দেশ্য, তা আমরা জানি না। একথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তাদের অনুমান ছিল তাদের সম্প্রদায়ে মু'মিন কম হবে। কাজেই অধিকাংশ লোক শাস্তির যোগ্য হবে। এছাড়া জিন্ন্‌রা অদৃশ্যের খবর জানে না বলে তওহীদের বিষয়বস্তু জোরদার করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক লোকের বিশ্বাস এই যে, জিন্ন্‌রা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে)। আমাদের কেউ কেউ (পূর্ব থেকেই) সৎ কর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। (সার কথা) আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (এমনিভাবে এই পয়গম্বরের খবর শুনে এখনও আমাদের মধ্যে উভয় প্রকার লোক আছে। আমাদের পথ এই যে,) আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে যেয়ে) আল্লাহ্‌কে পরাস্ত করতে পারব না এবং (অন্য কোথাও) পলায়ন করেও তাঁকে পরাভূত করতে পারব না। (পলায়ন করার অর্থ পৃথিবী ছাড়া আকাশে চলে যাওয়া। এটা فِى الْاَرْضِ এর বিপরীত হিসাবে বোঝা যায়।

অন্য এক আয়াতে তদ্রূপ বলা হয়েছে ঃ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَاءِ —এর উদ্দেশ্যও সম্ভবত সতর্ক করা যে, আমরা কুফরী করলে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পাব না। তাদের বিভিন্ন পথ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কারও কারও ঈমান না আনা সত্য যে সত্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা, এটা চিরন্তন রীতি)। আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব যে (আমাদের মত) তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, যে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করবে না। (লোকসান হল কোন সৎকাজ অলিখিত থেকে যাওয়া এবং জোর-জবর হল যে গোনাহ্ করা হয়নি, তা লিখিত হওয়া। উৎসাহ প্রদানই সম্ভবত এ কথার উদ্দেশ্য)। আমাদের কিছু সংখ্যক (এসব ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের বিষয়বস্তু বোঝে) আজ্ঞাবহ (হয়ে গেছে) এবং কিছু সংখ্যক (পূর্বের ন্যায়) বিপথগামী (হয়ে গেছে)। যারা আজ্ঞাবহ হয়েছে, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। (ফলে তারা সওয়াবের অধিকারী হবে)। আর যারা বিপথগামী, তারা জাহান্নামের ইন্ধন। (এ পর্যন্ত জিন্নদের কথাবার্তা সমাপ্ত হল। অতঃপর ওহীর আরও বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আমাকে আরও ওহী করা হয়েছে যে) তারা (অর্থাৎ মক্কাবাসীরা) যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম। যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি (যে, নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, না অকৃতজ্ঞ হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কাবাসীরা যদি উপরে জিন্ন-দের উক্তিতে নিন্দিত শিরক না করত, তবে তৃতীয় ঘটনায় বর্ণিত দুর্ভিক্ষ তাদের উপর চেপে বসত না। কিন্তু তারা ঈমান আনার পরিবর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। কুফরের শাস্তি মক্কাবাসীদের জন্যই বিশেষভাবে নয়, বরং) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ (অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্য) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কঠোর আযাবে দাখিল করে। এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, সব সিজদা আল্লাহ্র হক। (অর্থাৎ কোন সিজদা আল্লাহ্কে করা এবং কোন সিজদা অপরকে করা জায়েয নয়, যেমন মুশরিকরা করত)। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে কারও ইবাদত করো না। (এতেও উপরোল্লিখিত তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। এবং ওহীর এক বিষয়বস্তু এই যে) যখন আল্লাহ্র বান্দা অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ইবা-দতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন তারা (অর্থাৎ কাফিররা) তার কাছে ভিড় করার জন্য সমবেত হয় (অর্থাৎ বিস্ময় ও শত্রুতা হেতু প্রত্যেকেই এভাবে দেখে যেন এখনই জড়ো হয়ে হামলা করে বসবে। এটাও তওহীদের পরিশিষ্ট। কেননা, এতে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা তওহীদকে ঘৃণা করে। অতঃপর এই বিস্ময় ও শত্রুতার জওয়াব দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে ঃ) আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ আমি তো কেবল আমার পালন-কর্তার ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (অতএব এটা কোন বিস্ময় ও শত্রুতার বিষয় নয়। অতঃপর রিসালত সম্পর্কিত আলোচনা করা হচ্ছে ঃ) আপনি

(আরও) বলুন ঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনার মালিক নই। (অর্থাৎ তোমরা যে আমাকে আযাব আনার ফরমায়েশ কর, এর জওয়াব এই যে, আমার এরূপ ক্ষমতা নেই। এমনিভাবে কেউ কেউ বলে যে, আপনি তওহীদ ও কোরআনে কিছু পরিবর্তন করলে আমরা আপনাকে মেনে নিব। এর জওয়াবে) আপনি বলুন ঃ (আল্লাহ্ না করুন, আমি এরূপ করলে) আল্লাহ্র কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (উদ্দেশ্য এই যে, কেউ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে রক্ষা করবে না এবং আমি খুঁজে কোন রক্ষাকারী পাব না)। কিন্তু আল্লাহ্র বাণী পৌঁছোনো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। (অতঃপর তওহীদ ও রিসালত উভয় বিষয় সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (কিন্তু কাফিররা এখন এসব বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। এবং উল্টা মুসলমানদেরকে ঘৃণিত মনে করে। তারা এই মূর্খতা থেকে বিরত হবে না) এমন কি, যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে কার সহায্যকারী দুর্বল এবং কার দল কম। (অর্থাৎ কাফিররাই দুর্বল ও কম হবে। অতঃপর কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাফিররা অস্বীকারের ছলে কিয়ামত কবে হবে জিজ্ঞাসা করে। জওয়াবে) আপনি (তাদে-রকে) বলুন ঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন, না আমার পালনকর্তা এর জন্য কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট করেছেন। (কিন্তু সর্বাবস্থায় সেটা সংঘটিত হবে। নির্দিষ্ট সময় এটা অদৃশ্য বিষয়)। অদৃশ্যের জ্ঞানী তিনিই। পরন্তু অদৃশ্যের বিষয় তিনি কারও কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। (অর্থাৎ কিয়ামতের সময় নির্ধারণ সম্পর্কিত জ্ঞান নবুয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে নবুয়ত সপ্রমাণকারী জ্ঞান যথা ভবিষ্য-দ্বাণী অথবা নবুয়তের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত জ্ঞান যথা বিধি-বিধানের জ্ঞান এগুলো প্রকাশ করার সময়) তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী ফেরেশতা প্রেরণ করেন, [যাতে শয়তান সেখানে পৌঁছতে না পারে এবং ফেরেশতাদের কাছে শুনে কারও কাছে বলতে না পারে। সেমতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য এরূপ পাহারাদার ফেরেশতা চারজন ছিল। এ ব্যবস্থা এজন্য করা হয়,] যাতে আল্লাহ্ (বাহ্যত) জেনে নেন যে, ফেরেশতারা তাদের পালনকর্তার পয়গাম (রসূল পর্যন্ত) পৌঁছিয়েছে কি না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (অর্থাৎ প্রহরী ফেরেশতাদের) সব অবস্থা জানেন (তাই এ কাজে দক্ষ ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন)। তিনি সব কিছুর গণনা জানেন (সুতরাং ওহীর এক একটি অংশ তাঁর জানা আছে এবং তিনি সবগুলো সংরক্ষণ করেন। সারকথা এই যে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কিত জ্ঞান নবুয়তের জ্ঞান নয়। তাই কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় না জানা নবুয়তের পরিপন্থী নয়। তবে নবুয়তের জ্ঞান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দান করা হয় এবং এতে কোন ভুলভ্রান্তির আশংকা থাকে না। অতএব তোমরা এসব জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হও এবং বাড়তি বিষয়ের পিছনে পড়ো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نَفَرٌ—نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা জ্ঞাপন করে। বর্ণিত

আছে যে, আয়াতে আলোচিত জিন্নদের সংখ্যা নয় ছিল। তারা ছিল নছীবাইনের অধিবাসী।

জিন্নদের স্বরূপ ঃ জিন্ন্ আল্লাহ্ তা'আলার একপ্রকার শরীরী, আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। একারণেই তাদেরকে জিন্ন্ বলা হয়। জিন্ন্-এর শাব্দিক অর্থ গুপ্ত। মানবসৃষ্টির প্রধান উপকরণ যেমন মৃত্তিকা, তেমনি জিন্ন্ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ অগ্নি। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, বাহ্যত তারাও জিন্নদের দুষ্ট শ্রেণীর নাম। জিন্ন্ ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার করা কুফর।—(মাযহারী)

لَقَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ—থেকে জানা গেল যে, এখানে বর্ণিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) জিন্নদেরকে স্বচক্ষে দেখেননি। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করেছেন।

সূরা জিন্ন্ অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা ঃ সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, এই ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) জিন্নদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেননি। এই ঘটনা তখনকার, যখন শয়তানদেরকে আকাশের খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছিল। এ সময়ে জিন্নরা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, আকাশের খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোন আকস্মিক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ও আনাচে-কানাচে জিন্নদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ খোঁজাখুঁজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি, তা জেনে আসবে। হেজাযে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন 'নাখলা' নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন।

জিন্নদের এই প্রতিনিধিদল নামাযে কোরআন পাঠ শুনে পরস্পরে শপথ করে বলতে লাগল ঃ এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল ঃ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا আল্লাহ্ তা'আলা এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর রসূলকে অবহিত করেছেন।

আবূ তালেবের ওফাত ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র তায়েফ গমন ঃ অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন ঃ আবূ তালেবের মৃত্যুর পর রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অসহায় ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। তখন তিনি স্বগোত্রের অত্যাচার ও নিপীড়নের মুকাবিলায় তায়েফের সকীফ্ গোত্রের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে একাকীই তায়েফে গমন করলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক

(র) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফে পৌঁছে সকীফ গোত্রের সরদার ও সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃত্রয়ের কাছে গেলেন। এই ভ্রাতৃত্রয় ছিল ওমায়রের পুত্র আবদে ইয়ালীল, সউদ ও হাবীব। তাদের গৃহে একজন কুরাইশ মহিলা ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং স্বগোত্রের নিপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু জওয়াবে ভ্রাতৃত্রয় অশোভন আচরণ করে এবং তাঁর সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে।

সকীফ গোত্রের গণ্যমান্য তিন ব্যক্তির কাছ থেকে নিরাশ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আপনারা যদি আমাকে সাহায্য না-ই করেন, তবে কমপক্ষে আমার আগমনের কথা কুরাইশদের কাছে প্রকাশ করবেন না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কুরাইশরা জানতে পারলে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু তারা একথাও মানল না বরং গোত্রের দুষ্ট লোকদেরকে তাঁর উপর লেলিয়ে দিল। তারা তাঁকে গালিগালাজ করল ও তাঁর পিছু পিছু হট্টগোলের সৃষ্টি করতে থাকল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আঙ্গুর বাগানে প্রবেশ করলেন। বাগানের মালিক ওতবা শায়বা বাগানে উপস্থিত ছিল। তখন দুষ্টরা তাঁকে ছেড়ে ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) আঙ্গুর বৃক্ষের ছায়ায় বসে গেলেন। ওতবা ও শায়বা ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে দেখছিল। তারা আরও লক্ষ্য করছিল যে, গোত্রের দুষ্ট লোকদের হাতে তিনি উৎপীড়িত হয়েছেন। ইতিমধ্যে সেই কুরাইশী মহিলাও বাগানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সাক্ষাৎ করল। তিনি মহিলার কাছে তার শ্বশুরালয়ের লোকদের মন্দ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেন।

এই বাগানে বসে রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কিছুটা স্বস্তি লাভ করলেন, তখন আল্লাহ্র দরবারে দুই হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন। এরূপ অভিনব ভাষায় দোয়া তিনি আর কখনও করেছেন বলে বর্ণিত নেই। দোয়াটি এই :

اللّٰهم انی اشکو الیک ضعف قوتی و قلة حیلتی و هوانی علی الناس وانت ارحم الراحمین و انت رب المستضعفین فانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجهمنی او الی عدو ملکته امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی ولکن عافیتک هی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیه امر الدنیا والاخرة من ان تنزل بی غضبک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনার কাছে আমি আমার শক্তির দুর্বলতার, কৌশলের স্বল্পতার এবং লোকচক্ষুতে হেয়তার অভিযোগ করছি। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং আপনি দুর্বলদের সহায়, আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি আমাকে কার কাছে সমর্পণ করেন—পরের কাছে? যে আমাকে আক্রমণ করে, না কোন শত্রুর কাছে, যাকে আমার মালিক করে দিয়েছেন (ফলে যা ইচ্ছা, তাই করবে?) আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন, তবে আমি কোন কিছুরই পরওয়া করি না। আপনার নিরাপত্তা আমার জন্য শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। (আমি তা চাই।)

আমি আপনার নূরের আশ্রয় গ্রহণ করি, যদ্দ্বারা সমস্ত অন্ধকার আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায় এবং ইহকাল ও পরকালের সব কাজ সঠিক হয়ে যায়। আশ্রয় গ্রহণ করি আপনার গযবে পতিত হওয়া থেকে। আপনাকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের কাজ। আমরা কোন অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারি না এবং কোন পুণ্য অর্জন করতে পারি না আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে।—(মাযহারী)

ওতবা ও শায়বা ভ্রাতৃদ্বয় এই অবস্থা দেখে দয়ার্দ্র হল এবং 'আদ্দাস' নামক তাদের এক খৃস্টান গোলামকে ডেকে বলল : একগুচ্ছ আঙ্গুর একটি পাত্রে রেখে ঐ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে তা খেতে বল। গোলাম তাই করল। সে আঙ্গুরের পাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে রেখে দিল। তিনি বিসমিল্লাহ্ বলে পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। 'আদ্দাস' এই দৃশ্য দেখে বলল : আল্লাহ্র কসম, বিসমিল্লাহির রহমানির-রাহিম বাক্যটি তো এই শহরের অধিবাসীরা বলে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আদ্দাস, তুমি কোন্ শহরের অধিবাসী? তোমার ধর্ম কি? আদ্দাস বলল : আমি খৃস্টান এবং আমার জন্মস্থান 'নায়নুয়া' শহরে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ভাল কথা। তাহলে তুমি আল্লাহ্র সৎবান্দা ইউনুস ইবনে মাতা' (আ)-র শহরের অধিবাসী। সে বলল : আপনি ইউনুস ইবনে মাতাকে চিনেন কিরূপে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তিনি তো আমার ভাই। কেননা, তিনি যেমন আল্লাহ্র নবী, তেমনি আমিও আল্লাহ্র নবী।

একথা শুনে আদ্দাস রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পদতলে লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর মস্তক ও হস্তপদ চুম্বন করল। ওতবা ও শায়বা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছিল। তাদের একজন অপরজনকে বলল : লোকটি তো আমাদের গোলামকে নষ্ট করে দিল। অতঃপর আদ্দাস তাদের কাছে ফিরে এলে তারা বলল : আদ্দাস, তুমি লোকটির হস্তপদ চুম্বন করলে কেন? সে বলল : আমার প্রভুগণ, এসময়ে পৃথিবীর বুকে তাঁর চেয়ে উত্তম কোন মানুষ নেই। তিনি আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন, যা নবী ব্যতীত কারও বলার সাধ্য নেই। তারা বলল : আরে পাজী, লোকটি তোমাকে ধর্মচ্যুত না করে দেয়নি তো। তোমার ধর্ম তো সর্বাবস্থায় তার ধর্মের চেয়ে ভাল।

এরপর তায়েফবাসীদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফেরার পথে তিনি 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করে শেষরাত্রে তাহাজ্জুদের নামায শুরু করেন। ইয়ামেনের নছীবাইন শহরের জিন্নদের এই প্রতিনিধিদলও তখন সেখানে অবস্থানরত ছিল। তারা কোরআন পাঠ শুনল এবং শুনে বিশ্বাস স্থাপন করল। অতঃপর তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তারই আলোচনা করেছেন।—(মাযহারী)

জনৈক সাহাবী জিন্ন-এর ঘটনা : ইবনে জওযী (র) 'আছ-ছফওয়া' গ্রন্থে হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক জায়গায় জনৈক বৃদ্ধ জিন্নকে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেন। সে পশমের জোব্বা পরিহিত ছিল। হযরত সহল (রা) বলেন : নামায সমাপনান্তে আমি তাকে সালাম করলে সে জওয়াব দিল ও বলল : তুমি এই জোব্বার চাকচিক্য দেখে বিস্মিত হচ্ছ? জোব্বাটি সাতশ বছর

ধরে আমার গায়ে আছে। এই জোব্বা পরিধান করেই আমি হযরত ঈসা (আ)-র সাথে সাক্ষাৎ করেছি। অতঃপর এই জোব্বা গায়েই আমি মুহাম্মদ (সা)-এর দর্শন লাভ করেছি। যেসব জিন্ন্ সম্পর্কে 'সূরা জিন্ন্' অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তাদেরই একজন।—(মাযহারী)

হাদীসে বর্ণিত লায়লাতুল-জিন্ন্-এর ঘটনায় আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-কে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইচ্ছাকৃতভাবে জিন্ন্দের কাছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মক্কার অদূরে জঙ্গলে যাওয়া এবং কোরআন শোনানো উল্লিখিত আছে। এটা বাহ্যত সূরায় বর্ণিত কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা। আল্লামা খাফফাযী বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, জিন্ন্দের প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একবার দু'বার নয়—ছয় বার আগমন করেছিল। অতএব সূরার বর্ণনা ও হাদীসের বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا—جد শব্দের অর্থ শান, অবস্থা। আল্লাহ্ তা'আলার জন্য বলা হয় تعالى جده -অর্থাৎ আল্লাহ্র শান ঊর্ধ্বে। এখানে সর্বনামের পরিবর্তে رب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এতে শান ঊর্ধ্বে হওয়ার প্রমাণও এসে গেছে। কেননা, যিনি সৃষ্টির পালনকর্তা, তাঁর শান যে ঊর্ধ্বে, তা বলাই বাহুল্য।

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا—شطط শব্দের অর্থ অবান্তর কথা, অন্যায় ও জুলুম। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন জিন্ন্রা এ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে ঃ আমাদের সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা আল্লাহ্র শানে অবাস্তব কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম না যে, কোন মানব অথবা জিন্ন্ আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারে। তাই বোকাদের কথায় আমরা আজ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিলাম। এখন কোরআন শুনে আমাদের চক্ষু খুলেছে।

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا—এই আয়াতে মু'মিন জিন্ন্রা বলেছে ঃ মূর্খতা যুগে মানুষ যখন কোন বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন প্রান্তরের জিন্ন্দের আশ্রয় গ্রহণ করত। এতে জিন্ন্রা মনে করে বসল, আমরা মানবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানবও আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। এতে জিন্ন্দের পথভ্রষ্টতা আরও বেড়ে যায়।

জিন্ন্দের প্রেরণায় হযরত রাফে ইবনে ওমায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ তফসীরে-মাযহারীতে আছে 'হাওয়াতিফুল-জিন্ন্' কিতাবে হযরত রাফে ইবনে ওমায়র (রা) সাহাবীর

ইসলাম গ্রহণের অন্যতম কারণ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ এক রাত্রিতে আমি মরুভূমিতে সফর করছিলাম। হঠাৎ নিদ্রাভিভূত হয়ে আমি উট থেকে নেমে গেলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের পূর্বে আমি স্বগোত্রের অভ্যাস অনুযায়ী এই বাক্য উচ্চারণ করলাম ঃ انى اعوذ بعظيم هذا الوادى অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের জিন্ন্ সরদারের আশ্রয়গ্রহণ করছি। অতঃপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তির হাতে একটি অস্ত্র। সে আমার উটের বুকে তদ্দ্বারা আঘাত করতে চায়। আমি ত্রস্ত হয়ে উঠে পড়লাম এবং ডানে-বামে দৃষ্টিপাত করে কিছুই দেখতে পেলাম না। মনে মনে বললাম ঃ

এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা, আসল স্বপ্ন নয়। অতঃপর নিদ্রায় বিভোর হয়ে গেলাম। পুনরায় সেই স্বপ্ন দেখে উঠে পড়লাম। এবারও উটের চতুষ্পার্শ্বে কিছুই দেখলাম না কিন্তু উটটি কেন জানি থরথর করে কাঁপছিল। আমি আবার নিদ্রিত হয়ে সেই একই স্বপ্ন দেখলাম। জাগ্রত হয়ে দেখি, আমার উটটি ছটফট করছে এবং একজন যুবক বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি স্বপ্নে যে যুবককে দেখেছিলাম, সে সেই যুবক। সাথে সাথে দেখলাম, জনৈক বৃদ্ধ যুবকের হাত ধরে রেখেছে এবং উটকে আঘাত হানতে নিষেধ করছে। ইতিমধ্যে তিনটি বন্য গর্দভ সামনে এসে গেলে বৃদ্ধ যুবককে বলল ঃ এই তিনটির মধ্যে যেটি তোমার পছন্দ হয়, নিয়ে যাও এবং এই লোকটির উট ছেড়ে দাও। যুবক একটি বন্য গর্দভ নিয়ে চলে গেল। অতঃপর বৃদ্ধ আমাকে বলল ঃ হে বোকা মানব! তুমি কোন প্রান্তরে অবস্থান করে যদি জিন্ন্দের উপদ্রব আশংকা কর, তবে এ কথা বলো ঃ اعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادى অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের ভয় ও অনিষ্ট থেকে মুহাম্মদের পালনকর্তা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর কোন জিন্ন্-এর আশ্রয় গ্রহণ করো না। কেননা, সেদিন গত হয়ে গেছে, যখন মানুষ জিন্ন্দের আশ্রয় গ্রহণ করত। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুহাম্মদ কে? সে বলল ঃ ইনি আরব নবী —প্রাচ্যেরও নন, প্রতীচ্যেরও নন। তিনি সোমবারে প্রেরিত হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কোথায় থাকেন? সে বলল ঃ ইনি খর্জুর-বস্তি ইয়াসরিবে (মদীনায়) থাকেন। অতঃপর প্রত্যুষেই আমি মদীনার পথ ধরলাম। দ্রুত উট হাঁকিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মদীনায় পৌঁছে গেলাম। রসূলে করীম (সা) আমাকে দেখে আমার আদ্যোপান্ত ঘটনা বলে দিলেন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) এই ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন ঃ আমাদের মতে এই ঘটনা সম্পর্কে কোরআন পাকে وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ এ আয়াতখানি নাযিল হয়েছে।

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا—আরবী অভিধানে سماء শব্দের অর্থ যেমন আকাশ, তেমনি মেঘমালা অর্থেও এর ব্যবহার ব্যাপক ও সুবিদিত। এখানে বাহ্যত এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

জিন্‌রা আকাশের সংবাদ শোনার জন্য মেঘমালা পর্যন্ত গমন করতো—আকাশ পর্যন্ত নয়ঃ জিন্ ও শয়তানরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্য আকাশ পর্যন্ত যাওয়ার অর্থ মেঘমালা পর্যন্ত যাওয়া। এর প্রমাণ বুখারীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা)-র এই হাদীস ঃ

قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة تنزل فى العنان وهو السحاب فتذكر الامر الذى قضى فى السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحه الى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند انفسهم -

হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি—ফেরেশ-তারা 'ইনান' অর্থাৎ মেঘমালা পর্যন্ত অবতরণ করে। সেখানে তারা আল্লাহ্‌র জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পরে আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতী-ন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয়।—(মাযহারী)

বুখারীতেই আবূ হুরায়রা (রা)-র এবং মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনা আসল আকাশে সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন আকাশে কোন হুকুম জারি করেন, তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয়। এরপর তারা পরস্পরে সে বিষয়ে আলোচনা করে। খবরচোর শয়তানরা এই আলোচনা শুনে নেয় এবং তাতে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

এই বিষয়বস্তু হযরত আয়েশা (রা)-র হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, শয়তানরা আসল আকাশে পৌঁছে খবর চুরি করে। বরং এটা সম্ভবপর যে, এসব খবর পর্যায়ক্রমে আকাশের ফেরেশতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ফেরে-শতাগণ মেঘমালা পর্যন্ত এসে সে সম্পর্কে আলোচনা করে। এখান থেকে শয়তানরা তা চুরি করে। পূর্বোক্ত হাদীসে তাই বলা হয়েছে।—(মাযহারী)

সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পূর্বে আকাশের খবর চুরির ধারা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল। শয়তানরা নির্বিঘ্নে মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের সময় তাঁর ওহীর হিফাযতের উদ্দেশ্যে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হল এবং কোন শয়তান খবর চুরির নিয়তে উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। চোর বিতাড়নের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিন্‌রা চিন্তিত হয়ে কারণ অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধানকারী দল প্রেরণ করেছিল। অতঃপর 'নাখলা' নামক স্থানে একদল জিন্ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কোরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

উল্কাপিণ্ড পূর্বেও ছিল কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমল থেকে একে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ঃ প্রচলিত ভাষায় شهاب ثاقب বলা হয় তারকা বিচ্যুতিকে। আরবীতে এরজন্য انقضاض الكوكب শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই তারকা-বিচ্যুতির ধারা প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত আছে। অথচ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলের বৈশিষ্ট্য। এর জওয়াব এই যে, উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। এর স্বরূপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের ভাষ্য এই যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছু আগ্নেয় পদার্থ শূন্যমণ্ডলে পৌঁছে এবং এক সময়ে তা প্রজ্বলিত হয়ে যায়। এটাও সম্ভবপর যে, কোন তারকা অথবা গ্রহ থেকে এই আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হয়। যাই হোক না কেন, জগতের আদিকাল থেকেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে এই আগ্নেয় পদার্থকে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে। দৃষ্ট সব উল্কাপিণ্ডকে একাজে ব্যবহার করাও জরুরী নয়। সূরা হিজরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

—أَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

অর্থাৎ খবর চুরি বন্ধ করার কারণ দ্বিবিধ হতে পারে—১. পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেওয়া, যাতে তারা আকাশের খবরাদি না পায়, ২. তাদের হিদায়তের ব্যবস্থা করা, যাতে জিন্ ও শয়তান আল্লাহ্র ওহীতে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে।

فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا — بخس শব্দের অর্থ প্রাপ্য অপেক্ষা কম দেওয়া এবং رهق শব্দের অর্থ লাঞ্ছনা ও অপমান। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিনের প্রতিদান কম দেওয়া হবে না এবং পরকালে তার কোন লাঞ্ছনা হবে না।

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا—مساجد শব্দটি مسجد এর বহুবচন। এর এক অর্থ উপাসনালয় হতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, মসজিদসমূহ কেবল আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়েছে। অতএব তোমরা মসজিদে যেয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডেকো না; যেমন ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের উপাসনালয়সমূহে এধরনের শির্কী করে থাকে। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম এই যে, মসজিদসমূহকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মিথ্যা কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

এছাড়া مسجد শব্দটি এখানে مصدر ميمى হয়ে সিজদার অর্থেও হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সকল সিজদা আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সাহায্যের জন্য ডাকে, সে যেন তাকে সিজদা করে। অতএব অপরকে সিজদা করা থেকে বিরত থাক।

উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সিজদা করা হারাম এবং কোন কোন আলিমের মতে কুফর।

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا —এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলকে আদেশ করেছেন, যে সব অবিশ্বাসী আপনাকে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন তারিখ বলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তাদেরকে বলে দিন ঃ কিয়ামতের আগমন ও হিসাব-নিকাশ নিশ্চিত কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন তারিখ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে বলেননি। তাই আমি জানি না কিয়ামতের দিন আসন্ন না আমার পালন-কর্তা এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিবেন। দ্বিতীয় আয়াতে এর দলীল বর্ণনা করা হয়েছে যে, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا অর্থাৎ আমার না জানার কারণ এই যে, আমি 'আলেমুল-গায়েব' নই বরং আলেমুল গায়েব বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ। আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

এখানে কোন নির্বোধ ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না, তখন তিনি রসূল হলেন কিরূপে ? কেননা, রসূলের কাছে আল্লাহ্ তা'আলা হাজারো গায়বের বিষয় ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যার কাছে ওহী আসে না, সে নবী ও রসূল হতে পারে না। এই প্রশ্নের জওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য পরবর্তী আয়াতে ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে।

গায়েব ও গায়েবের খবরের মধ্যে পার্থক্য ঃ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا —উপরোক্ত বোকাসুলভ প্রশ্নের জওয়াব এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম। অর্থাৎ রসূল গায়েব জানেন না—এ কথার অর্থ যে, কোন গায়েব জানেন না নয়। বরং রিসালতের জন্য যে পরিমাণ গায়েবের খবর ও অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান কোন রসূলকে দেওয়া অপরিহার্য, সেই পরিমাণ গায়েবের খবর ওহীর মাধ্যমে রসূলকে দান করা হয়েছে এবং তা খুবই সংরক্ষিত পথে দান করা হয়েছে। যখন রসূলের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা থাকে, যাতে শয়তান কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। এখানে রসূল শব্দ দ্বারা প্রথমে রসূল ও নবীকে প্রদত্ত গায়েবের প্রকার নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে শরীয়ত ও বিধি বিধানের জ্ঞান এবং সময়োপযোগী গায়েবের খবর। এরপর পরবর্তী বাক্যে আরও সুনি-দিষ্ট করা হয়েছে যে, এ সব খবর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার চতুষ্পার্শ্বে অন্য ফেরেশতাগণের প্রহরা নিয়োগ করা হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে নবী ও রসূলের রিসালতের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের গায়েব সপ্রমাণ করা হয়েছে।

অতএব পরিভাষায় এই ব্যতিক্রমকে استثناء منقطع বলা হবে। অর্থাৎ যে গায়েব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না, ব্যতিক্রমের মাধ্যমে সেই

গায়েব প্রমাণ করা হয়নি বরং বিশেষ ধরনের 'ইলমে-গায়েব' প্রমাণ করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে একে انبا ء الغيب শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। এক আয়াতে আছে : تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ

কোন কোন অজ্ঞ লোক গায়েব ও গায়েবের খবরের মধ্যে পার্থক্য বুঝে না। তারা পয়গম্বরগণের জন্য বিশেষত শেষ নবী (সা)-এর জন্য সর্বপ্রকার ইলমে-গায়েব সপ্রমাণ করার প্রয়াস পায় এবং তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ আলেমুল-গায়েব তথা সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞানবান মনে করে। এটা পরিষ্কার শিরক এবং রসূলকে আল্লাহ্র আসনে আসীন করার অপপ্রয়াস বৈ নয়।—(নাউযুবিল্লাহ্) যদি কোন ব্যক্তি তার গোপন ভেদ তার বন্ধুকে বলে দেয়, এতে দুনিয়ার কেউ আলেমুল-গায়েব আখ্যা দিতে পারে না। এমনিভাবে পয়গম্বরগণকে ওহীর মাধ্যমে হাজারো গায়েবের বিষয় বলে দেওয়ার কারণে তাঁরা আলেমুল-গায়েব হয়ে যাবেন না। অতএব বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝে নেওয়া দরকার।

এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না। ফলে তাদের কাছে যখন বলা হয় রসূলুল্লাহ্ (সা) 'আলেমুল-গায়েব' নন, তখন তারা এই অর্থ বুঝে যে, নাউযুবিল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন গায়েবের খবর রাখেন না। অথচ দুনিয়াতে কেউ এর প্রবক্তা নয় এবং হতে পারে না। কেন না, এরূপ হলে খোদ নবুয়ত ও রিসালতই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই কোন মু'মিনের পক্ষেই এরূপ বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়।

সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে : وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا —অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর পরিসংখ্যান আল্লাহ্ তা'আলারই গোচরীভূত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অণু-পরমাণু রয়েছে, সারা বিশ্বের জলধিসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ জলবিন্দু আছে, প্রত্যেক বৃষ্টিতে কত সংখ্যক ফোঁটা বর্ষিত হয় এবং সারা জাহানের বৃক্ষসমূহের পত্রের সঠিক পরিসংখ্যান তাঁর জানা আছে। সমস্ত ইলমে-গায়েব যে আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ, আয়াতে একথা আবার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে উপরোক্ত ব্যতিক্রম দেখে ভুল বোঝা-বুঝিতে পতিত না হয়।

ইলমে-গায়েবের অর্থ ও তার বিস্তারিত বিধি বিধান সূরা নমলের قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

سورة المزمل

সূরা মুয্‌যাম্‌মিল

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২০ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ
قَلِيْلًا ۙ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ
قَوْلًا ثَقِيْلًا ۞ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ؕ
اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ؕ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ
تَبْتِيْلًا ؕ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۞
وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۞ وَذَرْنِيْ وَ
الْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۞ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا
ۙ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَ
الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ۞ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ
رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ؕ فَعَصٰى
فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ۞ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْ
تُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۖۗ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ
وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ۞ اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ
سَبِيْلًا ۞ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ

وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۚ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ
عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۚ
عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ
يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ
فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ
قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ
اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) হে বস্ত্রাবৃত, (২) রাত্রিতে ইবাদতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে; (৩) অর্ধ রাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম (৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে। (৫) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। (৬) নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (৭) নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। (৯) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে। (১০) কাফিররা যা বলে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। (১১) বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপ-কারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন। (১২) নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড, (১৩) গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৪) যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তূপ। (১৫) আমি তোমাদের কাছে একজন রসূলকে তোমাদের জন্য সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফিরাউনের কাছে একজন রসূল। (১৬) অতঃপর ফিরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। (১৭) অতএব, তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সে দিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ? (১৮) সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (১৯) এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার

দিকে পথ অবলম্বন করুক। (২০) আপনার পালনকর্তা জানেন আপনি ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্ দিবা ও রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বস্ত্রাবৃত, [এভাবে সম্বোধন করার কারণ এই যে, নবুয়তের প্রথমভাগে কোরা-ইশরা তাদের 'দারুন্নদওয়া' তথা পরামর্শ গৃহে একত্রিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপযুক্ত ও সর্বসম্মত খেতাব সম্পর্কে পরামর্শ করে। কেউ বলল ঃ তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী। অন্যেরা তাতে সায় দিল না। কেউ বলল ঃ তিনি উন্মাদ। এটাও অগ্রাহ্য হয়ে গেল। আবার কেউ বলল ঃ তিনি যাদুকর। এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল। কিন্তু অনেকেই এর কারণ বর্ণনা করল যে, তিনি বন্ধুকে বন্ধু থেকে পৃথক করে দেন। যাদুকর খেতাবই তাঁর জন্য উপযুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ পেয়ে খুবই দুঃখিত অবস্থায় বস্ত্রাবৃত হয়ে গেলেন। প্রায়ই দুঃখ ও বিষাদের সময় মানুষ এরূপ করে থাকে। তাই তাঁকে প্রফুল্ল করার জন্য ও কৃপা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে; যেমন হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার হযরত আলী (রা)-কে আবু তোরাব বলে সম্বোধন করেছিলেন। সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে যে, এ সব বিষয়ের কারণে আপনি দুঃখ করবেন না এবং আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আরও বেশী মনোনিবেশ করুন, এভাবে যে] রাত্রিতে (নামাযে) দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অর্থাৎ অর্ধ রাত্রি, (এতে বিশ্রাম গ্রহণ করুন) অথবা তদপেক্ষা কম। দণ্ডায়মান হোন এবং অর্ধেকের বেশি সময় আরাম করুন অথবা অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী (দণ্ডায়মান হোন এবং অর্ধেকের চেয়ে কম সময়ে বিশ্রাম করুন। সারকথা, রাত্রিতে নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া তো ফরয হল কিন্তু সময়ের পরিমাণ কতটুকু হবে তা ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—তিনটির মধ্য থেকে যে কোন একটি—অর্ধ রাত্রি, দুই-তৃতীয়াংশ রাত্রি, এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি) এবং (এই দণ্ডায়মান অবস্থায়) কোরআন স্পষ্টভাবে পাঠ করুন (অর্থাৎ প্রত্যেকটি অক্ষর পৃথক পৃথক উচ্চারিত হওয়া চাই। নামাযের বাইরেও এভাবে পাঠ করার আদেশ আছে। অতঃপর এই আদেশের কারণ ও উপযোগিতা বর্ণনা করা হয়েছে) আমি আপনার প্রতি এক ভারী কালাম অবতীর্ণ করব

[অর্থাৎ কোরআন মজীদ, যা অবতরণের সময় তাঁর অবস্থা পরিবর্তন করে দিত। হাদীসে আছে, একবার ওহী নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উরু যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর উরুতে রাখা ছিল। ফলে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর উরু ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) উষ্ট্রীর উপর সওয়ার অবস্থায় ওহী নাযিল হলে উষ্ট্রী বোঝার ভারে ঝুঁকে পড়ত এবং নড়াচড়া করতে পারত না। কনকনে শীতের মধ্যে ওহী নাযিল হলেও তার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এ ছাড়া কোরআনকে সংরক্ষিত রাখা ও অপরের কাছে পৌঁছানোও কষ্টসাধ্য ছিল। এসব কারণে 'ভারী কালাম' বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রিতে দণ্ডায়মান হওয়াকে কঠিন মনে করবেন না। আমি তো আরও ভারী কাজ আপনাকে সোপর্দ করব। আপনাকে সাধনায় অভ্যস্ত করার জন্যই এই আদেশ করা হয়েছে। যে ভারী কালাম আপনার প্রতি নাযিল করব, তার জন্য শক্তিশালী যোগ্যতা দরকার। অতঃপর দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করা হয়েছে] নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তিদলনে খুব সহায়ক এবং (দোয়া হোক কিংবা কিরাআত) স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (অবসর মুহূর্তে হওয়ার কারণে দোয়া ও কিরা-আতের ভাষা ধীর ও শান্তভাবে উচ্চারিত হয় এবং একাগ্রচিত্ততাও হাসিল হয়। অতঃপর তৃতীয় একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, এতে রাত্রির বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে—) নিশ্চয় দিবাভাগে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা রয়েছে (সাংসারিক—যেমন গৃহস্থালীর কাজকর্ম এবং ধর্মীয় যেমন প্রচার কাজ। তাই রাত্রিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রাত্রি ছাড়া অন্যান্য সময়েও আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন অর্থাৎ স্মরণ ও মগ্নতা সার্বক্ষণিক করুন। একাগ্রচিত্ততার অর্থ আল্লাহ্র সম্পর্ক সবকিছুর উপর প্রবল হওয়া। অতঃপর তওহীদসহ এ বিষয়ের তাকীদ করা হয়েছে) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাঁকেই কর্মবিধা-য়করূপে গ্রহণ করুন। কাফিররা যা বলে, তজ্জন্যে সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। [অর্থাৎ তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। 'সুন্দরভাবে' এই যে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রতিশোধের চিন্তা করবেন না। অতঃপর তাদের আযাবের সংবাদ দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে] বিত্তবৈভবের অধিকারী মিথ্যা-রোপকারীদেরকে (বর্তমান অবস্থায়) আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে আরও কিছু দিন অবকাশ দিন। (অর্থাৎ আরও কিছু দিন সবর করুন। সত্বরই তাদের শাস্তি হবে। কেন না) আমার কাছে আছে শিকল, অগ্নি, গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং মর্মন্তুদ শাস্তি। (সুতরাং তাদেরকে এসব বস্তু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে এবং তা সেদিন হবে,) যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ (চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে) বহমান বালুকা-স্তূপ হয়ে যাবে (এবং উড়তে থাকবে। অতঃপর মিথ্যারোপকারীদেরকে সরাসরি সম্বো-ধন করা হয়েছে এবং রিসালত ও শাস্তি সপ্রমাণও করা হয়েছে) নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে এমন একজন রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি (কিয়ামতের দিন তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন যে, ধর্ম প্রচারের পর তোমরা কি ব্যবহার করেছ), যেমন ফিরাউনের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর ফিরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল। ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। অতএব তোমরা যদি (রসূল প্রেরণের পর নাফরমানী ও) কুফরী

কর, তবে (এমনিভাবে তোমাদেরকেও একদিন দুর্ভোগ পোহাতে হবে। সেই দুর্ভোগের দিন সামনে আছে। অতএব তোমরা) সেই দিন (অর্থাৎ সেই দিনের বিপদ) থেকে কিরূপে আত্মরক্ষা করবে, যা (ভয়াবহতা দৈর্ঘ্যের কারণে) বালককে করে দিবে বৃদ্ধ ! সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (এটা টলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই)। এটা (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়বস্তু) একটা (সারগর্ভ) উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার দিকে রাস্তা অবলম্বন করুক। (অর্থাৎ তাঁর কাছে পৌঁছার জন্য ধর্মের পথ অবলম্বন করুক। অতঃপর সূরার শুরুতে বর্ণিত রাত্রির ইবাদত ফরয হওয়ার আদেশ রহিত করা হচ্ছে ঃ) আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবং আপনার কতক সহচর (কখনও) রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, (কখনও) অর্ধাংশ এবং (কখনও) এক-তৃতীয়াংশ (নামাযে) দণ্ডায়মান হন। দিবা ও রাত্রির পূর্ণ পরিমাপ আল্লাহ্ তা'আলাই করতে পারেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। (ফলে তোমরা খুবই কষ্ট ভোগ কর। কেননা, অনুমান করলে কম হওয়া সন্দেহ থাকে এবং অনুমানের চেয়ে বেশী করলে সারারাত্রি ব্যয়িত হয়ে যায়। উভয় বিষয়ে আত্মিক ও দৈহিক কষ্ট আছে) অতএব (এসব কারণে) তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং পূর্ববর্তী আদেশ রহিত করে দিয়েছেন। কাজেই (এখন) কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু পাঠ কর। (এখানে কোরআন পাঠ করার অর্থ তাহাজ্জুদ পড়া। কারণ, এতে কোরআন পাঠ করা হয়। এই আদেশ মোস্তাহাব বিধান প্রমাণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদ পড়া আর ফরয নয়। এই আদেশ রহিত। এখন যতক্ষণ পার মোস্তাহাব হিসাবে ইচ্ছা করলে পড়ে নাও। রহিত হওয়ার আসল কারণ কষ্ট। عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ থেকে তা বোঝা যায়। পূর্ববর্তী বিষয়বস্তু এর ভূমিকা। অতঃপর রহিত করণের দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হচ্ছে ঃ) তিনি (আরও) জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ জীবিকা অন্বেষণে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। (এসব অবস্থায় নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া কঠিন। তাই আদেশ রহিত করা হয়েছে। কাজেই এ কারণেও অনুমতি আছে যে) কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ কর। (তাহাজ্জুদ রহিত হয়ে গেলেও এই আদেশ এখনও বহাল আছে যে) তোমরা (ফরয) নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে উত্তম (অর্থাৎ আন্তরিকতাপূর্ণ) ঋণ দাও। তোমরা যে সৎ কর্ম নিজেদের জন্য অগ্রে (পরকালের পুঁজি করে) পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তমরূপে সঞ্চিত থাকবে এবং পুরস্কার হিসাবে বর্ধিতরূপে পাবে। (অর্থাৎ সাংসারিক কাজে ব্যয় করলে যে প্রতিদান ও উপকার পাওয়া যায়, সৎ কাজে ব্যয় করলে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে)। তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ক্ষমা প্রার্থনা করাও বহাল নির্দেশাবলীর অন্যতম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ — مزمل এবং পরবর্তী সূরায় ব্যবহৃত مدثر শব্দদ্বয়ের অর্থ

প্রায় এক অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত। উভয় সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ গুণ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ ভয় ও উদ্বেগের কারণে তীব্র শীত অনুভব করছিলেন এবং বস্ত্রাবৃত হয়েছিলেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম হেরা গিরিগুহায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে ফেরেশতা জিবরাঈল আগমন করে ইক্‌রা সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত খাদিজা (রা)-র নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন ঃ زملونى ، زملونى অর্থাৎ 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও।' এর পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে 'ফতরাতুল-ওহী' বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন ঃ একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একস্থানে একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম ঃ আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আয়াত নাযিল হল। এই হাদীসে কেবল এই আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্য يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপের বর্ণনানুযায়ী এই আয়াতের ঘটনা পৃথকও হতে পারে। এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিশেষ এক করুণা ও অনুগ্রহ আছে। নিছক করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।---(রূহুল মা'আনী) এই বিশেষ ভঙ্গিতে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে এবং এর কিছু বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

তাহাজ্জুদ নামাযের বিধানাবলী ঃ مدثر ও مزمل শব্দদ্বয় থেকেই বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কোরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঞ্জেগানা নামায ফরয ছিল না। পাঞ্জেগানা নামায মে'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখের হাদীসদৃষ্টে ইমাম বগভী (র) বলেন ঃ এই আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ রাত্রির নামায রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সমগ্র উম্মতের উপর ফরয ছিল। এটা পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার পূর্বের কথা।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায কেবল ফরযই করা হয়নি বরং তাতে রাত্রির কম-পক্ষে এক-চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। কারণ আয়াতের মূল আদেশ

হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকা। কিছু অংশ বাদ দেওয়ার বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম বগভী (র) বলেন : এই আদেশ পালনার্থে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যয় করতেন। ফলে তাঁদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামাযে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ নামায পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায পড়াই তাহাজ্জুদের জন্য যথেষ্ট। এই বিষয়বস্তু আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মে'রাজের রাত্রিতে পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এরপরও তাহাজ্জুদ সুন্নত থেকে যায়। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সা) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। ---(মাযহারী)

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا -- اللَّيْل শব্দের সাথে আলিফ ও লাম সংযুক্ত হওয়ার অর্থ হয়েছে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন। অর্থাৎ আপনি সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে : نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ অর্থাৎ এখন আপনি অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী নামাযে মশগুল হোন। এটা إِلَّا قَلِيلًا ব্যতিক্রমের বর্ণনা। তাই প্রশ্ন হয় যে, অর্ধেক রাত্রি তো কিছু অংশ হতে পারে না। জওয়াব এই যে, রাত্রির প্রাথমিক অংশ তো মাগরিব ও ইশার নামায ইত্যাদিতে অতিবাহিতই হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রাত্রির অর্ধেক। সেটা সারা রাত্রির তুলনায় কিছু অংশ। আয়াতে অর্ধরাত্রির কমেরও অনুমতি আছে, বেশীরও আছে। তাই সমষ্টিগতভাবে এর সারমর্ম এই যে, কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ রাত্রির চেয়ে কিছু বেশী নামাযে মশগুল থাকা ফরয।

تَرْتِيل قُرْآن এর অর্থ : تَرْتِيل-এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা।---(মুফরাদাত) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দ্রুত কোরআন তিলাওয়াত করবেন না বরং সহজভাবে এবং অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে উচ্চারণ করবেন।---(কুরতুবী) رَتِّل বলে রাত্রির নামাযে করণীয় কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামায কেরাআত, তসবীহ, রুকূ, সিজদা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত হলেও তাতে আসল উদ্দেশ্য কোরআন পাঠ। একারণেই সহীহ হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদের নামায অনেক লম্বা করে আদায় করতেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল কোরআন পাঠই কাম্য নয় বরং তরতীল তথা সহজ ও সঠিকভাবে পাঠ কাম্য। রসূলুল্লাহ্ (সা) এভাবেই পাঠ করতেন। রাত্রির নামাযে তিনি কিরূপে কোরআন তিলাওয়াত করতেন, এই প্রশ্নের জওয়াবে হযরত উম্মে সালমা (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিরাআত অনুকরণ করে শোনান তাতে প্রত্যেকটি হরফ স্পষ্ট ছিল।—(মাযহারী)

যথা সম্ভব সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করাও তরতীলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: যে নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করেন, তাঁর কিরা'আতের মত অন্য কারও কিরা'আত আল্লাহ্ তা'আলা শুনেন না।—(মাযহারী)

হযরত আলকামা (রা) এক ব্যক্তিকে সুমধুর স্বরে তিলাওয়াত করতে দেখে বললেন:
لقد رتل القرا ن فدا ه ابى و امى —অর্থাৎ সে কোরআন তরতীল করেছে; আমার পিতামাতা তারজন্য উৎসর্গ হোন।—(কুরতুবী)

তবে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করে তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তরতীল। হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করতে দেখে বলেছিলেন: আল্লাহ্ তা'আলা وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا আয়াতে যে তরতীলের আদেশ করেছেন, এটাই সেই তরতীল।—(কুরতুবী)

قَوْلًا ثَقِيْلًا—اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (ভারী কালাম) বলে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন বর্ণিত হালাল, হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের সীমা স্থায়ীভাবে মেনে চলা স্বভাবত ভারী ও কঠিন। তবে যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সহজ করে দেন, তার কথা স্বতন্ত্র। কোরআনকে ভারী বলার আরেক কারণ এই যে, কোরআন নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষ ওজন ও তীব্রতা অনুভব করতেন। ফলে প্রচণ্ড শীতেও তাঁর মস্তক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তিনি তখন কোন উটের উপর সওয়ার থাকলে বোঝার কারণে উট নুয়ে পড়ত।—(বুখারী)

এই আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষকে কষ্টে অভ্যস্ত করার জন্য তাহাজ্জুদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। রাত্রিকালে নিদ্রার প্রাবল্য এবং মানসিক সুখের বিরুদ্ধে এটা একটা জিহাদ। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোরআন অবতীর্ণ কষ্টসাধ্য ও ভারী বিধি বিধান সহ্য করা সহজ হয়ে যাবে।

ناشئة — إنّ ناشئة الليل শব্দটি ধাতু। এর অর্থ রাত্রির নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রার পর নামাযের জন্য গাত্রোত্থান করা। তাই এর অর্থ হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ। কারণ, এর শাব্দিক অর্থও রাত্রিতে নিদ্রার পর উঠে নামায পড়া। ইবনে কায়সান (রা) বলেন : শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করাকে ناشئة الليل বলা হয়। ইবনে যায়েদ (রা) বলেন : রাত্রির যে অংশতে কোন নামায পড়া হয়, তা ناشئة الليل এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবী মুলায়কা (রা) এক প্রশ্নের জওয়াবে হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের (রা)ও তাই বলেছেন।— (মাযহারী)

এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে রাত্রির যে কোন অংশে যে নামায পড়া হয়, বিশেষত ইশার পর যে নামায পড়া হয়, তাই قيام الليل ও ناشئة الليل-এর মধ্যে দাখিল, যেমন হাসান বসরী (র) বলেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা), সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও বুযুর্গগণ সর্বদাই এই নামায নিদ্রার পর শেষরাত্রে জাগ্রত হয়ে পড়তেন। তাই এটা উত্তম ও অধিক বরকতের কারণ। তবে ইশার নামাযের পর যে কোন নফল নামায পড়া যায়, তাতে তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

وطأ — هى أشدّ وطأً শব্দে দুরকম কিরা'আত আছে। প্রসিদ্ধ কিরা'আতে ওয়াও এর উপর যবর এবং ত্বোয়া সাকিন করে অর্থ দলন করা, পিষ্ট করা। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির নামায প্রবৃত্তি দলনে খুবই সহায়ক অর্থাৎ এতে করে প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং অবৈধ বাসনা থেকে বিরত রাখার কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই কিরা'আত অবলম্বন করা হয়েছে। দ্বিতীয় কিরা'আত হচ্ছে كتاب-এর ওজনে وطاء- এমতাবস্থায় এটা অনুকূল হওয়ার অর্থে ধাতু। ليواطئوا عدة ما حرم আয়াতেও শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যায়েদ (রা) থেকে এই অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ (রা) বলেন : উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রিতে নামাযের জন্য গাত্রোত্থান করা অন্তর, দৃষ্টি, কর্ণ ও জিহবার মধ্যে পারস্পরিক একাত্মতা সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : أشد وطأ-এর অর্থ এই যে, কর্ণ ও অন্তরের মধ্যে তখন অধিকতর একাত্মতা থাকে। কারণ, রাত্রিবেলায় সাধারণত কাজকর্ম ও হট্টগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, কর্ণও তা শুনে ও অন্তরও উপস্থিত থাকে।

أقوم- শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। অর্থাৎ রাত্রিবেলায় কোরআন তিলাওয়াত

অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিষ্ক ব্যাকুল হয় না।

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এই আয়াতেও তাহাজ্জুদের রহস্য বর্ণিত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا আয়াতে বর্ণিত রহস্যটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিজ সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত ও রহস্যটি সমস্ত উম্মতের জন্য ব্যাপক।

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا—سبح শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও ঘোরাফেরা করা। এ কারণেই সাঁতার কাটাকেও سبح ও سبحا বলা হয়। এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা, শিক্ষা দেওয়া, প্রচার করা, মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত অথবা নিজের জীবিকার অন্বেষণে ঘোরাফেরা করা ইত্যাদি সবই এতে দাখিল।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের তৃতীয় রহস্য ও উপযোগিতা বর্ণিত হয়েছে। এটাও সবার জন্য ব্যাপক। রহস্য এই যে, দিবাভাগে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও অন্য সবাইকে অনেক কর্মব্যস্ততায় থাকতে হয়। ফলে একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাত্রি একাজের জন্য থাকা উচিত যে, প্রয়োজন মাফিক নিদ্রা ও আরাম এবং তাহাজ্জুদের ইবাদতও হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য ঃ ফিকাহ্‌বিদগণ বলেন ঃ যে সব আলিম ও মাশায়েখ জনগণের শিক্ষাদীক্ষা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদেরও এ কাজ দিবাভাগে সীমিত রেখে রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত ও ইবাদতে মশগুল হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণের কর্মপদ্ধতি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে যদি কোন সময় রাত্রিবেলায়ও উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক ব্যতিক্রম হতে পারে। এর সাক্ষ্য ও অনেক আলিম ও ফিকাহ্‌বিদের কর্ম থেকে পাওয়া যায়।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا—تبتل-এর শাব্দিক অর্থ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাযের আদেশ দেওয়ার পর এই আয়াতে এমন এক ইবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা রাত্রি অথবা দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয় বরং সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। এখানে সদাসর্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা, একথা কল্পনাও করা যায় না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন না, তাই এ আদেশ করা হয়েছে।—(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিবারাত্রি সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে কোন সময় অবহেলা ও অনবধানতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এটা তখনই হতে পারে, যখন স্মরণ করার অর্থ ব্যাপক নেওয়া হয় অর্থাৎ মুখে, অন্তরে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে ব্যাপৃত রেখে ইত্যাদি যে কোন প্রকারে স্মরণ করা। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন: كان يذكر الله على كل حين অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন। এটাও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে শুদ্ধ হতে পারে। কেননা, প্রস্রাব-পায়খানার সময় তিনি যে মুখে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন না, একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তবে আন্তরিক স্মরণ সর্বাবস্থায় হতে পারে। আন্তরিক স্মরণ দুই প্রকার—১. শব্দ কল্পনা করে স্মরণ করা এবং ২. আল্লাহ্‌র গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।—(মাওলানা থানভী)

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় আদেশ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا—অর্থাৎ আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানে ও ইবাদতে মগ্ন হোন। এর সাধারণ অর্থে ইবাদতে শিরক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসায়, চলাফেরায় দৃষ্টি ও ভরসা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল। হযরত ইবনে যায়েদ (রা) বলেন: تبتل -এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা।—(মাযহারী) কিন্তু এই تبتل তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই رهبانيت তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে لا رهبانية فى الاسلام বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, শরীয়তের পরিভাষায় رهبانية-এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমূহকে ইবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস থাকা যে, এসব হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে না, অথবা ওয়াজিব হকে ত্রুটি করে কার্যত সম্পর্কচ্ছেদ করা। আর এখানে যে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের উপর কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেওয়া। এ ধরনের সম্পর্কচ্ছেদ বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের পরিপন্থী নয়, বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। পয়গম্বরগণের সুন্নত; বিশেষত পয়গম্বরকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)-র সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে تبتل শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীনের ভাষায় এরই অপর নাম 'ইখলাস'।—(মাযহারী)

জ্ঞাতব্য: অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং সাংসারিক সম্পর্ক ত্যাগ করায় ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সূফী বুযুর্গগণ সবার অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা বলেন:

আমরা যে দূরত্ব অতিক্রম করার কাজে দিবারাত্রি মশগুল আছি, প্রকৃতপক্ষে তার দু'টি স্তর আছে—প্রথম স্তর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় স্তর আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা। উভয় স্তর পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আলোচ্য আয়াতে এ দু'টি স্তরই পর পর দুই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ১. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ এবং ২. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

এখানে আল্লাহ্কে স্মরণ করার অর্থ সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণ করা, যাতে কখনও ত্রুটি ও শৈথিল্য দেখা না দেয়। এই স্তরকেই সূফী-বুযুর্গগণের পরিভাষায় وصول الى الله আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা বলা হয়। এভাবে প্রথম বাক্যে শেষ স্তর এবং শেষ বাক্যে প্রথম স্তর উল্লিখিত হয়েছে। এই ক্রম পরিবর্তনের কারণ সম্ভবত এই যে, দ্বিতীয় স্তরই আল্লাহ্র পথের পথিকের আসল উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। তাই এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করার জন্য স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। শেখ সাদী (র) উপরোক্ত দু'টি স্তর চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

تعلق حجاب است وبے حاصلی — چو پیوندها بگسلی واصلی

ইসমে যাতের যিকর অর্থাৎ বারবার 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' বলাও ইবাদত ঃ আয়াতে ইসম শব্দ উল্লেখ করে وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ বলা হয়েছে এবং وَاذْكُرْ رَبَّكَ বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসমে অর্থাৎ আল্লাহ্ বারবার উচ্চারণ করাও আদিষ্ট বিষয় ও কাম্য।—(মাযহারী) কোন কোন আলিম একে বিদ'আত বলেছেন। আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের এই উক্তি ঠিক নয়।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا—যাকে কোন কাজ সোপর্দ করা হয়, অভিধানে তাকে وكيل বলা হয়। কাজেই فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ কর। পরিভাষায় একেই তাওয়াক্কুল বলা হয়। এই সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে এটা পঞ্চম নির্দেশ। ইমাম ইয়াকুব কারখী (র) বলেন ঃ সূরার শুরু থেকে এই আয়াত পর্যন্ত সুলূক তথা আল্লাহ্র পথে চলার পাঁচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে ১. রাত্রিবেলায় আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্জনে গমন, ২. কোরআন পাকে মশগুল হওয়া, ৩. সদা-সর্বদা আল্লাহ্র স্মরণ ৪. সৃষ্টির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং ৫. তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের সর্বশেষ নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার গুণ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পালন-কর্তা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি আগা গোড়া পূর্ণ করার যিম্মাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার যোগ্য হতে পারেন এবং তার উপর যে ব্যক্তি ভরসা করবে, সে কখনও বঞ্চিত হবে না। কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছে : وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার যাবতীয় প্রয়োজনাদি ও বিপদাপদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

তাওয়াক্কুলের শরীয়তসম্মত অর্থ : আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করার অর্থ এরূপ নয় যে, জীবিকা উপার্জন ও আত্মরক্ষার যেসব উপকরণ ও হাতিয়ার আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন, সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে হবে। বরং তাওয়াক্কু-লের স্বরূপ এই যে, উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ও উপকরণাদি পুরোপুরি ব্যবহার কর, কিন্তু বৈষয়িক উপকরণাদিতে অতিমাত্রায় মগ্ন হয়ে যেও না। ইচ্ছাধীন কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর ফলাফল আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।

তাওয়াক্কুলের এই অর্থ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বগভী ও বায়হাকী (র) বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেন :

ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ا لا فا تقوا الله و ا جملو ا فى الطلب অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তখন পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হবে না, যে পর্যন্ত সে তার অবধারিত ও লিখিত রিযিক পুরোপুরি হাসিল না করে। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে এতদূর মগ্ন হয়ো না যে, অন্তরের সমস্ত অভিনিবেশ বৈষয়িক উপকরণাদির মধ্যেই সীমিত থেকে যায় এবং তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর।—(মাযহারী) তিরমিযীতে আবূ যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : দুনিয়া ত্যাগ এর নাম নয় যে, তোমরা হালালকৃত বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য হারাম করে নেবে অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ অযথা উড়িয়ে দেবে; বরং দুনিয়া ত্যাগের অর্থ এই যে, তোমাদের কাছে যা আছে, তার তুলনায় আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তার উপর তোমাদের ভরসা বেশী হবে।—(মাযহারী)

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ—ইমাম কারখী (র)-র উক্তিমতে এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত ষষ্ঠ নির্দেশ। অর্থাৎ মানুষের উৎপীড়ন ও গালিগালাজে সবর করা। এটা আল্লাহ্‌র পথের পথিকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। উদ্দেশ্য এই যে, যাদের শুভেচ্ছায় ও সহানুভূতিতে সাধক তার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও জীবন নিয়োজিত করে, প্রতিদানে তাদের পক্ষ থেকেই নির্যাতন ও গালিগালাজ শুনে উত্তম সবর করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের

কল্পনাও করবে না। সূফীগণের পরিভাষায় এই সর্বোচ্চ স্তর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا — هجر—এর শাব্দিক অর্থ বিষণ্ণ ও দুঃখিত মনে কোন কিছুকে ত্যাগ করা। অর্থাৎ মিথ্যারোপকারী কাফিররা আপনাকে যেসব পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে, আপনি সেসবের প্রতিশোধ নেবেন না ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় মানুষের অভ্যাস এই যে, যার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা হয়, তাকে গালমন্দ দেয়। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্পর্ক ত্যাগের আদেশ দিতে যেয়ে هَجْرًا جَمِيلًا শব্দ যোগ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনার উচ্চ পদমর্যাদার খাতিরে আপনি কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন এবং মুখেও তাদেরকে মন্দ বলবেন না।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : পরবর্তীতে অবতীর্ণ জিহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু চিন্তা করলে এরূপ বলার প্রয়োজন নেই। কেননা, আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের উৎপীড়নের কারণে সবর ও সম্পর্ক ত্যাগ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটা হুমকি, শাস্তি ও জিহাদের পরিপন্থী নয়। এই আয়াতের নির্দেশ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এবং জিহাদে যে শাস্তির হুমকি আছে তার আদেশ বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রযোজ্য। এছাড়া ইসলামী জিহাদ কোন প্রতিশোধ স্পৃহা ও ক্রোধবশত করা হয় না, যা সবর ও উত্তম সম্পর্ক ত্যাগের পরিপন্থী হবে। বরং জিহাদ বিশেষ আল্লাহ্র আদেশ প্রতিপালন মাত্র। সাধারণ অবস্থায় সবর ও সম্পর্ক ত্যাগও তেমনি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্ত্বনার জন্য কাফিরদের পরকালীন আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী অত্যাচার-অবিচারের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন। তবে বিশেষ রহস্যের তাগিদে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। পরবর্তী আয়াত ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا—এর মর্ম তাই। এতে কাফিরদেরকে أُولِي النَّعْمَةِ বলা হয়েছে। نَعْمَة শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে; দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া পরকাল অবিশ্বাসীরই কাজ হতে পারে। মু'মিনও মাঝে মাঝে এগুলো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে তাতে মত্ত হয়ে পড়ে না। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মধ্যে থেকেও তার অন্তর পরকাল চিন্তা থেকে মুক্ত হয় না।

অতঃপর পরকালের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে أَنْكَالًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। এরপর জাহান্নামের উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা আছে— طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ—এর অর্থ গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, গলধঃকরণও করা যায় না এবং উদ্‌গীরণও করা যায় না। জাহান্নামীদের খাদ্য যরী ও যাক্কুমের অবস্থা তাই হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : তাতে আগুনের কোঁটা থাকবে, যা গলায় আটকে যাবে।—(নাউযুবিল্লাহ্ মিনহু) শেষে বলা হয়েছে : وَعَذَابًا أَلِيمًا—নির্দিষ্ট আযাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরও অধিক কঠোরতা ও অকল্পনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের পরকাল ভীতি : ইমাম আহমদ, ইবনে আবী দাউদ, ইবনে আদী ও বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি কোরআন পাকের এই আয়াত শুনে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। হযরত হাসান বসরী (র) একদিন রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় সম্মুখে খাদ্য নীত হলে অন্তরে এই আয়াতের কল্পনা জেগে উঠে। তিনি খাদ্য গ্রহণ করতে পারলেন না। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আবার এই ঘটনা ঘটল। তিনি আবার খাদ্য ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন তিনি খাদ্য গ্রহণ করলেন না, তখন তাঁর পুত্র হযরত সাবেত বানানী, ইয়াযীদ যব্বী ও ইয়াহ্ইয়া বাক্কা (র)-র কাছে যেয়ে পিতার অবস্থা জানালেন। তাঁরা এসে বহু পীড়াপীড়ির পর তাঁকে সামান্য খাদ্য গ্রহণে সম্মত করলেন।—(রূহুল মা'আনী)

অতঃপর কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে : يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ—এরপর কাফিরদের ফিরাউন ও হযরত মূসার কাহিনী শুনিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ফিরাউন পয়গম্বর মূসা (আ)-কে মিথ্যারোপ করে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, তোমরা মিথ্যারোপ অব্যাহত রাখলে তোমাদের উপরও দুনিয়াতে এমনি ধরনের আযাব আসতে পারে। শেষে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে এরূপ আযাব না আসলেও কিয়ামতের সেই দিনের আযাবকে ঠেকাতে পারবে না, যেদিন ভয়াবহ ও দীর্ঘ হওয়ার কারণে বালককে বৃদ্ধে পরিণত করে দেবে। বাহ্যত এতে কিয়ামতের ভয়াবহতা ও কঠোরতা বিধৃত হয়েছে। সেদিন এমন ভীতি ও ত্রাস দেখা দেবে যে, বালকও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ একে উপমা বলেছেন এবং কারও মতে এটা বাস্তব সত্য। দিনটি এত দীর্ঘ হবে যে, বালকও বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে।—(কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

তাহাজ্জুদ আর ফরয নয় : সূরার শুরুতে قُمِ اللَّيْلَ বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও

সকল মুসলমানের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই নামায অর্ধরাত্রির কিছু কম অথবা কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর একদল সাহাবী প্রায়ই রাত্রির অধিকাংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করে এই ফরয আদায় করতেন। প্রতি রাত্রিতেই এই ইবাদত এবং দিনের বেলায় দীনের দাওয়াত ও প্রচারকার্য, তদুপরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই মেহনতমজুরী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। নিয়মিতভাবে এই দীর্ঘ নামায আদায় করতে করতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের পদযুগল ফুলে যায়। তাঁদের এই কষ্ট ও শ্রম আল্লাহ্ তা'আলার অগোচরে ছিল না। কিন্তু তাঁর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল যে, এই পরিশ্রম ও মেহনতের ইবাদত ক্ষণস্থায়ী হবে, যাতে তাঁরা পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যস্ত হয়ে যান। এর প্রতি إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا আয়াতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ এর চেয়ে ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী কোরআনের দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করা হবে, তাই আপনাকে এই কষ্ট ও পরিশ্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী যখন এই সাধনা ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে দেওয়া হল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেবল দীর্ঘ নামায রহিত হয়েছে এবং আসল তাহাজ্জুদের নামায পূর্ববৎ ফরয রয়ে গেছে। অতঃপর মি'রাজের রাত্রিতে যখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয করা হল, তখন তাহাজ্জুদের নামায আর ফরয রইল না।

বাহ্যত রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সমস্ত উম্মত থেকে এই রহিত ফরয হয়ে গেছে। তবে তাহাজ্জুদের নামায মোস্তাহাব এবং আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়—এই বিধান এখনও বাকী আছে। এখন এই নামাযে কোন সময়সীমা এবং কোরআন পাঠের কোন বাঁধা-ধরা পরিমাণ রাখা হয়নি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি ও ফুরসত অনুযায়ী পড়তে পারে এবং যতটুকু সম্ভব কোরআন পাঠ করতে পারে।

শরীয়তের বিধান রহিত হওয়ার স্বরূপ ঃ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে তাদের আইন-কানুন পরিবর্তন ও রহিত করে থাকে। তবে এর বেশীর ভাগ কারণ, অভিজ্ঞতার পর নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে, যা পূর্বে জানা থাকে না। নতুন পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে প্রথম আইন রহিত করে অন্য আইন জারি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলীতে এরূপ কল্পনাও করা যায় না। কেননা, কোন নতুন বিধান জারি করার পর মানুষের কি অবস্থা দাঁড়াবে, কেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন। তাঁর সর্বব্যাপী ও চিরন্তন জ্ঞানের বাইরে কোন কিছু নেই। কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে কোন কোন বিধান আল্লাহর জ্ঞানে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জারি করা হয় এবং তা কারও কাছে প্রকাশ করা হয় না। ফলে মানুষ মনে করে যে, এই বিধান চিরকালের জন্য স্থায়ী। আল্লাহর কাছে নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যখন বিধানটি প্রত্যাহার করা হয়, তখন মানুষের দৃষ্টিতে তা রহিতকরণ বলে প্রতিভাত হয়। অথচ

প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা মানুষের কাছে একথা বর্ণনা করা ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে, বিধানটি চিরকালের জন্য নয়, বরং এই মেয়াদের জন্যই জারি করা হয়েছিল। এখন মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিধানও শেষ হয়ে গেছে।

কোরআন পাকের অনেক আয়াত রহিত হতে দেখে সাধারণভাবে যে সন্দেহ উত্থাপন করা হয়, উপরোক্ত বক্তব্যে তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল। তাঁরা সূরা বনী ইসরাঈলের وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ আয়াতখানি এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। এতে বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দায়িত্বে তাহাজ্জুদের নামাযকে একটি অতিরিক্ত ফরয হিসাবে আরোপ করা হয়েছে। কেননা, نَافِلَةً শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত; মানে অতিরিক্ত ফরয। কিন্তু অধিকাংশের মতে এই নামায এখন কারও উপর ফরয নয়। তবে মোস্তাহাব সবার জন্যই। আয়াতে نَافِلَةً لَّكَ বলে পারিভাষিক নফল বোঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কিত অবশিষ্ট আলোচনা সূরা বনী ইসরাঈলের তফসীরে দেখুন।

ফরয তাহাজ্জুদ রহিতকারী إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ থেকে فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ পর্যন্ত আয়াতখানি সূরার শুরুভাগের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার এক বছর অথবা আট মাস পর অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব পূর্ণ এক বছর পর ফরয তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। মসনদে আহমদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরার শুরুতে তাহাজ্জুদের নামায ফরয করে-ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এক বছর পর্যন্ত এই আদেশ পালন করতে থাকেন। সূরার শেষ অংশ বার মাস পর্যন্ত আকাশে আটকে রাখা হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার পর শেষ অংশ অবতীর্ণ হয় এবং তাতে ফরয তাহাজ্জুদ রহিত করে দেওয়া হয়। এরপর তাহাজ্জুদের নামায নিছক নফল ও মোস্তাহাব থেকে যায়।—(রূহুল মা'আনী)

এর পর রহিতকরণের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ عَلِمَ أَنْ لَّنْ تُحْصُوهُ

احصاء—শব্দের অর্থ গণনা করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা করতে পারবে না। কোন কোন তফসীরবিদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে এই নামাযে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্র কত-টুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। কেননা, তখনকার দিনে সময় জানার যন্ত্র ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না। থাকলেও নামাযে মশগুল হয়ে বারবার ঘড়ির দিকে তাকানো তাঁদের অবস্থা ও

খুশু-খুযুর পরিপ্রেক্ষিতে সহজ ছিল না। আবার কোন কোন তফসীরবিদ বলেন: এখানে احصاء শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যহ যথারীতি নামায পড়তে সক্ষম না হওয়া। শব্দটি এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন হাদীসে আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে: من احصاها دخل الجنة অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামসমূহকে কর্মের ভেতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে। সূরা ইবরাহীমের তফসীরেও এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

فَتَابَ عَلَيْكُمْ—তওবা শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তওবাকেও এ কারণে তওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অবশেষে বলা হয়েছে: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

—অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায, যা এখন ফরযের পরিবর্তে মোস্তাহাব অথবা সুন্নত রয়ে গেছে, তাতে যে যতটুকু কোরআন সহজে পাঠ করতে পারে, পাঠ করুক। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই।

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ—এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, ফরয নামায পাঁচটি যা মি'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায এক বছর পর্যন্ত ফরয থাকাকালেই মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর পূর্বোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ফরয তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। সুতরাং সূরার শেষের أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ আয়াতে পাঞ্জেগানা ফরয নামায বোঝানো যেতে পারে।—(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত)

এমনি ভাবে وَآتُوا الزَّكٰوةَ বাক্যে ফরয যাকাত বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরয হয়েছে এবং এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোন কোন তফসীরবিদ বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু ইবনে কাসীর বলেন: যাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরয হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরয যাকাত বোঝানো যেতে পারে।—রূহুল-মা'আনীও তাই বলেছে।

وَأَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا—আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা

হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহ্‌কে ঋণ দিচ্ছে। এতে তার অবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের দিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ধনীদের সেরা ধনী, তাঁকে দেওয়া ঋণ কখনও মারা যাবে না—অবশ্যই পরিশোধিত হবে। ফরয যাকাতের আদেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে; যেমন আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনকে কিছু দেওয়া, মেহমানদের জন্য ব্যয় করা, আলিম ও সাধু পুরুষদের সেবাযত্ন করা ইত্যাদি। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। কাজেই أَقْرِضُوا اللهَ বাক্যে এসব ওয়াজিব পাওনা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ—অর্থাৎ তোমরা জীবদ্দশায় যে যে কাজ সম্পাদন কর, তা মৃত্যুর সময় সেই কাজের ওসীয়্যত করে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ, মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা স্বাধীন; তারা ওসীয়্যত পূর্ণ করতেও পারে, না-ও করতে পারে। এতে আর্থিক-ইবাদত, সদকা-খয়রাতসহ নামায-রোযা ইত্যাদিও দাখিল।

হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে নিজের ধনসম্পদের তুলনায় ওয়ারিশের ধনসম্পদকে বেশী ভালবাসে ? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ নিজের ধনের চেয়ে ওয়ারিশের ধনকে বেশী ভালবাসে এরূপ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ খুব বুঝেশুনে উত্তর দাও। সাহাবায়ে কিরাম বললেন ঃ এই উত্তর ছাড়া আমাদের অন্য কোন উত্তর জানা নেই। তিনি বললেন ঃ (আচ্ছা, তা হলে বুঝে নাও) তোমার ধন তাই, যা তুমি স্বহস্তে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে। তোমার মৃত্যুর পর যে ধন থেকে যাবে, তা তোমার ধন নয়—তোমার ওয়ারিশের ধন। —(ইবনে কাসীর)

سورة المدثر

সূরা মুদ্দাস্‌সির

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৬ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ﴿۱﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ﴿۲﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ﴿۳﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ﴿۴﴾
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۙ﴿۵﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۙ﴿۶﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿۷﴾ فَاِذَا نُقِرَ
فِي النَّاقُوْرِ ۙ﴿۸﴾ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۙ﴿۹﴾ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ
يَسِيْرٍ ﴿۱۰﴾ ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۙ﴿۱۱﴾ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۙ﴿۱۲﴾
وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۙ﴿۱۳﴾ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۙ﴿۱۴﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۙ﴿۱۵﴾
كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ؕ﴿۱۶﴾ سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ؕ﴿۱۷﴾ اِنَّهٗ
فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۙ﴿۱۸﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۙ﴿۱۹﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۙ﴿۲۰﴾ ثُمَّ نَظَرَ ۙ﴿۲۱﴾
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۙ﴿۲۲﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۙ﴿۲۳﴾ فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ
يُّؤْثَرُ ۙ﴿۲۴﴾ اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ؕ﴿۲۵﴾ سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ﴿۲۶﴾ وَمَآ
اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ؕ﴿۲۷﴾ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ۚ﴿۲۸﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۚ﴿۲۹﴾ عَلَيْهَا
تِسْعَةَ عَشَرَ ؕ﴿۳۰﴾ وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۪ وَّمَا جَعَلْنَا
عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ

أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى
لِلْبَشَرِ ۝ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝ وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝ وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۝ اِنَّهَا
لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ
اَوْ يَتَاَخَّرَ ۝ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝ فِىْ جَنّٰتٍ
يَتَسَآءَلُوْنَ ۝ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ۝ قَالُوْا
لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۝ وَكُنَّا نَخُوْضُ
مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۝ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝ حَتّٰىٓ اَتٰىنَا
الْيَقِيْنُ ۝ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ۝ فَمَا لَهُمْ عَنِ
التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۝ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝ بَلْ
يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝ كَلَّا ؕ بَلْ لَّا
يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝ كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝ وَمَا
يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হে চাদরাবৃত, (২) উঠুন, সতর্ক করুন, (৩) আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন (৪) আপন পোশাক পবিত্র করুন (৫) এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৬) অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দেবেন না। (৭) এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে সবর করুন। (৮) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে; (৯) সেদিন হবে কঠিন দিন, (১০) কাফিরদের জন্য এটা সহজ নয়। (১১) যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। (১২) আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়েছি (১৩) এবং সদাসংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি, (১৪) এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। (১৫) এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দিই (১৬) কখনই নয়। সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (১৭) আমি সত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ

করাব। (১৮) সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে, (১৯) ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে, (২০) আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে। (২১) সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে, (২২) অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে, (২৩) অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে, (২৪) এরপর বলেছে : এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ নয়, (২৫) এ তো মানুষের উক্তি বৈ নয়। (২৬) আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে। (২৭) আপনি কি বুঝলেন অগ্নি কি? (২৮) এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না (২৯) মানুষকে দগ্ধ করবে। (৩০) এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশজন ফেরেশতা। (৩১) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফিরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তাদের এই সংখ্যা করেছি—যাতে কিতাবীরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মু'মিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফিররা বলে যে, আল্লাহ্ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (৩২) কখনই নয়। চন্দ্রের শপথ, (৩৩) শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়, (৩৪) শপথ প্রভাতকালের, যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়, (৩৫) নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম, (৩৬) মানুষের জন্য সতর্ককারী (৩৭) তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে। (৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; (৩৯) কিন্তু ডানদিকস্থরা, (৪০) তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে (৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে (৪২) বলবে : তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? (৪৩) তারা বলবে : আমরা নামায পড়তাম না, (৪৪) অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, (৪৫) আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম (৪৬) এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম (৪৭) আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। (৪৮) অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (৪৯) তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? (৫০) যেন তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গর্দভ (৫১) হট্টগোলের কারণে পলায়নপর। (৫২) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক। (৫৩) কখনও না বরং তারা পরকালকে ভয় করে না। (৫৪) কখনও না, এটা তো উপদেশ মাত্র। (৫৫) অতএব যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক। (৫৬) তারা স্মরণ করবে না কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, উঠুন (অর্থাৎ স্বীয় জায়গা থেকে উঠুন অথবা প্রস্তুত হোন) অতঃপর (কাফিরদেরকে) সতর্ক করুন, (যা নবুয়তের দায়িত্ব। এখানে 'সুসংবাদ প্রদান করুন' বলা হয়নি। কারণ, আয়াতটি একেবারেই নবুয়তের প্রথম দিকের। তখন দু-একজন ছাড়া কেউ মুসলমান ছিল না। ফলে সতর্ক করাই অধিক সমীচীন ছিল)। আপন পালনকর্তার

মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, (কেননা, তওহীদই তবলীগের প্রধান বিষয়বস্তু। অতঃপর নিজেরও কতিপয় জরুরী পালনীয় কর্ম, বিশ্বাস ও চরিত্রের শিক্ষা রয়েছে। কারণ, যে তবলীগ করবে, তারও আত্মসংশোধন প্রয়োজন)। আপন পোশাক পবিত্র রাখুন (এটা কর্ম সম্পর্কিত বিষয়। শুরুতে নামায ফরয ছিল না, তাই নামাযের আদেশ করা হয়নি। দ্বিতীয় এই যে) এবং প্রতিমা থেকে দূরে থাকুন [যেমন এ পর্যন্ত আছেন। এটা বিশ্বাসগত বিষয়। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের ন্যায় তওহীদে অটল থাকুন। রসূলুল্লাহ্ (সা) শিরকে লিপ্ত হবেন এরূপ আশংকা ছিল না। তবুও তওহীদের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁকে এই আদেশ করা হয়েছে]। প্রতিদানে অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অন্যকে কিছু দেবেন না। [এটা চারিত্রিক বিষয়। পয়গম্বর ব্যতীত অপরের জন্য এ কাজ জায়েয হলেও অনুত্তম। সূরা রোমের আয়াত وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا এর তফসীর থেকে একথা জানা যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শান ও মর্যাদা সবার উর্ধ্বে, তাই এটা তাঁর জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে]। এবং (সতর্ককরণের কাজে নির্যাতনের সম্মুখীন হলে তজ্জন্য) আপনার পালনকর্তার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে সবর করুন। (এটা তবলীগ সম্পর্কিত বিশেষ নৈতিকতা। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতসমূহে নিজের ও অপরের চরিত্র এবং কর্ম সংশোধনের বিভিন্ন ধারা ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর সতর্ক করার পরও যারা ঈমান আনে না, তাদের জন্য এই শাস্তিবাণী রয়েছে যে) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন কাফিরদের জন্য এক ভয়াবহ দিন হবে, যা কাফিরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না। (অতঃপর কতিপয় বিশেষ কাফির সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ) যাকে আমি (সন্তান ও ধন সম্পদ থেকে রিক্ত) একক সৃষ্টি করেছি (জন্মের সময় কারও ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থাকে না। এখানে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে বোঝানো হয়েছে)। তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন (আমিই তাকে বুঝে নেব)। আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়েছি ও সদাসংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। এরপরও (সে ঈমান এনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি বরং কুফর ও অমর্যাদার ভঙ্গিতে এই বিপুল ধনসম্পদকে সামান্য মনে করে) সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দিই। কখনও (সে বেশী দেওয়ার যোগ্য) নয়, (কেননা,) সে আমার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (বিরুদ্ধাচরণের সাথে যোগ্যতা কিরূপে থাকতে পারে। তবে ঢিলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেশী দিলে সেটা ভিন্ন কথা। আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে এই ব্যক্তির উন্নতি বাহ্যত বন্ধ হয়ে যায়। সে মতে এরপর তার কোন সন্তান হয়নি এবং ধনসম্পদও বাড়েনি। এ শাস্তি দুনিয়াতে আর পরকালে) তাকে সত্বরই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই) জাহান্নামের পাহাড়ে আরোহণ করাব। (তিরমিযীর হাদীসে আছে জাহান্নামে একটি পাহাড়ের নাম 'সঊদ'। সত্তর বছরে এর শৃঙ্গে পৌঁছুবে, এরপর সেখান থেকে নিচে পড়ে যাবে। এরপর সর্বদাই এমনিভাবে আরোহণ করবে এবং নিচে পতিত হবে। উল্লিখিত হঠকারিতাই এই শাস্তির কারণ। অতঃপর এর আরও কিছু বিবরণ দেওয়া হচ্ছেঃ) সে চিন্তা করেছে (যে কোর-আন সম্পর্কে কি বলা যায়) অতঃপর (চিন্তা করে) মনস্থির করেছে (পরে তা বর্ণিত হবে)। ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে (এ বিষয়ে) মনস্থির করেছে। আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে (এ বিষয়ে) মনস্থির করেছে। (তীব্র নিন্দা জ্ঞাপনার্থে বারবার বিস্ময় প্রকাশ করা

হয়েছে)। অতঃপর সে (উপস্থিত লোকজনের প্রতি) দৃষ্টিপাত করেছে (যাতে স্থিরীকৃত কথাটি তাদের কাছে বলে) অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছে এবং মুখ বিকৃত করেছে, অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে। (আপত্তিকর বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার সময় মুখ বিকৃত করে ঘৃণা প্রকাশ করাই সাধারণ অভ্যাস)। এরপর বলেছেঃ এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ নয়, এ তো মানুষের উক্তি বৈ নয়। (উপরোক্ত মনস্থির করার বিষয়বস্তু এটাই। উদ্দেশ্য এই যে, এই কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম নয় বরং মানুষের কালাম, যা তিনি কোন যাদুকরের কাছ থেকে বর্ণনা করেন অথবা তিনি নিজেই এর রচয়িতা। তবে বিষয়বস্তু তাদের কাছ থেকে বর্ণিত, যারা পূর্বে নবুয়ত দাবী করত।

অতঃপর এই হঠকারিতার বিস্তারিত শাস্তি উল্লেখ করা হচ্ছে। পূর্বে سَأُرْهِقُهُ বাক্যে তা সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছিল)। আমি সত্বরই তাকে জাহান্নামে দাখিল করব। আপনি কি বুঝলেন জাহান্নাম কি? এটা (এমন যে, প্রবিষ্ট ব্যক্তির কোন কিছু দগ্ধ করতে) বাকী রাখবে না এবং (কোন কাফিরকে ভিতরে না নিয়ে) ছাড়বে না। মানুষকে দগ্ধ করবে। এর উপর নিয়োজিত থাকবে উনিশ জন ফেরেশতা। তাদের একজনের নাম মালেক। তারা কাফিরদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেবে। শক্তিশালী একজন ফেরেশতাই জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও উনিশ জনকে নিয়োগ করা থেকে বোঝা যায় যে, শাস্তি দানের কাজটি খুবই গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন করা হবে। উনিশ সংখ্যার গূঢ় তত্ত্ব আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে অভাজনের কাছে যা অধিক গ্রহণযোগ্য, তা এই যে, আসলে সত্য বিশ্বাস-সমূহের বিরোধিতার কারণে কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কর্ম সম্পর্কিত নয় এমন অকাট্য বিশ্বাস নয়টি ১. আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. জগতের নতুনত্বে বিশ্বাস করা, ৩. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ৪. সমস্ত ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাস রাখা, ৫. পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা, ৬. তকদীরে বিশ্বাস করা, ৭. কিয়ামতে বিশ্বাস করা। ৮. জান্নাত ও ৯. দোযখে বিশ্বাস করা। অন্যসব বিশ্বাস এগুলোর শাখা-প্রশাখা। কর্ম সম্পর্কিত অকাট্য বিশ্বাস দশটি—পাঁচটি করণীয় অর্থাৎ এগুলো করা যে ওয়াজিব, তা বিশ্বাস করা জরুরী। যথা, ১. কালেমা উচ্চারণ করা, ২. নামায কায়েম করা, ৩. যাকাত দেওয়া, ৪. রমযানের রোযা রাখা এবং ৫. বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা। আর পাঁচটি বর্জনীয় অর্থাৎ এগুলো করা হারাম এরূপ বিশ্বাস রাখা জরুরী। যথা, ১. চুরি করা, ২. ব্যভিচার করা, ৩. হত্যা করা, বিশেষত সন্তান হত্যা করা, ৪. অপবাদ আরোপ করা, ৫. সৎ কাজে অবাধ্যতা করা, এতে গীবত, জুলুম, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করা ইত্যাদি দাখিল আছে। এখন সব বিশ্বাসের সমষ্টি হল উনিশ। সম্ভবত এক এক বিশ্বাসের শাস্তি দেওয়ার জন্য এক একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। তওহীদের বিশ্বাসটি সর্ববৃহৎ বিধায় তার জন্য একজন বড় ফেরেশতা মালেককে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই আয়াতের বিষয়বস্তু শুনে কাফিররা উপহাস করেছিল। (তাই পরবর্তী বিষয়বস্তু নাযিল হয় অর্থাৎ) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক (মানুষ নয়) কেবল ফেরেশতা নিযুক্ত করেছি। (তাদের মধ্যে এক একজন ফেরেশতা সমস্ত জিন ও মানবের সমান শক্তিধর)

আমি তাদের সংখ্যা (বর্ণনায়) এরূপ (অর্থাৎ উনিশ) রেখেছি কেবল কাফিরদের পরীক্ষার জন্য যাতে কিতাবীরা (শোনার সাথে সাথে) দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, মু'মিনদের ঈমান বেড়ে যায় এবং কিতাবিগণ ও মু'মিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে (সন্দেহের) রোগ আছে তারা এবং কাফিররা বলে যে, আল্লাহ্ এই আশ্চর্য বিষয়বস্তু দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন? (কিতাবীদের বিশ্বাসী হওয়ার কথা বলার দুটি কারণ সম্ভবপর—১. তাদের কিতাবেও এই সংখ্যা লিখিত আছে। অতএব শোনা মাত্রই মেনে নেবে। তাদের কিতাবে এখন এই সংখ্যা উল্লিখিত না থাকলে সম্ভবত বিকৃতির কারণে মিটে যায়। ২. তাদের কিতাবে যদি এই সংখ্যা না থাকে, তবে তারা ফেরেশতাগণের অসাধারণ শক্তিমত্তায় বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণনা ব্যতীত জানার উপায় নেই; এমন অনেক বিষয় তাদের কিতাবে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং সেগুলোর ন্যায় এই সংখ্যার বিষয়কে অস্বীকার করার কোন ভিত্তি তাদের কাছে ছিল না। অতএব আয়াতে বিশ্বাসের অর্থ হবে অস্বীকার ও উপহাস না করা। এই দু'টি কারণের মধ্য থেকে প্রথম কারণটি স্পষ্ট। মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ারও দুটি কারণ হতে পারে—১. কিতাবীদের বিশ্বাস দেখে তাদের ঈমান গুণগত শক্তিশালী হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সা) কিতাবীদের সাথে মেলামেশা না করা সত্ত্বেও তাদের গুহীর অনুরূপ খবর দেন। অতএব তিনি অবশ্যই সত্য নবী। ২. নতুন কোন বিষয়বস্তু অবতীর্ণ হলেই মু'মিনগণ তৎপ্রতি ঈমান আনত। সুতরাং সংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নাযিল হওয়ার ফলে তাদের ঈমানের পরিমাণ বেড়ে গেল। এরূপ সন্দেহ পোষণ না করার কথাটি তাকীদার্থে সংযুক্ত করা হয়েছে। রোগ কি, এ ব্যাপারেও দুরকম সম্ভাবনা আছে—১. সন্দেহ; কেমনা, সত্য প্রকাশিত হলে কেউ কেউ তা অস্বীকার করে এবং কেউ তা মেনে নিতে ইতস্তত করে। মক্কাবাসীদের মধ্যেও এমন লোক থাকা বিচিত্র নয়। ২. নিফাক তথা কপটতা। এমতাবস্থায় আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, মদীনায় কপট বিশ্বাসী থাকবে এবং তাদের এই বক্তব্য হবে। মু'মিন ও কিতাবীদের বিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ না করার বিষয়টি আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, কিতাবীদের বিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ না করা হল আভিধানিক অর্থে এবং মু'মিনদের শরীয়তের পরিভাষাগত অর্থে। অতঃপর উভয় দলের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে মু'মিনগণকে যেমন বিশেষ হিদায়ত দান করেছেন এবং কাফিরদেরকে বিশেষ পথভ্রষ্ট করেছেন, এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দান করেন। (অতঃপর পূর্বের বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের সংখ্যা উনিশ বিশেষ রহস্যের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। নতুবা) আপনার পালনকর্তার (এসব) বাহিনী (অর্থাৎ ফেরেশতাদের সংখ্যা এত প্রচুর যে, তাদের) সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (তিনি ইচ্ছা করলে অগণিত ফেরেশতাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে পারতেন। এখনও তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা উনিশ হলেও তাদের সহকারী ও সাহায্যকারী অনেক। মুসলিমের হাদীসে আছে, জাহান্নামকে এমতাবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তার সত্তর হাজার বল্গা থাকবে এবং প্রত্যেক বল্গা সত্তর হাজার ফেরেশতা ধারণ করে রাখবে। জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করার যা আসল উদ্দেশ্য, তা সংখ্যাল্পতা অথবা সংখ্যাধিক্য অথবা উনিশ সংখ্যার রহস্য উন্মোচন করা অথবা না করার উপর নির্ভরশীল নয় এবং সেই আসল

উদ্দেশ্য এই যে) এটা (অর্থাৎ জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করা) মানুষের জন্য উপদেশ বৈ নয় (যাতে তারা আযাবের কথা শুনে সতর্ক হয় এবং ঈমান আনে। এই উদ্দেশ্য কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং আসল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যে রেখে এসব বাড়তি বিষয়ের পেছনে না পড়াই যুক্তিসঙ্গত। অতঃপর জাহান্নামের শাস্তির কিছুটা বর্ণনা আছে, যা মানুষের জন্য উপদেশ হওয়ার দিকটিকে ফুটিয়ে তোলে। ইরশাদ হচ্ছেঃ) চন্দ্রের শপথ, শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়, শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়, নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম। মানুষের জন্য সতর্ককারী— তোমাদের মধ্যে যে, (সৎ কাজের দিকে) অগ্রগামী হয়, তার জন্য অথবা যে (সৎ কাজ থেকে) পশ্চাতে থাকে, তার জন্যও। (অর্থাৎ সবার জন্য সতর্ককারী। এই সতর্ককরণের ফলাফল কিয়ামতে প্রকাশ পাবে, তাই কিয়ামতের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিষয়সমূহের শপথ করা হয়েছে। সেমতে চন্দ্রের বৃদ্ধি ও হ্রাস এ জগতের উন্নয়ন ও অবক্ষয়ের নমুনা। চন্দ্র যেমন এক সময়ে তার আলো হারিয়ে ফেলে, তেমনি জগৎও নিরেট অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। এমনি-ভাবে দিবা ও রাত্রির পারস্পরিক সম্পর্কের অনুরূপ সত্যাসত্যের গোপনীয়তা ও বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে বিশ্বজগৎ ও পরকালের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং বিশ্বজগতের বিলুপ্তি রাত্রির অবসানের মত এবং পরকালের প্রকাশ প্রভাতকালীন ঔজ্জ্বল্য সদৃশ। অতঃপর দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) প্রত্যেক ব্যক্তি তার (কুফরী) কৃত-কর্মের বিনিময়ে (জাহান্নামে) আটক থাকবে কিন্তু ডানদিকস্থরা (অর্থাৎ মু'মিনগণ, তাঁদের বিবরণ সূরা ওয়াকিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। নৈকট্যশীলগণও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা জাহা-ন্নামে আটক থাকবে না) তাঁরা থাকবে জান্নাতে (এবং) অপরাধী কাফিরদের অবস্থা (তাদের কাছেই) জিজ্ঞাসা করবে। (জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক বাক্যালাপ কিরূপে হবে, এসম্পর্কে সূরা আ'রাফের তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। শাসানোর জন্য এই জিজ্ঞাসা করা হবে। মু'মিনগণ কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করবে) তোমাদেরকে জাহান্নামে কিসে দাখিল করল? তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে (ওয়াজিব) আহার্য দিতাম না এবং যারা (সত্য ধর্মের বিপক্ষে) সমালোচনামুখর ছিল, আমরাও তাদের সাথে মিলে (ধর্মের বিপক্ষে) আলোচনা করতাম এবং প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। (অর্থাৎ নাফরমানীর উপরই আমাদের জীবনাবসান হয়। ফলে আমরা জাহান্নামে চলে এসেছি। এ থেকে জরুরী হয় না যে, কাফিররাও নামায, রোযা ইত্যাদি ব্যাপারে আদিষ্ট। কেননা, জাহান্নামে দুটি বিষয় থাকবে—এক. আযাব ও দুই. আযাবের তীব্রতা। সুতরাং উল্লিখিত কর্মসমূহের সমষ্টি আযাব ও আযাবের তীব্রতা এই দুই-এর কারণ হতে পারে, এভাবে যে, কুফর ও শিরক কারণ হবে আযাবের এবং নামায ইত্যাদির তরক কারণ হবে আযাবের তীব্রতার। কাফিররা নামায-রোযা ইত্যাদির ব্যাপারে আদিষ্ট নয়—এর অর্থ এই নেওয়া হবে যে, নামায-রোযার কারণে তাদের আসল আযাব হবে না এবং মূল ঈমানের সাথে যেহেতু নামায-রোযাও প্রসঙ্গ ক্রমে এসে যায়, তাই নামায-রোযা তরক করার কারণে আযাবের তীব্রতা হতে পারে)। অতএব (উল্লিখিত অবস্থায়) সুপারিশ-কারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (অর্থাৎ কেউ তাদের জন্য সুপারিশই

করতে পারবে না। কারণ, অন্য এক আয়াতে আছে ঃ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ —কুফ-রের কারণে যখন তাদের এই দুর্গতি হবে, তখন) তাদের কি হল যে, তারা (কোরআনের এই) উপদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয় যেন তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গর্দভ, সিংহ থেকে পলায়নপর। (এই তুলনায় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথমত গর্দভ বোকামি ও নির্বুদ্ধিতায় সুবিদিত। দ্বিতীয়ত তাকে বন্য ধরা হয়েছে, যে ভয় করার নয়, এমন জিনিসকেও অহেতুক ভয় করে এবং পালিয়ে ফিরে। তৃতীয়ত সিংহকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। ফলে তার পলায়ন যে চরম পর্যায়ের হবে, তা বলাই বাহুল্য। এই পলায়নের অন্যতম কারণ এই যে, কাফিররা কোরআনকে তাদের ধারণায় যথেষ্ট দলীল মনে করে না) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় যে, তাকে উন্মুক্ত (ঐশী) কিতাব দেওয়া হোক।—[দুররে-মনসূরে কাতাদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কতক কাফির রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল ঃ আপনি যদি আমাদের অনুসরণ কামনা করেন, তবে বিশেষভাবে আমাদের নামে আকাশ থেকে এমন কিতাব আসতে হবে, যাতে আপনাকে অনুসরণ করার আদেশ থাকবে। অন্য এক আয়াতে যেমন আছে ঃ

حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তোলার জন্য مُنَشَّرَةً (উন্মুক্ত) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ; অর্থাৎ সাধারণ পত্র যেমন খোলা হয় ও পঠিত হয়, তেমনি পত্র আমাদের নামে আসা চাই। অতঃপর এই বাজে দাবী খণ্ডন করা হয়েছে ঃ] কখনই না, (এর প্রয়োজন নেই এবং এর যোগ্যতাও তাদের মধ্যে নেই। বিশেষত অনুসরণের নিয়তে এই দাবী করা হয়নি)। বরং (কারণ এই যে,) তারা পরকালকে (অর্থাৎ পরকালের আযাবকে) ভয় করে না। তাই (সত্যান্বেষণ নেই। কেবল হঠকারিতাবশতই এসব দাবী করা হয়, যদি কদাচ এসব দাবী পূরণও করা হয় তবে তার অনুসরণ করবে না। অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ অতঃপর খণ্ডন ও শাসানোর ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে, যখন প্রমাণিত হল যে, তোমাদের দাবী অনর্থক, তখন এটা) কখনও (হতে পারে) না ; (বরং) এটাই (অর্থাৎ কোরআনই) যথেষ্ট উপদেশ, অন্য সহীফার প্রয়োজন নেই। অতএব যার ইচ্ছা, সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক এবং যার ইচ্ছা, সে জাহান্নামে যাক। আমার তাতে পরওয়া নেই। কোরআন দ্বারা কিছু কিছু মানুষের হিদায়ত হয় না ঠিক, কিন্তু এতে কোরআনের কোন ত্রুটি নেই। কোরআন স্বস্থানে হিদায়ত, কিন্তু) আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না। (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হওয়ার পিছনে অনেক রহস্য আছে। কিন্তু কোরআন অবশ্যই উপদেশ। অতএব এ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর। কেননা) তিনিই (অর্থাৎ তাঁর আযাবই ভয়ের যোগ্য) এবং তিনিই

(বান্দার গোনাহ্) ক্ষমা করার অধিকারী। (অন্য আয়াতে আছে ঃ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুদ্দাস্সির সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরাও বলেছেন। সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা ইক্রার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কোরআন অবতরণ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় পথ চলাকালে উপর দিক থেকে কিছু আওয়ায শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে, সেই হেরা গিরিগুহায় আগমনকারী ফেরেশতা শূন্য মণ্ডলে একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে হেরা গিরিগুহার অনুরূপ তিনি আবার ভীত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং বললেন ঃ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে গেলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। তাই আয়াতে তাঁকে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 'হে বস্ত্রাবৃত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি دثار থেকে উদ্ভূত। অর্থ শীত ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাধারণ পোশাকের উপর ব্যবহৃত অতিরিক্ত বস্ত্র। مزمل শব্দের অর্থ এর কাছাকাছি। রূহুল মা'আনীতে জাবের ইবনে যায়েদ তাবেয়ীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, সূরা মুদ্দাস্সির সূরা মুয্যাম্মিলের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন কিন্তু উপরে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্সির অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ওহী বিরতির পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। যদি সূরা মুয্যাম্মিল এর আগে অবতীর্ণ হত, তবে হাদীসের বর্ণনাকারী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) তা বর্ণনা করতেন বলা বাহুল্য যে, মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাস্সির শব্দ দুটি প্রায় সমার্থবোধক। হতে পারে যে, একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় সূরা অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই ঘটনা হচ্ছে জিবরাঈল (আ)-কে আকাশের নীচে চেয়ারে উপবিষ্ট দেখা, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে কম-পক্ষে এতটুকু প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সূরা মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াত-সমূহ ওহীর বিরতির পর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে নাযিল হয়েছে। সে সম্পর্কে রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে বিরোধ আছে। তবে সূরা ইক্রার প্রাথমিক আয়াতসমূহ যে সর্বাগ্রে নাযিল হয়েছে, একথা সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। উভয় সূরা যদিও কাছাকাছি সময়ে একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ

হয়েছে, তবুও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সূরা মুয্‌যাম্মিলের শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যক্তিগত সংশোধন সম্পর্কিত বিধানাবলী রয়েছে এবং সূরা মুদ্দাস্‌সিরের শুরুতে দাওয়াত, তবলীগ ও জনশুদ্ধি সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রদত্ত হয়েছে।

সূরা মুদ্দাস্‌সিরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত সর্বপ্রথম নির্দেশ এই : قُمْ فَاَنْذِرْ

অর্থাৎ উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান'ও হাতে পারে। অর্থাৎ আপনি বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেওয়াও অবান্তর নয়। উদ্দেশ্য এই যে, এখন আপনি সাহস করে জনশুদ্ধির দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোন।

فَاَنْذِرْ শব্দটি اِنْذَار থেকে উদ্ভূত। অর্থ সতর্ক করা। কিন্তু এমন সতর্ক করা, যা স্নেহ ও ভালবাসার উপর ভিত্তিশীল, যেমন পিতা তার সন্তানকে সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে সতর্ক করে। পয়গম্বরগণ এরূপই করে থাকেন। তাই তাঁরা بشير ও نذير উপাধিতে ভূষিত হন। نذير এর অর্থ স্নেহ ও সমমর্মিতার ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ক-কারী এবং بشير এর অর্থ সুসংবাদদাতা। রসূলুল্লাহ্ (সা)-রও এই উভয় উপাধি কোর-আনের স্থানে স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এ স্থলে শুধু সতর্ক করার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত মু'মিন মুসলমান গুণাগুণতি কয়েকজনই ছিল। অবশিষ্ট সবাই ছিল অবিশ্বাসী কাফির, যারা সুসংবাদের নয়—সতর্ক করারই যোগ্য পাত্র ছিল।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই : وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ শুধু আপন পালনকর্তার মহত্ত্ব বর্ণনা করুন কথায় ও কাজে। এখানে رب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এটাই এই নির্দে-শের মূল কারণ। যিনি সারাজাহানের পালনকর্তা, একমাত্র তিনিই সর্বপ্রকার মহত্ত্ব বর্ণনার যোগ্য। তকবীরের শাব্দিক অর্থ আল্লাহু আকবার বলা হয়ে থাকে। এতে নামাযের তকবীরে তাহ্‌রীমাসহ অন্যান্য তাকবীরও দাখিল আছে। এই নির্দেশকে নামাযের তকবীরে তাহ্‌রী-মার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কোরআনের ভাষায় কোন ইঙ্গিত নেই।

তৃতীয় নির্দেশ এই : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ — ثياب শব্দটি ثوب-এর বহুবচন। এর আসল ও আক্ষরিক অর্থ কাপড়। রূপক অর্থে কর্মকেও لباس ও ثوب বলা হয়, এমনিভাবে অন্তর, মন, চরিত্র ও ধর্মকেও বলা হয়। মানব দেহকেও لباس বলে ব্যক্ত করা হয়, যার সাক্ষ্য কোরআন ও আরবী বাক্য পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদগণ থেকে উপরোক্ত সকল অর্থই বর্ণিত আছে। বাহ্যত এতে কোন বৈপরীত্য নেই। এমতাবস্থায় নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্রতা থেকে

মুক্ত রাখুন। পায়জামা অথবা লুঙ্গি পায়ের গিঁটের নীচ পর্যন্ত পরিধান করার নিষেধাজ্ঞাও এ থেকে বোঝা যায়। কেননা, গিঁটের নীচ পর্যন্ত পরিহিত বস্ত্র নাপাক হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা থাকে। অতএব কাপড় পবিত্র রাখার আদেশের মধ্যে এ বিষয়ও দাখিল আছে যে, এভাবে কাপড় পরিধান কর যেন নাপাকী থেকে দূরে থাকে। হারাম অর্থ দ্বারা পোশাক তৈরী না করা এবং নিষিদ্ধ কাটসাটে তৈরী না করাও এই আদেশের মধ্যে দাখিল আছে। পোশাক পবিত্র রাখার এই আদেশ বিশেষভাবে নামাযের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। তাই ফিকহবিদগণ বলেন ঃ নামায ছাড়া অন্য অবস্থায়ও বিনা প্রয়োজনে শরীরকে নাপাক রাখা অথবা নাপাক কাপড় পরিধান করে থাকা অথবা নাপাক জায়গায় বসে থাকা জায়েয নয়। তবে প্রয়োজনের মুহূর্তগুলো ব্যতিক্রমভুক্ত।—(মাযহারী)

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা পছন্দ করেন। এক আয়াতে আছে ঃ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ —হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে। তাই মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শরীর, স্থান ও পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং অন্তরকে অভ্যন্তরীণ অশুচি থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে।

চতুর্থ নির্দেশ এই ঃ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ—তফসীরবিদ মুজাহিদ, ইকরামা কাতাদাহ্, যুহরী, ইবনে যায়েদ প্রমুখ এ স্থলে رجز-এর অর্থ নিয়েছেন প্রতিমা। ইবনে আব্বাস (রা) এক রেওয়ায়েতে এর অর্থ নিয়েছেন গোনাহ্। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা অথবা গোনাহ্ পরিত্যাগ করুন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তো পূর্ব থেকেই ঐ সবের ধারে কাছে ছিলেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে এই আদেশ করার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতেও এসব বিষয় থেকে দূরে থাকুন। প্রকৃতপক্ষে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অতিশয় গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে রসূলকেই সম্বোধন করে আদেশটি দেওয়া হয়েছে। এতে উম্মত বুঝতে পারবে যে, আদেশটি খুবই গুরুত্ববহ। তাই নিষ্পাপ রসূলকেও এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

পঞ্চম নির্দেশ ঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ—অর্থাৎ বেশী পাওয়ার অভিপ্রায়ে কারও প্রতি অনুগ্রহ করো না। এ থেকে জানা যায় যে, প্রতিদানে বেশী দেবে, এই আশায় কাউকে উপঢৌকন দেওয়া নিন্দনীয় ও মাকরূহ্। কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা সাধারণ লোকের জন্য এর বৈধতা জানা গেলেও এটা সাধারণ ভদ্রতার পরিপন্থী। বিশেষত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য এটা হারাম।

ষষ্ঠ নির্দেশ ঃ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ — صبر-এর শাব্দিক অর্থ প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়া ও বশে রাখা। তাই আল্লাহ্ তা'আলার বিধি বিধান প্রতিপালনে প্রবৃত্তিকে কায়েম রাখা, আল্লাহ্র

হারামকৃত বস্তুসমূহ থেকে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা এবং বিপদাপদে যথাসাধ্য হাহুতাশ করা থেকে বেঁচে থাকাও সবরের মধ্যে দাখিল। সুতরাং এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক নির্দেশ, যা গোটা দীনকে পরিব্যাপ্ত করে। এ স্থলে বিশেষভাবে এই নির্দেশ দানের কারণ সম্ভবত এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে দীনের প্রতি দাওয়াত এবং শিরক ও কুফরকে বাধা দানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এর ফলশ্রুতি এই ছিল যে, অনেক মানুষ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরোধিতা ও শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হবে। তাই সবর ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলা তাঁর জন্য সমীচীন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কয়েকটি নির্দেশ দেওয়ার পর কিয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। نَاقُوْر শব্দের অর্থ শিংগা এবং نَقْر বলে শিংগায় ফুঁ দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। কিয়ামত দিবস সকল কাফিরের জন্যই কঠিন হবে—এ কথা বর্ণনা করার পর জনৈক দুষ্টমতি কাফিরের অবস্থাও তার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ওলীদ ইবনে মুগীরার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি গিনি ঃ এই কাফিরের নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ভাষায় তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সওরী বলেন ঃ তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে এতটুকু সবার কাছেই স্বীকৃত যে, তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানী সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাই কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হত। জনসাধারণের মধ্যে তার উপাধি 'রায়হানা কোরায়শ' খ্যাত ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশত নিজেকে ওহীদ ইবনুল-ওহীদ অর্থাৎ এককের পুত্র একক বলত। তার দাবী ছিল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সে তার পিতা মুগীরা অদ্বিতীয়।—(কুরতুবী) কিন্তু এই পাপিষ্ঠ আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করেনি এবং কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম মেনে নেওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা রচনা বকে। সে কোরআনকে যাদু এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদুকর বলে প্রচার করে। তফসীরে কুরতুবীতে তার ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

রসূলে করীম (সা) একদিন حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ থেকে اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করছিলেন। ওলীদ ইবনে মুগীরা এই তিলাওয়াত শুনে এ'কে আল্লাহ্‌র কালাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধ্য হয় যে ঃ

والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله

لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر-

—"আল্লাহ্র শপথ, আমি তাঁর মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোন মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোন জিনেরও হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ চাকচিক্য। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকবে এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়।"

আরবের সর্ববৃহৎ ঐশ্বর্যশালী সরদারের মুখে একথা উচ্চারিত হওয়া মাত্রই কোরাইশ-দের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের দিকে ঝুঁকতে লাগল। অপরদিকে কাফির কোরাইশ সরদাররা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হল। আবু জাহল বলল ঃ চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি এখনি যাচ্ছি, তাকে ঠিক করে আসব।

আবু জাহল ও ওলীদের কথোপকথন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্যতায় মতৈক্য ঃ আবু জাহল মুখমণ্ডলে কৃত্রিম বিষণ্ণতা ফুটিয়ে ওলীদের কাছে পৌঁছল (এবং ইচ্ছাকৃত-ভাবেই এমন কথা বলল, যাতে সে রাগান্বিত হয়)। ওলীদ বলল ঃ ব্যাপার কি, তুমি এমন বিষণ্ণ কেন? আবু জাহল বলল ঃ বিষণ্ণ না হয়ে উপায় কি, তারা সবাই চাঁদা সংগ্রহ করে তোমাকে অর্থকড়ি দেয়। কারণ, তুমি এখন বুড়ো হয়ে গেছ, তোমাকে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু এখন তারা জানতে পেরেছে যে, তুমি মুহাম্মদ ও ইবনে আবী কোহাফা অর্থাৎ আবু বকরের কাছে যাতায়াত কর, যাতে তারা তোমাকে কিছু আহার্য দেয়। তুমি খোশামোদের ছলে তাদের কালাম শুনে বাহ্বা দাও এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কর। [বাহ্যত চাঁদা করে ওলীদকে অর্থকড়ি দেওয়ার বিষয়টিও মিথ্যা ছিল, যা কেবল তাকে রাগান্বিত করার জন্যই বলা হয়েছিল। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে আহার্য গ্রহণের ব্যাপারটি তো মিথ্যা ছিলই]। একথা শুনে ওলীদ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং অহংকারে পাগলপারা হয়ে বলতে লাগল ঃ একি বললে, আমি মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের রুটির টুকরার মুখাপেক্ষী? তুমি কি আমার ধন-দওলতের প্রাচুর্য সম্পর্কে জান না? লাত ও ওযযার শপথ, আমি কখনও তাদের মুখাপেক্ষী নই। তবে তোমরা যে মুহাম্মদকে উন্মাদ বল, একথা মিথ্যা। এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাদের কেউ তাকে কোন পাগলসুলভ কাণ্ড করতে দেখেছ কি? আবু জাহল স্বীকার করে বলল ঃ না, আমরা তা দেখিনি। ওলীদ বলল ঃ তোমরা তাকে কবি বল। জিজ্ঞাসা করি, তাকে কি কখনও কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছ? আবু জাহল বলল ঃ না, শুনিনি। ওলীদ বলল ঃ তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বল। বল তো দেখি, এ পর্যন্ত তার কোন কথা মিথ্যা পেয়েছ কি? এর জওয়াবেও আবু জাহলকে لا والله (না, আল্লাহ্র শপথ) বলতে হল। ওলীদ আরও বলল ঃ তোমরা তাকে অতীন্দ্রিয়বাদী বল। তোমরা কি কখনও তার এমন অবস্থা ও কথাবার্তা দেখেছ বা শুনেছ, যা অতী-ন্দ্রিয়বাদীদের হয়ে থাকে? আমি অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথাবার্তা ভালরূপেই চিনি। তার

কালাম অতীন্দ্রিয়বাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এ ক্ষেত্রেও আবূ জাহ্‌লকে لا والله বলতে হল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র কোরাইশ গোত্রের মধ্যে 'আল-আমীন' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। ওলীদের যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তায় আবূ জাহ্‌ল হার মানতে বাধ্য হল এবং উপরোক্ত কুৎসা রটনার অসারতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করতে লাগল যে, তাহলে কি কথা বলে মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখা যায়! তাই সে ওলীদকেই সম্বোধন করে বলল ঃ তা হলে তুমিই বল মুহাম্মদকে কি বলা যায়। ওলীদ কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করল। অতঃপর আবূ জাহ্‌লের দিকে চোখ তুলে তাচ্ছিল্য প্রকাশার্থে মুখ ভেংচাল। অবশেষে বলল ঃ মুহাম্মদকে উন্মাদ, কবি, অতীন্দ্রিয়বাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যাবে না। হ্যাঁ, তাকে যাদুকর বললে তা যুৎসই হবে। এ হতভাগা খুব জানত যে, তিনি যাদুকরও নন এবং তাঁর কালামকে যাদুকরদের কালামও বলা যায় না। কিন্তু সে এভাবে তার কথাকে দাঁড় করাল যে, তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও যাদুকরদের যাদুর প্রতিক্রিয়ার ন্যায় হয়ে থাকে। যাদুকররা তাদের যাদু বলে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিত। নাউযুবিল্লাহ্। তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ। যে-ই ঈমান আনে সে-ই তার কাফির পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। ওলীদের এই ঘটনার শেষাংশই কোরআন পাক নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ব্যক্ত করেছে ঃ

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ -

এখানে قدّر শব্দটি تقدير থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রস্তাব করা। উদ্দেশ্য এই যে, এই হতভাগা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করারই সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু অপমানের ভয়ে পরিষ্কার মিথ্যা বলা থেকে বিরত রইল। তাই অনেক চিন্তাভাবনার পর প্রস্তাব করল, তাঁকে উপরোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে যাদুকর বলা হোক। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ বলে ওর প্রতি পুনঃ পুনঃ অভিসম্পাত করেছেন।

কাফিররাও মিথ্যা ভাষণে বিরত থাকত ঃ চিন্তা করুন, সব কোরাইশ সরদারই কাফির পাপাচারী এবং নানা রকম গোনাহ্ ও অশ্লীল কার্যের সাথে জড়িত থাকত কিন্তু মিথ্যা ভাষণ এমন একটি দোষ, যা থেকে কাফিররাও পলায়ন করত। ইসলাম-পূর্বকালে রোম সম্রাটের দরবারে আবূ সুফিয়ানের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, কাফিররা রসূলে করীম (সা)-এর

বিরোধিতায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল ; কিন্তু মিথ্যা বলায় প্রস্তুত ছিল না। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান বিপরীতমুখী উন্নতির যুগে এই দোষটি যেন দোষই নয় ; বরং সবচাইতে বড় নৈপুণ্যে পরিণত হয়ে গেছে। শুধু কাফির পাপিষ্ঠই নয়, সৎ ও ধার্মিক মুসলমানদের মন থেকেও এর প্রতি ঘৃণা দূর হয়ে গেছে। তারা অনর্গল মিথ্যা বলা ও অপরকে বলতে বাধ্য করাকে গর্বের সাথে বর্ণনা করে।—(নাউযুবিল্লাহ্)

সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা একটি নিয়ামত ঃ ওলীদ ইবনে মুগীরাকে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব নিয়ামত দান করেছিলেন তন্মধ্যে একটি ছিল بَنِينَ شُهُودًا অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা। এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করা ও জীবিত থাকা যেমন নিয়ামত, তেমনিভাবে সন্তান-সন্ততি কাছে উপস্থিত থাকাও আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। তারা পিতামাতার চক্ষু শীতল করে এবং অন্তরকে শান্ত রাখে। তাদের উপস্থিতির দ্বারা পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও কাজকারবারে সাহায্য পাওয়া আর একটি অতিরিক্ত নিয়ামত। বর্তমান বিপরীতমুখী উন্নতি কেবল সোনারূপার মুদ্রা ও কাগজী নোটের নাম রেখেছে আরাম-আয়েশ, যার জন্য পিতামাতা অত্যন্ত গর্বের সাথে সন্তান-সন্ততিকে বিদেশে নিক্ষেপ করে দেয়। তারা এতই আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে, বছরের পর বছর সন্তানের মুখ না দেখলেও সন্তানের মোটা অংকের বেতন ও অগাধ আমদানীর খবর তাদের কানে পৌঁছতে থাকে। তারা এই খবরের মাধ্যমে জাতি-গোষ্ঠীর কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার প্রয়াস পায়। মনে হয়, তারা সুখ ও আরামের অর্থ সম্পর্কেই বেখবর হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলাকে বিস্মৃত হওয়ার পরিণতি এটাই হওয়া স্বাভাবিক যে, তার নিজেদেরকে অর্থাৎ নিজেদের প্রকৃত সুখ ও আরামকেও বিস্মৃত হয়ে যাবে। কোরআন বলে ঃ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ—তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন ঃ এটা আবূ জাহ্লের উক্তির জওয়াব। সে যখন কোরআনের এই বক্তব্য শুনল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশ জন ফেরেশতা, তখন কোরাইশ যুবকদেরকে সম্বোধন করে বলল ঃ মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশ জন। অতএব তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুদ্দী বলেন ঃ উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাযিল হলে পর জনৈক নগণ্য কোরাইশ কাফির বলে উঠল ঃ হে কোরাইশ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্য আমি একাই যথেষ্ট। আমি ডান বাহু দ্বারা দশজনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয়জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিস্সা চুকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় ঃ আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমত, ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট। এখানে যে উনিশজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফিরদেরকে আযাব দেওয়ার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর কিয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা

হয়েছে : اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ — كُبَر শব্দটি كُبْرى এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে জাহান্নামে দাখিল করা হবে, সেটি সাক্ষাত গুরুতর বিপদ। এ ছাড়া তাতে রয়েছে আরো নানা রকম আযাব।

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ — এখানে অগ্রে যাওয়ার অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতর্ক করা সব মানুষের জন্য ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোন কোন হতভাগা এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়।

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ — رَهِيْنَةٌ-এর অর্থ এখানে প্রত্যেকের আটক ও বন্দী হওয়া। ঋণের পরিবর্তে বন্ধকী দ্রব্য যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে—মালিক তাকে কোন কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে আটক ও বন্দী থাকবে। কিন্তু, 'আস্‌হাবুল ইয়ামীন' তথা ডানদিকের সৎ লোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে।

এখানে জাহান্নামে বন্দী থাকাও অর্থ হতে পারে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য জাহান্নামে বন্দী থাকবে। কিন্তু 'আস্‌হাবুল ইয়ামীন' বন্দী থাকবে না। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা গেল যে, আস্‌হাবুল ইয়ামীন তারা, যারা ঋণ পরিশোধ করেছে এবং করজ ও ফরয সব আদায় করেছে। অতএব তাদের বন্দী থাকার কোন কারণ নেই। এই তফসীর বাহ্যত নির্মল ও সহজবোধ্য। পক্ষান্তরে যদি আটক থাকার অর্থ হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত এবং দোযখে প্রবেশ করার পূর্বে কোন স্থানে আটক থাকা নেওয়া হয়, তবে এর সারমর্ম এই হবে যে, সব লোক হিসাব-নিকাশের জন্য আটক থাকবে এবং হিসাব না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোথাও যেতে পারবে না। এমতাবস্থায় আস্‌হাবুল ইয়ামীন তারা হতে পারে, যাদের হিসাব-নিকাশ নেই এবং নিষ্পাপ। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা। এটা হযরত আলীর উক্তি। অথবা তারা হতে পারে, যাদের সম্পর্কে হাদীসে আছে : এই উম্মতের অনেক লোককে হিসাব থেকে মুক্তি দিয়ে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করা হবে। সূরা ওয়াকিয়ায় হাশরে উপস্থিত লোকদের তিন প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে—১. অগ্রগামী ও নৈকট্যশীল, ২. ডানদিকস্থ লোক ও ৩. বাম দিকস্থ লোক। এই সূরায় নৈকট্যশীল-গণকে ডান দিকস্থ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে শুধু 'আস্‌হাবুল ইয়ামীন' উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থের দিক দিয়ে সকল আস্‌হাবুল ইয়ামীন হিসাব থেকে মুক্ত থাকবে—একথা কোন আয়াত অথবা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই। তাই এ আয়াতের তফসীর জাহান্নামে আটক থাকা গ্রহণ করলে সেটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ—এখানে هُمْ সর্বনাম দ্বারা সেসব অপরাধীকে বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ স্বীকার করেছে—১. তারা নামায পড়ত না, ২. তারা কোন অভাবগ্রস্ত ফকীরকে আহার্য দিত না অর্থাৎ দরিদ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, ৩. ভ্রান্ত লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত অথবা গোনাহ্ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হত, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত হত এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, ৪. তারা কিয়ামত অস্বীকার করত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব অপরাধী এসব গোনাহ্ করে এবং কিয়ামত অস্বীকার করার মত কুফরী করে, তাদের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা, তারা কাফির। কাফিরের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহণীয় হবে না। যদি সব সুপারিশকারী একত্রিত হয়ে জোরেসোরে সুপারিশ করে, তাতেও উপকার হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ বলা হয়েছে।

কাফিরের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না, মু'মিনের জন্য হবে : এই আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, মুসলমান গোনাহ্গার হলেও তার জন্য সুপারিশ উপকারী হবে। অনেক সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবীগণ, ওলীগণ, সৎকর্মপরায়নগণ—এমনকি সাধারণ মু'মিগণও অপরের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তা কবূল হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বলেন : পরকালে আল্লাহর ফেরেশতাগণ, পয়গম্বরগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপীদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তাঁদের সুপারিশের কারণে পাপীরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তবে উপরোল্লিখিত চার প্রকার লোক মুক্তি পাবে না; অর্থাৎ যারা নামায ও যাকাত তরক করে, কাফিরদের ইসলাম বিরোধী কথাবার্তায় শরীক থাকে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে। এ থেকে জানা যায় যে, বেনামাযী ও যাকাত তরককারীর জন্য সুপারিশ কবূল হবে না। কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে এ কথাই শুদ্ধ মনে হয় যে, যারা কিয়ামত অস্বীকার সহ উপরোক্ত চারটি অপরাধ করবে, তাদের জন্যই সুপারিশ কবূল হবে না। আর যারা কিয়ামত অস্বীকার ব্যতীত আলাদা আলাদা অন্যান্য অপরাধ করবে, তাদের জন্য এই শাস্তি জরুরী নয়। কিন্তু কতক হাদীসে বিশেষ বিশেষ গোনাহ্গার সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তারা সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সুপারিশ বা নবী-রসূলগণের শাফা'আত সত্য বলে বিশ্বাস করে না অথবা হাউযে কাওসারের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সুপারিশ এবং হাউযে কাওসারে তার কোন অংশ নেই।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ—এখানে تَذْكِرَةٌ তথা উপদেশ বলে কোরআন মজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর শাব্দিক অর্থ স্মারক। কোরআন পাক আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী, রহমত, গযব, সওয়াব ও আযাবের অদ্বিতীয় স্মারক। শেষে বলা

হয়েছে إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ كَلَّا —অর্থাৎ নিশ্চিতই কোরআন উপদেশ, যা তোমরা বর্জন করে রেখেছ। قَسْوَرَةٌ এর অর্থ সিংহ এবং তীরন্দাজ শিকারী। এ স্থলে সাহাবায়ে কিরাম থেকে উভয় অর্থ বর্ণিত আছে।

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ —আল্লাহ্ তা'আলা اهل تقوى এই অর্থে যে, একমাত্র তিনিই ভয় করার ও তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার যোগ্য। اهل مغفرت হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই বড় বড় অপরাধী ও গোনাহ্‌গারের অপরাধ ও গোনাহ্ যখন ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। অন্য কেউ এরূপ উচ্চমনা হতে পারে না।

سورة القيامة

সূরা কিয়ামত

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪০ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝١ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢ أَيَحْسَبُ
الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۝٣ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى أَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝٤
بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝٥ يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦ فَإِذَا بَرِقَ
الْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩ يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ
يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨالْمُسْتَقَرُّ ۝١٢
يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝١٣ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ
بَصِيْرَةٌ ۝١٤ وَّلَوْ أَلْقٰى مَعَاذِيْرَهُ ۝١٥ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝١٦ إِنَّ
عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ ۝١٧ فَإِذَا قَرَأْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ ۝١٨ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا
بَيَانَهُ ۝١٩ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۝٢٠ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝٢١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ
نَّاضِرَةٌ ۝٢٢ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝٢٣ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ ۝٢٤ تَظُنُّ
أَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝٢٥ كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝٢٦ وَقِيْلَ مَنْ ٚ
رَاقٍ ۝٢٧ وَّظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝٢٨ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝٢٩ إِلٰى
رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨالْمَسَاقُ ۝٣٠ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۝٣١ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝٣٢
ثُمَّ ذَهَبَ إِلٰٓى أَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ۝٣٣ أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى ۝٣٤ ثُمَّ أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى ۝٣٥ أَيَحْسَبُ

الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ۝ ثُمَّ كَانَ
عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝
أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের, (২) আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়—(৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না ? (৪) পরন্তু আমি তার অংগুলীগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (৫) বরং মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায় ; (৬) সে প্রশ্ন করে—কিয়ামত দিবস কবে ? (৭) যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, (৮) চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে (৯) এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে—(১০) সেই দিন মানুষ বলবে ঃ পলায়নের জায়গা কোথায় ? (১১) না, কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। (১২) আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে। (১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। (১৪) বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুমান, (১৫) যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে। (১৬) তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। (১৭) এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। (১৮) অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। (১৯) এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব। (২০) কখনও না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস (২১) এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। (২২) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। (২৩) তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (২৪) আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। (২৫) তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে। (২৬) কখনও না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে (২৭) এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে (২৮) এবং সে মনে করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে (২৯) এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে। (৩০) সেদিন আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে। (৩১) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি ; (৩২) পরন্তু মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। (৩৩) অতঃপর সে দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। (৩৪) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ ! (৩৫) অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (৩৬) মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে ? (৩৭) সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না ? (৩৮) অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, অতঃপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। (৩৯) অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল—নর ও নারী। (৪০) তবুও কি সেই আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের। আরও শপথ করি সেই মনের যে নিজেকে ধিক্কার দেয় (অর্থাৎ সৎ কাজ করে বলে : আমি কি করেছি। আমার কাজে আন্তরিকতা ছিল না, এতে অমুক দোষ ছিল। আর যদি গোনাহ্ হয়ে যায়, তবে খুব অনুতাপ করে।—(দূররে মনসূর) এই অর্থের দিক দিয়ে নফসে মুতমায়িন্না তথা প্রশান্ত মনও এতে দাখিল আছে। শপথের জওয়াব উহ্য আছে, অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। উভয় শপথ স্থানোপযোগী। কেননা, কিয়ামত হচ্ছে পুনরুত্থানের স্থান। আর ধিক্কারকারী মন কার্যত কিয়ামত বিশ্বাস করে। অতঃপর যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করে, তাদেরকে খণ্ডন করা হয়েছে :) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? (এখানে মানুষ মানে কাফির। অস্থিই দেহের আসল খুঁটি, তাই বিশেষভাবে অস্থির কথা বলা হয়েছে। অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আমি অবশ্যই একত্রিত করব এবং এই একত্রিত করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কেননা) আমি তার অংগুলীগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (দুই কারণে অংগুলী উল্লেখ করা হয়েছে : এক, অংগুলী দেহের অংশ এবং প্রত্যেক বস্তু তার অংশ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। আমাদের বাক-পদ্ধতিতেও এরূপ স্থলে বলা হয় : আমার অংগে অংগে ব্যথা; অর্থাৎ সমস্ত দেহে ব্যথা। দুই, অংগুলী ছোট হলেও তাতে শিল্প নৈপুণ্য অধিক এবং স্বভাবত কঠিন। সুতরাং যে একে সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম হবে, সে সহজ কাজ আরও বেশী পারবে। কিন্তু কতক লোক আল্লাহ্র কুদরত সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং কিয়ামতে বিশ্বাস করে না)। বরং মানুষ (কিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়ে) ভবিষ্যৎ জীবনেও (নির্বিবাদে) পাপাচার করতে চায়। তাই (অস্বীকারের ছলে) সে প্রশ্ন করে কিয়ামত দিবস কবে? (অর্থাৎ সে সারা জীবন গোনাহ্ ও কুপ্রবৃত্তিতে অতিবাহিত করবে বলে স্থির করে নিয়েছে। তাই সে সত্যান্বেষণের চিন্তাই করে না যে, কিয়ামত হবে বলে বিশ্বাস করবে। ফলে উপর্যুপরি অস্বীকারই করে)। অতএব যখন (বিস্ময়াতিশয্যে) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, (এই বিস্ময়ের কারণ হবে এই যে, যেসব বিষয়কে সে মিথ্যা মনে করত, সেগুলো হঠাৎ চোখের সামনে মূর্তমান হয়ে দেখা দেবে)। এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে (শুধু চন্দ্রই কেন, বরং) সূর্য ও চন্দ্র (উভয়ই) এক রকম (অর্থাৎ জ্যোতিহীন) হয়ে যাবে, (চন্দ্রকে পৃথক বর্ণনা করার কারণ সম্ভবত এই যে, চান্দ্র হিসাব রাখার কারণে আরবরা এর অবস্থা অধিক গুরুত্ব সহকারে নিরীক্ষণ করত)। সেদিন মানুষ বলবে : এখন পলায়নের জায়গা কোথায়? (ইরশাদ হচ্ছে :) কখনই (পলায়ন সম্ভবপর) নয়। (কেননা) কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন আপনার পালনকর্তার কাছেই ঠাঁই হবে। (এরপর হয় জান্নাতে যাবে, না হয় জাহান্নামে। পালনকর্তার সামনে যাওয়ার পর) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং যা পশ্চাতে রেখেছে। (মানুষের নিজ কর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া অবহিত করার উপরই নির্ভরশীল নয়) বরং মানুষ নিজেই নিজের কর্ম সম্পর্কে (আপনা আপনি জাজ্বল্যমান হওয়ার কারণে) চক্ষুষ্মান হবে যদিও (স্বভাবদোষে তখনও) তার অজুহাত (বাহানা) পেশ করতে চাইবে। (কাফিররা বলবে : وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ—কিন্তু মনে মনে জানবে যে, তারা মিথ্যাবাদী।

অতএব অবহিত করার জন্য অবহিত করা হবে না।, বরং হুঁশিয়ার ও নিরুত্তর করার জন্য হবে)। হে পয়গম্বর, (بَلِ الْاِنْسَانُ ও يُنَبَّؤُ থেকে দুটি বিষয় জানা যায়—এক. আল্লাহ্ তা'আলা সব বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা উপযোগিতার তাগিদে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান মানুষের চিন্তায় উপস্থিত করে দেন যদিও তা সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত হয়। কিয়ামতের দিন এরূপ করা হবে। সুতরাং আপনি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় কিছু বিষয়বস্তু ভুলে যাবেন—এই আশংকায় এত কষ্ট কেন স্বীকার করবেন যে, একাধারে ওহীও শুনবেন, তা পাঠও করবেন এবং লক্ষ্যও রাখবেন, যেমন এ পর্যন্ত এই কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন। কেননা, আমি যখন আপনাকে পয়গম্বর করেছি এবং আপনাকে তবলীগের দায়িত্ব দিয়েছি, তখন উপযোগিতার তাগিদ এটাই যে, এতদসংক্রান্ত বিষয়বস্তু আপনার চিন্তায় উপস্থিত রাখতে হবে। আমি যে এই উপস্থিত রাখতে সক্ষম, তা বলাই বাহুল্য। অতএব, এখন থেকে আপনি আর এ কষ্ট স্বীকার করবেন না এবং যখন ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন) আপনি (ওহী শেষ হওয়ার পূর্বে) দ্রুত কোরআন আবৃত্তি করবেন না, যাতে আপনি তা তাড়াতাড়ি শিখে নেন। (কেননা) আপনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং (আপনার মুখে) তা পাঠ করানো আমার দায়িত্ব। অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি (অর্থাৎ আমার ফেরেশতা পাঠ করে) তখন আপনি (সর্বান্তকরণে) সেই পাঠের অনুসরণ করুন (অর্থাৎ সেদিকেই মনোনিবেশ করুন এবং আবৃত্তিতে মশগুল হবেন না। অন্য আয়াতে আছে ঃ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ —) অতঃপর (আপনার মুখে মানুষের সামনে) এর বিশদ বর্ণনাও আমার দায়িত্ব। (অর্থাৎ আপনাকে মুখস্থ করানো, আপনার মুখে উচ্চারিত করা এবং তবলীগের সময়েও মনে রাখা ও মানুষের সামনে পাঠ করিয়ে দেওয়া, এসব আমার দায়িত্ব। এই বিষয়বস্তু প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হল। অতঃপর আবার কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে —) অবিশ্বাসীরা, (কিয়ামতে অবশ্যই মানুষকে অগ্রপশ্চাতের কর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। তোমরা তো মনে কর কিয়ামত হবে না,) কখনও এরূপ নয়। (তোমাদের কাছে এর না হওয়ার কোন প্রমাণ নেই)। বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস এবং (এতে মগ্ন হয়ে) পরকালকে (গাফেল হয়ে) উপেক্ষা কর। (সুতরাং যার ভিত্তিতে তোমরা কিয়ামত অস্বীকার কর, তা ভ্রান্ত। অতএব, কিয়ামত হবে এবং প্রত্যেকেই তার কর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়ে উপযুক্ত প্রতিদান পাবে, যার বিবরণ এই ঃ) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর ভাঙ্গা আচরণ করা হবে। (অর্থাৎ কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অতঃপর শাসানো হচ্ছে যে, তোমরা যে পার্থিব জীবনকে প্রিয় এবং পরকালকে বর্জনীয় মনে করছ,) কখনও এরূপ নয়। (কেননা, দুনিয়ার সাথে একদিন বিচ্ছেদ হবেই এবং সবশেষে পরকালে যেতে হবে)। যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং (খুব পরিতাপ সহকারে) বলা হয় (অর্থাৎ শুশ্রূষাকারী বলে ঃ) কোন ঝাড়ফুঁককারী আছে কি ? (উদ্দেশ্য যে কোন চিকিৎসক। আরবে

ঝাড়ফুঁকের প্রচলন বেশী ছিল বলে رَاقٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে) এবং তখন সে (মরণোন্মুখ ব্যক্তি) বিশ্বাস করে যে, (দুনিয়া থেকে) বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। এবং (তীব্র মৃত্যু যন্ত্রণার কারণে) গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যায়। (অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গোছার কথা বলা হয়েছে। এমতাবস্থায়) সেদিন তোমার পালনকর্তার নিকট নীত হবে। (এমতাবস্থায় দুনিয়াপ্রীতি ও পরকাল বর্জন খুবই মূর্খতা। আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার পর যদি সে কাফির হয়, তবে তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হবে। কেননা,) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি, কিন্তু (আল্লাহ্ ও রসূলকে) মিথ্যারোপ করেছে এবং (বিধানাবলী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (তদুপরি সত্যের প্রতি আহবানকারীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তজ্জন্য) দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। (উদ্দেশ্য এই যে, কুফর এবং অবাধ্যতা করে তজ্জন্য অনুতাপও করেনি, বরং উল্টা গর্ব করত এবং চাকর-নওকর ও পরিবার-পরিজনের কাছে যেয়ে আরও বেশী অহংকারী হয়ে যেত। এরূপ ব্যক্তিকে বলা হবে:) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ (আবার শোন) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (এক বচনকে পুনঃ পুনঃ বলায় অধিক পরিমাণ জানা গেল এবং বহু বচনকে পুনঃ পুনঃ বলায় গুণের আধিক্য জানা গেল। মানুষের আদিষ্ট হওয়া ও পুনরুজ্জীবিত হওয়ার উপর উপরোক্ত প্রতিদান নির্ভরশীল। তাই অতঃপর এই দুটি বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে)। মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? (বিধানাবলী আরোপ করা হবে না এবং তার হিসাব নিকাশও হবে না? বরং উভয় বিষয় নিশ্চিত। পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করাও তার নির্বুদ্ধিতা)। সে কি (প্রথমে নিছক মায়ের গর্ভাশয়ে) স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর সে রক্তপিণ্ড হয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্ তাকে (মানবরূপে) সৃষ্টি করেছেন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল—নর ও নারী। (অতএব, যে আল্লাহ্ প্রথমে স্বীয় কুদরত দ্বারা এসব করেছেন,) সেই আল্লাহ্ কি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন? (অথচ পুনরায় সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজতর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ — এখানে لا অব্যয়টি অতিরিক্ত। কারও বিরোধী মনোভাব খণ্ডন করার জন্য শপথ করা হলে শপথের পূর্বে অতিরিক্ত لا ব্যবহৃত হয়। আরবী বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আমাদের ভাষায়ও মাঝে মাঝে তাকীদযোগ্য বিষয়বস্তু বর্ণনা করার পূর্বে বলা হয় 'না', এরপর স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। এ সূরায় কিয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার ও তাদের সন্দেহ-সংশয়ের জওয়াব দান করা হয়েছে। প্রথমে কিয়ামত দিবস পরে 'নফসে-লাওয়ামা' তথা ধিক্কারকারী মনের শপথ করে সূরা শুরু করা হয়েছে। শপথের জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য আছে; অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। কিয়ামতের শপথ যে স্থানোপযোগী

হয়েছে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এমনিভাবে নফ্‌সে-লাওয়ামার শপথেও তার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্‌র কাছে মকবুল হওয়ার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। 'নফ্‌স' শব্দের অর্থ প্রাণ ও আত্মা সুবিদিত। لوامة শব্দটি لوم থেকে উদ্ভূত। অর্থ তিরস্কার ও ধিক্কার দেওয়া। 'নফ্‌সে-লাওয়ামা' বলে এমন নফ্‌স বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ কৃত গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে যে, তুই এমন করলি কেন? সৎ কর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, আরও বেশী সৎ কাজ সম্পাদন করে উচ্চ মর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কামিল মু'মিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কাজের জন্য নিজেকে তিরস্কারই করে। গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে তিরস্কার করার হেতু বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সৎ কাজে তিরস্কার করার কারণ এই যে, নফ্‌স ইচ্ছা করলে আরও বেশী সৎ কাজ করতে পারত। সে বেশী সৎ কাজ করল না কেন? এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর) এই অর্থের ভিত্তিতেই হযরত হাসান বসরী (র) নফ্‌সে লাওয়ামার তফসীর করেছেন 'নফ্‌সে-মু'মিনা।' তিনি বলেছেন: আল্লাহ্‌র কসম, মু'মিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে ধিক্কারই দেয়। সৎ কর্মসমূহেও সে আল্লাহ্‌র শানের মুকাবিলায় আপন কর্মে অভাব ও ত্রুটি অনুভব করে। কেননা, আল্লাহ্‌র হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ত্রুটি থাকে এবং তজ্জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হাসান বসরী (র) প্রমুখের এই তফসীর অনুযায়ী নফ্‌সে লাওয়ামার শপথ করার উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মু'মিন ব্যক্তিদের সম্মান ও সম্ভ্রম প্রকাশ করা, যারা নিজেদের কাজ কর্ম হিসাব করে ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হয় ও নিজেদেরকে তিরস্কার করে।

নফ্‌সে লাওয়ামার এই তফসীরে 'নফ্‌সে মুতমায়িন্নাও' দাখিল আছে। এগুলো 'নফ্‌সে মুত্তাকীরই' উপাধি।

নফ্‌সে আম্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িন্না: সূফী বুযুর্গগণ বলেন: নফ্‌স মজ্জাগত ও স্বভাবগতভাবে أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সৎ কর্ম ও সাধনার বলে সে নফ্‌সে লাওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎ কর্মে উন্নতি ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে চেষ্টা করতে করতে যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়ত-বিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফ্‌সই মুতমায়িন্না উপাধি প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর কিয়ামত-অবিশ্বাসীদের একটি সাধারণ প্রশ্নের জওয়াব আছে। প্রশ্ন এই যে,

মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। তার অস্থিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সেগুলোকে পুনরায় একত্র করে কিরূপে জীবিত করা হবে ? জওয়াবে বলা হয়েছে : بَلٰى قَادِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ —এর সারমর্ম এই যে, চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহকে একত্র করে পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তোমরা বিস্মিত হচ্ছ ; অথচ এ বিষয়টি পূর্বে একবার প্রত্যক্ষ করেছ যে, দুনিয়াতে পালিত ও বর্ধিত প্রত্যেক মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ ও কণা নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। অতএব, যে ক্ষমতাশালী সত্তা প্রথমবার সারা বিশ্বে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একজন মানুষের অস্তিত্বে একত্র করেছেন, এখন পুনরায় সেগুলোকে একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কিরূপে কঠিন হবে ? তিনি পূর্বে যেমন তার কাঠামোতে আত্মা রেখে তাকে জীবিত করেছেন, পুনরায় এরূপ করলে তা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে কেন ?

দেহ পুনরুত্থানে কুদরতের অভাবনীয় কর্ম : চিন্তার বিষয় এটা যে, একজন মানুষ যে দেহাবয়ব ও আকার-আকৃতিতে প্রথমে সৃজিত হয়েছিল, আল্লাহ্‌র কুদরত পুনর্বারও তার অস্তিত্বে সে সব বিষয় চুল পরিমাণ পার্থক্য ব্যতিরেকে সন্নিবেশিত করে দেবেন। অথচ সৃষ্টির আদিকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কত বিচিত্র আকার-আকৃতির মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কার সাধ্য যে, তাদের সবার আকার-আকৃতি ও দৈহিক গঠনের গুণাগুণ আলাদা আলাদাভাবে স্মরণও রাখতে পারে—পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন যে, আমি কেবল মৃত ব্যক্তির বড় ও প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই পূর্ববৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম নই বরং মানব অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতম অঙ্গকেও সম্পূর্ণ পূর্বের ন্যায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। আয়াতে বিশেষভাবে অংগুলীর অগ্রভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই মানুষের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ। এই ছোট অঙ্গের পুনঃ সৃষ্টি-তেই যখন কোন পার্থক্য হবে না, তখন হাত পা ইত্যাদি বড় বড় অঙ্গের তো কথাই নেই।

চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বিশেষভাবে অংগুলীর অগ্রভাগ উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এক মানুষকে অন্য মানুষ থেকে পৃথক করার জন্য তার সর্বাঙ্গেই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। এসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা সে আলাদাভাবে পরিচিত হয়। বিশেষত মানুষের যে মুখমণ্ডল কয়েক বর্গ ইঞ্চির বেশী নয়, তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এমন সব স্বাতন্ত্র্য রেখেছেন, যার ফলে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একের মুখমণ্ডল অপরের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিল খায় না। মানুষের জিহবা ও কণ্ঠনালী সম্পূর্ণ একই রকম হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে স্বতন্ত্র। ফলে, বালক, বৃদ্ধ এবং নারী ও পুরুষের কণ্ঠস্বর আলাদা-আলাদাভাবে চিনা যায় এবং প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠস্বর পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়। আরও বেশী বিস্ময়কর বস্তু হচ্ছে মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অংগুলীর অগ্রভাগ। এগুলোর উপর যে সব রেখা ও কারুকার্যের জাল বিস্তৃত আছে, তা কখনও একে অপরের সাথে মিলে না। অথচ মাত্র অর্ধ ইঞ্চি পরিসরের মধ্যে এসব পারস্পরিক সামঞ্জস্যবিহীন স্বাতন্ত্র্য নিহিত আছে। প্রাচীন ও আধুনিক প্রতি যুগে বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপকে একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বস্তুরূপে গণ্য করে এর ভিত্তিতেই আদালতের ফয়সালা হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, এটা কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক অংগুলীর অগ্রভাগের রেখাও এমনিভাবে স্বতন্ত্র।

একথা বুঝে নেওয়ার পর বিশেষভাবে অংগুলীর অগ্রভাগ উল্লেখ করার কারণ আপনা-আপনি হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তো এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ কর যে, এই মানুষ পুনরায় কিরূপে জীবিত হবে। আরও সামান্য অগ্রসর হয়ে চিন্তা কর যে, কেবল জীবিতই হবে না বরং তার পূর্বের আকার-আকৃতিও প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সহকারে জীবিত হবে। এমনকি, পূর্বের সৃষ্টিতে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অঙ্গুলীসমূহের রেখা যেভাবে ছিল, পুনঃ সৃষ্টিতেও তদ্রূপই থাকবে।

لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ—اَمَامَ শব্দের অর্থ সম্মুখ ও ভবিষ্যত। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফির ও গাফিল মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের এসব চাক্ষুষ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, যাতে অতীতের অস্বীকারের দরুন অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যত ঠিক করে নিতে পারে বরং ভবিষ্যতেও সে কুফর, শিরক, অস্বীকার ও মিথ্যারোপে অটল থাকতে চায়।

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَ خَسَفَ الْقَمَرُ وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ—এখানে কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। بَرِقَ অর্থ চক্ষুতে ধাঁধা লেগে গেল এবং দেখতে পারল না। কিয়ামতের দিন সবার দৃষ্টিতে ধাঁধা লেগে যাবে। ফলে চক্ষু স্থির কোন বস্তু দেখতে পারবে না। خَسَفَ শব্দটি خُسُوْف থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ—এতে বলা হয়েছে যে, শুধু চন্দ্রই জ্যোতিহীন হবে না বরং সূর্যের দশাও তাই হবে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আসল আলো সূর্যের মধ্যে নিহিত। চন্দ্রও সূর্যের কিরণ থেকে আলো লাভ করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একত্র করা হবে এবং উভয়েই জ্যোতি হারিয়ে ফেলবে। কেউ কেউ বলেন, চন্দ্র ও সূর্যকে একত্র করার অর্থ এই যে, সেদিন উভয়েই একই উদয়াচল থেকে উদিত হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাই বর্ণিত আছে।

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَ اَخَّرَ—অর্থাৎ মানুষকে সে দিন অবহিত করা হবে, যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সৎ কাজ করে নেয়, তা সে অগ্রে প্রেরণ করে এবং যে সৎ অথবা অসৎ উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে (এর সওয়াব অথবা শাস্তি সে পেতে থাকবে)। হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন : مَا قَدَّمَ বলে এমন সৎ কাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবদ্দশায় করে নেয় এবং مَا اَخَّرَ বলে এমন সৎ কাজ বোঝানো হয়েছে, যা সে করতে পারত কিন্তু করেনি এবং সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে।

بَصِيرَةٌ ও بَصِير — بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ

এর অর্থ চক্ষুষ্মান। এর অপর অর্থ প্রমাণও হয়ে থাকে। কোরআনে আছে : لَقَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ — এখানে بَصَائِر শব্দটি بَصِيرَةٌ এর বহুবচন। অর্থ প্রমাণ। مَعَاذِير শব্দটি ওযর অর্থে مِعْذَار এর বহুবচন। আয়াতের অর্থ এই যে, যদিও ন্যায়বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেই জানে। এছাড়া হাশরের মাঠে প্রত্যেকে তার সৎ-অসৎ কর্ম স্বচক্ষে দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে : وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে হাশরের মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান বলার অর্থ তাই।

পক্ষান্তরে بَصِيرَةٌ-এর অর্থ প্রমাণ হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ হবে। সে অস্বীকার করলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে। কিন্তু মানুষ তার অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা সত্ত্বেও বাহানাবাজি ত্যাগ করবে না। সে তার কৃতকর্মের অজুহাত পেশ করতেই থাকবে। وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ বাক্যের অর্থ তাই।

এ পর্যন্ত কিয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা আলোচিত হল। পরেও এই আলোচনা আসবে। মাঝখানে চার আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশ এই যে, যখন জিবরাঈল (আ) কোরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন। এক. কোথাও এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায়। দুই. কোথাও এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন জিবরাঈল (আ) কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহ্বা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বারবার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন বিশুদ্ধ পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলমানদের কাছে হুবহু তা পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে দ্রুত নাড়া দেওয়ার কষ্ট করবেন না। لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ বাক্যের অর্থ তাই। এরপর বলেছেন : إِنَّ

عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ অর্থাৎ আয়াতসমূহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। এরপর বলা হয়েছে : فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ—এখানে কোরআনের অর্থ পাঠ। অর্থ এই যে, যখন আমি অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ) কোরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না বরং চুপ করে শোনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কোরআন অনুসরণ করার মানে চুপ করে জিবরাঈলের পাঠ শ্রবণ করা। সকল তফসীরবিদই এতে একমত।

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাআত না করার একটি প্রমাণ : সহীহ্ হাদীসে আছে অনুকরণ ও অনুসরণের জন্যই নামাযে ইমাম নিযুক্ত হয়। অতএব, মুক্তাদীদের উচিত ইমামের অনুসরণ করা। যখন সে রুকূ' করে, তখন সব মুক্তাদী রুকূ' করবে এবং যখন সিজদা করে তখন সবাই সিজদা করবে। মুসলিমের রেওয়ায়েতে তৎসঙ্গে আরও বলা হয়েছে—যখন ইমাম কিরা'আত করে, তখন তোমরা চুপ করে শ্রবণ কর। إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا এ থেকেও বোঝা যায় যে, ইমামের অনুসরণ উদ্দেশ্য। রুকূ' ও সিজদায় ইমামের অনুসরণ এই যে, তার সাথে সাথে রুকূ' ও সিজদা আদায় করবে কিন্তু সাথে সাথে কিরা'আত করা কিরা'আতের অনুসরণ নয় বরং কিরা'আতের অনুসরণ এই যে, ইমাম যখন কিরা'আত করবে, তখন তোমরা চুপ করে শুনবে। ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কিরা'আত করা উচিত নয়—এই মাস'আলায় ইমাম আবূ হানীফা (র) ও অপর কয়েকজন ইমামের এটাই দলীল।

অবশেষে বলা হয়েছে : إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ অর্থাৎ আপনি এ চিন্তাও করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেওয়াও আমার দায়িত্ব, আমি কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব। এই চার আয়াতে কোরআন ও তার তিলাওয়াত সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণনা করার পর আবার কিয়ামতের পরিস্থিতি ও তত্ত্বাবহতারই অবশিষ্ট আলোচনা করা হচ্ছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই চার আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক কি? তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ স্বীয় অসীম কুদরতের বলে প্রত্যেক মানুষকে পূর্বে যে আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলেন, সেই আকারে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এমনকি, তার অংগুলীর অগ্রভাগ এবং তাতে অংকিত রেখা ও চিহ্নসমূহকেও হুবহু পূর্বের ন্যায় করে দেবেন। এতে কেশাগ্র পরিমাণ পার্থক্য হবে না। এটা তখনই হতে পারে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানও অসীম হয় এবং তথ্যাবলী সংরক্ষণের পদ্ধতিও অদ্বিতীয় হয়। এর সাথে মিল রেখে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই চার আয়াতে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তো ভুলেও যেতে পারেন এবং বর্ণনায় ভুল করারও আশংকা আছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এসব বিষয়ের ঊর্ধ্বে। এসব বিষয়ের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। তাই আপনি

কোরআনের বাক্যাবলী সংরক্ষিত রাখা অথবা এগুলোর অর্থ বোঝার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার কষ্ট ছেড়ে দিন। এসব কাজ আল্লাহ্ তা'আলাই সম্পন্ন করবেন। অতঃপর কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ—অর্থাৎ সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হাসি-খুশি ও সজীব হবে এবং তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে জান্নাতীগণ চর্মচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নত ওয়াল-জমাআতের সকল আলিম ও ফিক্হবিদ এ বিষয়ে একমত। কেবল মুতাজিলা ও খারেজী সম্প্রদায় এটা স্বীকার করে না। তাদের অস্বীকারের কারণ দার্শনিক সন্দেহ। তাদের ভাষ্য এই যে, চর্মচক্ষে দেখার জন্য দর্শক এবং যাকে দেখা হয় উভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের জন্য যে সব শর্ত রয়েছে, সেগুলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে অনুপস্থিত। আহলে সুন্নত-ওয়াল-জমাআতের বক্তব্য এই যে, পরকালে আল্লাহ্র দীদার ও সাক্ষাৎ এসব শর্তের ঊর্ধ্বে থাকবে। না কোন দিক ও পার্শ্বের সাথে এর সম্পর্ক থাকবে এবং না কোন বিশেষ আকার-আকৃতির সাথে। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। তবে এই দীদার ও সাক্ষাতে জান্নাতিগণের বিভিন্ন স্তর থাকবে। কেউ সপ্তাহে একবার অর্থাৎ শুক্রবারে এই সাক্ষাৎ লাভ করবে, কেউ দৈনিক সকাল বিকাল লাভ করবে এবং কেউ সারাক্ষণ সাক্ষাতেই থাকবে।—(মাযহারী)

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই আয়াতে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈমান ও সৎ কর্মের দিকে ধাবিত হয়। আয়াতে মৃত্যুর চিত্র অংকন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে গাফিল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকে, তখন তার মাথার উপর মৃত্যু এসে দণ্ডায়মান হয় এবং আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে ঠেকে। শুশ্রূষাকারীরা চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে ঝাড়ফুঁককারীদেরকে খুঁজতে থাকে এবং পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আল্লাহ্র কাছে যাওয়ার সময়। এ সময়ে কোন তওবা কবুল হয় না এবং কোন আমলও করা যায় না। কাজেই বুদ্ধিমানের উচিত এর আগেই সংশোধনের চেষ্টা করা। وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ—ساق-এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা। গোছার সাথে গোছা জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এখানে দুই গোছা বলে দুই জগৎ—ইহকাল ও পরকাল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তখন হবে ইহকালের শেষ দিন এবং

পরকালের প্রথম দিনের সম্মিলন। তাই মানুষ ইহকালের বিরহ-বেদনা এবং পরকালে কি হবে না হবে তার চিন্তায় প্রেরুতার থাকবে।

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ — اولى শব্দটি ويل-এর

অপভ্রংশ। অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। যে ব্যক্তি কুফর ও মিথ্যারোপকেই আঁকড়ে থাকে এবং দুনিয়ার ধনসম্পদে মত্ত থাকে ও তদবস্থায় মারা যায়, তার জন্য এখানে চারবার ويل তথা দুর্ভোগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে সমবেত হওয়ার সময় এবং অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশের সময় বিপর্যয় ও দুর্ভোগই তোমার প্রাপ্য।

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ—অর্থাৎ জীবন মৃত্যুও সারা বিশ্ব যে সত্তার করতলগত, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন? রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: যে ব্যক্তি সূরা কিয়ামতের এই আয়াত পাঠ করে, তার বলা উচিত بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ—অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তিনি সক্ষম এবং আমিও এর একজন সাক্ষী। সূরা ত্বীনের শেষ আয়াত أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ পাঠ করার সময়ও একথা বলার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই হাদীসে আরও বলা হয়েছে: যে ব্যক্তি সূরা মুরসালাতের فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ আয়াত পাঠ করে তার বলা উচিত آمَنَّا بِاللَّهِ।

سورة الدهر

সূরা দাহর

মদীনায় অবতীর্ণ, ৩১ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝١

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا

بَصِيْرًا ۝٢ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝٣ اِنَّآ اَعْتَدْنَا

لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝٤ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ

كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝٥ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا

۝٦ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝٧ وَ

يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝٨ اِنَّمَا

نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝٩ اِنَّا نَخَافُ

مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١٠ فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ

وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝١١ وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝١٢

مُّتَّكِـِٔيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا

۝١٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝١٤ وَيُطَافُ

عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ۝١٥ قَوَارِيْرَا۠

مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝١٦ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا

زَنْجَبِيلًا ۚ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
مُخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ
ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ
وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾
إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ
آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ
الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ
وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ
هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا
تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾
يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (২) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে—এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (৩) আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়। (৪) আমি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি। (৫) নিশ্চয়ই সৎ কর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র। (৬) এটা ঝরনা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ

৮২—

পান করবে—তারা একে প্রবাহিত করবে। (৭) তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী। (৮) তারা আল্লাহ্‌র প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (৯) তারা বলে ঃ কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (১০) আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি। (১১) অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে সে দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। (১২) এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। (১৩) তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। (১৪) তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। (১৫) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্র (১৬) রূপালী স্ফটিক পাত্রে—পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (১৭) তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'যানজাবীল' মিশ্রিত পানপাত্র। (১৮) এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরণা। (১৯) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তা। (২০) আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নিয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। (২১) তাদের আভরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শরাবান-তহুরা'। (২২) এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে। (২৩) আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাযিল করেছি। (২৪) অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যেকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফিরের আনুগত্য করবেন না। (২৫) এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। (২৬) রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সিজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (২৭) নিশ্চয় এরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। (২৮) আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। (২৯) এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয়, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (৩০) আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্যকোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে দাখিল করেন। আর জালিমদের জন্য তো প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় মানুষের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (অর্থাৎ সে মানুষ ছিল না—বীর্য ছিল, এর আগে খাদ্য এবং এর আগে উপাদান-চতুষ্টয়ের অংশ ছিল)। আমি তাকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। (অর্থাৎ

নর ও নারী উভয়ের বীর্য থেকে। কেননা, নারীর বীর্যও ভিতরে ভিতরে তার গর্ভাশয়ে স্খলিত হয়। এরপর কখনও গর্ভাশয়ের মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং কখনও ভিতরে থেকে যায়। মিশ্র বীর্যের আরেক অর্থ এই যে, এই বীর্য বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হয়ে থাকে এবং এটা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সার কথা, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি) এভাবে যে, তাকে আদিষ্ট করব। অতঃপর (এ কারণে) তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন (সমঝদার) করে দিয়েছি। (বাকপদ্ধতিতে সমঝদার বুদ্ধিমানকেই বিশেষভাবে শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান বলা হয়। তাই আদিষ্ট হওয়ার যে ভিত্তি সমঝদার হওয়া; তা এখানে উল্লিখিত না হলেও বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে আদিষ্ট হওয়ার গুণাবলীসহ সৃষ্টি করেছি। এরপর যখন শরীয়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিষ্ট হওয়ার সময় আসল, তখন আমি তাকে (ভালমন্দ জ্ঞাত করে) পথনির্দেশ করেছি (অর্থাৎ বিধানাবলী পালন করতে বলেছি। অতঃপর) হয় সে কৃতজ্ঞ (ও মু'মিন) হয়েছে, না হয় অকৃতজ্ঞ (ও কাফির) হয়েছে অর্থাৎ যে পথে চলতে বলেছিলাম, সে সেই পথে চলেছে, সে মু'মিন হয়েছে। পক্ষান্তরে যে সেই পথ সম্পূর্ণ বর্জন করেছে, সে কাফির হয়েছে। অতঃপর উভয় দলের প্রতিফল বর্ণনা করা হয়েছে ঃ আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ী ও লেলিহান অগ্নি। (আর) যাঁরা সৎকর্মশীল তাঁরা এমন পানপাত্র (অর্থাৎ পানপাত্র থেকে শরাব) পান করবে যার মিশ্রণ হবে কাফূর অথবা এমন ঝরনা থেকে (পান করবে) যা থেকে আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দাগণ পান করবে এবং যাকে (তারা যথা ইচ্ছা) প্রবাহিত করবে। (জান্নাতের ঝরনাসমূহ জান্নাতীদের অনুগামী হবে এটা তাদের এক কারামত। দুররে মনসুরে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীদের হাতে স্বর্ণের ছড়ি থাকবে। তারা এসব ছড়ি দ্বারা যে দিকে ইশারা করবে, সে দিকে ঝরনা প্রবাহিত হবে। জান্নাতের কাফূর শুভ্রতা, শীতলতা, চিত্তবিনোদন ও বলবীর্য বর্ধনে অতুলনীয় হবে। শরাবে বিশেষ গুণ সৃষ্টি করার জন্য কতক উপযুক্ত বস্তু মিশ্রিত করার নিয়ম আছে। সে মতে জান্নাতের শরাবে কাফূর মিশ্রিত করা হবে। নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট ঝরনা থেকে শরাবের পাত্র পূর্ণ করা হবে। অতএব এটা উৎকৃষ্টতর হবে, তা বলাই বাহুল্য। এতে করে সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ আরও জোরদার হয়ে যায়। যদি ابرار ও عباد الله বলে একই শ্রেণীর লোক বোঝানো হয়ে থাকে, তবে দুই জায়গায় বর্ণনা করার উদ্দেশ্য পৃথক পৃথক। এক জায়গায় মিশ্রণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় জায়গায় তার আধিক্য ও আয়ত্তাধীন হওয়ার কথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। কেননা বিলাস সামগ্রীর আধিক্য ও আয়ত্তাধীন হওয়া ভোগ-বিলাসের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলা। অতঃপর সৎকর্মশীলদের গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে ঃ) তারা মানত পূর্ণ করে (আন্তরিকতা সহকারে, কেননা) তারা এমন দিনকে ভয় করে, যার কঠোরতা হবে ব্যাপক। (অর্থাৎ কমবেশী সবাই এই কঠোরতার আওতায় পড়বে। এখানে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। তার এমন আন্তরিক যে, আর্থিক ইবাদতেও, যাতে প্রায়শ আন্তরিকতা কম থাকে—তারা আন্তরিক। সেমতে) তারা আল্লাহ্‌র প্রেমে দরিদ্র, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (বন্দী মজলুম হলে তার সাহায্য করা যে শুভ কাজ, তা বর্ণনা-সাপেক্ষ নয়। পক্ষান্তরে অপরাধ করে বন্দী হলে অধিক প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য

দেওয়াও শুভকাজ। তারা আহার্য দিয়ে মুখে অথবা অন্তরে বলে ঃ) কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দেই এবং তোমাদের কাছে কোন (কার্যত) প্রতিদান ও (মৌখিক) কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (কেননা) আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভয়ংকর ও তিক্ত দিনের আশংকা রাখি। (তাই আশা করি যে, এসব আন্তরিক কর্মের বদৌলতে সেদিনের তিক্ততা ও কঠোরতা থেকে নিরাপদ থাকব। এ থেকে জানা গেল যে, পরকালের ভয়ে কোন কাজ করা আন্তরিকতা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনার পরিপন্থী নয়)। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে (এই আনুগত্য ও আন্তরিকতার বরকতে) সে দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। (অর্থাৎ মুখমণ্ডলে সজীবতা ও অন্তরে আনন্দ দান করবেন) এবং তাদের দৃঢ়তার প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। তারা তথায় (অর্থাৎ জান্নাতে) আরাম-কেদারায় (আরামে ও সসম্মানে) হেলান দিয়ে বসবে। তারা তথায় রৌদ্রতাপ ও শৈত্য অনুভব করবে না (বরং আনন্দদায়ক ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ হবে)। সেখানকার (অর্থাৎ জান্নাতের) বৃক্ষ-ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে (অর্থাৎ নিকটে থাকবে। ছায়া অন্যতম বিলাস উপকরণ। জান্নাতে চন্দ্র-সূর্য নেই। অতএব, ছায়ার মানে কি ? জওয়াব এই যে, সম্ভবত অন্যান্য জ্যোতির্ময় বস্তু নিচয়ের আলোকেই ছায়া বলা হয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন সাধন করাই বোধ হয় ছায়ার উপকারিতা। কেননা, এক অবস্থা যতই আরামপ্রদ হোক না কেন, অবশেষে তা থেকে মন ভরে যায়)। এবং জান্নাতের ফলমূল তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। (ফলে সর্বক্ষণ সর্বভাবে অনায়াসে তা গ্রহণ করতে পারবে) তাদের কাছে (পানাহারের বস্তু পৌঁছানোর জন্য) রূপার পাত্র পরিবেশন করা হবে এবং স্ফটিকের পানপাত্র। এটা হবে রূপালী স্ফটিক—পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (অর্থাৎ এমন পরিমাপ করে ভর্তি করা হবে যে, অতৃপ্তি না থাকে এবং উদ্বৃত্তও না হয়। কারণ, উভয়ের মধ্যেই বিতৃষ্ণা রয়েছে। রূপালী স্ফটিকের অর্থ এই যে, রূপার মত শুভ্র এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। পার্থিব রূপা স্বচ্ছ নয় এবং স্ফটিক শুভ্র নয়। সুতরাং এটা এক অভূতপূর্ব বস্তু হবে। তথায় তাদেরকে (উল্লিখিত কাফুর মিশ্রিত শরাব ব্যতীত আরও) এমন পাত্র-পান পান করানো হবে, যাতে যানজাবীলের মিশ্রণ থাকবে। (উত্তেজনা সৃষ্টি ও মুখের স্বাদ পরিবর্তনের জন্য শরাবে এর মিশ্রণ করারও নিয়ম আছে। অর্থাৎ) এমন ঝরনা থেকে (তাদেরকে পান করানো হবে) যার নাম (সেখানে) সালসাবীল (প্রসিদ্ধ) হবে। (অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত ঝরনার শরাবে কাফুরের এবং এই আয়াতে বর্ণিত ঝরনার শরাবে যানজাবীলের মিশ্রণ থাকবে। এর রহস্য আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। তাদের কাছে (এসব বস্তু নিয়ে) চির কিশোর বালকরা ঘোরাফেরা করবে (তারা এমন সুশ্রী যে) হে পাঠক, তুমি তাদেরকে দেখে মনে করবে যেন বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তা। (পরিচ্ছন্নতা ও চাকচিক্যে তাদেরকে মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং চলাফেরার দিক দিয়ে বিক্ষিপ্ত বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা উচ্চস্তরের তুলনা। কেবল উল্লিখিত বিলাস-সামগ্রীই নয় বরং সেখানে আরও সর্বপ্রকার বিলাস দ্রব্য এত অধিক ও উচ্চমানের থাকবে যে) হে পাঠক, যদি তুমি সেই স্থানটি দেখ, তবে তুমি অগাধ নিয়ামত ও বিশাল সাম্রাজ্য দেখতে পাবে। তাদের (অর্থাৎ জান্নাতীদের) আভরণ হবে-চিকন সবুজ রেশমী বস্ত্র ও

মোটা রেশমী বস্ত্র। (কেননা প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে পৃথক আনন্দ রয়েছে)। তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন। (এই সূরার তিন জায়গায় রূপার আসবাব-পত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে স্বর্ণের আসবাবপত্রের বর্ণনা আছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, উভয় প্রকার আসবাবপত্র থাকবে। এর রহস্য বিলাসব্যসনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন মানসিক প্রবণতার প্রতি নযর রাখা। পুরুষের জন্য অলংকার দূষণীয় বলে প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। কেননা, দুনিয়াতে যা দূষণীয়, পরকালেও তা দূষণীয় হবে—এটা জরুরী নয়)। তাদের পালনকর্তা (তাদেরকে উপরের বর্ণনা অনুযায়ী যে শরাব পান করতে দিবেন, তা দুনিয়ার শরাবের ন্যায় অপবিত্র, বিবেকবুদ্ধি বিলোপকারী ও নেশাযুক্ত হবে না বরং আল্লাহ্ তা'আলা) তাদেরকে শরাবান-তহুরা (পবিত্র শরাব) পান করাবেন। এতে নাপাকী ও ময়লা থাকবে না, যেমন অন্য আয়াতে আছে : لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ সূরার তিন জায়গায় শরাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক জায়গার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম জায়গায় يَشْرَبُونَ দ্বিতীয় জায়গায় يُسْقَوْنَ এবং তৃতীয় জায়গায় سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম জায়গায় সাধারণভাবে পান, দ্বিতীয় জায়গায় সসম্মানে পান এবং তৃতীয় জায়গায় চূড়ান্ত সম্মানের সাথে পান করা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং একই বিষয়-বস্তুর বারবার উল্লেখ হয়নি। এসব নিয়ামত দিয়ে আত্মিক সুখ বৃদ্ধি করার জন্য জান্নাতী-গণকে বলা হবে : এটা তোমাদের প্রতিদান এবং (দুনিয়াতে কৃত) তোমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। [অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, শত্রুদের শাস্তি আপনি শুনলেন। অতএব, এ শত্রুতা ও বিরোধিতার জন্য দুঃখ করবেন না এবং ইবাদত ও প্রচারকার্যে মশগুল থাকুন। এটা যেমন ইবাদত, তেমনি অন্তরকেও শক্তিশালী করে। ইবাদতের বর্ণনা এই :] আমি আপনার প্রতি অল্প অল্প করে কোরআন নাযিল করেছি (যাতে অল্প অল্প করে মানুষের কাছে পৌঁছাতে থাকেন এবং তারা সহজে উপকৃত হতে পারে। যেমন সূরা ইসরার শেষে বলা হয়েছে : وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ—) অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার (তবলীগসহ) আদেশের উপর অটল থাকুন এবং তাদের মধ্যে কোন পাপিষ্ঠ ও কাফিরের আনুগত্য করবেন না। [অর্থাৎ তারা যে তবলীগ করতে নিষেধ করে, তা মানবেন না। এখানে উদ্দেশ্য গুরুত্ব প্রকাশ করা। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কথা মেনে চলবেন—এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না)। এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সিজদা করুন (অর্থাৎ ফরয নামায পড়ুন) এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়ুন। অতঃপর সান্ত্বনাদানের উদ্দেশ্যে আরও একটি বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কাফিরদেরর নিন্দাও রয়েছে। অর্থাৎ কাফিরদের বিরোধিতার আসল কারণ এই যে) তারা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং ভবিষ্যতে আগমনকারী এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। (সুতরাং দুনিয়াপ্রীতি তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা সত্যের

দুশমন হয়ে গেছে। অতঃপর কঠিন দিবসের অসম্ভাব্যতা নিরসন করার জন্য বলা হয়েছে ঃ) আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। (অতএব, উভয় বিষয় থেকে আল্লাহ্র কুদরত প্রকাশ পায়। কাজেই মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করাই আর বেশী কি কঠিন যে, এটা করার কুদরত হবে না। অতঃপর উল্লিখিত যাবতীয় বিষয়বস্তুর নির্যাস বর্ণনা করা হচ্ছে যে) এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) উপদেশ। অতএব, যার ইচ্ছা হয়, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (এরূপ সন্দেহ করা উচিত নয় যে, কেউ কেউ তো কোরআন থেকে হিদায়ত পায় না। আসল ব্যাপার এই যে, কোরআন স্বস্থানে উপদেশ ও যথেষ্ট হিদায়ত, কিন্তু) আল্লাহ্র অভিপ্রায় ব্যতীত তোমরা অভিপ্রায় পোষণ করতে পার না। (কতক লোকের জন্য আল্লাহ্র অভিপ্রায় না হওয়ার পশ্চাতে রহস্য আছে। কেন না) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। এবং (যাকে ইচ্ছা, কুফর ও পাপাচারে ডুবিয়ে রাখেন)। তিনি জালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা দাহ্রের অপর নাম সূরা 'ইনসান' ও সূরা 'আবরার'।—(রূহুল মা'আনী) এতে মানব সৃষ্টির আদি-অন্ত, কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি, কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর বিশুদ্ধ ও সাবলীল ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

هل—هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

অব্যয়টি আসলে প্রশ্নবোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে কোন জাজ্বল্যমান ও প্রকাশ্য বিষয়কে প্রশ্নের আকারে ব্যক্ত করা যায়, যাতে তার প্রকাশ্যতা আরও জোরদার হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, যাকেই জিজ্ঞাসা করবে, সে এই উত্তরই দেবে, অপর কোন সম্ভাবনাই নেই। উদাহরণত কেউ দুপুরের সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করে—এখন কি দিন নয়? এটা দৃশ্যত প্রশ্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি যে একেবারে চরম জাজ্বল্যমান, তারই বর্ণনা। তাই এ ধরনের স্থানে কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, قد অব্যয়টি এখানে هل (বাস্তবিক নিশ্চয়তার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে তার নাম-নিশানা এমনকি, আলোচনা পর্যন্ত ছিল না। حين শব্দটিকে تنوين-সহ উল্লেখ করে সময়ের দীর্ঘতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত যে দীর্ঘ সময় মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে, তাতে তার কোন না পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। নতুবা মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে—একথা বলা দুরস্ত হয় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই দীর্ঘ সময়ের অর্থ মায়ের পেটে গর্ভ সঞ্চারের পর থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়, যা সাধারণত নয় মাস হয়ে থাকে। এতে মানব সৃষ্টির সপ্ত স্তর অতিবাহিত হয়—বীর্য থেকে দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,

প্রাণ সঞ্চার ইত্যাদি সব দাখিল আছে। এই সম্পূর্ণ সময়ে এক পর্যায়ে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সে ছেলে, না মেয়ে তা কেউ জানে না। এ সময়ে তার কোন নাম থাকে না এবং কোন আকার-আকৃতিও কেউ জানে না। ফলে কোথাও তার কোন আলোচনা পর্যন্ত হয় না। আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময়কে আরও বিস্তৃত অর্থ দেওয়া যেতে পারে। যে বীর্য থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা, সেই বীর্যও খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়। সেই খাদ্য এবং খাদ্যের পূর্ববর্তী উপকরণ কোন না কোন আকারে দুনিয়াতে ছিল। এই সময়কেও শামিল করলে আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময় হাজারো বছর হতে পারে। সার কথা, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের দৃষ্টি এক নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। মানুষ যদি সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিরও অধিকারী হয় এবং এই তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে, তবে একদিকে তার নিজের স্বরূপ তার কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে এবং অপরদিকে স্রষ্টার অস্তিত্ব, জ্ঞান ও অপার শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না। যদি একজন সত্তর বছর বয়স্ক ব্যক্তি ধ্যান করে যে, এখন থেকে একাত্তর বছর পূর্বে তার কোন নাম-নিশানা ছিল না, কোন ভঙ্গিতেই কেউ তার সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে পারত না, পিতামাতা ও দাদা-দাদীর মনেও তার বিশেষ অস্তিত্বের কোন আশংকা পর্যন্ত ছিল না, তখন কি বস্তু তার আবিষ্কার ও সৃষ্টির কারণ হয়েছে এবং কোন্ বিস্ময়কর অপার শক্তি সারা বিশ্বে বিস্তৃত কণাসমূহকে তার অস্তিত্বে একত্রিত করে তাকে একজন হুঁশিয়ার, জ্ঞানী, শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান মানুষে রূপান্তরিত করেছে, তবে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথা বলতে বাধ্য হবে যে,

ما نبود یم و تقا ضا ما نبود — لطف تو نا گفتۂ ما می شنود

এরপর মানব সৃষ্টির সূচনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে : اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ

مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ —অর্থাৎ আমি মানুষকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। اَمْشَاجٍ শব্দটি مَشَجٌ অথবা مَشِيْجٌ -এর বহুবচন। অর্থ মিশ্র। বলা বাহুল্য, এখানে নর ও নারীর মিশ্র বীর্য বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ তাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেন : এখানে اَمْشَاجٍ বলে রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত—এই শারীরিক উপাদান চতুষ্টয় বোঝানো হয়েছে। এগুলো দিয়ে বীর্য গঠিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের উপাদান ও কণা শামিল আছে : চিন্তা করলে দেখা যায় উপরোক্ত শারীরিক উপাদান চতুষ্টয়ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে অর্জিত হয়। প্রত্যেক মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা করলেও দেখা যায় এতে দূর-দূরান্ত দেশ ও ভূখণ্ডের উপাদান পানি, বায়ু ইত্যাদির মাধ্যমে শামিল হয়। এভাবে একজন মানুষের বর্তমান শরীর বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, এটা এমন উপাদান ও কণাসমূহের সমষ্টি, যা বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্ত ছিল। সর্বশক্তিমানের অভাবনীয় ব্যবস্থা সেগুলোকে

বিস্ময়করভাবে তার শরীরে একত্রিত করেছে। امشاج-এর এই শেষোক্ত অর্থ অনুযায়ী এর দ্বারা কিয়ামত-অবিশ্বাসীদের সর্ববৃহৎ সন্দেহের অবসানও হয়ে যায়। কেননা, এই নিরীশ্বরবাদীদের মতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পথে সর্ববৃহৎ অন্তরায় এটাই যে, মানুষ মরে মৃত্তিকায় পরিণত হয়, এরপর তা ধূলিকণা হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এসব কণাকে পুনরায় একত্র করা এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করা তাদের মতে যেন একেবারে অসম্ভব।

امشاج–এর তফসীরে তাদের এই সন্দেহের সুস্পষ্ট জওয়াব রয়েছে। কারণ, মানুষের প্রথম সৃষ্টিতেও তো সারা বিশ্বের উপাদান ও কণাসমূহ শামিল ছিল। এই প্রথম সৃষ্টি যার জন্য কঠিন হল না, পুনর্বার সৃষ্টি তার জন্য কঠিন হবে কেন?

نَبْتَلِيهِ—এটা ابتلاء থেকে উদ্ভূত। অর্থ পরীক্ষা করা। এই বাক্যে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে এ ভাবে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তাকে পরীক্ষা করা, পরের আয়াতে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমি পয়গম্বর ও ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে তাকে পথ বলে দিয়েছি যে, এই পথ জান্নাতের দিকে এবং এই পথ জাহান্নামের দিকে যায়। এরপর তাকে ক্ষমতা দিয়েছি, যে কোন পথ অবলম্বন করার। সে মতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا—অর্থাৎ একদল তো তাদের স্রষ্টা ও নিয়ামতদাতাকে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু অপরদল অকৃতজ্ঞ হয়ে কাফির হয়ে গেছে। অতঃপর উভয়-দলের প্রতিফল ও পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিরদের জন্য রয়েছে শিকল, বেড়ী ও জাহান্নাম। আর ঈমান ও ইবাদত পালনকারীদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত নিয়ামত। সর্ব প্রথম পানীয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাত্র দেওয়া হবে, যাতে কাফুরের মিশ্রণ থাকবে। কোন কোন তফসীরকারক বলেনঃ কাফুর জান্নাতের একটি ঝরনার নাম। এই শরাবের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করার জন্য তাতে এই ঝরনার পানি মিলানো হবে। যদি কাফুরের প্রসিদ্ধ অর্থ নেওয়া হয়, তবে জরুরী নয় যে, জান্নাতের কাফুর দুনিয়ার কাফুরের ন্যায় অখাদ্য হবে। বরং সেই কাফুরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হবে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ—عينا শব্দটি كافورا-এর بدل ও হতে পারে। এমতাবস্থায় এটা নির্দিষ্ট যে, আয়াতে কাফুর বলে জান্নাতের ঝরনাই বোঝানো হয়েছে। عباد الله বলে আল্লাহ্‌র সে সব নেক বান্দাকেই বোঝানো হয়েছে, ইতিপূর্বে যাদেরকে ابرار বলা হয়েছিল। পক্ষান্তরে যদি عينا শব্দটি من كأس-এর بدل হয়, তবে এটা অন্য কোন ঝরনা ও পানির বর্ণনা হবে। এমতাবস্থায় عباد الله-এর অর্থ হবে ابرار থেকে নিম্নস্তরের অন্য কোন দল।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ—এতে বিধৃত হয়েছে যে, সৎ কর্মশীল বান্দাগণকে এসব নিয়ামত কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যে কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। نذر-এর শাব্দিক অর্থ নিজের জন্য এমন কোন কাজ ওয়াজিব করে নেওয়া, যা শরীয়তের তরফ থেকে তার দায়িত্বে ওয়াজিব নয়। এরূপ মানত পূর্ণ করা শরীয়তের আইনে ওয়াজিব। এর বিবরণ পরে বর্ণিত হবে। এখানে মানত পূর্ণ করাকে জান্নাতীদের মহান প্রতিদান ও অফুরন্ত নিয়ামত লাভের কারণে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা যখন নিজেদের ওয়াজিব করা বিষয় পালনে যত্নবান, তখন যে সব ফরয-ওয়াজিব কর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো পালনে আরও উত্তমরূপে যত্নবান হবে। এভাবে মানত পূর্ণ করার মধ্যে সকল ওয়াজিব ও ফরয কর্ম পালনের বিষয় শামিল হয়ে গেছে। ফলে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ লাভের পূর্ণ কারণ হবে পূর্ণ আনুগত্য এবং ফরয ও ওয়াজিব কর্মসমূহ সম্পাদন। তবে মানত পূর্ণ করা যে ওয়াজিব ও গুরুত্বপূর্ণ, তা এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

মাস'আলা : কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে মানত হয়ে থাকে ১. যে কাজের মানত করা হয়, তা জায়েয ও হালাল হওয়া চাই এবং গোনাহ্ না হওয়া চাই। কেউ কোন নাজায়েয কাজের মানত করলে তা পূর্ণ না করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা আদায় করতে হবে। ২. কাজটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওয়াজিব না হওয়া চাই। সেমতে কোন ব্যক্তি ফরয নামায অথবা ওয়াজিব বেতেরের মানত করলে তা মানত হবে না।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র মতে আরও একটি শর্ত এই যে, যেসব ইবাদত শরীয়তে ওয়াজিব করা হয়েছে, সেই জাতীয় কাজের মানত করতে হবে, যেমন নামায-রোযা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। যে জাতীয় কাজের কোন ইবাদত শরীয়তে উদ্দিষ্ট নয়, সেই জাতীয় কোন মানত করলে তা পূর্ণ করা জরুরী হয় না; যেমন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া অথবা জানাযার পশ্চাৎগমন ইত্যাদি। এগুলো ইবাদত হলেও উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا——অর্থাৎ জান্নাতীদের এসব নিয়ামত একারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করত। عَلٰى حُبِّهٖ-এর মর্মার্থ এই যে, তারা শুধু নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার্যই দরিদ্রদেরকে দান করে না বরং নিজেদের প্রয়োজন সত্ত্বেও দান করে। দরিদ্র ও ইয়াতীমদেরকে আহার্য দেওয়া যে ইবাদত, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। বন্দী বলে এমন বন্দী বোঝানো হয়েছে, যাকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী বন্দী করা হয়েছে—সে কাফির হোক অথবা মুসলমান অপরাধী। বন্দীকে খাওয়ানো ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

কেউ বন্দীকে আহার্য দিলে সে যেন সরকার ও বায়তুল মালকে সাহায্য করে। তাই বন্দী কাফির হলেও তাকে খাওয়ানো সওয়াবের কাজ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বন্দীদেরকে খাওয়ানো ও তাদের হিফাযতের দায়িত্ব সাধারণ মুসলমানদের উপর বণ্টন করে অর্পণ করা হত। বদর যুদ্ধের বন্দীদের বেলায় তাই করা হয়েছিল।

قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ—দুনিয়ার রৌপ্য-পাত্র ঘাড় মোটা হয়ে থাকে—আয়নার মত স্বচ্ছ হয় না। পক্ষান্তরে কাঁচ নির্মিত পাত্র রৌপ্যের মত শুভ্র হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কিন্তু জান্নাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানকার রৌপ্য আয়নার মত স্বচ্ছ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ জান্নাতের সব বস্তুর নযীর দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তবে দুনিয়ার রৌপ্য নির্মিত গ্লাস ও পাত্র জান্নাতের পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ নয়।

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا—زَنْجَبِيل-এর প্রসিদ্ধ অর্থ শুঁঠ। আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত। তাই জান্নাতেও একে পছন্দ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ জান্নাতের বস্তু ও দুনিয়ার বস্তু নামেই কেবল অভিন্ন। বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাই দুনিয়ার শুঁঠের আলোকে জান্নাতের শুঁঠকে বোঝার উপায় নেই।

وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ—أَسَاوِر শব্দটি سِوَار-এর বহুবচন। অর্থ কংকন, যা হাতে পরিধান করার অলংকারবিশেষ। এই আয়াতে রূপার কংকন এবং অন্য এক আয়াতে স্বর্ণের কংকন উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা, কোন সময় রূপার এবং কোন সময় স্বর্ণের কংকন ব্যবহৃত হতে পারে অথবা কেউ রূপার এবং কেউ স্বর্ণের ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এখানে কথা থাকে এই যে, কংকন নারীদের ব্যবহারের অলংকার। পুরুষদের জন্য এরূপ অলংকার পরিধান করা সাধারণত দূষণীয়। জওয়াব এই যে, কোন অলংকার নারীদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া এবং পুরুষদের জন্য দূষণীয় হওয়া—এটা সর্বতোভাবে প্রচলন ও অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন দেশে অথবা জাতিতে যে জিনিস দূষণীয়, অন্য জাতিতে তাই পছন্দনীয় হয়ে থাকে। পারস্য সম্রাটগণ হাতে কংকন পরিধান করতেন এবং বুকে ও মুকুটে অলংকারাদি ব্যবহার করতেন। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য ও সম্মানরূপে গণ্য হত। পারস্য সাম্রাজ্য বিজিত হওয়ার পর সম্রাটদের যে ধনভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাতে রাজকীয় কংকনও ছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সামান্য ভৌগোলিক ও জাতিগত তফাতের কারণে যখন এরূপ হতে পারে, তখন জান্নাতকে দুনিয়ার আলোকে দেখার কোন মানে থাকতে পারে না। জান্নাতে অলংকারাদি পুরুষদের জন্যও উত্তম বিবেচিত হবে।

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا—অর্থাৎ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে পৌঁছে যাবে, তখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বলা হবেঃ জান্নাতের এসব বিস্ময়কর

অবদানসমূহ তোমাদের দুনিয়াতে কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেষ্টা আল্লাহ্‌র কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব বাক্য মোবারকবাদ হিসাবে বলা হবে। আশেক ও প্রেমিকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, জান্নাতের সব নিয়ামত একদিকে এবং রব্বুল আলামীনের এই উক্তি একদিকে; নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় নিয়ামত। কারণ, এতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টির সনদ বিতরণ করছেন। সাধারণ জান্নাতীদের নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করার পর অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ নিয়ামত হচ্ছে কোরআন অবতরণ। এই মহান নিয়ামত উল্লেখ করার পর প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধী কাফিররা যে অস্বীকার, হঠকারিতা ও নানাভাবে আপনাকে হয়রানি করে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন। এছাড়া দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকুন। এর মাধ্যমেই কাফিরদের হয়রানিরও অবসান হবে।

পরিশেষে কাফিরদের হঠকারিতার এই কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই মূর্খরা পার্থিব ধ্বংসশীল ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পরিণাম অর্থাৎ পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। অথচ আমি দুনিয়াতেও খোদ তাদের অস্তিত্বে এমন উপকরণ রেখেছিলাম, যে সম্পর্কে চিন্তা করলে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারত। বলা হয়েছে ঃ نَحْنُ

خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ—অর্থাৎ আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন প্রকৃতি মজবুত ও সুদৃঢ় করেছি।

মানবদেহের গ্রন্থিতে কুদরতের অপূর্ব লীলা ঃ এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ তার এক এক গ্রন্থি সম্পর্কে ভেবে দেখুক। উপযোগিতা ও আরামের খাতিরে দৃশ্যত এগুলো নরম ও নাজুক মনে হয় এবং নরম নরম মাংসপেশী দ্বারা পরস্পরে সংযুক্ত আছে। ফলে স্বভাবত এক-দুই বছরেই গ্রন্থির এই বন্ধন ও মাংসপেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার কথা ছিল, বিশেষত যখন এগুলো সারাক্ষণ নড়াচড়া এবং বাঁকানো মোড়ানোর মধ্যেই থাকে। এভাবে দিবারাত্র নড়াচড়ার মধ্যে থাকলে তো লোহার স্প্রিংও এক-দুই বছরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এসব নরম ও নাজুক মাংসপেশী কিভাবে দেহের গ্রন্থিসমূহকে বেঁধে রেখেছে! এগুলো না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, না ভেঙ্গে যায়। হাতের অঙ্গুলীর গ্রন্থিগুলোই দেখুন এবং হিসাব করুন, সারা জীবনে এরা কতবার নড়াচড়া করেছে এবং কেমন কেমন জোর ও চাপ এদের উপর পড়েছে। ইস্পাতের তৈরী হলেও এত দিনে ক্ষয় হয়ে যেত। কিন্তু সত্তর-আশি বছর চালু থাকার পরও এগুলো সগর্বে অক্ষত আছে।

سورة المرسلات

সূরা মুরসালাত

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৫০ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ(١) فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ(٢) وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ(٣)
فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ(٤) فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ(٥) عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ(٦)
اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۗ(٧) فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۙ(٨) وَاِذَا السَّمَآءُ
فُرِجَتْ ۙ(٩) وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۙ(١٠) وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۗ(١١) لِاَيِّ يَوْمٍ
اُجِّلَتْ ۗ(١٢) لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۚ(١٣) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۗ(١٤)
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (١٥) اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۗ(١٦) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ
الْاٰخِرِيْنَ (١٧) كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ (١٨) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (١٩) اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۙ(٢٠) فَجَعَلْنٰهُ فِيْ
قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۙ(٢١) اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۙ(٢٢) فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ (٢٣)
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (٢٤) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۙ(٢٥)
اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ۙ(٢٦) وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً
فُرَاتًا ۗ(٢٧) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (٢٨) اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ
بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ (٢٩) اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۙ(٣٠) لَّا ظَلِيْلٍ
وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ۗ(٣١) اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۚ(٣٢)

كَأَنَّهُ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۝٣٣ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٣٤ هٰذَا يَوْمُ لَا
يَنْطِقُونَ ۝٣٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝٣٦ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٣٧ هٰذَا
يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ۝٣٨ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ
فَكِيدُونِ ۝٣٩ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٤٠ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلٰلٍ
وَّعُيُونٍ ۝٤١ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝٤٢ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٤٣ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝٤٤ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٤٥ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ۝٤٦
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٤٧ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا
لَا يَرْكَعُونَ ۝٤٨ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٤٩ فَبِأَيِّ
حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝٥٠

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) কল্যাণের জন্য প্রেরিত বায়ুর শপথ, (২) সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, (৩) মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ, (৪) মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর শপথ এবং (৫) ওহী নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতাগণের শপথ—(৬) ওযর-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্য অথবা সতর্ক করার জন্য (৭) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। (৮) অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাপিত হবে, (৯) যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে, (১০) যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং (১১) যখন রসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরূপিত হবে, (১২) এসব বিষয় কোন্ দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে? (১৩) বিচার দিবসের জন্য (১৪) আপনি জানেন বিচার দিবস কি? (১৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (১৬) আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? (১৭) অতঃপর তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করব পরবর্তীদেরকে। (১৮) অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি। (১৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (২০) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? (২১) অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সংরক্ষিত আধারে, (২২) এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, (২৩) অতঃপর আমি পরিমিত আকারে সৃষ্টি করেছি, আমি কত সক্ষম স্রষ্টা? (২৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

(২৫) আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিণীরূপে, (২৬) জীবিত ও মৃতদেরকে? (২৭) আমি তাতে স্থাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা এবং পান করিয়েছি তোমাদেরকে তৃষ্ণা নিবারণকারী সুপেয় পানি। (২৮) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে! (২৯) চল তোমরা তারই দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (৩০) চল তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, (৩১) যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। (৩২) এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করবে (৩৩) যেন সে পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী। (৩৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৫) এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না (৩৬) এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেওয়া হবে না। (৩৭) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৮) এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্র করেছি। (৩৯) অতএব তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে। (৪০) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪১) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা থাকবে ছায়ায় এবং প্রস্রবণসমূহে—(৪২) এবং তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের মধ্যে। (৪৩) বলা হবে: তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। (৪৪) এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (৪৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪৬) কাফিরগণ, তোমরা কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও। তোমরা তো অপরাধী। (৪৭) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪৮) যখন তাদেরকে বলা হয়, নত হও, তখন তারা নত হয় না। (৪৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৫০) এখন কোন্ কথায় তারা এরপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কল্যাণের জন্য প্রেরিত বায়ুর শপথ, সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, (যাতে বিপদাশংকা থাকে) মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ (যার পরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়) মেঘপুঞ্জকে বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর শপথ (বৃষ্টির পর এরূপ হয়ে থাকে) এবং সেই বায়ুর শপথ যে, (অন্তরে) আল্লাহ্‌র স্মরণ অর্থাৎ (তওবা অথবা সতর্কবাণী) জাগরিত করে। (অর্থাৎ উপরোক্ত বায়ুসমূহ আল্লাহ্‌র অপার কুদরত জ্ঞাপন করার কারণে আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগী হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। এই মনোযোগ দ্বিবিধ হয়ে থাকে—(১) এ সব বায়ু ভীতিপ্রদ হলে ভয় সহকারে এবং (২) তওবা ওযরখাহী সহকারে। এটা ভয় ও আশা উভয় অবস্থাতে হতে পারে। বায়ু কল্যাণবাহী হলে আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং নিজ ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়ে। পক্ষান্তরে বায়ু ভয়াবহ হলে আল্লাহ্‌র আযাবকে ভয় করে গোনাহের জন্য তওবা করা হয়। অতঃপর শপথের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে) তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে। এসব শপথ কিয়ামতের খুবই উপযুক্ত। কেননা, প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেওয়ার পর বিশ্বজগতের ধ্বংসপ্রাপ্তির ঘটনা ঝঞ্ঝাবায়ুর সমতুল্য এবং দ্বিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার পরবর্তী ঘটনাবলী তথা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়া ইত্যাদি কল্যাণবাহী বায়ুর

সাথে সামঞ্জস্যশীল, যদ্দ্বারা বৃষ্টি এবং বৃষ্টি দ্বারা উদ্ভিদের মধ্যে জীবন সঞ্চারিত হয়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ) অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন পর্বতমালা উড়তে থাকবে এবং যখন রসূলগণকে নির্দিষ্ট সময়ে একত্র করা হবে, (তখন সবার বিচার হবে। অতঃপর সেই দিবসের ভয়াবহতা উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু জানা আছে কি) পয়গম্বরগণের ব্যাপার কোন্ দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে) বিচার দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। এই প্রশ্ন ও উত্তরের উদ্দেশ্য এরূপ মনে হয় যে, কাফিররা সবসময়ই রসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে। এখনও তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিথ্যারোপ করছে। তাদেরকে এ বিষয়ে পরকালের ভয় প্রদর্শন করা হলে তারা পরকালকেও অস্বীকার করে। এই মিথ্যারোপের ব্যাপারটি অনতিবিলম্বেই চুকিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কারণ, একে স্থগিত রাখার ফলে কাফিররা আরও অস্বীকার ও মিথ্যারোপের সুযোগ পায়। মুসলমানরাও এব্যাপারটি দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার বাসনা পোষণ করে। সুতরাং আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন রহস্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা একে স্থগিত রেখেছেন কিন্তু একদিন না একদিন অবশ্যই এই বিচার সংঘটিত হবে)। আপনি জানেন সেই বিচারের দিবস কেমন? (অর্থাৎ খুবই কঠিন। যারা এর বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, তাদের বোঝা উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর অতীত ইতিহাসের মাধ্যমে বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে)। আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করিনি? অতঃপর তাদের পশ্চাতে পরবর্তীদেরকেও (আযাবে) একত্র করব। (অর্থাৎ আপনার উম্মতের কাফিরদের উপরও ধ্বংসের শাস্তি নাযিল করব। বদর, ওহুদ ইত্যাদি যুদ্ধে তাই হয়েছে। অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি। অর্থাৎ কুফরের শাস্তি দেই—উভয় জাহানে কিংবা পরকালে। যারা কুফরের কারণে আযাবের যোগ্য হওয়াকে মিথ্যা মনে করে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা ও মৃতদের পুনরুজ্জীবনকে আরও ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (অর্থাৎ বীর্য) থেকে সৃষ্টি করিনি? (অর্থাৎ প্রথমে তোমরা বীর্য ছিলে)। অতঃপর আমি তা এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রেখেছি সংরক্ষিত আধারে (অর্থাৎ নারীর গর্ভাশয়ে)। অতঃপর আমি (এ সব কাজের) এক পরিমাণ নির্ধারণ করেছি। আমি কত উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী! (এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ মৃতদেরকে পুনর্বার জীবিত করতে সক্ষম। সুতরাং যারা এই সত্যকে অর্থাৎ পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতাকে মিথ্যারোপ করে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর আনুগত্য ও ঈমানে উৎসাহিত করার জন্য কতক নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে) আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃতদেরকে ধারণকারীরূপে সৃষ্টি করিনি? (জীবন এর উপরই অতিবাহিত হয়। মৃত্যুর পর দাফন, নিমজ্জিত ও প্রজ্বলিত হওয়ার পথে অবশেষে মানুষ মাটির সাথেই মিশে যায়। মৃত্যুর পরও ভূমি নিয়ামত। কেননা, মৃতরা মাটি না হয়ে গেলে জীবিতদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যেত, তারা পৃথিবীতে বসবাস এমনকি, চলাফেরা করার জায়গা পেত না)। আমি তাতে (অর্থাৎ ভূমিতে) স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা (যদ্দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হয়)। এবং

তোমাদেরকে মিঠা পানি পান করিয়েছি। (একে স্বতন্ত্র নিয়ামতও বলা যায় এবং ভূমি সম্পর্কিত নিয়ামতও বলা যায়। কেননা, পানির কেন্দ্রস্থল ভূমিই। এসব নিয়ামত তওহীদকে জরুরী করে। সুতরাং যারা এই সত্য বিষয়কে অর্থাৎ তওহীদ জরুরী হওয়াকে মিথ্যা বলে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কিয়ামতের কতক শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে ঃ) তোমরা সেই আযাবের দিকে চল, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (এর এক শাস্তি এই নির্দেশের মধ্যে আছে—) চল, তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে—যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং উত্তাপ থেকে রক্ষাও করে না। [এখানে জাহান্নাম থেকে নির্গত একটি ধূম্রকুণ্ডলী বোঝানো হয়েছে। আধিক্যের কারণে এটা উপরে উঠে বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়বে।—(তাবারী) হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কাফিররা এই ধূম্রকুণ্ডলীর নিচে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে নেক বান্দাগণ আরশের ছায়াতলে অবস্থান করবে। অতঃপর এই ধূম্রকুণ্ডলীর আরও কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে]। এটা অট্টালিকা সদৃশ পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণীর ন্যায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। [নিয়ম এই যে, অগ্নি থেকে স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হওয়ার সময় বিরাট আকারে উত্থিত হয়, এরপর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে মাটিতে পতিত হয়। সুতরাং প্রথম তুলনাটি প্রথম অবস্থার দিক দিয়ে এবং দ্বিতীয় তুলনাটি শেষ অবস্থার দিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে।—(রূহুল মা'আনী) অতঃপর যারা এই সত্য ঘটনাকে মিথ্যা বলে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে,] সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কাফিরদের আরও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে)। এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কোন কথা বলবে না এবং কাউকে ওযর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। (কারণ, বাস্তবে কোন সঙ্গত ওযর থাকবেই না। যারা এই সত্য ঘটনাকেও মিথ্যারোপ করছে, তারা বুঝে নিক যে,) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ঃ) এটা বিচার দিবস, (যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে) আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে (বিচারের জন্য) একত্র করেছি। অতএব অদ্যকার ফলাফল ও বিচার থেকে আত্মরক্ষার কোন অপকৌশল তোমাদের কাছে থাকলে তা আমার কাছে প্রয়োগ কর। (কাফিররা এই সত্য ঘটনাকেও মিথ্যারোপ করে। অতএব তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কাফিরদের মুকাবিলায় মু'মিনদের পুরস্কার বর্ণিত হয়েছে)। আল্লাহ্‌ভীরুগণ থাকবে ছায়ায়, প্রস্রবণসমূহে এবং তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলসমূহে। (তাদেরকে বলা হবে ঃ)। আপন (সৎ) কর্মের বিনিময়ে খুব তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। (কাফিররা জান্নাতের নিয়ামতসমূহকেও মিথ্যা বলে। অতএব তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর আবার কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। কাফিররা) তোমরা (দুনিয়াতে) কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও (সত্বরই দুর্ভোগ আসবে। কেননা) তোমরা নিশ্চিতই অপরাধী। (অপরাধীদের অবস্থা তাই হবে। যারা অপরাধের শাস্তিকে মিথ্যারোপ করে, তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (কাফিররা এমন অপরাধী যে) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ নত হও, (অর্থাৎ ঈমান ও দাসত্ব অবলম্বন কর) তখন তারা নত হয় না। (এর

চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হবে। তারা এই অপরাধকেও মিথ্যা মনে করে। অতএব তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (কোরআনের এসব বর্ণনা শোনা-মাত্রই ভয়ে ঈমান আনা উচিত ছিল। এর পরও যখন তারা প্রভাবান্বিত হয় না, তখন) এরপর (অর্থাৎ প্রাঞ্জলভাষী, সতর্ককারী কোরআনের পর) তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? (এতে কাফিরদেরকে শাসানো হয়েছে এবং তাদের ঈমানের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিরাশ করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন: আমরা মিনায় এক গুহায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে সূরা মুরসালাত অবতীর্ণ হল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরাটি আবৃত্তি করতেন আর আমি তা শুনে শুনে মুখস্থ করতাম। সূরার মিষ্টতায় তাঁর মুখমণ্ডল সতেজ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। আমরা সর্পের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কিন্তু সে পালিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন: তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রয়েছ, তেমনি সেও তোমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে।—(ইবনে কাসীর)

এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকটি বস্তুর শপথ করে কিয়ামতের নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই বস্তুগুলোর নাম কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তাবে সেগুলোর স্থলে এই পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে: عاصفات مرسلات-ملقيات الذكر- فارقات - ناشرات - -কিন্তু এগুলো কার বিশেষণ, কোন হাদীসে তা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই এ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বিভিন্নরূপ তফসীর বর্ণিত আছে।

কারও কারও মতে এগুলো সব ফেরেশতাগণের বিশেষণ। সম্ভবত ফেরেশতাগণের বিভিন্ন দল এসব বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত। কেউ কেউ এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, বায়ু বিভিন্ন প্রকার ও গুণের হয়ে থাকে। ফলে বায়ুরও এসব বিভিন্ন বিশেষণ হতে পারে। কেউ কেউ স্বয়ং পয়গম্বরগণকে এসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। একারণেই ইবনে জরীর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকাকে অধিকতর নিরাপদ ঘোষণা করে বলেছেন: সবই হতে পারে কিন্তু আমরা কোনকিছু নির্দিষ্ট করি না।

এতে সন্দেহ নেই যে, এখানে উল্লিখিত পাঁচটি বিশেষণের মধ্যে কয়েকটি ফেরেশতা-গণের সাথেই অধিক খাপ খায় এবং তাদের জন্যই উপযুক্ত। এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ করা হলে টানা-হেঁচড়া ও সদর্থের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। পক্ষান্তরে কতক বিশেষণ এমন যে, এগুলো বায়ুর সাথেই অধিক খাপ খায়। এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে সদর্থ করা ছাড়া শুদ্ধ হয় না। তাই এ স্থলে ইবনে কাসীরের ফয়সালাই উত্তম

মনে হয়। তিনি বলেছেন, প্রথমোক্ত তিনটি বায়ুর বিশেষণ। এগুলোতে বায়ুর শপথ করা হয়েছে এবং শেষোক্ত দুটি ফেরেশতাগণের বিশেষণ। এগুলোতে ফেরেশতাগণের শপথ করা হয়েছে।

বায়ুর বিশেষণ করা হলে শেষোক্ত দুই বিশেষণে যে সদর্থ করা হয়, তা আপনি তফসীরের সার-সংক্ষেপে দেখেছেন। কেননা, এতে এই মত অবলম্বন করেই তফসীর করা হয়েছে। এমনিভাবে এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে প্রথমোক্ত তিনটি বিশেষণ مرسلات - عاصفات ও ناشرات -কে ফেরেশতাগণের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য এমনি ধরনের সদর্থের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইবনে কাসীরের মতানুযায়ী আয়াতসমূহের অর্থ এই: প্রেরিত বায়ুসমূহের কসম। عرفا -এর অর্থ কল্যাণের জন্য। বলা বাহুল্য, বৃষ্টি নিয়ে আগমনকারী বায়ু কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। عرفا -এর অপর অর্থ একের পর একও হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সব বায়ু মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ে একের পর এক অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়। عاصفات -শব্দটি عصف -থেকে উদ্ভূত। অর্থ সজোরে বায়ু প্রবাহিত হওয়া। উদ্দেশ্য ঝটিকা ও ঝঞ্ঝাবায়ু, যা মাঝে মাঝে প্রবাহিত হয়। ناشرات —বলে এমন বায়ু বোঝানো হয়েছে যা বৃষ্টির পর মেঘমালাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। فارقات —এটা ফেরেশতাগণের বিশেষণ। অর্থাৎ যারা ওহী নাযিল করে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলে। ملقيات الذكر —এটাও ফেরেশতাগণের বিশেষণ। ذكر -এর অর্থ কোরআন অথবা ওহী। উদ্দেশ্য এই যে, সে সব ফেরেশতার শপথ যারা ওহীর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে এবং সে সব ফেরেশতার শপথ, যারা পয়গম্বরগণের নিকট ওহী ও কোরআন নাযিল করে। এভাবে কোন বিশেষণে সদর্থ ও টানা-হেঁচড়ার প্রয়োজন হয় না।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই তফসীরের ভিত্তিতে প্রথমে বায়ুর ও পরে ফেরেশতা-গণের শপথ করা হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে মিল কি? জওয়াব এই যে, আল্লাহ্‌র কালামের রহস্য কেউ পূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম নয়। তথাপি এরূপ মিল থাকতে পারে যে, বায়ুর দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে—এক. বৃষ্টিবাহী ও কল্যাণকর এবং অপরটি ঝটিকা ও অকল্যাণ-কর। এগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। প্রত্যেকেই এগুলোকে বুঝে ও চিনে। প্রথমে চিন্তা-ভাবনার জন্য এগুলোকে মানুষের সামনে আনা হয়েছে। এরপর ফেরেশতা ও ওহী উপস্থিত করা হয়েছে, যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে এগুলোর বিশ্বাস লাভ করা যায়।

عُذْرًا أَوْ نُذْرًا —এই আয়াত ملقيات ذكرا -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ ذكر তথা ওহী পয়গম্বরগণের কাছে নাযিল করা হয়, যাতে তা মু'মিনদের জন্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে ওযরখাহীর কারণ হয় এবং কাফিরদের জন্য সতর্ককারী হয়ে যায়।

বায়ু, ফেরেশতা অথবা উভয়ের শপথ করে আল্লাহ্ বলেছেনঃ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ অর্থাৎ তোমাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও শাস্তির যে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর বাস্তবায়ন মুহূর্তের কতিপয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে সব নক্ষত্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অথবা জ্যোতিহীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পর্বতসমূহ তুষারের ন্যায় উড়তে থাকবে। চতুর্থ অবস্থা এইঃ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ। أُقِّتَتْ শব্দটি تَوْقِيتٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ সময় নির্ধারণ করা। আল্লামা যমখশরী বলেনঃ এর অর্থ কোন সময় নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থই উপযুক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের জন্য উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার যে সময় নিরূপিত হয়েছিল, তাঁরা যখন সে সময়ে পৌঁছে যাবেন এবং তাঁদের উপস্থিতির মেয়াদ এসে যাবে। তাই তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর অর্থ করা হয়েছে যখন পয়গম্বরগণকে একত্র করা হবে। অতঃপর وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন খুবই ভয়াবহ হবে। কারণ, এটা বিচার দিবস। এতে কাফির ও মিথ্যারোপকারীদের জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া কিছু হবে না। وَيْلٌ শব্দের অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। হাদীসে আছে وَيْلٌ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এতে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থানের পুঁজ একত্রিত হবে এবং এটাই হবে মিথ্যারোপকারীদের বাসস্থান। অতঃপর বর্তমান লোকদেরকে অতীত লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে বলা হয়েছে أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ অর্থাৎ আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে তাদের কুফরের কারণে ধ্বংস করিনি? এখানে আদ, সামূদ, কওমে লূত, কওমে ফিরাউন ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ এক কিরাআত অনুযায়ী অর্থ এই যে, আমি কি পূর্ববর্তীদের পর পরবর্তীদেরকেও তাদের পশ্চাতে ধ্বংস করিনি? এমতাবস্থায় পরবর্তী মানে পূর্ববর্তীদেরই পরবর্তী লোকেরা, যারা কোরআন অবতরণের পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অপর কিরাআত অনুযায়ী এটা আলাদা বাক্য এবং পরবর্তী মানে উম্মতে মুহাম্মদীর কাফির। উদ্দেশ্য, পরবর্তী লোকদের ধ্বংসের খবর দিয়ে বর্তমান কাফিরদেরকে ভবিষ্যৎ আযাবের খবর দেওয়া। এই আযাব বদর, ওহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে তাদের উপর পতিত হয়েছে।

পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তীদের উপর আসমানী আযাব নাযিল হত, যাতে সমগ্র জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হত আর বর্তমান কাফিরদের উপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মানার্থে আসমানী আযাব আসে না বরং মুসলমানদের তরবারির মাধ্যমে তাদের আযাব আসে। এতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয় না—কেবল প্রধান অপরাধীরাই নিহত হয়।

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا —অর্থাৎ আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃত মানুষদের জন্য كفات করিনি? كفات শব্দটি كفت থেকে উদ্ভূত এর অর্থ মিলানো। كفات সেই বস্তু, যে অনেক কিছুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। ভূমি ও জীবিত মানুষকে তার পৃষ্ঠে এবং সকল মৃতকে তার পেটে ধারণ করে।

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ — قصر -এর অর্থ অট্টালিকা। جمالة উটকে বলা হয় এবং صفر শব্দটি أصفر-এর বহুবচন অর্থ পীতবর্ণ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের অগ্নি বিশালকায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে, যা বিরাট অট্টালিকার ন্যায় মনে হবে। অতঃপর তা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হবে এবং খণ্ডগুলো পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণীর সমান মনে হবে। কেউ কেউ এখানে صفر -এর অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণবর্ণ। কেননা, পীতবর্ণ উট কৃষ্ণাভ হয়ে থাকে—(রূহুল মা'আনী)

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ —অর্থাৎ সেদিন কেউ কথা বলতে পারবে না এবং কাউকে কৃতকর্মের ওযর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। অন্যান্য আয়াতে কাফিরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ করার কথা রয়েছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কেননা, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থান আসবে। কোন স্থানে ওযর পেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে এবং কোন স্থানে অনুমতি দেওয়া হবে—(রূহুল মা'আনী)

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ —অর্থাৎ কিছুদিন খেয়ে-দেয়ে নাও এবং আরাম করে নাও। তোমরা তো অপরাধী; অবশেষে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে। পয়গম্বরগণের মাধ্যমে একথা দুনিয়াতে মিথ্যারোপকারীদেরকে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আযাবই আযাব রয়েছে। —(আবু হাইয়ান)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ —এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে রুকূর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে যখন তাদেরকে আল্লাহ্র বিধানাবলী মেনে চলতে বলা হত, তখন তারা মেনে চলত না। কেউ

কেউ রুকূর পারিভাষিক অর্থও নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যখন তাদেরকে নামাযের দিকে আহ্বান করা হত, তখন তারা নামায পড়ত না। কাজেই আয়াতে রুকূ বলে পুরো নামায বোঝানো হয়েছে।—(রূহুল মা'আনী)

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ—অর্থাৎ তারা যখন কোরআনের মত অপূর্ব, অলংকারপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিমণ্ডিত কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন এরপর আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? এখানে উদ্দেশ্য তাদের ঈমানের ব্যাপারে নৈরাশ্য ব্যক্ত করা। হাদীসে আছে যখন এই সূরা তিলাওয়াতকারী এই আয়াত পাঠ করে তখন তার آمَنَّا بِاللّٰهِ বলা উচিত। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নামাযের বাইরেও নফল নামাযের মধ্যে এই বাক্য বলা উচিত। ফরয ও সুন্নত নামাযে এ থেকে বিরত থাকা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

سورة النبا

সূরা নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৪০ আয়াত, ২ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۚ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۙ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ؕ كَلَّا

سَيَعْلَمُوْنَ ۙ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ

وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ وَّجَعَلْنَا

النَّهَارَ مَعَاشًا ۪ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۪ۙ وَّاَنْزَلْنَا

مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۙ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ؕ اِنَّ يَوْمَ

الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۙ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۙ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ

فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ؕ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۙ

لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۙ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا ۚ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۙ

اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۙ جَزَآءً وِّفَاقًا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۙ وَّكَذَّبُوْا

بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۙ فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۧ

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۙ حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۙ وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۙ وَّكَاْسًا دِهَاقًا ؕ

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۚ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۙ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا

بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۚ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ

اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ

مَآبًا ۝ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে? (২) মহাসংবাদ সম্পর্কে, (৩) যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে। (৪) না, সত্বরই তারা জানতে পারবে, (৫) অতঃপর না, সত্বর তারা জানতে পারবে। (৬) আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা (৭) এবং পর্বতমালাকে পেরেক? (৮) আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, (৯) তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তিদূরকারী, (১০) রাত্রিকে করেছি আবরণ, (১১) দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়, (১২) নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত আকাশ, (১৩) এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। (১৪) আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি, (১৫) যাতে তদ্দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ (১৬) ও পাতাঘন উদ্যান। (১৭) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (১৮) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে, (১৯) আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে (২০) এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে। (২১) নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে, (২২) সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। (২৩) তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। (২৪) তথায় তারা কোন শীতল বস্তু এবং পানীয় আস্বাদন করবে না; (২৫) কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে। (২৬) পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে। (২৭) নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না। (২৮) এবং আমার আয়াতসমূহতে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। (২৯) আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। (৩০) অতএব তোমরা আস্বাদন কর, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব। (৩১) পরহেযগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য (৩২) উদ্যান, আঙুর (৩৩) সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী (৩৪) এবং পূর্ণ পানপাত্র। (৩৫) তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। (৩৬) এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান, (৩৭) যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তাঁর সাথে কথার অধিকারী হবে না। (৩৮) যেদিন রূহ্ ও ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে। (৩৯) এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক। (৪০) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফির বলবে : হায়, আফসোস—আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কিয়ামত অস্বীকারকারীরা) কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে? তারা সেই

মহা ঘটনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করে, যে বিষয়ে তারা (সত্যপন্থীদের সাথে) মতবিরোধ করে। (অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে। জিজ্ঞাসা করার অর্থ অস্বীকারের স্থলে জিজ্ঞাসা করা। এই প্রশ্ন ও জওয়াবের উদ্দেশ্য বিষয়টির দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করা এবং গুরুত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে প্রথমে অস্পষ্ট রেখে পরে তফসীর করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তাদের এই মতবিরোধ ভ্রান্ত। তারা যে মনে করে—কিয়ামত আসবে না) কখনও এরূপ নয় (বরং কিয়ামত আসবে এবং) তারা সত্বরই জানতে পারবে। (অর্থাৎ দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর যখন তারা আযাবে পতিত হবে, তখন প্রকৃত সত্য এবং কিয়ামতের সত্যতা তাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে। আমি পুনশ্চ বলছি তারা যে মনে করে—কিয়ামত আসবে না) কখনও এরূপ নয় (বরং আসবে এবং) সত্বরই তারা জানতে পারবে। (কাফিররা যেহেতু কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করে, তাই অতঃপর তার সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, একে অসম্ভব মনে করলে আমার কুদরত ও শক্তি-সামর্থ্যের অস্বীকৃতি জরুরী হয়ে পড়ে। আমার কুদরতকে অস্বীকার করা বিস্ময়কর বটে। কেননা) আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে (ভূমির) পেরেক ? (অর্থাৎ পেরেকের মত করেছি। কোন কিছুতে পেরেক মেরে দিলে যেমন তা স্থানচ্যুত হয় না, তেমনি ভূমিকে পর্বতমালার মাধ্যমে স্থিতিশীল করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমি কুদরতের আরও নিদর্শন প্রকাশ করেছি। সেমতে) আমিই তোমাদেরকে জোড়া জোড়া (অর্থাৎ নর ও নারী) সৃষ্টি করেছি। তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রামের বস্তু। আমিই রাত্রিকে আবরণ করেছি। আমিই দিবসকে জীবিকার সময় করেছি। আমিই তোমাদের ঊর্ধ্বে মজবুত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছি। আমিই (আকাশে) এক উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ সূর্য। অন্য আয়াতের আছে وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا) আমিই জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করি, যাতে তদ্দ্বারা শস্য, উদ্ভিদ, পাতাঘন উদ্যান উৎপন্ন করি। (এগুলো থেকে আমার অপার শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশ পায়। অতএব, কিয়ামতের ব্যাপারে আমার শক্তিকে কেন অস্বীকার করা হয় ? অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা বর্ণিত হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত আছে। (অর্থাৎ) যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে (অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের পৃথক পৃথক দল হবে। এরপর মু'মিন, কাফির, সৎ কর্মপরায়ণ, অসৎ কর্মপরায়ণ সবাই পৃথক পৃথক দলে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে)। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে অনেক দরজা হয়ে যাবে (অর্থাৎ অনেক দরজা খুলে দিলে যেমন অনেক জায়গা খুলে যায়, তেমনি আকাশের অনেক জায়গা খুলে যাবে। সুতরাং কথাটি তুলনা হিসেবে বলা হয়েছে। বস্তুত দরজা তো আকাশে এখনও আছে—একথা বলে আর আপত্তি তোলা যাবে না। এই খোলা ফেরেশতাদের অবতরণের জন্য হবে। সূরা ফোরকানে একেই تَشَقَّقُ السَّمَاءُ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে)। এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে (যেমন অন্য আয়াতে كَثِيبًا مَهِيلًا বলা হয়েছে। এসব ঘটনা দ্বিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার সময় সংঘটিত

হবে। তবে পর্বতমালা চালনার ঘটনাটি যে জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, সবখানেই উভয়বিধ সম্ভাবনা রয়েছে—দ্বিতীয় বার ফুঁক দেওয়ার পরেও হতে পারে এবং প্রথমবার ফুঁক দেওয়ার পরেও হতে পারে। দ্বিতীয় ফুঁকের পর দুনিয়ার সবকিছু পুনরায় নিজস্ব আকৃতি ধারণ করবে। হিসাবের সময় হলে পর্বতমালাকে ভূমির সমান করে দেওয়া হবে, যাতে ভূমির উপর কোন আড়াল না থাকে এবং একই সমতল ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম ফুঁকের মূল উদ্দেশ্যই সবকিছু ধ্বংস করা। প্রথম ফুঁক থেকে দ্বিতীয় ফুঁক পর্যন্ত সময়কে একই দিন ধরে নিয়ে সেই দিনকে সব ঘটনার সময় বলা হয়েছে। অতঃপর এই বিচার দিবসের বিচার বর্ণনা করা হয়েছে) নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে (অর্থাৎ আযাবের ফেরেশতাগণ ওঁত পেতে থাকবে যে, কাফির আসলেই তাকে ধরে আযাব দেওয়া শুরু করবে। এটা) অবাধ্যদের আশ্রয়স্থল। তারা তথায় অশেষকাল পর্যন্ত অবস্থান করবে। তারা তথায় কোন শীতলবস্তু (অর্থাৎ আরামদায়ক বস্তু) এবং পানীয় আস্বাদন করবে না (ফলে তৃষ্ণা নিবারিত হবে না) কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে। এটা (তাদের) পুরোপুরি প্রতিফল। (যে সব কাজের এটা প্রতিফল তা এই যে) তারা (কিয়ামতের) হিসাব-নিকাশ আশা করত না এবং (হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য সত্য বিষয় সম্বলিত) আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যারোপ করত। আমি (তাদের কর্মসমূহের মধ্যে) সবকিছুই (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। অতএব (এসব কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে বলা হবে ঃ এখন এসব কর্মের) স্বাদ আস্বাদন কর; আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব। (অতঃপর মু'মিনদের ফয়সালা উল্লেখ করা হয়েছে।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য রয়েছে সাফল্য অর্থাৎ (আহার ও ভ্রমণের জন্য) উদ্যান (তাতেও নানারকম ফলমূল থাকবে), আঙুর (গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। মনোরঞ্জনের জন্য) সমবয়স্কা পূর্ণ যৌবনা তরুণী এবং (পান করার জন্য) পরিপূর্ণ পানপাত্র। তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। (কেননা তথায় এগুলো থাকবে না)। এটা প্রতিদান, যা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট পুরস্কার—যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক, (যিনি) দয়াময়। কেউ (স্বেচ্ছায়) তাঁর সাথে কথা বলার অধিকারী হবে না। যেদিন সকল রূহ্‌ধারী ও ফেরেশতা (আল্লাহ্‌র সামনে) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, (সেদিন) দয়াময় আল্লাহ্ যাকে (কথা বলার) অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে ঠিক কথা বলবে। (ঠিক কথার অর্থ যে, যে কথার অনুমতি দেওয়া হবে, তাই বলবে অর্থাৎ কথা বলাও সীমিত হবে—যা ইচ্ছা, তা বলতে পারবে না। অতঃপর উল্লিখিত সব বিষয়-বস্তুর সারমর্ম বলা হয়েছে)। এ দিবস নিশ্চিত। অতএব যার ইচ্ছা সে তার পালনকর্তার কাছে (নিজের) ঠিকানা তৈরী করুক (অর্থাৎ ভাল ঠিকানা পেতে হলে ভাল কাজ করুক। লোকসকল) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম। (এই শাস্তি এমন দিনে সংঘটিত হবে) যেদিন প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্ম (সামনে উপস্থিত) দেখে নিবে এবং কাফির (পরিতাপ করে) বলবে ঃ হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! (তাহলে আযাব থেকে বেঁচে যেতাম। চতুষ্পদ জন্তুদেরকে যখন মৃত্তিকায় পরিণত করে দেওয়া হবে, তখন কাফিররা একথা বলবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ —অর্থাৎ তারা কি বিষয়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই উত্তর দিয়েছেন : عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ - نَبَأ — শব্দের অর্থ মহা খবর। এখানে মহা খবর বলে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মক্কাবাসী কাফিররা কিয়ামত সম্পর্কে সওয়াল-জওয়াব করছে, যে সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কোরআনের অবতরণ শুরু হলে মক্কার কাফিররা তাদের বৈঠকে বসে এ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করত। কোরআনে কিয়ামতের আলোচনাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ এটা তাদের মতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই এ সম্পর্কে অধিক পরিমাণে আলোচনা চলত। কেউ একে সত্য মনে করত এবং কেউ অস্বীকার করত। তাই আলোচ্য সূরার শুরুতে কাফিরদের অবস্থা উল্লেখ করে কিয়ামতের সম্ভাব্যতা আলোচনা করা হয়েছে। কিয়ামত সম্পর্কে কাফিররা যেসব খটকা ও আপত্তি উত্থাপন করত, সেগুলোর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরকারক বলেন যে, কাফিরদের এই সওয়াল ও জওয়াব তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে নয় বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে ছিল। কোরআন পাক এর জওয়াবে একই বাক্যকে তাকীদের জন্য দুবার উল্লেখ করেছে— كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ —অর্থাৎ কিয়ামতের বিষয়টি সওয়াল-জওয়াব, আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম হবে না বরং এটা যখন সামনে উপস্থিত হবে, তখনই এর স্বরূপ জানা যাবে। এর নিশ্চিত বিষয়ে বিতর্ক, প্রশ্ন ও অস্বীকারের অবকাশ নেই। অতিসত্বর অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরজগতের বস্তুসমূহ দৃষ্টিতে ভেসে উঠবে এবং সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলী দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। তখন কিয়ামতের স্বরূপ খুলে যাবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি, প্রজ্ঞা ও কারিগরির কয়েকটি দৃশ্য উল্লেখ করেছেন, যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় তদ্রূপই সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে ভূমি ও পর্বতমালা সৃষ্টি এবং নর ও নারীর যুগলের আকারে মানব সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও কাজ-কারবারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে একটি বাক্য এই যে, جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا — سُبَات শব্দটি سَبْت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কমানো, কর্তন করা। নিদ্রা মানুষের চিন্তাভাবনাকে কর্তন করে তার অন্তর ও মস্তিষ্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি

দান করে, যার বিকল্প দুনিয়ার কোন শান্তি হতে পারে না। এ কারণেই কেউ কেউ سُبَاتًا এর অর্থ করেছেন সুখ, আরাম।

নিদ্রা খুব বড় নিয়ামত : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যুগলাকারে সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করার পর তার আরামের সব উপকরণের মধ্য থেকে বিশেষভাবে নিদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন। চিন্তা করলে বোঝা যায় এটি এক বিরাট নিয়ামত। নিদ্রাই মানুষের সব সুখের ভিত্তি। এই নিয়ামতটি আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক করে দিয়েছেন। ফলে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, রাজা-প্রজা সবাই এই ধন সমহারে একই সময়ে প্রাপ্ত হয় বরং বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গরীব ও শ্রমজীবী মানুষ এই নিয়ামত যে পরিমাণে লাভ করে, ধনাঢ্য ও ঐশ্বর্যশালীদের ভাগ্যে তা ঘটে না। তাদের কাছে সুখের সামগ্রী, সুখের বাসগৃহ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, নরম তোষক, নরম বালিশ ইত্যাদি সবই থাকে, যা দরিদ্ররা কদাচ চোখেও দেখে না কিন্তু নিদ্রা এসব তোষক, বালিশ অথবা প্রাসাদ-বাংলোর অনুগামী নয়। এটা তো আল্লাহ্ তা'আলার এমন এক নিয়ামত, যা সরাসরি তাঁর কাছ থেকেই আসে। মাঝে মাঝে নিঃস্ব সম্বলহীন ব্যক্তিকে কোন শয্যা-বালিশ ছাড়াই উন্মুক্ত আকাশের নিচে এই নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দান করা হয় এবং মাঝে মাঝে সম্পদশালীদেরকে দান করা হয় না। তারা নিদ্রার বটিকা সেবন করে এই নিয়ামত লাভ করে এবং প্রায়শ এই বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়। চিন্তা করুন, এর চেয়ে বড় নিয়ামত এই যে, এই নিদ্রা কেবল বিনা মূল্যে ও বিনা পরিশ্রমেই মানুষ, জন্তু নির্বিশেষে সবাইকে দান করা হয়নি বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার অনুগ্রহে এই নিয়ামতটি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। মানুষ মাঝে মাঝে কাজের আধিক্যের দরুন সারারাত্রি জেগে কাজ করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহ তার উপর জোরেজবরে নিদ্রা চাপিয়ে দেন, যাতে সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং সে আরও অধিক কাজের শক্তি অর্জন করে। অতঃপর এই নিদ্রারূপী মহা অবদানের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا —অর্থাৎ আমি রাত্রিকে করেছি আবরণ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বভাবত মানুষের নিদ্রা তখন আসে, যখন আলো অধিক না থাকে, চতুর্দিকে নীরবতা বিরাজ করে এবং হট্টগোল না থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রিকে আবরণ বলে ইশারা করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে কেবল নিদ্রাই দেননি বরং সারা বিশ্বে নিদ্রার উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সমস্ত মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে একই সময়ে নিদ্রা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সবাই একযোগে নিদ্রা গেলেই চারদিকে পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করবে। নতুবা অন্যান্য কাজের ন্যায় নিদ্রার সময়ও যদি বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্নরূপ হত; তবে কেউ পূর্ণ শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারত না।

এরপর বলা হয়েছে وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا —মানুষের সুখ ও শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যাদির সরবরাহও নিতান্ত জরুরী। নতুবা নিদ্রা সাক্ষাৎ মৃত্যু হয়ে

যাবে। যদি সারাক্ষণ রাত্রিই থাকত এবং মানুষ কেবল নিদ্রাই যেত, তবে এসব দ্রব্য কিরূপে অর্জিত হত। এর জন্য চেষ্টা, পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি জরুরী, যা আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে সম্ভবপর। তাই বলা হয়েছে : তোমাদের সুখকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি কেবল রাত্রি ও তার অন্ধকার সৃষ্টি করিনি বরং একটি আলোকোজ্জ্বল দিনও দিয়েছি, যাতে তোমরা কাজ-কারবার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পার। অতঃপর মানুষের সুখের সেই উপকরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা আকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ উপকারী বস্তু হচ্ছে সূর্যের আলো। বলা হয়েছে : وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا—অর্থাৎ আমি একটি প্রোজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। এর পর মানুষের সুখের প্রয়োজনে আকাশের নিচে সৃজিত বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু মেঘমালার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا—معصرات শব্দটি معصرة-এর বহুবচন। এর অর্থ জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। এ থেকে জানা গেল যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। কোন কোন আয়াতে আকাশ থেকে বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। তাতে আকাশের অর্থ আকাশের শূন্যমণ্ডল। এই অর্থে سماء শব্দের ব্যবহার কোরআনে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া একথাও বলা যায় যে, কোন সময় সরাসরি আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষিত হতে পারে। এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এসব কারিগরি ও নিয়ামত উল্লেখ করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু কিয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا—অর্থাৎ বিচারের দিন মানে কিয়ামত নির্দিষ্ট সময়ে আসবে। তখন এই বিশ্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, দুইবার শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকারের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এসময় বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ দলে দলে আল্লাহ্‌র সকাশে উপস্থিত হবে। হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে। একদল উদরপূর্তি ও পোশাক পরিহিত অবস্থায় সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে হাশরের ময়দানে আসবে। দ্বিতীয় দল পায়ে হেঁটে আগমন করবে এবং তৃতীয় দলকে উপুড় অবস্থায় পায়ে ধরে টেনে হাশরের ময়দানে আনা হবে।—(মাযহারী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আয়াতের তফসীরে দশ দল হবে বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : নিজ নিজ কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের দল হবে অসংখ্য। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا—অর্থাৎ যে পাহাড়কে আজ অটল ও অনড় হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হয়, সেই পাহাড় স্বস্থান থেকে বিচ্যুত

হয়ে তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। سراب -এর শাব্দিক অর্থ চলে যাওয়া। মরুভূমির যে বালুকাস্তূপ দূর থেকে পানির ন্যায় ঝলমল করতে থাকে তাকেও سراب -এ কারণে বলা হয় যে, কাছে গেলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়।—(সেহাহ্, রাগিব)

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا—যে স্থানে বসে কারও দেখাশোনা অথবা অপেক্ষা করা হয়, তাকে مرصاد বলা হয়। এখানে জাহান্নামের অর্থ জাহান্নামের পুল তথা পুলসিরাত। সওয়াবদাতা ও শাস্তিদাতা উভয় প্রকার ফেরেশতা এখানে অপেক্ষা করবে। জাহান্নামীদেরকে শাস্তিদাতা ফেরেশতারা পাকড়াও করবে এবং জান্নাতীদেরকে সওয়াবদাতা ফেরেশতারা তাদের গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবে। (মাযহারী)

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : জাহান্নামের পুলের উপর পরিদর্শক ফেরেশতাগণের চৌকি থাকবে। যার কাছে জান্নাতের ছাড়পত্র থাকবে, তাকে অগ্রে যেতে দেওয়া হবে এবং যার কাছে এই ছাড়পত্র থাকবে না তাকে আটকিয়ে রাখা হবে।—(কুরতুবী)

لِلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا—এটা اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا -এর দ্বিতীয় خبر উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক সৎ ও অসৎকে জাহান্নামের পুলের উপর দিয়ে যেতে হবে এবং জাহান্নাম সীমালংঘনকারীদের আবাসস্থল। طاغين শব্দটি طاغى এর বহুবচন এবং طغيان থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ অবাধ্যতা করা। طاغى এমন লোককে বলা হয়। যে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। ঈমান না থাকলেও এটা হতে পারে। তাই এখানে طاغى অর্থ কাফির। কু-বিশ্বাসী, পথভ্রষ্ট মুসলমানদের সেই দলও অর্থ হতে পারে, যারা কোরআন ও সুন্নাহর সীমা ডিঙিয়ে যায়। যদিও প্রকাশ্যভাবে কুফর অবলম্বন করে না, যেমন রাফেযী, খারেজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায়।—(মাযহারী)

لَابِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا—لابثين শব্দটি لابث -এর বহুবচন। অর্থ অবস্থানকারী। احقاب শব্দটি حقبة-এর বহুবচন। অর্থ সুদীর্ঘ সময়। ইবনে জরীর হযরত আলী (রা) থেকে এর পরিমাণ আশি বছর বর্ণনা করেছেন, যার প্রত্যেক বছর বার মাসের, প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনের এবং প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের। এভাবে প্রায় দুই কোটি আটাশি বছরে এক حقبة হয়। অপর কয়েকজন সাহাবী এর পরিমাণ আশির পরিবর্তে সত্তর বছর বলেছেন। অবশিষ্ট হিসাব পূর্বের ন্যায়।—(ইবনে-কাসীর) কিন্তু মসনদে বাযযারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

لا يخرج احد كم من النار حتى يمكث فيها احقابا والحقب بضع وثمانون سنة كل سنة ثلثمائة وستون يوما مما تعدون -

তোমাদের যাকে গোনাহের সাজায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাকে কয়েক হুকবা জাহান্নামে অবস্থান না করা পর্যন্ত বের করা হবে না। এক হুকবা আশি বছরের কিছু বেশী এবং এক বছর তোমাদের বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৩৬০ দিনের হবে।—(মাযহারী)

এই হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর না হলেও এতে أحقابا শব্দের অর্থ বর্ণিত আছে। অপরদিকে কয়েকজন সাহাবী থেকে এ সম্পর্কে প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের বর্ণিত আছে। যদি এটাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-রই উক্তি হয়, তবে এর অর্থ এই যে, হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে। এই বিরোধ আসা অবস্থায় কোন এক অর্থ নিশ্চিতভাবে নেওয়া যায় না। তবে উভয় হাদীসের অভিন্ন বিষয়বস্তু এই যে, হুকবা অত্যন্ত দীর্ঘ সময়কে বলা হয়। একারণেই ইমাম রায়যাভী إحقاب-এর অর্থ করেছেন دهورا متتابعة অর্থাৎ উপর্যুপরি বহু বছর।

জাহান্নামে চিরকাল বসবাস সম্পর্কে আপত্তি ও জওয়াব ঃ হুকবার পরিমাণ যত দীর্ঘই হোক, তা সীমিত, অনন্ত নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই সুদীর্ঘ সময়ের পর কাফির জাহান্নামীরাও জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। অথচ এটা কোরআনের অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী। যে সব আয়াতে خالدين فيها أبدا বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই উম্মতের ইজমা হয়েছে যে, জাহান্নাম কখনও ধ্বংস হবে না এবং কাফিররা কখনও জাহান্নাম থেকে বের হবে না।

সুদ্দী হযরত মুররা ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ যদি জাহান্নামী-দেরকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, জাহান্নামে তাদের অবস্থান সারা বিশ্বের কংকরের সমান হবে, তবে এতেও তারা আনন্দিত হবে। কারণ, কংকরের সংখ্যা অগণিত হলেও সীমিত। ফলে একদিন না একদিন আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। যদি একই সংবাদ জান্নাতী-দেরকে দেওয়া হয়, তবে তারা দুঃখিত হবে। কেননা, কংকরের সমান মেয়াদ যত দীর্ঘই হোক না কেন, সেই মেয়াদের পর তারা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে।—(মাযহারী)

সার কথা, আলোচ্য আয়াতের أحقابا শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, কয়েক হুকবা অতিবাহিত হলে পরে জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। এই অর্থ অন্য সব আয়াত, হাদীস ও ইজমার পরিপন্থী হওয়ার কারণে ধর্তব্য নয়। কেননা, এই আয়াতে কয়েক হুকবার পরে কি হবে, তার বর্ণনা নেই। এতে শুধু উল্লেখ আছে যে, তারা কয়েক হুকবা জাহান্নামে থাকবে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, কয়েক হুকবার পর জাহান্নাম থাকবে না অথবা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এ কারণেই হযরত হাসান (রা) এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামীদের জন্য কোন সময় ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করেননি, যদ্দ্বারা তাদের জাহান্নাম থেকে বের হওয়া বোঝা যেতে পারে বরং উদ্দেশ্য এই যে, যখন সময়ের এক অংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন অন্য অংশ শুরু হয়ে যাবে। এমনিভাবে তৃতীয় চতুর্থ অংশ করে অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র) কাতাদাহ্ থেকেও এই তফসীরই

বর্ণনা করেছেন যে, احقا ب-এর অর্থ অনন্তকাল অর্থাৎ এক হুক্বা শেষ হলে দ্বিতীয় হুক্বা শুরু হবে এবং এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।—(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর এখানে ويحتمل বলে আরও একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, طاغين -এর অর্থ কাফির না নেওয়া বরং মুসলমানদের এমন দল বোঝানো, যারা বাতিল আকীদার কারণে পথভ্রষ্ট দল বলে গণ্য হয়। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় তাদেরকে প্রবৃত্তিবাদী বলা হয়। এমতাবস্থায় আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, যে সব কালেমা উচ্চারণকারী তওহীদ পন্থী লোক বাতিল আকীদা রাখার কারণে কুফরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে কিন্তু প্রকাশ্য কাফির নয়, তারা কয়েক হুক্বা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকার পর অবশেষে কালেমার বরকতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। কুরতুবী এই ব্যাখ্যাকে সম্ভবপর আখ্যা দিয়েছেন এবং মাযহারী এই ব্যাখ্যাই পছন্দ করেছেন। তিনি এর সমর্থনে মসনদে বাযযার বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এর পূর্বোল্লেখিত হাদীসও পেশ করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, কয়েক হুক্বা অতিবাহিত হওয়ার পর তারা জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

কিন্তু আবূ হাইয়ান বলেন যে, পরবর্তী আয়াত انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بايتنا كذابا—এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় যে, طاغين-এর অর্থ এখানে তওহীদ পন্থী ভ্রান্তদল হবে। কেননা, এই আয়াতে কিয়ামত অস্বীকার এবং আয়াতসমূহকে মিথ্যারোপ করার কথা পরিষ্কার বর্ণিত আছে। এমনিভাবে, আবূ হাইয়ান মুকাতিলের এই উক্তিও প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, এই আয়াতটি মনসুখ বা রহিত।

একদল তফসীরকারক আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে তৃতীয় একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, এই আয়াতের পরবর্তী لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا আয়াতটি احقا با থেকে جمله حاليه হবে। আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা কোন শীতলদ্রব্য ও পানীয় আস্বাদন করবে না ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত। এরপর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের এই দুরবস্থার পরিবর্তন হতে পারে এবং অন্য প্রকার আযাব হতে পারে। حميم এমন ফুটন্ত পানি, যা মুখের কাছে আনা হলে গোশ্ত জ্বলে যাবে এবং পেটে গেলে ভিতরের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। غساق—জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি।

جزاء وفاقا—অর্থাৎ জাহান্নামে তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা ন্যায়

ও ইনসাফের দৃষ্টিতে তাদের বাতিল বিশ্বাস ও কু-কর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোন বাড়াবাড়ি হবে না।

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا—অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে যেমন কুফর ও অস্বীকারে কেবল বেড়েই চলেছ—বাধ্যতামূলক মৃত্যুর সম্মুখীন না হলে আরও বেড়েই চলতে, তেমনিভাবে আজ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আযাব কেবল বৃদ্ধিই করবেন। অতঃপর কাফিরদের বিপরীতে মু'মিন মুত্তাকীদের সওয়াব ও জান্নাতের নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا—অর্থাৎ জান্নাতের এসব নিয়ামত মু'মিনদের প্রতিদান এবং আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত দান। এখানে জান্নাতের নিয়ামতসমূহকে প্রথমে কর্মের প্রতিদান ও পরে আল্লাহ্‌র দান বলা হয়েছে। বাহ্যত উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কেননা, কোন কিছুর বিনিময়ে যা দেওয়া হয়, তাকে প্রতিদান এবং বিনিময় ছাড়াই পুরস্কারস্বরূপ যা দেওয়া হয়, তাকে দান বলা হয়। কোরআন পাক উভয় শব্দকে একত্র করে ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাতে প্রবেশাধিকার এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহ কেবল আকার ও বাহ্যিক দিক দিয়েই জান্নাতীদের কর্মের প্রতিদান—প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো খাঁটি আল্লাহ্‌র দান। কেননা, মানুষের কাজকর্ম তো সেসব নিয়ামতেরই প্রতিদান হতে পারে না, যেগুলো তাকে দুনিয়াতে দান করা হয়। পরকালীন নিয়ামত অর্জন তো শুধু আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ, কৃপা ও দান বৈ নয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি শুধু তার কর্মের জোরে জান্নাতে যেতে পারে না যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ না হয়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ আপনিও কি? উত্তর হল ঃ হ্যাঁ, আমিও আমার কর্মের জোরে জান্নাতে যেতে পারি না। حِسَابًا শব্দের অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে—এক. এমন দান যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত হয়। এই অর্থ নিম্নোক্ত ব্যবহার থেকে নেওয়া হয়েছে— أَحْسَبْتُ فُلَانًا أَيْ أَعْطَيْتُهُ مَا يَكْفِيهِ حَتَّى قَالَ حَسْبِي অর্থাৎ আমি তাকে এতটুকু দিলাম, যা তার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট; এমনকি, সে বলে উঠল, ব্যস, এতটুকু আমার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় অর্থ মুকাবিলা করণ। তফসীরবিদগণের কেউ কেউ প্রথম অর্থ এবং কেউ কেউ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। হযরত মুজাহিদ (র) দ্বিতীয় অর্থ নিয়ে আয়াতের অর্থ করেছেন—এই দান জান্নাতীদেরকে তাদের আমলের হিসাব দেওয়া হবে। আন্তরিকতা ও কর্ম সৌন্দর্যের হিসাবে এই দানের স্তর নির্ধারিত হবে। উদাহরণত সহীহ্ হাদীসসমূহে উম্মতের কর্মের মুকাবিলায় সাহাবায়ে কিরামের কর্মের এই মর্যাদা নিরূপিত হয়েছে যে, সাহাবী আল্লাহ্‌র পথে একমুদ (প্রায় এক সের) ব্যয় করলে তা অন্যের ওহুদ পর্বত সমান ব্যয়েরও অধিক মর্যাদাশীল হবে।

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ বাক্যের সাথেও لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا—এই বাক্য পূর্বের সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যেরূপ সওয়াব দান করবেন, তাতে কারও কথা বলার সাধ্য হবে না যে, অমুককে কম এবং অমুককে বেশি কেন দেওয়া হল? যদি একে আলাদা বাক্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কারও ভাষণ দেওয়ার ক্ষমতা হবে না। এই অনুমতি কোন কোন স্থানে হবে এবং কোন কোন স্থানে হবে না।

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا—কোন কোন তফসীরকারের মতে 'রূহ্' বলে এখানে জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করার সাধারণ উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণের পূর্বে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রূহ্ আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট বাহিনী, যারা ফেরেশতা নয় তাদের মাথা ও হস্তপদ আছে। এই তফসীর অনুযায়ী দুটি সারি হবে—একটি রূহের ও অপরটি ফেরেশতাগণের।

يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ—বাহ্যত এই দিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন। হাশরে প্রত্যেকেই তার কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে—হয় আমলনামা হাতে আসার ফলে দেখবে, না হয় কাজকর্ম সব সশরীরী হয়ে সামনে এসে যাবে। কোন কোন হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত আছে। এ দিন মৃত্যুর দিনও হতে পারে। এমতাবস্থায় স্বীয় কাজকর্ম দেখা কবরে ও বরযখে হতে পারে।—(মাযহারী)

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا-হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন সমগ্র ভূপৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে মানব, জিন, গৃহপালিত জন্তু ও বন্য জন্তু সবাইকে একত্র করা হবে। জন্তুদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এমনকি কোন শিংবিশিষ্ট ছাগল কোন শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে সে দিন তারও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তুকে আদেশ করা হবে ঃ মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে—হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। এরূপ হলে আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে যেতাম।

سورة النازعات

সূরা নাযিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿۱﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿۲﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿۳﴾ فَالسّٰبِقٰتِ
سَبْقًا ﴿۴﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿۵﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿۶﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿۷﴾
قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ﴿۸﴾ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿۹﴾ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُ
وْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿۱۰﴾ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿۱۱﴾ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿۱۲﴾
فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿۱۳﴾ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿۱۴﴾ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى
﴿۱۵﴾ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿۱۶﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿۱۷﴾
فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰۤى اَنْ تَزَكّٰى ﴿۱۸﴾ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿۱۹﴾ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ
الْكُبْرٰى ﴿۲۰﴾ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿۲۱﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿۲۲﴾ فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿۲۳﴾ فَقَالَ اَنَا
رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿۲۴﴾ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿۲۵﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً
لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿۲۶﴾ ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰىهَا ﴿۲۷﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا
فَسَوّٰىهَا ﴿۲۸﴾ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿۲۹﴾ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿۳۰﴾ اَخْرَجَ
مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿۳۱﴾ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿۳۲﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿۳۳﴾ فَاِذَا
جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿۳۴﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿۳۵﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ
لِمَنْ يَّرٰى ﴿۳۶﴾ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿۳۷﴾ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿۳۸﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿۳۹﴾

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ۝
يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ۝ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ۝ إِلَىٰ رَبِّكَ
مُنتَهَىٰهَآ ۝ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا ۝ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟
إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে, (২) শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে; (৩) শপথ তাদের, যারা সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে, (৪) শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং (৫) শপথ তাদের, যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে—কিয়ামত অবশ্যই হবে। (৬) যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, (৭) অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাৎগামী; (৮) সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহ্বল হবে। (৯) তাদের দৃষ্টি নত হবে। (১০) তারা বলে ঃ আমরা কি উলটো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হবই—(১১) গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও? (১২) তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে! (১৩) অতএব এটা তো কেবল এক মহা-নাদ, (১৪) তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে। (১৫) মূসার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌঁছেছে কি? (১৬) যখন তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহ্বান করেছিলেন, (১৭) ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে। (১৮) অতঃপর বল ঃ তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? (১৯) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর। (২০) অতঃপর সে তাকে মহা-নিদর্শন দেখাল। (২১) কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল। (২২) অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল। (২৩) সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহ্বান করল (২৪) এবং বলল ঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। (২৫) অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন। (২৬) যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। (২৭) তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন? (২৮) তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (২৯) তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। (৩০) পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। (৩১) তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাস নির্গত করেছেন (৩২) পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (৩৪) অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে (৩৫) অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে (৩৬) এবং দর্শকদের জন্য জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে, (৩৭) তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে (৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, (৩৯) তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (৪০) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান

হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, (৪১) তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (৪২) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কখন হবে? (৪৩) এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? (৪৪) এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে। (৪৫) যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন। (৪৬) যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ সেই ফেরেশতাগণের যারা (কাফিরদের) প্রাণ নির্মমভাবে বের করে। শপথ তাদের, যারা (মুসলমানদের আত্মা মৃদুভাবে বের করে যেন) বাঁধন খুলে দেয়। শপথ তাদের, যারা (আত্মাকে নিয়ে পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে দ্রুতগতিতে ধাবমান হয় যেন) সন্তরণ করে। অতঃপর (যখন আত্মাকে নিয়ে পৌঁছে, তখন আত্মা সম্পর্কে আল্লাহ্র আদেশ পালনার্থে) দ্রুত অগ্রসর হয়, অতঃপর (এই আত্মা সম্পর্কে সওয়াবের আদেশ হোক অথবা আযাবের, উভয়) কার্য নির্বাহ করে। (এসব শপথ করে বলেন যে) কিয়ামত অবশ্যই হবে, যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী (অর্থাৎ শিংগার প্রথম ফুঁক)। অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাৎগামী (অর্থাৎ শিংগার দ্বিতীয় ফুঁক)। অনেক হৃদয় সেদিন ভীত-বিহ্বল হবে, তাদের দৃষ্টি (অনুতাপের ভারে) নত হবে। (কিন্তু তারা এখন কিয়ামত অস্বীকার করে এবং) বলে: আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হব? (অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার পুনরুজ্জীবন হবে কি? উদ্দেশ্য, এটা কিরূপে হতে পারে?) গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও কি? (উদ্দেশ্য, এটা খুবই কঠিন। যদি এরূপ হয়) তবে তো এ প্রত্যাবর্তন (আমাদের জন্য) সর্বনাশা হবে। (কারণ, আমরা তো এর জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। উদ্দেশ্য মুসলমানদের বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রূপ করা যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের বিরাট ক্ষতি হবে। উদাহরণত একজন অন্যজনকে শুভেচ্ছার বশবর্তী হয়ে সতর্ক করে বলে: এ পথে যেয়ো না, সিংহ আছে। অতঃপর সেই ব্যক্তি অস্বীকারের ছলে কাউকে বলে: ভাই, সে দিকে যেয়ো না, সিংহ খেয়ে ফেলবে। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে সিংহ বলতে কিছুই নেই। অতঃপর খণ্ডন করা হয়েছে যে, তারা কিয়ামতকে অসম্ভব ও কঠিন মনে করে) অতএব, (তারা বুঝে নিক যে, আমার পক্ষে এটা মোটেই কঠিন নয়; বরং) এটা তো কেবল এক মহানাদ হবে, যার ফলে তারা তৎক্ষণাৎ ময়দানে আবির্ভূত হবে। [অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মূসা (আ) ও ফিরাউনের কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে:] আপনার কাছে মূসা (আ)-র বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহ্বান করেন যে, তুমি ফিরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে। তার কাছে যেয়ে বল: তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? (তোমার সংশোধনের নিমিত্ত) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার (সত্তা ও গুণাবলীর) দিকে পথ দেখাব, যাতে (তাঁর সত্তা ও গুণাবলী শুনে) তুমি তাঁকে ভয় কর। [এই ভয়ের ফলশ্রুতিতে তোমার সংশোধন হয়ে যাবে। এই আদেশ শুনে মূসা (আ) তার কাছে গেলেন এবং পয়গাম পৌঁছালেন] অতঃপর (সে যখন নবুয়তের নিদর্শন

চাইল, তখন) তিনি তাকে মহানিদর্শন (নবুয়তের) দেখালেন (অর্থাৎ লাঠি অথবা লাঠিও সুশুভ্র হাত)। কিন্তু সে (অর্থাৎ ফিরাউন) মিথ্যারোপ করল ও অমান্য করল। অতঃপর [মূসা (আ)-র কাছ থেকে] প্রস্থান করল এবং (তাঁর বিরুদ্ধে) চেষ্টা করল। সে (সকলকে) সমবেত করল এবং (তাদের সামনে) সজোরে ঘোষণা করল ও বলল ঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। ('সেরা' কথাটি এমনিতেই প্রশংসার্থে যোগ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য নয় যে, অন্য আরও পালনকর্তা আছে)। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন (ইহকালের শাস্তি নিমজ্জিত করা এবং পরকালের শাস্তি জাহান্নামে প্রজ্বলিত করা)। নিশ্চয় এতে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। (অতঃপর কিয়া-মতকে অসম্ভব ও কঠিন মনে করার যুক্তিগত জওয়াব দেওয়া হয়েছে)। তোমাদের (পুনর্বার) সৃষ্টি অধিক কঠিন, না আকাশের ? (এটা অন্যের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌র পক্ষে সব সৃষ্টিই সমান। বলা বাহুল্য, আকাশের সৃষ্টিই অধিক কঠিন। এই কঠিনতর সৃষ্টিই যখন তিনি সম্পন্ন করেছেন, তখন তোমাদের সৃষ্টি আর কি কঠিন হবে। অতঃপর আকাশ সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে)। আল্লাহ্ একে নির্মাণ করেছেন, এর ছাদ উচ্চ করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন, (যাতে এর মধ্যে ফাটল, ছিদ্র ও জোড়া তালি না থাকে)। তিনি এর রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। (আকাশের রাত্রি ও আকাশের সূর্যালোক বলার কারণ এই যে, সূর্যের উদয় ও অস্ত দ্বারা দিবারাত্রি হয়। সূর্য আকাশের সাথে সম্পৃক্ত)। এর পরে তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং (বিস্তৃত করে) এর মধ্য থেকে এ পানি ও ঘাস নির্গত করেছেন। তিনি পর্বতকে (এর উপর) প্রতিষ্ঠিত করেছেন—তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (আসল প্রমাণ ছিল আকাশ সৃষ্টি কিন্তু পৃথিবী সর্বদা দৃষ্টির সামনে থাকে বলে সম্ভবত এর উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আকাশের সমান না হলেও মানব সৃষ্টির চেয়ে পৃথিবী সৃষ্টি কঠিনতর। সুতরাং প্রমাণের সারমর্ম এই যে, এমন এমন বস্তু যখন আমি নির্মাণ করেছি, তখন তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা আর কঠিন হবে কেন? অতঃপর পুনরুত্থানের পর দান প্রতিদানের বস্তু যখন আমি নির্মাণ করেছি, তখন তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা আর কঠিন হবে কেন? ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে)। অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে অর্থাৎ মানুষ যেদিন তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে এবং দর্শকদের জন্য জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে, তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং (পরকালে অবিশ্বাসী হয়ে) পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে থাকাকালে) তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া ভয় করেছে (ফলে কিয়ামত, পরকাল ও হিসাব-নিকাশে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করেছে) এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, (অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিশ্বাসসহ সৎ কর্মও সম্পাদন করেছে) তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সৎ কর্ম জান্নাতের পথ। এর উপর জান্নাত নির্ভরশীল নয়। কাফিররা অস্বীকারের ছলে কিয়ামতের সময় জিজ্ঞাসা করত, তাই অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে)। তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন হবে? এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? (কেননা, জানা থাকলেই বর্ণনা করা যায়। অথচ আমি এর নির্দিষ্ট সময় কাউকে বলিনি, বরং) এর চরম জ্ঞান শুধু আপনার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। আপনি তো কেবল

(সংক্ষিপ্ত খবরের ভিত্তিতে) এমন ব্যক্তিকে সতর্ক করেন, যে একে ভয় করে (এবং ভয় করে ঈমান আনে। যারা কিয়ামতের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করছে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে,) যেদিন তারা একে দেখবে সেদিন (তাদের) মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র একদিনের শেষাংশ অথবা এক দিনের প্রথমাংশ অবস্থান করেছে। (অর্থাৎ দুনিয়ার দীর্ঘজীবন খাটো মনে হবে। তারা মনে করবে আযাব বড় তাড়াতাড়ি এসে গেছে। সার কথা এই যে, তড়িঘড়ি কর কেন? যখন আসবে, তখন মনে করবে যে, দ্রুত এসে গেছে। তোমরা এখন যাকে বিলম্ব মনে করছ, তখন কিন্তু তা বিলম্ব মনে হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا—نازعات-শব্দটি نزع-থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুকে উৎপাটন করা। اغراق ও غرق—এর অর্থ কোন কাজ নির্মমভাবে করা। বাক-পদ্ধতিতে বলা হয়ঃ اغرق النازع فى القوس—অর্থাৎ তীর নিক্ষেপকারী ধনুকে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছে। সূরার শুরুতে ফেরেশতাগণের কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে তাঁদের শপথ করা হয়েছে। শপথের জওয়াব উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত ও হাশর-নশর অবশ্যই হবে। ফেরেশতাগণ এখনও সারা বিশ্বের কাজকর্ম ও শৃঙ্খলা বিধানে নিয়োজিত রয়েছে কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বস্তুনিষ্ঠ কারণাদি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন ফেরেশতাগণই যাবতীয় কর্ম নির্বাহ করবে। এই সম্পর্কের কারণে সূরায় তাদের শপথ করা হয়েছে।

এস্থলে ফেরেশতাগণের পাঁচটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো মানুষের মৃত্যু ও আত্মা বের করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদ্দেশ্য, কিয়ামতের সত্যতা বর্ণনা করা। মানুষের মৃত্যু দ্বারা এই বর্ণনা শুরু করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার জন্য আংশিক কিয়ামত হয়ে থাকে। কিয়ামতের বিশ্বাসে এর প্রভাব অসাধারণ। প্রথম বিশেষণ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا —অর্থাৎ নির্মমভাবে টেনে আত্মা নির্গতকারী। এখানে আযাবের সে সব ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা কাফিরের আত্মা নির্মমভাবে বের করে। যেহেতু এই নির্মমতা আত্মিক হয়ে থাকে, তাই দর্শকদেরও এটা অনুভব করা জরুরী নয়। এ কারণেই কাফিরদের আত্মা প্রায়ই সহজে বের হতে দেখা যায় কিন্তু এটা কেবল আমাদের দেখার মধ্যেই। তার আত্মার উপর যে নির্মম কাণ্ড সংঘটিত হয়, তা কে দেখতে পারে। এটা তো আল্লাহ্র উক্তি থেকেই জানা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের আত্মা টেনে টেনে নির্মমভাবে বের করা হয়।

দ্বিতীয় বিশেষণ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا—ناشطات -শব্দটি نشط থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাঁধন খুলে দেওয়া। কোন কিছুতে পানি অথবা বাতাস ভর্তি থাকলে যদি তার বাঁধন খুলে দেওয়া

হয়, তবে সেই পানি বা বাতাস সহজে বের হয়ে যায়। এতে মু'মিনের আত্মা বের করাকে এর সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, যে ফেরেশতা মু'মিনের রূহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে অনায়াসে রূহ কবজ করে—কঠোরতা করে না। এখানেও বিষয়টি আত্মিক বিধায় কোন মুসলমান বরং সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আত্মা বের হতে বিলম্ব হলে একথা বলা যায় না যে, তার প্রতি নির্মমতা করা হচ্ছে—যদিও শারীরিকভাবে নির্মমতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃত কারণ এই যে, কাফিরের আত্মা বের করার সময় থেকেই বরযখের আযাব সামনে এসে যায়। এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে আত্মগোপন করতে চায়। ফেরেশতা জোরে-জবরে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মু'মিনের রূহের সামনে বরযখের সওয়াব নিয়ামত ও সুসংবাদ ভেসে উঠে। ফলে সে দ্রুতবেগে সে দিকে যেতে চায়।

তৃতীয় বিশেষণ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا —سبح-এর আভিধানিক অর্থ সন্তরণ করা। এখানে উদ্দেশ্য দ্রুতবেগে চলা। নদীপথে কোন বাধা-বিঘ্ন থাকে না। সন্তরণকারী ব্যক্তি অথবা নৌকারোহী সোজা গন্তব্য স্থানের দিকে ধাবিত হয়। এই সন্তরণকারী বিশেষণটিও মৃত্যুর ফেরেশতাগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের রূহ কবজ করার পর তারা দ্রুত গতিতে আকাশের দিকে নিয়ে যায়।

চতুর্থ বিশেষণ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا—উদ্দেশ্য এই যে, যে আত্মা ফেরেশতাগণের হস্তগত হয়, তাকে ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌঁছানোর কাজে তারা দ্রুততায় একে অপরকে ডিঙিয়ে যায়। তারা মু'মিনের আত্মাকে জান্নাতের আবহাওয়ায় ও নিয়ামতের জায়গায় এবং কাফিরের আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও আযাবের জায়গায় পৌঁছিয়ে দেয়।

পঞ্চম বিশেষণ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا— মৃত্যুর ফেরেশতাদের সর্বশেষ কাজ এই যে, যে আত্মাকে সওয়াব ও আরাম দেওয়ার আদেশ হয়, তারা তার জন্য সওয়াব ও আরামের ব্যবস্থা করে এবং যাকে আযাব ও কষ্টে রাখার আদেশ হয়, তারা তার জন্য আযাব ও কষ্টের ব্যবস্থা করে।

কবরে সওয়াব ও আযাব : উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ মানুষের মৃত্যুর সময় আগমন করে রূহ কবজ করে আকাশের দিকে নিয়ে যায়, ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় দ্রুতবেগে পৌঁছিয়ে দেয় ও সেখানে সওয়াব অথবা আযাব এবং কষ্ট অথবা সুখের ব্যবস্থা করে। এই আযাব ও সওয়াব কবরে অর্থাৎ বরযখে হবে। হাশরের আযাব ও সওয়াব এর পরে হবে। সহীহ্ হাদীসসমূহে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মসনদে আহমদের বরাত দিয়ে মেশকাতে এতদসম্পর্কিত হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে।

নফ্স ও রূহ্ সম্পর্কে কাযী সানাউল্লাহ্ (র)-র উপাদেয় বক্তব্য : তফসীরে মাযহারীর বরাত দিয়ে নফ্স ও রূহের স্বরূপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা সূরা হিজরের আয়াতে

উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) এ স্থলে লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব তথ্যের মধ্যে অনেক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের নফ্স উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা গঠিত একটি সূক্ষ্ম দেহ, যা তার জড় দেহে নিহিত আছে। দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদগণ একেই রূহ্ বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের রূহ্ একটি অশরীরী আল্লাহ্র নৈপুণ্য, যা নফসের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে এবং নফসের জীবন এর উপরই নির্ভরশীল। ফলে এটা যেন রূহের রূহ্। কারণ, দেহের জীবন নফ্সের উপর এবং নফ্সের জীবন এর উপর নির্ভরশীল। নফ্সের সাথে এই রূহের যে সম্পর্ক, তার স্বরূপ স্রষ্টা ব্যতীত কেউ জানে না। নফ্সকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এমন একটি আয়না সদৃশ করেছেন, যাকে সূর্যের বিপরীতে রেখে দেওয়া হয়েছে। সূর্যের আলো তাতে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে সে নিজেও সূর্যের ন্যায় আলো বিকিরণ করে। মানুষের নফ্স যদি ওহীর শিক্ষা অনুযায়ী সাধনা ও পরিশ্রম করে তবে সে নিজেও আলোকিত হয়ে যায়। নতুবা সে জড় দেহের বিরূপ প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এই সূক্ষ্ম দেহ তথা নফসকেই ফেরেশতাগণ উপরে নিয়ে যায়। অতঃপর সম্মান সহকারে নিচে আনে যদি সে আলোকিত হয়ে থাকে। নতুবা তার জন্য আকাশের দ্বার খুলে না এবং উপর থেকেই নিচে সজোরে নিক্ষেপ করা হয়। এই সূক্ষ্ম দেহ সম্পর্কেই উপরোক্ত হাদীসে আছে যে, আমি একে পৃথিবীর মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি, এতেই ফিরিয়ে আনব এবং পুনরায় এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করব। এই সূক্ষ্ম দেহই সৎ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আলোকিত ও সুগন্ধযুক্ত হয়ে যায় এবং কুফর ও শিরকের মাধ্যমে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। জড় দেহের সাথে অশরীরী রূহের সম্পর্ক সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ নফ্সের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। অশরীরী রূহ্ মৃত্যুর আওতায় পড়ে না। কবরের আযাব এবং সওয়াবও নফ্সের সাথে জড়িত থাকে। কবরের সাথে এ নফ্সেরই সম্পর্ক থাকে এবং অশরীরী রূহ্ ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করে পরোক্ষভাবে নফ্সের সওয়াব এবং আযাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এভাবে রূহ্ কবরে থাকে কথাটি নফ্স কবরে থাকে অর্থে বিশুদ্ধ এবং নফ্স রূহ্ জগতের অথবা ইল্লিয়্যীনে থাকে কথাটি রূহ্ থাকে অর্থে নির্ভুল। এর ফলে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের অসামঞ্জস্য দূর হয়ে যায়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা, এতে প্রথম ফুঁৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্তি, দ্বিতীয় ফুঁৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের পুনঃ সৃষ্টি এবং এ সম্পর্কে কাফিরদের আপত্তি ও তার জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে বলা হয়েছে : فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ — ساهرة

অর্থ সমতল ময়দান। কিয়ামতে পুনরায় যে ভূপৃষ্ঠ সৃষ্টি করা হবে, তা সমতল হবে, এতে উঁচু-নিচু, পাহাড়-পর্বত, টিলা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। একেই ساهرة বলা হয়েছে। অতঃপর কিয়ামত অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা ও শত্রুতার ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) যে মর্মপীড়া অনুভব করতেন, তা দূর করার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ) ও ফিরাউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুরা কেবল আপনাকেই কষ্ট দেয়নি, পূর্ববর্তী

পয়গম্বরগণও শত্রুদের পক্ষ থেকে দারুণ মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। তাঁরা সবর করেছেন। অতএব, আপনারও সবর করা উচিত।

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى — نكال -শব্দের অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যা দেখে অন্যরাও আতঙ্কিত হয়ে যায়। نكال الاخرة হল ফিরাউনের পরকালীন আযাব এবং نكال الاولى -দরিয়ায় নিমজ্জিত হওয়ার আযাব। অতঃপর মরে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবন কিরূপে হবে! কাফিরদের এই বিস্ময়ের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃজিত বস্তুসমূহের উল্লেখ করে অনবধান মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যে মহান সত্তা কোনরূপ উপকরণ ও হাতিয়ার ব্যতিরেকেই এসব মহাসৃষ্টিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি যদি এগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্তির পর পুনরায় সৃষ্টি করে দেন, তবে এতে বিস্ময়ের কি আছে? এরপর আবার কিয়ামত দিবসের কঠোরতা, প্রত্যেকের আমলনামা সামনে আসা এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের ঠিকানা বর্ণনা করা হয়েছে। অবশেষে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের বিশেষ বিশেষ আলামত উল্লিখিত হয়েছে, যদ্দারা একজন মানুষ দুনিয়াতেই ফয়সালা করতে পারে যে, 'আইনের দৃষ্টিতে' তার ঠিকানা জান্নাত, না জাহান্নাম। আইনের দৃষ্টিতে বলার কারণ এই যে, অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, কারও সুপারিশে অথবা সরাসরি আল্লাহ্র রহমতে কোন কোন জাহান্নামীকে জান্নাতে পৌঁছানো হবে। কারও বেলায় এরূপ হলে সেটা হবে ব্যতিক্রমধর্মী আদেশ। জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার আসল বিধি তাই, যা এসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى প্রথমে জাহান্নামীদের দুটি বিশেষ আলামত বর্ণিত হয়েছে।

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا——এক. আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করা। দুই. পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া অর্থাৎ যে কাজ অবলম্বন করলে দুনিয়াতে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু পরকালে তার জন্য আযাব নির্দিষ্ট আছে, সে ক্ষেত্রে পরকালের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অগ্রাধিকার দেওয়া। দুনিয়াতে যে ব্যক্তির মধ্যে এই দুটি আলামত পাওয়া যায়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে: فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى —অর্থাৎ জাহান্নামই তার ঠিকানা। এরপর জান্নাতীদেরও দুটি বিশেষ আলামত বর্ণনা করা হয়েছে: وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى

النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى —এক. দুনিয়াতে প্রত্যেক কাজের সময় এরূপ ভয় করা যে, একদিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হয়ে এ কাজের হিসাব দিতে হবে। দুই. অবৈধ খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এই দুটি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, কোরআন পাক তাকে সুসংবাদ দেয়ঃ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى — অর্থাৎ জান্নাতই তার ঠিকানা।

খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার তিন স্তরঃ আলোচ্য আয়াতে জান্নাত ঠিকানা হওয়ার দুটি শর্ত ব্যক্ত করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ফলাফলের দিক দিয়ে এগুলো একই শর্ত। কারণ, প্রথম শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহির ভয় এবং দ্বিতীয় শর্ত নিজেকে খেয়াল-খুশী থেকে বিরত রাখা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র ভয়ই মানুষকে খেয়াল-খুশীর অনুসরণ থেকে বিরত রাখে। কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন।

প্রথম স্তর এই যে, যেসব ভ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাস কোরআন, হাদীস এবং ইজমার বিপরীত, সেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা। কেউ এই স্তরে পৌঁছলেই সে সুন্নী মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য হয়।

মধ্যম স্তর এই যে, কোন গোনাহ্ করার সময় আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহির কথা চিন্তা করে গোনাহ্ থেকে বিরত থাকা। সন্দেহজনক কাজ থেকেও বিরত থাকা এবং কোন জায়েয কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে কোন নাজায়েয কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে সেই জায়েয কাজ থেকে বিরত থাকাও এই মধ্যম স্তরের পরিশিষ্ট। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকে, সে তার আবরু ও ধর্মকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হয়, সে পরিশেষে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। যে কাজে জায়েয ও নাজায়েয উভয়বিধ সম্ভাবনা থাকে তাকেই সন্দেহজনক কাজ বলা হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে সন্দেহ দেখা দেয় যে, কাজটি তার জন্য জায়েয না নাজায়েয। উদাহরণত জনৈক রুগ্ন ব্যক্তি অযু করতে সক্ষম কিন্তু অযু করা তার জন্য ক্ষতিকরই হবে এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস নেই। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয কিনা, তা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে কিন্তু খুব বেশী কষ্ট হয়। এমতাবস্থায় বসে নামায পড়া জায়েয কিনা তা সন্দিগ্ধ হয়ে গেল। এরূপ ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে নিশ্চিত জায়েয কাজ করা তাকওয়া এবং খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার মধ্যম স্তর।

নফসের চক্রান্তঃ যেসব বিষয় প্রকাশ্য গোনাহ্, সেসব বিষয়ে খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা করার চেষ্টা করলে যে কেউ নিজে নিজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু খেয়াল-খুশী এমনও রয়েছে, যেগুলো ইবাদত ও সৎ কর্মে শামিল হয়ে যায়। রিয়া, নাম-যশ, আত্মপ্রীতি এমন সূক্ষ্ম গোনাহ্ ও খেয়াল-খুশী, যাতে মানুষ প্রায়শই ধোঁকা খেয়ে নিজের কর্মকে

সঠিক ও বিশুদ্ধ মনে করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা করাই সর্ব-প্রথম ও সর্বাধিক জরুরী। কিন্তু এ থেকে আত্মরক্ষা করার একটি মাত্র অব্যর্থ ও অমোঘ ব্যবস্থাপত্র আছে। তা এই যে, এমন শায়খে-কামেল তালাশ করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে, যিনি কোন সুদক্ষ শায়খের সংসর্গে থেকে সাধনা করেছেন এবং নফসের দোষত্রুটি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন।

শায়খ-ইমাম ইয়াকুব কারখী (র) বলেন ঃ আমি প্রথম বয়সে কাঠমিস্ত্রী ছিলাম। আমি নিজের মধ্যে এক প্রকার শৈথিল্য ও অন্ধকার অনুভব করে কয়েকদিন রোযা রাখার ইচ্ছা করলাম, যাতে এই অন্ধকার ও শৈথিল্য দূর হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এই রোযা রাখা অবস্থায় আমি একদিন শায়খে-কামেল ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র)-র খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি মেহমানদের জন্য গৃহ থেকে আহার্য আনালেন এবং আমাকেও খাওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশীর বান্দা, সে অত্যন্ত মন্দ বান্দা। এই খেয়াল-খুশী তাকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ে। তিনি আরও বললেন ঃ খেয়াল-খুশীর অনুসারী হয়ে যে রোযা রাখা হয়, তার চেয়ে খানা খেয়ে নেওয়াই উত্তম। এসব কথাবার্তা শুনে আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আমি আত্মপ্রীতির শিকার হচ্ছিলাম এবং শায়খ তা ধরে ফেলেছেন। তখন আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, যিক্‌র-আযকার ও নফল ইবাদতে কোন শায়খে-কামেলের অনুমতি ও নির্দেশ দরকার। কেননা, শায়খে-কামেল নফসের চক্রান্ত জানেন, বুঝেন। যে নফল ইবাদতে নফসের চক্রান্ত থাকবে, তিনি তা করতে নিষেধ করবেন। আমি শায়খের নিকট আরয করলাম, হযরত, পরিভাষায় যাকে ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ বলা হয়, এরূপ শায়খ পাওয়া না গেলে কি করতে হবে? শায়খ বললেন ঃ এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের পর বিশবার করে দৈনিক একশ বার ইস্তেগফার করা উচিত। কেননা, রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ আমি মাঝে মাঝে অন্তরে মলিনতা অনুভব করি। তখন আমি প্রত্যহ একশ বার ইস্তেগফার অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার তৃতীয় স্তর এই যে, অধিক যিক্‌র, অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে নফসকে এমন পবিত্র করা, যাতে খেয়াল-খুশীর চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট না থাকে। এটা বিশেষ ওলীদের স্তর এবং তা সেই ব্যক্তিরই হাসিল হয়, যাকে সূফী বুযুর্গগণের পরিভাষায় ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ বলা হয়। এই শ্রেণীর ওলীগণের সম্পর্কেই কোরআনে শয়তানকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ —অর্থাৎ আমার বিশেষ বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না। এক হাদীসেও তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به —অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ততক্ষণ কামেল মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ তার খেয়াল-খুশী আমার শিক্ষার অনুসারী না হয়ে যায়।

কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ও সময় বলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করত। সূরার উপসংহারে তাদের এই হঠকারিতার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার রহস্য বলে এ বিষয়ের জ্ঞান নিজের জন্যই নির্দিষ্ট রেখেছেন। এই সংবাদ কোন ফেরেশতা অথবা রসূল (সা)-কে তিনি দেন নি। কাজেই এ দাবী অসার।

سورة عبس

সূরা আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৪২ আয়াত, ১ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ (١) اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى (٢) وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ (٣) اَوْ يَذَّكَّرُ
فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى (٤) اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى (٥) فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى (٦) وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا
يَزَّكّٰى (٧) وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى (٨) وَهُوَ يَخْشٰى (٩) فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى (١٠) كَلَّآ اِنَّهَا
تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ (١٢) فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (١٣) مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (١٤) بِاَيْدِيْ
سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦) قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ (١٧) مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ (١٨)
مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ (١٩) ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ (٢٠) ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ (٢١) ثُمَّ
اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ (٢٢) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ (٢٣) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ (٢٤)
اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا (٢٧) وَّعِنَبًا
وَّقَضْبًا (٢٨) وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا (٢٩) وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا (٣٠) وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا (٣١) مَّتَاعًا
لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ (٣٢) فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ (٣٤)
وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ
يُّغْنِيْهِ (٣٧) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَوُجُوْهٌ
يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤١) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (٤٢)

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (২) কারণ, তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল। (৩) আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ তার উপকার হত। (৫) পরন্তু যে বেপরোয়া, (৬) আপনি তার চিন্তায় মশগুল। (৭) সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। (৮) যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো (৯) এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, (১০) আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। (১১) কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবাণী। (১২) অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে কবূল করবে। (১৩—১৪) এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ, পবিত্র পত্রসমূহে, (১৫) লিপিকারের হস্তে, (১৬) যারা মহৎ, পূতঃ চরিত্র। (১৭) মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ! (১৮) তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুপরিমিত করেছেন তাকে (২০) অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন, (২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে। (২২) এরপর যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (২৩) সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি। (২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। (২৫) আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি। (২৬) এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। (২৭) অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, (২৮) আঙুর, শাক-সবজি, (২৯) যয়তুন, খর্জুর, (৩০) ঘন উদ্যান, (৩১) ফল এবং ঘাস (৩২) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (৩৩) অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, (৩৪) সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, (৩৫) তার মাতা, তার পিতা, (৩৬) তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। (৩৭) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (৩৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, (৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল। (৪০) এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত। (৪১) তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। (৪২) তারাই কাফির পাপিষ্ঠের দল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে-নুযূল : এসব আয়াত অবতরণের কাহিনী এই যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিসে বসে কিছু মুশরিক সরদারকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাদের এই নামও বর্ণিত আছে—আবূ জাহ্ল ইবনে হিশাম, ওতবা ইবনে রবীয়া, উবাই ইবনে খলফ, উমাইয়া ইবনে খলফ। ইতিমধ্যে অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিছু জিজ্ঞেস করলেন। এই বাক্য বিরতিতে তিনি বিরক্তিবোধ করলেন এবং তার দিকে তাকালেন না। তাঁর চোখে-মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল। যখন তিনি মজলিস ত্যাগ করে গৃহে রওয়ানা হলেন, তখন ওহীর লক্ষণাদি ফুটে উঠল এবং আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হল। এই ঘটনার পর যখনই এই অন্ধ সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আসতেন, তখনই তিনি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন।—(দুররে মনসুর) আয়াতে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

পয়গম্বর (সা) ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং তাকালেন না। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। (এখানে অনুপস্থিত পদবাচ্যে বলা হয়েছে। এতে বক্তার চরম দয়া ও অনুকম্পা এবং প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে। কারণ, এতে প্রতিপক্ষকে মুখোমুখি দোষারোপ করা হয়নি। অতঃপর বিমুখতার সন্দেহ দূরীকরণার্থে উপস্থিত পদবাচ্যে বলা হচ্ছে ঃ) আপনি কি জানেন যে (অর্থাৎ অন্ধ সাহাবী আপনার শিক্ষা দ্বারা) হয়তো (পুরোপুরি) শুদ্ধ হত অথবা (কমপক্ষে কোন বিশেষ ব্যাপারে) উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশে তার (কিছু না কিছু) উপকার হত। পরন্তু যে ব্যক্তি (ধর্ম থেকে) বেপরোয়া আপনি তার চিন্তায় মশগুল হন। অথচ সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। (তার বেপরোয়া ভাব উল্লেখ করে তার প্রতি বেশী মনোযোগী না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)। যে ব্যক্তি আপনার কাছে (দীনের আগ্রহে) দৌড়ে আসে এবং সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আপনি তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। [এসব আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর ইজতিহাদী ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এই ইজতিহাদের উৎস ছিল এই যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগে সম্পাদন করাই সর্বজনস্বীকৃত। রসূলুল্লাহ্ (সা) কুফরের তীব্রতাকে গুরুত্বের কারণ মনে করেছেন। উদাহরণত যদি ডাক্তারের কাছে একজন কলেরা রোগী ও একজন সর্দিরোগী একই সময়ে উপস্থিত হয়, তবে কলেরা রোগীর চিকিৎসা অগ্রাধিকার পাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলার উক্তির সারমর্ম এই যে, রোগের তীব্রতা তখনই গুরুত্বের কারণ হবে, যখন উভয় রোগী চিকিৎসা প্রত্যাশী হয়। কিন্তু গুরুতর রোগী যদি চিকিৎসা প্রত্যাশীই না হয় বরং চিকিৎসার বিরোধিতা করে, তবে যে রোগী চিকিৎসা প্রত্যাশী সে-ই অগ্রাধিকার পাবে যদিও তার রোগ খুব হাল্কা হয়। অতঃপর মুশরিকদের প্রতি এত বেশী মনোযোগী না হওয়ার কথা বলা হচ্ছে ঃ আপনি ভবিষ্যতে] কখনও এরূপ করবেন না। (কেননা) কোরআন (নিছক একটি) উপদেশবাণী। (আপনার দায়িত্ব কেবল প্রচার করা)। অতএব, যে ইচ্ছা করবে সে একে কবূল করবে। (যে কবূল করবে না, তার কারণে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। এমতাবস্থায় আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? অতঃপর কোরআনের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যে) এটা (অর্থাৎ কোরআন লওহে মাহ্ফূযের) সম্মানিত, (অর্থাৎ পছন্দনীয় ও মকবুল) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন (কেননা, লওহে মাহ্ফূয আরশের নিচে অবস্থিত) পবিত্র সহীফাসমূহে লিখিত আছে (দুর্মতি শয়তান সেখানে পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ لَا يَمَسُّهٗٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ) মহৎ ও পূতঃ চরিত্র লিপিকারদের (অর্থাৎ ফেরেশতাগণের) হস্তে।

[এসব গুণ জ্ঞাপন করে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র কিতাব। লওহে-মাহ্ফূযে একই বস্তু। কিন্তু এর অংশসমূহকে সুহুফ (সহীফাসমূহ) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফেরেশতাগণকে লিপিকার বলা হয়েছে। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র আদেশে লওহে মাহ্ফূয থেকে লিপিবদ্ধ করে। আয়াতসমূহের সারমর্ম এই যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপদেশবাণী। আপনি উপদেশ শুনিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবেন—কেউ ঈমান আনুক বা না আনুক। সুতরাং এ ধরনের

অগ্রাধিকার দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর কাফিরদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে যে] মানুষ (অর্থাৎ কাফির মানুষ, যারা এহেন উপদেশবাণী দ্বারা উপকৃত হয় না, যেমন আবূ জাহ্ল প্রমুখ। তারা) ধ্বংস হোক। সে কত অকৃতজ্ঞ! (সে দেখে না যে) আল্লাহ্ তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন, (অর্থাৎ তুচ্ছ বস্তু) শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) সুপরিমিত করেছেন, অতঃপর তার (বের হওয়ার) পথ সহজ করেছেন। (সেমতে এমন অপ্রশস্ত জায়গা দিয়ে এমন সুঠাম শিশুর নির্বিঘ্নে বের হয়ে আসা আল্লাহ্র ক্ষমতা ও শক্তিমত্তাই জ্ঞাপন করে)। অতঃপর (বয়স শেষ হলে) তার মৃত্যু ঘটান এবং কবরস্থ করেন। এরপর যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র এসব কর্ম প্রমাণ করে যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের অধীন এবং তাঁর নিয়ামত ভোগ করে। সুতরাং তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনা জরুরী ছিল। কিন্তু) সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি এবং তিনি যে আদেশ করেছিলেন, তা পূর্ণ করেনি। অতএব, মানুষ (তার সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করার পর বেঁচে থাকা ও আরাম-আয়েশ করার উপকরণাদির প্রতি লক্ষ্য করুক। উদাহরণত সে) তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, (যাতে তা কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য ও ঈমান আনার কারণ হয়। অতঃপর লক্ষ্য করার নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে যে) আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খর্জুর, ঘন উদ্যান, ফল ও ঘাস। (কিছু) তোমাদের ও (কিছু) তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (এগুলো নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণ। এগুলোর প্রত্যেকটি কৃতজ্ঞতা ও ঈমান দাবী করে, অতঃপর উপদেশ কবুল না করার শাস্তি ও কবুল করার সওয়াব উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ এখন তো তারা অকৃতজ্ঞতা ও কুফর করে) অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, (অর্থাৎ কিয়ামত শুরু হবে, তখন সব অকৃতজ্ঞতার মজা টের পেয়ে যাবে। অতঃপর সেদিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে) সেদিন (উপরে বর্ণিত) মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা, মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে। (অর্থাৎ কেউ কারও প্রতি দরদ দেখাবে না, যেমন অন্য আয়াতে আছে لَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا—কারণ) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে অপর থেকে নির্লিপ্ত রাখবে। (অতঃপর মু'মিনদের ও কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন (ঈমানের কারণে) উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল হবে এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন কুফরের কারণে, ধূলি ধূসরিত হবে। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফির, পাপাচারীর দল। (কাফির বলে ভ্রান্ত বিশ্বাসী এবং পাপাচারী বলে ভ্রান্ত কর্মী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নুযূলে বর্ণিত অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে-মকতুম (রা)-এর ঘটনায় ইমাম বগভী (র) আরও রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) অন্ধ হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেন নি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন।

তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আওয়াজ দিতে শুরু করেন এবং বারবার আওয়াজ দেন।—(মাযহারী) ইবনে কাসীরের এক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআনের একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞেস করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মক্কার কাফির নেতৃবর্গকে উপদেশ দানে মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রবীয়া, আবূ জাহ্ল ইবনে হিশাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হন নি। এরূপ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা)-র এভাবে কথা বলা এবং আয়াতের ভাষায় ঠিক করা মামুলী প্রশ্ন রেখে তাৎক্ষণিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ্ (রা) পাক্কা মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তার এই জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না। এর বিপরীত কোরায়েশ নেতৃবর্গ সব সময় মজলিসে আগমন করতো না এবং যে কোন সময় তাদের কাছে তবলীগও করা যেত না। এ সময়ে তারা মনোনিবেশ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করছিল। ফলে তাদের ঈমান আনা আশাতীত ছিল না। তাদের কথাবার্তা কেটে দিলে ঈমানের আশাই সুদূরপরাহত ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতির কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা)-কে আমল দেন নি এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিনি কাফির নেতৃবর্গের সাথে কথাবার্তা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর মজলিস সমাপ্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কর্ম-পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করে তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই কর্মপদ্ধতি নিজস্ব ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, যে মুসলমান কথাবার্তায় মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করে, তাকে কিছু হুঁশিয়ার করা দরকার, যাতে সে ভবিষ্যতে মজলিসের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখে। এ কারণে তিনি আবদুল্লাহ্র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এছাড়া কুফর ও শিরক বাহ্যত সর্ববৃহৎ গোনাহ্। এর অবসানের চিন্তা আগে হওয়া উচিত। আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা) তো ধর্মের একটি শাখাগত বিষয়ের শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন মাত্র কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ইজতিহাদকে সঠিক আখ্যা দেন নি এবং হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি ধর্মীয় শিক্ষার প্রত্যাশী হয়ে প্রশ্ন করেছিল, তার জওয়াবের উপকারিতা নিশ্চিত, আর যে বিরুদ্ধবাদী, কথা শুনতেও নারাজ, তার সাথে কথা বলার উপকারিতা অনিশ্চিত। অতএব অনিশ্চিতকে নিশ্চিতের উপর কিরূপে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়? এটা সত্যি যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা) মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন কিন্তু কোরআন أَعْمَىٰ -শব্দ ব্যবহার করে তাঁর ওযর বর্ণনা করে দিয়েছে যে, তিনি অন্ধ ছিলেন। তাই দেখতে সক্ষম ছিলেন না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এখন কি কাজে মশগুল আছেন এবং কাদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে। সুতরাং তিনি ক্ষমার্হ ছিলেন এবং বিমুখতা প্রদর্শনের পাত্র ছিলেন না। এ থেকে জানা যায়

যে, কোন অপারক ব্যক্তির দ্বারা অজ্ঞাতসারে মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা নিন্দার্হ হবে না।

عَبَسَ وَتَوَلَّى—প্রথম শব্দের অর্থ রুক্ষতা অবলম্বন করা এবং চোখে-মুখে বিরক্তি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটা মুখোমুখি সম্বোধন করে উপস্থিত পদবাচ্য দ্বারা এসব কথা বলার স্থান ছিল। কিন্তু তা না করে কোরআন পাক অনুপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করেছে। এতে ভর্ৎসনার স্থলেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, কাজটি যেন অন্য কেউ করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এরূপ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয়নি। পরবর্তী وَمَا يُدْرِيكَ (আপনি কি জানেন?) বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওযরের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, আপনার মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হয়নি যে, সাহাবীর জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপকারিতা নিশ্চিত এবং কাফিরদের সাথে আলোচনার উপকারিতা অনিশ্চিত। এ বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্যের পরিবর্তে উপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করার মধ্যেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে। কেননা, যদি কোথাও উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা না হত, তবে সন্দেহ হতে পারত যে, এই কর্মপদ্ধতি অপছন্দ করার কারণেই মুখোমুখি সম্বোধন বর্জন করা হয়েছে। এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য অসহনীয় কষ্টের কারণ হত। সুতরাং প্রথম বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয় বাক্যে উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা—উভয়টির মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে।

لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى—অর্থাৎ আপনি কি জানেন, এই সাহাবী যা জিজ্ঞাসা করছিল, তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তদ্দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে পারত কিংবা কমপক্ষে আল্লাহ্কে স্মরণ করে প্রাথমিক উপকার লাভ করতে পারত। ذِكْرَى-শব্দের অর্থ আল্লাহ্কে বহুল পরিমাণে স্মরণ করা।—(সিহাহ্)

এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে— يَزَّكَّى ও يَذَّكَّرُ— প্রথমটির অর্থ পাক-পবিত্র হওয়া এবং দ্বিতীয়টির অর্থ উপদেশ লাভ করা। প্রথমটি সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্ভীরুদের স্তর। যারা নফ্সকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার নোংরামি থেকে পাক-সাফ করে নেয় এবং দ্বিতীয়টি ধর্মের পথে চলার প্রথম স্তর। কারণ, যে আল্লাহ্র পথে চলা শুরু করে, তাকে আল্লাহ্র স্মরণে নিয়োজিত করা হয়- -যাতে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভয় তার মনে উপস্থিত থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, এই সাহাবীকে শিক্ষা দিলে তাতে এক না এক উপকার হতই—প্রথমটি, না হয় দ্বিতীয়টি। উভয় প্রকার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। —(মাযহারী)

প্রচার ও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কোরআনী মূলনীতিঃ এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে একই সময়ে দু'টি কাজ উপস্থিত হয়—১. একজন মুসলমানকে শিক্ষা দান ও তার মনস্তুষ্টি বিধান এবং ২. অমুসলমানদের হিদায়তের দিকে মনোযোগ। কোরআন পাকের ইরশাদ একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, প্রথম কাজটি দ্বিতীয় কাজের অগ্রে সম্পাদন করতে হবে এবং দ্বিতীয় কাজের কারণে প্রথম কাজে বিলম্ব করা অথবা ত্রুটি করা বৈধ নয়। এ থেকে জানা গেল যে, মুসলমানদের শিক্ষা ও সংশোধনের চিন্তা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা থেকে অধিক গুরুত্ববহ ও অগ্রণী।

এতে সেসব আলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ রয়েছে, যারা অমুসলমানদের সন্দেহ দূরীকরণ এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার খাতিরে এমন সব কাণ্ড করে বসেন, যদ্দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের মনে সন্দেহ-সংশয় অথবা অভিযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের উচিত এই কোরআনী দিক নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদের সংরক্ষণ ও অবস্থা সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আকবর এলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেন ঃ

بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم اس سے بچو
دیر والے کج ادا کہدیں یہ بد نامی بھلی

পরবর্তী আয়াতসমূহে কোরআন পাক এ বিষয়টিই পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে।

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার ধর্মের প্রতি বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় মশগুল আছেন যে, সে কোনরূপে মুসলমান হোক। অথচ এটা আপনার দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অন্বেষণে দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আল্লাহ্‌কে ভয়ও করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষা সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাকাপোক্ত মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কোরআন যে উপদেশবাণী এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ — صحف বলে লওহে মাহ্ফুয বোঝানো হয়েছে। এটা যদিও এক বস্তু কিন্তু সমস্ত ঐশী সহীফা এতে লিখিত আছে বলে একে বহু-বচনে প্রকাশ করা হয়েছে। مرفوعة-বলে এর উচ্চমর্যাদা বোঝানো হয়েছে এবং مطهرة-বলে বোঝানো হয়েছে যে, নাপাক মানুষ, হায়েয ও নেফাসওয়ালী নারী এবং অযুহীন ব্যক্তি একে স্পর্শ করতে পারে না।

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ — سفرة-শব্দটি سافر এর বহুবচন হতে পারে। অর্থ

হবে লিপিকার। এমতাবস্থায় এই শব্দ দ্বারা ফেরেশতা কেরামুন-কাতেবীন অথবা পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের ওহী লেখকগণকে বোঝানো হবে। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র)-এর তফসীর।

سَفَرَةٍ-শব্দটি سَفِيرٌ-এর বহুবচনও হতে পারে। অর্থ দূত। এমতাবস্থায় এর দ্বারা দূত ফেরেশতা, পয়গম্বরগণ এবং ওহী লেখক সাহাবায়ে কিরামকে বোঝানো হয়েছে। আলিমগণও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কেননা তাঁরাও রসূলুল্লাহ্ (সা) ও উম্মতের মধ্যবর্তী দূত। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিরা'আতে বিশেষজ্ঞ কোরআন পাঠকও এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ নয় কিন্তু কষ্টে-সৃষ্টে কিরা'আত শুদ্ধ করে নেয়, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে, কিরা'আতের সওয়াবও কষ্ট করার সওয়াব। এ থেকে জানা গেল যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনেক সওয়াব পাবে।—(মাযহারী)

অতঃপর মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব নিয়ামত ভোগ করে, সেসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুভূত বিষয়। সামান্য চেতনাশীল ব্যক্তিও এগুলো বুঝতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথমে مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ বলে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, হে মানুষ, চিন্তা কর, আল্লাহ্ তোমাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের জওয়াব নির্দিষ্ট—অন্য কোন জওয়াব হতেই পারে না। তাই নিজেই জওয়াব দিয়েছেন ঃ مِنْ نُطْفَةٍ—অর্থাৎ মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ—অর্থাৎ কেবল বীর্য থেকে মানুষকে সৃষ্টিই করেন নি বরং তাকে সুপরিমিতও করেছেন। তার গঠনপ্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, গ্রন্থি, চক্ষু, নাক, কান ইত্যাদি এমন সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটু এদিক-সেদিক হলে মানুষের আকৃতিই বিগড়ে যেত এবং কাজকর্ম দুরূহ হয়ে যেত।

قَدَّرَهُ-শব্দের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হতে থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চারটি বিষয়ের পরিমাণ লিখে দেন। ১. সে কি কি কাজ করবে এবং কিরূপে করবে, ২. তার বয়স কত হবে, ৩. কি পরিমাণ রিযিক পাবে এবং ৪. পরিণামে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা হবে।—(বুখারী, মুসলিম)

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে মাতৃগর্ভের তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এবং সংরক্ষিত জায়গায় মানুষকে সৃষ্টি করেন। যার গর্ভে এই সৃষ্টিকর্ম চলে, সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানে না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার অপার

শক্তিই এই জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। চার-পাঁচ পাউণ্ড ওজনের দেহটি সহীসালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোন দৈহিক ক্ষতি হয় না।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ—নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করার পর পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যু ও কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোন বিপদ নয়—নিয়ামত। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ মৃত্যু মু'মিনের জন্য উপঢৌকনস্বরূপ। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। فَاَقْبَرَهٗ অর্থাৎ অতঃপর তাকে কবরস্থ করেছেন। বলা বাহুল্য, এটাও এক নিয়ামত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় যেখানে মরে সেখানেই পচে গলে যেতে দেন নি বরং তাকে গোসল দিয়ে পাক-সাফ কাপড় পরিয়ে সম্মান সহকারে কবরে দাফন করে দেওয়া হয়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, মৃত মানুষকে দাফন করা ওয়াজিব।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهٗ—এতে অবিশ্বাসী মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র উপরোক্ত নিদর্শনাবলী ও নিয়ামতরাজির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর বিধানাবলী পালন করা। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি। অতঃপর মানবসৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তির মাঝখানে যেসব নিয়ামত মানুষ ভোগ করে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের রিযিক কিভাবে সৃষ্টি করা হয়? কিভাবে আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়ে মাটির নিচে চাপাপড়া বীজকে সজীব ও সতেজ করে তোলে। ফলে একটি সরু ও ক্ষীণকায় অংকুর মাটি ভেদ করে উপরে উঠে। অতঃপর তা থেকে হরেক রকমের শস্য, ফল-মূল ও বাগ-বাগিচা সৃষ্টি হয়। এসব নিয়ামত সম্পর্কে মানুষের বারবার অবহিত করার পর পরিশেষে আবার কিয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ—صاخة এমন কঠোর নাদ, যার ফলে মানুষ শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলে। এখানে কিয়ামতের হট্টগোল তথা শিংগার ফুঁক বোঝানো হয়েছে।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ— এখানে হাশরের ময়দানে সকলের সমাবেশের দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়াতে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন

দিতে কুণ্ঠিত হয় না, হাশরে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারও খবর নিতে পারবে না বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে—পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশী পিতামাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশী স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হাশরের ময়দানে মু'মিন ও কাফিরের পরিণতি বর্ণনা করে সূরার ইতি টানা হয়েছে।

سورة التكوير

সূরা তাকভীর

মক্কায় অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا
الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦ وَإِذَا النُّفُوسُ
زُوِّجَتْ ۝٧ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَإِذَا الصُّحُفُ
نُشِرَتْ ۝١٠ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝١١ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝١٤ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝١٦ وَاللَّيْلِ
إِذَا عَسْعَسَ ۝١٧ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝١٩ ذِي قُوَّةٍ
عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝٢٠ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝٢١ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ۝٢٢
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝٢٣ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝٢٤ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ
شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۝٢٥ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝٢٦ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝٢٧ لِمَن شَاءَ
مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۝٢٨ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٢٩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, (২) যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, (৩) যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, (৪) যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে, (৫) যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, (৬) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৭) যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে, (৮) যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, (৯) কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? (১০) যখন আমলনামা খোলা হবে

(১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, (১২) যখন জাহান্নামে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে (১৩) এবং যখন জান্নাত, সন্নিকটবর্তী হবে, (১৪) তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি উপস্থিত করেছে। (১৫) আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়, (১৬) চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়, (১৭) শপথ নিশাবসান ও (১৮) প্রভাত আগমনকালের, (১৯) নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী, (২০) যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, (২১) সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন। (২২) এবং তোমাদের সাথী পাগল নন। (২৩) তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। (২৪) তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপণতা করেন না। (২৫) এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। (২৬) অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? (২৭) এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ, (২৮) তার জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। (২৯) তোমরা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন সূর্য জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র খসিত হবে, যখন পর্বতমালা চালিত হবে যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলো উপেক্ষিত হবে, যখন বন্য জন্তুরা (অস্থির হয়ে) একত্রিত হবে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (এই ছয়টি ঘটনা প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেওয়ার সময় হবে। তখন দুনিয়া জনবসতিপূর্ণ হবে এবং শিংগা ফুঁকের ফলে এসব বিবর্তন সংঘটিত হবে। উষ্ট্রী ইত্যাদিও স্ব-স্ব অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে এবং কতকগুলো উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসবের নিকটবর্তী হবে। এ ধরনের উষ্ট্রী আরবদের কাছে সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। তারা সর্বক্ষণ এগুলোর দেখাশোনা করে। কিন্তু তখন হৈ-হল্লোড়ের মধ্যে কারও কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য থাকবে না। বন্য জন্তুরাও অস্থির হয়ে একদল অপর দলের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যাবে। সমুদ্রে প্রথমে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেবে এবং ভূমিতে ফাটল সৃষ্টি হবে। ফলে সব মিষ্ট ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাবে। وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর উত্তাপের আতিশয্যে সব সমুদ্রের পানি অগ্নিতে পরিণত হবে। সম্ভবত প্রথমে বায়ু হয়ে পরে অগ্নি হয়ে যাবে। এরপর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর যে ছয়টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেওয়ার পর সংঘটিত হবে। ঘটনাগুলো এই) যখন এক এক শ্রেণীর লোককে একত্র করা হবে, (কাফির আলাদা, মুসলমান আলাদা, তাদের মধ্যে এক এক তরীকার লোক আলাদা আলাদা)। যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ? (এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য প্রোথিতকারী নরপিশাচদের অপরাধ প্রকাশ করা) যখন আমলনামা খোলা হবে (যাতে সবাই নিজ নিজ আমল দেখে নেয়, যেমন অন্য আয়াতে আছে : يَلْقَاهُ مَنْشُورًا) যখন আকাশ খুলে যাবে, (ফলে আকাশের উপরিস্থিত বস্তুসমূহ দৃষ্টিগোচর হবে। এছাড়া আকাশ খুলে যাওয়ার ফলে ধূম্ররাশি বর্ষিত হতে থাকবে يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ -আয়াতে

যার উল্লেখ করা হয়েছে)। যখন জাহান্নাম (আরও বেশী) প্রজ্বলিত করা হবে এবং জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে (প্রথম ফুঁক ও দ্বিতীয় ফুঁকের এসব ঘটনা যখন সংঘটিত হয়ে যাবে, তখন) প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি নিয়ে এসেছে। (এই হৃদয়বিদারক ঘটনা যখন হবে, তখন আমি অবিশ্বাসীদেরকে এর স্বরূপ বলে দিচ্ছি এবং বিশ্বাসীদেরকে এর জন্য প্রস্তুত করছি। কোরআন মেনে নিলে এবং তদনুযায়ী কাজকর্ম করলে এই উভয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। কোরআনে এর প্রমাণ এবং মুক্তির পন্থা আছে। তাই) আমি শপথ করি সেসব নক্ষত্রের, যেগুলো (সোজা চলতে চলতে) পশ্চাতে সরে যায় (অতঃপর) পশ্চাতেই (চলমান হয় এবং পশ্চাতে চলতে চলতে এক সময় উদয়াচলে) অদৃশ্য হয়ে যায়। (পাঁচটি নক্ষত্র এরূপ করে। এগুলো কখনও সোজা চলে, কখনও পশ্চাতে চলে। এরা হচ্ছে শনি, বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ)। শপথ নিশা অবসান ও প্রভাত আগমন কালের, (অতঃপর জওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে) এই কোরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতার অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-এর আনীত কালাম, যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের কাছে মর্যাদাশীল, সেখানে (অর্থাৎ আকাশে) তাঁর কথা মান্য করা হয় (অর্থাৎ ফেরেশতারা তাঁকে মানে। মি'রাজের হাদীস থেকেও একথা জানা যায়। তাঁর আদেশেই ফেরেশতাগণ আকাশের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছিল এবং তিনি) বিশ্বাসভাজন (তাই বিশুদ্ধ-ভাবে ওহী পৌঁছিয়ে দেন। অতঃপর যার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে:) তোমাদের সাথী [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) যার অবস্থা তোমরা জান] উন্মাদ নন (নবুয়ত অস্বীকারকারীরা তাই বলত)। তিনি ফেরেশতাকে (আসল আকৃতিতে আকাশের) পরিষ্কার দিগন্তে দেখেছেনও (পরিষ্কার দিগন্ত অর্থ ঊর্ধ্বদিগন্ত, যা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সূরা নজমে আছে وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى)। তিনি অদৃশ্য (অর্থাৎ ওহীর) বিষয়াদিতে কৃপণতা করেন না (অতীন্দ্রিয়বাদীরা তাই করত। তারা অর্থের বিনি-ময়ে কোন বিষয় প্রকাশ করত। এতে করে যেন বলা হয়েছে তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং নিজের কাজের কোন বিনিময় গ্রহণ করেন না)। এটা (অর্থাৎ কোরআন) কোন বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। [এতে পূর্বোক্ত 'অতীন্দ্রিয়বাদী' নন কথাটি আরও জোরদার হয়ে গেছে। সারকথা এই যে, মুহাম্মদ (সা) উন্মাদ নন, অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং অর্থলোভীও নন। তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতাকে চিনেনও। এই ফেরেশতাও অনুরূপ গুণ-সম্পন্ন। সুতরাং এই কোরআন অবশ্যই আল্লাহ্‌র কালাম এবং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল (সা) উপরোক্ত শপথগুলো উদ্দিষ্ট বিষয়ের সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। নক্ষত্রসমূহের সোজা চলা, পশ্চাৎগামী হওয়া ও অদৃশ্য হওয়া ফেরেশতার আগমন-নির্গমন ও ঊর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হওয়ার সাথে মিল রাখে এবং নিশার অবসান ও প্রভাতের আগমন কোরআনের কারণে কুফরের অন্ধকার দূরীভূত হওয়া এবং হিদায়ত জ্যোতির আগমনের অনুরূপ]। অতএব তোমরা (এ ব্যাপারে) কোথায় চলে যাচ্ছ (এবং কেন নবুয়ত অস্বীকার করছ)? এটা তো (সাধারণভাবে) বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ (এবং বিশেষভাবে) এমন ব্যক্তির জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলার ইচ্ছা করে। (কোরআন সোজা পথ বলে দেয়, এদিক

দিয়ে কোরআন সাধারণ লোকদের জন্য হিদায়ত এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়ত এই অর্থে যে, তাদেরকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়। কেউ কেউ কোরআনের উপদেশ গ্রহণ করে না, এতে কোরআন উপদেশবাণী নয় বলে সন্দেহ পোষণ করা যায় না। কেননা) রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের বাইরে তোমরা অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না (অর্থাৎ এটা উপদেশবাণী ঠিকই কিন্তু এর কার্যকারিতা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, যা কতকের জন্য হয় এবং কতকের জন্য রহস্যবশত হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ—تكوير-এর এক অর্থ জ্যোতিহীন হওয়া। হাসান বসরী (র) এই তফসীরই করেছেন। এর অপর অর্থ নিক্ষেপ করাও হয়ে থাকে। রবী ইবনে খায়সাম (র) এই তফসীর করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সূর্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে এবং সূর্যের উত্তাপে সারা সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। এই দুই তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এটা সম্ভবপর যে, প্রথমে সূর্যকে জ্যোতিহীন করে দেওয়া হবে, অতঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। সহীহ্ বুখারীতে আবূ হোরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: কিয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। মসনদে আহমদে আছে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এই আয়াত প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও সমস্ত নক্ষত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন, অতঃপর এর উপর প্রবল বাতাস প্রবাহিত হবে। ফলে সারা সমুদ্র অগ্নি হয়ে যাবে। এভাবে চন্দ্র, সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে—এই উভয় কথাই ঠিক হয়ে যায়। কেননা, সারা সমুদ্র তখন জাহান্নাম হয়ে যাবে।—(মাযহারী, কুরতুবী)

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ—انكدار—এর অর্থ পতিত হওয়া। পূর্ববর্তীগণ থেকে এই তফসীরই বর্ণিত হয়েছে। আকাশের সব নক্ষত্র সমুদ্রে পতিত হবে। পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে এর বিবরণ রয়েছে।

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ—আরবের রীতি অনুযায়ী দৃষ্টান্তস্বরূপ একথা বলা হয়েছে। কেননা, কোরআনে আরবদেরকেই প্রথমে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বিরাট ধনরূপে গণ্য হত। তারা এর দুগ্ধ ও বাচ্চার অপেক্ষা করত। ফলে একে দৃষ্টির আড়াল হতে দিত না এবং কখনও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত না।

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ—تسجير-এর অর্থ অগ্নিসংযোগ করা ও প্রজ্বলিত করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই অর্থই নিয়েছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা। এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রথমে লোনা সমুদ্র ও মিঠা সমুদ্র একাকার করা হবে। মাঝখানের অন্তরায় শেষ করে দেওয়া হবে। ফলে উভয় প্রকার সমুদ্রের পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। অতঃপর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এতে নিক্ষেপ করে সমস্ত পানিকে অগ্নি তথা জাহান্নামে পরিণত করা হবে।— (মাযহারী)

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ—অর্থাৎ যখন হাশরে সমবেত লোকদেরকে বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ করে দেওয়া হবে। এই দলবদ্ধকরণ ঈমান ও কর্মের দিক দিয়ে করা হবে। কাফির এক জায়গায় ও মু'মিন এক জায়গায়। কাফির এবং মু'মিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পার্থক্য থাকে। এদিক দিয়ে কাফিরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মু'মিন-দেরও বিশ্বাস এবং কর্মের ভিত্তিতে দল হবে। বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন, যারা ভাল হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করবে, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। উদাহরণত আলিমগণ এক জায়গায়, ইবাদতকারী সংসারবিমুখগণ এক জায়গায়, জিহাদ-কারী গাযীগণ এক জায়গায় এবং সদ্‌কা-খয়রাতে বৈশিষ্ট্যের অধিকারিগণ এক জায়গায় সমবেত হবে। এমনিভাবে মন্দ লোকদের মধ্যে চোর-ডাকাতকে এক জায়গায়, ব্যভিচা-রীকে এক জায়গায় এবং অন্যান্য বিশেষ গোনাহে অংশগ্রহণকারীদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: হাশরে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বজাতির সাথে থাকবে (কিন্তু এই জাতীয়তা বংশ অথবা দেশভিত্তিক হবে না বরং কর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক হবে)। তিনি এর প্রমাণস্বরূপ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً—আয়াতখানি পেশ করেন। অর্থাৎ হাশরে লোকদের তিনটি প্রধান দল হবে—১. পূর্ববর্তী সৎকর্মী লোকদের, ২. আসহাবুল ইয়ামীনের এবং (৩) আসহাবুশ শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফির পাপাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না।

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ—مَوْءُودَة—এর অর্থ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। মূর্খ আরবরা কন্যাসন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। ইসলাম এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, স্বয়ং কন্যাকেই জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? উদ্দেশ্য এই যে, সে নিজের নির্দোষ ও মজলুম হওয়ার বিষয় আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করুক, যাতে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। এটাও সম্ভবপর যে, জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কে তার হত্যাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা একে কি অপরাধে হত্যা করলে?

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, কিয়ামতের নামই তো يوم الحساب (হিসাব দিবস), يوم الجزاء (প্রতিদান দিবস) ও يوم الدين (বিচার দিবস)।

এতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সব কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এ স্থলে বিশেষভাবে জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কিত প্রশ্নকে এত গুরুত্ব দেওয়ার রহস্য কি? চিন্তা করলে জানা যায় যে, এই মজলুম শিশু কন্যাকে স্বয়ং তার পিতামাতা হত্যা করেছে। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে কোন বাদী নেই, বিশেষত গোপনে হত্যা করার কারণে কেউ জানতেই পারেনি যে সাক্ষ্য দেবে। হাশরের ময়দানে যে ন্যায়বিচারের আদালত কায়েম হবে, তাতে এমন অত্যাচার ও নিপীড়নকেও সর্বসমক্ষে আনা হবে, যার কোন সাক্ষ্য নেই এবং কোন দাবীদার নেই।

চার মাস পর গর্ভপাত করা হত্যার শামিল : শিশুদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করা অথবা হত্যা করা মহাপাপ ও গুরুতর জুলুম এবং চার মাসের পর গর্ভপাত করাও এই জুলুমের শামিল। কেননা, চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং সে জীবিত মানুষের মধ্যে গণ্য হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি গর্ভবতী নারীর পেটে আঘাত করে, ফলে গর্ভপাত হয়ে যায়, উম্মতের ঐকমত্যে তার উপর 'গুররা' ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ একটি গোলাম অথবা তার মূল্য দিতে হবে। যদি জীবিতাবস্থায় গর্ভপাত হয়, এরপর মারা যায়, তবে বয়স্ক লোকের সমান রক্তপণ দিতে হবে। একান্ত অপারকতা না হলে চার মাসের পূর্বেও গর্ভপাত করা হারাম, অবশ্য প্রথমোক্ত হারামের চেয়ে কিছুটা কম। কারণ, এটা কোন জীবিত মানুষের প্রকাশ্য হত্যা নয়।—(মাযহারী)

আজকাল দুনিয়াতে জন্মশাসনের নামে এমন পন্থা অবলম্বন করা হয়, যাতে গর্ভ সঞ্চারই হয় না। এর শত শত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) একেও وأد خفي —অর্থাৎ 'গোপনভাবে শিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা' আখ্যা দিয়েছেন।—(মুসলিম) অন্য কতক রেওয়ায়েতে 'আযল' তথা প্রত্যাহার পদ্ধতির কথা আছে। এতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যাতে বীর্য গর্ভাশয়ে না যায়। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে নীরবতা ও নিষেধ না করা বর্ণিত আছে। এটা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমিত। তাও এভাবে করতে হবে, যাতে স্থায়ী বংশবিস্তার রোধের পদ্ধতি না হয়ে যায়। আজকাল জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে প্রচলিত ঔষধপত্র ও ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে কতগুলো এমন, যদ্দ্বারা সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শরীয়তে কোনক্রমেই এর অনুমতি নেই।

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ —كشط— এর আভিধানিক অর্থ জন্তুর চামড়া খসানো। বাহ্যত এটা প্রথম ফুঁকের সমসাময়িক অবস্থা, যা এই দুনিয়াতেই ঘটবে। আকাশের সৌন্দর্য সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। আকাশের বর্তমান আকার-আকৃতি বদলে যাবে। এই অবস্থাকে كشط -শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ লিখেছেন গুছিয়ে নেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, মাথার উপর ছাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে গুছিয়ে নেওয়া হবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ —অর্থাৎ কিয়ামতের উপরোক্ত পরিস্থিতিতে

প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ সৎ কর্ম কিংবা অসৎ কর্ম—সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে—আমলনামায় লিখিত অবস্থায় অথবা অন্য কোন বিশেষ পন্থায়। হাদীস থেকে এরূপই জানা যায়। কিয়ামতের এসব অবস্থা ও ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকটি নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন যে, এই কোরআন সত্য এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে খুব হিফাযত সহকারে প্রেরিত। যার প্রতি এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি একজন মহাপুরুষ। তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতাকে পূর্ব থেকে চিনতেন, জানতেন। তাই এর সত্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে পাঁচটি নক্ষত্রের শপথ করা হয়েছে। সৌরবিজ্ঞানীদের ভাষায় এগুলোকে خمسة متحيرة -
(অদ্ভুত পঞ্চ নক্ষত্র) বলা হয়। এরূপ বলার কারণ এগুলোর অদ্ভুত গতিবিধি। কখনও পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে, অতঃপর পশ্চাৎগামী হয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে। এই বিভিন্নমুখী গতির কারণ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আধুনিক দার্শনিকদের গবেষণা সেসব উক্তির কোনটিকে সমর্থন করে এবং কোনটিকে প্রত্যাখ্যান করে। এর প্রকৃত স্বরূপ স্রষ্টা ব্যতীত আর কেউই জানেন না। সবাই অনুমানভিত্তিক কথা বলে যা ভুলও হতে পারে, শুদ্ধও হতে পারে। কোরআন মুসলমানদেরকে এই অনর্থক আলোচনায় জড়িত করেনি। দরকারী কথাটুকু বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ্র অপার মহিমা ও কুদরতের এসব নিদর্শন দেখে তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আন।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ —অর্থাৎ এই কোরআন একজন সম্মানিত দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল, ফেরেশতাগণের মান্যবর এবং আল্লাহ্র বিশ্বাসভাজন। পয়গাম আনা-নেওয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম-বেশী করার আশংকা নেই। এখানে رسول كريم বলে বাহ্যত জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। পয়গম্বরগণের ন্যায় ফেরেশতাগণের বেলায়ও 'রসূল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত সবগুলো বিশেষণ জিবরাঈল (আ)-এর জন্য বিনাদ্বিধায় প্রযোজ্য। তিনি যে শক্তিশালী, সূরা নজমে তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে : عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى -
তিনি যে আরশ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর, তা মি'রাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌঁছলে তাঁর আদেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি যে أمين -তথা বিশ্বাসভাজন, তা বর্ণনা-সাপেক্ষ নয়। কোন কোন তফসীরবিদ رسول أمين -এর অর্থ নিয়েছেন, মুহাম্মদ (সা)। তাঁরা উল্লিখিত বিশেষণগুলোকে কিছু কিছু সদর্থ করে তাঁর জন্য প্রযোজ্য করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাহাত্ম্য এবং কাফিরদের অলীক অভিযোগের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ -যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উন্মাদ বলত,

এতে তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ—অর্থাৎ তিনি জিবরাঈল (আ)-কে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নজমে আছে : فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى—এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী জিবরাঈল (আ)-এর সাথে পরিচিত ছিলেন, তাঁকে আসল আকার-আকৃতিতেও দেখেছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

سورة الانفطار

সূরা ইনফিতার

মক্কায় অবতীর্ণ, ১৯ আয়াত রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝١ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْقُبُورُ
بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝٥ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ
بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝٦ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ
رَكَّبَكَ ۝٨ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۝٩ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا
كَاتِبِينَ ۝١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝١٢ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝١٣ وَإِنَّ الْفُجَّارَ
لَفِي جَحِيمٍ ۝١٤ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝١٥ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝١٦ وَمَا
أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝١٧ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝١٨ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ
نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝١٩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, (৩) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৪) এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে, (৫) তখন প্রত্যেকে জেনে নেবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। (৬) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। (৮) তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৯) কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না বরং তোমরা দান-প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর। (১০) অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে (১১) সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। (১২) তারা জানে যা তোমরা কর। (১৩) সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে (১৪) এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে

জাহান্নামে; (১৫) তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে। (১৬) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না। (১৭) আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৮) অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৯) যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্রসমূহ (খসে) ঝরে পড়বে, যখন (মিঠা ও লোনা) সমুদ্র উদ্বেলিত হবে (এবং একাকার হয়ে যাবে; যেমন পূর্বের সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনাত্রয় প্রথম ফুঁকের সময়কার। অতঃপর দ্বিতীয় ফুঁকের পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণিত হচ্ছেঃ) যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে (অর্থাৎ ভিতর থেকে মৃতরা বের হয়ে আসবে, তখন) প্রত্যেকেই তার আগে পিছের কর্ম জেনে নেবে। (এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল গাফিলতির নিদ্রা পরিহার করা। কিন্তু মানুষ তা করেনি। তাই অতঃপর এ সম্পর্কে সাবধান করা হচ্ছেঃ) হে মানুষ কিসে তোমাকে তোমার মহানুভব পালনকর্তা থেকে বিভ্রান্ত করল, যিনি তোমাকে (মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তোমাকে সুষম করেছেন অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমতা রেখেছেন) তিনি তোমাকে ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। কখনও বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, (কিন্তু তোমরা বিরত হচ্ছ না) বরং (এতটুকু অগ্রসর হয়েছ যে) তোমরা প্রতিদান ও শাস্তিকে মিথ্যা বলছ। (অথচ এর মাধ্যমেই বিভ্রান্তি দূর হতে পারত। তোমাদের এই মিথ্যা বলাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না বরং আমার পক্ষ থেকে) তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে (তোমাদের ক্রিয়াকর্ম স্মরণ রাখার জন্য। তারা আমার কাছে) সম্মানিত, (তোমাদের কর্মসমূহ) লেখকবৃন্দ। তোমরা যা কর, তারা তা জানে (এবং লেখে। সুতরাং কিয়ামতে এসব কর্ম পেশ করা হবে—তোমাদের কুফর ও মিথ্যা মনে করাও এতে থাকবে। অতঃপর উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হবে। ফলে) সৎকর্মশীলরা থাকবে জান্নাতে এবং দুষ্কর্মীরা (অর্থাৎ কাফিররা) থাকবে জাহান্নামে। তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে (এবং প্রবেশ করে) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না (বরং চিরকাল থাকবে)। আপনি জানেন, প্রতিফল দিবস কি? অতঃপর (আবার বলি) আপনি জানেন, প্রতিফল দিবস কি? (এর উদ্দেশ্য ভয়াবহতা প্রকাশ করা)। যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সব কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ—অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্র-সমূহ ঝরে মিঠা ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কিয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে যাবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি

অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়েছে। অগ্রে প্রেরণ করার এক অর্থ কাজ করা এবং পশ্চাতে ছাড়ার অর্থ কাজ না করা। সুতরাং কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং সৎ অসৎ কি কর্ম করেনি। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, অগ্রে প্রেরণ করেছে মানে যে কর্ম সে নিজে করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়েছে মানে যে কর্ম সে নিজে তো করেনি কিন্তু তার ভিত্তি ও প্রথা স্থাপন করে এসেছে। কাজটি সৎ হলে তার সওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ্ আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নত ও নিয়ম চালু করে, সে তার সওয়াব সব সময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কু-প্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে, যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ করবে, ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ্ লিখিত হতে থাকবে।

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ —পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামতের ভয়াবহ কাজ-কারবার উল্লিখিত হয়েছে। এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত এবং তাঁদের নির্দেশাবলীর চুল পরিমাণও বিরুদ্ধাচরণ করত না। কিন্তু মানুষ ভুল-ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ হে মানুষ, তোমার সূচনা ও পরিণামের এসব অবস্থা সামনে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করল যে, আল্লাহ্র নাফরমানী শুরু করেছ?

এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে فَعَدَلَكَ —অর্থাৎ তোমার অস্তিত্বকে বিশেষ সমতা দান করেছেন যা অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। মানবসৃষ্টিতে যদিও রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী উপকরণ শামিল রয়েছে কিন্তু আল্লাহ্র রহস্য, এগুলোর সমন্বয়ে একটি সুষম মেযাজ তৈরী করে দিয়েছে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে একই আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেননি। এরূপ করলে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য থাকত না। বরং তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার-আকৃতি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

সৃষ্টির এসব প্রারম্ভিক পর্যায় বর্ণনার পর বলা হয়েছে ঃ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ—

مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ -হে অনবধান মানব, যে পালনকর্তা তোমার মধ্যে এতসব গুণ গচ্ছিত রেখেছেন, তাঁর ব্যাপারে তুমি কিরূপে ধোঁকা খেলে যে, তাঁকে ভুলে গেছ এবং তাঁর নির্দেশাবলী অমান্য করছ? তোমার দেহের প্রতিটি গ্রন্থিই তো তোমাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় এই বিভ্রান্তি কিরূপে হল? এখানে كريم -শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের ধোঁকায় পড়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্ মহানুভব। তিনি দয়া ও কৃপার কারণে মানুষের গোনাহের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না, এমনকি তার রিযিক, স্বাস্থ্য ও পার্থিব সুখ-শান্তিতেও কোন বিঘ্ন ঘটান না। এতেই মানুষ ধোঁকা খেয়ে গেছে। অথচ সামান্য বুদ্ধি খাটালে এই দয়া ও কৃপা বিভ্রান্তির কারণ হওয়ার পরিবর্তে পালনকর্তার অনুগ্রহের কাছে ঋণী হয়ে আরও বেশী আনুগত্যের কারণ হওয়া উচিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন: كم من مغرور تحت الستر وهو لا يشعر অর্থাৎ অনেক মানুষের দোষত্রুটি ও গোনাহের উপর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা ফেলে রেখেছেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেননি। ফলে তারা আরও বেশী ধোঁকায় পড়ে গেছে।

عَلِمَتْ — إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ পূর্ববর্তী نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ —আয়াতে যে কর্ম সামনে আসার কথা বলা হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতে তারই শাস্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সৎ কর্ম করত তারা নিয়ামতে তথা জান্নাতে থাকবে এবং অবাধ্য ও নাফরমানরা জাহান্নামে থাকবে।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ —অর্থাৎ জাহান্নামীরা কোন সময় জাহান্নাম থেকে পৃথক হবে না। কারণ, তাদের জন্য চিরকালীন আযাবের নির্দেশ আছে। لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا —অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অন্যের কোন উপকার করতে পারবে না এবং কারও কষ্ট লাঘবও করতে পারবে না। এতে সুপারিশ করবে না, এরূপ বোঝা যায় না। কেননা, কারও সুপারিশ করা নিজ ইচ্ছায় হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ কাউকে কারও সুপারিশ করার অনুমতি না দেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলাই আসল আদেশের মালিক। তিনি স্বীয় কৃপায় কাউকে সুপারিশের অনুমতি দিলে এবং তা কবুল করলে তাও তাঁরই আদেশ হবে।

سورة التطفيف

সূরা তাৎফীফ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৩৬ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝١ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝٢ وَاِذَا
كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝٣ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝٤ لِيَوْمٍ
عَظِيْمٍ ۝٥ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦ كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ
لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝٧ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝٨ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ
اَثِيْمٍ ۝١٢ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ
عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٤ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝١٥
ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۝١٦ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝١٧
كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ۝١٨ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝١٩ كِتٰبٌ
مَّرْقُوْمٌ ۝٢٠ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝٢١ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝٢٢ عَلَى الْاَرَآئِكِ
يَنْظُرُوْنَ ۝٢٣ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝٢٤ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ
مَّخْتُوْمٍ ۝٢٥ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ۚ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝٢٦ وَمِزَاجُهٗ مِنْ
تَسْنِيْمٍ ۝٢٧ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝٢٨ اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝٢٩ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝٣٠ وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ

انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝ وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۝ وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۝ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য দুর্ভোগ, (২) যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় (৩) এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে (৫) সেই মহাদিবসে, (৬) যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে। (৭) এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। (৮) আপনি জানেন, সিজ্জীন কি? (৯) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (১০) সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যারোপকারীদের, (১১) যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে। (১২) প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। (১৩) তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে ঃ পুরাকালের উপকথা। (১৪) কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। (১৫) কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। (১৬) অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৭) এরপর বলা হবে ঃ একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে। (১৮) কখনও না, নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে। (১৯) আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কি? (২০) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (২১) আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ একে প্রত্যক্ষ করে। (২২) নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে, (২৩) সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। (২৪) আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। (২৫) তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ শরাব পান করানো হবে। (২৬) তার মোহর হবে কস্তুরি। এবিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (২৭) তার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। (২৮) এটা একটা ঝরনা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ। (২৯) যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত (৩০) এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। (৩১) তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। (৩২) আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত ঃ নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। (৩৩) অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি। (৩৪) আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস করছে (৩৫) সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে, (৩৬) কাফিররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য বড় দুর্ভোগ, তারা যখন লোকের কাছ থেকে (নিজেদের প্রাপ্য) মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (অবশ্য লোকদের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় নেওয়া নিন্দনীয় নয় কিন্তু এ কাজের নিন্দা করা এর উদ্দেশ্য নয় বরং কম দেওয়ার নিন্দাকে জোরদার করার জন্য এর উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কম দেওয়া যদিও এমনিতে নিন্দনীয় কিন্তু এর সাথে অপরের এতটুকুও খাতির না করা আরও বেশী নিন্দনীয়। যে অপরের খাতির করে, তার মধ্যে কম দেওয়ার দোষ থাকলেও একটি গুণও রয়েছে। তাই প্রথমোক্ত ব্যক্তির দোষ গুরুতর। এখানে আসল উদ্দেশ্য কম দেওয়ার নিন্দা করা, তাই মাপ ও ওজন উভয়টিই উল্লিখিত হয়েছে। পূর্ণমাত্রায় নেওয়া এমনিতে দূষণীয় নয়; তাই এক্ষেত্রে মাপ ও ওজন উভয়টি উল্লেখ করা হয়নি বরং মাপের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। মাপের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, আরবে মাপের প্রচলনই বেশী ছিল; বিশেষত আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হলে—যেমন, রাহুল মা'আনী বর্ণনা করেছেন—এই কারণ, আরও সুস্পষ্ট। কেননা, মদীনায় মাপের প্রচলন মক্কার চেয়ে বেশী ছিল; অতঃপর যারা এরূপ করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা এক মহাদিবসে পুনরুত্থিত হবে, যেদিন সব মানুষ বিশ্ব পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হবে? (অর্থাৎ সেদিনকে ভয় করা উচিত এবং মানুষের হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এই পুনরুত্থান ও প্রতিদানের কথা শুনে মু'মিন-গণ ভীত হয়ে গেল এবং কাফিররা অস্বীকার করতে লাগল। অতঃপর কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করে উভয়পক্ষের প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। কাফিররা যেমন প্রতি-দান ও শাস্তিকে অস্বীকার করে) কখনও (এরূপ) নয়; (বরং প্রতিদান ও শাস্তি অবশ্য-ম্ভাবী এবং যেসব কর্মের কারণে প্রতিদান ও শাস্তি হবে তাও সুনির্দিষ্ট। এর বিবরণ এই যে) পাপাচারীদের (অর্থাৎ কাফিরদের) আমলনামা সিজ্জীনে থাকবে [এটা সপ্তম যমীনে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এটা কাফিরদের আত্মারও স্থান।—(ইবনে কাসীর, দুররে মনসূর) অতঃপর সতর্ক করার পর প্রশ্ন করা হয়েছে:] আপনি জানেন সিজ্জীনে রক্ষিত আমলনামা কি? এটা এক চিহ্নিত খাতা। [চিহ্নিত মানে মোহরকৃত—(দুররে মনসূর) উদ্দেশ্য এই যে, এতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সারকথা এই যে, কর্মসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। এতে প্রমাণিত হল যে, প্রতিদান সত্য। প্রতিদান এই যে] সেদিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) মিথ্যারোপকারীদের বড়ই দুর্ভোগ হবে। যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা-রোপ করে। একে তারাই মিথ্যারোপ করে, যারা সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ। তার কাছে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে: এগুলো সেকালের উপকথা। (উদ্দেশ্য একথা বলা যে, যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসকে মিথ্যারোপ করে, সে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ এবং কোরআন অস্বীকারকারী। তারা একে মিথ্যা বলছে) কখনও এরূপ নয়, (তাদের কাছে এর কোন প্রমাণ নেই) বরং (আসল কারণ এই যে) তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়েছে। (এর কারণে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে অস্বীকার করছে। তারা যেমন মনে করছে) কখনও এরূপ নয়। (তাদের দুর্ভোগ

এই যে) তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে (শুধু তাই নয়; বরং) তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর তাদেরকে বলা হবে: একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে। (তারা নিজেদের শাস্তিকে যেমন মিথ্যা মনে করত। তেমনি মু'মিনগণের প্রতিদানকেও মিথ্যা মনে করত। তাই হুঁশিয়ার করা হয়েছে) কখনও এরূপ নয়; (বরং তাদের প্রতিদান অবশ্যই হবে। তা এরূপ যে) সৎলোকদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে। [এটা সপ্তম আকাশে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এখানে মু'মিনগণের আত্মা থাকে।---(ইবনে কাসীর) অতঃপর বোঝাবার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে:] আপনি জানেন ইল্লিয়্যীনে রক্ষিত আমলনামা কি? এটা একটা চিহ্নিত খাতা। আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ একে (আগ্রহভরে) দেখে। (এটা মু'মিনের বিরাট সম্মান। রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে যখন ফেরেশতাগণ মু'মিনদের রূহ্ কবজ করে নিয়ে যায়, তখন প্রত্যেক আকাশের নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ তার সাথী হয়ে যায়। অবশেষে সপ্তম আকাশে পৌঁছে রূহটি রেখে দেওয়া হয়। অতঃপর ফেরেশতাগণ তার আমলনামা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অতঃপর আমলনামা খুলে দেখানো হয়)। সৎলোকগণ খুব স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। সিংহাসনে বসে (জান্নাতের দৃশ্যাবলী) অবলোকন করবে। (হে পাঠক) তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ শরাব পান করানো হবে, যার মোহর হবে কস্তুরি। আকাঙ্ক্ষাকারীদের এমন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। (অর্থাৎ শরাব হোক কিংবা জান্নাতের নিয়ামতরাজি হোক, আকাঙ্ক্ষা করার জিনিস এগুলোই---দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়। সৎকর্ম দ্বারাই সেসব নিয়ামত অর্জিত হয়। অতএব, এ ব্যাপারে চেষ্টিত হওয়া দরকার) এই শরাবের মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। (আরবরা সাধারণত শরাবে পানি মিশিয়ে পান করত। জান্নাতের শরাবে তসনীমের পানি মিশানো হবে)। তসনীম এমন একটি ঝরনা, যার পানি নৈকট্যশীলগণ পান করবে। [উদ্দেশ্য এই যে, নৈকট্যশীলগণ তো এর পানি পান করার জন্যই পাবে এবং আসহাবুল ইয়ামীন অর্থাৎ সৎকর্মশীলগণ শরাবে মিলিত অবস্থায় এর পানি পাবে।---(দুররে মনসূর) শরাবে মোহর করা সম্মানের আলামত। নতুবা জান্নাতে এ ধরনের হিফাযতের প্রয়োজন নেই। জান্নাতে শরাবের পাত্রের মুখে গালার পরিবর্তে কস্তুরি লাগিয়ে মোহর করা হবে। উভয়পক্ষের পৃথক পৃথক প্রতিদান বর্ণনা করার পর এখন উভয়পক্ষের মোটামুটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে]। যারা অপরাধী (অর্থাৎ কাফির ছিল), তারা বিশ্বাসীদেরকে (দুনিয়াতে ঘৃণা প্রকাশার্থে) উপহাস করত এবং বিশ্বাসীরা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত, তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। যখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও উপহাস করতে করতে ফিরত। (উদ্দেশ্য এই যে, সামনে-পশ্চাতে সর্বাবস্থায় ঠাট্টাবিদ্রূপই করত। তবে সামনে ইশারা করত এবং পশ্চাতে স্পষ্টভাষায় বিদ্রূপ করত)। আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত: নিশ্চিতই এরা পথভ্রষ্ট। (কারণ, কাফিররা ইসলামকে পথভ্রষ্টতা মনে করত)। অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি। (অর্থাৎ নিজেদের চিন্তা করাই তাদের কর্তব্য ছিল। তারা বিশ্বাসীদের চিন্তায় মশগুল হল কেন? অতএব তারা দ্বিবিধ ভ্রান্তিতে পতিত ছিল---এক. সত্যপন্থীদেরকে উপহাস করা এবং দুই. শুদ্ধি

চিন্তা না করা।) অতএব, আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস করবে, সিংহাসনে বসে তাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে।—[দুররে-মনসূরে কাতাদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন খিড়কী ও জানালা দিয়ে জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে দেখতে পাবে। তারা তাদের দুর্দশা দেখে প্রতিশোধ গ্রহণের স্থলে তাদেরকে উপহাস করবে]। বাস্তবিকই কাফিররা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পেয়ে গেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা তাৎফীফ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রা)-এর মতে মক্কায় অবতীর্ণ এবং হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ (রা) মুকাতিল ও যাহ্হাক (র)-এর মতে মদীনায় অবতীর্ণ কিন্তু মাত্র আটটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। ইমাম নাসায়ী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন, তখন মদীনাবাসীদের সাধারণ কাজ-কারবার 'কায়ল' তথা মাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। তারা এ ব্যাপারে চুরি করা ও কম মাপায় খুবই অভ্যস্ত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা তাৎফীফ্ অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরও বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় পৌঁছার পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কারণ, মদীনাবাসীদের মধ্যে তখন এ বিষয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল যে, তারা নিজেরা কারও কাছ থেকে সওদা নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করত এবং অন্যের কাছে বিক্রি করার সময় মাপে কম দিত। এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তারা এই বদ-অভ্যাস থেকে বিরত হয় এবং এমন বিরত হয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের এই সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত।—(মাযহারী)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ —تَطْفِيف-এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরূপ করে, তাকে বলা হয় مُطَفِّف-কোরআনের এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাপে কম করা হারাম।

تَطْفِيف -কেবল মাপে কম করার মধ্যেই সীমিত নয় বরং যে কোন ব্যাপারে প্রাপককে প্রাপ্য থেকে কম দেয়াও تَطْفِيف-এর অন্তর্ভুক্ত : কোরআন ও হাদীসে মাপ ও ওজনে কম করাকে হারাম করা হয়েছে। সাধারণভাবে কাজ-কারবারে লেনদেনে এই দুই উপায়েই সম্পন্ন হয় এবং প্রাপকের প্রাপ্য আদায় হল কি না, তা এই দুই উপায়েই নির্ণীত হয়। প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দেওয়াই যে এর উদ্দেশ্য, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব বোঝা গেল যে, এটা শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে না বরং মাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোন পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা تَطْفِيف—এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে আছে, হযরত উমর (রা) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের রুকু-সিজদা ইত্যাদি ঠিকমত করে না এবং দ্রুত নামায শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন : لَقَدْ طَفَّفْتَ -অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায়ে تَطْفِيف-করেছ।

এই উক্তি উদ্ধৃত করে হযরত ইমাম মালেক (র) বলেন : لكل شيئ وفاء و تطفيف - অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেওয়া ও কম করা আছে, এমনকি নামায ও অযুর মধ্যেও। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অন্যান্য হক ও ইবাদতে এবং বান্দার নির্দিষ্ট হকে ত্রুটি ও কম করে, সেও تطفيف -এর অপরাধে অপরাধী। মজুর, কর্মচারী যতটুকু সময় কাজ করার চুক্তি করে, তাতে কম করাও অন্যায় এবং প্রচলিত নিয়মের বরখেলাফ, কাজে অলসতা করাও নাজায়েয। এসব ব্যাপারে সাধারণ লোক, এমনকি আলিমদের মধ্যেও অনবধানতা পরিদৃষ্ট হয়। তারা চাকুরীর কর্তব্যে ত্রুটি করাকে পাপই গণ্য করে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : خمس بخمس -অর্থাৎ পাঁচটি গোনাহের শাস্তি পাঁচটি—১. যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ তার উপর শত্রুকে প্রবল ও জয়ী করে দেন। ২. যে জাতি আল্লাহ্‌র আইন পরিত্যাগ করে অন্যান্য আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ৩. যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাদের উপর প্লেগ ও অন্যান্য মহামারী চাপিয়ে দেন। ৪. যারা মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দুর্ভিক্ষের সাজা দেন। ৫. যারা যাকাত আদায় করে না, আল্লাহ্ তাদেরকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে দেন।—(কুরতুবী)

তিবরানীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেন : যে জাতির মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চুরি প্রচলিত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাদের অন্তরে শত্রুর ভয়ভীতি চাপিয়ে দেন, যে জাতির মধ্যে সুদের প্রচলন হয়ে যায়, তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রাচুর্য দেখা দেয়, যে জাতি মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ্ তাদের রিযিক বন্ধ করে দেন, যে জাতি ন্যায়ের বিপরীতে ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে হত্যা ও খুন-খারাবী ব্যাপক হয়ে যায় এবং যারা চুক্তির ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আল্লাহ্ তাদের উপর শত্রুকে প্রবল করে দেন।—(মাযহারী)

দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও রিযিক বন্ধ করার বিভিন্ন উপায় : হাদীসে বর্ণিত রিযিক বন্ধ করা কয়েক উপায়ে হতে পারে—১. রিযিক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে, ২. রিযিক মওজুদ আছে কিন্তু তা খেতে পারে না কিংবা ব্যবহার করতে পারে না, যেমন আজকাল অনেক অসুখ-বিসুখে এরূপ হতে দেখা যায় এবং এটা বর্তমান যুগে খুবই ব্যাপক। এমনিভাবে দুর্ভিক্ষ কয়েক প্রকারে হতে পারে—১. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেলে এবং ২. দ্রব্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেলে। আজকাল অধিকাংশ জিনিসপত্রে এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। হাদীসে বর্ণিত দারিদ্র্যের অর্থও কেবল টাকা-পয়সা এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকা নয় বরং দারিদ্র্যের আসল অর্থ পরমুখাপেক্ষিতা ও অভাব-অনটন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ-কারবারে অপরের প্রতি যতবেশী মুখাপেক্ষী, সে ততবেশী দরিদ্র। বর্তমান যুগের পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ তার বসবাস, চলাফেরা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে এমন এমন আইন-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ যে, তার লোকমা ও কালেমা পর্যন্ত বিধিনিষেধের আওতাধীন। ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে

ক্রয় করতে পারে না, যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে সফর করতে পারে না। বিধি-নিষেধের বেড়াজাল এত বেশী যে, প্রত্যেক কাজের জন্য অফিসে যাতায়াত এবং অফিসার থেকে শুরু করে চাপরাশীদের পর্যন্ত খোশামোদ করা ছাড়া জীবন নির্বাহ করা কঠিন। এসব পর-মুখাপেক্ষিতারই তো অপর নাম দারিদ্র্য। বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বাহ্যত যেসব সন্দেহ দেখা দিতে পারে, এই বর্ণনার মাধ্যমে তা দূরীভূত হয়ে গেল।

সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীন ঃ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ — سِجِّين -এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় বন্দী করা। কামূসে আছে— سِجِّين -এর অর্থ চিরস্থায়ী কয়েদ। হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, سِجِّين -এর একটি বিশেষ স্থানের নাম। এখানে কাফিরদের রূহ্ অবস্থান করে এবং এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। এখানে এটাও সম্ভবপর যে, এস্থানে এমন কোন খাতা আছে, যাতে সারা বিশ্বের কাফিরদের কর্মসমূহ লিপি-বদ্ধ করা হয়।

স্থানটি কোথায় অবস্থিত, এসম্পর্কে বারা ইবনে আযেব (রা)-এর এক নাতিদীর্ঘ রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সিজ্জীন সপ্তম নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের নিচে অবস্থিত।—(মাযহারী) কোন কোন হাদীসে আরও আছে সিজ্জীন কাফির ও পাপাচারীদের আত্মার আবাসস্থল এবং ইল্লিয়্যীন মু'মিন-মুত্তাকীগণের আত্মার আবাসস্থল।

জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান স্থল ঃ বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, জান্নাত আকাশে এবং জাহান্নাম মর্ত্যে অবস্থিত। ইবনে জরীর (র) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে وَجِايْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ (সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ জাহান্নামকে সপ্তম যমীন থেকে উপস্থিত করা হবে। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নাম সপ্তম যমীনে আছে। সেখান থেকেই প্রজ্বলিত হবে এবং সমুদ্র ও দরিয়া তার অগ্নিতে শামিল হবে, অতঃপর সবার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। এভাবে সেসব রেওয়ায়েতের মধ্যেও সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, সিজ্জীন জাহান্নামের একটি অংশের নাম।—(মাযহারী)

كِتَابٌ مَرْقُومٌ — এস্থলে مَرْقُوم -এর অর্থ مَخْتُوم -(মোহরকৃত)। ইমাম বগভী ও ইবনে কাসীর (র) বলেন ঃ এটা সিজ্জীনের তফসীর নয় বরং পূর্ববর্তী كِتَابَ الْفُجَّارِ -এর বর্ণনা। অর্থ এই যে, কাফির ও পাপাচারীদের আমলনামা মোহর লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে না। এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিজ্জীন। এখানেই কাফিরদের রূহ্ জমা করা হবে।

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ — رَانَ -শব্দটি رَيْن -থেকেই উদ্ভূত। অর্থ মরিচা ও ময়লা। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অন্তরে পাপের মরিচা পড়ে গেছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ মু'মিন ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করলে তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। যদি সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং সংশোধিত হয়ে যায়, তবে এই কাল দাগ মিটে যায় এবং অন্তর পূর্ববৎ উজ্জ্বল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি তওবা না করে এবং গোনাহ্ করে যায়, তবে এই কাল দাগ তার সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একেই আয়াতে رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ —বলা হয়েছে।—(মাযহারী) পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কাফিররা কোরআনকে উপকথা বলে পরিহাস করে। এই আয়াতের শুরুতে كَلَّا -বলে তাদেরকে শাসানো হয়েছে যে, তারা গোনাহের স্তূপে পড়ে অন্তরের সেই ঔজ্জ্বল্য ও যোগ্যতা খতম করে দিয়েছে, যদ্দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝা যায়। এই যোগ্যতা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় গচ্ছিত রাখেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মিথ্যারোপ কোন প্রমাণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও সুবিবেচনা প্রসূত নয় বরং এর কারণ এই যে, তাদের অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভালমন্দ দৃষ্টিগোচরই হয় না।

اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ —অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এই কাফিররা তাদের পালনকর্তার যিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) বলেনঃ এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মু'মিন ও ওলীগণ আল্লাহ্ তা'আলার যিয়ারত লাভ করবে। নতুবা কাফিরদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখার কোন উপকারিতা নেই।

জনৈক শীর্ষস্থানীয় আলিম বলেনঃ এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসতে বাধ্য। এ কারণেই সাধারণ কাফির ও মুশরিক যত কুফর ও শিরকেই লিপ্ত থাকুক না কেন এবং আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যত ভ্রান্ত বিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা সবার অন্তরেই বিরাজমান থাকে। তারা নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁরই অন্বেষণ ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত করে থাকে। ভ্রান্ত পথের কারণে তারা মনযিলে মকসুদে পৌঁছতে না পারলেও অন্বেষণ সেই মনযিলেরই করে। আলোচ্য আয়াত থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। কেননা, কাফিরদের মধ্যে যদি আল্লাহ্র যিয়ারতের আগ্রহ না থাকত, তবে শাস্তিস্বরূপ একথা বলা হত না যে, তারা আল্লাহ্র যিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ, যে ব্যক্তি কারও যিয়ারতের প্রত্যাশীই নয় বরং তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তার জন্য তার যিয়ারত থেকে বঞ্চিত করা কোন শাস্তি নয়।

إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ—কারও কারও মতে عليين শব্দটি علو-এর বহুবচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। ফাররা (র)-র মতে এটা এক জায়গার নাম—বহুবচন নয়। পূর্বোল্লিখিত বারা ইবনে আযেব (র)-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এক স্থানের নাম। এতে মু'মিনদের রূহ্ ও আমলনামা রাখা হয়। পরবর্তী كِتَابٌ مَرْقُومٌ—বাক্যটিও ইল্লিয়্যীনের তফসীর নয়—সৎলোকদের আমলনামার বর্ণনা। উপরে إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ বাক্যে এই আমলনামার উল্লেখ আছে।

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ—يشهد-শব্দটি شهود-থেকে উদ্ভূত। অর্থ উপস্থিত হওয়া, প্রত্যক্ষ করা। কোন কোন তফসীরকারের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মশীলদের আমলনামা নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ দেখবে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান ও হিফাযত করবে।—(কুরতুবী) شهود-এর অর্থ উপস্থিত হওয়া নেওয়া হলে يشهده-এর সর্বনাম দ্বারা ইল্লিয়্যীন বোঝানো হবে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, নৈকট্যশীলগণের রূহ্ এই ইল্লিয়্যীন নামক স্থানে উপস্থিত হবে। কারণ, এটাই তাদের আবাসস্থল, যেমন সিজ্জীন কাফিরদের রূহের আবাসস্থল। সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস এর প্রমাণ। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: শহীদগণের রূহ্ আল্লাহ্র সান্নিধ্যে সবুজ পাখীদের মধ্যে থাকবে এবং জান্নাতের বাগবাগিচা ও নহরসমূহে ভ্রমণ করবে। তাদের বাসস্থানে আরশের নিচে জ্বলন্ত প্রদীপ থাকবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, শহীদগণের রূহ্ আরশের নিচে থাকবে এবং জান্নাতে ভ্রমণ করতে পারবে। সূরা ইয়াসীনে হাবীব নাজ্জারের ঘটনায় বলা হয়েছে:

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي—এ থেকে জানা যায় যে, হাবীব নাজ্জার মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। কোন কোন হাদীস দ্বারাও জানা যায় যে, মু'মিনদের রূহ্ জান্নাতে থাকবে। সবগুলোর সারমর্ম এই যে, এসব রূহের আবাসস্থল হবে সপ্তম আকাশে আরশের নিচে। জান্নাতের স্থানও এটাই। এসব রূহ্কে জান্নাতে ভ্রমণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখানে নৈকট্যশীলগণের উচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যদিও এ অবস্থাটি শুধু তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও প্রকৃতপক্ষে এটাই সব মু'মিনের রূহের আবাসস্থল। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা)-এর বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন:

انما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة حتى ترجع الى

جسده يوم القيامة —মু'মিনের রূহ্ পাখীর আকারে জান্নাতের বৃক্ষে ঝুলন্ত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন আবার আপন দেহে ফিরে যাবে। এই বিষয়বস্তুরই এক রেওয়ায়েত মসনদে আহমদ ও তিবরানীতে বর্ণিত হয়েছে।—(মাযহারী)

মৃত্যুর পর মানবাত্মার স্থান কোথায়? : এ ব্যাপারে হাদীসসমূহ বাহ্যত বিভিন্নরূপ। সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীনের তফসীর প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের আত্মা সিজ্জীনে থাকে যা সপ্তম যমীনে অবস্থিত এবং মু'মিনদের আত্মা সপ্তম আকাশে আরশের নিচে ইল্লিয়্যীনে থাকে। উল্লিখিত কতক রেওয়ায়েত থেকে আরও জানা যায় যে, কাফিরদের আত্মা জাহান্নামে এবং মু'মিনদের আত্মা জান্নাতে থাকে। আরও কতক হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ও কাফির উভয় শ্রেণীর আত্মা তাদের কবরে থাকে। বারা ইবনে আযেব (রা)-এর বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে আছে, যখন মু'মিনের আত্মাকে ফেরেশতাগণ আকাশে নিয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ বলেন : আমার এই বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিখে দাও এবং তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কেননা, আমি তাকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি, মৃত্যুর পর তাতেই ফিরিয়ে দিব এবং মাটি থেকে তাকে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত করব। এই আদেশ পেয়ে ফেরেশতাগণ তার আত্মা কবরে ফিরিয়ে দেয়। এমনিভাবে কাফিরের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তাকে কবরে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ করা হবে। ইমাম ইবনে আবদুল বার (রা) এই হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যার মর্ম এই যে, মু'মিন ও কাফির সবার আত্মা মৃত্যুর পর কবরেই থাকে। উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা কোন বিরোধ নয়। কেননা, ইল্লিয়্যীনের স্থান সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এবং জান্নাতের স্থানও সেখানেই। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে আছে :

عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى —এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে। সিদরাতুল মুনতাহা যে সপ্তম আকাশে একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই আত্মার স্থান ইল্লিয়্যীন জান্নাতের সংলগ্ন এবং আত্মাসমূহ জান্নাতের বাগিচায় ভ্রমণ করে। অতএব, আত্মার স্থান জান্নাতও বলা যায়।

এমনিভাবে কাফিরদের আত্মার স্থান সিজ্জীন—সপ্তম যমীনে অবস্থিত। হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণিত আছে যে, জাহান্নামও সপ্তম যমীনে অবস্থিত এবং জাহান্নামের উত্তাপ ও কষ্ট সিজ্জীনবাসীরা ভোগ করবে। তাই কাফিরদের আত্মার স্থান জাহান্নাম—একথা বলে দেওয়াও নির্ভুল। তবে যে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের আত্মা কবরে থাকে, সেই রেওয়ায়েত বাহ্যত উপরোক্ত দুই রেওয়ায়েতের বিরোধী। প্রখ্যাত তফসীরবিদ হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে-মাযহারীতে এই বিরোধের

মীমাংসা দিয়ে বলেছেন : এটা মোটেই অবান্তর নয় যে, আত্মাসমূহের আসল স্থান ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীনই। কিন্তু এসব আত্মার একটি বিশেষ যোগসূত্র কবরের সাথেও কায়েম রয়েছে। এই যোগসূত্র কিরূপ, তার স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। কিন্তু সূর্য ও চন্দ্র যেমন আকাশে থাকে এবং তাদের কিরণ পৃথিবীতে পড়ে পৃথিবীকেও আলোকোজ্জ্বল করে দেয় এবং উত্তপ্তও করে, তেমনিভাবে ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীনস্থ আত্মাসমূহের কোন অদৃশ্য যোগসূত্র কবরের সাথে থাকতে পারে। এই মীমাংসার ব্যাপারে কাযী সানাউল্লাহ্ (র)-র সুচিন্তিত বক্তব্য সূরা নাযিয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, রূহ্ দুই প্রকার—১. মানবদেহে প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ। এটা বস্তুনিষ্ঠ এবং চারি উপাদানে গঠিত দেহ, কিন্তু এমন সূক্ষ্ম যে, দৃষ্টিগোচর হয় না। একেই নফস বলা হয়। ২. অবস্তুনিষ্ঠ অশরীরী রূহ্। এই রূহ্ই নফসের জীবন। কাজেই একে রূহের রূহ্ বলা যায়। মানবদেহের সাথে উভয় প্রকার রূহের সম্পর্ক আছে। কিন্তু প্রথম প্রকার রূহ্ অর্থাৎ নফ্স মানবদেহের অভ্যন্তরে থাকে। এর বের হয়ে যাওয়ারই নাম মৃত্যু। দ্বিতীয় রূহ্ প্রথম রূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে কিন্তু এই সম্পর্কের স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। মৃত্যুর পর প্রথম রূহ্কে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, অতঃপর কবরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কবরই এর স্থান। আযাব ও সওয়াব এর উপরই চলে এবং দ্বিতীয় প্রকার অশরীরী রূহ্ ইল্লিয়্যীন অথবা সিজ্জীনে থাকে। এভাবে সব রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। অতএব, অশরীরী আত্মাসমূহ জান্নাতে অথবা ইল্লিয়্যীনে, জাহান্নামে অথবা সিজ্জীনে থাকে এবং প্রথম প্রকার রূহ্ তথা সূক্ষ্ম শরীরী নফ্স কবরে থাকে।

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ —تنا فس-এর অর্থ কোন বিশেষ পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করার জন্য কয়েকজনের ধাবিত হওয়ার ও দৌড়া, যাতে অপরের আগে সে তা অর্জন করে। এখানে জান্নাতের নিয়ামতরাজি উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা গাফিল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : আজ তোমরা যেসব বস্তুকে প্রিয় ও কাম্য মনে কর, সেগুলো অর্জন করার জন্য অগ্রে চলে যাওয়ার চেষ্টায়রত আছ, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নিয়ামত। এসব নিয়ামত প্রতিযোগিতার যোগ্য নয়। এসব ক্ষণস্থায়ী সুখের সামগ্রী হাতছাড়া হয়ে গেলেও তেমন দুঃখের কারণ নয়। হ্যাঁ, জান্নাতের নিয়ামতরাজির জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত। এগুলো সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী। আকবর এলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেন :

یہ کہاں کا فسا نہ ہے سود و زیاں ، جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا
کہو دل سے فرصت عمر ہے کم ، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ —এই আয়াতে

আল্লাহ্ তা'আলা সত্যপন্থীদের সাথে মিথ্যাপন্থীদের ব্যবহারের পূর্ণ চিত্র অংকন করেছেন। কাফিররা মু'মিনদেরকে উপহাস করে হাসত, তাদেরকে সামনে দেখলে চোখ টিপে ইশারা করত। এরপর তারা যখন নিজেদের বাড়ীঘরে ফিরত, তখন মু'মিনদেরকে উপহাস করার বিষয়ে আনন্দভরে আলোচনা করত। কাফিররা মু'মিনদেরকে দেখে বাহ্যত সহানুভূতির সুরে এবং প্রকৃতপক্ষে উপহাসের ছলে বলত : এ বেচারীরা বড় সরলমনা ও বেওকুফ। মুহাম্মদ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

আজকালকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, যারা নব্যশিক্ষার অশুভ ফলস্বরূপ ধর্ম ও পরকালের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি নামেমাত্রই বিশ্বাসী রয়ে গেছে, তারা আলিম ও ধর্মপরায়ণ লোকদের সাথে হুবহু এমনি ধরনের ব্যবহার করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে এই মর্মন্তুদ আযাব থেকে রক্ষা করুন। এই আয়াতে মু'মিন ও ধার্মিক লোকদের জন্য সান্ত্বনার যথেষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে। তাদের উচিত এই তথাকথিত শিক্ষিতদের উপহাসের পরোয়া না করা। জনৈক কবি বলেন :

ھنسے جانے سے جب تک ھم ڈریں گے + زمانہ ھم پر ھنستا ھی رھے گا

سُوْرَةُ الانشقاق

সূরা ইনশিকাক

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ
كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ
أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُ
كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ
بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا
اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ
عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত (৩) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (৪) এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে (৫) এবং তার

পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত। (৬) হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে। (৭) যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, (৮) তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে (৯) এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে (১০) এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেওয়া হবে, (১১) সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে (১২) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৩) সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। (১৪) সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। (১৫) কেন যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন। (১৬) আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার (১৭) এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে (১৮) এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, (১৯) নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে। (২০) অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না? (২১) যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সিজদা করে না। (২২) বরং কাফিররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। (২৩) তারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ্ তা জানেন। (২৪) অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২৫) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন (দ্বিতীয় ফুঁকের সময়) আকাশ বিদীর্ণ হবে (তাতে মেঘমালার ন্যায় ফেরেশতা-বাহী এক বস্তু অবতীর্ণ হয়। يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ আয়াতে এর উল্লেখ আছে)। এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে। (অর্থাৎ বিদীর্ণ হওয়ার সৃষ্টিগত আদেশ পালন করার অর্থ, তা ঘটা)। এবং আকাশ (আল্লাহ্র কুদরতের অধীন হওয়ার কারণে) এরই উপযুক্ত (যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা হওয়া মাত্রই তা অবশ্যই হবে) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (যেমন চামড়া অথবা রবারকে সম্প্রসারিত করা হয়। ফলে পৃথিবীর পরিধি বর্তমানের চেয়ে অনেক বেড়ে যাবে, যেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের তাতে স্থান সংকুলান হয়; দুররে মনসুরে বর্ণিত এক হাদীসে আছে:

تمد الارض يوم القيامة مد الاديم সুতরাং আকাশের বিদীর্ণ হওয়া এবং পৃথিবীর সম্প্রসারণ উভয়টি হাশরের হিসাব-নিকাশের অন্যতম ভূমিকা)। এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত বস্তুসমূহকে (অর্থাৎ মৃতদেরকে) বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং (সমস্ত মৃত থেকে) খালি হয়ে যাবে এবং সে (অর্থাৎ পৃথিবী) তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং সে এরই উপযুক্ত। (এর তফসীর পূর্বের ন্যায়। তখন মানুষ তার কৃতকর্ম-সমূহ দেখবে; যেমন ইরশাদ হয়েছে:) হে মানুষ, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট পৌঁছা পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত) চেষ্টা করে যাচ্ছ (অর্থাৎ কেউ সৎ কাজে এবং কেউ অসৎ কাজে নিয়োজিত রয়েছে), অতঃপর (কিয়ামতে) সেই চেষ্টার (প্রতিফলের) সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে। (তখন) যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, তার কাছ থেকে

সহজ হিসাব নেওয়া হবে এবং সে (হিসাব শেষে) তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। (সহজ হিসাবের স্তর বিভিন্ন রূপ—এক. হিসাবের ফলে মোটেই আযাব হবে না। তারা কোনরূপ আযাব ব্যতিরেকেই মুক্তি পাবে। এবং দুই. হিসাবের ফলে চিরস্থায়ী আযাব হবে না। এটা সাধারণ মু'মিনদের জন্য হবে। এক্ষেত্রে অস্থায়ী আযাব হতে পারে। পক্ষান্তরে) যার আমলনামা (তার বাম হাতে) পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেওয়া হবে [অর্থাৎ কাফির। সে হয় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকবে, ফলে বাম হাত পশ্চাতে থাকবে, না হয় মুজাহিদের উক্তি অনুযায়ী তার বাম হাত পৃষ্ঠদেশে করে দেওয়া হবে।—(দুররে-মনসূর], সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে (যেমন, বিপদে মৃত্যু কামনা করার অভ্যাস মানুষের আছে) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে (দুনিয়াতে) তার পরিবার-পরিজনের (ও চাকর-নকরের) মধ্যে আনন্দিত ছিল (এমনকি, আনন্দের আতিশয্যে পরকালকেও মিথ্যা মনে করত) সে মনে করত যে, সে কখনও (আল্লাহ্র কাছে) ফিরে যাবে না। (অতঃপর এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে) কেন ফিরে যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে সম্যক দেখতেন (এবং তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়ার ইচ্ছা করে রেখেছিলেন। তাই এই ইচ্ছার বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী ছিল)। অতএব, আমি শপথ করছি, সন্ধ্যাকালীন লাল আভার এবং রাত্রির এবং রাত্রি যা নিজের মধ্যে ধারণ করে তার (অর্থাৎ সেসব প্রাণীর, যারা বিশ্রামের জন্য রাত্রিতে নিজ নিজ ঠিকানায় ফিরে আসে) এবং চন্দ্রের যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে (অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র হয়ে যায়, এসব জিনিসের শপথ করে বলছি) তোমাদেরকে অবশ্যই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পৌঁছাতে হবে। এটা يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ থেকে فَمُلَاقِيهِ পর্যন্ত বর্ণিত সাক্ষাতের বিশদ বিবরণ। এসব অবস্থা হচ্ছে মৃত্যুর অবস্থা, বরযখের অবস্থা, কিয়ামতের অবস্থা। এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে একাধিক অবস্থা আছে। শপথের সাথে এগুলোর মিল এই যে, রাত্রির অবস্থা বিভিন্ন রূপ হয়। প্রথমে পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা যায়, এরপর রাত্রি গভীর হলে সব নিদ্রিত হয়ে যায়। চন্দ্রালোকের আধিক্য এবং স্বল্পতায়ও এক রাত্রি অন্য রাত্রি থেকে ভিন্ন রূপ হয়। এগুলো সব মৃত্যু পরবর্তী বিভিন্ন অবস্থার অনুরূপ। এছাড়া মৃত্যু পরকালের সূচনা, যেন সন্ধ্যাকালীন লাল আভা রাত্রির সূচনা। অতঃপর বরযখের অবস্থান মানুষের নিদ্রিত থাকার অনুরূপ এবং ক্ষয়-প্রাপ্তির পর চন্দ্রের পূর্ণ রূপ লাভ করা সবকিছু ধ্বংসের পর কিয়ামতের পুনরুজ্জীবন লাভ করার সাথে সামঞ্জস্যশীল)। অতএব (ভীত হওয়ার ও ঈমান আনার এসব কারণ থাকা সত্ত্বেও) মানুষের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না? (তাদের হঠকারিতা এতদূর যে) যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহ্র কাছে নত হয় না বরং (নত হওয়ার পরিবর্তে) কাফিররা (উল্টো) মিথ্যারোপ করে। তারা যা (অর্থাৎ কুকর্মের ভাণ্ডার) সংরক্ষণ করে আল্লাহ্ তা সবিশেষ জানেন। অতএব (এসব কুফরী কর্মের কারণে) আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিয়ে দিন। কিন্তু যারা ঈমান

আনে ও সৎ কর্ম করে, তাদের জন্য (পরকালে) রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার, (সৎ কর্ম শর্ত নয়—কারণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় কিয়ামতের অবস্থা, হিসাব-নিকাশ এবং সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা আছে। অতঃপর গাফিল মানুষকে তার সত্তা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তদ্দ্বারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছার নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যে, তার গর্ভে যেসব গুপ্ত ভাণ্ডার অথবা মানুষের মৃতদেহ আছে, সব সেদিন বাইরে উদগীরণ করে দেবে এবং হাশরের জন্য এক নতুন পৃথিবী তৈরী হবে। তাতে না থাকবে কোন পাহাড়-পর্বত এবং না থাকবে কোন দালান-কোঠা ও বৃক্ষলতা—পরিষ্কার একটি সমতল ভূমি হবে। একে আরও সম্প্রসারিত করা হবে, যাতে করে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ তাতে সমবেত হতে পারে। অন্যান্য সূরায়ও এই বর্ণনা বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে। এখানে নতুন সংযোজন এই যে, কিয়ামতের দিন আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ । أَذِنَتْ-এর অর্থ শুনেছে অর্থাৎ আদেশ পালন করেছে। حُقَّتْ-এর অর্থ حق لها إلا تنقاد অর্থাৎ আদেশ পালন করাই তার ওয়াজিব কর্তব্য ছিল।

আল্লাহ্র নির্দেশ দুই প্রকার: এখানে আকাশ ও পৃথিবীর আনুগত্য এবং আদেশ প্রতিপালনের দু' অর্থ হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্র নির্দেশ দুই প্রকার—১. শরীয়ত-গত নির্দেশ; এতে একটি আইন ও বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি বলে দেওয়া হয় না কিন্তু প্রতি-পক্ষকে করা না করার ব্যাপারে বাধ্য করা হয় না বরং তাকে স্বেচ্ছায় আইন মানা না মানা উভয় বিষয়ের ক্ষমতা দান করা হয়। এসব নির্দেশ সাধারণত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টির প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে; যেমন মানব ও জিন। এই শ্রেণীর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মু'মিন ও কাফির এবং বাধ্য ও অবাধ্যের দুইটি প্রকার সৃষ্টি হয়। ২. সৃষ্টিগত ও তকদীরগত নির্দেশ; এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে আরোপিত হয়। কারও সাধ্য নেই যে, চুল পরিমাণ বিরুদ্ধাচরণ করে। সমগ্র সৃষ্টি এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করে; জিন এবং মানবও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মু'মিন, কাফির, সৎ ও পাপাচারী সবাই এই আইন মেনে চলতে বাধ্য।

ذرہ ذرہ دہر کا پابستۂ تقدیر ہے
زندگی کے خواب کی جامی یہی تقدیر ہے

এস্থলে এটা সম্ভবপর যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীকে আদিষ্ট মানব ও জিনের ন্যায় চেতনা ও উপলব্ধি দান করবেন। ফলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আসামাত্রই তারা স্বেচ্ছায় তা পালন করবে ও মেনে নেবে। আর যদি নির্দেশের অর্থ এখানে

সৃষ্টিগত নির্দেশ নেওয়া হয়, যাতে ইচ্ছা ও এরাদার কোন দখলই নেই, তবে এটাও সম্ভবপর। তবে أَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ—এর ভাষা প্রথমোক্ত অর্থের অধিক নিকটবর্তী। দ্বিতীয় অর্থ ও রূপক হিসাবে হতে পারে।

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ—مد—এর অর্থ টেনে লম্বা করা। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে চামড়ার (অথবা রবারের) ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ একত্রিত হওয়ার ফলে এক একজনের ভাগে কেবল পা রাখার স্থান পড়বে।—(মাযহারী)

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ—অর্থাৎ পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু উদ্‌গীরণ করে একেবারে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধনভাণ্ডার, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মৃত মানুষের দেহকণা ইত্যাদি রয়েছে। প্রবল ভূকম্পনের মাধ্যমে পৃথিবী এসব বস্তু গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ—كدح—এর অর্থ কোন কাজে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। إِلَىٰ رَبِّكَ—অর্থাৎ মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহ্‌র দিকে চূড়ান্ত হবে।

আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন ঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সম্বোধন করে চিন্তাভাবনার একটি পথ দেখিয়েছেন। যদি মানুষের মধ্যে সামান্যতম জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনা থাকে এবং এ পথে চিন্তাভাবনা করে, তবে সে তার চেষ্টা-চরিত্র ও অধ্যবসায়ের সঠিক গতি নির্ণয় করতে সক্ষম হবে এবং এটা হবে তার ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম কথা এই যে, সৎ-অসৎ ও কাফির-মু'মিন নির্বিশেষে মানুষ মাত্রই প্রকৃতিগতভাবে কোন না কোন বিষয়কে লক্ষ্য স্থির করে তা অর্জনের জন্য অধ্যবসায় ও শ্রম স্বীকার করতে অভ্যস্ত। একজন সম্ভ্রান্ত ও সৎ লোক যেমন জীবিকা ও জীবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈধ পন্থাসমূহ অবলম্বন করে এবং তাতে স্বীয় শ্রম ও শক্তি ব্যয় করে, তেমনি দুষ্কর্মী ও অসৎ ব্যক্তিও পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় ব্যতিরেকে স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না। চোর, ডাকাত, বদমায়েশ ও লুটতরাজকারীদেরকে দেখুন, তারা কি পরিমাণ মানসিক ও দৈহিক শ্রম স্বীকার করে। এরপরই তারা লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয়। দ্বিতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মানুষের প্রত্যেকটি গতিবিধি বরং নিশ্চলতাও এমন এক সফরের বিভিন্ন মনযিল, যা সে অজ্ঞাতসারেই

অব্যাহত রেখেছে। এই সফরের শেষ সীমা আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিতি অর্থাৎ মৃত্যু। الى ربك বাক্যাংশে এরই বর্ণনা রয়েছে। এই শেষ সীমা এমন একটি অকাট্য সত্য, যা অস্বীকার করার শক্তি কারও নেই। প্রত্যেকেই এই অপ্রিয় সত্য স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা-চরিত্র ও অধ্যবসায় মৃত্যু পর্যন্ত নিঃশেষ হওয়া নিশ্চিত। তৃতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় সমস্ত গতিবিধি, কাজকর্ম ও চেষ্টা চরিত্রের হিসাবনিকাশ হওয়া বিবেক ও ইনসাফের দৃষ্টিতে অবশ্যম্ভাবী, যাতে সৎ ও অসতের পরিণাম আলাদা আলাদাভাবে জানা যায়। নতুবা ইহকালে এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। একজন সৎ লোক একমাস মেহনত-মজুরি করে যে জীবনোপকরণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যোগাড় করে, চোর ও ডাকাত তা এক রাত্রিতে অর্জন করে ফেলে। যদি হিসাবে কোন সময় না আসে এবং প্রতিদান ও শাস্তি না হয়, তবে চোর, ডাকাত ও সৎ লোক এক পর্যায়ে চলে যাবে, যা বিবেক ও ইনসাফের পরিপন্থী। অবশেষে বলা হয়েছে : فملقيه—এর সর্বনাম দ্বারা كدح ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ হবে এই যে, মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পরিশেষে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর শুভ অথবা অশুভ পরিণতির সামনে এসে যাবে। এই সর্বনাম দ্বারা رب -ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ পরকালে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং হিসাবের জন্য তার সামনে উপস্থিত হবে। অতঃপর সৎ ও অসৎ এবং মু'মিন ও কাফির মানুষের আলাদা আলাদা পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। ডান হাতে অথবা বাম হাতে আমলনামা আসার মাধ্যমে এর সূচনা হবে। ডান হাতওয়ালারা জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামতের সুসংবাদ এবং বাম হাতওয়ালারা জাহান্নামের শাস্তির দুঃসংবাদ পেয়ে যাবে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, এমনকি অনেক অনাবশ্যক ভোগ্য বস্তুও সৎ-অসৎ উভয় প্রকার লোকই অর্জন করে। এভাবে পার্থিব জীবন উভয়ের অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু উভয়ের পরিণতিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একজনের পরিণতি স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন সুখই সুখ এবং অপরজনের পরিণতি অনন্ত আযাব ও বিপদ। মানুষ আজই এই পরিণতির কথা চিন্তা করে কেন চেষ্টা ও কর্মের গতিধারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে দেয় না। যাতে দুনিয়াতেও তার প্রয়োজনাদি পূর্ণ হয় এবং পরকালেও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত হাতছাড়া না হয়?

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا—এতে মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং তাদের সহজ হিসাব নিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে।

হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ من حوسب يوم القيامة عذاب—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) প্রশ্ন করলেনঃ কোরআনে কি يحاسب حسابا يسيرا বলা হয়নি? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ এই আয়াতে যাকে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয় বরং কেবল আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিতি। যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেওয়া হবে, সে আযাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।—(বুখারী)

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, মু'মিনদের কাজকর্মও সব আল্লাহ্র সামনে পেশ করা হবে কিন্তু তাদের ঈমানের বরকতে প্রত্যেক কর্মের চুলচেরা হিসাব হবে না। এরই নাম সহজ হিসাব। পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসার বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. পরিবার-পরিজনের অর্থ জান্নাতের হুরগণ। তারাই সেখানে মু'মিনদের পরিবার-পরিজন হবে। দুই. দুনিয়ার পরিবার-পরিজনই অর্থ। হাশরের ময়দানে হিসা-বের পর যখন মু'মিন ব্যক্তি সফল হবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী সাফল্যের সুসং-বাদ শুনানোর জন্য সে তাদের কাছে যাবে। তফসীরকারকগণ উভয় অর্থ বর্ণনা করেছেন। —(কুরতুবী)

انه كان في اهله مسرورا—অর্থাৎ যার আমলনামা তার পিঠের দিক থেকে বাম হাতে আসবে সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে আযাব থেকে বেঁচে যায় কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন যাপন করত। মু'মিনগণ এর বিপরীত। তারা পার্থিব জীবনে কখনও নিশ্চিন্ত হয় না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের মধ্যেও তারা পরকালের কথা বিস্মৃত হয় না। কোরআন পাক তাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেঃ انا كنا في اهلنا مشفقين—অর্থাৎ আমরা পরিবার-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়েও পরকালের ভয় রাখতাম। তাই উভয় দলের পরিণতি তাদের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। যারা দুনিয়াতে পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে পরকালের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন ও আনন্দ-উল্লাসে দিন অতিবাহিত করত, আজ তাদের ভাগ্যে জাহান্নামের আযাব এসেছে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াতে পরকালের হিসাব-নিকাশ ও আযাবের ভয় রাখত, তারা আজ অনাবিল আনন্দ ও খুশী অর্জন করেছেন। এখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দে বসবাস করবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, দুনিয়ার সুখে মত্ত ও বিভোর হয়ে যাওয়া মু'মিনের কাজ নয়। সে কোন সময় কোন অবস্থাতেই পরকালের হিসাবের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয় না।

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ—এখানে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করে মানুষকে আবার لَتَرْكَبُنَّ... إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ। আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করেছেন। শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক অবস্থার উপর স্থিতিশীল থাকে না এবং তার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শপথের চারটি বস্তু এই বিষয়বস্তুর সাক্ষ্য দেয়। প্রথমে شَفَق-এর শপথ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই লাল আভা, যা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে দেখা যায়। এটা রাত্রির সূচনা, যা মানুষের অবস্থায় একটি বড় পরিবর্তনের পূর্বাভাস। এ সময় আলো বিদায় নেয় এবং অন্ধকারের সয়লাব চলে আসে। এরপর স্বয়ং রাত্রির শপথ করা হয়েছে, যা এই পরিবর্তনকে পূর্ণতা দান করে। এরপর সেসব জিনিসের শপথ করা হয়েছে, যেগুলোকে রাত্রির অন্ধকার নিজের মধ্যে একত্র করে। وسق -এর আসল অর্থ একত্র করা। এর ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে এতে জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অর্থও হতে পারে যে, যেসব বস্তু সাধারণত দিনের আলোতে চারদিকে ছড়িয়ে থাকে, রাত্রিবেলায় সেগুলো জড়ো হয়ে নিজ নিজ ঠিকানায় একত্রিত হয়ে যায়। মানুষ তার গৃহে, জীবজন্তু নিজ নিজ গৃহে ও বাসায় একত্রিত হয়। কাজ-কারবারে ছড়ানো আসবাবপত্র গুটিয়ে এক জায়গায় জমা করা হয়। এই বিরাট পরিবর্তন স্বয়ং মানুষ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর মধ্যে হয়ে থাকে। চতুর্থ শপথ হচ্ছে : وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ এটাও وسق থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ একত্র করা। চন্দ্রের একত্র করার অর্থ তার আলোকে একত্র করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মত দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের সাক্ষ্যদাতা চারটি বস্তুর শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ উপরে নিচে স্তরে স্তরে সাজানো জিনিসপত্রের এক একটি স্তরকে طبق বলা হয়। ركوب—এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোন সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে না বরং তার উপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে।

মানুষের অস্তিত্বে অগণিত পরিবর্তন, অব্যাহত সফর এবং তার চূড়ান্ত মনযিল : সে বীর্য থেকে জমাট রক্ত হয়েছে, এরপর গোশ্‌তপিণ্ড হয়েছে, অতঃপর তাতে অস্থি সৃষ্টি হয়েছে, অস্থির উপর গোশ্‌ত হয়েছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করেছে, এরপর রূহ্ স্থাপন

করার ফলে সে একজন জীবিত মানুষ হয়েছে। মায়ের পেটে তার খাদ্য ছিল গর্ভাশয়ের পচা রক্ত। নয় মাস পরে আল্লাহ্ তা'আলা তার পৃথিবীতে আসার পথ সুগম করে দিলেন। সে পচা রক্তের বদলে মায়ের দুধ পেল, দুনিয়ার সুবিস্তৃত পরিমণ্ডল দেখল, আলো-বাতাসের ছোঁয়া পেল। সে বাড়তে লাগল এবং নাদুস-নুদুস হয়ে গেল। দু'বছরের মধ্যে হাঁটি হাঁটি পা পা-সহ কথা বলারও শক্তি লাভ করল। মায়ের দুধ ছাড়া পেয়ে আরও অধিক সুস্বাদু ও রকমারি খাদ্য আসল। খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌতুক তার দিবারাত্রির একমাত্র কাজ হয়ে গেল। যখন কিছু জ্ঞান ও চেতনা বাড়ল তখন শিক্ষাদীক্ষার যাঁতাকলে আবদ্ধ হয়ে গেল। যখন যৌবনে পদার্পণ করল তখন অতীতের সব কাজ পরিত্যক্ত হয়ে যৌবন-সুলভ কামনা-বাসনা তার স্থান দখল করে বসল এবং এক রোমাঞ্চকর জগৎ সামনে এল। বিয়ে-শাদী, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিচালনার কর্মব্যস্ততায় দিবারাত্রি অতিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে এ যুগেরও সমাপ্তি ঘটল। আঙ্গিক শক্তি ক্ষয় পেতে লাগল। প্রায়ই অসুখ-বিসুখ দেখা দিতে লাগল। অবশেষে বার্ধক্য আসল এবং ইহকালের সর্বশেষ মনযিল কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলল। এসব বিষয় তো চোখের সামনে থাকে, যা কারও অস্বীকার করার সাধ্য নেই কিন্তু অদূরদর্শী মানুষ মনে করে যে, মৃত্যু ও কবরই তার সর্বশেষ মনযিল। এরপর কিছুই নেই। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞানী ও সব বিষয়ের খবর রাখেন। তিনি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে গাফিল মানুষকে অবহিত করেছেন যে, কবর তোমার সর্বশেষ মনযিল নয় বরং এটা এক প্রতীক্ষাগার। সামনে এক মহাজগৎ আসবে। তাতে এক মহাপরীক্ষার পর মানুষের সর্বশেষ মনযিল নির্ধারিত হবে, যা হয় চিরস্থায়ী আরাম ও সুখের মনযিল হবে, না হয় অনন্ত আযাব ও বিপদের মনযিল হবে। এই সর্বশেষ মনযিলেই মানুষ তার সত্যিকার আবাসস্থল লাভ করবে এবং পরিবর্তনের চক্র থেকে অব্যাহতি পাবে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে إِلَىٰ رَبِّكَ — إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ এবং

كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ—বলে এই বিষয়বস্তুই বর্ণনা করেছে। সে গাফিল মানুষকে এই সর্বশেষ মনযিল সম্পর্কে অবহিত করে হুঁশিয়ার করেছে যে, বয়স হচ্ছে দুনিয়ার সব পরিবর্তন, সর্বশেষ মনযিল পর্যন্ত যাওয়ার সফর এবং তার বিভিন্ন পর্যায়। মানুষ চলাফেরায়, নিদ্রা ও জাগরণে, দাঁড়ানো ও উপবিষ্ট—সর্বাবস্থায় এই সফরের মনযিলসমূহ অতিক্রম করছে। অবশেষে সে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাবে এবং সারা জীবনের কাজ-কর্মের হিসাব দিয়ে সর্বশেষ মনযিলে অবস্থান লাভ করবে, সেখানে হয় সুখই সুখ এবং নিরবচ্ছিন্ন আরাম, না হয় আযাবই আযাব এবং অশেষ বিপদ রয়েছে। অতএব, বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়াতে নিজেকে একজন মুসাফির মনে করা এবং পরকালের জন্য আসবাবপত্র তৈরী ও প্রেরণের চিন্তাকেই দুনিয়ার সর্ববৃহৎ লক্ষ্য স্থির করা। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ—অর্থাৎ তুমি দুনিয়াতে এভাবে থাক, যেমন কোন মুসাফির কয়েক দিনের জন্য কোথাও অবস্থান করে অথবা কোন পথিক পথে

চলতে চলতে বিশ্রামের জন্য থেমে যায়। উপরে বর্ণিত طبقا عن طبق -এর তফসীরের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত আবূ নাঈম (র) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই দীর্ঘ হাদীসটি এ স্থলে কুরতুবী আবূ নাঈমের এবং ইবনে কাসীর (র) ইবনে আবী হাতেম (র)-এর বরাত দিয়ে বিস্তারিত উদ্ধৃত করেছেন। এসব আয়াতে গাফিল মানুষকে তার সৃষ্টি ও দুনিয়াতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ সামনে এনে নির্দেশ করা হয়েছে যে, হে মানুষ এখনও সময় আছে, নিজের পরিণতি ও পরকালের চিন্তা কর। কিন্তু এতসব উজ্জ্বল নির্দেশ সত্ত্বেও অনেক মানুষ গাফলতি ত্যাগ করে না। তাই শেষে বলা হয়েছে ঃ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ—অর্থাৎ এই গাফিল ও মূর্খ লোকদের কি হল যে, তারা সবকিছু শোনা ও জানার পরও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে না?

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ—অর্থাৎ যখন তাদের সামনে সুস্পষ্ট হিদায়তে পরিপূর্ণ কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহ্র দিকে নত হয় না।

سجود ও سجدة—এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। এর মাধ্যমে আনুগত্য ও ফরমাবরদারী বোঝানো হয়। বলা বাহুল্য, এখানে পারিভাষিক সিজদা উদ্দেশ্য নয় বরং আল্লাহ্র সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনীত হওয়া উদ্দেশ্য। এর সুস্পষ্ট কারণ এই যে, এই আয়াতে কোন বিশেষ আয়াত সম্পর্কে সিজদার নির্দেশ নেই বরং নির্দেশটি সমগ্র কোরআন সম্পর্কিত। সুতরাং এই আয়াতে পারিভাষিক সিজদা অর্থ নেওয়া হলে কোরআনের প্রত্যেক আয়াতে সিজদা করা অপরিহার্য হবে, যা উম্মতের ইজমার কারণে হতে পারে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণের মধ্যে কেউ এর প্রবক্তা। এখন প্রশ্ন থাকে যে, এই আয়াত পাঠ করলে ও শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে কি না? বলা বাহুল্য, কিঞ্চিৎ সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতকেও সিজদা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়। কোন কোন হানাফী ফিকাহ্বিদ তাই করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ এখানে القرآن বলে সমগ্র কোরআন বোঝানো হয়নি বরং الف لام عهدى হওয়ার ভিত্তিতে বিশেষভাবে এই আয়াতই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা এক প্রকার সদর্থই, যাকে সম্ভাবনার পর্যায়ে শুদ্ধ বলা যেতে পারে। কিন্তু বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে এটা অবান্তর মনে হয়। তাই নির্ভুল কথা এই যে, এর ফয়সালা হাদীস এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি দ্বারা হতে পারে। তিলাওয়াতের সিজদা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে। ফলে মুজতাহিদ আলিমগণও বিষয়টিতে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র মতে এই আয়াতেও সিজদা ওয়াজিব। তিনি নিম্নোদ্ধৃত হাদীসসমূহকে এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন ঃ

সহীহ্ বুখারীতে আছে, হযরত আবূ রাফে' (রা) বলেন ঃ আমি একদিন ইশার নামায হযরত আবূ হুরায়রার পিছনে পড়লাম। তিনি নামাযে সূরা ইন্শিকাক পাঠ

করলেন এবং এই আয়াতে সিজদা করলেন। নামাযান্তে আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ কেমন সিজদা? তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পশ্চাতে এই আয়াতে সিজদা করেছি। তাই হাশরের ময়দানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত আমি এই আয়াতে সিজদা করে যাব। সহীহ্ মুসলিম আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে সূরা ইন্‌শিকাক ও সূরা ইকরায় সিজদা করেছি। ইবনে আরাবী (র) বলেন ঃ এটাই ঠিক যে, এই আয়াতটিও সিজদার আয়াত। যে এই আয়াত তিলাওয়াত করে অথবা শুনে তার উপর সিজদা ওয়াজিব।—(কুরতুবী) কিন্তু ইবনে আরাবী (র) যে সম্প্রদায়ে বসবাস করতেন, তাদের মধ্যে এই আয়াতে সিজদা করার প্রচলন ছিল না। তারা হয়তো এমন ইমামের মুকাল্লিদ (অনুসারী) ছিল, যার মতে এই আয়াতে সিজদা নেই। তাই ইবনে আরাবী (র) বলেন ঃ আমি যখন কোথাও ইমাম হয়ে নামায পড়াতাম তখন সূরা ইন্‌শিকাক পাঠ করতাম না। কারণ, আমার মতে এই সূরায় সিজদা ওয়াজিব। কাজেই যদি সিজদা না করি, তবে গোনাহ্‌গার হব। আর যদি করি, তবে গোটা জামাআত আমার এই কাজকে অপছন্দ করবে। কাজেই অহেতুক মতানৈক্য সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই।

سورة البروج

সূরা বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২২॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝٣ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٦ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝٩ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝١١ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝١٢ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۝١٣ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝١٤ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝١٥ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝١٦ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝١٧ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ۝١٨ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۝١٩ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝٢٠ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝٢١ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝٢٢

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের, (২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, (৩) এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়, (৪-৫) অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা; (৬) যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল, (৭) এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। (৮) তারা

তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু একারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল; (৯) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহ্‌র সামনে রয়েছে সব কিছু। (১০) যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামে শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা। (১১) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণী-সমূহ। এটাই মহাসাফল্য। (১২) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। (১৩) তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। (১৪) তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়; (১৫) মহান আরশের অধিকারী। (১৬) তিনি যা চান, তাই করেন। (১৭) আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে কি, (১৮) ফিরাউনের এবং সামূদের? (১৯) বরং যারা কাফির, তারা মিথ্যারোপে রত আছে। (২০) আল্লাহ্ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (২১) বরং এটা মহান কোরআন, (২২) লওহে মাহ্‌ফুযে লিপিবদ্ধ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে নুযূল ঃ এই সূরার একটি কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে উল্লিখিত এই কাহিনীর সার-সংক্ষেপ এই যে, জনৈক বাদশাহ্‌র দরবারে একজন অতীন্দ্রিয়বাদী থাকত। (যে ব্যক্তি শয়তানদের সাহায্যে অথবা নক্ষত্রের লক্ষণাদির মাধ্যমে মানুষকে ভবিষ্যতের খবরাদি বলে, তাকে অতীন্দ্রিয়বাদী বলা হয়)। সে একদিন বাদশাহ্‌কে বলল ঃ আমাকে একটি চালাক-চতুর বালক দিলে আমি তাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতাম। সেমতে তার কাছ থেকে এই বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য একটি বালককে মনোনীত করা হল। এই বালকের আসা-যাওয়ার পথে জনৈক খৃস্টান পাদ্রী বসবাস করত। সে যুগে খৃস্টধর্মই ছিল সত্যধর্ম। পাদ্রী অধিকাংশ সময়ই ইবাদতে মশগুল থাকত। বালকটি তার কাছে আসা-যাওয়া করত এবং সে গোপনে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল। একদিন বালকটি দেখল যে, একটি সিংহ পথ আটকে রেখেছে এবং মানুষ সিংহের ভয়ে অস্থির হয়ে ঘোরাফেরা করছে। বালকটি এক খণ্ড পাথর হাতে নিয়ে দোয়া করল ঃ হে আল্লাহ্, যদি পাদ্রীর ধর্ম সত্য হয়, তবে এই সিংহ আমার প্রস্তরাঘাতে মারা যাক, আর যদি অতীন্দ্রিয়বাদী সত্য হয়, তবে না মরুক। একথা বলে সে পাথর নিক্ষেপ করতেই তা সিংহের গায়ে লাগল এবং সিংহ মারা গেল। এরপর মানুষের মধ্যে একথা ছড়িয়ে পড়ল যে, এই বালক এক আশ্চর্য বিদ্যা জানে। জনৈক অন্ধ একথা শুনে এসে বলল ঃ আমার অন্ধত্ব মোচন করে দিন। বালক বলল ঃ তুমি আল্লাহ্‌র সত্যধর্ম কবূল করলে আমি চেষ্টা করে দেখব। অন্ধ এই শর্ত মেনে নিল। সেমতে বালকটি দোয়া করতেই অন্ধ তার চক্ষু ফিরে পেল এবং সত্যধর্ম গ্রহণ করল। এসব সংবাদ বাদশাহের কানে পৌঁছলে সে পাদ্রী এবং বালক ও অন্ধকে গ্রেফতার করিয়ে দরবারে আনল। অতঃপর সে পাদ্রী ও অন্ধকে হত্যা করল এবং বালকের ব্যাপারে আদেশ দিল যে, তাকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হোক। কিন্তু যারা তাকে পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল তারাই নিচে পড়ে গিয়ে নিহত হল এবং বালক নিরাপদে

ফিরে এল। অতঃপর বাদশাহ্ তাকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করার আদেশ দিল। সে এবারও বেঁচে গেল এবং যারা তাকে নিয়ে গিয়েছিল, তারা সলিলসমাধি প্রাপ্ত হল। অতঃপর বালকটি স্বয়ং বাদশাহ্কে বললঃ বিস্মিল্লাহ্ বলে তীর নিক্ষেপ করলে আমি মারা যাব। সেমতে তাই করা হল এবং বালকটি মারা গেল। এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখে অকস্মাৎ সাধারণ মানুষের মুখে উচ্চারিত হলঃ আমরা সবাই আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। বাদশাহ্ খুবই অস্থির হল এবং সভাসদদের পরামর্শক্রমে বিরাট বিরাট গর্ত খনন করিয়ে সেগুলো অগ্নিতে ভর্তি করে ঘোষণা দিলঃ যারা নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করবে না তাদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে। সেমতে বহু লোক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হল। এরপর বাদশাহ্ ও তার সভাসদদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হওয়ার বর্ণনা শপথ সহকারে এই সূরায় আছে।

শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের এবং শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের (অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের) এবং শপথ উপস্থিত দিনের এবং শপথ সেদিনের যাতে লোকেরা উপস্থিত হবে। (তিরমিযীর হাদীসে আছে يوم موعود কিয়ামতের দিন شهود শুক্রবার দিন এবং مشهود আরাফাতের দিন। এক দিনকে شاهد এবং এক দিনকে مشهود বলার কারণ সম্ভবত এই যে, শুক্রবার দিন সব মানুষ নিজ নিজ জায়গায় থাকে। তাই দিনটি যেন নিজেই উপস্থিত এবং আরাফাতের দিন হাজীগণ নিজ নিজ জায়গা থেকে সফর করে আরাফাতের ময়দানে এই দিনের উদ্দেশ্যে আগমন করে। তাই দিন যেন উদ্দিষ্ট এবং উপস্থিতির কাল এবং লোকেরা উপস্থিত। শপথের জওয়াব এইঃ) অভিশপ্ত হয়েছে গর্তওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইন্ধনের অগ্নি সংযোগকারীরা যখন তারা সেই অগ্নির আশেপাশে উপবিষ্ট ছিল এবং তারা ঈমানদারদের সাথে যে জুলুম করছিল, তা দেখে যাচ্ছিল। (বলা বাহুল্য, তাদের অভিশপ্ত হওয়ার সংবাদে মু'মিনগণ আশ্বস্ত হবে। কারণ, এতে বোঝা যায় যে, বর্তমানে যেসব কাফির মুসলমানদের উপর জুলুম করেছে, তারাও অভিশপ্ত হবে। এর প্রতিক্রিয়া দুনিয়াতেও প্রকাশ পেতে পারে। যেমন বদর যুদ্ধে জালিমরা নিহত ও লাঞ্ছিত হয়েছে কিংবা শুধু পরকালে প্রকাশ পাবে, যেমন সাধারণ কাফিরদের জন্য এটা নিশ্চিত। তারা জুলুমের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য আশেপাশে উপবিষ্ট ছিল। شاهد শব্দের মধ্যে তত্ত্বাবধান ছাড়াও তাদের নিষ্ঠুরতার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। দেখে শুনেও তাদের মনে দয়ার উপক্রম হত না। অভিশপ্ত হওয়ার ব্যাপারে এ বিষয়টির বিশেষ প্রভাব আছে)। কাফিররা মু'মিনদের মধ্যে এছাড়া কোন দোষ পায়নি যে, তারা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করেছিল, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্বের মালিক। (অর্থাৎ ঈমান আনার অপরাধে এই ব্যবহার করেছে। ঈমান আনা আসলে কোন অপরাধ নয়। সুতরাং নিরপরাধ লোকদের উপর তারা জুলুম করেছে। তাই তারা অভিশপ্ত হয়েছে। অতঃপর জালিমদের জন্য সাধারণ শাস্তিবাণী এবং মজলুমদের জন্য সাধারণ ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে)। আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফ। (মজলুমের অবস্থাও জানেন, তাই তাকে সাহায্য করবেন এবং জালিমের অবস্থাও জানেন, তাই তাকে শাস্তি দিবেন ইহকালে অথবা পরকালে) যারা মুসলমান নর ও নারীদেরকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি,

তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর (জাহান্নামের বিশেষভাবে) তাদের জন্য আছে দহন যন্ত্রণা। (আযাবে সর্প, বিচ্ছু, বেড়ী, শিকল, ফুটন্ত পানি, পুঁজ ইত্যাদি সবরকম কষ্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সর্বোপরি দহন যন্ত্রণা আছে। তাই একে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মজলুমসহ মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত। এটা মহাসাফল্য। আপনার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর। (কাজেই বোঝা যায় যে, তিনি কাফিরদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন)। তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় কিয়ামতেও সৃষ্টি করবেন। (সুতরাং পাকড়াওয়ের সময় যে কিয়ামত, তা সংঘটিত না হওয়ার সন্দেহ রইল না)। তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশের অধিপতি ও মহান। (সুতরাং মু'মিনদের গোনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং তাদেরকে প্রিয় করে নিবেন। আরশের অধিপতি হওয়া ও মহত্ত্ব থেকে আযাব দেওয়া এবং সওয়াব দেওয়া উভয়টি বোঝা যায় কিন্তু এখানে মুকাবিলার ইঙ্গিতে একথা বোঝানোই উদ্দেশ্য যে, তিনি সওয়াব দিতে সক্ষম। অতঃপর আযাবদান ও সওয়াবদান উভয়টি প্রমাণ করার জন্য একটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যে) তিনি যা চান, তাই করেন। (অতঃপর মু'মিনদেরকে আরও সান্ত্বনা এবং কাফিরদেরকে আরও হুঁশিয়ার করার জন্য কতক বিশেষ অভিশপ্তের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে) আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে কি অর্থাৎ ফিরাউন (ও ফিরাউন বংশধর) এবং সামূদের? (তারা কিভাবে কুফর করেছে এবং কিভাবে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে? এতে মু'মিনদের আশ্বস্ত এবং কাফিরদের ভীত হওয়া উচিত। কিন্তু কাফিররা মোটেই ভীত হয় না) বরং তারা (কোরআনের) মিথ্যারোপে রত আছে। (পরিণামে তারা এর শাস্তি ভোগ করবে। কেননা) আল্লাহ্ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (অতঃপর তার কুদরত ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। তারা যে কোরআনকে মিথ্যারোপ করে এটা এক নির্বুদ্ধিতা। কেননা, কোরআন মিথ্যারোপের যোগ্য নয়) বরং এটা মহান কোরআন—লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ। (এতে কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সেখান থেকে কড়া প্রহরাধীনে পয়গম্বরের কাছে পৌঁছানো হয়, যেমন সূরা জিনে আছে— فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا —সুতরাং কোরআনকে মিথ্যারোপ করা নিঃসন্দেহে মূর্খতা ও শাস্তির কারণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ —بروج শব্দটি برج-এর বহুবচন। অর্থ বড় প্রাসাদ ও দুর্গ। অন্য আয়াতে আছে وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ —এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর মূল ধাতু برج—এর আভিধানিক অর্থ বাহির হওয়া।

تَبَرُّج-এর অর্থ বেপর্দা খোলাখুলি চলাফেরা করা। এক আয়াতে আছে وَلَا تَبَرَّجْنَ

تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে

بروج-এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ অর্থাৎ সেসব গৃহ, যা আকাশে প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্য নির্ধারিত। পরবর্তী কোন কোন তফসীরবিদ দার্শনিকদের পরিভাষায় বলেছেন যে, সমগ্র আকাশ-মণ্ডলী বার ভাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেক ভাগকে برج—বলা হয়। তাঁদের ধারণা এই যে, স্থিতিশীল নক্ষত্রসমূহ এসব برج-এর মধ্যেই অবস্থান করে। গ্রহসমূহ আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব برج--এর মধ্যে অবতরণ করে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কোরআন পাক গ্রহসমূহকে আকাশে প্রোথিত বলে না যে, এগুলো আকাশের গতিতে গতিশীল হবে বরং কোরআনের মতে প্রত্যেক গ্রহ নিজস্ব গতিতে গতিশীল। সূরা ইয়াসীনে আছে ঃ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ—এক্ষণে فلك-এর অর্থ আকাশ নয় বরং গ্রহের কক্ষপথ, যেখানে সে বিচরণ করে।

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ—তফসীরের সার-সংক্ষেপে তিরমিযীর হাদীসের বরাত দিয়ে লিখিত হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কিয়ামতের দিন, شاهد-এর অর্থ শুক্রবার দিন এবং مشهود-এর অর্থ আরাফাতের দিন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। এক. বুরূজবিশিষ্ট আকাশের, দুই. কিয়ামত দিবসের, তিন শুক্রবারের এবং চার আরাফাতের দিনের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি, কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতি-দানের দলীল। শুক্রবার আরাফাতের দিন মুসলমানদের জন্য পরকালের পুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন। অতঃপর শপথের জওয়াবে সেই কাফিরদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে, যারা মুসলমানদেরকে ঈমানের কারণে অগ্নিতে পুড়িয়ে মেরেছে। এরপর মু'মিনদের পর-কালীন মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

গর্তওয়ালাদের ঘটনার কিছু বিবরণ ঃ এই ঘটনাই সূরা অবতরণের কারণ। তফসীরের সার-সংক্ষেপে ঘটনাটির সারমর্ম বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে অতীন্দ্রিয়বাদীর পরিবর্তে যাদুকর বলা হয়েছে এবং এই বাদশাহ্ ছিল ইয়ামেন দেশের বাদশাহ্। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত মতে তার নাম ছিল 'ইউসুফ যুনওয়াস'। তার সময় ছিল রসূলে করীম (সা)-এর জন্মের সত্তর বছর পূর্বে। যে বালককে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা যাদুকরের কাছে তার বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য বাদশাহ্ আদেশ

করেছিল, তার নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে তামের। পাদ্রী খৃস্টধর্মের আবেদ ও যাহেদ ছিল। তখন খৃস্টধর্ম ছিল সত্যধর্ম, তাই এই পাদ্রী তখনকার খাঁটি মুসলমান ছিল। বালকটি পথিমধ্যে পাদ্রীর কাছে যেয়ে তার কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত হত এবং অবশেষে মুসলমান হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাকাপোক্ত ঈমান দান করেছিলেন। ফলে বহু নির্যাতনের মুখেও সে ঈমানে অবিচল ছিল। পথিমধ্যে সে পাদ্রীর কাছে বসে কিছু সময় অতিবাহিত করত। ফলে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা যাদুকরের কাছে বিলম্বে পৌঁছার কারণেও সে তাকে প্রহার করত। ফেরার পথে আবার পাদ্রীর কাছে যেত। ফলে গৃহে পৌঁছাতে বিলম্ব হত এবং গৃহের লোকেরা তাকে মারত। কিন্তু সে কোন কিছুর পরোয়া না করে পাদ্রীর কাছে যাতায়াত অব্যাহত রাখল। এরই বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পূর্বোল্লিখিত কারামত তথা অলৌকিক ক্ষমতা দান করলেন। এই অত্যাচারী বাদশাহ্ মু'মিনদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গর্ত খনন করিয়ে তা অগ্নিতে ভর্তি করে দিল। অতঃপর মু'মিনদের এক একজনকে উপস্থিত করে বলল : ঈমান পরিত্যাগ কর নতুবা এই গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে এমন দৃঢ়তা দান করেছিলেন যে, তাদের একজনও ঈমান ত্যাগ করতে সম্মত হল না এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকেই পছন্দ করে নিল। মাত্র একজন স্ত্রীলোক, যার কোলে শিশু ছিল, সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হতে সামান্য ইতস্তত করছিল। তখন কোলের শিশু বলে উঠল : আম্মা, সবর করুন, আপনি সত্যের উপর আছেন। এই প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে যারা প্রাণ দিয়েছিল, তাদের সংখ্যা কোন কোন রেওয়ায়েতে বার হাজার এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বেশী বর্ণিত আছে।

বালক নিজেই বাদশাহ্কে বলেছিল : আপনি আমার তূন থেকে একটি তীর নিন এবং 'বিসমিল্লাহি রব্বী' বলে আমার গায়ে নিক্ষেপ করুন, আমি মরে যাব। এ পদ্ধতিতে সে তার প্রাণ দেওয়ার সাথে সাথে বাদশাহ্র গোটা সম্প্রদায় আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে উঠে এবং মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করে দেয়। এভাবে কাফির বাদশাহ্কে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও বিফল মনোরথ করে দেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর রেওয়ায়েতে আছে, ইয়ামেনের যে স্থানে এই বালকের সমাধি ছিল, ঘটনাক্রমে কোন প্রয়োজনে সেই জায়গা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে খনন করানো হলে তার লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় নির্গত হয়। লাশটি উপবিষ্ট অবস্থায় ছিল এবং হাত কোমরদেশে রক্ষিত ছিল। বাদশাহ্র তীর সেখানেই লেগেছিল। কোন একজন দর্শক তার হাতটি সরিয়ে দিলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে। হাতটি আবার পূর্বের ন্যায় রেখে দেওয়া হলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। তার হাতের আংটিতে ربي الله (আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা) লিখিত ছিল। ইয়ামেনের গভর্নর খলীফা হযরত উমর (রা)-কে এই ঘটনার সংবাদ দিলে তিনি উত্তরে লিখে পাঠালেন : তাকে আংটিসহ পূর্বাবস্থায় রেখে দাও।- (ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে লিখেছেন : অগ্নিকুণ্ডের ঘটনা দুনিয়াতে একটি নয়—বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অনেক সংঘটিত হয়েছে। এরপর

ইবনে আবী হাতেম বিশেষভাবে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন—এক. ইয়ামেনের অগ্নি-কুণ্ড, যার ঘটনা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের সত্তর বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, দুই. সিরিয়ার অগ্নিকুণ্ড এবং তিন. পারস্যের অগ্নিকুণ্ড। এই সূরায় বর্ণিত অগ্নিকুণ্ড আরবের ভূখণ্ড ইয়ামেনের নাজরানে ছিল।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ—এখানে অত্যাচারী কাফিরদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা মু'মিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শাস্তি প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে—এক وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ তাদের জন্য পরকালে জাহান্নামের আযাব রয়েছে, দুই. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ অর্থাৎ তাদের জন্য দহন যন্ত্রণা রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামে যেয়ে তারা চিরকাল দহন যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটাও সম্ভবপর যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, মু'মিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের রূহ্ কবজ করে নেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেশী প্রজ্ব-লিত হয়ে তার লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলমানদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কেবল বাদশাহ্ 'ইউসুফ যুনওয়াস' পালিয়ে যায়। সে অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই সলিল সমাধি লাভ করে।—(মাযহারী)

কাফিরদের জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণার খবর দেওয়ার সাথে সাথে কোরআন বলেছে: ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا—অর্থাৎ এই আযাব তাদের উপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি। এতে তাদেরকে তওবার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন: বাস্তবিকই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তারা তো আল্লাহ্র ওলীগণকে জীবিত দগ্ধ করে তামাশা দেখেছে, আল্লাহ্ তা'আলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফিরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন।—(ইবনে কাসীর)

سورة الطارق

সূরা তারেক

মক্কায় অবতীর্ণঃ ১৭ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ إِنْ كُلُّ
نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ
دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝
وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝ إِنَّهُمْ
يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর! (২) আপনি জানেন যে রাত্রিতে আসে, সে কি? (৩) সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। (৪) প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে। (৫) অতএব মানুষ দেখুক কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। (৬) সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। (৭) এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের মধ্য থেকে (৮) নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম! (৯) যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে, (১০) সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না। (১১) শপথ চক্রশীল আকাশের (১২) এবং বিদারনশীল পৃথিবীর! (১৩) নিশ্চয় কোরআন সত্য-মিথ্যার ফয়সালা (১৪) এবং এটা উপহাস নয়। (১৫) তারা ভীষণ চক্রান্ত করে, (১৬) আর আমিও কৌশল করি। (১৭) অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন—কিছু দিনের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ আকাশের এবং সেই বস্তুর, যা রাত্রিতে আবির্ভূত হয়। আপনি জানেন

রাত্রিতে কি আবির্ভূত হয় ? সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। (অতঃপর শপথের জওয়াব আছে—) প্রত্যেকের উপর একজন কর্মসংরক্ষণকারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে, (যেমন অন্য আয়াতে আছে : وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

উদ্দেশ্য এই যে, কাজকর্মের হিসাব হবে। উদ্দেশ্যের সাথে শপথের মিল এই যে, আকাশে নক্ষত্র যেমন সর্বদা সংরক্ষিত থাকে এবং বিশেষ করে রাত্রিতে প্রকাশ পায় তেমনিভাবে কাজকর্ম আমলনামায় সব সময় সংরক্ষিত আছে এবং বিশেষ করে কিয়ামতের দিন তা প্রকাশ পাবে)। অতএব মানুষ দেখুক কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে, যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের (অর্থাৎ সমগ্র দেহের) মধ্য থেকে নির্গত হয়। (এখানে পানি বলে বীর্য বোঝানো হয়েছে—শুধু পুরুষের কিংবা নারী-পুরুষ উভয়ের। পুরুষের তুলনায় কম হলেও নারীর বীর্যও সবেগে স্খলিত হয়। পানির অর্থ নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্য হলে ماء শব্দটি একবচনে আনার কারণ এই যে, উভয়ের বীর্য মিশ্রিত হয়ে এক বস্তুর মত হয়ে যায়। পৃষ্ঠ ও বক্ষ দেহের দুই পার্শ্ব। তাই সমগ্র দেহ অর্থ নেওয়া যায়। সারকথা এই যে, বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করা পুনর্বার সৃষ্টি করা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক কাজ। তিনি যখন এটাই করতে সক্ষম, তখন প্রমাণিত হল যে) তিনি তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম। (সুতরাং কিয়ামত না হওয়ার সন্দেহ দূর হয়ে গেল। এই পুনঃ সৃষ্টি সেদিন হবে, যেদিন সবার ভেদ প্রকাশ হয়ে যাবে। অর্থাৎ বাতিল বিশ্বাস ও ভ্রান্ত নিয়ত ইত্যাদি সব গোপন বিষয় বাহির হয়ে যাবে। দুনিয়াতে যেমন সময়মত অপরাধ অস্বীকার করা এবং তা গোপনে করা হয়, সেখানে এরূপ সম্ভবপর হবে না)। তখন তার কোন প্রতিরোধ শক্তি থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারী হবে না (যে, আযাব হটিয়ে দিবে। কিয়ামতের বাস্তবতা যেহেতু কোরআন দ্বারা প্রমাণিত, তাই অতঃপর কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে:) শপথ আকাশের যা থেকে পরপর বৃষ্টিপাত হয় এবং পৃথিবীর, যা (বীজের অঙ্কুরোদগমের সময়) বিদীর্ণ হয়। (অতঃপর শপথের জওয়াব আছে—) নিশ্চয় কোরআন সত্যমিথ্যার ফয়সালা। এটা অসার কালাম নয়। (এতে কোরআন যে আল্লাহ্র সত্য কালাম, একথা প্রমাণিত হল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের অবস্থা এই যে,) তারা (সত্যকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য) নানা অপকৌশল করছে এবং আমি (তাদেরকে ব্যর্থ ও দণ্ড দেওয়ার জন্য) নানা কৌশল করে যাচ্ছি। (বলা বাহুল্য, আমার কৌশল প্রবল হবে। আপনি যখন আমার কৌশলের কথা শুনলেন) অতএব আপনি কাফিরদেরকে (ভয় করবেন না এবং তাদের দ্রুত আযাব কামনা করবেন না, বরং তাদেরকে) অবকাশ দিন (কোনদিন নয় বরং) তাদেরকে অবকাশ দিন কিছু দিনের জন্য। (এরপর মৃত্যুর আগে অথবা পরে আমি তাদের উপর আযাব নাযিল করব। শেষ শপথের শেষ বিষয়বস্তুর সাথে মিল এই যে, কোরআন আকাশ থেকে আসে এবং যার মধ্যে যোগ্যতা থাকে, তাকে ধন্য করে। যেমন বৃষ্টি আকাশ থেকে নেমে উর্বর ভূমিকে সমৃদ্ধ করে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন : প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। সে তার সমস্ত কাজকর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যা কিছু করছে, তা সবই কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ্র কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোন সময় পরকাল ও কিয়ামতের চিন্তা থেকে গাফিল হওয়া অনুচিত। এরপর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে শয়তান মানুষের মনে যে অসম্ভাব্যতার সন্দেহ সৃষ্টি করে, তার জওয়াব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : মানুষ লক্ষ্য করুক যে, সে কিভাবে বিভিন্ন অণু, কণা ও বিভিন্ন উপকরণ থেকে সৃজিত হয়েছে। যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের কণাসমূহ একত্র করে একজন জীবিত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পর পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এরপর কিয়ামতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করে আবার আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে পরকাল চিন্তার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে যেন তাকে হাসি-তামাশা মনে না করে। এটা এক বাস্তব সত্য, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অবশেষে দুনিয়াতেই কেন আযাব আসে না—কাফিরদের এই প্রশ্নের জওয়াবের মাধ্যমে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

প্রথম শপথে আকাশের সাথে طارق শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ রাত্রিতে আগমনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় লুক্কায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজন্য নক্ষত্রকে طارق বলা হয়েছে। কোরআন এ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে নিজেই জওয়াব দিয়েছে

النَّجْمُ الثَّاقِبُ—অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র। আয়াতে কোন নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই যে কোন নক্ষত্রকে বুঝানো যায়। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন বিশেষ নক্ষত্র 'সুরাইয়া', যা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি নক্ষত্র কিংবা 'শনিগ্রহ' অর্থ নিয়েছেন। আরবী ভাষায় সুরাইয়া ও শনিগ্রহকে نجم বলা হয়ে থাকে।

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ—এটা শপথের জওয়াব। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। এখানে حافظ শব্দ এক বচনে উল্লেখ করা হলেও তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত থেকে জানা যায়। অন্য আয়াতে আছে : وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ

حافظ—এর অপর অর্থ আপদবিপদ থেকে হিফাযতকারীও হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের হিফাযতের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তারা দিনরাত মানুষের হিফাযতে নিয়োজিত থাকে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য যে বিপদ অবধারিত করে দিয়েছেন, তারা সে বিপদ থেকে হিফাযত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা পরিষ্কারভাবে

বর্ণিত হয়েছে : لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

অর্থাৎ মানুষের জন্য পালাক্রমে আগমনকারী পাহারাদার ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আল্লাহ্র আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে তার হিফাযত করে।

এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) বলেন—প্রত্যেক মু'মিনের উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তার হিফাযতের জন্য তিন শ ষাট জন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা তার প্রত্যেক অঙ্গের হিফাযত করে। তন্মধ্যে সাতজন ফেরেশতা কেবল চোখের হিফাযতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। এসব ফেরেশতা অবধারিত নয়—এমন প্রত্যেক বালা-মুসিবত থেকে এভাবে মানুষের হিফাযত করে, যেমন মধুর পাত্রে আগমনকারী মাছিকে পাখা ইত্যাদির সাহায্যে দূর করে দেওয়া হয়। মানুষের উপর এরূপ পাহারা না থাকলে শয়তান তাকে ছিনিয়ে নিত।—(কুরতুবী)

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ—অর্থাৎ মানুষ সৃজিত হয়েছে এক সবেগে স্খলিত পানি থেকে যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থিপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়। সাধারণভাবে তফসীর-বিদগণ এর এই অর্থ করেছেন যে, বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু মানবদেহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুচিন্তিত অভিমত ও অভিজ্ঞতা এই যে, বীর্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ নারী ও পুরুষের সেই অঙ্গ থেকে নির্গত বীর্য দ্বারা গঠিত হয়। তবে এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী প্রভাব থাকে মস্তিষ্কের। এ কারণেই সাধারণত দেখা যায়, যারা অতিরিক্ত স্ত্রীমৈথুন করে, তারা প্রায়ই মস্তিষ্কের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। তাদের আরও সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বীর্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে স্খলিত হয়ে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে অণ্ডকোষে জমা হয় এবং সেখান থেকে নির্গত হয়।

এই অভিমত বিশুদ্ধ হলে তফসীরবিদগণের উপরোক্ত উক্তির সঙ্গত ব্যাখ্যাদান অবান্তর নয়। কেননা, চিকিৎসাবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, বীর্য উৎপাদনে সর্বাধিক প্রভাব রয়েছে মস্তিষ্কের। আর মস্তিষ্কের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে সেই শিরা, যা মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে পৃষ্ঠদেশে ও পরে অণ্ডকোষে পৌঁছেছে। এরই কিছু উপশিরা বক্ষের অস্থি-পাঁজরে এসেছে। এটা সম্ভবপর যে, নারীর বীর্যে বক্ষপাঁজর থেকে আগত বীর্যের এবং পুরুষের বীর্যে পৃষ্ঠদেশ থেকে আগত বীর্যের প্রভাব বেশী।—(বায়যাভী)

কোরআন পাকের ভাষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এতে নারী ও পুরুষের কোন বিশেষত্ব নেই। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে নির্গত হয়। এর সরাসরি অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বীর্য নারী ও পুরুষ উভয়ের সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হয়। তবে সামনের ও পশ্চাতের প্রধান অঙ্গের নাম উল্লেখ করে সমস্ত দেহ ব্যক্ত করা হয়েছে। সম্মুখভাগে বক্ষ এবং পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠ প্রধান অঙ্গ। এই দুই অঙ্গ থেকে নির্গত হওয়ার অর্থ নেওয়া হবে সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হওয়া। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ — رجع -এর অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা প্রথমবার মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও ভালরূপে সক্ষম।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ — تبلى -এর শাব্দিক অর্থ পরীক্ষা করা, যাচাই করা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের যেসব বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মনন ও সংকল্প অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, দুনিয়াতে কেউ জানত না, এবং যেসব কাজকর্ম সে গোপনে করেছিল, কিয়ামতের দিন সে সবগুলোই পরীক্ষিত হবে। অর্থাৎ প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের সব গোপন ভেদ খুলে যাবে। প্রত্যেক ভালমন্দ বিশ্বাস ও কর্মের আলামত হয় মানুষের মুখমণ্ডলে শোভা পাবে না হয় অন্ধকার ও কাল রঙের আকারে প্রকাশ করে দেওয়া হবে।—(কুরতুবী)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ — رجع-এর অর্থ পর পর বর্ষিত বৃষ্টি। একবার বৃষ্টি হয়ে শেষ হয়ে যায়, আবার হয়।

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ — অর্থাৎ কোরআন সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা করে; এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআন সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ

كتاب فيه خبر ما قبلكم و حكم ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل

অর্থাৎ এই কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের সংবাদ এবং তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্য বিধি-বিধান রয়েছে। এটা চূড়ান্ত উক্তি; আমার মুখের কথা নয়।

سورة الاعلى

সূরা আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ : ১৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ وَالَّذِي
أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى ۝ إِلَّا مَا
شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۝ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ۝ فَذَكِّرْ
إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى ۝ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى ۝ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝
الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝ قَدْ أَفْلَحَ
مَن تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةُ
خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন, (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন (৩) এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথপ্রদর্শন করেছেন (৪) এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন, (৫) অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (৬) আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না— (৭) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়। (৮) আমি আপনার জন্য সহজ শরীয়ত সহজতর করে দেবো। (৯) উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন, (১০) যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, (১১) আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে, (১২) সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (১৩) অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। (১৪) নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় (১৫) এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (১৬) বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, (১৭) অথচ পরকালের

জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (১৮) এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, (১৯) ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে পয়গম্বর) আপনি (এবং যারা আপনার সঙ্গে রয়েছে, সবাই) আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন, যিনি (যাবতীয় বস্তুনিচয়কে) সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন (অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু উপযুক্তরূপে সৃষ্টি করেছেন) এবং যিনি (প্রাণীদের জন্য তাদের উপযুক্ত বস্তু) নির্ণয় করেছেন, অতঃপর (তাদেরকে সেসব বস্তুর দিকে) পথ প্রদর্শন করেছেন (অর্থাৎ তাদের মনে সেসব বস্তুর চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন) এবং যিনি (সবুজ সদৃশ) তৃণাদি (মাটি থেকে) উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (প্রথমে সাধারণ সৃষ্টিকর্ম, প্রাণী সম্পর্কিত সৃষ্টিকর্ম ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত সৃষ্টিকর্ম উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, আনুগত্যের মাধ্যমে পরকালের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। সেখানে কাজকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি হবে। এই আনুগত্যের পন্থা বলার জন্যই আমি কোরআন নাযিল করেছি এবং আপনাকে তা প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছি। অতএব এই কোরআন সম্পর্কে আমার প্রতিশ্রুতি এই যে) আমি (যতটুকু) কোরআন (নাযিল করব, ততটুকু) আপনাকে পাঠ করাতে থাকব (অর্থাৎ মুখস্থ করিয়ে দিব) ফলে আপনি (তার কোন অংশ) বিস্মৃত হবেন না আল্লাহ্ যতটুকু (বিস্মৃত করতে) চান, ততটুকু ব্যতীত। (কারণ, এটাও রহিত করার এক পন্থা। আল্লাহ্ বলেনঃ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এরূপ অংশ আপনার সবার মন থেকে ভুলিয়ে দেওয়া হবে। এই মুখস্থ করানো ও বিস্মৃত করানো সবই রহস্যোপযোগী হবে। কেননা) তিনি প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় জানেন। (তাই কোনকিছুর উপযোগিতা তাঁর কাছে গোপন নয়। যখন যে বিষয়কে সংরক্ষিত রাখা উপযুক্ত মনে করেন, সংরক্ষিত রাখেন এবং যখন বিস্মৃত করা উপযুক্ত মনে করেন, বিস্মৃত করে দেন। আমি যেমন আপনার জন্য কোরআনকে সহজ করে দেব, তেমনি) আমি আপনাকে সহজ শরীয়তের জন্য (অর্থাৎ শরীয়তের আদেশ অনুযায়ী চলার জন্য) সুবিধা দান করব। (অর্থাৎ সহজে বোঝাতে পারবেন, সহজে আমল করতে পারবেন এবং সহজে প্রচার করতে পারবেন। সকল বাধাবিপত্তি অপসারিত করে দেব। শরীয়তকে প্রশংসার্থে সহজ বলা হয়েছে অথবা এ কারণে যে, এটা সহজ হওয়ার কারণ। ওহী সম্পর্কিত প্রত্যেক কাজ যখন সহজ করার ওয়াদা আমি করছি, তখন) আপনি (নিজে যেমন পবিত্রতা বর্ণনা করেন তেমনি অপরকেও) উপদেশ দিন যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়। (বলা বাহুল্য, উপদেশ উপকারীই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ — কাজেই আপনি সযত্নে উপদেশ দিন। এতদসত্ত্বেও উপদেশ সবার জন্যই উপকারী নয়,

বরং) উপদেশ সে ব্যক্তি গ্রহণ করে, যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে। (পক্ষান্তরে) যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করে। (ফলে) সে (অবশেষে) মহা অগ্নিতে (অর্থাৎ জাহান্নামে) প্রবেশ করবে; অতঃপর সেখানে সে মরবেও না এবং (সুখে) জীবিতও থাকবে না। (অর্থাৎ যেখানে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্যতা নেই, সেখানে উপদেশ ব্যর্থ হলেও উপদেশ স্বতই উপকারী বটে। উপদেশ দান আপনার দায়িত্বে ওয়াজিব হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ পর্যন্ত সারমর্ম এই যে, আপনি নিজেও পূর্ণতা অর্জন করুন এবং অপরের কাছেও প্রচার করুন। আমি আপনার সহায়। কোরআন শুনে বাতিল বিশ্বাস ও হীন চরিত্র থেকে) সে ব্যক্তি সাফল্য লাভ করে যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (কিন্তু হে অবিশ্বাসীরা, তোমরা কোরআন শুনে কোরআনকে মান্য কর না এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ কর না; বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকাল দুনিয়া অপেক্ষা) উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (এই বিষয়টি কেবল কোরআনেরই দাবী নয় বরং) এটা (অর্থাৎ এই বিষয়টি) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও (লিখিত) রয়েছে অর্থাৎ ইবরাহীম ও মূসা (আ)-র কিতাবসমূহে।—[রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি দশটি সহীফা এবং মূসা (আ)-র প্রতি তওরাত অবতরণের পূর্বে দশটি সহীফা তথা ছোট কিতাব নাযিল হয়েছিল]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাস'আলা ঃ আলিমগণ বলেন ঃ নামাযের বাইরে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى তিলাওয়াত করলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কিরাম এই সূরা তিলাওয়াত শুরু করলে এরূপ বলতেন।—(কুরতুবী)

o ওকবা ইবনে আমের জোহানী (রা) বর্ণনা করেন, যখন সূরা আ'লা নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ اِجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ—অর্থাৎ তোমরা سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى কালেমাটি সিজদায় পাঠ কর। تَسْبِيْحٌ শব্দের অর্থ পবিত্র রাখা, পবিত্রতা বর্ণনা করা। سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ—এর অর্থ এই যে, আপন পালনকর্তার নাম পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ পালনকর্তার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করার সময় বিনয়, নম্রতা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তাঁর উপযুক্ত

নয়—এমন যাবতীয় বিষয় থেকে তাঁর নামকে পবিত্র রাখুন। এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের যেসব নাম বর্ণনা করেছেন, তাঁকে কেবল সেসব নামের মাধ্যমেই ডাকুন। অন্য কোন নামে তাঁকে ডাকা জায়েয নয়।

০ এর অপর অর্থ এই যে. যেসব নাম আল্লাহ্র জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, সেগুলো কোন মানুষের জন্য ব্যবহার করা তাঁর পবিত্রতার পরিপন্থী, তাই নাজায়েয। যেমন রহমান, রায্যাক, গাফ্ফার, কুদ্দুস ইত্যাদি।—(কুরতুবী) আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীনতার অন্ত নেই। মানুষ নাম সংক্ষেপ করতে খুবই আগ্রহী। মানুষ অবলীলাক্রমে আবদুর রহমানকে রহমান, আবদুর রায্যাককে রায্যাক এবং আবদুর গাফ্ফারকে গাফ্ফার বলে থাকে। কেউ একথা বোঝে না যে, যে এরূপ বলে এবং যে শুনে উভয়ই গোনাহ্গার হয়। এই নিরর্থক গোনাহ্ দিবারাত্রি অহেতুক হতে থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে اسم-এর অর্থ নিয়েছেন যার নাম তার সত্তা। আরবী ভাষায় এর অবকাশ আছে এবং কোরআন পাকেও اسم শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে কালেমাটি নামাযের সিজদায় পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, সেটি سُبْحَانَ اسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰى নয় বরং سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى —এ থেকেও জানা যায় যে, এ ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয় বরং স্বয়ং সত্তা উদ্দেশ্য। —(কুরতুবী)

বিশ্ব সৃষ্টির নিগূঢ় তাৎপর্য : اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى

—এগুলো সব জগৎ সৃষ্টিতে আল্লাহ্র অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত গুণাবলী। প্রথম গুণ خلق -এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয় বরং কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করা। কোন সৃষ্টির এ কাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতই কোন পূর্বনমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করে। দ্বিতীয় গুণ فَسَوّٰى এটা تسوية থেকে উদ্ভূত। অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিশেষ মিল রেখে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ ও প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকে তার প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। হস্তপদ ও অংগসমূহের মধ্যে এমন জোড় ও প্রাকৃতিক স্প্রিং সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এগুলোকে চতুর্দিকে ঘোরানো-মোড়ানো যায়। এই বিস্ময়কর মিল স্রষ্টার রহস্য ও শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট।

তৃতীয়গুণ قَدَّرَ—تقدير-এর অর্থ কোন বস্তুকে বিশেষ পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি

করা। শব্দটি ফয়সালা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ্র ফয়সালা। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার বস্তুসমূহকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করে সে কাজের উপযুক্ত সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এটা কোন বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে সীমিত নয়—সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকেই আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং সে কাজেই নিয়োজিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তার পালনকর্তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আকাশ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি থেকে শুরু করে মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ সবাইকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যেতে দেখা যায়ঃ ابروباد ومه خورشيد وفلک رکاد رند —মাওলানা রুমী বলেছেন ঃ

خاک وباد وآب وآتش بنده اند
با من وتو مرده با حق زنده اند

বিশেষত মানুষ ও জীবজন্তুর প্রত্যেক প্রকারকে আল্লাহ্ তা'আলা যে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা প্রকৃতিগতভাবে সে কাজই করে যাচ্ছে। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সে কাজকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছে ঃ

هریکے را بہر کارے ساختند
میل اورا در دلش انداختند

চতুর্থ গুণ فَهَدٰى—অর্থাৎ স্রষ্টা যে কাজের জন্য যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিতেই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিম্নস্তরের। অন্য আয়াতে আছে ঃ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করে এক অস্তিত্ব দিয়েছেন, অতঃপর তার সংশ্লিষ্ট কাজের পথনির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ এ পথনির্দেশের প্রভাবে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টির আদি থেকে যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছে, সে কাজ হুবহু তেমনিভাবে কোনরূপ ত্রুটি ও অলসতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করে চলেছে। বিশেষ করে মানুষ ও জীবজন্তুর বুদ্ধি ও চেতনা তো সবসময় চোখের সামনেই রয়েছে। তাদের সম্পর্কে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, তাদের প্রত্যেক শ্রেণী বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র অর্জন করার এবং প্রতিকূল পরিবেশে থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিস্ময়কর সূক্ষ্ম নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বাধিক বুদ্ধি ও চেতনাশীল জীব মানুষের কথা বাদ

দিন, বনের হিংস্র-জন্তু, পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গকে লক্ষ্য করুন—প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ, বসবাস এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য কেমন সব কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো বিশ্ব স্রষ্টার তরফ থেকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা। তারা কোন স্কুল-কলেজ থেকে কিংবা কোন ওস্তাদের কাছ থেকে এসব শিক্ষা করেনি বরং এগুলো সব সাধারণ আল্লাহ্র পথনির্দেশেরই ফলশ্রুতি যা أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ

ثُمَّ هَدَىٰ —এবং এই সূরার قَدَّرَ فَهَدَىٰ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র দান ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সর্বাধিক জ্ঞান ও চেতনা দান করেছেন এবং তাকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সমগ্র পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং এগুলোতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ মানুষের সেবা ও উপকারের জন্য সৃজিত হয়েছে কিন্তু এগুলোর দ্বারা পুরোপুরি ও বিভিন্ন প্রকার উপকার লাভ করা এবং বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে নতুন জিনিস সৃষ্টি করা অত্যধিক জ্ঞান ও নৈপুণ্যসাপেক্ষ কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে এমন সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি নিহিত রেখেছেন যে, সে পর্বত খনন করে এবং সাগর গর্ভে ডুবে গিয়ে শত প্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক সামগ্রী আহরণ করতে পারে এবং কাঠ, লোহা, তামা, পিতল ইদ্যাদির সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন বস্তু নির্মাণ করতে পারে। এ জ্ঞান ও নৈপুণ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কলেজের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়। জগতের আদিকাল থেকে অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তিরাও এসব কাজ করে আসছে। প্রকৃতিগত এ বিজ্ঞানই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। অতঃপর শাস্ত্রীয় ও শিক্ষাগত গবেষণার মাধ্যমে এতে উন্নতি লাভ করার প্রতিভাও আল্লাহ্ তা'আলারই দান।

সবাই জানে যে, বিজ্ঞান কোন বস্তু সৃষ্টি করে না বরং আল্লাহ্র সৃজিত বস্তুসমূহের ব্যবহার শিক্ষা দেয়। এ ব্যবহারের সামান্য স্তর তো আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর এতে কারিগরি গবেষণা ও উন্নতির এক বিস্তৃত ময়দান খোলা রেখে মানুষের প্রকৃতিতে তা বোঝার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রেখেছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে নিত্যই নতুন নতুন আবিষ্কার সামনে আসছে এবং আল্লাহ্ জানেন ভবিষ্যতে আরও কি কি আসবে। বলা বাহুল্য, এ সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ এবং কোরআনের একটি মাত্র শব্দ فَهَدَىٰ -এর প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে এসব কাজের পথ দেখিয়েছেন এবং তা সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান করেছেন। পরিতাপের বিষয়, যারা বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করেছে, তারা কেবল এ মহাসত্য সম্পর্কে অজ্ঞই নয় বরং দিন দিন অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ — مَرْعَىٰ শব্দের অর্থ পশু-চারণ ভূমি এবং غُثَاءً-শব্দের অর্থ আবর্জনা যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে।

احوى শব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাঢ় সবুজ রং। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হিকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কাল রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে মানুষের পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেহের এ সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফূর্তি ও চাতুর্য আল্লাহ্ তা'আলারই দান। কিন্তু পরিশেষে এসবই নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও হিকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নবুয়তের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআনের কোন আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলী বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশংকায় জিবরাঈল (আ)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, জিবরাঈল (আ)-এর চলে যাওয়ার পর কোরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করানো এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। এর ফলে فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ—অর্থাৎ আপনি কোন বিষয় বিস্মৃত হবেন না সে অংশ ব্যতীত যা কোন উপযোগিতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইবেন। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনে কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিষ্কার দ্বিতীয় আদেশ নাযিল করা। এর আর একটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রসূলুল্লাহ (সা) ও সকল মুসলমানের স্মৃতি থেকে তা মুছে দেওয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ আমি কোন আয়াত রহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই। কেউ কেউ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ -এর অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন উপযোগিতা বশত কোন আয়াত সাময়িকভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন এটা সম্ভবপর। হাদীসে আছে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন একটি সূরা তিলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : মনসূখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি। (কুরতুবী) অতএব উল্লিখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সাময়িকভাবে কোন আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ —এর আক্ষরিক তরজমা এই যে, আমি আপনাকে সহজ করে দেব সহজ পদ্ধতির জন্য। সহজ পদ্ধতি বলে ইসলামী শরীয়ত বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বাহ্যত এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি এ পদ্ধতি ও শরীয়তকে আপনার জন্য সহজ করে দেব। কিন্তু এর পরিবর্তে কোরআন বলেছে, আপনাকে এই শরীয়তের জন্য সহজ করে দেব। এর তাৎপর্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এরূপ করে দেবেন যে, শরীয়ত আপনার মজ্জা ও স্বভাবে পরিণত হবে এবং আপনি তার ছাঁচে গঠিত হয়ে যাবেন।

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ —পরবর্তী আয়াতসমূহে নবুয়তের কর্তব্য পালনে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল।

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কর্তব্য পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষ হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও তবে এ কাজ করা উচিত। বলা বাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং কাজটি যে অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোন সময় পরিত্যাগ করবেন না।

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ —زكو -এর আসল অর্থ শুদ্ধ করা। ধন-সম্পদের যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে শুদ্ধ করে। এখানে تزكى -শব্দের অর্থ ব্যাপক। এতে ঈমানগত ও চরিত্রগত শুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ —অর্থাৎ তারা পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং নামায আদায় করে। বাহ্যত এতে ফরয ও নফল সবরকম নামায অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের নামায দ্বারা এর তফসীর করেছেন। তাও এতে শামিল।

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا —হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন: সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি থেকে উধাও ও অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে অনুপস্থিতের উপর

প্রাধান্য দিয়ে বসে, যা তাদের জন্য চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্র কিতাবও রসূলগণের মাধ্যমে পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও বিদ্যমান। একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ বস্তুতে মজে যাওয়া ও তার জন্য স্বীয় শক্তি ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে :

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ তোমরা যারা দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দাও, একটু চিন্তা কর যে, তোমরা কি বস্তু ছেড়ে কি বস্তু অবলম্বন করছ। যে দুনিয়ার জন্য তোমরা পাগলপারা, প্রথমত তার বৃহত্তম সুখ এবং আনন্দ ও দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, দ্বিতীয়ত তার কোন স্থিরতা ও স্থায়িত্ব নেই। আজ যে বাদশাহ্, কাল সে পথের ভিখারী। আজিকার যুবক ও বীর্যবান, আগামীকাল দুর্বল ও অক্ষম। এটা দিবারাত্রি চোখের সামনে ঘটছে। এর বিপরীতে পরকাল এসব দোষ থেকে মুক্ত। পরকালের প্রত্যেক নিয়ামত ও সুখ উৎকৃষ্টই উৎকৃষ্ট—দুনিয়ার কোন নিয়ামত ও সুখের সাথে তার কোন তুলনা হয় না। তদুপরি তা اَبْقٰى অর্থাৎ চিরস্থায়ী। মানুষ চিন্তা করুক, যদি তাকে বলা হয়—তোমার সামনে দু'টি গৃহ আছে। একটি সুউচ্চ প্রাসাদ যা যাবতীয় বিলাসসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত এবং অপরটি মামুলী কুঁড়েঘর, যাতে কোন সাজসরঞ্জামও নেই। এখন হয় তুমি এই প্রাসাদোপম বাংলো গ্রহণ কর কিন্তু কেবল এক দু'মাসের জন্য—এরপর একে খালি করে দিতে হবে, না হয় এই কুঁড়েঘর গ্রহণ কর, যা তোমার চিরস্থায়ী মালিকানায় থাকবে। এখন প্রশ্ন এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে পরকালের নিয়ামত যদি অসম্পূর্ণ ও নিম্নস্তরেরও হত, তবুও চিরস্থায়ী হওয়ার কারণে তাই অগ্রাধিকারের যোগ্য ছিল। অথচ বাস্তবে যখন এই নিয়ামত দুনিয়ার নিয়ামতের মুকাবিলায় উৎকৃষ্ট, উত্তম ও চিরস্থায়ীও, তখন কোন বোকারাম হতভাগাই এ নিয়ামত পরিত্যাগ করে দুনিয়ার নিয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে।

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى—অর্থাৎ এই সূরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (অর্থাৎ পরকাল উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী হওয়া) পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও লিখিত আছে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আ)-এর সহীফাসমূহে। হযরত মূসা (আ)-কে তওরাতের পূর্বে কিছু সহীফাও দেওয়া হয়েছিল। এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে অথবা তওরাতও বোঝানো যেতে পারে।

ইবরাহীমী সহীফার বিষয়বস্তু : হযরত আবূযর গিফারী (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা কিরূপ ছিল? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছিল। তন্মধ্যে এক দৃষ্টান্তে অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : হে ভুঁইফোঁড় গর্বিত বাদশাহ্, আমি তোমাকে ধনৈশ্বর্য

স্তূপীকৃত করার জন্য রাজত্ব দান করিনি বরং আমি তোমাকে এজন্য শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতের বদদোয়া আমা পর্যন্ত পৌঁছতে না দাও। কেননা, আমার আইন এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফিরের মুখ থেকে হয়।

অপর এক দৃষ্টান্তে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : বুদ্ধিমানের কাজ হল, নিজের সময়কে তিনভাগে বিভক্ত করা। এক ভাগ তার পালনকর্তার ইবাদত ও তাঁর সাথে মুনাজাতের, এক ভাগ আত্মসমালোচনার ও আল্লাহর মহাশক্তি এবং কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং এক ভাগ জীবিকা উপার্জনের ও স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর।

আরও বলা হয়েছে : বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য এই যে, সে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে, উদ্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং জিহবার হিফাযত করবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাকেও নিজের কর্ম বলে মনে করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং কেবল জরুরী বিষয়ে সীমিত থাকবে।

মূসা (আ)-র সহীফার বিষয়বস্তু : হযরত আবূযর (রা) বলেন : অতঃপর আমি মূসা (আ)-র সহীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এসব সহীফায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুই ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ :

আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করি, যে মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। অতঃপর সে কিরূপে আনন্দিত থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে বিধিলিপি বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরূপে অপারক, হতোদ্যম ও চিন্তাযুক্ত হয়। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উত্থান-পতন দেখে, সে কিরূপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী। অতঃপর সে কিরূপে কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকে? হযরত আবূ যর (রা) বলেন : অতঃপর আমি প্রশ্ন করলাম : এসব সহীফার কোন বিষয়বস্তু আপনার কাছে আগত ওহীর মধ্যেও আছে কি? তিনি বললেন : হে আবূ যর, এ আয়াতগুলো সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ কর— قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ——(কুরতুবী)

سورة الغاشية

সূরা গাশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২৬ আয়াত ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ

ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ﴿٧﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيْهَا عَيْنٌ

جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٣﴾ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ

﴿١٥﴾ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَاِلَى

السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَاِلَى الْاَرْضِ

كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾

اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ اِنَّ

اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? (২) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, (৩) ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। (৪) তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। (৫) তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। (৬) কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই। (৭) এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না। (৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব. (৯) তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। (১০) তারা

থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে (১১) তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। (১২) তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরনা। (১৩) তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন (১৪) এবং সংরক্ষিত পানপাত্র (১৫) এবং সারি সারি গালিচা (১৬) এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (১৭) তারা কি উল্টের প্রতি লক্ষ্য করে না যে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা (১৮) এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? (১৯) এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? (২০) এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে? (২১) অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, (২২) আপনি তাদের শাসক নন, (২৩) কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফির হয়ে যায়, (২৪) আল্লাহ্ তাকে মহা আযাব দেবেন। (২৫) নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার কাছে সব কিছুকে আচ্ছন্নকারী সে ঘটনার কিছু সংবাদ পৌঁছেছে কি? (অর্থাৎ কিয়ামতের। তার প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বকে গ্রাস করবে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য, পরবর্তী কথা শোনার আগ্রহ সৃষ্টি করা। অতঃপর জওয়াবের আকারে সংবাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে)। অনেক মুখমণ্ডল সেদিন লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হবে। তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। তাদেরকে ফুটন্ত ঝরনা থেকে পানি পান করানো হবে। কণ্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের কোন খাদ্য থাকবে না, যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। (অর্থাৎ তাতে খাদ্য হওয়ার এবং ক্ষুধা দূর করার যোগ্যতা নেই। ক্লিষ্ট হওয়ার অর্থ হাশরে অস্থির হয়ে ঘোরাফেরা করা, জাহান্নামে শিকল ও বেড়ী টানা এবং পাহাড়-পর্বতে আরোহণ করা। ফুটন্ত ঝরনাকেই অন্য আয়াতে حميم বলা হয়েছে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, জাহান্নামে ফুটন্ত পানিরও ঝরনা হবে। যরী ব্যতীত খাদ্য হবে না। এর অর্থ সুস্বাদু খাদ্য হবে না। সুতরাং যাক্কুম, গিসলীন ইত্যাদি খাদ্য থাকা এর পরিপন্থী নয়। মুখমণ্ডল বলে ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়েছে। অতঃপর জাহান্নামী-দের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছেঃ) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল এবং তাদের সৎ কর্মের কারণে প্রফুল্ল হবে। তারা সুউচ্চ জান্নাতে থাকবে। তথায় তারা কোন অসার কথা শুনবে না। তথায় প্রবাহিত ঝরনা থাকবে। জান্নাতে উচ্চ উচ্চ আসন বিছানো আছে এবং রক্ষিত পানপাত্র আছে। (অর্থাৎ এসব সাজ-সরঞ্জাম সামনেই উপস্থিত থাকবে, যাতে পাওয়ার ইচ্ছা হলে পেতে দেরী না হয়)। সারি সারি গালিচা আছে এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট আছে। (ফলে যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই আরাম করতে পারবে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতেও হবে না। এসব বিষয়বস্তু শুনে যারা কিয়ামত অস্বীকার করে তারা ভুল করে। কেননা) তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃজিত হয়েছে (এর আকৃতি ও স্বভাব অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় আশ্চর্যজনক) এবং আকাশের দিকে যে কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে এবং পাহাড়ের দিকে যে কিভাবে

তা স্থাপিত হয়েছে এবং পৃথিবীর দিকে যে কিভাবে তা বিছানো হয়েছে? (অর্থাৎ এসব বস্তু দেখে আল্লাহর কুদরত বোঝে না কেন যাতে কিয়ামতের ব্যাপারে তাঁর সক্ষমতাও বুঝতে পারত। বিশেষভাবে এই চারটি বস্তু উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা প্রায়ই প্রান্তরে চলাফেরা করত। তখন তাদের সামনে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূমি এবং চারদিকে পাহাড়-পর্বত থাকত। তাই এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। প্রমাণাদি দেখা সত্ত্বেও তারা যখন চিন্তা-ভাবনা করে না, তখন আপনিও তাদের চিন্তায় পড়বেন না। বরং) উপদেশ দিন। কেননা আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। আপনি তাদের শাসক নন—(যে, বেশী চিন্তা করতে হবে)। কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কুফর করে, আল্লাহ্ তাকে পরকালে মহাশাস্তি দেবেন। কেননা, আমারই কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে, অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশও আমারই কাজ। (কাজেই আপনি অধিক চিন্তিত হবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ—কিয়ামতে মু'মিন ও কাফির আলাদা আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফিরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তা خَاشِعَةٌ অর্থাৎ হেয় হবে। خشوع শব্দের অর্থ নত হওয়া ও লাঞ্ছিত হওয়া। নামাযে খুশুর অর্থ আল্লাহ্র সামনে নত হওয়া, হেয় হওয়া। যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্র সামনে খুশু অবলম্বন করেনি, কিয়ামতে এর শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে : عَامِلَةٌ—نَاصِبَةٌ—বাকপদ্ধতিতে অবিরাম কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে عامله এবং ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় ناصبه-বলা বাহুল্য, কাফিরদের এ দু'অবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা পরকালে কোন কর্ম ও মেহনত নেই। তাই কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন : প্রথম অবস্থা অর্থাৎ মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত হওয়া তো পরকালে হবে এবং পরবর্তী দু'অবস্থা কাফিরদের দুনিয়াতেই হয়। কেননা অনেক কাফির দুনিয়াতে মুশরিকসুলভ ইবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধ্যবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু যোগী ও খৃস্টান পাদ্রী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্ তা'আলারই সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াতে ইবাদত ও সাধনা করে থাকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করে। কিন্তু এসব ইবাদত মুশরিকসুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহ্র কাছে সওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রইল এবং পরকালে তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রাখবে।

হযরত হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন, খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) যখন

শাম দেশে সফরে গমন করেন, তখন জনৈক খৃস্টান বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছে আগমন করে। সে তার ধর্মীয় ইবাদত, সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশী আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোন শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেনঃ এই বৃদ্ধের করুণ অবস্থা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারা স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবনপণ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে কিন্তু সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। অতঃপর খলীফা হযরত উমর (রা) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ —আয়াত তিলাওয়াত করলেন।—(কুরতুবী)

حَامِيَةً — نَارًا حَامِيَةً শব্দের অর্থ গরম, উত্তপ্ত। অগ্নি স্বভাবতই উত্তপ্ত। এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা একথা বলার জন্য যে, এই অগ্নির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোন সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না বরং এটা চিরন্তন উত্তপ্ত।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ —অর্থাৎ যরী ব্যতীত জাহান্নামীরা কোন খাদ্য পাবে না। যরী পৃথিবীর এক প্রকার কণ্টকবিশিষ্ট ঘাস যা মাটিতেই ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর ধারেকাছেও যায় না।

জাহান্নামে ঘাস, বৃক্ষ কিরূপে হবে? এখানে প্রশ্ন হয় যে, ঘাস-বৃক্ষ তো আগুনে পুড়ে যায়। জাহান্নামে এগুলো কিরূপে থাকবে? জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে এগুলোকে পানি ও বায়ু দ্বারা লালন করেছেন। তিনি জাহান্নামে এগুলোকে অগ্নিতে পরিণত করতেও সক্ষম; ফলে আগুনেই বাড়বে, ফলন্ত হবে।

কোরআনে জাহান্নামীদের খাদ্য সম্পর্কে যরী ব্যতীত যাক্কুম ও গিস্লীনেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সীমিত করে বলা হয়েছে যে, যরী ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য থাকবে না। এর অর্থ এই যে, জাহান্নামীরা কোন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য পাবে না বরং যরীর মত কষ্টদায়ক বস্তু খেতে দেওয়া হবে। অতএব, যাক্কুম এবং গিসলীনও যরীর অন্তর্ভুক্ত। কুরতুবী বলেনঃ সম্ভবত জাহান্নামীদের বিভিন্ন স্তর থাকবে এবং বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন খাদ্য হবে—কোথাও যরী, কোথাও যাক্কুম এবং কোথাও গিসলীন।

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ —জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যরী—একথা শুনে কোন কোন কাফির বলতে থাকে যে, আমাদের উট তো যরী খেয়ে খুব মোটাতাজা হয়ে যায়। এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার যরী দ্বারা জাহান্নামের যরীকে বোঝার

চেষ্টা করো না। জাহান্নামের যরী খেয়ে কেউ মোটাতাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً —অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীরা কোন অসার ও মর্মন্তুদ কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মিথ্যা, কুফরী কথাবার্তা, গালিগালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا —অর্থাৎ তারা জান্নাতে কোন অনর্থক ও দোষারোপের কথা শুনবে না। আরও কতিপয় আয়াতে এ বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, দোষারোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় সামাজিক রীতিনীতি ঃ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ — اكواب শব্দটি كوب-এর বহুবচন। অর্থ পানপাত্র, যথা গ্লাস ইত্যাদি। موضوعة অর্থাৎ নির্দিষ্ট জায়গায় পানির সন্নিকটে রক্ষিত থাকবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পানপাত্র পানির কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক-সেদিক থাকে এবং পানি পান করার সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের বস্তু—যেমন বদনা, গ্লাস, তোয়ালে ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা এবং ব্যবহারের পর সেখানেই রেখে দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া উচিত যাতে অন্যদের কষ্ট না হয়। জান্নাতীদের পানপাত্র পানির কাছে রক্ষিত থাকবে —একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ —কিয়ামতের অবস্থা এবং মু'মিন ও কাফিরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর কিয়ামতে অবিশ্বাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার কথা বলেছেন। আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরুচারী আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তে সফর করে। তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূপৃষ্ঠ এবং অগ্র-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা। এই চারটি বস্তু সম্পর্কেই তাদেরকে চিন্তাভাবনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শন বাদ দিয়ে যদি এ চারটি বস্তু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়, তবে আল্লাহ্র অপার কুদরত চাক্ষুষ দেখা যাবে।

জন্তুদের মধ্যে উটের এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যা বিশেষভাবে চিন্তাশীলদের

জন্য আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও কুদরতের দর্পণ হতে পারে। প্রথমত আরবে দেহাবয়বের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ জীব হচ্ছে উট। সে দেশে হাতী নেই। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলা এই বিশাল বপু জীবকে এমন সহজলভ্য করেছেন যে, আরবের বেদুইন ও দরিদ্রতম ব্যক্তিও এই বিরাট জীবকে লালন-পালন করতে মোটেই অসুবিধা বোধ করে না। কারণ, একে ছেড়ে দিলে নিজে নিজেই পেটভরে খেয়ে চলে আসে। উঁচু বৃক্ষের পাতা ছিঁড়ে দেওয়ার কষ্টও স্বীকার করতে হয় না। সে নিজেই বৃক্ষের ডাল খেয়ে খেয়ে দিনাতিপাত করে। হাতী ও অন্যান্য জীবের ন্যায় তাকে দুর্মূল্য খাবার দিতে হয় না। আরবের প্রান্তরে পানি খুবই দুষ্প্রাপ্য বস্তু। সর্বত্র সর্বদা পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা উটের পেটে একটি রিজার্ভ টাংকী স্থাপন করেছেন। সে সাত-আট দিনের পানি একবারে পান করে এক টাংকীতে ভরে নেয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে সে এই রিজার্ভ পানি ব্যয় করে। এত উঁচু জীবের পিঠে সওয়ার হওয়ার জন্য স্বভাবতই সিঁড়ির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার পা তিন ভাঁজে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ প্রত্যেক পায়ে দু'টি করে হাঁটু রেখেছেন। সে যখন সবগুলো হাঁটু গেড়ে বসে যায়, তখন তার পিঠে সওয়ার হওয়া ও নামা খুব সহজ হয়ে যায়। উট এত পরিশ্রমী যে, সব জীবের চেয়ে অধিক বোঝা বহন করতে পারে। আরবের প্রান্তরসমূহে অসহনীয় রৌদ্রতাপের কারণে দিবাভাগে সফর করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা এই জীবকে সারারাত্রি সফরে অভ্যস্ত করে দিয়েছেন। উট এত নিরীহ প্রাণী যে, একটি ছোট বালিকাও তার নাকারশি ধরে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া আল্লাহ্‌র কুদরতের সবক দেয় এমন আরও বহু বৈশিষ্ট্য উটের মধ্যে রয়েছে। সূরার উপসংহারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে ঃ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ —অর্থাৎ আপনি তাদের শাসক নন যে, তাদেরকে মু'মিন করতেই হবে। আপনার কাজ শুধু প্রচার করা ও উপদেশ দেওয়া। এতটুকু করেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান আমার কাজ।

سورة الفجر

সূরা ফজর

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৩০ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ
قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧
الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩
وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝١٠ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝١١ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝١٢
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤ فَاَمَّا
الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ۝١٥
وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ۝١٦ كَلَّا بَلْ
لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝١٧ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝١٨ وَتَاْكُلُوْنَ
التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۝١٩ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝٢٠ كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا
دَكًّا ۝٢١ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝٢٢ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ
يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝٢٣ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۝٢٤
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۝٢٥ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ۝٢٦ يٰٓاَيَّتُهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝٢٧ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝٢٨ فَادْخُلِيْ فِيْ
عِبٰدِيْ ۝٢٩ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝٣٠

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) শপথ ফজরের, (২) শপথ দশ রাত্রির, (৩) শপথ তার, যা জোড় ও যা বেজোড় (৪) এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে, (৫) এর মধ্যে আছে শপথ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে। (৬) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, (৭) যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং (৮) যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি (৯) এবং সামূদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল (১০) এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে, (১১) যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল। (১২) অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। (১৩) অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশা-ঘাত করলেন। (১৪) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (১৫) মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে: আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন (১৬) এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে: আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। (১৭) এটা অমূলক বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না (১৮) এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না (১৯) এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল (২০) এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভাল-বাস। (২১) এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে (২২) এবং আপনার পালন-কর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, (২৩) এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে? (২৪) সে বলবে: হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম! (২৫) সেদিন তার শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিবে না (২৬) এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দেবে না। (২৭) হে প্রশান্ত মন, (২৮) তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। (২৯) অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও (৩০) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ ফজরের সময়ের এবং (যিলহজ্জের) দশ রাত্রির (অর্থাৎ দশদিনের। এই দিনগুলোর ফযীলত অনেক)। শপথ তার যা জোড় ও যা বেজোড়। (জোড় বলে যিল-হজ্জের দশম তারিখ এবং বেজোড় বলে নবম তারিখ বোঝানো হয়েছে। অন্য এক হাদীসে আছে যে, এর অর্থ নামায। কোন নামাযের রাক'আত জোড় এবং কোন নামাযের রাক'আত বেজোড়। প্রথম রেওয়ায়েতকে বর্ণনা ও অর্থ উভয় দিক দিয়ে অধিক সহীহ্ বলা হয়েছে। কারণ, এই সূরায় সময়েরই শপথ করা হয়েছে। সুতরাং জোড় ও বেজোড়ও সময়েরই শপথ হওয়া সঙ্গত। এরূপও বলা যায় যে, জোড় ও বেজোড় বলে যা যা সম্মা-নার্হ, তাই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় সময়ও এর অন্তর্ভুক্ত এবং নামাযের রাক'আতও

দাখিল)। শপথ রাত্রির, যখন তা গত হতে থাকে (যেমন অন্য আয়াতে আছে وَاللَّيْلِ

إِذْ أَدْبَرَ —অতঃপর এই শপথটি যে মহান, মধ্যবর্তী বাক্যে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে)

এর মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট শপথ আছে কি? [এ প্রশ্নের অর্থ আরও জোরদার করা অর্থাৎ উল্লিখিত শপথগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি শপথ বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য যথেষ্ট। কোরআনে উল্লিখিত সব শপথই এ ধরনের কিন্তু গুরুত্ব বোঝাবার জন্য এ শপথের যথেষ্টতা পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ

لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ শপথের উহ্য জওয়াব এই যে, কাফিরদের অবশ্যই শাস্তি হবে। পরবর্তী শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত থেকে একথা বোঝা যায়।—(জালালাইন)] আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং সারা বিশ্বের শহরসমূহে শক্তি ও বলবীর্যে যাদের সমান কোন লোক সৃজিত হয়নি? [এ সম্প্রদায়ের দুটি উপাধি ছিল আদ ও ইরাম। আ'দ আসের, আস্ ইরামের এবং ইরাম ছিল নূহ-তনয় সামের পুত্র। সুতরাং, কখনও তাদেরকে পিতার নামে আ'দ বলা হয়, আবার কখনও দাদার নামে ইরাম বলা হয়। ইরামের অপর পুত্র ছিল আবের এবং আবেরের পুত্র ছিল সামূদ। এই নামে একটি বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অতএব, আ'দ আসের মধ্যস্থতায় এবং সামূদ আ'বেরের মধ্যস্থতায় ইরামের সাথে মিলিত হয়ে যায়। আয়াতে আ'দের সাথে ইরামকে যুক্ত করার কারণ এই যে, আ'দ বংশের দুটি স্তর রয়েছে—পূর্ববর্তী যাদেরকে প্রথম আ'দ বলা হয় এবং পরবর্তী, যাদেরকে দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়। ইরাম শব্দ যোগ করায় ইঙ্গিত হয়ে গেল যে, এখানে প্রথম আ'দ বোঝানো হয়েছে। কেননা, কম মধ্যস্থতার কারণে ইরাম শব্দের অর্থ প্রথম আ'দই হয়ে থাকে—(রূহুল মা'আনী) অতঃপর অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত উম্মতের কথা বলা হয়েছে যে, আপনি কি লক্ষ্য করেননি]—সামূদ গোত্রের সাথে (কি আচরণ করেছেন) যারা কোরা উপত্যকায় (পাহাড়ের) পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। ('ওয়াদিউল কোরা' তাদের একটি শহরের নাম; যেমন অপর এক শহরের নাম ছিল 'হিজর'। এগুলো সবই হেজায ও শামের মধ্যস্থলে অবস্থিত সামূদ গোত্রের বাসস্থান)। এবং কীলকের অধিপতি ফিরাউনের সাথে।—(দুররে মনসূরে বর্ণিত আছে ফিরাউন যাকে শাস্তি দিত তার চার হাত-পায়ে কীলক এঁটে দিয়ে শাস্তি দিত। অতঃপর সব সম্প্রদায়ের অভিন্ন অপরাধ উল্লেখ করা হয়েছে—) যারা শহরসমূহে গর্বিত মস্তক উঁচু করে রেখেছিল এবং তথায় বিস্তর অশান্তি বিরাজ করেছিল। অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন। (অর্থাৎ আযাব নাযিল করলেন। এখানে আযাবকে চাবুকের সাথে এবং নাযিল করাকে আঘাত করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর এই শাস্তির

কারণ এবং উপস্থিত কাফিরদের শিক্ষার জন্য ইরশাদ হচ্ছেঃ) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা (অবাধ্যদের প্রতি) সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (ফলে উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলোকে তো ধ্বংস করে দিয়েছেনই এবং বর্তমান লোকদেরকেও আযাব দেবেন)। অতএব (এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কাফিরদের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আযাব ডেকে আনে, এমন কর্ম থেকে বেঁচে থাকা উচিত ছিল কিন্তু কাফির) মানুষ যে, (যে কর্মই তারা অবলম্বন করে সেগুলোর উৎস দুনিয়াপ্রীতি; সেমতে তাকে তার পালনকর্তা পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন (যেমন, ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি দেন, যার উদ্দেশ্য তার কৃতজ্ঞতা যাচাই করা) তখন সে (একে তার প্রাপ্য বলে মনে করে গর্বে ও অহংকারভরে) বলে, আমার পালনকর্তা আমার সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ আমি তাঁর প্রিয়পাত্র বলেই আমাকে এমন সব নিয়ামত দান করেছেন)। এবং যখন তাকে (অন্যভাবে) পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, (যার উদ্দেশ্য তার সবর ও সন্তুষ্টি যাচাই করা) তখন সে (অভিযোগের সুরে) বলেঃ আমার পালনকর্তা আমার সম্মান হ্রাস করেছেন। (অর্থাৎ আমি সম্মানের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ইদানিং আমাকে হেয় করে রেখেছেন। ফলে পার্থিব নিয়ামতও হ্রাস পেয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কাফির দুনিয়াকেই মূল লক্ষ্য মনে করে। ফলে এর স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রমাণ এবং নিজেকে এর যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে। পক্ষান্তরে এর দুঃখকষ্টকে বিতাড়িত হওয়ার দলীল এবং নিজেকে এর পাত্র নয় বলে মনে করে। সুতরাং কাফির ব্যক্তি দুটি ভুল করে—এক. দুনিয়াকে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করা। এ থেকে পরকালে অবিশ্বাস জন্মলাভ করে। দুই. যোগ্যপাত্র হওয়ার দাবী করা। এথেকে গর্ব, অহংকার অকৃতজ্ঞতা, বিপদে হতাশা এবং ধৈর্যহীনতা জন্মলাভ করে। এগুলো সব আযাবের কারণ)। কখনই এরূপ নয়। (অর্থাৎ দুনিয়া মূল লক্ষ্য নয় এবং দুনিয়া থাকা না থাকা প্রিয়পাত্র অথবা অপ্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল নয়। কেউ কোন সম্মানের যোগ্য নয় এবং সবর ও কৃতজ্ঞতা ওয়াজিব হওয়ার গণ্ডি থেকে কেউ মুক্ত নয়। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কেবল এসব কর্মই আযাবের কারণ নয়) বরং (তোমাদের মধ্যে আরও অনেক কর্ম নিন্দনীয়, অপছন্দনীয় ও আযাবের কারণ রয়েছে। সেমতে) তোমরা এতীমকে সম্মান কর না (অর্থাৎ এতীমকে লাঞ্ছিত কর এবং জুলুম করে তার ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে ফেল) এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। (অর্থাৎ অপরের প্রাপ্য নিজেরাও পরিশোধ কর না এবং অপরকেও পরিশোধ করতে বল না। বস্তুত ওয়াজিব কাজ না করা কাফিরের জন্য আযাব বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। তবে কুফর ও শিরক আসল আযাবের ভিত্তি হয়ে থাকে)। তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণই কুক্ষিগত করে ফেল। (অর্থাৎ অপরের হকও খেয়ে ফেল। বর্তমান ব্যাখ্যা অনুযায়ী তখন উত্তরাধিকার মক্কায় প্রচলিত না থাকলেও ইবরাহিমী এবং ইসমাঈলী শরীয়তের উত্তরাধিকার প্রথা মক্কায় বিদ্যমান ছিল। সেমতে মূর্খতাযুগে শিশু ও মহিলাদেরকে উত্তরাধিকারের যোগ্য মনে না করা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, উত্তরাধিকার প্রথা পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিল। সূরা নিসায় এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে) এবং তোমরা ধনসম্পদকে খুবই ভালবাস। (উপরোক্ত

কুকর্মসমূহ এরই ফলশ্রুতি। কেননা, দুনিয়াপ্রীতিই সব পাপের মূল কারণ। সারকথা, এসব ক্রিয়াকর্মই শাস্তির কারণ। অতঃপর যারা এসব কর্মকে শাস্তির কারণ মনে করে না, তাদেরকে শাসানো হয়েছে—) কখনও এরূপ নয়। (এসব কর্ম শাস্তির কারণ অবশ্যই হবে। অতঃপর শাস্তি ও প্রতিদানের সময় বর্ণনা করা হয়েছে—) যখন পৃথিবী (অর্থাৎ পৃথিবীর সুউচ্চ অংশ, যথা পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি) চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে (ফলে ভূপৃষ্ঠ সমান্তরাল হয়ে যাবে, যেমন অন্য আয়াতে আছে لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا) এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ (হাশরের ময়দানে) সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবে। (হিসাব-নিকাশের সময় এটা হবে। আল্লাহ্ তা'আলার উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না)। এবং সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে, সেদিন মানুষ বুঝবে এবং এই বোঝা তার কি কাজে আসবে? (অর্থাৎ এখন বুঝলে তার কোন উপকার হবে না। কারণ, সেটা প্রতিদান জগৎ—কর্মজগৎ নয়)। সে বলবে: হায়, এ জীবনের জন্য যদি আমি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম। সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দেবে না এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দেবে না। (অর্থাৎ এমন কঠোর শাস্তি ও বন্ধন দেবেন, যা দুনিয়াতে কেউ কাউকে দেয়নি। অতঃপর আল্লাহ্র বাধ্য বান্দাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:) হে প্রশান্ত রূহ, (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্যে বিশ্বাসী ছিল এবং কোন প্রকার সন্দেহ ও অস্বীকার করত না। রূহ সেরা অঙ্গ, তাই রূহ বলে ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে)। তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। (مُطْمَئِنَّةُ শব্দের মাঝে তাদের সৎকর্মসমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সৎকর্মের প্রতি ইঙ্গিত এবং শাস্তির কর্মসমূহের বিবরণ দানের কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে মক্কাবাসীদেরকে শোনানোই প্রধান উদ্দেশ্য। তখন মক্কায় এ জাতীয় কর্মের লোক বেশী ছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় পাঁচটি বস্তুর শপথ করে اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ আয়াতে বর্ণিত বিষয়-বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দুনিয়াতে তোমরা যা কিছু কর, তার শাস্তি ও প্রতিদান অপরিহার্য ও নিশ্চিত। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

শপথের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে ফজর অর্থাৎ সোবহে-সাদেকের সময়। এখানে প্রত্যেক দিনের প্রভাতকালও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। এখানে বিশেষ দিনের প্রভাতকালও বোঝানো যেতে পারে। তফসীরবিদ সাহাবী হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়র (রা) থেকে প্রথম অর্থ এবং ইবনে আব্বাসের এক

রেওয়ায়েতে ও হযরত কাতাদাহ্ (রা) থেকে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল বর্ণিত হয়েছে। এ দিনটি ইসলামী চান্দ্র বছরের সূচনা।

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল। মুজাহিদ (র) ও ইকরিমা (রা)-এর উক্তি তাই। বিশেষ করে এদিনের শপথ করার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দিনের সাথে একটি রাত্রি সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামী নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে থাকে। একমাত্র 'ইয়াওমুন্নহর' তথা যিলহজ্জের দশম তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে কোন রাত্রি নেই। কারণ, এর পূর্বের রাত্রি এ দিনের রাত্রি নয় বরং আইনত তা আরাফারই রাত্রি। এ কারণেই কোন হাজী যদি 'ইয়াওমে-আরাফা' তথা নবম তারিখে দিনের বেলায় আরাফাতের ময়দানে পৌঁছতে না পারে এবং রাত্রিতে সোবহে সাদেকের পূর্বে কোন সময় পৌঁছে যায়, তবে তার আরাফাতে অবস্থান সিদ্ধ ও হজ্জ শুদ্ধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবসের রাত্রি দু'টি—একটি পূর্বে ও একটি পরে এবং 'ইয়াওমুন্নহর' তথা দশম তারিখের কোন রাত্রি নেই। এদিক দিয়ে এ দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী।—(কুরতুবী)

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ্ এবং মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে এতে যিলহজ্জের প্রথম দশ রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কেননা, হাদীসে এসব রাত্রির ফযীলত বর্ণিত রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ইবাদত করার জন্য আল্লাহ্র কাছে যিলহজ্জের দশদিন সর্বোত্তম দিন। এর প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছর রোযার সমান এবং এতে প্রত্যেক রাত্রির ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমতুল্য।—(মাযহারী) হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ—এর তফসীর করেছেন, যিলহজ্জের দশদিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত মূসা (আ)-র কাহিনীতে وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেন ঃ হযরত জাবের (রা)-এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, যিলহজ্জের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মূসা (আ)-র জন্যও এই দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ—এ দু'টি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে 'জোড়' ও 'বেজোড়'। এই জোড় ও বেজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر—অর্থাৎ وتر-এর অর্থ আরাফা দিবস, (যিলহজ্জের নবম তারিখ) এবং شفع--এর অর্থ ইয়াওমুন্নহর (যিলহজ্জের দশম তারিখ)।

কুরতুবী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন : এটা সনদের দিক দিয়ে এমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ্, যাতে জোড় ও বেজোড় নামাযের কথা আছে। তাই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরিমা (রা) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত তফসীরই অবলম্বন করেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টজগৎ বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন : وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ—অর্থাৎ আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি; যথা কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত ও গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বেজোড় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা সত্তার— هُوَ اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ

وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ— يَسْرِى অর্থ রাত্রিতে চলা। অর্থাৎ রাত্রির শপথ, যখন সে চলতে থাকে তথা খতম হতে থাকে। এই পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা গাফিল মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বলেছেন : هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ — حِجْر -এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেওয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই حِجْر -এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্য এসব শপথও যথেষ্ট কি না? এই প্রশ্ন প্রকৃত পক্ষে মানুষকে গাফলতি থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে, তাঁর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করা সম্পর্কে এবং শপথের বিষয়সমূহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়, তার নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়েছে, তা এই যে, মানুষের প্রত্যেক কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং তার শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। শপথের এই জওয়াব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের উপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করেও একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি পরকালে হওয়া তো স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—এক. আ'দ বংশ, দুই. সামূদ গোত্র এবং তিন. ফিরাউন সম্প্রদায়। আ'দ ও সামূদ জাতিদ্বয়ের বংশতালিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে ইরাম শব্দটি আ'দ ও সামূদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। এখানে শুধু আ'দ-এর সাথে ইরাম উল্লেখ করার কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ — এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ'দ-গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম আ'দকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আ'দের তুলনায় আ'দের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে আ'দে-ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকেই এখানে عاد ارم শব্দ দ্বারা এবং সূরা নজ্ মে عاد الاولى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে : ذَاتِ الْعِمَادِ — عماد ও عمود শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদেরকে ذات العماد বলা হয়েছে। এই আ'দ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কোরআন পাক তাদের এই স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে : لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ অর্থাৎ এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃজিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও কোরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে আ'দের দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অদ্ভুত ধরনের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুকাতিল (র) থেকে তাদের উচ্চতা বার হাত তথা ১৮ ফুট বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য, তাঁরা ইসরাইলী রেওয়ায়েতদৃষ্টেই একথা বলেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : ইরাম আ'দ তনয় শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ ذَاتِ الْعِمَادِ — কেননা, এই অনুপম প্রাসাদটি বহু স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান এবং স্বর্ণরৌপ্য ও মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এই নগদ বেহেশতকে পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হল। ফলে সবাই ধ্বংস এবং কৃত্রিম বেহেশতও ধূলিসাৎ হয়ে গেল।—(কুরতুবী) এ তফসীরের দিক দিয়ে আয়াতে আ'দ গোত্রের একটি বিশেষ আযাব বর্ণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের উপর নাযিল হয়েছে। প্রথম তফসীর অনুযায়ী এতে আ'দ গোত্রের সমস্ত আযাবের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ — اوتاد শব্দটি وتد-এর বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফিরাউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এই শব্দের মধ্যে তার জুলুম-নিপীড়ন ও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ কারণই প্রসিদ্ধ। ফিরাউন যার প্রতি কুপিত হত, তার হস্তপদ চারটি কীলকে বেঁধে অথবা চার হাতপায়ে কীলক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে

দিত এবং তার দেহে সর্প, বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোন কোন তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়ার ঈমানপ্রকাশ করা এবং ফিরাউন কর্তৃক তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।—(মাযহারী)

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ—আ'দ, সামূদ ও ফিরাউন গোত্রের অপকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আযাবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কশাঘাত যেমন দেহের বিভিন্ন অংশে হয়, তেমনি তাদের উপরও বিভিন্ন প্রকার আযাব নাযিল করা হয়।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ—مرصاد ও مرصد শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঘাঁটি, যা কোন উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোন কোন তফসীরবিদ এ বাক্যকে পূর্বোক্ত শপথ বাক্যসমূহের জওয়াব সাব্যস্ত করেছেন।

দুনিয়াতে জীবনোপকরণের বাহুল্য ও স্বল্পতা আল্লাহর কাছে প্রিয়পাত্র ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আলামত নয়: فَأَمَّا الْإِنْسَانُ—আয়াতে আসলে কাফির ইনসান বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সেসব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা নিম্নরূপ ধারণায় লিপ্ত থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধনসম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে দেয়—এক. সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণগরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্যপাত্র। দুই. আমি আল্লাহ্র কাছেও প্রিয়পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নিয়ামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে ক্রুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল কিন্তু তাকে অহেতুক লাঞ্ছিত ও হেয় করা হয়েছে। কাফির ও মুশরিকদের মধ্যে এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং কোরআন পাক কয়েক জায়গায় তা উল্লেখও করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানও এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের অবস্থাই উল্লেখ করেছেন: كَلَّا—অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য সৎ ও আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দলীল নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। খোদায়ী দাবী করা সত্ত্বেও ফিরাউনের কোনদিন

মাথা ব্যথাও হয়নি, অপরপক্ষে কোন কোন পয়গম্বরকে শত্রুরা করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। রসূলে করীম (সা) বলেছেন, মুহাজিরগণের মধ্যে যারা দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিল, তারা ধনী মুহাজিরগণ অপেক্ষা চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবে।—(মাযহারী) অন্য এক হাদীসে আছে আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে ভালবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ।—(মাযহারী)

ইয়াতীমের জন্য ব্যয় করাই যথেষ্ট নয়, তাকে সম্মান করাও জরুরী : এরপর কাফিরদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ—অর্থাৎ তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। এখানে আসলে বলা উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় কর না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন কর না। কিন্তু 'সম্মান কর না' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয়-ভার বহন করলেই তোমাদের যৌক্তিক, মানবিক ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ধনসম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে; নিজেদের সন্তানদের মুকাবিলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না। কাফিররা যে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সম্মান এবং অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহ্যত তারই জওয়াব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোন সময় অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তা এ কারণে হয় যে, তোমরা ইয়াতীমের ন্যায় দয়াযোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্যও আদায় কর না। তাদের দ্বিতীয় মন্দ অভ্যাস হল : وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ অর্থাৎ তোমরা নিজেরা তো গরীব-মিসকীনকে অন্নদান করই না, পরন্তু অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত কর না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনী ও বিত্তশালীদের উপর যেমন গরীব-মিসকীনের হক আছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপরও হক আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে।

তৃতীয় মন্দ অভ্যাস এই যে, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا—অর্থাৎ তোমরা হারাম ও হালাল সবরকম ওয়ারিশী সম্পত্তি একত্র করে খেয়ে ফেল এবং নিজের অংশের সাথে অপরের অংশও ছিনিয়ে নাও। সবরকম হালাল ও হারাম ধনসম্পদ একত্র করা নাজায়েয কিন্তু এখানে বিশেষভাবে ওয়ারিশী সম্পত্তির কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, ওয়ারিশী সম্পত্তির দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা ও তার পেছনে লেগে থাকা ভীরুতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। এ ধরনের লোক মৃতভোজী জন্তুদের মতই তাকিয়ে থাকে, কবে সম্পত্তির মালিক মরবে এবং তারা সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার সুযোগ পাবে। যারা কৃতী পুরুষ, তারা নিজেদের উপার্জনেই সন্তুষ্ট থাকে এবং মৃতদের সম্পত্তির প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

চতুর্থ মন্দ অভ্যাস হচ্ছে : وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا — অর্থাৎ তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস। অত্যধিক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনসম্পদের ভালবাসা এক পর্যায়ে নিন্দনীয় নয় বরং মানুষের জন্মগত তাগিদ। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তাতে মজে যাওয়া নিন্দনীয়। কাফিরদের এসব মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে কিয়ামত আগমনের কথা বলা হয়েছে।

إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا — د ك -এর শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে আঘাত করে ভেঙ্গে দেওয়া। এখানে কিয়ামতের ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে যা পর্বতমালাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। دَكًّا دَكًّا বারবার বলায় ইঙ্গিত হয়েছে যে, কিয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অব্যাহত থাকবে।

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا — অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে আগমন করবেন, তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ — অর্থাৎ সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে অর্থাৎ সামনে উপস্থিত করা হবে। এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে আনা হবে, তার স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তবে বাহ্যত বোঝা যায় যে, সপ্তম পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত জাহান্নাম তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে এবং সব সমুদ্র অগ্নিময় হয়ে তাতে শামিল হয়ে যাবে। এভাবে জাহান্নাম হাশরের আঙিনায় সবার সামনে এসে যাবে।

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ — تذكر -এর অর্থ এখানে বুঝে আসা। অর্থাৎ কাফির মানুষ সেদিন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার কি করা উচিত ছিল আর সে কি করেছে। কিন্তু তখন এই বুঝে আসা নিষ্ফল হবে। কেননা পরকাল কর্ম-জগৎ নয়—প্রতিদান জগৎ। অতঃপর সে يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي বলে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে যে, হায়! আমি যদি দুনিয়াতে কিছু সৎকর্ম করতাম! কিন্তু কুফর ও শিরকের শাস্তি সামনে এসে যাওয়ার পর এ আকাঙ্ক্ষায় কোন লাভ নেই। এখন আযাব ও পাকড়াও-য়ের সময়। আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াওয়ের মত কঠিন পাকড়াও কারও হতে পারে না। অতঃপর মু'মিনদের সওয়াব ও জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে।

نفس مطمئنة يا ايتها النفس المطمئنة —এখানে মু'মিনদের রূহকে نفس مطمئنة (প্রশান্ত আত্মা) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সে আত্মা, যে আল্লাহ্র স্মরণ ও আনুগত্যের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে অশান্তি ভোগ করে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মন্দস্বভাব ও হীনমন্যতা দূর করেই এই স্তর অর্জন করা যায়। আল্লাহ্র আনুগত্য, যিকির ও শরীয়ত এরূপ ব্যক্তির মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। সম্বোধন করে বলা হয়েছে : ارجعى الى ربك —অর্থাৎ নিজের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও। ফিরে যাওয়া বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, তার প্রথম বাসস্থানও পালনকর্তার কাছে ছিল। সেখানেই ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মু'মিনগণের আত্মা তাদের আমলনামাসহ সপ্তম আকাশে আরশের ছায়াতলে অবস্থিত ইল্লিয়্যীনে থাকবে। সমস্ত আত্মার আসল বাসস্থান সেখানেই। সেখানে থেকে এনে মানব দেহে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যায়।

راضية مرضية —অর্থাৎ এ আত্মা আল্লাহ্র প্রতি তাঁর সৃষ্টিগত ও আইনগত বিধি-বিধানে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, বান্দার সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বান্দা আল্লাহ্র ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়ার তওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

من احب لقاء الله ا حب الله لقائه و من كره لقاء الله كره الله لقائه

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন। এই হাদীস শুনে হযরত আয়েশা (রা) বললেন : আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ তো মৃত্যুর মাধ্যমেই হতে পারে। কিন্তু মৃত্যু আমাদের অথবা কারও পছন্দনীয় নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আসল ব্যাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, যা শুনে মৃত্যু তার কাছে অত্যধিক প্রিয় বিষয় হয়ে যায়। এমনিভাবে মৃত্যুর সময় কাফিরের সামনে আযাব ও শাস্তি উপস্থিত করা হয়। ফলে তখন তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক মন্দ ও অপছন্দনীয় কোন বিষয় মনে হয় না।—(মাযহারী) সারকথা বর্তমানে যে মানুষমাত্রই মৃত্যুকে অপছন্দ করে, তা ধর্তব্য নয় বরং আত্মা নির্গত হওয়ার সময়ে যে ব্যক্তি মৃত্যুতে এবং আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। راضية مرضية -এর মর্ম তাই।

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ—প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা ধর্মপরায়ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। এ থেকে জানা যায় যে, যারা দুনিয়াতে ধার্মিক ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও সংসর্গ অবলম্বন করে, তারা যে তাদের সাথে জান্নাতে যাবে, এটা তারই আলামত। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আ) দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন : وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ এবং ইউসুফ (আ) দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন : وَاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ এতে বোঝা গেল, সৎসংসর্গ একটি মহানিয়ামত, যা পয়গম্বরগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ—এতে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ 'আমার জান্নাত' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাত কেবল চিরন্তন সুখ-শান্তির আবাসস্থলই নয় বরং সর্বোপরি এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থান।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত মু'মিনগণকে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানসূচক এ সম্বোধন কখন হবে, সে সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, কিয়ামতে হিসাব-নিকাশের পর এ সম্বোধন হবে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনার দ্বারাও এর সমর্থন হয়। কারণ, পূর্বোল্লিখিত কাফিরদের আযাব কিয়ামতের পরেই হবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'মিনদের প্রতি এ সম্বোধনও তখনই হবে। কেউ কেউ বলেন : এ সম্বোধন মৃত্যুর সময় দুনিয়াতেই হয়। অনেক হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই ইবনে কাসীর বলেছেন : উভয় সময়েই মু'মিনদের আত্মাকে এই সম্বোধন করা হবে—মৃত্যুর সময়েও এবং কিয়ামতেও।

যেসব হাদীস থেকে মৃত্যুর সময় সম্বোধন হবে বলে জানা যায়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর হাদীস। অপর একটি হাদীস হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে মসনদে আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যখন মু'মিনের মৃত্যুর সময় আসে, তখন রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী বস্ত্র সামনে রেখে তার আত্মাকে সম্বোধন করে اُخْرُجِىْ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً اِلٰى رَوْحِ اللّٰهِ وَرَيْحَانِ اللّٰهِ অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট—এমতাবস্থায় তুমি এ দেহ থেকে বের হয়ে আস। এই বের হওয়া হবে আল্লাহ্‌র রহমত এবং জান্নাতের চিরন্তন সুখের দিকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ আয়াতখানি

পাঠ করলাম। হযরত আবু বকর (রা) মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! এটা কি চমৎকার সম্বোধন ও সম্মান প্রদর্শন! রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ শুনে রাখুন, মৃত্যুর পর ফেরেশতা আপনাকে এই সম্বোধন করবে।—(ইবনে কাসীর)

কয়েকটি আশ্চর্যজনক ঘটনাঃ হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) বলেনঃ তায়েফ নগরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ইন্তিকাল হয়। জানাযা প্রস্তুত হওয়ার পর সেখানে একটি পাখী এসে উপস্থিত হল যার অনুরূপ পাখী কখনও দেখা যায়নি। অতঃপর পাখীটি শবাধারে ঢুকে পড়ল। এরপর কেউ তাকে বের হতে দেখেনি। অতঃপর মৃতদেহ কবরে নামানোর সময় কবরের এক পাশ থেকে একটি অদৃশ্য কণ্ঠ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ—আয়াতখানি পাঠ করল। সবাই তালাশ করল কিন্তু কে পাঠ করল, তার কোন হদিস পাওয়া গেল না।—(ইবনে কাসীর)

ইমাম হাফেয তিবরানী 'কিতাবুল আজায়েব' গ্রন্থে ফাত্তান ইবনে রুযাইনের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। ফাত্তান ইবনে রুযাইন বলেনঃ একবার রোমদেশে আমরা বন্দী হয়ে সেখানকার বাদশাহের সামনে নীত হলাম। এই কাফির বাদশাহ্ আমাদের উপর তার ধর্ম অবলম্বন করার জন্য জোর-জবরদস্তি চালাল। সে বললঃ যে কেউ আমার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করবে, তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে তিন ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে বাদশাহের ধর্ম অবলম্বন করল। চতুর্থ ব্যক্তি বাদশাহের সামনে নীত হল। সে তার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করল। সেমতে তার গর্দান কেটে মস্তকটি নিকটবর্তী একটি নহরে নিক্ষেপ করা হল। তখন মস্তকটি পানির গভীরে চলে গেল বটে কিন্তু পরক্ষণেই পানির উপরে ভেসে উঠল এবং তাদের দিকে চেয়ে প্রত্যেকের নাম নিয়ে বলতে লাগল, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي এরপর মস্তকটি আবার পানিতে ডুবে গেল।

উপস্থিত সবাই এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখল ও শুনল। সেখানকার খৃস্টানরা এ ঘটনা দেখে প্রায় সবাই মুসলমান হয়ে গেল। ফলে বাদশাহের সিংহাসন কেঁপে উঠল। ধর্মত্যাগী তিন ব্যক্তি আবার মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর খলীফা আবু জা'ফর মনসুর আমাদেরকে বাদশাহের কবল থেকে মুক্ত করে আনেন।—(ইবনে কাসীর)

سورة البلد

সূরা বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২০ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝١ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝٢ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۝٣

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝٤ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝٥

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝٦ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۝٧ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ

عَيْنَيْنِ ۝٨ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝٩ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝١٠ فَلَا اقْتَحَمَ

الْعَقَبَةَ ۝١١ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝١٢ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝١٣ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ

ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۝١٤ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝١٦ ثُمَّ كَانَ

مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝١٧ اُولٰٓئِكَ

اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝١٨ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝١٩

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۝٢٠

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আমি এই নগরীর শপথ করি (২) এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। (৩) শপথ জনকের ও যা জন্ম দেয়, (৪) নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রম-নির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি। (৫) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? (৬) সে বলে ঃ আমি প্রচুর ধনসম্পদ ব্যয় করেছি! (৭) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮) আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়, (৯) জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়? (১০) বস্তুত আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। (১১) অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। (১২) আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি? (১৩) তা হচ্ছে দাসমুক্তি

(১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান (১৫) এতীম আত্মীয়কে (১৬) অথবা ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে (১৭) অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার। (১৮) তারাই সৌভাগ্যশালী। (১৯) আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা। (২০) তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি এই (মক্কা) নগরীর শপথ করি এবং [শপথের জওয়াব বলার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য একটি সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে যে] আপনার জন্য এ নগরীতে যুদ্ধবিগ্রহ জায়েয হবে। (সেমতে মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর জন্য যুদ্ধ হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। হেরেমের বিধানাবলী অপ্রযোজ্য করে দেওয়া হয়েছিল)। শপথ জনকের এবং যা জন্ম দেয় তার। [সমস্ত সন্তানের পিতা আদম (আ)। অতএব এভাবে আদম ও বনী-আদম সবারই শপথ হয়ে গেল। অতঃপর শপথের জওয়াব বলা হয়েছে] আমি মানুষকে খুব শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি। (সেমতে মানুষ সারা জীবন অসুখে-বিসুখে, কষ্টে ও চিন্তাভাবনায় অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকে। এর ফলে তার মধ্যে অক্ষমতা ও অপারক মনোভাব থাকা উচিত ছিল। সে নিজেকে বিধি-লিপির বেড়াজালে আবদ্ধ মনে করত এবং আল্লাহ্র আদেশের অনুসারী হত। কিন্তু কাফির মানুষ সম্পূর্ণ ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে। অতএব) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না ? (অর্থাৎ সে কি নিজেকে আল্লাহ্র কুদরতের বাইরে মনে করেই এমন ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে ?) সে বলে : আমি প্রচুর ধনসম্পদ ব্যয় করেছি। (অর্থাৎ এক্ষে তো স্পর্ধা দেখায়, তার উপর রসূলের শত্রুতা ও ইসলামের বিরোধিতায় ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে গর্বের বিষয় মনে করে। এরপর প্রচুর ধনসম্পদের বলে মিথ্যাও বলে)। সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি ? [অর্থাৎ আল্লাহ্ অবশ্যই দেখছেন এবং তিনি জানেন যে, পাপ কাজে ব্যয় করেছে। সুতরাং এজন্য শাস্তি দেবেন। এছাড়া পরিমাণও দেখেছেন যে, প্রচুর নয়। এটা যেকোন কাফিরের অবস্থা। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শত্রুরা তাই বলত এবং করত। মোট কথা, কাফির ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি এবং অনুগ্রহ ও নিয়ামতের দ্বারাও হয়নি, যা অতঃপর বর্ণিত হয়েছে]। আমি কি তাকে চক্ষুদ্বয়, জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় দেইনি ? অতঃপর তাকে ভাল ও মন্দ দু'টি পথই বলে দিয়েছি যাতে ক্ষতি-কর পথ থেকে বেঁচে থাকে এবং লাভের পথে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতেও আল্লাহ্র বিধানাবলীর অনুসারী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। (ধর্মের কাজ কষ্টসাধ্য বিধায় একে ঘাঁটি বলা হয়েছে)। আপনি কি জানেন, সে ঘাঁটি কি ? তা হচ্ছে দাস-মুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান, কোন আত্মীয় এতীমকে অথবা কোন ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে। (অর্থাৎ আল্লাহ্র এসব বিধান মেনে চলা উচিত ছিল)। অতঃপর (সর্বোপরি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল) যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সব-রের এবং (উপদেশ দেয়) দয়ার। (অর্থাৎ জুলুম না করার। ঈমান সবার অগ্রে, এরপর

সবরের উপদেশ উত্তম, এরপর জুলুম থেকে বেঁচে থাকা উত্তম, এরপর আসে ثُمَّ كَانَ থেকে مَرْحَمَةِ পর্যন্ত বর্ণিত বিষয়াদির স্তর। অতএব ثُمَّ অব্যয়টি এখানে মর্যাদার উচ্চতা বোঝাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ধর্মের যাবতীয় মূলনীতি ও শাখাগুলো মেনে চলা উচিত ছিল। অতঃপর মু'মিনদের প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে)। তারাই ডান-দিকস্থ লোক। (এর তফসীর সূরা ওয়াকিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানেও এ শব্দে সর্বস্তরের মু'মিনই অন্তর্ভুক্ত)। আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে (অর্থাৎ শাখা তো দূরের কথা মূলনীতিই মানে না)। তারাই বামপার্শ্বস্থ লোক। তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে। (অর্থাৎ জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে ভর্তি করে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে চিরকাল সেখানে থাকবে এবং বের হতে পারবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ —এখানে لَا অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং আরবী বাকপদ্ধতিতে এর অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত। অধিক বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্য এই لَا শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার ধারণা নয় বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। الْبَلَد (নগরী) বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা ত্বীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে الْأَمِين বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা নগরীর শপথ এ কথা জ্ঞাপন করে যে, অন্যান্য নগরীর তুলনায় এটা অভিজাত ও সেরা নগরী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আ'দী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের সময় মক্কা নগরীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : আল্লাহ্র কসম, তুমি গোটা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে যদি এখান থেকে বের হতে বাধ্য করা না হত, তবে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করতাম না।—(মাযহারী)

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ — حِلٌّ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে—এক. এটা حُلُول থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুতে অবস্থান নেওয়া, থাকা ও অবতরণ করা। অতএব, حِلٌّ-এর অর্থ হবে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র; বিশেষত আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুনও বাসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায়। কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে। দুই. এটা حِلّت থেকে উদ্ভূত। অর্থ হালাল হওয়া। এ দিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফিররা হালাল মনে করে রেখেছে

এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোন শিকারকেই হালাল মনে করে না। এমতাবস্থায় তাদের জুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহর রসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে নিয়েছে। অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্য মক্কার হেরেমে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্য তাই করা হয়েছিল। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থ অবলম্বনেই তফসীর করা হয়েছে। মাযহারীতে সম্ভাব্য তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ—এখানে والد বলে মানব পিতা হযরত আদম (আ) আর ما ولد বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হযরত আদম ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ—كبد-এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মানুষ গর্ভাশয়ে আবদ্ধ থাকে, জন্মলগ্নে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে, এরপর আসে জননীর দুগ্ধ পান করার ও তা ছাড়ানোর শ্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কষ্ট, বার্ধক্যের কষ্ট, মৃত্যু, কবর ও হাশর এবং তাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি, প্রতিদান ও শাস্তি—এসমুদয় শ্রমের বিভিন্ন পর্যায়, যা মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এ শ্রম ও কষ্ট শুধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য জীব-জানোয়ারও এতে শরীক রয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমত মানুষ সব জীব-জানোয়ার অপেক্ষা অধিক চেতনা ও উপলব্ধির অধিকারী। পরিশ্রমের কষ্ট চেতনাভেদে কম-বেশী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ শ্রম হচ্ছে হাশরের মাঠে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব দেওয়া। এটা অন্য জীব-জানোয়ারের বেলায় নেই।

কোন কোন আলিম বলেন ঃ মানুষের ন্যায় অন্য কোন সৃষ্টজীব কষ্ট সহ্য করে না অথচ সে শরীর ও দেহাবয়বে অধিকাংশ জীবের তুলনায় দুর্বল। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক-শক্তি অত্যন্ত বেশী। একারণেই বিশেষভাবে মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কা মুকাররমা, আদম ও বনী-আদমের শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা এ সত্যটি বর্ণনা করেছেন যে, আমি মানুষকে কষ্ট ও শ্রমনির্ভরশীলরূপেই সৃষ্টি করেছি। এটা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মানুষ আপনাআপনি সৃজিত হয়নি অথবা অন্য কোন মানুষ তাকে জন্ম দেয়নি বরং তার সৃষ্টিকর্তা এক সর্বশক্তিমান, যিনি প্রত্যেক সৃষ্টজীবকে বিশেষ বিশেষ স্বভাব ও বিশেষ ক্রিয়াকর্মের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানব-সৃষ্টিতে যদি মানবের কোন প্রভাব থাকত, তবে সে নিজের জন্য কখনও এরূপ শ্রম ও কষ্ট পছন্দ করত না।—(কুরতুবী)

কষ্ট স্বীকারের জন্য মানুষের প্রস্তুত থাকা উচিত ঃ এ শপথ ও তার জওয়াবে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়াতে অনাবিল সুখই কামনা কর এবং কোন কষ্টের

সম্মুখীন হতে চাও না, তোমাদের এই কামনা একটি দুঃস্বপ্ন, যা কোনদিন বাস্তব রূপ লাভ করবে না। তাই দুনিয়াতে প্রত্যেকের দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য। অতএব যখন শ্রম ও কষ্ট করতেই হবে, তখন বুদ্ধিমানের কাজ হল, এমন বিষয়ে কষ্ট করা, যা চিরকাল কাজে লাগবে এবং চিরস্থায়ী সুখের নিশ্চয়তা দেবে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল ঈমান ও আল্লাহ্র আনুগত্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর পরকালে অবিশ্বাসী মানুষের কতিপয় মূর্খতাসুলভ অভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে : أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ—অর্থাৎ এই বোকা কি মনে করে যে, তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখেনি? তার জানা উচিত যে, তার স্রষ্টা সবকিছুই দেখছেন।

চক্ষু ও জিহ্বা সৃষ্টির কয়েকটি রহস্য : — أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ — نَجْدَيْنِ শব্দটি نَجْد-এর দ্বিবচন। এর শাব্দিক অর্থ ঊর্ধ্বগামী পথ। এখানে প্রকাশ্য পথ বোঝানো হয়েছে। এ পথ দু'টির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ।

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, সে মনে করে যে, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলারও কোন ক্ষমতা নেই এবং তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখে না। আলোচ্য আয়াতে এমন কতিপয় নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর কারিগরি নৈপুণ্য ও রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করলে আল্লাহ্ তা'আলার অতুলনীয় হিকমত ও কুদরত এর মধ্যেই নিরীক্ষণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রথমে চক্ষুদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। চোখের নাজুক শিরা-উপশিরা, তার অবস্থান ও আকার সব মিলে এটা খুবই নাজুক অঙ্গ। এর হিফাযতের ব্যবস্থা এর সৃষ্টির পরিধির মধ্যেই করা হয়েছে। এর উপরে এমন পর্দা রাখা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মত কোন ক্ষতিকর বস্তু সামনে আসতে দেখলেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। এই পর্দার উপরে ধূলোবালি প্রতিরোধ করার জন্য পশম স্থাপন করা হয়েছে। মাথার দিক থেকে পতিত বস্তু যাতে সরাসরি চোখে পড়তে না পারে, সেজন্য ভ্রূর চুল রাখা হয়েছে। মুখমণ্ডলের মধ্যে চক্ষুকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে, উপরে ভ্রূর শক্ত হাড় এবং নিচে গণ্ডদেশের শক্ত হাড় রয়েছে। ফলে মানুষ যদি কোথাও উপুড় হয়ে পড়ে যায় কিংবা মুখমণ্ডলে কোন কিছু পড়ে, তবে উপর নিচের শক্ত অস্থিদ্বয় চক্ষুকে অনায়াসে রক্ষা করতে পারে।

দ্বিতীয় নিয়ামত হচ্ছে জিহ্বা। এর কারিগরিও বিস্ময়কর। এই রহস্যময় স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে মনের ভাব ব্যক্ত করা হয়। এর বিস্ময়কর কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন— মনের মাঝে কোন একটি বিষয়বস্তু উঁকি দিল, মস্তিষ্ক সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করল এবং এর জন্য ভাষা তৈরী করল। অতঃপর সে ভাষা জিহ্বার মেশিন দিয়ে বের হতে লাগল। এই দীর্ঘ কাজটি অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। ফলে শ্রোতা অনুভবও করতে পারে না যে, কতগুলো মেশিনারী কর্মরত হওয়ার পর এই ভাষাগুলো জিহ্বায় এসেছে। জিহ্বার কাজে ওষ্ঠ খুব সহায়ক বিধায় এর সাথে ওষ্ঠেরও উল্লেখ করা হয়েছে। ওষ্ঠই আওয়াজ ও

অক্ষরকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে। আরও একটি কারণ, সম্ভবত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা জিহ্বাকে একটি দ্রুত কর্মসম্পাদনকারী মেশিন করেছেন। ফলে অর্ধ মিনিটের মধ্যে তার দ্বারা এমন কথা বলা যায় যা, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন, ঈমানের কলেমা। অথবা দুনিয়াতে শত্রুর কাছেও প্রিয় করে দেয়। যেমন, বিগত অন্যায় ক্ষমা করা। এই জিহ্বা দ্বারাই ততটুকু সময়ে এমন কথাও বলা যায়, যা তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। যেমন, কুফরের কলেমা। অথবা দুনিয়াতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও তার শত্রুতে পরিণত করে দেয়। যেমন, গালিগালাজ ইত্যাদি। জিহ্বার উপকারিতা যেমন অসংখ্য, তেমনি এর ধ্বংসকারিতাও অগণিত। এটা যেন এক তরবারি, যা শত্রুর গর্দানও উড়াতে পারে এবং স্বয়ং তার গলাও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ তরবারিকে ওষ্ঠদ্বয়ের চাদর দ্বারা আবৃত করে দিয়েছেন। এ স্থলে ওষ্ঠদ্বয়ের উল্লেখ করার মধ্যে এরূপ ইঙ্গিতও থাকতে পারে যে, যে প্রভু মানুষকে জিহ্বা দিয়েছেন, তিনি তা বন্ধ রাখার জন্য ওষ্ঠও দিয়েছেন। তাই একে বুঝে সুঝে ব্যবহার করতে হবে এবং অস্থলে একে ওষ্ঠ-দ্বয়ের কোষ থেকে বের করা যাবে না। তৃতীয় নিয়ামত পথপ্রদর্শন করা দু'রকম। আল্লাহ্ তা'আলা ভাল ও মন্দের পরিচয়ের জন্য মানুষের মধ্যে এক প্রকার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। যেমন এক আয়াতে আছে فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا অর্থাৎ মানুষের নফসের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা পাপাচার ও সদাচারের উপকরণ রেখে দিয়েছেন। এভাবে একটি প্রাথমিক পথ প্রদর্শন মানুষ তার বিবেকের কাছ থেকেই পায়। অতঃপর এর সমর্থনে পয়-গম্বরগণও ঐশী কিতাব আগমন করে। সারকথা এই যে, গাফিল ও অবিশ্বাসী মানুষ যদি তার নিজের অস্তিত্বের কয়েকটি দেদীপ্যমান বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে আল্লাহ্র কুদরত ও হিকমত চাক্ষুষ দেখতে পাবে। চোখে দেখ, মুখে স্বীকার কর এবং পথ দু'টির মধ্য থেকে মঙ্গলজনক পথ অবলম্বন কর।

অতঃপর আবার গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে—এসব উজ্জ্বল প্রমাণ দ্বারা আল্লাহ্র কুদরত, কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশের নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া উচিত ছিল এবং এ বিশ্বাসের ফলেই সৃষ্টজীবের উপকার করা, তাদের অনিষ্ট থেকে আত্ম-রক্ষা করা, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজের সংশোধন করা এবং অপরের সংশোধ-নের চিন্তা করা দরকার ছিল, যাতে কিয়ামতে সে 'আসহাবে-ইয়ামীন' তথা জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু হতভাগা মানুষ তা করেনি বরং কুফরকেই আঁকড়ে রয়েছে, যার পরিণাম জাহান্নামের আগুন। সূরার শেষ অবধি এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এতে কতিপয় সৎ কর্ম অবলম্বন না করার বিষয়কে বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ — عقبة বলা হয় পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা ঘাটিকে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে এ ঘাটি মানুষকে সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে

আরোহণ করে আত্মরক্ষা করা যায় অথবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যত্র চলে যাওয়া যায়। এস্থলে আল্লাহ্‌র ইবাদতকে একটি মাটি রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। মাটি যেমন শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়, সৎকর্মও তেমনি পরকালের আযাব থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এসব সৎ কর্মের মধ্যে প্রথমে فَكُّ رَقَبَةٍ অর্থাৎ দাসমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা খুব বড় ইবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর। দ্বিতীয় সৎ কর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান। যে কাউকে অন্নদান করা সওয়াবমুক্ত নয় কিন্তু কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর লোককে অন্ন দান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে ঃ

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ—অর্থাৎ বিশেষভাবে যদি আত্মীয় ইয়াতীমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়। এক. ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার সওয়াব এবং দুই. আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব। فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ—অর্থাৎ বিশেষভাবে ক্ষুধার দিনে তাকে অন্ন দান করা অধিক সওয়াবের কারণ হয়ে যায়। এমনিভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত মিসকীন অর্থাৎ নিরতিশয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে অন্নদান করাও অধিক সওয়াবের কাজ। এরূপ ব্যক্তি যত বেশী অভাবী হবে, অন্নদাতার সওয়াবও ততই বৃদ্ধি পাবে।

অপরকেও সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ঈমানের দাবী ঃ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ এ আয়াতে ঈমানের পর মু'মিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলমান ভাইকে সবর ও অনুকম্পার উপদেশ দেবে। সবরের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সৎ কর্ম সম্পাদন করা। مَرْحَمَةٌ-এর অর্থ অপরের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও জুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। এতে দীনের প্রায় সব নির্দেশই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

سورة الشمس

সূরা শাম্‌স

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ১৫ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣ وَالَّيْلِ
اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦ وَنَفْسٍ
وَّمَا سَوّٰهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝٨ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝٩ وَقَدْ
خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝١٠ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝١١ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا ۝١٢
فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝١٣ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۥ
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝١٤ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝١٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, (২) শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে, (৩) শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, (৪) শপথ রাত্রির যখন সে সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, (৫) শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তার, (৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তার, (৭) শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তার, (৮) অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন, (৯) যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। (১০) এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (১১) সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত মিথ্যারোপ করেছিল (১২) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল, (১৩) অতঃ-পর আল্লাহ্‌র রসূল তাদেরকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক। (১৪) অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উষ্ট্রীর পা কর্তন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন। (১৫) আল্লাহ্ তা'আলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের (অস্ত যাওয়ার) পেছনে আসে (অর্থাৎ উদিত হয়। এখানে মধ্য-মাসের কয়েক রাত্রির চাঁদ বোঝানো হয়েছে। এ সময়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর চন্দ্র উদিত হয়। একথা যোগ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা পরিপূর্ণ নূরের সময়; যেমন ضحٰها বলে সূর্যের পরিপূর্ণ নূরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা এ সময় কুদরতের দু'টি নিদর্শন সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় মিলিতভাবে একের পর এক প্রকাশ পায়)। শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে (ও তার প্রভাব ও আলোকে সম্পূর্ণরূপে) আচ্ছাদিত করে। (অর্থাৎ রাত্রি গভীর হয়ে যায়, তখন সূর্যের কোন প্রভাব অবশিষ্ট থাকে না। পরিপূর্ণ অবস্থার শপথ করার জন্য প্রত্যেকটির সাথে 'যখন কথাটি বারবার' যোগ করা হয়েছে)। শপথ আকাশের এবং তার, যিনি তাকে নির্মাণ করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার। এমনিভাবে مَا طَحٰهَا ও مَا سَوّٰهَا-এর মধ্যেও বুঝতে হবে। সৃষ্টির শপথকে স্রষ্টার শপথের পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এরূপ হতে পারে যে, এখানে চিন্তাকে প্রমাণ থেকে দাবীর দিকে স্থানান্তর করা উদ্দেশ্য। স্রষ্টা দাবী এবং সৃষ্টি তার প্রমাণ। সুতরাং এতে তওহীদের দলীল হওয়ারও ইঙ্গিত রয়েছে)। শপথ পৃথিবীর এবং তার যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। শপথ (মানুষের) প্রাণের এবং তার, যিনি একে (সর্বপ্রকার আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা) সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের (উভয়ের) জ্ঞানদান করেছেন। (অর্থাৎ অন্তরে যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের প্রবণতা সৃষ্টি হয়, তার স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা। অতঃপর অসৎ কর্মী ও সৎ কর্মীর পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে যে) যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় (অর্থাৎ যে নিজেকে অসৎ কর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখে ও সৎ কর্ম অবলম্বন করে)। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়। (এরপর শপথের জওয়াব উহ্য আছে। অর্থাৎ হে কাফির সম্প্রদায়, তোমরা যখন অসৎ কর্মে লিপ্ত রয়েছ, তখন অবশ্যই গযব ও ধ্বংসে পতিত হবে। পরকালে তো অবশ্যই, দুনিয়াতে মাঝে মাঝে, যেমন সামূদ গোত্র এই অসৎ কর্মের কারণে আল্লাহ্‌র গযব ও আযাবে পতিত হয়েছে। তাদের ঘটনা এই :) সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা-বশত (সালেহ্ পয়গম্বরের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল, (এটা তখনকার ঘটনা) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি (উষ্ট্রী হত্যায়) তৎপর হয়ে উঠেছিল। (তার সাথে অন্যান্য লোকও শরীক ছিল)। অতঃপর আল্লাহ্‌র রসূল [সালেহ্ (আ) যখন তাদের হত্যার সংকল্প জানতে পারেন, তখন] তাদেরকে বলেছিলেন : আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক (অর্থাৎ উষ্ট্রীকে হত্যা করো না এবং তার পানি বন্ধ করো না। হত্যা সংকল্পের আসল কারণও ছিল পানির পালা, তাই একে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী' বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিকরূপে একে সৃষ্টি করে নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে কায়েম করেছিলেন এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন জরুরী করে দিয়েছিলেন)।

অতঃপর তারা তাকে (অর্থাৎ নবুয়তের উষ্ট্রীরূপী প্রমাণকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল (কেননা তারা তাঁকে রসূল গণ্য করত না) এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। অতএব তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে সেই ধ্বংসকে (সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য) ব্যাপক করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা (কারও পক্ষ থেকে) এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না (যেমন দুনিয়ার রাজা বাদশাহ্‌রা কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি দিলে প্রায়ই ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গণআন্দোলনের আশংকা করে থাকেন। সামূদ সম্প্রদায় ও উষ্ট্রীর বিস্তারিত ঘটনা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরার শুরুতে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষণ যোগ করা হয়েছে। প্রথম শপথ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا এখানে ضحى শব্দটি অর্থগতভাবে شمس-এর বিশেষণ। অর্থাৎ শপথ সূর্যের যখন তা ঊর্ধ্বগগনে থাকে। সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু ঊর্ধ্বে উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে ضحى বলা হয়। তখন সূর্য কাছেই দৃষ্টিগোচর হয় এবং তেমন প্রখরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরূপে দেখাও যায়।

দ্বিতীয় শপথ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا — অর্থাৎ চন্দ্রের শপথ যখন তা সূর্যের পেছনে আসে এবং এর এক অর্থ এই যে, যখন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরেই উদিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। পেছনে আসার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কিছুটা ঊর্ধ্বগগনে থাকার সময় সূর্য যেমন পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শপথ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا— এখানে جلها-এর সর্বনাম দ্বারা পৃথিবী অথবা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথিবীর—যাকে দিন আলোকিত করে। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণরূপে আলোকিত দিবসের শপথ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এখানে সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে আলোকিত করে। অর্থাৎ যখন দিন শুরু হওয়ার কারণে সূর্য উজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়।

চতুর্থ শপথ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا—অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। মানে সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়।

পঞ্চম শপথ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا—এখানে ما অব্যয়কে مصدرية ধরে এই অর্থ নেওয়া সুস্পষ্ট যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي এমনিভাবে ষষ্ঠ শপথ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে, শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখও এতদুভয়ের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্য। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ্ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। কাশশাফ, বায়যাবী ও কুরতুবী একেই পছন্দ করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এস্থলে ما অব্যয়কে من-এর অর্থে ধরে এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তাঁর, যিনি একে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তাঁর, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবগুলো শপথই সৃষ্টবস্তুর শপথ। মাঝখানে স্রষ্টার শপথ এসে যাওয়া ধারাবাহিকতার খিলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী এ আপত্তিও দেখা দেয় না যে, সৃষ্টবস্তুর শপথ স্রষ্টার শপথের অগ্রে বর্ণিত হল কেন?

সপ্তম শপথ ঃ وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا—এখানেও দু'রকম অর্থ হতে পারে—এক. শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং দুই. শপথ নফসের এবং তাঁর, যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰهَا—الهام-এর অর্থ নিক্ষেপ করা এবং فجور শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ্। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নফস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎ কর্ম ও সৎ কর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহ্ ও ইবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা ইবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হয়। এই তফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও ইবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্য সে কোন সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হবে না। একটি হাদীস থেকে এই তফসীর গৃহীত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, তফসীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে গোনাহ্ ও ইবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন,

কিন্তু তাকে কোন একটি করতে বাধ্য করেন নি বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তখন উচ্চৈস্বরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلٰهَا وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا—

—অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাকে তাকওয়ার তওফীক দান কর, তুমিই আমার মুরুব্বী ও পৃষ্টপোষক।

সপ্তম শপথের পর জওয়াবে বলা হয়েছে : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ

دَسّٰهَا—অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে। تَزْكِيَةٌ শব্দের প্রকৃত অর্থ অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে দেয়। دَسٌّ -এর অর্থ মাটিতে প্রোথিত করা, যেমন এক আয়াতে আছে : اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ—কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়; যাকে আল্লাহ্ শুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সামূদ গোত্রের ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে :

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا— دَمْدَمَ শব্দ এমন কঠোর শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বারবার কোন ব্যক্তি অথবা জাতির উপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। سَوّٰهَا-এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আযাব জাতির আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সবাইকে বেষ্টন করে নেয়। وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তিদান ও কোন জাতিকে নির্মূল করে দেওয়ার ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের মত মনে করো না। দুনিয়াতে কোন রাজাধিরাজ ও প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও কোন জাতির বিরুদ্ধে

ধ্বংসাভিযান পরিচালনা করলে সে জাতির অবশিষ্ট লোক অথবা তাদের সমর্থকদের প্রতি-শোধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্রোহের আশংকা করতে থাকে। এখানে যারা অপরকে হত্যা করে, তারা নিজেরাও হত্যার আশংকা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা অপরকে আক্রমণ করে তারা নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ নন। কারও পক্ষ থেকে কোন সময় তাঁর কোন বিপদাশঙ্কা নেই।

سورة الليل

সূরা লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২১ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝١ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝٢ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۝٣ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝٤ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝٧ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝١٠ وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ۝١١ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝١٢ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۝١٣ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۝١٤ لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۝١٥ الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝١٦ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝١٧ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝١٨ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۝١٩ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۝٢٠ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۝٢١

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে, (২) শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় (৩) এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন, (৪) নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। (৫) অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহ্‌ভীরু হয়, (৬) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, (৭) আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (৮) আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় (৯) এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, (১০) আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (১১) যখন সে অধঃ-পতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। (১২) আমার দায়িত্ব পথ-প্রদর্শন করা। (১৩) আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। (১৪) অতএব,

১০০—

আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। (১৫) এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, (১৬) যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৭) এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিকে, (১৮) যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে (১৯) এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। (২০) তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। (২১) সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ রাত্রির যখন সে (সূর্য ও পৃথিবীকে) আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন সে আলোকিত হয় এবং (শপথ) তার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার। অতঃপর জওয়াব এই যে) নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা (অর্থাৎ কর্মসমূহ) বিভিন্ন ধরনের। (এমনিভাবে এসব কর্মের ফলাফলও বিভিন্ন ধরনের)। অতএব, যে (আল্লাহ্‌র পথে ধনসম্পদ) দান করে, আল্লাহ্‌ভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে (অর্থাৎ ইসলামকে) সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। ('সুখের বিষয়' বলে সৎকর্ম ও তার মধ্যস্থতায় জান্নাত বোঝানো হয়েছে। এটাই সহজ পথের কারণ ও স্থান) এবং যে (ওয়াজিব প্রাপ্য দেওয়ার ব্যাপারে) কৃপণতা করে এবং (আল্লাহ্‌কে ভয় করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র প্রতি) বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে (অর্থাৎ ইসলামকে) মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। ('কষ্টের বিষয়' বলে কুকর্ম ও তার মধ্যস্থতায় জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। এটাই কষ্টের কারণ ও স্থান। উভয় জায়গায় সহজ পথ দান করার অর্থ এই যে, ভাল অথবা মন্দ কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং অকপটে প্রকাশ পাবে। হাদীসে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন আছে। অতঃপর শেষোক্ত প্রকার লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে) যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার ধনসম্পদ তার কোন কাজে আসবে না। (অধঃপতিত হওয়ার অর্থ জাহান্নামে যাওয়া)। নিশ্চয় আমার দায়িত্ব (ওয়াদা অনুযায়ী) পথপ্রদর্শন করা। (আমি এই দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছি। এরপর কেউ তো ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেছে, যা مَنْ أَعْطَىٰ বাক্যে উল্লিখিত হয়েছে এবং কেউ কুফর ও গোনাহের পথ ধরেছে, যা مَنْ بَخِلَ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। যে যেমন পথ অবলম্বন করবে, সে তেমনি ফলপ্রাপ্ত হবে। কেননা) আমারই কব্জায় পরকাল ও ইহকাল। (অর্থাৎ উভয় কালে আমারই রাজত্ব। তাই ইহকালে আমি বিধি-বিধান জারি করেছি এবং পরকালে মান্য ও অমান্য করার কারণে প্রতিদান ও শাস্তি দেব। অতঃপর বলা হয়েছে, আমি যে তোমাদেরকে বিভিন্ন কর্মের বিভিন্ন প্রতিফল বলে দিয়েছি, এটা এজন্য যে) আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি, (যা فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ বাক্য জ্ঞাপন করে, যাতে তোমরা ঈমান ও আনুগত্য

অবলম্বন করে এ অগ্নি থেকে আত্মরক্ষা কর এবং কুফর ও গোনাহ্ অবলম্বন করে জাহান্নামে না যাও। অতঃপর তাই বলা হয়েছে—) এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে (সত্য ধর্মের প্রতি) মিথ্যারোপ করে এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তিকে, যে (কেবল) আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধনসম্পদ দান করে (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই যার কাম্য হয়)। এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত (কারণ, এটাই তার লক্ষ্য। এতে আন্তরিকতার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, কারও অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়াও মোস্তাহাব, উত্তম ও সওয়াবের কাজ। কিন্তু প্রাথমিক অনুগ্রহের সমান শ্রেষ্ঠ নয়। এ ব্যক্তি প্রাথমিক অনুগ্রহ করে। তাই তার দান রিয়া, গোনাহ্ ইত্যাদির আশংকা থেকে উত্তমরূপে মুক্ত হবে। এটাই পরিপূর্ণ আন্তরিকতা)। সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে। (উপরে শুধু বলা হয়েছিল যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পরকালে তাকে এমন সব নিয়ামত দেওয়া হবে, যাতে সে বাস্তবিকই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى—এ বাক্যটি সূরা ইনশিকাকের إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا বাক্যের অনুরূপ যার তফসীর সে সূরায় বর্ণিত হয়ে গেছে। মর্মার্থ এই যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে কোন না কোন কাজের জন্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ে অভ্যস্ত কিন্তু কোন কোন লোক তার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করে নেয়, আর কেউ কেউ এই পরিশ্রম দ্বারাই অনন্ত আযাব ক্রয় করে। হাদীসে আছে, প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় গাত্রোত্থান করে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে পরকালের আযাব থেকে মুক্ত করে। পক্ষান্তরে কারও শ্রম ও প্রচেষ্টাই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হল প্রথমে নিজের প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিণতি চিন্তা করা এবং যে কর্মের পরিণতি সাময়িক সুখ ও আনন্দ হয়, তার কাছেও না যাওয়া।

কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'দল ঃ অতঃপর কোরআন পাক কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকের তিনটি করে বিশেষণ বর্ণনা করেছে —প্রথমে সফলকাম দলের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى—অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ্কে ভয় করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, তাঁর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং সে উত্তম কলেমাকে সত্য মনে করে। এখানে 'উত্তম কলেমা' বলে কলেমায়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'

বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে আব্বাস, যাহ্হাক) এই কলেমাকে সত্য মনে করার অর্থ ঈমান আনা। যদিও ঈমান সব কর্মেরই প্রাণ এবং সবার অগ্রবর্তী বিষয় কিন্তু এখানে পেছনে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে উদ্দেশ্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা। এগুলো কর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। ঈমান হলো একটি অন্তরের বিষয় অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ্ ও রসূলকে সত্য জানা এবং কলেমায়ে শাহাদতের মাধ্যমে মুখেও তা স্বীকার করা। বলাবাহুল্য, এই উভয় কাজে কোন শারীরিক শ্রম নেই এবং কেউ এগুলোকে কর্মের তালিকাভুক্ত গণ্য করে না।

দ্বিতীয় দলেরও তিনটি কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে : وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ—অর্থাৎ যে আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তথা যাকাত ও ওয়াজিব সদকাও দেয় না, আল্লাহ্কে ভয় করার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং উত্তম কলেমা তথা ঈমানের কলেমাকে মিথ্যা মনে করে। এতদুভয়ের প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ৷ يُسْرَىٰ -এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও আরামদায়ক বিষয়, যাতে কোন কষ্ট নেই। এখানে জান্নাত বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ৷ عُسْرَىٰ -এর শাব্দিক অর্থ কঠিন ও কষ্টদায়ক বিষয়। এখানে জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা, আল্লাহ্কে ভয় করা এবং ঈমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি জান্নাতের কাজের জন্য সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে জাহান্নামের কাজের জন্য সহজ করে দেই। এখানে বাহ্যত এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি তাদের জন্য জান্নাতের অথবা জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেই। কেননা কাজকর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে—ব্যক্তি সহজ অথবা কঠিন হয় না। কিন্তু কোরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, স্বয়ং তাদের সত্তাকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথম দলের জন্য জান্নাতের কাজকর্ম তাদের মজ্জায় পরিণত হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দলের জন্য জাহান্নামের কাজকর্ম মজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হবে। ফলে তারা এজাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শান্তি পাবে। উভয় দলের মজ্জায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদেরকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এক হাদীস এর সমর্থনে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اعملوا فكل ميسر لما خلق له ا ما من كان من اهل السعادة فسنيسر

لعمل السعادة و اما من كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة -

অর্থাৎ তোমরা নিজ নিজ কর্ম করে যাও। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেকাজই সহজ করা হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবানদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। আর যে হতভাগা, হতভাগাদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। এতদুভয় বিষয় আল্লাহ্প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলশ্রুতিতে অর্জিত হয়। তাই একারণে আযাব ও সওয়াব দেওয়া হয়। অতঃপর হতভাগ্য জাহান্নামী দলকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে ঃ

وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى—অর্থাৎ যে ধনসম্পদের খাতিরে এ হতভাগ্য ওয়াজিব হক দিতেও কৃপণতা করত, সে ধনসম্পদ আযাব আসার সময় তার কোন কাজে আসবে না। تردى -এর শাব্দিক অর্থ গর্তে পতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে কবরে অতঃপর কিয়ামতে যখন সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে, তখন এই ধনসম্পদ কোন উপকারে আসবে না।

لَا يَصْلٰهَاۤ اِلَّا الْاَشْقَى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى—অর্থাৎ এই জাহান্নামে নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ মিথ্যা আরোপকারী কাফিরই হতে পারে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, পাপী মু'মিন যে মিথ্যারোপের অপরাধে অপরাধী নয়, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না। অথচ কোরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তি গোনাহ্ করার পর যদি তওবা না করে অথবা কারও সুপারিশের বলে কিংবা বিশেষ রহমতে যদি তাকে ক্ষমা করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামে যাবে এবং গোনাহের শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। অবশ্য শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে ঈমানের কল্যাণে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের ভাষা বাহ্যত এর পরিপন্থী। অতএব এ আয়াতের অর্থ এমন হওয়া জরুরী, যা অন্যান্য আয়াত ও সহীহ হাদীসের খিলাফ নয়। এর একান্ত সহজ ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে চিরকালের জন্য দাখিল হওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা কাফিরেরই বৈশিষ্ট্য। মু'মিন কোন না কোন সময় গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে। তফসীরবিদগণ এছাড়া আরও কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে আছে যে, আয়াতে اتقى ও اشقى শব্দদ্বয়ের অর্থ ব্যাপক নয় বরং এখানে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে কোন মুসলমান গোনাহ্ করা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংসর্গের বরকতে জাহান্নামে যাবে না।

সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাহান্নাম থেকে মুক্ত ঃ কারণ, প্রথমত তাঁদের দ্বারা গোনাহ্

খুব কমই হয়েছে। তাছাড়া তাঁদের অবস্থা থেকে একথা জরুরীভাবে জানা যায় যে, তাঁদের কারও দ্বারা কোন গোনাহ্ হয়ে থাকলে তিনি তওবা করে নিয়েছেন। আরও বলা যায় যে, তাঁদের এক একটি গোনাহের মুকাবিলায় সৎকর্মের সংখ্যা এত বেশী যে, সে গোনাহ্ অনায়াসেই মাফ হয়ে যেতে পারে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ সৎ কর্ম অসৎ কর্মের কাফফরা হয়ে যায়। স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গও এমন একটি সৎকর্ম, যা সব সৎকর্মের উপর প্রবল। হাদীসে সৎকর্মশীল বুযুর্গদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : هُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ وَلَا يَخِيبُ أَنِيسُهُمْ অর্থাৎ তাঁদের সাথে যারা উঠাবসা করে, তারা হতভাগা হতে পারে না এবং তাদের সাথে যারা প্রীতির সম্পর্ক রাখে, তারা বঞ্চিত হতে পারে না।—(বুখারী, মুসলিম) সুতরাং যে ব্যক্তি পয়গম্বরকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-র সহচর হবে, সে কিরূপে হতভাগ্য হতে পারে? এ কারণেই অনেক সহীহ হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত। খোদ কোরআনে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ —অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হুসনা অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্য এক আয়াতে আছে : إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ —অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে হুসনা (জান্নাত) অবধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে। এক হাদীসে আছে, জাহান্নামের অগ্নি সে ব্যক্তিকে স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে।—(তিরমিযী)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ —এতে সৌভাগ্যশালী আল্লাহ্ভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যে অভ্যস্ত এবং একমাত্র গোনাহ্ থেকে শুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে।

আয়াতের ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তিই ঈমানসহ আল্লাহ্র পথে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। কিন্তু এ আয়াতের শানে-নুযূল সংক্রান্ত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, এখানে الْأَتْقَى বলে হযরত আবূ বকর

সিদ্দীক (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ওরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাতজন মুসলমানকে কাফিররা গোলাম বানিয়ে রেখেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। হযরত আবূ বকর (রা) বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে তাদেরকে কাফির মালিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেন এবং মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।—(মাযহারী)

এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى—অর্থাৎ যেসব গোলামকে হযরত আবূ বকর (রা) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত; বরং إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى—তাঁর লক্ষ্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকে কাফির মালিকের হাতে বন্দী দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণত দুর্বল ও শক্তি-হীন হত। একদিন তাঁর পিতা হযরত আবূ কোহাফা বললেন ঃ তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হিফাজত করতে পারে। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ কোন মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তাদেরকে মুক্ত করি।—(মাযহারী)

وَلَسَوْفَ يَرْضَى—অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তার ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং পার্থিব উপকার চায়নি, আল্লাহ্ তা'আলাও পরকালে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নিয়ামত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি হযরত আবূ বকর (রা)-এর জন্য একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ্ তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।

سورة الضحى

সূরা যোহা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১ ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى ۝ وَالَّيْلِ إِذَا سَجٰى ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ পূর্বাহ্নের, (২) শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (৩) আপনার পালন-কর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। (৪) আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (৫) আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। (৭) তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করে-ছেন। (৮) তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। (৯) সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; (১০) সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না (১১) এবং আপনার পালনকর্তার নিয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ পূর্বাহ্নের এবং রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে— এক. আক্ষরিক অর্থাৎ পুরোপুরি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। কেননা, রাত্রিতে অন্ধকার আস্তে আস্তে বাড়ে এবং কিছু রাত্রি অতিবাহিত হলে পর তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দুই. রূপক অর্থাৎ প্রাণীকুলের নিদ্রামগ্ন হয়ে যাওয়া এবং চলাফেরা ও কথাবার্তার আওয়াজ থেমে যাওয়া। অতঃপর শপথের জওয়াব বলা হয়েছে) আপনার পালনকর্তা

আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নি। (কেননা, প্রথমত আপনি এরূপ কোন কাজ করেন নি। দ্বিতীয়ত পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ আচরণ থেকে মুক্ত রেখেছেন। সুতরাং আপনি কাফিরদের বাজে কথায় ব্যথিত হবেন না। ওহীর আগমনে কয়েকদিন বিলম্ব দেখে তারা বলতে শুরু করেছে ঃ আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেছেন। কাফিরদের এই প্রলাপোক্তির মুকাবিলায় আপনি পূর্ববৎ ওহীর সম্মান দ্বারা ভূষিত হবেন। এ সম্মান তো আপনার জন্য ইহকালে) আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (সুতরাং সেখানে আপনি আরও বেশী সম্মান ও নিয়ামত পাবেন)। আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে (পরকালে প্রচুর নিয়ামত) দান করবেন, অতঃপর আপনি (এ দান পেয়ে) সন্তুষ্ট হবেন। [শপথের বিষয়বস্তুর সাথে এ সুসংবাদের সম্পর্ক এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেমন বাহ্যত দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন এনে তাঁর কুদরত ও হিকমতের বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশ করেন, অভ্যন্তরীণ অবস্থাকেও তেমনি বুঝতে হবে। সূর্য-কিরণের পর রাত্রির আগমন যদি আল্লাহ্ তা'আলার রোষ ও অসন্তুষ্টির দলীল না হয় এবং এতে প্রমাণিত না হয় যে, এরপর কখনও দিবালোক আসবে না, তবে কয়েক দিন ওহীর আগমন বন্ধ থাকলে এটা কিরূপে বোঝা যায় যে, আজকাল আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত পয়গম্বরের প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। ফলে ওহীর দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন? এরূপ বলার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান ও অপার রহস্য সম্পর্কে আপত্তি তোলা যে, তিনি পূর্বে জানতেন না তাঁর মনোনীত পয়গম্বর ভবিষ্যতে অযোগ্য প্রমাণিত হবে (নাউযু-বিল্লাহ্)। অতঃপর কতক নিয়ামত দ্বারা উপরোক্ত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে]। আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে ইয়াতীমরূপে পান নি? অতঃপর আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। [মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই রসূলুল্লাহ্ (সা) পিতৃহীন হয়ে যান। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা দাদাকে দিয়ে তাঁর লালন-পালন করান। আট বছর বয়সে মাতারও ইন্তেকাল হয়ে গেলে তিনি পিতৃব্যের লালন-পালনে আসেন। আশ্রয় দেওয়ার অর্থ এটাই]। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে (শরীয়ত সম্পর্কে) বেখবর পান, অতঃপর (শরীয়তের) পথপ্রদর্শন করেছেন।

(যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ —ওহীর পূর্বে শরীয়তের তফসীল জানা না থাকা কোন দোষ নয়)। তিনি আপনাকে নিঃস্ব পেয়েছেন অতঃপর ধনশালী করেছেন। [খাদীজা (রা)-র অর্থ দ্বারা তিনি অংশীদারিত্বে ব্যবসা করেন এবং মুনাফা অর্জন করেন। অতঃপর খাদীজা (রা) তাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁর হাতে তুলে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি শুরু থেকেই নিয়ামত-প্রাপ্ত আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমি যখন এসব নিয়ামত আপনাকে দিয়েছি, তখন] আপনি (এর কৃতজ্ঞতায়) ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা করবেন না, সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেবেন না (এটা কার্যগত কৃতজ্ঞতা।) এবং আপনার পালনকর্তার (উপরোক্ত) নিয়ামতের কথা প্রকাশ করতে থাকুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত জুনদুব ইবনে অবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি অংগুলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন ঃ

ان انت الا اصبع دميت
وفى سبيل الله لقيت

অর্থাৎ তুমি তো একটি অংগুলিই যা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহ্র পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের)। এ ঘটনার পর কিছু দিন জিবরাঈল ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ্ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে এই সূরা যোহা অব-তীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত জুনদুব (রা)-এর রেওয়ায়েতে দু'এক রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার কথা আছে---ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিযীতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী বিলম্বিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই সংঘ-টিত হতে পারে বিধায় উভয় রেওয়ায়েতে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয় তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রেওয়ায়েতে আছে যে, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কোরআন অবতরণের প্রথমভাগে, যাকে 'ফাতরাতে-ওহী'র কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশী দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জওয়াব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন 'ইনশাআল্লাহ্' না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা যোহা অবতীর্ণ হয়, সেটাও এমনি ধরনের। সবগুলো ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া জরুরী নয় বরং আগে-পিছেও হতে পারে।

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ---এখানে آخرة ও اولى শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ পরকাল ও ইহকাল নেওয়া হলে এর ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এর অসারতা তো তারা ইহকালে দেখে নিবেই, অধিকন্তু আমি আপনাকে পরকালে নিয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশী নিয়ামত দান করা হবে। এখানে آخرة কে শাব্দিক অর্থে নেওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা, যেমন اولى শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে

জানগরিমা ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যে উন্নতিলাভসহ জীবিকা এবং পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى —অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দেবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবস্তুই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাম্যবস্তুসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের উন্নতি, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উম্মতের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, শত্রুদেশে ইসলামের কলেমা সমুন্নত করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে পর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাহলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার উম্মতের একটি লোকও জাহান্নামে থাকবে।—(কুরতুবী) হযরত আলী (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবুল করবেন এবং অবশেষে তিনি বলবেন : رضيت يا محمد হে মুহাম্মদ, এখন আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি? আমি আরয করব : يارب رضيت হে আমার পরওয়ারদিগার, আমি সন্তুষ্ট। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন : একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ —অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-র উক্তি সম্বলিত অপর একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন : إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ —এরপর তিনি দু'হাত তুলে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন : اللهم امتى امتى আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করতে প্রেরণ করলেন : (এবং বললেন, অবশ্য আমি সব জানি)। জিবরাঈলের জওয়াবে তিনি বললেন : আমি আমার উম্মতের মাগফিরাত চাই। আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেন : যাও, গিয়ে বল যে, আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং আপনাকে দুঃখিত করবেন না।

উপরে কাফিরদের বলাবলির জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। অতঃপর তিনটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করে এর কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হয়েছে : أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى —এটা প্রথম নিয়ামত।

অর্থাৎ আমি আপনাকে পিতৃহীন পেয়েছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করে-ছিল। পিতা কোন বিষয়-আশয়ও ছেড়ে যায়নি, যদ্দ্বারা আপনার লালন-পালন হতে পারত। অতঃপর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ প্রথমে পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের ও পরে পিতৃব্য আবূ তালিবের অন্তরে আপনার প্রতি অগাধ ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ফলে তারা ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক যত্নসহকারে আপনাকে লালন-পালন করত।

দ্বিতীয় নিয়ামত ঃ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ — ضال শব্দের অর্থ পথভ্রষ্টও হয় এবং অনভিজ্ঞ, বেখবরও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। অতঃপর নবুয়তের পদ দান করে তাঁকে পথনির্দেশ দেওয়া হয়।

তৃতীয় নিয়ামত ঃ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে ধনশালী করেছেন। হযরত খাদীজা (রা)-র ধনসম্পদ দ্বারা অংশীদারী কারবার করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়, অতঃপর খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়।

এ তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ — قهر শব্দের অর্থ জবরদস্তিমূলক-ভাবে অধিকারভুক্ত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কোন পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ মনে করে তার ধনসম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না। একা-রণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াতীমের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মুসলমানদের সে গৃহই সর্বোত্তম যাতে কোন ইয়াতীম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়। আর সে গৃহ সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোন ইয়াতীম রয়েছে কিন্তু তার সাথে অসদ্ব্যবহার করা হয়।—(মাযহারী)

দ্বিতীয় নির্দেশ ঃ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ — نهر শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া এবং سائل-এর অর্থ সাহায্যপ্রার্থী। অর্থগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকার সাহায্যপ্রার্থী এর অন্তর্ভুক্ত। উভয়কে ধমক দিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্যপ্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জওয়াবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা নিষেধ। তবে যদি কোন সাহায্যপ্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তবে প্রয়োজনে তাকে ধমক দেওয়াও জায়েয।

তৃতীয় নির্দেশ : وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ —تحديث শব্দের অর্থ কথা বলা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাও এক পন্থা। এমনকি একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ্ তা'আলারও শোকর আদায় করে না।—(মাযহারী)

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তোমারও উচিত তার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া। যদি আর্থিক প্রতিদান দিতে অক্ষম হও, তবে মানুষের সামনে তার প্রশংসা কর। কেননা, যে জনসমক্ষে তার প্রশংসা করে, সে কৃতজ্ঞতার হক আদায় করে দেয়।—(মাযহারী)

মাস'আলা : সবরকম নিয়ামতের শোকর আদায় করাই ওয়াজিব। আর্থিক নিয়ামতের শোকর হল তা থেকে কিছু খাঁটি নিয়তে ব্যয় করা। শারীরিক নিয়ামতের শোকর হল শারীরিক শক্তিকে আল্লাহ্‌র ফরয কার্য সম্পাদনে ব্যয় করা। জ্ঞানগত নিয়ামতের শোকর হল অপরকে তা শিক্ষা দেওয়া।—(মাযহারী)

o সূরা যোহা থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার সাথে তকবীর বলা সুন্নত। শায়েখ সালেহ মিসরীর মতে এই তকবীর হল : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ —(মাযহারী)

ইবনে কাসীর প্রত্যেক সূরা শেষে এবং বগভী (র) প্রত্যেক সূরার শুরুতে তকবীর বলা সুন্নত বলেছেন।—(মাযহারী) উভয়ের মধ্যে যাই করা হবে, তাতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং কয়েকটি সূরায় কিয়ামত ও তার অবস্থাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন মহান এবং যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে। এই বিষয়বস্তু দ্বারাই কোরআন পাক শুরু করা হয়েছে এবং সেই সত্তার মাহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা শেষ করা হয়েছে, যাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

سورة الانشراح

সূরা ইনশিরাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৮ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ﴿۱﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ﴿۳﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ﴿۴﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ﴿۵﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ﴿۶﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ﴿۷﴾ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿۸﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি ? (২) আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, (৩) যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় দুঃসহ। (৪) আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। (৫) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৭) অতএব, যখন অবসর পান, পরিশ্রম করুন। (৮) এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি কি আপনার খাতিরে আপনার বক্ষ (জ্ঞান ও সহিষ্ণুতা দ্বারা) প্রশস্ত করে দেইনি ? (অর্থাৎ জ্ঞান ও বিস্তৃতি দান করেছি এবং প্রচারকার্যে শত্রুদের বাধা দানের কারণে যে কষ্ট হয়, তা সহ্য করার ক্ষমতাও দিয়েছি।—দুররে-মনসূর) আমি আপনার বোঝা লাঘব করেছি, যা আপনার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। ['বোঝা' বলে এখানে সেসব বৈধ বিষয় বোঝানো হয়েছে, যা কোন কোন সময় রহস্য ও উপযোগিতাবশত রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পাদন করতেন এবং পরে প্রমাণিত হত যে, এটা উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী। এতে তিনি উচ্চমর্যাদা ও চরম নৈকট্যের কারণে এমন চিন্তিত হতেন, যেন কোন গোনাহ্ করে ফেলেছেন। আয়াতে এ জাতীয় কাজের জন্য তাঁকে পাকড়াও করা হবে না বলে সুসংবাদ রয়েছে। এরূপ সুসংবাদ তাঁকে দু'বার দেওয়া হয়েছে—একবার মক্কায় এই সূরার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়বার মদীনায় সূরা ফাত্হের মাধ্যমে। এতে প্রথম সুসংবাদের তাকীদ নবায়ন

ও তফসীল করা হয়েছে]। আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চে স্থাপন করেছি। (অর্থাৎ শরীয়তের অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহ্‌র নামের সাথে আপনার নাম যুক্ত হয়েছে। এক হাদীসে-কুদসীতে আল্লাহ্‌ বলেন : اذا ذكرت ذ كرت معى অর্থাৎ যেখানে আমার আলোচনা হবে, সেখানে আমার সাথে আপনার আলোচনাও হবে। যেমন, খোতবায়, তাশাহ্‌হুদে, আযানে ও ইকামতে। আল্লাহ্‌র নামের উচ্চতা ও খ্যাতি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র নামের সাথে যুক্ত নামও উচ্চ ও সুখ্যাত হবে। মক্কায় তিনি ও মু'মিনগণ নানারকম কষ্ট ও বিপদাপদে গ্রেফতার ছিলেন। তাই অতঃপর সেসব কষ্ট দূর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, আমি যখন আপনাকে আত্মিক সুখ দিয়েছি এবং আত্মিক কষ্ট দূর করে দিয়েছি,. তখন পার্থিব সুখ ও শ্রমের ব্যাপারেও আমার দয়া এবং অনুগ্রহের আশা করা উচিত। সেমতে আমি ওয়াদা করছি) নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সাথে (অর্থাৎ সত্বরই) স্বস্তি হবে। (এসব বিপদাপদের প্রকার ও সংখ্যা অনেক ছিল। তাই তাকীদের জন্য পুনশ্চ ওয়াদা করা হচ্ছে) নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সাথে স্বস্তি হবে। (সেমতে সব বিপদাপদ এক এক করে দূর হয়ে যায়। অতঃপর এসব নিয়ামতের কারণে শোকর আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—আমি যখন এসব নিয়ামত দিলাম, তখন) আপনি যখন (প্রচারকার্য থেকে) অবসর পাবেন, তখন (আপনার বিশেষ বিশেষ ইবাদতে) পরিশ্রম করুন (অর্থাৎ অধিক ইবাদত ও সাধনা করুন। এটাই আপনার শানের উপযুক্ত) এবং (যা কিছু চাইতে হয়, সে ব্যাপারে) আপনার পালনকর্তার দিকে মনোনিবেশ করুন। (অর্থাৎ তাঁর কাছেই চান। এতেও কষ্ট দূর করার এক ধরনের সুসংবাদ রয়েছে। কেননা, আবেদন করার নির্দেশ দান প্রকারান্তরে আবেদন পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা যোহার শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি সূরায় বেশীর ভাগ রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র প্রতি নিয়ামত ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মাত্র কয়েকটি সূরায় কিয়ামতের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরা ইন্‌শিরাহেও রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে এবং এ বর্ণনায়ও সূরা যোহার ন্যায় জিজ্ঞাসাবোধক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ—شرح শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য বক্ষকে প্রশস্ত করে দেওয়ার অর্থে বক্ষ উন্মুক্ত করা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য এক আয়াতে আছে : فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র পবিত্র বক্ষকে আল্লাহ্‌ তা'আলা জ্ঞান-তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বড় বড় পণ্ডিত-দার্শনিকও তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারে

কাছে পৌঁছতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করত না। কোন কোন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ্র আদেশে বাহ্যত ও তাঁর বক্ষ বিদারণ করে পরিষ্কার করেছিল। কোন কোন তফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উম্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন। —(ইবনে কাসীর)

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ — وزر -এর শাব্দিক অর্থ বোঝা আর نقض ظهر -এর শাব্দিক অর্থ কোমর ভেঙ্গে দেওয়া। অর্থাৎ কোমরকে নুইয়ে দেওয়া। কোন বড় বোঝা কারও মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার এক ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এতে সে বৈধ ও অনুমোদিত কাজ বোঝানো হয়েছে, যা কোন কোন সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) তাৎপর্য ও উপযোগিতাবশত সম্পাদন করেছেন কিন্তু পরে জানা গেছে যে, কাজটি উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে ছিল এবং তিনি আল্লাহ্র নৈকট্যের বিশেষ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই এ ধরনের কাজের জন্যও তিনি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত ও ব্যথিত হতেন। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সুসংবাদ শুনিয়ে সে বোঝা তাঁর উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ ধরনের কাজের জন্য আপনাকে পাকড়াও করা হবে না।

কোন কোন তফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে বোঝার অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নবুয়তের প্রথমদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও গুরুতররূপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করা এবং কুফর ও শিরকের বিলোপ সাধন করে সমগ্র মানব জাতিকে তওহীদে একত্রিত করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। এসব ব্যাপারে আদেশ ছিলঃ فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ —অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী সরলপথে অটল থাকুন। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই গুরুভার তিলে তিলে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তাঁর দাড়ির কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বললেনঃ فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ — এই আয়াত আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।

এই বোঝাকেই তাঁর অন্তর থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে উক্ত হয়েছে। একে সরানোর পন্থা পরের আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আপনার প্রত্যেক কষ্টের পর স্বস্তি আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা বক্ষ উম্মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মনোবল আকাশচুম্বী করে দেন। ফলে প্রত্যেক কঠিন কাজই তাঁর কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোন বোঝাই আর বোঝা থাকেনি।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ —রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আলোচনা উন্নত করা এই যে, ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। সারা বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিম্বরে 'আশহাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহহ্'র সাথে সাথে 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্' বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের কোন জ্ঞানী মানুষ তাঁর নাম সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়।

এখানে তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে—شرح صدر (বক্ষ উন্মোচন) وضع وزر (বোঝা লাঘবকরণ) ও رفع ذكر (আলোচনা উন্নতকরণ)। এগুলোকে তিনটি বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাক্যে কর্তা ও কর্মের মাঝখানে لك অথবা عنك ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব কাজ আপনার খাতিরেই করা হয়েছে।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا —আরবী ভাষার একটি নীতি এই যে, আলিফ ও লাম যুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে العسر শব্দটি যখন পুনরায় العسر উল্লিখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জায়গায় একই عسر অর্থাৎ কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে يسرا শব্দটি উভয় জায়গায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লিখিত হয়েছে। এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় يسر তথা স্বস্তি প্রথম يسر তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। অতএব আয়াতে اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا —এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্য দু'টি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু'-এর উদ্দেশ্যও এখানে বিশেষ দু'-এর সংখ্যা নয়, বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি কষ্টের সাথে তাঁকে অনেক স্বস্তিদান করা হবে।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন: আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে এই আয়াত থেকে দু'টি সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, لن يغلب عسر يسرين অর্থাৎ এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারে না। সেমতে মুসলমান ও অমুসলমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, যে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর বরং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হত, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য সে কাজ সহজতর হয়ে গিয়েছিল।

শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য একান্তে যিকর ও আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করা জরুরী ঃ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

অর্থাৎ আপনি যখন দাওয়াত ও তবলীগের কাজ থেকে অবসর পান, তখন অন্য কাজের জন্য তৈরী হয়ে যান। আর তা হল এই যে, আল্লাহ্র যিকর, দোয়া ও ইস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ তফসীরই করেছেন। কেউ কেউ অন্য তফসীরও করেছেন কিন্তু এটাই অধিকতর বোধগম্য তফসীর। এর সারমর্ম এই যে, দাওয়াত, তবলীগ, মানুষকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের চিন্তা করা—এসবই ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সর্ববৃহৎ ইবাদত। কিন্তু এটা সৃষ্টজীবের মধ্যস্থতায় ইবাদত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কেবল এজাতীয় পরোক্ষ ইবাদত করে ক্ষান্ত হবেন না বরং যখনই এ ইবাদত থেকে অবসর পাবেন, তখন একান্তে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করুন। তাঁর কাছেই প্রত্যেক কাজে সাফল্য লাভের দোয়া করুন। আল্লাহ্র যিকর ও প্রত্যক্ষ ইবাদতই তো আসল উদ্দেশ্য। এর জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই পরোক্ষ ইবাদত থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক প্রয়োজনের ইবাদত। এ থেকে অবসর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ ইবাদত তথা আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করা এমন বিষয়, যা থেকে মু'মিন ব্যক্তি কখনও অবসর পেতে পারে না, বরং তার জীবন ও সর্বশক্তি এতে ব্যয় করতে হবে।

এ থেকে জানা গেল যে, আলিম সমাজ, যার শিক্ষা, প্রচার ও জনসংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের কিছু সময় আল্লাহ্র যিকর ও আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশে ব্যয়িত হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণ এরূপই ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা এবং প্রচারকার্যও কার্যকর হয় না এবং তাতে বরকতও হয় না। فَانْصَبْ শব্দটি نصب থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পরিশ্রম ও ক্লান্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদত ও যিকর এতটুকু করা উচিত যে, তাতে কিছু কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভূত হয়—আরাম পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত নয়। কোন ওযিফা কিংবা নিয়ম মেনে চলাও এক প্রকার কষ্ট ও ক্লান্তি, যদিও কাজ সামান্যই হয়।

سورة التين

সূরা তীন

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৮ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ আঞ্জীর ফল (তথা ডুমুর) ও যয়তুনের, (২) এবং তুরে সিনীনের (৩) এবং এই নিরাপদ নগরীর। (৪) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে (৫) অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে (৬) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৭) অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কিয়ামতকে ? (৮) আল্লাহ্‌ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) বৃক্ষের, যয়তুন বৃক্ষের, তুরে সিনীনের এবং এই নিরাপদ নগরীর (অর্থাৎ মক্কা মোয়াযযমার)। আমি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর (তাদের মধ্যে যে লোক বৃদ্ধ হয়ে যায়) তাকে হীনতাগ্রস্তদের মধ্যে হীনতর করে দেই। (অর্থাৎ সৌন্দর্য কদাকারে এবং শক্তি দৌর্বল্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়)। ফলে সে হীন থেকে হীনতর হয়ে যায়। (এতে পূর্ণ মন্দতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এর ফলে আল্লাহ্‌ যে তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাই ফুটে উঠে। অন্য এক আয়াতে আছে اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ —আল্লাহ্‌ তা'আলা পুনরায় সৃষ্টি করতে ও জীবিত করতে সক্ষম—একথা সপ্রমাণ করাই এ সূরার উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ -বাক্যে এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা যায় যে, সব বৃদ্ধই বিশ্রী ও হীন হয়ে যায়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য অতঃপর আয়াতে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। (এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মু'মিন সৎকর্ম বৃদ্ধ ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পরিণতির দিক দিয়ে ভাল অবস্থায়ই থাকে, বরং তাদের ইযযত পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যায়। অতঃপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ যখন সৃষ্টি করতে ও অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম, তখন হে মানুষ) অতঃপর কিসে তোমাকে কিয়ামতে অবিশ্বাসী করে? (অর্থাৎ কোন্ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে তুমি কিয়ামতকে মিথ্যা মনে কর?) আল্লাহ্ তা'আলা কি সব বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন? (পার্থিব কাজকারবারে ও তন্মধ্যে মানবসৃষ্টি ও বার্ধক্যে তার মধ্যে পরিবর্তন আনার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং পারলৌকিক ব্যাপারাদিতেও —তন্মধ্যে কিয়ামত ও দান-প্রতিদান অন্যতম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ—এ সূরায় চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এক. তীন অর্থাৎ আঞ্জীর তথা ডুমুর বৃক্ষ। দুই. যয়তূন বৃক্ষ। তিন. তূরে সিনীন। চার. মক্কা মোকাররমা। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তূর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যয়তূন বৃক্ষও বহুল উপকারী। এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও যয়তুন উল্লেখ করে সে স্থান বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ, যা পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। হযরত ইবরাহীম (আ)ও সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মক্কা মোকাররমায় আনা হয়েছিল। এভাবে উপরোক্ত শপথসমূহে সেসব পবিত্র ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। শাম দেশ অধিকাংশ পয়গম্বরের আবাসভূমি। তূর পর্বত মূসা (আ)-র আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা তূর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেষ নবী (সা)-এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।

শপথের পর বলা হয়েছে : لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ—

تَقْوِيْم-এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছুর অবয়ব ও ভিত্তিকে ঠিক করা।

احسن تقويم-এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর ঃ মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। ইবনে আরাবী বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জ্ঞানী, শক্তিমান, বক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী। সেমতে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে ঃ ان الله خلق ادم على صورته অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে নিজের আকারে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কতিপয় গুণাবলী কোন কোন পর্যায়ে তাকেও দেওয়া হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন আকার নেই।—(কুরতুবী)

মানব সৌন্দর্যের একটি অভাবনীয় ঘটনা ঃ কুরতুবী এস্থলে বর্ণনা করেন, ঈসা ইবনে মূসা হাশেমী খলীফা আবূ জা'ফর মনসূরের একজন বিশেষ সভাসদ ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে অত্যধিক ভালবাসতেন। একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে স্ত্রীর সাথে বসে হাসি তামাশার ছলে বলে ফেললেন ঃ انت طالق ثلاثا ان لم تكونى احسن من القمر অর্থাৎ তুমি তিন তালাক, যদি তুমি চাঁদ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী না হও। একথা বলতেই স্ত্রী উঠে পর্দায় চলে গেল এবং বলল ঃ আপনি আমাকে তালাক দিয়েছেন। ব্যাপারটি যদিও হাসি তামাশার ছিল কিন্তু বিধান এই যে, পরিষ্কার তালাক শব্দ হাসি তামাশার ছলে উচ্চারণ করলেও তালাক হয়ে যায়। ঈসা ইবনে মূসা চরম অস্থিরতার মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। প্রত্যুষে খলীফা আবূ জা'ফর মনসূরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। খলীফা শহরের ফতওয়াবিদ আলিমগণকে ডেকে মাস'আলা জিজ্ঞেস করলেন। সবাই এক উত্তর দিলেন যে, তালাক হয়ে গেছে। কেননা, তাদের মতে চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপরই নয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার জনৈক শিষ্য আলিম চুপচাপ বসে ছিলেন। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিশ্চুপ কেন? তখন তিনি বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম পাঠ করে আলোচ্য সূরা তীন তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন ঃ আমিরুল মু'মিনীন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ মাত্রেরই অবয়ব সুন্দরতম। কোন কিছুই মানুষ অপেক্ষা সুন্দর নয়। একথা শুনে উপস্থিত আলিমগণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন এবং কেউ বিরোধিতা করলেন না। সেমতে খলীফা তালাক হয়নি বলে রায় দিয়ে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর—রূপ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এবং শারীরিক গড়নের দিক দিয়েও। তার মস্তকে কেমন অঙ্গ কি কি আশ্চর্যজনক কাজ করছে—মনে হয় যেন একটি ফ্যাক্টরী, যাতে নাযুক, সূক্ষ্ম ও স্বয়ংক্রিয় মেশিন চালু রয়েছে। তার বক্ষ ও পেটের অবস্থাও তদ্রূপ। তার হস্তপদের গঠন ও আকার হাজারো উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই দার্শনিকগণ বলেন ঃ মানুষ একটি ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ সমগ্র জগতের একটি মডেল। সমগ্র জগতে যেসব বস্তু ছড়িয়ে আছে, তা সবই মানুষের মধ্যে সমবেত আছে।—(কুরতুবী)

সূফী বুযুর্গগণও এ বিষয়ের সমর্থন করেছেন এবং কেউ কেউ মানুষের আপাদমস্তক বিশ্লেষণ করে তাতে জগতের সব বস্তুর নমুনা দেখিয়েছেন।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ—পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরতম সৃষ্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রারম্ভে যেমন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। যৌবন অস্তমিত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ধক্য এসে তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। সে কুশ্রী দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। কারও কোন উপকারে আসে না। অন্যান্য জীবজন্তু এর বিপরীত। তারা শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে। মানুষ তাদের কাছ থেকে দুগ্ধ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রকম কাজ নেয়। তাদেরকে জবাই করা হলে অথবা তারা মারা গেলেও তাদের চামড়া, পশম, অস্থি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ধক্যে অক্ষম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোন অংশ দ্বারা কোন মানুষ অথবা জন্তুর উপকার হয় না। সার কথা, মানুষ যে নিকৃষ্টদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এর অর্থ তার বৈষয়িক ও শারীরিক অবস্থা। হযরত যাহ্হাক প্রমুখ থেকে এ তফসীরই বর্ণিত রয়েছে।—(কুরতুবী)

এ তফসীর অনুযায়ী পরের আয়াতে মু'মিন সৎকর্মীর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মু'মিন সৎকর্মী বার্ধক্যে অক্ষম ও অপারক হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের দৈহিক বেকারত্ব ও বৈষয়িক অকর্মন্যতার ক্ষতি তাদের হয় না বরং ক্ষতি কেবল তাদের হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈষয়িক উন্নতিতেই ব্যয় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিন্তু মু'মিন সৎকর্মীর পুরস্কার ও সওয়াব কোন সময়ই নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ধক্যের বেকারত্ব ও অপারকতার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখই সুখ বিদ্যমান থাকে। বার্ধক্যজনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলনামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: কোন মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ্ তা'আলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎ কর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক।—(বুখারী) এছাড়া এস্থলে মু'মিন সৎ কর্মীর প্রতিদান জান্নাত ও তার নিয়ামত বর্ণনা করার পরিবর্তে বলা হয়েছে: لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ—অর্থাৎ তাদের পুরস্কার কখনও বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাদের এই পুরস্কার দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য বার্ধক্যে এমন খাঁটি সহচর জুটিয়ে দেন, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে আত্মিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সেবাযত্ন করেন। এভাবে বার্ধক্যের যে স্তরে মানুষ বৈষয়িক ও দৈহিক দিক দিয়ে অকেজো, বেকার ও অপরের উপর বোঝারূপে গণ্য হয়, সে স্তরেও আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ বেকার থাকেন না। কোন কোন তফসীরবিদ আলোচ্য

আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন যে, رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ——সাধারণ মানুষের জন্য নয় বরং কাফির ও পাপাচারীদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত সুন্দর অবয়ব, গুণগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে বরবাদ করে দেয়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসাবে তাদেরকে হীনতম পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا বাক্যের ব্যতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল থাকে। অর্থাৎ যারা মু'মিন ও সৎকর্মী, তাদেরকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছানো হবে না। কেননা, তাদের পুরস্কার সব সময়ই অব্যাহত থাকবে।—(মাযহারী)

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ——এতে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কুদরতের উপরোক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্য পরকাল ও কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা কি সব বিচারকের মহা বিচারক নন ?

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা তীনের أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ পর্যন্ত পাঠ করে, তার উচিত وَأَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ বলা। সেমতে ফিকাহ্‌বিদগণের মতেও এই বাক্যটি পাঠ করা মোস্তাহাব।

سورة العلق

সূরা আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ১৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۝ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝ اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۝ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۝ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۝ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝ كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (৩) পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৬) সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, (৭) একারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (৮) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (৯) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে (১০) এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে? (১১) আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎ পথে থাকে (১২) অথবা আল্লাহ্‌ভীতি শিক্ষা দেয়। (১৩) আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন? (১৫) কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই---(১৬) মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। (১৭) অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক। (১৮) আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের

প্রহরীদেরকে। (১৯) কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(اِقْرَأْ থেকে مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতরণের মাধ্যমে নবুয়তের সূচনা হয়। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে এর কাহিনী এভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, নবুয়ত লাভের কিছু দিন পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাআপনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে যান। তিনি হেরা গিরিগুহায় গমন করে কয়েক রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করতেন। এক দিন হঠাৎ জিবরাঈল এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন ঃ اقرا অর্থাৎ পাঠ করুন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ما انا بقارى অর্থাৎ আমি যে পড়তে জানি না। জিবরাঈল তাঁকে সজোরে চেপে ধরলেন, অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ اقرا পাঠ করুন। তিনি আবারও সে জওয়াবই দিলেন। এমনিভাবে তিন বার চেপে ধরলেন ও ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ اقرا থেকে مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত)

হে পয়গম্বর (এ সময়কার আয়াতগুলোসহ আপনার প্রতি যে কোরআন নাযিল হবে, তা) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম নিয়ে পাঠ করুন। [অর্থাৎ যখন পাঠ করেন, তখন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' বলে পাঠ করুন। অন্য এক আয়াতে اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ বলে কোরআন পাঠের সাথে আউযুবিল্লাহ্ পড়ার আদেশ করা হয়েছে। এ দু'টি আদেশের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। এটা মনে মনে বলা ওয়াজিব এবং মুখে উচ্চারণ করা সুন্নত। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিসমিল্লাহ্ জানা থাকা জরুরী নয়। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েতে এ সূরার সাথে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম নাযিল হওয়াও বর্ণিত আছে।

اخرجه الواحدى عن عكرمة والحسن انهما قالا اول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم واول سورة اقرأ واخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس انه قال اول ما نزل جبرا ئيل عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم - كذا فى روح المعانى -

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র নামে পাঠ করতে বলা হয়েছে। এ আয়াতে স্বয়ং এই আয়াতসমূহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা এমন যেমন কেউ অপরকে বলে, আমি যা বলি শুন। এতে স্বয়ং এই বাক্যটি শুনার আদেশ করাও বক্তার উদ্দেশ্য থাকে। অতএব সারকথা এই যে, এ আয়াতগুলো পাঠ করুন অথবা পরে যেসব আয়াত নাযিল হবে, সেগুলো পাঠ করুন, সবগুলোর পাঠই আল্লাহ্‌র নামে হওয়া উচিত। রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানতে পেরেছিলেন যে, এটা কোরআন ও ওহী। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ভীত হয়ে গিয়েছিলেন এবং ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গমন করেছিলেন। অবশ্য সন্দেহের কারণে ছিল না বরং ওহীর ভীতির কারণে তিনি এরূপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিষয়টি ওয়ারাকার কাছে বর্ণনা করা ছিল মানসিক শান্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, অবিশ্বাসের কারণে নয়। শিক্ষক ছাত্রকে অক্ষর শিক্ষাদান আরম্ভ করার সময় বলেন ঃ পড়। একে কেউ অসাধ্য কাজের আদেশ বলে না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওযর করার এক কারণ এই যে, তিনি কি পড়বেন, তা তাঁর কাছে নির্দিষ্ট ছিল না। এটা পয়গম্বরের শানের খেলাফ হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, পাঠ করা অধিকাংশ সময় লিখিত বিষয় পড়ার অর্থে ব্যবহৃত নয়। তাঁর যেহেতু অক্ষরজ্ঞান ছিল না, তাই এই ওযর করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে ওহীর গুরুভার বহন করার যোগ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্ভবত জিবরাঈল তাঁকে চেপে ধরেছিলেন। والله اعلم পালনকর্তা (رب) শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমি আপনার পুরোপুরি পালন করব এবং নবুয়তের উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেব। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তিনি এমন পালনকর্তা যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন। (বিশেষভাবে এ গুণটি উল্লেখ করার তাত্ত্বিক কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এ নিয়ামতটিই প্রকাশ পায়। অতএব সর্বাগ্রে এরই উল্লেখ সমীচীন। এছাড়া সৃষ্টিকর্ম স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। স্রষ্টার জ্ঞান লাভ করাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য কাজ। ব্যাপক সৃষ্টির কথা বলার পর এখন বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে—) যিনি (সব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিশেষভাবে) মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিরূপী নিয়ামতসমূহের মধ্যে সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর তুলনায় মানুষের প্রতি অধিক নিয়ামত রয়েছে। তাকে অনেক উন্নত করেছেন, চমৎকার আকার-আকৃতি দিয়েছেন এবং জ্ঞান গরিমায় সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং মানুষের অধিক শোকর ও যিকর করা উচিত। বিশেষভাবে জমাট রক্ত উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা একটা বরযখী অবস্থা। এর আগে রয়েছে বীর্য, খাদ্য ও উপাদান এবং এরপরে রয়েছে মাংসপিণ্ড, অস্থি গঠন ও আত্মাদান। সুতরাং জমাট রক্ত যেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থাসমূহের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা। অতঃপর কোরআন পাঠ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা সাব্যস্ত করার জন্য বলা হয়েছে ঃ) আপনি কোরআন পাঠ করুন। (অর্থাৎ প্রথম আদেশ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, এখানে আসল উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহ্‌র নাম বরং পাঠ করাও উদ্দেশ্য। কেননা, পাঠ করাই তবলীগের উপায় এবং পয়গম্বরের

আসল কাজই তবলীগ। সুতরাং এই পুনরুল্লেখ দ্বারা একথাও প্রকাশ পেয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তবলীগের আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর সে ওযর দূর করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যা তিনি প্রথমে জিবরাঈলের কাছে পেশ করেছিলেন যে, তিনি পড়া জানেন না ঃ বলা হয়েছে ঃ) আপনার পালনকর্তা দয়ালু (যা ইচ্ছা দান করেন) যিনি (লেখাপড়া জানাদেরকে) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন (এবং সাধারণভাবে) মানুষকে (অন্যান্য উপায়ে) শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। [অর্থাৎ প্রথমত শিক্ষা লেখার মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয় —অন্যান উপায়েও শিক্ষা হতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত উপায়াদি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল নয়—প্রকৃত শিক্ষাদাতা আমি। সুতরাং আপনি লেখা না জানলেও আমি অন্য উপায়ে আপনাকে পড়া এবং ওহীর জ্ঞান সংরক্ষণের শক্তি দান করব। কারণ, আমি আপনাকে পাঠ করার আদেশ দিয়েছি। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। সুতরাং এ আয়াতসমূহে নবুয়ত ও তার ভূমিকা এবং পরিপূরক বিষয়াদির বর্ণনা হয়ে গেছে। যেহেতু পয়গম্বরের বিরোধিতা চরম গোনাহ্ ও গর্হিত কাজ, তাই অনেক পরে অবতীর্ণ পরবর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশিষ্ট্য বিরোধিতাকারী আবূ জাহ্লের নিন্দা ব্যাপক ভাষায় করা হয়েছে। ফলে অন্যান্য বিরোধিতা-কারীও এতে শামিল হয়ে গেছে। এসব আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, একবার আবূ জাহ্ল রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নামায পড়তে দেখে বলল ঃ আমি আপনাকে নামায পড়তে বারবার নিষেধ করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ধমক দিলে সে বলল ঃ মক্কার অধিকাংশ লোকই আমার সাথে রয়েছে। যদি আপনাকে ভবিষ্যতে নামায পড়তে দেখি, তাহলে আপনার ঘাড়ে পা রেখে দেব (নাউযুবিল্লাহ্)। সেমতে সে একবার নামায পড়ার সময় হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে এগিয়ে এল কিন্তু হুযূর (সা)-এর কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেল এবং পেছনের দিকে সরতে লাগল। পরে এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে বলল ঃ আমি সামনে একটি অগ্নিপূর্ণ গর্ত দেখেছি এবং তাতে পাখাবিশিষ্ট কিছু বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে বলেন ঃ তারা ছিল ফেরেশতা। যদি আবূ জাহ্ল আরও সামনে এগোত, তবে ফেরেশ-তারা তাকে টুকরা টুকরা করে দিত। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে] সত্যি সত্যি (কাফির) মানুষ সীমালংঘন করে। কারণ, সে নিজেকে (অন্যদের থেকে) অমুখাপেক্ষী মনে করে। (অন্য আয়াতে আছে ঃ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ — الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا —অথচ এই অমুখাপেক্ষিতার কারণে অবাধ্যতা করা নির্বু-দ্ধিতা। কেননা, কেউ যদি সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন দিক দিয়ে অমুখাপেক্ষী হয়েও যায় কিন্তু স্রষ্টার প্রতি সে কোন অবস্থাতেই অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। এমনকি পরিশেষে হে মানুষ) তোমার পালনকর্তার দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন হবে। (কখনও জীবদ্দশার ন্যায় তাঁর কুদরত দ্বারা বেষ্টিত হবে এবং তখন অবাধ্যতার যে শাস্তি হবে, তা থেকেও কোথাও পালাতে পারবে না। সুতরাং অক্ষম ব্যক্তি সক্ষমের প্রতি কেমন করে অমুখাপেক্ষী হতে পারে ? অতএব নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করা এবং তজ্জন্য অবাধ্যতা করা বোকামিই বটে। অতঃপর জিজ্ঞাসার আকারে অবাধ্যতার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে—) হে মানুষ,

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে (আমার) এক বান্দাকে নামায পড়তে বারণ করে ? (অর্থাৎ এর চেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় আর নেই। নামাযীকে নামায পড়তে বারণ করা খুবই মন্দ ও বিস্ময়কর বিষয়। অতঃপর অধিকতর তাকীদ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে) হে ব্যক্তি, তুমি কি দেখেছ, যদি সে বান্দা (যাকে বারণ করা হয়েছে) সৎ পথে থাকে (যা নিজস্ব গুণ) অথবা অপরকে আল্লাহ্‌ভীতি শিক্ষা দেয় (যা পরোপকার। 'অথবা' বলে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দু'টি গুণের মধ্যে একটি থাকলেও নিষেধকারীর নিন্দার জন্য যথেষ্ট হত। আর তার মধ্যে তো দু'টিই রয়েছে)। হে ব্যক্তি, তুমি কি দেখেছ, যদি সে (নিষেধকারী) বান্দা মিথ্যারোপ করে এবং (সত্যধর্ম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ বিশ্বাসও না রাখে এবং আমলও না করে। প্রথমে দেখ যে, নামায পড়তে বারণ করা কত মন্দ। এরপর লক্ষ্য কর, বারণকারী একজন পথভ্রষ্ট এবং যাকে বারণ করছে সে একজন সৎ পথপ্রাপ্ত। সুতরাং এটা কেমন বিস্ময়কর ব্যাপার। অতঃপর বারণকারীর উদ্দেশ্যে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে—) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা (তার অবাধ্যতা এবং তা থেকে উৎপন্ন কার্যকলাপ) দেখছেন (এর জন্য) তিনি শাস্তি দেবেন ? (তার কখনও এরূপ করা উচিত নয়।) যদি সে (এই কর্মকাণ্ড থেকে) বিরত না হয়, তবে আমি (তাকে) মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে যা, মিথ্যা ও পাপে আপ্লুত কেশগুচ্ছ (জাহান্নামের দিকে) হেঁচড়াবই। (সে তার দলবলের স্পর্ধা দেখিয়ে আমার পয়গম্বরকে হুমকি দেয়—) অতএব সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক, (সে এরূপ করলে) আমিও জাহান্নামের প্রহরীদেরকে আহ্বান করব। [সে আহ্বান করেনি বলে আল্লাহ্ তা'আলাও ফেরেশতাগণকে আহ্বান করেন নি। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আবু জাহ্ল এরূপ করলে জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাগণ অবশ্যই প্রকাশ্যে তাকে পাকড়াও করত]। কখনও তার এরূপ করা উচিত নয়। আপনি (এই নালায়েকের কোন পরওয়া করবেন না এবং) তার কথা মেনে চলবেন না (যেমন এ পর্যন্ত মেনে চলেন নি) এবং (পূর্ববৎ) সিজদা করুন এবং আমার নৈকট্য অর্জন করুন। [এতে ওয়াদা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী ঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত (مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত) সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ সূরা মুদ্দাস্‌সিরকে সর্বপ্রথম সূরা এবং কেউ কেউ সূরা ফাতিহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম বগভী অধিকাংশ আলিমের মতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। সূরা মুদ্দাস্‌সিরকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, সূরা আলাকের পাঁচ আয়াত নাযিল হওয়ার পর দীর্ঘকাল কোরআন অবতরণ বন্ধ থাকে, যাকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে—এই বিরতির কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ মর্মবেদনা ও মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হন। এরপর একদিন হঠাৎ জিবরাঈল (আ) সামনে আসেন

এবং সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও ওহী অবতরণ এবং জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাতের দরুন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে সে পূর্বের মতই ভাবান্তর দেখা দেয়, যা সূরা আলাক অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল। এভাবে বিরতিকালের পর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্‌সি-রের প্রাথমিক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা আখ্যা দেওয়া যায়। সূরা ফাতিহাকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসাবে একত্রে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার অংশবিশেষই অবতীর্ণ হয়েছিল।—(মাযহারী) বুখারী ও মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে নবুয়ত ও ওহীর সূচনা সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন: সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহীর সূচনা হয়। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন, বাস্তবে হুবহু তাই সংঘটিত হত এবং তাতে কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকত না। স্বপ্নে দেখা ঘটনা দিবালোকের মত সামনে এসে যেত।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে নির্জনতার ও একান্তে ইবাদত করার প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি হেরা গিরিগুহাকে পছন্দ করে নেন (এ গুহাটি মক্কার কবরস্থান জান্নাতুল মুয়াল্লা থেকে একটু সামনে জাবালুন্নূর নামক পাহাড়ে অবস্থিত। এর শৃঙ্গ দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়)। হযরত আয়েশা (রা) বলেন: তিনি এ গুহায় রাত্রিতে গমন করতেন এবং ইবাদত করতেন। পরিবার -পরিজনের খবরাখবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা না দিলে তিনি সেখানেই অবস্থান করতেন এবং প্রয়োজনীয় পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পাথেয় শেষ হয়ে গেলে তিনি পত্নী খাদীজা (রা)-র কাছে ফিরে আসতেন এবং আরও কিছুদিনের পাথেয় নিয়ে গুহায় গমন করতেন। এমনিভাবে গুহায় অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে ওহী আগমন করে। হেরা গুহায় নির্জনবাসের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি পূর্ণ রমযান মাস এ গুহায় অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাক ও যরকানী (র) বলেন: এর চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করার প্রমাণ কোন রেওয়ায়েতে নেই। ওহী অবতরণের পূর্বে নামায ইত্যাদি ইবাদতের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং হেরা গুহায় রসূলুল্লাহ্ (সা) কিভাবে ইবাদত করতেন সে সম্পর্কে কোন কোন আলিম বলেন: তিনি নূহ্, ইবরাহীম ও ঈসা (আ)-র শরীয়ত অনুসরণ করে ইবাদত করতেন। কিন্তু কোন রেওয়ায়েতে এর প্রমাণ নেই এবং তিনি নিরক্ষর ছিলেন বিধায় একে বিশুদ্ধও মেনে নেওয়া যায় না। বরং বাহ্যত বোঝা যায় যে, তখন জনকোলাহল থেকে একান্তে গমন এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ ধ্যানে মগ্ন হওয়াই ছিল তাঁর ইবাদত।—(মাযহারী)

ওহীর আগমন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বলেন: হযরত জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আগমন করে বললেন: اِقْرَأْ (পাঠ করুন)। তিনি বলেন: ما انا بقارئ আমি পড়া জানি না। [কারণ, তিনি উম্মী ছিলেন। জিবরাঈল (আ)-এর উদ্দেশ্য কি, কিভাবে পড়াতে চান এবং কোন লিখিত বিষয় পড়তে হবে কিনা ইত্যাদি বিষয় তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হন নি। তাই ওযর পেশ করেছেন।] রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার এ জওয়াব শুনে জিবরাঈল (আ) আমাকে বুকে জড়িয়ে

ধরলেন এবং সজোরে চাপ দিলেন। ফলে আমি চাপের কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : اِقْرَأْ (পাঠ করুন)। আমি আবার পূর্ববৎ জওয়াব দিলাম। এতে তিনি পুনরায় আমাকে চেপে ধরলেন। চাপের কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বারের মত পাঠ করতে বললেন। আমি এবারও পূর্ববৎ জওয়াব দিলে তিনি তৃতীয়বারের মত আমাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ০

কোরআনের এই সর্বপ্রথম পাঁচখানি আয়াত নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে ফিরলেন। তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। খাদীজা (রা)-র কাছে পৌঁছে বললেন : زملونى زملونى আমাকে আবৃত কর, আমাকে আবৃত কর। খাদীজা (রা) তাঁকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করলে কিছুক্ষণ পর ভীতি বিদূরিত হল। এ ভাবান্তর ও কম্পন জিবরাঈল (আ)-এর ভয়ে ছিল না। তাঁর শান এর চেয়ে আরও অনেক ঊর্ধ্বে বরং এই ওহীর মাধ্যমে নবুয়তের যে বিরাট দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করা হয়েছিল, তারই গুরুভার তিনি তিলে তিলে অনুভব করছিলেন। এছাড়া একজন ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজা (রা)-কে হেরা গুহার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললেন : এতে আমার মধ্যে এমন ভাবান্তর দেখা দেয় যে, আমি জীবনের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ি। হযরত খাদীজা (রা) বললেন : না, এরূপ কখনও হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কখনও ব্যর্থ হতে দেবেন না। কেননা, আপনি আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, বোঝাক্লিষ্ট লোকদের বোঝা বহন করেন, বেকারকে কাজে নিয়োজিত করেন, অতিথি সেবা করেন এবং বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন বিদুষী মহিলা। তিনি সম্ভবত তওরাত ও ইঞ্জিল থেকে অথবা এসব আসমানী কিতাবের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, উপরোক্ত চরিত্র-গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি কখনও বঞ্চিত ও ব্যর্থ হন না। তাই এভাবে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

এরপর খাদীজা (রা) তাঁকে আপন পিতৃব্যপুত্র ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন। ইনি জাহিলিয়াত যুগে প্রতিমাপূজা বর্জন করে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যা ছিল তৎকালে একমাত্র সত্য ধর্ম। শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে হিব্রু ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আরবী ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তিনি হিব্রু ভাষায়ও লিখতেন এবং ইঞ্জীল আরবীতে অনুবাদ করতেন। তখন তিনি অত্যধিক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় ছিল। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন : ভাইজান, আপনি

তাঁর কথাবার্তা একটু শুনুন। ওয়ারাকার জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা গুহার সমুদয় বৃত্তান্ত বলে শোনালেন। শোনামাত্রই ওয়ারাকা বলে উঠলেন : ইনিই সে পবিত্র ফেরেশতা, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-র কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়, আমি যদি আপনার নবুয়তকালে শক্তিশালী হতাম! হায়, আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম, যখন আপনার কওম আপনাকে (দেশ থেকে) বহিষ্কার করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আমার স্বজাতি কি আমাকে বহিষ্কার করবে? ওয়ারাকা বললেন : অবশ্যই বহিষ্কার করবে। কারণ, যখনই কোন ব্যক্তি সত্য পয়গাম ও সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করে, যা আপনি নিয়ে এসেছেন, তখনই তার কওম তার উপর নিপীড়ন চালায়। যদি আমি সে সময়কাল পাই, তবে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। ওয়ারাকা এর কয়েকদিন পরই ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়।—(বুখারী, মুসলিম) সোহায়লী বর্ণনা করেন, ওহীর বিরতিকাল ছিল আড়াই বছর। কোন কোন রেওয়ায়েতে তিন বছরও আছে।—(মাযহারী)

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ—এখানে اسم-শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখনই কোরআন পড়বেন, আল্লাহ্র নাম অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পেশকৃত ওযরের জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উম্মী; লেখাপড়া জানেন না কিন্তু আপনার পালনকর্তা উম্মী ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বক্তৃতা নৈপুণ্য, বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছিল।—(মাযহারী) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্র 'রব' নামটি উল্লেখ করায় এ বিষয়বস্তু আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার পালনকর্তা। তিনি সর্বতোভাবে আপনাকে পালন করেন। তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে পাঠ করাতে সক্ষম। আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্য থেকে এ স্থলে বিশেষভাবে সৃষ্টিগুণ উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত রহস্য এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম অনুগ্রহ। এ স্থলে ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য خَلَقَ-ক্রিয়াপদের কর্ম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতই এই সৃষ্টি কর্মের ফল।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ—পূর্বের আয়াতে সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সেরা সৃষ্টি মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় সমগ্র বিশ্বজগতের সার-নির্যাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে, তার প্রত্যেকটির নযীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, নবুয়ত, রিসালত ও কোরআন নাযিল করার লক্ষ্য আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালন করানো। এটা বিশেষভাবে মানুষেরই কাজ; عَلَق-শব্দের অর্থ জমাট রক্ত, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত হয়। মৃত্তিকা ও উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা এর সূচনা

হয়, এরপর বীর্য ও এরপর জমাট রক্তের পালা আসে। অতঃপর মাংসপিণ্ড ও অস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এসবের মধ্যে জমাট রক্ত হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উল্লেখ করায় এর পূর্বাপর অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ—এখানে اقْرَأْ-আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পাঠ করার জন্য প্রথম اقرأ বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় اقرأ তবলীগ, দাওয়াত ও অপরকে পাঠ করানোর জন্য বলা হয়েছে। اكرم বিশেষণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিজের কোন স্বার্থ ও লাভ নেই বরং এগুলো সব দানশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। ফলে তিনি অযাচিতভাবে সৃষ্ট-জগৎকে অস্তিত্বের মহান নিয়ামত দান করেছেন।

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ—মানব সৃষ্টির পর মানব-শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণত দ্বিবিধ। এক. মৌখিক শিক্ষা এবং দুই. কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার শুরুতে اقرأ—শব্দের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্ণনায় কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষার সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র এক রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتى غلبت غضبى—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ

اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما يكون الى يوم القيامة فهو عنده فى الذكر فوق عرشه -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহ্র কাছে আরশে রক্ষিত আছে।—(কুরতুবী)

কলম তিন প্রকার ঃ আলিমগণ বলেন ঃ জগতে তিনটি কলম আছে ঃ এক. আল্লাহ্ তা'আলার স্বহস্তে সৃজিত সর্বপ্রথম কলম, যাকে তিনি তকদীর লেখার আদেশ করেছিলেন। দুই. ফেরেশতাগণের কলম, যদ্দ্বারা তারা ভবিতব্য ঘটনা, তার পরিমাণ এবং মানুষের

আমলনামা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি সাধারণ মানুষের কলম, যদ্দ্বারা তারা তাদের কথা-বার্তা লিখে এবং নিজেদের অভীষ্ট কাজে ব্যবহার করে। লিখন প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার বর্ণনা এবং বর্ণনা মানুষের বিশেষ গুণ।---(কুরতুবী) তফসীরবিদ মুজাহিদ আবু আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্ট জগতে চারটি বস্তু স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। এগুলো ব্যতীত সব বস্তু 'কুন' তথা 'হয়ে যাও' আদেশের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সেই বস্তু চতুষ্টয় এই ঃ কলম, আরশ, জান্নাতে আদন ও আদম (আ)।

লিখন জ্ঞান সর্বপ্রথম দুনিয়াতে কাকে দান করা হয় ঃ কেউ কেউ বলেন—সর্ব-প্রথম এই জ্ঞান মানবপিতা আদমকে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম লেখা শুরু করেন।--- (কা'বে আহবার) কেউ কেউ বলেন, হযরত ইদরীস (আ)-ই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম লেখক।---(যাহ্হাক) কারও কারও মতে প্রত্যেক লেখকের শিক্ষাই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

অংকন ও লিখন আল্লাহর বড় নিয়ামত ঃ হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন, কলম আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। কলম না থাকলে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকত না এবং দুনিয়ার কাজকারবারও সঠিকভাবে পরিচালিত হত না। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটা বড় কৃপা যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে অজ্ঞাত বিষয়-সমূহের জ্ঞান দান করেছেন এবং তাদেরকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে বের করে এনেছেন। তিনি মানুষকে লিখন বিদ্যায় উৎসাহিত করেছেন। কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তা গণনা করে শেষ করতে পারে না। যাব-তীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইতিহাস, জীবনালেখ্য ও উক্তি আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সমস্তই কলমের সাহায্যে লিখিত হয়েছে এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে। কলম না থাকলে ইহকাল ও পরকালের সব কাজকর্মই বিঘ্নিত হবে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ সর্বদা লিখন কর্মের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের অগণিত রচনাশৈলীই এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগে আলিম ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি চরম উদাসীনতা বিরাজমান রয়েছে। ফলে শত শত লোকের মধ্যে দু'চারজনই এ ব্যাপারে পণ্ডিত দৃষ্টিগোচর হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লিখন শিক্ষা না দেওয়ার রহস্য ঃ আল্লাহ্ তা'আলা শেষ নবী (সা)-র মর্যাদাকে মানুষের চিন্তা ও অনুমানের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য তাঁর জন্মস্থান থেকে ব্যক্তিগত অবস্থা পর্যন্ত সবকিছুকে এমন করেছিলেন যে, কোন মানুষ এসব ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও শ্রম দ্বারা কোন উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে না। তাঁর জন্মস্থানের জন্য আরবের মরুভূমি মনোনীত হয়েছে, যা সভ্য জগৎ ও জ্ঞান-গরিমার পীঠভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং পথ ও যোগাযোগের দিক দিয়ে অত্যধিক দুর্গম ছিল। ফলে শাম, ইরাক, মিসর ইত্যাদি উন্নত নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেখানকার লোকদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এ

কারণেই আরবের সবাই উম্মী বলে কথিত হয়। এমন দেশ ও গোত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণের পর আল্লাহ্ তা'আলা আরও কিছু ব্যবস্থা করলেন। তা এই যে, আরবদের মধ্যে যদিও বা খুব নগণ্য সংখ্যক লোক জ্ঞান-বিজ্ঞান, অঙ্কন ও লিখন বিদ্যা শিক্ষা করত, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তা শিক্ষা করারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির কাছ থেকে কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত চরিত্র আশা করতে পারত? হঠাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের অলংকারে ভূষিত করলেন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অশেষ ফল্গুধারা তাঁর মুখ দিয়ে প্রবাহিত করে দিলেন। বিশুদ্ধতায় ও প্রাঞ্জলতায় আরবের বড় বড় কবি ও অলংকারবিদও তাঁর কাছে হার মেনে যায়। এই প্রোজ্জ্বল মো'জেযাটি স্বচক্ষে দেখে এ প্রত্যয় না করে উপায় নেই যে, তাঁর এসব গুণ-গরিমা মানবীয় প্রচেষ্টা ও কর্মের ফলশ্রুতি নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য দান। অংকন ও লিখন শিক্ষা না দেওয়ার মধ্যে এ রহস্যই নিহিত ছিল।——(কুরতুবী)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ——পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শিক্ষার মাধ্যম অসংখ্য, অগণিত——শুধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়েছে——আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে পূর্বে জানত না। এতে কলম অথবা অন্য কোন উপায় উল্লেখ না করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ শিক্ষা মানুষের জন্মলগ্ন থেকে অব্যাহত রয়েছে। তিনি মানুষকে প্রথমে বুদ্ধি দান করেন, যা জ্ঞান লাভের সর্ববৃহৎ উপায়। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে কোন শিক্ষা ব্যতিরেকে অনেক কিছু শিখে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সামনে ও পেছনে স্বীয় অসীম কুদরতের বহু নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। যাতে সে সেগুলো প্রত্যক্ষ করে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে। এরপর ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে অনেক বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন। এছাড়া আরও বহু বিষয়ে জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্ক আপনা-আপনি জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। এতে কোন ভাষা অথবা কলমের সাহায্যে শিক্ষার দখল নেই। একটি চেতনাহীন শিশু জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার খাদ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ জননীর স্তনযুগলকে চিনে নেয়। স্তন থেকে দুগ্ধ বের করার জন্য মুখ চেপে ধরার কৌশল তাকে কে শিক্ষা দেয় এবং দিতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা শিশুকে ক্রন্দন করার কৌশল জন্মলগ্ন থেকেই শিখিয়ে দেন। তার এই ক্রন্দন তার অনেক প্রয়োজন মেটানোর উপায় হয়ে থাকে। তাকে ক্রন্দনরত দেখলে পিতামাতা তার কষ্টের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উত্তাপ, শৈত্য ইত্যাদি অভাব ক্রন্দনের দ্বারাই বিদূরিত হয়। সদ্যপ্রসূত শিশুকে এই ক্রন্দন কে শেখাতে পারত এবং কিভাবে শেখাত? এগুলো সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান, যা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণী বিশেষত মানুষের মস্তিষ্কে সৃষ্টি করে দেন। এই জরুরী শিক্ষার পর মৌখিক শিক্ষা ও অন্তরগত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। مَا لَمْ يَعْلَمْ (যা সে জানত না) বলার বাহ্যত কোন প্রয়োজন ছিল না! কারণ, শিক্ষা স্বভাবত অজানা

বিষয়েরই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এজন্য বলা হয়েছে, যাতে মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও কৌশলকে তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে না বসে। এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উপর এমনও এক সময় আসে, যখন সে কিছুই জানে না, যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে: اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জননীর গর্ভ থেকে এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জান না। অতএব বোঝা গেল যে, মানুষের জ্ঞান-গরিমা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয় বরং স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ্ তা'আলারই দান।—(মাযহারী) কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতে ইনসানের অর্থ নিয়েছেন হযরত আদম (আ) অথবা রসূলে করীম (সা)। হযরত আদমকেই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম শিক্ষা দান করেছেন। বলা হয়েছে:

وعلم آدم الاسماء كلها —এবং নবী করীম (সা)-ই সর্বশেষ পয়গম্বর, যার শিক্ষায় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের এবং লওহ ও কলমের শিক্ষা শামিল রয়েছে। বলা হয়েছে:

ومن علومك علم اللوح و القلم ।

সূরা ইকরার উপরোক্ত পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত। এর পরবর্তী আয়াতসমূহ অনেক দিন পরে অবতীর্ণ হয়। কেননা, সূরার শেষ অবধি অবশিষ্ট আয়াত-সমূহ আবূ জাহ্লের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কোন বিরুদ্ধবাদী ছিল না বরং সবাই তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করত, মনেপ্রাণে ভালবাসত ও সম্মান করত। আবূ জাহ্লের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা বিশেষত নামাযে নিষেধ করার ঘটনা বলা বাহুল্য তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) নবুয়ত ও দাওয়াত ঘোষণা করেন এবং রজনীতে নামাযের হুকুম অবতীর্ণ হয়।

كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى —আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবূ জাহ্লকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণত বিত্তশালী, শাসনক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমত্ত হয়ে অপরকে পরোয়াই করে না। আবূ জাহ্লের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সে ছিল মক্কার বিত্তশালীদের অন্যতম। তার গোত্র এমনকি সমগ্র শহরের লোক তাকে সমীহ করত। সে এমনি অহংকারে মত্ত হয়ে পয়গম্বরকুল শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রসূলে করীম (সা)-এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল।

পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে।

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ —অর্থাৎ সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাবে এবং ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব নেবে। অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে। এটাও অসম্ভব নয় যে, এ আয়াতে গর্বিত মানুষের গর্বের প্রতিকার বর্ণনা করার জন্য বলা হয়েছে : হে নির্বোধ, তুমি নিজেকে সবকিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী ও স্বেচ্ছাধীন মনে কর কিন্তু চিন্তা করলে তুমি নিজেকে প্রতিটি উঠাবসায় ও চলাফেরায় আল্লাহ্র প্রতি মুখাপেক্ষী পাবে। তিনি যদি বাহ্যত তোমাকে কোন মানুষের মুখাপেক্ষী না করে থাকেন, তবে কমপক্ষে এটা তো দেখ যে, তোমাকে প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী করেছেন। মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত মনে করার বিষয়টিও বাহ্যিক বিভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবরূপে সৃষ্টি করেছেন। সে একা তার কোন প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। সে তার মুখের একটি গ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখতে পাবে যে, সেটা হাজারো মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘদিনের সাধনার ফলশ্রুতি, যা সে অনায়াসে গিলে যাচ্ছে। এত হাজার হাজার মানুষকে নিজের কাজে নিয়োজিত করার সাধ্য কার আছে? মানুষের পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অবস্থাও তদ্রূপ। সেগুলো সরবরাহের পেছনে হাজারো, লাখো মানুষের শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে, যারা কোন ব্যক্তি বিশেষের গোলাম নয়। কেউ তাদের সবাইকে বেতন দিয়ে কাজ করাতে চাইলেও তা সাধ্যাতীত ব্যাপার। এসব বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ এ রহস্য জানতে পারে যে, মানুষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা তার নিজের তৈরী নয় বরং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অচিন্তনীয় প্রভাবে এই পরিকল্পনা তৈরী করেছেন ও চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কারও অন্তরে কৃষিকাজের ইচ্ছা জাগ্রত করেছেন, কারও মনে কাঠ কাটা ও মিস্ত্রীগিরির প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, কাউকে কর্মকারের কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, কাউকে শ্রম ও মজুরি করার মধ্যেই সন্তুষ্টি দান করেছেন এবং কাউকে বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতি উৎসাহিত করে মানুষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের বাজার বসিয়ে দিয়েছেন। কোন রাষ্ট্র আইন করে এসব ব্যবস্থাপনা করতে পারে না এবং একা কোন ব্যক্তির পক্ষেও এটা সম্ভব নয়। তাই এই চিন্তা-ভাবনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ অর্থাৎ পরিশেষে সব মানুষই যে আল্লাহ্র কুদরত ও প্রভাব অধীন, একথা জীবন্ত হয়ে দৃষ্টির সামনে এসে যায়।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ —এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাযের আদেশ নাযিল করার পর যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) নামায পড়া শুরু করেন, তখন আবূ জাহল তাঁকে নামায পড়তে বারণ করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামায পড়লে ও সিজদা করলে সে তাঁর ঘাড়

পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে : اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى—অর্থাৎ সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখছেন? কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামায প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতির কল্পনাও করা যায় না।

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ—سفع-এর অর্থ কঠোরভাবে হেঁচড়ানো। نَاصِيَة শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ। বাগ্ন এই কেশগুচ্ছ অন্যের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে পড়ে।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ—এতে নবী করীম (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবূ জাহ্লের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সিজদা ও নামাযে মশগুল থাকুন। কারণ, এটাই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উপায়।

সিজদায় দোয়া কবূল হয় : আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء অর্থাৎ বান্দা যখন সিজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সিজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে :

فانه قمن ان يستجاب لكم—অর্থাৎ সিজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবূল হওয়ার যোগ্য।

নফল নামাযের সিজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বর্ণিত সে দোয়া পাঠ করাই উত্তম। ফরয নামায-সমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ, ফরয নামায সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সিজদা করা ওয়াজিব। সহীহ্ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করেছেন।

سورة القدر

সূরা কদর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝١ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝٢ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝٤ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। (২) শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? (৩) শবে-কদর হল এক হাজার রাত্রি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৪) এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৫) এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি একে (কোরআনকে) নাযিল করেছি শবে-কদরে। (সূরা দোখানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলা হয়েছে ঃ) আপনি কি জানেন শবে-কদর কি? (অতঃপর জওয়াব দেওয়া হয়েছে ঃ) শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ এক হাজার মাস পর্যন্ত ইবাদত করার যে পরিমাণ সওয়াব, তার চেয়ে বেশী শবে-কদরে ইবাদত করার সওয়াব)।—(খাযেন) এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ্ (অর্থাৎ জিবরাঈল) তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে প্রত্যেক মঙ্গলজনক কাজ নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতরণ করে (এবং এ রাত) আদ্যোপান্ত শান্তিময়। [হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে, শবে-কদরে হযরত জিবরাঈল একদল ফেরেশতাসহ আগমন করেন এবং যে ব্যক্তিকে নামায ও যিকিরে মশগুল দেখেন, তার জন্য রহমতের দোয়া করেন। কোর-আনে একেই سلام বলা হয়েছে এবং মঙ্গলজনক কাজের অর্থও তাই। এছাড়া রেওয়ায়েত-সমূহে এ রাত্রিতে তওবা কবুল হওয়া, আকাশের দরজা উন্মুক্ত হওয়া এবং প্রত্যেক মু'মিনকে

ফেরেশতাগণের সালাম করার কথাও বর্ণিত আছে। এসব বিষয় যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে হয় এবং শান্তির কারণ হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। অথবা امر-এর অর্থ এখানে সেসব বিষয়, যা সূরা দোখানে امر حكيم বলে বোঝানো হয়েছে। এ রাত্রিতে সেসব বিষয় সম্পন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে]। সে শবে-কদর (এ সওয়াব ও বরকতসহ) ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (অর্থাৎ কোন এক অংশে বরকত থাকবে, অন্য অংশে থাকবে না—এমন নয়)।

অনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ ইবনে আবী হাতেম (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার বনী ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ এ কথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্য শুধু এক রাত্রির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (র) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী ইসরাঈলের জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জিহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা সূরা-কদর নাযিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, শবে-কদর উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য।—(মাযহারী)

ইবনে কাসীর ইমাম মালিকের এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী মযহাবের কেউ কেউ একে অধিকাংশের মযহাব বলেছেন। খাত্তাবী এর উপর ইজমা দাবী করেছেন। কিন্তু কোন কোন হাদীসবিদ এ ব্যাপারে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন।

লায়লাতুল কদরের অর্থ ঃ কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এ স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লায়লাতুল কদর' তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। আবূ বকর ওয়াররাক বলেন ঃ এ রাত্রিকে লায়লাতুল কদর বলার কারণ এই যে, কর্মহীনতার কারণে এর পূর্বে যার কোন সম্মান ও মূল্য থাকে না, সে এ রাত্রিতে তওবা-ইস্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিত ও মহিমান্বিত হয়ে যায়।

কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতা-গণকে লিখে দেওয়া হয়, এমনকি, এ বছর কে হজ্জ করবে, তাও লিখে দেওয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি অনুযায়ী চারজন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন—ইসরাফীল, মীকাঈল, আযরাঈল ও জিবরাঈল (আ)।—(কুরতুবী)

সূরা দোখানে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ○ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا -

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এ পবিত্র রাতে তকদীর সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ -এর অর্থ শবে-কদরই। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্য শাবানের রাত্রি অর্থাৎ শবে-বরাত। তাঁরা বলেন যে, তকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রাথমিক ও সংরক্ষিত ফয়সালা শবে বরাতেই হয়ে যায়। অতঃপর তার বিশদ বিবরণ শবে-কদরে লিপিবদ্ধ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বগভীর রেওয়ায়েতে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সারা বছরের তকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদির ফয়সালা শবে-বরাতে সম্পন্ন করেন; অতঃপর শবে-কদরে এসব ফয়সালা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়।—(মাযহারী) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই রাত্রিতে তকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো লওহে মাহফূয থেকে নকল করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুবা আসল বিধিলিপি আদিকালেই লিখিত হয়ে গেছে।

শবে-কদর কোন্ রাত্রি ঃ কোরআন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে-কদর রমযান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে এসব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, শবে-কদর রমযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে কিন্তু এরও কোন তারিখ নির্দিষ্ট নেই বরং যে কোন রাত্রিতে হতে পারে। প্রত্যেক রমযানে তা পরিবর্তিতও হয়। সহীহ্ হাদীসদৃষ্টে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে শবে-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি শবে-কদরকে রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি রমযানে পরিবর্তনশীল মেনে নেওয়া যায়, তবে শবে-কদরের দিন তারিখ সম্পর্কিত হাদীস-সমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাই অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র)-র এক উক্তি এই যে, শবে-কদর নির্দিষ্ট দিনেই হয়ে থাকে।—(ইবনে কাসীর)

সহীহ্ বুখারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ—অর্থাৎ রমযানের শেষ দশকে শবে-কদর অন্বেষণ কর। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে ঃ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا—অর্থাৎ শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে তালাশ কর।—(মাযহারী)

শবে-কদরের কতক ফযীলত ও তাঁর বিশেষ দোয়া ঃ এ রাত্রির সর্ববৃহৎ ফযীলত তো আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাত্রির ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এক হাজার মাসে তিরাশি বছরের কিছু বেশী হয়। এই শ্রেষ্ঠত্ব কতগুণ, তার কোন সীমা নেই। অতএব দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, দশ গুণ, শতগুণ সবই হতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকে, তার অতীত সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ শবে-ক্বদরে সিদরাতুল-মুন্তাহায় অবস্থানকারী সব ফেরেশতা জিবরাঈলের সাথে দুনিয়াতে অবতরণ করে এবং মদ্যপায়ী ও শূকরের মাংস ভক্ষণকারী ব্যতীত প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও নারীকে সালাম করে।

অন্য এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সম্পূর্ণই বঞ্চিত ও হতভাগ্য। শবে-কদরে কেউ কেউ বিশেষ নূরও প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু এটা সবাই লাভ করতে পারে না এবং শবে-কদরের বরকত ও সওয়াব হাসিল হওয়ার ব্যাপারে এরূপ দেখার কোন দখলও নেই। কাজেই এর পেছনে পড়া উচিত নয়।

হযরত আয়েশা (রা) একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ যদি আমি শবে-কদর পাই, কি দোয়া করব? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এই দোয়া করো ঃ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ হে আল্লাহ্, আপনি অত্যন্ত ক্ষমতাশীল। ক্ষমা আপনার পছন্দনীয়। অতএব আমার গোনাহ্সমূহ মার্জনা করুন।—(কুরতুবী)

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ—এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কোরআন পাক শবে-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, সমগ্র কোরআন লওহে-মাহফূয থেকে শবে-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর জিবরাঈল একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছাতে থাকেন। দ্বিতীয় এই হতে পারে যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কোরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত ঐশী কিতাব রমযানেই অবতীর্ণ হয়েছে ঃ হযরত আবূ যর গিফারী (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ ৩রা রমযানে, তওরাত ৬ই রমযানে, ইনজীল ১৩ই রমযানে এবং যবূর ১৮ই রমযানে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন পাক ২০শে রমযানুল-মুবারকে নাযিল হয়েছে।—(মাযহারী)

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ—روح বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। হাদীসে আছে, শবে-কদরে জিবরাঈল ফেরেশতাদের বিরাট একদল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ

করেন এবং যত নারী-পুরুষ নামায অথবা যিকিরে মশগুল থাকে, তাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন।— (মাযহারী)

مِنْ كُلِّ اَمْرٍ —অর্থাৎ ফেরেশতাগণ শবে-কদরে সারা বছরের অবধারিত ঘটনাবলী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোন কোন তফসীরবিদ একে سَلَامٌ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, এ রাত্রিটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে শান্তিস্বরূপ।—(ইবনে কাসীর)

سَلَامٌ —অর্থাৎ এ রাত্রি শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিষ্টের নামও নেই। (কুরতুবী) কেউ কেউ একে مِنْ كُلِّ اَمْرٍ -এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন—ফেরেশতাগণ প্রত্যেক শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করে।—(মাযহারী)

هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ —অর্থাৎ শবে-কদরের এই বরকত রাত্রির কোন বিশেষ অংশে সীমিত নয় বরং ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

জ্ঞাতব্য : এ সূরায় শবে-কদরকে এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই এক হাজার মাসের মধ্যে প্রতি বছর শবে-কদর আসবে। অতএব হিসাব কিরূপে হবে? তফসীরবিদগণ বলেছেন, এখানে এমন এক হাজার মাস বোঝানো হয়েছে, যাতে 'শবে-কদর' নেই। অতএব কোন অসুবিধা নেই।—(ইবনে কাসীর)

উদয়াচলের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে শবে-কদর হতে পারে। প্রত্যেক দেশের দিক দিয়ে যে রাত্রি কদরের রাত্রি হবে, সে রাত্রিতেই শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত হাসিল হবে।

মাস'আলা : যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইশা ও ফজরের নামায জামা'আতের সাথে পড়ে নেয়, সে-ও এ রাত্রির সওয়াব হাসিল করে। যে ব্যক্তি যত বেশী ইবাদত করবে, সে তত বেশী সওয়াব পাবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি ইশার নামায জামা'আতের সাথে পড়ে, সে অর্ধ রাত্রির সওয়াব অর্জন করে। যদি সে ফজরের নামাযও জামা'আতের সাথে পড়ে নেয়, তবে সমস্ত রাত্রি জাগরণের সওয়াব হাসিল করে।

سورة البينة

সূরা বাইয়্যিনাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ﴿١﴾ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ﴿٢﴾ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۗ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ﴿٤﴾ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۗ﴿٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۗ﴿٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ﴿٧﴾ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ﴿٨﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। (২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, (৩) যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু। (৪) অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত হয়েছে তা হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (৫) তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠ-ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (৬) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম। (৭) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম

করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। (৮) তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

তফসীরের সার সংক্ষেপ

কিতাবধারী ও মুশরিকদের মধ্যে যারা (পয়গম্বরের আবির্ভাবের পূর্বে) কাফির ছিল, তারা (তাদের কুফর থেকে কখনও) বিরত হত না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত; (অর্থাৎ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন রসূল, যিনি (তাদেরকে) পবিত্র সহীফা পাঠ করে শোনাতেন, যাতে আছে সঠিক বিষয়বস্তু। (অর্থাৎ কোরআন। উদ্দেশ্য এই যে, এই কাফিরদের কুফর এমন শক্ত ছিল এবং তারা এমন কঠিন মূর্খতায় লিপ্ত ছিল যে, কোন রসূল ব্যতীত তাদের পথে আসা ছিল সুদূরপরাহত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিরুত্তর করার জন্য আপনাকে কোরআন দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাদের উচিত ছিল একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।) আর যারা কিতাব-প্রাপ্ত ছিল, (যারা কিতাবপ্রাপ্ত নয়, তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য) তারা যে বিভ্রান্ত হয়েছে (দীনের ব্যাপারে) তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (অর্থাৎ সত্য ধর্মের সাথেও মতানৈক্য করেছে এবং পূর্ব থেকে যে পারস্পরিক মতানৈক্য ছিল, তাও সত্য ধর্মের অনুসরণের মাধ্যমে দূর করেনি। মুশরিকদের কথা না বলার কারণ এই যে, তাদের কাছে তো পূর্ব থেকেও কোন ঐশী জ্ঞান ছিল না)। অথচ তাদেরকে (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে) এ আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে (মিছামিছি কাউকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করবে না।) নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। [সারকথা, আহ্‌লে কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা কোরআন ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ বলে উপরে কোরআনের শিক্ষাও তাই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং কোরআনকে অমান্য করার কারণে তাদের কিতাবেরও বিরোধিতা হয়ে গেছে। এ হচ্ছে আহ্‌লেকিতাবদের দোষ। মুশরিকরা পূর্ববর্তী কিতাব না মানলেও ইবরাহীম (আ)-এর তরীকা যে সত্য, তা স্বীকার করত। আর এটা সুনিশ্চিত যে, ইবরাহীম (আ) শিরক থেকে মুক্ত ছিলেন। কোরআনও এ তরীকার সাথে একমত। সুতরাং মুশরিকদের জন্যও প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে বিভক্ত ও বিরোধী বলে সেসব কাফিরকে বোঝানো হয়েছে, যারা ঈমান আনেনি। এ থেকে জানা গেল যে, যারা বিভেদ ও বিরোধিতা করেনি, তারা ঈমানদার। অতঃপর আহ্‌লে-কিতাব, মুশরিক ও মু'মিনদের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে—] নিশ্চয় আহ্‌লে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে, আর তারাই হল সৃষ্টির অধম। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান—চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের

প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে (অর্থাৎ তারাও কোন গোনাহ্ করবে না এবং তাদের সাথেও কোন অপ্রিয় ব্যবহার করা হবে না)। এটা (অর্থাৎ জান্নাত ও সন্তুষ্টি) তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। আল্লাহ্‌কে ভয় করলেই ঈমান ও সৎ কর্ম সম্পাদিত হয়, যা জান্নাত ও সন্তুষ্টি লাভের চাবিকাঠি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়াতে কুফর, শিরক ও মূর্খতার ঘোর অন্ধকারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এহেন সর্বগ্রাসী অন্ধকার দূর করার জন্য একজন পারদর্শী সংস্কারক প্রেরণ করা ছিল অপরিহার্য। রোগ যেমন জটিল ও বিশ্বব্যাপী, তার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকও তেমনি সুনিপুণ ও বিচক্ষণ হওয়া দরকার। অন্যথায় রোগ নিরাময়ের আশা সুদূরপরাহত হতে বাধ্য। অতঃপর সেই বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকের গুণাগুণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর অস্তিত্ব একটি 'বাইয়্যিনাহ্' অর্থাৎ কুফর ও শিরককে অসার প্রতিপন্ন করার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর বলা হয়েছে যে, এই চিকিৎসক হলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত একজন রসূল, যিনি কোরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে আগমন করেছেন। এ পর্যন্ত আয়াত থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল—এক. পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে দুনিয়াতে বিরাট অনর্থ এবং মূর্খতার অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং দুই. রসূলুল্লাহ্ (সা) মহান মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর কোরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ—يَتْلُوا শব্দটি تلا و ت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ 'পাঠ করা'। তবে যে কোন পাঠকেই তিলাওয়াত বলা যায় না বরং যে পাঠ পাঠদানকারীর প্রদত্ত অনুশীলনের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে তাকেই 'তিলাওয়াত' বলা হয়। তাই পরিভাষায় সাধারণত কোরআন পাঠ করার ক্ষেত্রে 'তিলাওয়াত' শব্দ ব্যবহৃত হয়। صحف শব্দটি صحيفة-এর বহুবচন। যেসব কাগজে কোন বিষয়বস্তু লিখিত থাকে সেগুলোকেই বলা হয় সহীফা। كتب শব্দটি كتاب-এর বহুবচন। এর অর্থ লিখিত বস্তু। এদিক দিয়ে কিতাব ও সহীফা সমার্থবোধক। কিতাব অর্থ কোন সময় আদেশও হয়ে থাকে। যেমন, এক আয়াতে আছে لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ—এখানেও এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অন্যথায় فيها বলার কোন মানে থাকে না।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুশরিক ও আহলে-কিতাবদের পথভ্রষ্টতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে সরে আসা সম্ভবপর ছিল না, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আল্লাহ্‌র কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে রসূলকে সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর কর্তব্য ছিল তাদেরকে পবিত্র সহীফা তিলাওয়াত করে শুনানো অর্থাৎ তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সংরক্ষিত

করা হয়। কেননা, প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সহীফা থেকে নয়—স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতেন। এসব সহীফায় ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে প্রদত্ত ও চিরন্তন বিধি-বিধান লিখিত ছিল।

تفرق —وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

-এর অর্থ এখানে বিরোধ ও অস্বীকার করা। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্ম ও আবির্ভাবের পূর্বে আহলে-কিতাবরা তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। কেননা, তাদের ঐশী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত, তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণাবলী ও তাঁর প্রতি কোরআন অবতরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল। তাই ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ ছিল না যে, শেষ যমানায় মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) আগমন করবেন, তাঁর প্রতি কোরআন নাযিল হবে এবং তাঁর অনুসরণ সবার জন্য অপরিহার্য হবে।

কোরআন পাকেও তাদের এই ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا —অর্থাৎ আহলে-কিতাবরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং যখনই মুশরিকদের সাথে তাদের মুকাবিলা হত, তখনই তাঁর মধ্যস্থতায় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিজয় কামনা করে দোয়া করত যে, শেষ নবীর বরকতে আমাদেরকে সাফল্য দান করা হোক। অথবা তারা মুশরিকদেরকে বলত ঃ তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করছ বটে, কিন্তু সত্বরই একজন রসূল আসবেন, যিনি তোমাদেরকে পদানত করবেন। আমরা তাঁর সাথে থাকব, ফলে আমাদেরই বিজয় হবে।

সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আগমনের পূর্বে আহলে-কিতাবরা সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করত কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা অস্বীকার করতে লাগল। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ —অর্থাৎ তাদের কাছে যখন পরিচিত রসূল সত্য ধর্ম অথবা কোরআন আগমন করল, তখন তারা কুফর করতে লাগল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আশ্চর্যের বিষয়, রসূলের আগমন ও তাঁকে দেখার পূর্বে তো তাদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোন মতবিরোধ ছিল না, সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে একমত ছিল কিন্তু যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ শেষ নবী আগমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ তো বিশ্বাস স্থাপন করে মু'মিন হল এবং অনেকেই কাফির হয়ে গেল।

এ ব্যাপারটি কেবল আহলে-কিতাবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে—মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরীক ছিল,

তাই প্রথম আয়াতে উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ বলা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপে দ্বিতীয় ব্যাপারেও মুশরিক এবং আহলে-কিতাব—উভয় সম্প্রদায়কে শামিল করে তফসীর করা হয়েছে।

وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ—অর্থাৎ আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এটা কেবল তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরীকাও তাই। বলা বাহুল্য, قَيِّمَةٌ শব্দটি كُتُبٌ -এর বিশেষণ হলে এর উদ্দেশ্য কোরআনী বিধি-বিধান হবে এবং আয়াতের মতলব হবে এই যে, মোহাম্মদী শরীয়ত প্রদত্ত বিধি-বিধানও হুবহু তাই, যা তাদের কিতাব তাদেরকে পূর্বে দিয়েছিল। ভিন্ন বিধি-বিধান হলে অবশ্য তারা বিরোধিতার বাহানা পেত। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ—এ আয়াতে জান্নাতীদের প্রতি সর্ববৃহৎ নিয়ামত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন : يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ (হে জান্নাতীগণ)। তখন তারা জওয়াব দিবে لبيك ربنا وسعديك والخير كل فى يديك হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন : هل رضيتم তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা জওয়াব দেবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! এখনও সন্তুষ্ট না হওয়ার কি সম্ভাবনা ? আপনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নিয়ামত দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি নাযিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।—(বুখারী, মুসলিম)

আলোচ্য আয়াতেও খবর দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতীরাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতেই পারে না। এমতাবস্থায় এখানে জান্নাতীদের সন্তুষ্টি উল্লেখ করার

তাৎপর্য কি? জওয়াব এই যে, সন্তুষ্টির এক স্তর হল প্রত্যেক আশা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া এবং কোন কামনা অপূর্ণ না থাকা। এখানে সন্তুষ্টি বলে এই স্তরই বোঝানো হয়েছে। উদাহরণত সূরা যোহায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ অর্থাৎ সত্বরই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এমন বস্তু দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তা হলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার একটি উম্মতও জাহান্নামে থাকবে।—(মাযহারী)

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ —সূরার উপসংহারে আল্লাহ্র ভয়কে সমস্ত ধর্মীয় উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নিয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোন শত্রু, হিংস্র জন্তু অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাকে خَشْيَةٌ বলা হয় না বরং কারও অসাধারণ মাহাত্ম্য ও প্রতাপ থেকে যে ভয়-ভীতির উৎপত্তি, তাকেই خَشْيَةٌ বলা হয়। এই ভয়ের প্রেক্ষিতে সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয় এবং অসন্তুষ্টির সন্দেহ থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই ভীতিই মানুষকে কামিল ও প্রিয় বান্দায় পরিণত করে।

سورة الزلزال

সূরা যিলযাল

মদীনায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, (২) যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল ? (৪) সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, (৫) কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে ; যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। (৭) অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন পৃথিবী তার কঠিন কম্পনে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী তার বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে, (বোঝা বলে ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডার ও মৃতদেরকে বোঝানো হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, পূর্বেও ভূগর্ভস্থ অনেক কিছু বাইরে চলে আসবে। কিয়ামতের পূর্বে যেসব ভূগর্ভস্থ সম্পদ বাইরে আসবে, সেগুলো সম্ভবত কালপ্রবাহে আবার মাটির নিচে চাপা পড়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন আবার বের হবে। ভূগর্ভস্থ ধনসম্পদ বাইরে চলে আসার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, যারা ধনসম্পদকে অত্যধিক ভালবাসে, তারা যাতে স্বচক্ষে ধনসম্পদের অসারতা প্রত্যক্ষ করে নেয়)। এবং (এই পরিস্থিতি দেখে) মানুষ বলবে, এর কি

হল (যে, এভাবে প্রকম্পিত হচ্ছে এবং সব গুপ্ত ভাণ্ডার বাইরে চলে আসছে)? সেদিন পৃথিবী তার (ভাল-মন্দ) বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (হাদীসে এর তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—পৃথিবীতে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করবে ভাল অথবা মন্দ—পৃথিবী তা বলে দেবে। এটা হবে তার সাক্ষ্য)। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে (হিসাবের ময়দান থেকে) ফিরবে (অর্থাৎ যাদের হিসাব সমাপ্ত হবে, তারা জান্নাতী ও জাহান্নামী দলে বিভক্ত হয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে রওয়ানা হবে) যাতে তারা তাদের কৃতকর্ম (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফলাফল) দেখে নেয়। অতএব যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করবে, সে তা দেখবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে, সেও তা দেখবে (যদি সৎ-অসৎ তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। নতুবা যদি কুফরের কারণে সৎ কর্ম ধ্বংস হয়ে যায় অথবা ঈমান ও তওবার কারণে অসৎ কর্ম মিটে যায়, তবে তা কিয়ামতের দিন দেখা যাবে না। কেননা, তখন সেই সৎ কর্ম সৎ কর্ম নয় এবং অসৎ কর্ম অসৎ কর্ম নয়। তাই সামনে আসবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا—আয়াতে প্রথম শিংগা ফুঁকার পূর্বেকার ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ফুৎকারের পূর্বেকার ভূকম্পন কিয়ামতের আলামত-সমূহের মধ্যে গণ্য হয় এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে কবর থেকে উত্থিত হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও তফসীরবিদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ যে, আলোচ্য আয়াতে কোন্ ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এ স্থলে দ্বিতীয় ভূকম্পন বোঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, এরপর কিয়ামতের অবস্থা তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।—(মাযহারী)

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا—এই ভূকম্পন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালকায় স্বর্ণখণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধনসম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল সে তা দেখে বলবে, এর জন্যই কি আমি এতবড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক-চ্ছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না।—(মুসলিম)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ—আয়াতে خير বলে শরীয়তসম্মত সৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে, যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ঈমান ব্যতীত

কোন সৎ কর্মই আল্লাহ্‌র কাছে সৎ কর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎ কর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেওয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎ কর্মের ফল পরকালে পাওয়া জরুরী। কোন সৎ কর্ম না থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মু'মিন ব্যক্তি যত বড় গোনাহ্‌গারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফির ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানেরও অভাবে তা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই পরকালে তার কোন সৎ কাজই থাকবে না।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ—জীবদ্দশায় তওবা করেনি—এখানে এমন অসৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন ও হাদীসে অকাট্য প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক—পরকালে অবশ্যই সামনে আসবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন, দেখ, এমন গোনাহ থেকেও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও, যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা, এর জন্যও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে।—(নাসায়ী, ইবনে মাযা)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন: কোরআনের এ আয়াতটি সর্বাধিক অটল ও ব্যাপক অর্থবোধক। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াতকে الفاذة الجامعة—অর্থাৎ একক, অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা যিলযালকে কোরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাসকে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূনকে কোরআনের এক-চতুর্থাংশ বলেছেন।—(মাযহারী)

سورة العاديات

সূরা আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۝ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۝ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۝ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের, (২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিনির্গত-কারী অশ্বসমূহের (৩) অতঃপর প্রভাতকালে লুটতরাজকারী অশ্বসমূহের (৪) ও যারা সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে (৫) অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে—(৬) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ (৭) এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত (৮) এবং সে নিশ্চিতই ধনসম্পদের ভালবাসায় মত্ত (৯) সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে (১০) এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে? (১১) সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বসমূহের, অতঃপর যারা (প্রস্তরে) ক্ষুরাঘাতে অগ্নি নির্গত করে, অতঃপর প্রভাতকালে লুটতরাজ করে, অতঃপর সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে ও শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, (এখানে যুদ্ধের অশ্বসমূহ বোঝানো হয়েছে। আরব দুর্ধর্ষ জাতি বিধায় যুদ্ধের জন্য অশ্ব পালন করত। অশ্বের সাথে তাদের এ সংযোগের প্রেক্ষিতে সামরিক অশ্বের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হচ্ছে :) নিশ্চয়

(যেসব) মানুষ (কাফির) তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। সে নিজেও এ সম্পর্কে অবহিত (কখনও প্রথমেই এবং কখনও চিন্তাভাবনার পর অকৃতজ্ঞতা অনুভব করে।) সে অবশ্যই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত। (এটাই তার অকৃতজ্ঞতার কারণ। অতঃপর এর জন্য শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে ঃ) সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশ করা হবে? সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ অবহিত। (ফলে তিনি তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। মোট কথা, মানুষ যদি সেই সংকটময় মুহূর্ত সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত হত, তবে অকৃতজ্ঞতা ও ধনসম্পদের লালসা থেকে অবশ্যই বিরত হত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আদিয়াত হযরত ইবনে মসউদ, জাবের হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা (রা) প্রমুখের মতে মক্কায় অবতীর্ণ এবং ইবনে আব্বাস, আনাস (রা), ইমাম মালিক ও কাতাদাহ্ (র) প্রমুখের মতে মদীনায় অবতীর্ণ।—(কুরতুবী)

এ সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা সামরিক অশ্বের কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। একথা বার বার বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাবলী ও বিধানাবলী বর্ণনা করেন। এটা আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করার লক্ষ্য নিজের বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। কোরআন পাক যে বস্তুর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় সপ্রমাণে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এখানে সামরিক অশ্বের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশ্ব বিশেষত সামরিক অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কত কঠোর খেদমতই না আনজাম দিয়ে থাকে। অথচ এসব অশ্ব মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার সৃজিত নয়। আল্লাহ্র সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় মাত্র। এখন অশ্বকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে। তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, কঠোরতর কষ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এক ফোঁটা তুচ্ছ বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উচ্চস্তরের অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। এবার শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করুন—عاديات শব্দটি عدو থেকে উদ্ভূত। অর্থ দৌড়ানো। ضبحا—ঘোড়ার দৌড় দেওয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজকে বলা হয়। موريات শব্দটি ايراء থেকে উদ্ভূত।

অর্থ অগ্নি নির্গত করা, যেমন চকমকি পাথর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘষা দিয়ে অগ্নি নির্গত করা হয়। قدح -এর অর্থ ক্ষুরাঘাত করা। লৌহজুতা পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। مغيرات শব্দটি اغارة থেকে উদ্ভূত। অর্থ হামলা করা, হানা দেওয়া। صبحا আরবদের অভ্যাস হিসাবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বীরত্ববশত রাত্রির অন্ধকারে হানা দেওয়া দূষণীয় মনে করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর এ কাজ করত। اثرن শব্দটি اثارة থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। نقع ধূলিকে বলা হয়। অর্থাৎ অশ্বসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এত দ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশেষত প্রভাতকালে ধূলি উড়া অধিক দ্রুতগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, স্বভাবত এটা ধূলি উত্থিত হওয়ার সময় নয়। ভীষণ দৌড় দ্বারাই ধূলি উড়তে পারে।

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا —অর্থাৎ এসব অশ্ব শত্রুদলের অভ্যন্তরে নির্ভয়ে ঢুকে পড়ে।

كنود হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ভুলে যায়।

আবু বকর ওয়াসেতী (র) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহকে গোনাহের কাজে ব্যয় করে, তাকে كنود বলা হয়। তিরমিযীর মতে এর অর্থ যে নিয়ামত দেখে কিন্তু নিয়ামতদাতাকে দেখে না। এসব উক্তির সারমর্ম নিয়ামতের নাশোকরী করা।

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ — خير -এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। আরবে ধন-সম্পদকেও خير বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন ধনসম্পদ মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ধনসম্পদ মানুষকে হাজারো বিপদে জড়িত করে দেয়। পরকালে তো হারাম ধনসম্পদের পরিণতি তাই হবে; দুনিয়াতেও তা মানুষের জন্য বিপদ হয়ে যায়। কিন্তু আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াতে ধনসম্পদকে خير বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে اِنْ تَرَكَ خَيْرًا —

উপরোক্ত আয়াতে অশ্বের শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দু'টি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে—এক. মানুষ অকৃতজ্ঞ, সে বিপদাপদ ও কষ্ট স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ও অনুগ্রহ ভুলে যায়। দুই. সে ধনসম্পদের লালসায় মত্ত। উভয় বিষয় শরীয়ত ও যুক্তির নিরিখে নিন্দনীয়। অকৃতজ্ঞতা যে নিন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তবে ধনসম্পদ মানুষের প্রয়োজনাদির ভিত্তি। এর উপার্জন শরীয়তে কেবল হালালই নয় বরং প্রয়োজনমাফিক ফরযও বটে। সুতরাং ধনসম্পদের ভালবাসা নিন্দনীয় হওয়ার এক কারণ তাতে এমন

ভাবে মত্ত হওয়া যে, আল্লাহ্র বিধি-বিধান থেকেও গাফিল হয়ে পড়া এবং হালাল ও হারামের পরওয়া না করা। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ধনসম্পদ উপার্জন করা এবং প্রয়োজনমাফিক সঞ্চয় করা তো নিন্দনীয় নয়, বরং ফরয। কিন্তু একে ভালবাসা নিন্দনীয়। কেননা, ভালবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। সারকথা এই যে, ধনসম্পদ প্রয়োজনমাফিক অর্জন করা এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হওয়া তো ফরয ও প্রশংসনীয় কিন্তু অন্তরে তৎপ্রতি মহব্বত হওয়া নিন্দনীয়। উদাহরণত মানুষ প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন মিটায়, এজন্য যত্নবান হয় কিন্তু অন্তরে এর প্রতি মহব্বত থাকে না। অসুস্থ অবস্থায় মানুষ ঔষধ সেবন করে, অপারেশন করায়, কিন্তু অন্তরে ঔষধ ও অপারেশনের প্রতি মহব্বত থাকে না বরং অপারক অবস্থায় এগুলো অবলম্বন করে। এমনিভাবে মু'মিনের এরূপ হওয়া দরকার যে, সে প্রয়োজনমাফিক অর্থোপার্জন করবে, তার হিফাযত করবে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাকে কাজেও লাগাবে কিন্তু অন্তরকে তার মহব্বতে মশগুল করবে না। মওলানা রূমী অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন ঃ

آب اندر زیر کشتی پشتی است   آب در کشتی هلاک کشتی است

অর্থাৎ পানি যতক্ষণ নৌকার নীচে থাকে, ততক্ষণ নৌকার পক্ষে সহায়ক হয় কিন্তু এই পানিই যখন নৌকার অভ্যন্তরে চলে যায়, তখন নৌকাকে নিমজ্জিত করে দেয়। এমনি-ভাবে ধনসম্পদ যতক্ষণ নৌকারূপী অন্তরের আশেপাশে থাকে, ততক্ষণই তা উপকারী থাকে। কিন্তু যখন তা অন্তরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে, তখন অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। সূরার উপসংহারে মানুষের এ দু'টি ঘৃণ্য স্বভাবের কারণে পরকালীন শাস্তিবাণী শুনানো হয়েছে।

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ —অর্থাৎ মানুষ কি জানে না যে, কিয়ামতের দিন সব মৃতকে কবর থেকে জীবিত উত্থিত করা হবে এবং অন্তরের সকল ভেদ ফাঁস হয়ে যাবে? এটাও সবার জানা যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত। অতএব তদনুযায়ী শাস্তি ও প্রতিদান দেবেন। কাজেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হল অকৃতজ্ঞতা না করা এবং ধনসম্পদের লালসায় মত্ত না হওয়া।

জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য সূরায় মানুষ মাত্রেরই দু'টি ঘৃণ্য স্বভাব বর্ণিত হয়েছে। অথচ মানুষের মধ্যে এমন অনেক নবী, ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা এ ঘৃণ্য স্বভাবদ্বয় থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা। তারা আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং হারাম ধনসম্পদ থেকে বেঁচে থাকেন। তবে অধিকাংশ মানুষ যেহেতু এসব দোষে পতিত, তাই মানুষ মাত্রেরই এই বদ-অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সবারই এরূপ হওয়া জরুরী হয় না। এ কারণেই কেউ কেউ আয়াতে মানুষ বলে কাফির মানুষ বুঝিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপেও তাই করা হয়েছে। এর সার অর্থ হবে এই যে, এ ঘৃণ্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের স্বভাব। আল্লাহ্ না করুন, যদি কোন মুসলমানের মধ্যেও এগুলো পাওয়া যায়, তবে অবিলম্বে তা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

سورة القارعة

সূরা কারেয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) করাঘাতকারী, (২) করাঘাতকারী কি? (৩) করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? (৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (৫) এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত। (৬) অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, (৭) সে সুখী জীবন যাপন করবে (৮) আর যার পাল্লা হালকা হবে, (৯) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (১০) আপনি জানেন তা কি? (১১) প্রজ্বলিত অগ্নি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কি? করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? (অর্থাৎ কিয়ামত, যে অন্তরকে ভীতি এবং কানকে ভীষণ শব্দে আঘাত করবে, আর এ অবস্থা সেদিন হবে,) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (কয়েকটি বিষয়ের কারণে মানুষকে পতংগের সাথে তুলনা করা হয়েছে—এক. সংখ্যাধিক্যের জন্য সেদিন বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষ এক ময়দানে সমবেত হবে। দুই. দুর্বলতা ও শক্তি-হীনতার জন্য। কারণ, সব মানুষ তখন পতংগের মতই শক্তিহীন ও দুর্বল হবে। এ দু'টি কারণ হাশরের সব মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে পাওয়া যাবে। তৃতীয় কারণ এই যে, সব মানুষ অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে, যা পতংগদের বেলায় প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য এ অবস্থা মু'মিনদের বেলায় হবে না। তারা প্রশান্ত মনে কবর থেকে উত্থিত হবে)। এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত। (পর্বতমালার রঙ

বিভিন্ন রূপ। যেহেতু এগুলো সেদিন উড়তে থাকবে, ফলে বিভিন্ন রঙ-এর পশমের মত দেখা যাবে। সেদিন মানুষের কর্ম ওজন করা হবে) অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন যাপন করবে (সে হবে মু'মিন। সে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে) এবং যার (ঈমানের) পাল্লা হালকা হবে (অর্থাৎ কাফির হবে) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন তা (অর্থাৎ হাবিয়া) কি? (সেটা) এক প্রজ্বলিত অগ্নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় আমলের ওজন ও তার হালকা এবং ভারী হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহান্নাম অথবা জান্নাত লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমলের ওজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাফের শুরুতে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। সেখানে একথাও লিখিত হয়েছে যে, বিভিন্ন হাদীস ও আয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জানা যায় আমলের ওজন সম্ভবত দু'বার হবে। একবার ওজন করে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হবে। মু'মিনের পাল্লা ভারী ও কাফিরের পাল্লা হালকা হবে। এরপর মু'মিনদের মধ্যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের পার্থক্য বিধানের জন্য হবে দ্বিতীয় ওজন। এ সূরায় বাহ্যত প্রথম ওজন বোঝানো হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মু'মিনের পাল্লা ঈমানের কারণে ভারী হবে, তার কর্ম যেমনই হোক। আর প্রত্যেক কাফিরের পাল্লা ঈমানের অভাবে হালকা হবে, সে যদিও কিছু সৎ কর্ম করে থাকে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে কাফির ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদের মধ্যে যারা সৎ ও অসৎ মিশ্র কর্ম করে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে দান-প্রদানের কোন উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কিয়ামতে মানুষের আমল ওজন করা হবে—গণনা করা হবে না। আমলের ওজন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। যার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের ওজন বেশী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো নামায, রোযা, সদকা-খয়রাত, হজ্জ-ওমরা অনেক করে কিন্তু আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমলের ওজন কম হবে।

سورة التكاثر

সূরা তাকাসুর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফিল রাখে, (২) এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। (৩) এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে, (৪) অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। (৫) কখনওই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (৭) অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পার্থিব সম্পদের) বড়াই তোমাদেরকে (পরকাল থেকে) গাফিল করে রাখে; এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও [অর্থাৎ মরে যাও—(ইবনে কাসীর)] কখনই নয়, (অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ বড়াই করার যোগ্য নয় এবং পরকাল গাফিল হওয়ার উপযুক্ত নয়)। যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রমাণাদিতে চিন্তা ও মনোনিবেশ করতে এবং এ বিষয়ে প্রত্যয় অর্জন করতে, তবে কখনও বড়াই করতে না এবং পরকাল থেকে উদাসীন হতে না)। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (আবার বলি) তোমরা অবশ্যই তা দেখবে দিব্য প্রত্যয়ে। কেননা, এই দেখা প্রমাণাদির পথে হবে না, যাতে প্রত্যয় অর্জনে সামান্য বিলম্ব হতে পারে বরং এটা দিব্য দৃষ্টিতে দেখা হবে। (চাক্ষুষ দেখাকে এখানে দিব্য প্রত্যয়ে দেখা বলা হয়েছে)। অতঃপর (আবার শুন) তোমরা অবশ্যই সেদিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের হক ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে আদায় করেছ কিনা—এ প্রশ্ন করা হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ — তাকাসুর শব্দটি থেকে কাসরাতুন থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র) এ তফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ্ (র) এ অর্থই করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এর অর্থ অবৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা।—(কুরতুবী)

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ — এখানে কবরস্থান যিয়ারত করার অর্থ মরে কবরে পৌঁছা। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ حتى يأتيكم الموت—(ইবনে কাসীর) অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশ-গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফিল ও উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোন চিন্তা তোমরা কর না এবং এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায়। আর মৃত্যুর পর তোমরা আযাবে গ্রেফতার হও। একথা বাহ্যত সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, যারা ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসায় অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শিখখীর (রা) বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট পৌঁছে দেখলাম, তিনি أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ তিলাওয়াত করে বলছিলেন ঃ

يقول ابن آدم مالي مالي لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت وفي رواية لمسلم وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس -

মানুষ বলে, আমার ধন, আমার ধন অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই, যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে—তুমি অপরের জন্য তা ছেড়ে যাবে।—(ইবনে কাসীর, তিরমিযী, আহমদ)

হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لو كان لابن آدم واد يا من ذهب لاحب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب -

আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে (তাতেই সন্তুষ্ট হবে না, বরং) দু'টি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো (কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করে, আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করেন—(বুখারী)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন: আমরা সূরা তাকাসুর নাযিল হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত হাদীসকে কোরআন মনে করতাম। মনে হয়—রসূলুল্লাহ্ (সা) أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় উপরোক্ত উক্তিটি করেছিলেন। এতে কোন কোন সাহাবী তাঁর উক্তিকেও কোরআনের ভাষা মনে করলেন। পরে যখন সম্পূর্ণ সূরা সামনে আসে, তখন তাতে এসব বাক্য ছিল না। ফলে প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠে যে, এগুলো ছিল তফসীরের বাক্য।

لَوْ—لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ—এর জওয়াব এ স্থলে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لَمَا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ—উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কিয়ামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে, তবে কখনও প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং উদাসীন হতে না।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ—উপরে বলা হয়েছে عِلْمَ الْيَقِينِ—এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: মূসা (আ) যখন তূর পর্বতে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তূর পর্বতেই তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলরা গোবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মূসা (আ)-র মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তওরাতের তক্তিগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।—(মাযহারী)

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ—অর্থাৎ তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌প্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না এবং পাপ কাজে ব্যয় করেছ কি না? তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নিয়ামতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কোরআনের অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে: —إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا এতে মানুষের শ্রবণশক্তি হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নিয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। বলা হবে : আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দেইনি, আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি পান করতে দেইনি ?—(তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আদায় না করা পর্যন্ত হাশরের মাঠে কেউ স্বস্থান ত্যাগ করতে পারবে না—এক. সে তার জীবনের দিন-গুলো কি কি কাজে নিঃশেষ করেছে ? দুই. সে তার যৌবনশক্তিকে কি কাজে ব্যয় করেছে ? তিন. সে যে সম্পদ উপার্জন করেছিল তা বৈধ পন্থায়, না অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে ? চার. সে সেই ধনসম্পদ কোথায় কোথায় ব্যয় করেছে ? পাঁচ. আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌ম অনু-যায়ী সে কতটুকু আমল করেছে ?—(বুখারী)

তফসীরবিদ ইমাম মুজাহিদ (র) বলেন : কিয়ামতের দিন এ ধরনের প্রশ্ন প্রত্যেক ভোগবিলাস সম্পর্কে করা হবে, তা পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান সম্পর্কিত ভোগ-বিলাস হোক কিংবা সন্তান-সন্ততি, শাসনক্ষমতা অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কিত ভোগ-বিলাস হোক। কুরতুবী এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন : এটা একান্ত যথার্থ যে, কোন বিশেষ নিয়ামত সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে না।

সূরা তাকাছুরের বিশেষ ফযীলত : রসূলে করীম (সা) একবার সাহাবায়ে কিরা-মকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মধ্যে কারও এমন ক্ষমতা নেই যে, এক হাজার আয়াত পাঠ করবে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন : হ্যাঁ, এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনের আছে। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ কি সূরা তাকাছুর পাঠ করতে পারবে না ? উদ্দেশ্য এই যে, দৈনিক এই সূরা পাঠ করা এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান।—(মাযহারী)

سورة العصر

সূরা আছর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৩ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) কসম যুগের, (২) নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; (৩) কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম যুগের (যাতে দুঃখ ও ক্ষতি সাধিত হয়), মানুষ (তার জীবনের দিনগুলো বিনষ্ট করার কারণে) খুবই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে (যা আত্মগুণ) এবং পরস্পরকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাকীদ দেয় এবং তাকীদ দেয় সৎ কর্মে অটল থাকার। (এটা পরোপকার গুণ। মোটকথা, যারা এ আত্মগুণ অর্জন করে এবং অপরকেও গুণান্বিত করে, তারা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত নয় বরং লাভবান)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আছরের বিশেষ ফযীলত ঃ হযরত ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে হিসন (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহাবীগণের মধ্যে দু'ব্যক্তি ছিল, তারা পরস্পর মিলে একজন অন্য-জনকে সূরা আছর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। —(তিবরানী) ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি সম্পর্কেই চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।—(ইবনে কাসীর)

সূরা আছর কোরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ সূরা যে, ইমাম শাফেয়ী (র)-র ভাষায় মানুষ এ সূরাটিকেই চিন্তা-ভাবনা সহকারে পাঠ করলে

তাদের ইহকাল ও পরকালের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। এ সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা যুগের কসম করে বলেছেন যে, মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে—ঈমান, সৎ কর্ম, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশ। দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার লাভ করার চার বিষয় সম্বলিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দু'টি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় দু'টি বিষয় মুসলমানদের হিদায়াত ও সংশোধন সম্পর্কিত।

প্রথম প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এ বিষয়বস্তুর সাথে যুগের কি সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের জওয়াবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন : মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সূরায় যে সব কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও এই যুগ কালেরই দিবারাত্রিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করা হয়েছে।

মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততায় যুগ ও কালের প্রভাব কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, আয়ুষ্কালের সাল, মাস, সপ্তাহ, দিবারাত্র বরং ঘণ্টা ও মিনিটই মানুষের একমাত্র পুঁজি, যার সাহায্যে সে ইহকাল ও পরকালের বিরাট এবং বিস্ময়কর মুনাফাও অর্জন করতে পারে এবং ভ্রান্ত পথে চললে এটাই তার জন্য বিপজ্জনকও হয়ে যেতে পারে। জনৈক আলিম বলেন :

حيا تك انفاس تعد فكلما + مضى نفس منها انتقصت به جزءا

অর্থাৎ তোমার জীবন কতিপয় গুণাগুনতি শ্বাস-প্রশ্বাসের নাম। যখন একটি শ্বাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তোমার বয়সের একটি অংশ হ্রাস পায়।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে তার আয়ুষ্কালের অমূল্য পুঁজি দিয়ে একটি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে দিয়েছেন, যাতে সে বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে এ পুঁজিকে খাঁটি লাভ-দায়ক কাজে লাগাতে পারে। যদি সে লাভদায়ক কাজে এ পুঁজিকে বিনিয়োগ করে, তবে মুনাফার কোন অন্ত থাকে না। পক্ষান্তরে যদি সে এই পুঁজি কোন ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করে, তবে মুনাফা দূরের কথা, পুঁজিই বিনষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর কেবল মুনাফা ও পুঁজি বিনষ্ট হয়েই ব্যাপার শেষ হয়ে যায় না বরং তার উপর শত শত অপরাধের শাস্তি আরোপিত হয়। কেউ যদি এ পুঁজিকে লাভজনক অথবা ক্ষতিকর কোন কাজেই ব্যবহার না করে, তবে এ ক্ষতি তো অবশ্যম্ভাবী যে, তার মুনাফা ও পুঁজি উভয়ই বিনষ্ট হল। এটা নিছক কবিসুলভ কল্পনাই নয়, বরং এক হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها—অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠে তার প্রাণের পুঁজি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এ পুঁজিকে লোকসান থেকে মুক্ত করে নেয় এবং কেউ ধ্বংস করে দেয়।

খোদ কোরআনও ঈমান এবং সৎ কর্মকে মানুষের ব্যবসারূপে ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে : هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ —আয়ুষ্কাল যখন পুঁজি আর মানুষ হল ব্যবসায়ী, তখন সাধারণ অবস্থায় এই ব্যবসায়ীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা, এই বেচারীর পুঁজি কোন আড়ষ্ট পুঁজি নয় যে কিছুদিন বেকারও রাখা যাবে; যাতে ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগানো যায়। বরং এটা বহমান পুঁজি, যা প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে। এ পুঁজির ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত চালাক ও সুচতুর হতে হবে। কারণ বহমান বস্তু থেকে মুনাফা অর্জন করা সহজ কথা নয়। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বরফ বিক্রেতার দোকানে গিয়ে সূরা আছরের যথার্থ তফসীর বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, দোকানদার সামান্য উদাসীন হলেই তার পুঁজি পানি হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই আয়াতে কালের শপথ করে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, সে যেন ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে বস্তু চতুষ্টয় সম্বলিত ব্যবস্থাপত্র ব্যবহারে সামান্যও গাফিল না হয়, বয়সের প্রতিটি মুহূর্তকে যেন সঠিকভাবে কাজে লাগায় এবং চার প্রকার কাজে নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখে।

কালের শপথের আরও একটি সম্পর্ক এরূপ হতে পারে যে, যার শপথ করা হয়, সে একদিক দিয়ে সেই বিষয়ের সাক্ষী হয়ে থাকে। কালও এমন বিষয় যে, কেউ যদি এর ইতিহাস, এতে জাতিসমূহের উত্থান-পতন সম্পর্কিত ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে সে অবশ্যই এ বিশ্বাসে উপনীত হবে যে, উপরোক্ত চারটি কাজের মধ্যেই মানুষের সাফল্য সীমিত। যে এগুলোকে বিসর্জন দেয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত। জগতের ইতিহাস এর সাক্ষী।

অতঃপর এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন। ঈমান ও সৎ কর্ম—আত্ম-সংশোধন সম্পর্কিত এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে সত্যের উপদেশ ও সবরের উপদেশ এ দু'টি বিষয়ের উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। تَوَاصِي শব্দটি وَصِيَّت থেকে উদ্ভূত। কাউকে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে উপদেশ দেওয়া ও সৎ কাজের জোর তাকীদ করার নাম ওসীয়্যত। এ কারণেই মরণোন্মুখ ব্যক্তি পরবর্তীকালের জন্য যেসব নির্দেশ দেয়, তাকেও ওসীয়্যত বলা হয়।

উপরোক্ত দু'রকম উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এই ওসীয়্যতেরই দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় সত্যের উপদেশ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সবরের উপদেশ। এখন এ দু'টি শব্দের কয়েক রকম অর্থ হতে পারে—এক. সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎ কর্মের সমষ্টি। আর সবরের অর্থ যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। অতএব প্রথম শব্দের সারমর্ম হল 'আমর বিল মারূফ' তথা সৎ কাজের আদেশ করা এবং দ্বিতীয় শব্দের সারমর্ম হল 'নিহী আনিল মুনকার' তথা মন্দ কাজে নিষেধ করা। এখন সমষ্টির সার-মর্ম এই দাঁড়ায় যে, নিজে যে ঈমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করেছে, অপরকেও তার উপদেশ দেয়া। দুই. সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং সবরের অর্থ সৎ কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, সবরের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেওয়া ও অনুবর্তী

করা। এ অনুবর্তী করার মধ্যে সৎ কর্ম সম্পাদন এবং গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করা উভয়ই শামিল।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন ঃ দু'টি বিষয় মানুষকে ঈমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করতে স্বভাবত বাধা দেয়—এক. সন্দেহ ও সংশয় অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের ব্যাপারে মানুষের মনে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া, যদ্দরুন বিশ্বাসই বিঘ্নিত হয়ে যায়। বিশ্বাসে ত্রুটি ঢুকে পড়লে কর্ম ত্রুটিমুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। দুই. খেয়ালখুশী, যা মানুষকে কোন সময় সৎ কাজের প্রতি বিমুখ করে দেয় এবং কোন সময় মন্দকাজে লিপ্ত করে দেয়, যদিও সে বিশ্বাসগতভাবে সৎ কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরী মনে করে। অতএব, আলোচ্য আয়াতে সত্যের উপদেশ বলে সন্দেহ দূর করা এবং সবরের উপদেশ বলে খেয়ালখুশী ত্যাগ করে সৎ কাজ অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া বোঝানো হয়েছে। সংক্ষেপে সত্যের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের শিক্ষাগত সংশোধন করা এবং সবরের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের কর্মগত সংশোধন করা।

মুক্তির জন্য নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের চিন্তাও জরুরী ঃ এ সূরায় মুসলমানদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজেদের ধর্মকে কোরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারী করে নেওয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী, ততটুকুই জরুরী অন্য মুসলমানদেরকেও ঈমান ও সৎ কর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমত চেষ্টা করা। নতুবা কেবল নিজেদের আমল মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না, বিশেষত আপন পরিবার-পরিজন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কুকর্ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা আপন মুক্তির পথ বন্ধ করার নামান্তর, যদিও নিজে পুরোপুরি সৎকর্মপরায়ণ হয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সাধ্যমত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ফরয করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান এমনকি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত উদাসীনতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা নিজেদের আমলকেই যথেষ্ট মনে করে বসে আছে, সন্তান-সন্ততি কি করছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন॥

سورة الهمزة

সূরা হুমাযা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿۱﴾ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ﴿۲﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ﴿۳﴾ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ﴿۴﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ؕ﴿۵﴾ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ﴿۶﴾ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ؕ﴿۷﴾ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ﴿۸﴾ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿۹﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, (২) যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে। (৩) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে! (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। (৫) আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি ? (৬) এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, (৭) যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। (৮) এতে তাদেরকে বেঁধে দেওয়া হবে, (৯) লম্বা লম্বা খুঁটিতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, যে (লালসার আধিক্যের কারণে) অর্থ জমা করে এবং (তৎপ্রতি মহব্বত ও গর্বের কারণে) তা বার বার গণনা করে। (তার ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যেন) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে (অর্থাৎ অর্থের প্রতি এমন লিপ্সা রাখে যে, সে যেন বিশ্বাস করে, সে নিজেও চিরকাল জীবিত থাকবে এবং তার অর্থও চিরকাল এমনি থাকবে। অথচ এই অর্থ তার কাছে) কখনও (থাকবে) না। (অতঃপর তার দুর্ভোগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে) সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে এমন অগ্নিতে যা সবকিছুকে পিষ্ট করে দেয়, সেটা আল্লাহ্‌র অগ্নি, যা (আল্লাহ্‌র আদেশে) প্রজ্বলিত, (আল্লাহ্‌র অগ্নি; বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, সেই অগ্নি অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াবহ হবে) যা (শরীরে লাগা মাত্রই) হৃদয় পর্যন্ত

পৌঁছবে। সেই অগ্নি তাদের উপর আবদ্ধ করে দেওয়া হবে (এভাবে যে, তারা অগ্নির) বড় লম্বা লম্বা স্তম্ভে পরিবেষ্টিত থাকবে, যেমন কাউকে অগ্নির সিন্দুকে পুরে দেওয়া হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় তিনটি জঘন্য গোনাহের শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। গোনাহ্ তিনটি হচ্ছে همز - لمز ও جمع مال প্রথমোক্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরকারকের মতে همز -এর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং لمز -এর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গোনাহ্। পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গোনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোন বাধা থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ্ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখের নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ্ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারও পশ্চাতে নিন্দা করা একারণেও বড় অন্যায় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

একদিক দিয়ে لمز তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিতও করা হয়। এর কষ্টও বেশী, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

شرار عباد الله تعالى المشاءون بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون لبراء العنت -

অর্থাৎ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষে নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

যেসব বদভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ্ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরী হক আদায় করা না হয় কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসার কারণে দীনের জরুরী কাজ বিঘ্নিত হয়।

تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ—অর্থাৎ জাহান্নামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাও বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ

জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও জ্বলে যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌঁছবে এবং হৃদয় দহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।

سورة الفيل

সূরা ফীল

মক্কায় অবতীর্ণঃ ৫ আয়াত ॥

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেন নি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি? (৩) তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, (৪) যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি জানেন না যে, আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঘটনার ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলা। অতঃপর সেই ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে)। তিনি কি তাদের (কাবা গৃহকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার) চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি? (এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঘটনার সত্যতা সপ্রমাণ করা)। তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে ভক্ষিত তৃণের ন্যায় (দলিত) করে দেন। (সার-কথা এই যে, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর অবমাননা করে, তাদের এ ধরনের শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। দুনিয়াতেই শাস্তি এসে যেতে পারে; যেমন এসেছে হস্তী-বাহিনীর উপর। পরন্তু পরকালের শাস্তি তো অবধারিতই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কা'বা গৃহকে ভূমিসাৎ

করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধূলায় মিশ্রিত করে দেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের বছর এ ঘটনা ঘটেছিল ঃ মক্কা মোকাররমায় খাতামুল-আম্বিয়া (সা)-র জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কতক রেওয়ায়েত দ্বারাও এটা সমর্থিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি।—(ইবনে কাসীর) হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এক প্রকার মো'জেযারূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মো'জেযা নবুয়ত দাবীর সাথে নবীর সমর্থনের প্রকাশ করা হয়। নবুয়ত দাবীর পূর্বে বরং নবীর জন্মেরও পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা মাঝে মাঝে দুনিয়াতে এমন ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতায় মো'জেযার অনুরূপ হয়ে থাকে। এ ধরনের নিদর্শনাবলীকে হাদীস-বিদগণের পরিভাষায় 'আরহাসাত' বলা হয়। 'রাহস' এর অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব নিদর্শন নবীর নবুয়ত প্রমাণের ভিত্তি ও ভূমিকা হয় বিধায় এগুলোকে 'আরহাসাত' বলা হয়ে থাকে। নবী করীম (সা)-এর নবুয়ত এমনকি, জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েক প্রকার 'আরহাসাত' প্রকাশ পেয়েছে। হস্তীবাহিনীকে আসমানী আযাব দ্বারা প্রতি হত করাও এসবের অন্যতম।

হস্তীবাহিনীর ঘটনা ঃ এ সম্পর্কে হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদ ইবনে কাসীরের ভাষ্য এরূপ ঃ আরবের ইয়ামেন প্রদেশ মুশরিক, 'হেমইয়ারী' রাজন্যবর্গের অধিকারভুক্ত ছিল। তাদের সর্বশেষ রাজা ছিলেন 'যু-নওয়াস'। সে সময় খৃস্টান সম্প্রদায়ই ছিল সত্য ধর্মাবলম্বী। রাজা 'যু-নওয়াস' তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। তিনি একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত গর্ত খনন করে তা অগ্নিতে ভর্তি করে দেন। অতঃপর যত খৃস্টান পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এক আল্লাহ্র ইবাদত করত, তাদেরকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেন। এরূপ নির্যাতিতদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজারের কাছাকাছি। এই গুর্তের কথাই সূরা বুরূজে 'আসহাবুল-উখদূদে'র নামে ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'ব্যক্তি কোনরূপে অত্যাচারীদের কবল থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। তারা সিরিয়ার রোমক শাসকের দরবারে যেয়ে খৃস্টানদের প্রতি রাজা যু-নওয়াসের লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করল। রোমক শাসক ইয়ামেনের নিকটবর্তী আবিসিনিয়ার খৃস্টান সম্রাটের কাছে এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী, দুই সেনানায়ক আরবাত ও আবরাহার নেতৃত্বে রাজা যু-নওয়াসের মুকাবিলায় পাঠিয়ে দিলেন। আবিসিনিয়ার সেনাবাহিনী ইয়ামেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সমগ্র ইয়ামেনকে হেমইয়ারীদের কবল মুক্ত করল। রাজা যু-নওয়াস পলায়ন করলেন এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। এভাবে আরবাত ও আবরাহার মাধ্যমে ইয়ামেন আবিসিনিয়া সম্রাটের করতলগত হল। এরপর আরবাত ও আবরাহার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই হল এবং আরবাত নিহত হল। আবিসিনিয়া সম্রাট বিজয়ী আবরাহাকে ইয়ামেনের শাসক নিযুক্ত করলেন।

ইয়ামেন অধিকার করার পর আবরাহার ইচ্ছা হল যে, সে তথায় এমন একটি

বিশাল সুরম্য গীর্জা নির্মাণ করবে, যার নযীর পৃথিবীতে নেই। এতে তার লক্ষ্য ছিল এই যে, ইয়ামেনের আরব বাসিন্দারা প্রতি বৎসর হজ্জ করার জন্য মক্কায় গমন করে এবং বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করে। তারা এই গীর্জার মাহাত্ম্য ও জাঁকজমকে অভিভূত হয়ে বায়তুল্লাহ্র পরিবর্তে এই গীর্জায় আগমন করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে একটি বিরাট সুরম্য গীর্জা নির্মাণ করল। নিচে দাঁড়িয়ে কেউ এই গীর্জার উচ্চতা পরিমাপ করতে পারত না। স্বর্ণ-রৌপ্য ও মূল্যবান হীরা-জহরত দ্বারা কারুকার্যখচিত এই গীর্জা নির্মাণ করার পর সে ঘোষণা করলঃ এখন থেকে ইয়ামেনের কোন বাসিন্দা হজ্জের জন্য কাবাগৃহে যেতে পারবে না। এর পরিবর্তে তারা এই গীর্জায় ইবাদত করবে। আরবে যদিও পৌত্তলিকতার জোর বেশী ছিল কিন্তু দীনে ইবরাহীম এবং কা'বার মাহাত্ম্য ও মহব্বত তাদের অন্তরে গ্রথিত ছিল। তাই আদনান, কাহতান ও কোরায়েশ উপজাতি-সমূহের মধ্যে এই ঘোষণার ফলে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তীব্রতর হয়ে উঠল। সে মতে তাদেরই কেউ রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে গীর্জায় প্রবেশ করে প্রস্রাব-পায়খানা করল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাদের এক যাযাবর গোত্র নিজেদের প্রয়োজনে গীর্জার সন্নিকটে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল। সেই অগ্নি গীর্জায় লেগে যায় এবং গীর্জার প্রভূত ক্ষতি হয়।

আবরাহাকে সংবাদ দেওয়া হল যে, জনৈক কোরায়শী এই দুষ্কর্ম করেছে। তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে শপথ করলঃ আমি কোরায়েশদের কাবাগৃহ নিশ্চিহ্ন না করে ক্ষান্ত হব না। অতঃপর সে এর প্রস্তুতি শুরু করল এবং আবিসিনিয়া সম্রাটের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। সম্রাট কেবল অনুমতিই দিলেন না বরং তার মাহমূদ নামক খ্যাতনামা হস্তীটিও আবরাহার সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এই হস্তীটি এমন বিশালকায় ছিল যে, এর সমতুল্য সচরাচর দৃষ্টিগোচর হতো না। এছাড়া আরও আটটি হাতী এই বাহিনীর জন্য সম্রাটের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হল। এতসব হাতী প্রেরণ করার উদ্দেশ্য ছিল কাবাগৃহ ভূমিসাৎ করার কাজে হাতী ব্যবহার করা। পরিকল্পনা ছিল এই যে, কাবাগৃহের স্তম্ভে লোহার মজবুত ও লম্বা শিকল বেঁধে দেওয়া হবে। অতঃপর সেসব শিকল হাতীর গলায় বেঁধে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সমগ্র কাবাগৃহ (নাউযুবিল্লাহ্) মাটিতে ধসে পড়বে।

আরবে এই আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র আরব মুকাবিলার জন্য তৈরী হয়ে গেল। ইয়ামেনী আরবদের মধ্য থেকে যুনফর নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে আরবরা আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল আবরাহার পরাজয় ও লাঞ্ছনা বিশ্ববাসীর জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে তুলে ধরা। তাই আরবরা যুদ্ধে সফল হতে পারল না। আবরাহা তাদেরকে পরাজিত করে যুনফরকে বন্দী করল। অতঃপর সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 'খাসআম' গোত্রের কাছে উপনীত হলে গোত্র সরদার নুফায়েল ইবনে হাবীব তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হল। কিন্তু আবরাহার লশকর তাকেও পরাজিত ও বন্দী করল। আবরাহা নুফায়েলকে হত্যা না করে পথপ্রদর্শকের কাজে নিয়োজিত করল। অতঃপর এই সেনাবাহিনী তায়েফের নিকটবর্তী হলে তথাকার সকীফ গোত্র আবরাহাকে বাধা দিল না। কারণ, তারা বিগত দু'টি যুদ্ধে আবরাহার বিজয় ও আরবদের পরাজয়ের ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। তারা আবরাহার সাথে সাক্ষাৎ

করে এই মর্মে এক শান্তিচুক্তিও সম্পাদন করল যে, তারা আবরাহার সামনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে না। যদি তায়েফে নির্মিত তাদের লাত নামক মূর্তির মন্দির অক্ষত থাকে। উপরন্তু তারা পথপ্রদর্শনের জন্য তাদের সরদার আবু রেগালকেও আবরাহার সঙ্গে দিয়ে দেবে। আবরাহা এতে সম্মত হয়ে আবু রেগালকে সাথে নিয়ে মক্কার অদূরে 'মাগমাস' নামক স্থানে পৌঁছে গেল। সেখানে কোরায়েশ গোত্রের উট-চারণ ভূমি অবস্থিত ছিল। আবরাহা সর্বপ্রথম সেখানে হামলা চালিয়ে সমস্ত উট বন্দী করে নিয়ে এল। এতে রসূলে করীম (সা)-এর পিতামহ আবদুল মোত্তালিবেরও দুই শত উট ছিল। এখান থেকে আবরাহা বিশেষ দূত মারফত মক্কা শহরে কোরায়েশ নেতাদের কাছে বলে পাঠাল যে, আমরা কোরায়েশদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই না। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কাবাগৃহ ভূমিসাৎ করা। এ লক্ষ্য অর্জনে বাধা না দিলে কোরায়েশদের কোন ক্ষতি করা হবে না। বিশেষ দূত 'হানাতা' এই পয়গাম নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলে সবাই তাকে প্রধান কোরায়েশ নেতা আবদুল মোত্তালিবের ঠিকানা বলে দিল। হানাতা তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে আবরাহার পয়গাম পৌঁছে দিল। ইবনে ইসহাক (র)-এর বর্ণনা মতে আবদুল মোত্তালিব প্রত্যুত্তরে বললেন : আমরাও আবরাহার মুকাবিলায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা রাখি না। মুকাবিলা করার যথেষ্ট শক্তিও আমাদের নেই। তবে এ কথা বলে দিচ্ছি যে, এটা আল্লাহ্র ঘর, তাঁর খলীল ইবরাহীম (আ)-এর হাতে নির্মিত। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণের যিম্মাদার। আবরাহা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে করুক এবং দেখুক আল্লাহ্ কি করেন। হানাতা বলল : তাহলে আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আবরাহার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব।

আবরাহা আবদুল মোত্তালিবের সুদর্শন সৌম্য চেহারা দেখে সিংহাসন ছেড়ে নিচে উপবেশন করল এবং আবদুল মোত্তালিবকে সাথে বসালো। অতঃপর দোভাষীর মাধ্যমে আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করল। অবদুল মোত্তালিব বললেন : আমার প্রয়োজন এতটুকুই যে, আমার কিছু উট আপনার সৈন্যরা নিয়ে এসেছে। সেগুলো ছেড়ে দিন। আবরাহা বলল : আমি প্রথম যখন আপনাকে দেখলাম, তখন আমার মনে আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আপনি আমার কাছে কেবল দুই শত উটের কথাই বলছেন। আপনি কি জানেন না যে, আমি আপনাদের কাবা তথা আপনাদের দীন-ধর্মকে ভূমিসাৎ করতে এসেছি? আপনি এ সম্পর্কে কোন কথাই বললেন না। আশ্চর্যের বিষয় বটে। আবদুল মোত্তালিব জওয়াব দিলেন : উটের মালিক আমি, তাই উটের কথাই চিন্তা করেছি। আমি কাবা গৃহের মালিক নই। এর মালিক একজন মহান সত্তা। তিনি জানেন তাঁর এ ঘরকে কিরূপে রক্ষা করতে হবে। আবরাহা বলল : আপনার আল্লাহ্ একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মোত্তালিব বললেন : তা'হলে আপনি যা ইচ্ছা করুন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, আবদুল মোত্তালিবের সাথে আরও কয়েকজন কোরায়েশ নেতা আবরাহার দরবারে গমন করেছিলেন। তাঁরা আবরাহার কাছে এই প্রস্তাব রাখলেন যে, আপনি আল্লাহ্র ঘরে হস্তক্ষেপ না করলে আমরা সমগ্র উপত্যকার এক তৃতীয়াংশ ফসল আপনাকে খেরাজ প্রদান করব। কিন্তু

আবরাহা এ প্রস্তাব মানতে সম্মত হল না। আবদুল মোত্তালিব তাঁর উট নিয়ে শহরে ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহ্র চৌকাঠ ধরে দোয়ায় মশগুল হলেন। কোরায়েশ গোত্রের বহু লোকজন দোয়ায় তাঁর সাথে শরীক হল। তারা বলল : হে আল্লাহ্, আবরাহার বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করার সাধ্য আমাদের নেই। আপনিই আপনার ঘরের হিফাযতের ব্যবস্থা করুন। কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করার পর আবদুল মোত্তালিব সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আবরাহার বাহিনীর উপর আল্লাহ্র গযব পতিত হবে। প্রত্যুষে আবরাহা কাবা ঘর আক্রমণের প্রস্তুতি নিল এবং মাহমুদ নামক প্রধান হস্তীটিকে অগ্রে চলার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। বন্দী নুফায়েল ইবনে হাবীব সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হস্তীর কান ধরে বিড় বিড় করে বলতে লাগল : তুই যেখান থেকে এসেছিস, সেখানেই নিরাপদে চলে যা; কেননা, তুই এখন আল্লাহ্র সংরক্ষিত শহরে আছিস। অতঃপর সে হাতীর কান ছেড়ে দিল। হাতী একথা শুনেই বসে পড়ল। চালকরা তাকে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে উঠাতে চাইল। কিন্তু সে আপন জায়গা থেকে একবিন্দুও সরল না। বড় বড় লৌহ শলাকা দ্বারা পিটানো হল, নাকের ভিতরে লোহার শিক ঢুকিয়ে দেওয়া হল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সে দণ্ডায়মান হল না। তখন তারা তাকে ইয়ামেনের দিকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। সে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল। অতঃপর সিরিয়ার দিকে চালাতে চাইলে চলতে লাগল। এরপর পূর্ব দিকেও কিছুদূর চলল। এসব দিকে চালানোর পর আবার যখন মক্কার দিকে চালানো হল, তখন পূর্ববৎ বসে পড়ল।

এখানে তো আল্লাহ্র কুদরতের এই লীলাখেলা চলছিলই; অপরদিকে সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এক ধরনের পাখী সারিবদ্ধভাবে উড়ে আসতে দেখা গেল। এগুলির প্রত্যেকটির কাছে ছোলা অথবা মসুরের সমান তিনটি করে কংকর ছিল; একটি চঞ্চুতে ও দু'টি দুই থাবায়। ওয়াকেদী (র) বর্ণনা করেন : পাখীগুলো অদ্ভুত ধরনের ছিল, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। দেখতে দেখতে সেগুলি আবরাহার বাহিনীর উপরিভাগ ছেয়ে ফেলল এবং বাহিনীর উপর কংকর নিক্ষেপ করতে লাগল। প্রত্যেকটি কংকর সেই কাজ করল, যা বন্দুকের গুলীতেও করতে পারে না। কংকর যে ব্যক্তির উপর পতিত হত, তাকে এপার-ওপার ছিদ্র করে মাটিতে পুঁতে যেত। এই আযাব দেখে সব হাতী ছুটাছুটি করে পালিয়ে গেল। একটিমাত্র হাতী ময়দানে ছিল, যা কংকরের আঘাতে নিহত হল। বাহিনীর সব মানুষই অকুস্থলে প্রাণ হারায়নি বরং তারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করল এবং পথিমধ্যে মাটিতে পড়ে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। আবরাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই সে তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করেনি। কিন্তু তার দেহে মারাত্মক বিষ সংক্রমিত হয়েছিল। ফলে দেহের এক একটি গ্রন্থি পচে-গলে খসে পড়তে লাগল। এমতাবস্থায়ই সে ইয়ামেনে নীত হল। রাজধানী 'সান'আয়' পৌঁছার পর তার সমস্ত শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। আবরাহার হস্তী মাহমুদের সাথে দু'জন চালক মক্কাতেই রয়ে গেল। তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন : আমি এই দু'জন

১০৯—

চালককে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ অবস্থায় দেখেছি। হযরত আয়েশা (রা)-র ভগিনী আসমা বলেন ঃ আমি এই বিকলাঙ্গ অন্ধদ্বয়কে ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখেছি। হস্তীবাহিনীর এই ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ — এখানে أَلَمْ تَرَ 'আপনি কি দেখেননি' বলা হয়েছে অথচ এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই দেখার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সেই ঘটনার জ্ঞানকেও 'দেখা' বলে ব্যক্ত করা হয়। যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা ও আসমা (রা) দু'জন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন।

طَيْرًا أَبَابِيلَ — أَبَابِيل শব্দটি বহুবচন। অর্থ পাখীর ঝাঁক—কোন বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। এই পাখী আকারে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল কিন্তু এই জাতীয় পাখী পূর্বে কখনও দেখা যায়নি।—(কুরতুবী)

بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ—ভিজা মাটি আগুনে পুড়ে যে কংকর তৈরী হয়, সেই কংকরকে سِجِّيل বলা হয়ে থাকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই কংকরেরও নিজস্ব কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্র কুদরতে ঐগুলি বন্দুকের গুলী অপেক্ষা বেশী কাজ করেছিল।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ — عَصْف -এর অর্থ ভূষি। ভূষি নিজেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোন জন্তু সেটিকে চর্বন করে, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না। কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা তদ্রূপই হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের অন্তরে কোরায়শদের মাহাত্ম্য আরও বাড়িয়ে দিল। এখন সবাই স্বীকার করতে লাগল যে, তারা বাস্তবিকই আল্লাহ্ ভক্ত। তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।—(কুরতুবী)

এই মাহাত্ম্যের প্রভাবেই কোরায়েশরা বাণিজ্য ব্যাপদেশে গমন করত এবং পথিমধ্যে কেউ তাদের কোন ক্ষতি করত না। অথচ তখন সাধারণের জন্য দেশ সফর করা ছিল জীবন বিপন্ন করার নামান্তর। পরবর্তী সূরা কোরায়শে তাদের এই সফরের কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

سورة القريش

সূরা কোরায়শ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৪ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) কোরায়শের আসক্তির কারণে, (২) আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (৩) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোরায়শের আসক্তির কারণে, তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের আসক্তির কারণে। (এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) অতএব তারা যেন অবশ্যই ইবাদত করে এই ঘরের পালন-কর্তার, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে নিরাপদ করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ ব্যাপারে সব তফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবত এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে এ দু'টিকে একই সূরারূপে লিখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ্‌ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত উসমান (রা) যখন তাঁর খিলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একত্র করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সকল সাহাবায়ে কিরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝ-খানে বিসমিল্লাহ্‌ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত উসমান (রা)-এর তৈরী এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ —আরবী ব্যাকরণিক গঠনপ্রণালী অনুযায়ী حرف لام -এর সম্পর্ক কোন পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে হওয়া বিধেয়। আয়াতে উল্লিখিত لام -এর সম্পর্ক কিসের সাথে, এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সূরা ফীলের সাথে অর্থগত সম্পর্কের কারণে কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে انا اهلكنا اصحاب الفيل অর্থাৎ আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্য ধ্বংস করেছি, যাতে কোরায়শদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন দুই সফরের পথে কোন বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে اعجبوا অর্থাৎ তোমরা কোরায়শদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর তারা কিভাবে শীত ও গ্রীষ্মের সফর নিরাপদে নির্বিবাদে করে। কেউ কেউ বলেন : এই لام -এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য فليعبدوا -এর সাথে। অর্থাৎ এই নিয়ামতের ফলশ্রুতিতে কোরায়শদের কৃতজ্ঞ হওয়া ও আল্লাহ্‌র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সার কথা, এই সূরার বক্তব্য এই যে, কোরায়শরা যেহেতু শীতকালে ইয়ামেনের দিকে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার দিকে সফরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দু'টি সফরের উপরই তাদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল এবং তারা ঐশ্বর্য-শালীরূপে পরিচিত ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শত্রু হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যে কোন দেশে গমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

সমগ্র আরবে কোরায়শদের শ্রেষ্ঠত্ব : এ সূরায় আরও ইঙ্গিত আছে যে, আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে কোরায়শগণ আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয়। রসূলে করীম (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ইসমাঈল (আ)-এর সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেনানাকে কেনানার মধ্যে কোরায়শকে, কোরায়শের মধ্যে বনী হাশিমকে এবং বনী হাশিমের মধ্যে আমাকে মনোনীত করেছেন। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন : সব মানুষ কোরায়শের অনুগামী ভাল ও মন্দে। প্রথম হাদীসে উল্লিখিত মনোনয়নের কারণ সম্ভবত এই গোত্রসমূহের বিশেষ নৈপুণ্য ও প্রতিভা। মূর্খতাযুগেও তাদের কতক চরিত্র ও নৈপুণ্য অত্যন্ত উচ্চস্তরে ছিল। সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তাদের মধ্যে পুরোপুরি ছিল। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম ও আল্লাহ্‌র ওলীগণের অধিকাংশই কোরায়শের মধ্য থেকে হয়েছেন।—(মাযহারী)

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ —একথা সুবিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থলে অবস্থিত, সেখানে কোন চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচা নেই, যা থেকে ফলমূল পাওয়া যেতে পারে। এজন্যই কাবার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ) দোয়া করেছিলেন وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ —অর্থাৎ হে আল্লাহ্, এতে বসবাসকারীদেরকে ফলমূলের

রিযিক দান করুন। আরও বলেছিলেনঃ يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ—অর্থাৎ বাইরে থেকেও যেন এখানে ফলমূল আনার ব্যবস্থা হয়। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করার উপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রপিতামহ হাশিম কোরায়শকে ভিন্-দেশে যেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্ম-কালে তারা সিরিয়ায় সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়ামেন গরম দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহ্র খাদেম হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। সরদার হাশিমের নিয়ম ছিল এই যে, ব্যবসায়ের সমস্ত মুনাফা তিনি কোরায়শের ধনী ও দরিদ্র সবার মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। ফলে তাদের দরিদ্র ও ধনীদের সমান গণ্য হত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ ও নিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ—নিয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কোরায়শকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই গৃহের মালিকের ইবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের মৌলিক গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে।

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ—সুখী জীবনের জন্য যা যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরায়শকে এগুলো দান করেছিলেন। أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ বলে পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বোঝানো হয়েছে এবং آمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ বাক্যে দস্যু শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি এ উভয় মর্মই বোঝানো হয়েছে।

ইবনে কাসীর বলেনঃ এ কারণেই যে ব্যক্তি এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে, আল্লাহ্ তার জন্য উভয় জাহানে নিরাপদ ও শংকামুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইবাদতের প্রতি বিমুখ হয় তার কাছ থেকে উভয় প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অন্য এক আয়াতে আছেঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এক জনপদের অধিবাসীরা সর্বপ্রকার বিপদাশংকা থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করত। তাদের কাছে সব জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে জীবনোপকরণ আগমন করত। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নিয়ামত-সমূহের নাশোকরী করল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ আস্বাদন করালেন।

আবুল হাসান কাযবিনী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শত্রু অথবা বিপদের আশংকা করে তার জন্য সূরা কোরায়শের তিলাওয়াত নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। একথা উদ্ধৃত করে ইমাম জযরী (র) বলেন—এটা পরীক্ষিত আমল। কাযী সানাউল্লাহ্ তফসীরে মাযহারীতে বলেন ঃ আমাকে আমার মুর্শিদ 'মির্যা মাযহার জান্-জানা' বিপদাপদের সময় এই সূরা তিলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক বালামুসিবত দূর করার জন্য এটা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। কাযী সানাউল্লাহ্ (র) আরও বলেন ঃ আমি বারবার এর পরীক্ষা করেছি।

سورة الماعون

সূরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণঃ ৭ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۞ فَذَٰلِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۞

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে? (২) সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। (৪) অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, (৫) যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর; (৬) যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে (৭) এবং ব্যবহার্য বস্তু দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে। (আপনি তার অবস্থা শুনতে চাইলে শুনুন) সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে (অপরকেও) উৎসাহিত করে না। (অর্থাৎ সে এমন নিষ্ঠুর যে, নিজে দরিদ্রকে দেওয়া তো দূরের কথা, অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত করে না। বান্দার হক নষ্ট করা যখন এমন মন্দ, তখন স্রষ্টার হক নষ্ট করা আরও বেশী মন্দ হবে)। অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর (অর্থাৎ নামায ছেড়ে দেয়।) যারা (নামায পড়লেও) তা লোক দেখানোর জন্য করে এবং যাকাত মোটেই দেয় না (যাকাত দেওয়ার জন্য সবার সামনে দেওয়া শরীয়ত মতে জরুরী নয়। কাজেই এটা মোটেই না দিলেও কেউ আপত্তি করতে পারে না। কিন্তু নামায জামা'আতের সাথে প্রকাশ্যে পড়া হয়, এটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে তা সবার কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই কেবল লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে নেয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় দুষ্কর্ম উল্লেখ করে তজ্জন্য জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিন ব্যক্তি বিচার দিবস অস্বীকার করে না। সুতরাং কোন মু'মিন যদি এসব দুষ্কর্ম করে, তবে তা শরীয়ত মতে কঠোর গোনাহ্ ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও বর্ণিত শাস্তির বিধান তার জন্য প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচার দিবস তথা কিয়ামত অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই ইঙ্গিত আছে যে, বর্ণিত দুষ্কর্ম কোন মু'মিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এটা কোন অবিশ্বাসী কাফিরই করতে পারে। বর্ণিত দুষ্কর্ম এই ঃ ইয়াতীমের সাথে দুর্ব্যবহার, শক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য না দেওয়া এবং অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেওয়া, লোক দেখানো নামায পড়া এবং যাকাত না দেওয়া। এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং কঠোর গোনাহ্। আর যদি কুফর ও মিথ্যারোপের ফলশ্রুতিতে কেউ এসব কর্ম করে, তবে তার শাস্তি চিরকাল দোযখ বাস। সূরায় (দুর্ভোগ) শব্দের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ

—এটা মুনাফিকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্য এবং মুসলমানিত্বের দাবী সপ্রমাণ করার জন্য নামায পড়ে। কিন্তু নামায যে ফরয, এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল নামাযেরও খেয়াল রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে নেয়, নতুবা ছেড়ে দেয়। আসল নামাযের প্রতিই ভ্রূক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং عَنْ صَلَاتِهِمْ শব্দের আসল অর্থ তাই। নামাযের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়া, যা থেকে কোন মুসলমান, এমনকি রসূলে করীম (সা)ও মুক্ত ছিলেন না—তা এখানে বোঝানো হয়নি। কেননা, এজন্য জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে না। এটা উদ্দেশ্য হলে عَنْ صَلَاتِهِمْ—এর পরিবর্তে فِيْ صَلَاتِهِمْ বলা হত। সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনেও একাধিকবার নামাযের মধ্যে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ—مَاعُوْن শব্দের আসল অর্থ যৎকিঞ্চিৎ ও তুচ্ছ বস্তু। এমন ব্যবহার্য বস্তুসমূহকেও مَاعُوْن বলা হয়, যা স্বভাবত একে অপরকে ধার দেয় এবং যেগুলির পারস্পরিক লেনদেন সাধারণ মানবতারূপে গণ্য হয়, যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রান্না-বান্নার পাত্র। প্রয়োজনে এসব জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া দূষণীয় মনে করা হয় না। কেউ এগুলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ মনে করা হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে مَاعُوْن বলে যাকাত

বোঝানো হয়েছে। যাকাতকে ماعون বলার কারণ এই যে, যাকাত পরিমাণে আসল অর্থের তুলনায় খুবই কম—অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। হযরত আলী ও ইবনে ওমর (রা) এবং হাসান বসরী, কাতাদাহ্ ও যাহহাক (র) প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ এখানে এ তফসীরই করেছেন।—(মাযহারী) বলাবাহুল্য, বর্ণিত শাস্তি ফরয কাজ তরক করার কারণেই হতে পারে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে দেওয়া খুব সওয়াবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরী কিন্তু ফরয ও ওয়াজিব নয়, যা না দিলে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে। কোন কোন হাদীসে ماعون -এর তফসীর ব্যবহার্য জিনিস দ্বারা করা হয়েছে। এর মর্মার্থ তাদের চরম নীচতাকে ফুটিয়ে তোলা যে, তারা যাকাত কি দিবে ব্যবহার্য জিনিস দেওয়ার মধ্যে কোন খরচ নেই—এতেও তারা কৃপণতা করে। অতএব শাস্তির বিধান কেবল ব্যবহার্য জিনিস না দেওয়ার কারণে নয় বরং ফরয যাকাত না দেওয়াসহ চরম কৃপণতার কারণে।

سورة الكوثر

সূরা কাউসার

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৩ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ② إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। (২) অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (৩) যে আপনার শত্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার (জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম, তদুপরি সর্বপ্রকার কল্যাণও এর অর্থের মধ্যে শামিল)। দান করেছি। (এতে ইহকাল ও পরকালের সব কল্যাণ অর্থাৎ ইহকালে ইসলামের স্থায়িত্ব ও উন্নতি এবং পরকালে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। অতএব (এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) আপনি আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে নামায পড়ুন (কেননা সর্ববৃহৎ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায় সর্ববৃহৎ ইবাদত দরকার আর সেটা হচ্ছে নামায) এবং কৃতজ্ঞতা পূর্ণ করার জন্য শারীরিক ইবাদতের সাথে আর্থিক ইবাদত অর্থাৎ তাঁরই নামে) কোরবানী করুন। [অন্যান্য আয়াতে নামাযের সাথে যাকাতের আদেশ আছে কিন্তু এখানে নামাযের সাথে কোরবানীর আদেশের কারণ সম্ভবত এই যে, কোরবানীর মধ্যে আর্থিক ইবাদতের সাথে সাথে মুশরিকদের ও মুশরিকসুলভ আচার-অনুষ্ঠানের কার্যত বিরোধিতাও রয়েছে। কারণ মুশরিকরা প্রতিমার নামে কোরবানী করত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুত্র কাসেমের শৈশবে ইন্তেকাল হলে কোন কোন মুশরিক দোষারোপ করেছিল যে, তাঁর বংশ বিস্তৃত হবে না এবং তাঁর ধর্মও অচিরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর এই দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্‌র কৃপায় নির্বংশ নন, বরং] আপনার শত্রুরাই নির্বংশ, লেজকাটা। (ওদের বাহ্যিক বংশ বিস্তৃত হোক বা না হোক, দুনিয়াতে ওদের শুভ আলোচনা অব্যাহত থাকবে না। কিন্তু আপনার প্রতি মহব্বত,

আপনার স্মৃতি ও সুখ্যাতি ভক্তি সহকারে কীর্তিত হবে। এসব নিয়ামত 'কাউসার' শব্দের অর্থে দাখিল রয়েছে। পুত্র-সন্তানজাত বংশ না থাকুক কিন্তু বংশের যা উদ্দেশ্য, তা তো ইহকালের পর পরকালেও অর্জিত রয়েছে। আপনার শত্রু এ থেকে বঞ্চিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ মুহাম্মদ ইবনে আলী, ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায়, আরবে তাকে ابتر নির্বংশ বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেল, তখন কাফিররা তাঁকে নির্বংশ বলে দোষারোপ করতে লাগল। তাদের মধ্যে কাফির 'আস ইবনে ওয়ায়েলের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কোন আলোচনা হলে সে বলত ঃ আরে তার কথা বাদ দাও। সে তো কোন চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তাঁর নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে কাসীর, মাযহারী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফ একবার মক্কায় আগমন করলে কোরায়শরা তার কাছে যেয়ে বলল ঃ আপনি কি সেই যুবককে দেখেন না, যে নিজকে ধর্মের দিক দিয়ে সর্বোত্তম বলে দাবী করে? অথচ আমরা হাজীদের সেবা করি, বায়তুল্লাহ্‌র হিফাযত করি এবং মানুষকে পানি পান করাই। কা'ব একথা শুনে বলল ঃ আপনারাই তদপেক্ষা উত্তম। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।—(মাযহারী)

সারকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্র-সন্তান না থাকার কারণে যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বে-খবর। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বংশগত সন্তান-সন্ততিও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যদিও তা কন্যাসন্তানের তরফ থেকে হয় অনন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ উম্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশী হবে। এছাড়া এ সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা) যে আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও তৃতীয় আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এতে কা'ব ইবনে আশরাফ-এর উক্তি খণ্ডিত হয়ে যায়।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'কাউসার' সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করেছেন। কাউসার জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম—কারও কারও এই উক্তি সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ একথাও ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তির পরিপন্থী নয়। কাউসার নামক প্রস্রবণটিও এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে দাখিল। তাই মুজাহিদ কাউসারের

তফসীর প্রসঙ্গে বলেন : এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জান্নাতের বিশেষ কাউসার প্রস্রবণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হাউযে কাউসার : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত :

بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا فى المسجد اذا اغفى اغفاءة ثم رفع راسه متبسما - قلنا ما اضحكك يا رسول الله قال لقد انزلت على انفا سورة فقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطينا ك الكوثر الخ ثم قال اتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدنيه ربى عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه امتى يوم القيامة انيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم فاقول رب انه من امتى فيقول انك لا تدرى ما احدث بعدك -

একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে এক প্রকার নিদ্রা অথবা অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসি-মুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ্, আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন : এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ্‌সহ সূরা কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন : তোমরা জান, কাউসার কি? আমরা বললাম : আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন : এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দিবেন বলে ওয়াদা করে-ছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউযে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউয থেকে হটিয়ে দিবে। আমি বলব : পরওয়ার-দিগার! সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মতপথ অবলম্বন করেছিল।—(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

উপরোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাসীর লিখেন :

وقد ورد فى صفة الحوض يوم القيامة انه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر وان انيته عدد نجوم السماء -

হাউয সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, তাতে দুটি পরনালা আকাশ থেকে পতিত হবে, যা কাউসার নহরের পানি দ্বারা হাউযকে ভর্তি করে দেবে। এর পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে।

এই হাদীস দ্বারা সূরা কাউসার অবতরণের হেতু এবং কাউসার শব্দের তফসীর (অজস্র কল্যাণ) জানা গেল। আরও জানা গেল যে, এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে হাউযে কাউসারও শামিল আছে, যা কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদীর পিপাসা নিবারণ করবে।

এ হাদীস আরও ফুটিয়ে তুলেছে যে, আসল কাউসার প্রস্রবণটি জান্নাতে অবস্থিত এবং হাউযে কাউসার থাকবে হাশরের ময়দানে। দু'টি পয়নালার সাহায্যে এতে কাউসার প্রস্রবণের পানি আনা হবে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদী জান্নাতে দাখিল হওয়ার পূর্বে হাউযে কাউসারের পানি পান করবে। এটা উপরোক্ত রেওয়ায়েতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। যারা পরবর্তীকালে ইসলাম ত্যাগ করেছিল কিংবা পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়—মুনাফিক ছিল, তাদেরকেই হাউযে কাউসার থেকে হটিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ্ হাদীসসমূহে হাউযে কাউসারের পানির স্বচ্ছতা মিষ্টতা এবং কিনারাসমূহ মণি-মানিক্য দ্বারা কারুকার্যখচিত হওয়া সম্পর্কে এমন বর্ণনা আছে, যার তুলনা দুনিয়ার কোন বস্তু দ্বারা সম্ভবপর নয়।

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী এই সূরা যদি কাফিরদের দোষারোপের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে এ সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাউযে কাউসারসহ কাউসার দান করার কথা বলে দোষারোপকারীদের অপপ্রচার খণ্ডন করা হয়েছে যে, তাঁর বংশধর কেবল ইহকাল পর্যন্তই চালু থাকবে না বরং তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের সম্পর্ক হাশরের ময়দানেও অনুভূত হবে। সেখানে তারা সংখ্যায়ও সকল উম্মত অপেক্ষা বেশী হবে এবং তাদের সম্মান আপ্যায়নও সর্বাপেক্ষা বেশী হবে।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ—نحر—শব্দের অর্থ উট কোরবানী করা। এর মসনূন পদ্ধতি হাত-পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরিকা দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেওয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কোরবানীর পদ্ধতি যবাই করা। অর্থাৎ জন্তুকে শুইয়ে কণ্ঠনালীতে ছুরিকাঘাত করা। আরবে সাধারণত উট কোরবানী করা হত। তাই কোরবানী বোঝাবার জন্য এখানে نحر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কোন কোরবানীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরার প্রথম আয়াতে কাফিরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাউসার অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের প্রত্যেক কল্যাণ তাও অজস্র পরিমাণে দেওয়ার সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—নামায ও কোরবানী। নামায শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ইবাদত এবং কোরবানী আর্থিক ইবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, আল্লাহ্র নামে কোরবানী করা প্রতিমা পূজারীদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি জিহাদ বটে। তারা প্রতিমাদের নামে কোরবানী করত। এ কারণেই অন্য এক আয়াতেও নামাযের সাথে কোরবানীর উল্লেখ আছে—

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ—আলোচ্য আয়াতে وَانْحَرْ—এর অর্থ যে কোরবানী, একথা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আতা

মুজাহিদ, হাসান বসরী (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নামাযে বুকে হাত বাঁধা করেছেন বলে যে রেওয়ায়েত প্রচলিত আছে, ইবনে কাসীর সেই রেওয়ায়েতকে মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ — شانئ-এর অর্থ শত্রুতাপোষণকারী, দোষারোপ-কারী। যেসব কাফির রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্বংশ বলে দোষারোপ করত, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে অধিকাংশ রেওয়ায়েত মতে 'আস ইবনে ওয়ায়েল, কোন কোন রেওয়ায়েত মতে ওকবা এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে কা'ব ইবনে আশরাফকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাউসার অর্থাৎ অজস্র কল্যাণ দান করেছেন। এর মধ্যে সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যও দাখিল। তাঁর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কম নয়। এছাড়া পয়গম্বর উম্মতের পিতা এবং উম্মত তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উম্মত পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বরের উম্মত অপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং একদিকে শত্রুদের উক্তি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে আরও বলা হয়েছে যে, যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ।

চিন্তা করুন, রসূলে করীম (সা)-এর স্মৃতিকে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপ মাহাত্ম্য ও উচ্চমর্যাদা দান করেছেন। তাঁর আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোণে কোণে তাঁর নাম দৈনিক পাঁচবার করে আল্লাহ্র নামের সাথে মসজিদের মিনারে উচ্চারিত হয়। পরকালে তিনি সর্বাপেক্ষা বড় সুপারিশকারীর মর্যাদা লাভ করেছেন। এর বিপরীতে বিশ্বের ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করুন, আস ইবনে ওয়ায়েল, ওকবা ও কা'ব ইবনে আশরা-ফের সন্তান-সন্ততিরা কোথায় এবং তাদের পরিবারের কি হল? স্বয়ং তাদের নামও ইসলামী বর্ণনা দ্বারা আয়াতসমূহের তফসীর প্রসঙ্গে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। নতুবা আজ দুনিয়াতে তাদের নাম মুখে নেওয়ার কেউ আছে কি? فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

سورة الكافرون

সূরা কাফিরূন

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৬ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, হে কাফিরকুল, (২) আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর (৩) এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি (৪) এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য এবং আমার ধর্ম আমার জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (কাফিরদেরকে) বলে দিন, হে কাফিরকুল (তোমাদের ও আমার তরীকা এক হতে পারে না। বর্তমানে) আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত কর না। (ভবিষ্যতেও) আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করব না এবং তোমরাও আমার উপাস্যের ইবাদত করবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, আমি একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে শিরক করতে পারি না—এখনও না এবং ভবিষ্যতেও না। পক্ষান্তরে তোমরা মুশরিক হয়ে একত্ববাদী সাব্যস্ত হতে পার না—এখনও না, ভবিষ্যতেও না। মানে একত্ববাদ ও শিরক হাত মিলাতে পারে না)। তোমরা তোমাদের প্রতিদান পাবে এবং আমি আমার প্রতিদান পাব। (এতে তাদের শিরকের কারণে শাস্তির খবর শুনানো হল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ঃ হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ফজরের সুন্নত নামাযে পাঠ করার জন্য দু'টি সূরা উত্তম—সূরা

কাফিরূন ও সূরা এখলাস।—(মাযহারী) তফসীর ইবনে কাসীরে কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ফজরের সুন্নত এবং মাগরিবের পরবর্তী সুন্নতে এ দু'টি সূরা অধিক পরিমাণে পাঠ করতে শুনেছেন। জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেন: আমাকে নিদ্রার পূর্বে পাঠ করার জন্য কোন দোয়া বলে দিন। তিনি সূরা কাফিরূন পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন, এটা শিরক থেকে মুক্তিপত্র। হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা) বলেন: একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন: তুমি কি চাও যে, সফরে গেলে সঙ্গীদের চেয়ে অধিক সুখে স্বচ্ছন্দে থাক এবং তোমার আসবাবপত্র বেশী হয়? আমি জওয়াব দিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা) আমি অবশ্যই এরূপ চাই। তিনি বললেন: কোরআনের শেষ দিককার পাঁচটি সূরা—সূরা কাফিরূন, নছর, এখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ কর এবং প্রত্যেক সূরা বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু কর ও বিসমিল্লাহ্ বলে শেষ কর। হযরত জুবায়ের (রা) বলেন, ইতিপূর্বে আমার অবস্থা ছিল এই যে, সফরে আমার পাথেয় কম এবং সঙ্গীদের তুলনায় আমি দুর্দশাগ্রস্ত হতাম। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে আমি সফরে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল হয়ে থাকি। হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন: একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিচ্ছু দংশন করলে তিনি পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করলেন এবং সূরা কাফিরূন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে করতে ক্ষতস্থানে পানি লাগালেন।—(মাযহারী)

শানে নুযূল: হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খলফ একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে বলল: আসুন, আমরা পরস্পরে এই শান্তিচুক্তি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব।—(কুরতুবী) তিবরানীর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, কাফিররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন।—(মাযহারী)

আবু সালেহ্-এর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: মক্কার কাফিররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোন কোন প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিবরাঈল সূরা কাফিরূন নিয়ে আগমন করলেন। এতে কাফিরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহ্র অকৃত্রিম ইবাদতের আদেশ আছে।

শানে-নুযূলে উল্লিখিত একাধিক ঘটনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে এবং সবগুলোর জওয়াবেই সূরাটি অবতীর্ণ হতে পারে। এধরনের শান্তিচুক্তিতে বাধা দেওয়া জওয়াবের মূল লক্ষ্য।

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ —এ সূরায় কয়েকটি বাক্য পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হওয়ায় স্বভাবত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার জন্য বুখারী অনেক তফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমান কালের জন্য এবং একবার ভবিষ্যৎ কালের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি এক্ষণে কার্যত তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই তফসীরই অবলম্বিত হয়েছে। কিন্তু বুখারীর তফসীরে لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ —আয়াতের অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, শান্তি চুক্তির প্রস্তাবিত পদ্ধতি গ্রহণের যোগ্য নয়। আমি আমার ধর্মের উপর কায়েম আছি এবং তোমরা তোমাদের ধর্মের উপর কায়েম আছ। অতএব এর পরিণতি কি হবে। বয়ানুল-কোরআনে এখানে دين অর্থ ধর্ম নয়—প্রতিদান করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর এখানে অন্য একটি তফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি এক জায়গায় ما-কে موصول ধরেছেন এবং অন্য জায়গায় مصدرية ধরেছেন। ফলে প্রথম জায়গায় لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ —আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত কর না। দ্বিতীয় জায়গায় وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ —আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও তোমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মত ইবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার ইবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দ্বিতীয় জায়গায় ইবাদত-পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সার কথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং ইবাদত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের ইবাদত-পদ্ধতি তাই, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের ইবাদত-পদ্ধতি স্বকপোলকল্পিত।

ইবনে কাসীর এই তফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে যেয়ে বলেন ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' কলেমার অর্থও তাই হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। ইবাদত-পদ্ধতি তাই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ —এর তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর বলেন : এ বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছে :

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ —আরও এক আয়াতে

لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ —এর সারমর্ম এই যে, ইবনে কাসীর دين শব্দকে ধর্মের ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন এবং উদ্দেশ্য তাই যা বয়ানুল-কোরআনে আছে যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, স্থান বিশেষে সব পুনরুল্লেখ আপত্তিকর নয়। অনেক স্থলে পুনরুল্লেখ ভাষার অলংকাররূপে গণ্য হয়। যেমন— اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا- আয়াতে তাই হয়েছে। এখানে পুনরুল্লেখের এক উদ্দেশ্য বিষয়-বস্তুর তাকীদ করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য একাধিক বাক্যে খণ্ডন করা। কারণ, তারা শান্তি চুক্তির প্রস্তাবও একাধিকবার করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তির কতক প্রকার বৈধ ও কতক প্রকার অবৈধ : আলোচ্য সূরায় কাফিরদের প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির কতক প্রকার সম্পূর্ণ খণ্ডন করে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং কোরআন পাকে একথাও আছে যে, فَاِنْ جَنَحُوْا

لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا —অর্থাৎ কাফিররা সন্ধি করতে চাইলে তোমরাও সন্ধি কর। মদীনায় হিজরত করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)ও ইহুদীদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই কোন কোন তফসীরবিদ সূরা কাফিরূনকে মনসূখ ও রহিত সাব্যস্ত করেছেন এবং এর বড় কারণ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ আয়াতখানি কেননা, এটা বাহ্যত জিহাদের আদেশের বিপরীত। কিন্তু শুদ্ধ কথা এই যে, لَكُمْ دِيْنُكُمْ -এর অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে বরং এর সারমর্ম হল 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। অতএব অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সূরাটি রহিত নয়। যে ধরনের শান্তি চুক্তি নিষিদ্ধ করার জন্য সূরা অবতীর্ণ

فَإِنْ جَنَحُوا

হয়েছিল, তা সে সময়েও নিষিদ্ধ ছিল এবং আজও নিষিদ্ধ রয়েছে।

আয়াত দ্বারা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র চুক্তি দ্বারা সে শান্তি চুক্তির অনুমতি বা বৈধতা জানা যায়, তা সে সময় যেমন বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে। বৈধতা ও অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলী। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফয়সালা দিতে যেয়ে বলেছেন: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا অর্থাৎ সেই সন্ধি অবৈধ, যা কোন হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম করে। এখন চিন্তা করুন, কাফিরদের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে শিরক করা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই সূরা কাফিরূন এ ধরনের সন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ইসলামের মূলনীতি বিরুদ্ধ কোন বিষয় ছিল না। উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তি অন্বেষায় ইসলামের সাথে কোন ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু শান্তি চুক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে—আল্লাহ্র আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোন প্রকার দর কষাকষির অবকাশ নেই।

سورة النصر

সূরা নছর

মদীনায় অবতীর্ণ, ৩ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ③

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় (২) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)] যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং (মক্কা) বিজয় (তার সমস্ত লক্ষণসহ) সমাগত হলো এবং (এ বিজয়ের ফলশ্রুতিগুলো হচ্ছে) আপনি লোকজনকে আল্লাহ্‌র দীনে (ইসলামে) দলে দলে যোগদান করতে দেখবেন, তখন (বুঝবেন যে, দুনিয়াতে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র দীনের পরিপূর্ণতা বিধান পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনার আখিরাতে যাত্রার সময় নিকটবর্তী, সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং) আপনার পালনকর্তার তসবীহ ও প্রশংসা কীর্তন করতে থাকুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমার আকুতি ব্যক্ত করতে থাকুন। (অর্থাৎ জীবনে যেসব ছোট-খাটো ব্যতিক্রমী আচরণ অনিচ্ছাকৃতভাবেও প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো থেকেও ক্ষমা প্রার্থনা করুন)। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তওবা কবূলকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ এবং এর অপর নাম সূরা 'তাওদী'। 'তাওদী' শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রসূলে করীম (সা)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে।

কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নছর কোরআনের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ এরপর কোন সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কতক রেওয়ায়েতে কোন কোন আয়াত নাযিল হওয়ার যে কথা আছে, তা এর পরিপন্থী নয়। সূরা ফাতেহাকে এই অর্থেই কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা বলা হয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরারূপে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে। সুতরাং সূরা আ'লাক, মুদ্দাসসির ইত্যাদির কোন কোন আয়াত পূর্বে নাযিল হলে তা এর পরিপন্থী নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন ঃ সূরা নছর বিদায় হজ্জে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ—আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবনের যখন মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকী ছিল, তখন কালালার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঁয়ত্রিশ দিন বাকী থাকার সময় لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ الخ—আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একুশ দিন বাকী থাকার সময় اِتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ الخ—আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরতুবী)

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে, তবে সূরাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাযিল হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। اِذَا جَاءَ ভাষাদৃষ্টে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহ্যত মনে হয়। রূহুল মা'আনীতে এর অনুকূলে একটি রেওয়ায়েতও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, খয়বর যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খয়বর বিজয় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। রূহুল মা'আনীতে হযরত কাতাদাহ্ (রা)-র উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) দু'বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হজ্জে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর মর্মার্থ এরূপ হতে পারে যে, এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরাটি পাঠ করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারণা করেছে যে, এটা এক্ষুণি নাযিল হয়েছে।

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রসূলে করীম (সা)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তসবীহ্ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল (র)-এর রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের এক সমাবেশে সূরাটি তিলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন।

বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তাই রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরও আছে যে, হযরত উমর (রা) একথা শুনে বললেন : এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি।—(কুরতুবী)

وَرَأَيْتَ النَّاسَ—মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছা-কাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কোরায়শদের ভয়ে অথবা কোন ইতস্ততার কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। মক্কা বিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়ামেন থেকে সাত'শ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পথিমধ্যে আযান দিতে দিতে ও কোরআন পাঠ করতে করতে মদীনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে বেশী পরিমাণে তসবীহ্ ও ইস্তেগফার করা উচিত : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ—হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়া পাঠ করতেন : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي—(বুখারী)

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন : এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তিনি উঠা-বসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় এই দোয়া পাঠ করতেন : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ তিনি বলতেন : আমাকে এর আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর প্রমাণস্বরূপ সূরাটি তিলাওয়াত করতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে ইবাদতে মনোনিবেশ করেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে যায়।—(কুরতুবী)

سورة اللهب

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۞ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۞

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, (২) কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। (৩) সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও .... যে ইন্ধন বহন করে, (৫) তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সে নিজে বরবাদ হোক। তার ধন-সম্পদ ও উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। (ধনসম্পদ মানে আসল পুঁজি এবং উপার্জন মানে মুনাফা। উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই তাকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচাতে পারবে না। এ হচ্ছে তার দুনিয়ার অবস্থা। আর পরকালে) সত্বরই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই) সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও—যে ইন্ধন বহন করে আনে, [অর্থাৎ কন্টকপূর্ণ ইন্ধন, যা সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পথে পুঁতে রাখত, যাতে তিনি কষ্ট পান। জাহান্নামে প্রবেশ করার পর] তার গলদেশে (জাহান্নামের শিকল ও বেড়ী হবে, যেন সেটা) হবে এক খর্জুরের রশি (শক্ত মজবুত হওয়ার ব্যাপারে তুলনা করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল ওয্যা। সে ছিল আবদুল মোত্তালিবের অন্যতম সন্তান। গৌরবর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবু লাহাব। কোরআন

পাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ, সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবূ লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কট্টর শত্রু ও ইসলামের ঘোরবিরোধী ছিল। সে নানাভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে যেয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত।—(ইবনে কাসীর)

শানে-নুযূল ঃ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কোরায়শ গোত্রের উদ্দেশে يا صباحاه বলে অথবা আবদে মানাফ ও আবদুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেওয়া তখন আরবে বিপদাশংকার লক্ষণ রূপে বিবেচিত হত)। ডাক শুনে কোরায়শ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যদি আমি বলি যে, একটি শত্রুদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোন সময় তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবূ লাহাব বলল ঃ تبا لك الهذا جمعتنا—ধ্বংস হও তুমি, এজন্যই কি আমাদেরকে একত্র করেছ? অতঃপর সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাথর মারতে উদ্যত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ—يد শব্দের আসল অর্থ হাত। মানুষের সব কাজে হাতের প্রভাবই বেশী, তাই কোন ব্যক্তির সত্তাকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেওয়া হয়; যেমন কোরআনে بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আবূ লাহাব একদিন বলতে লাগল ঃ মুহাম্মদ বলে যে, মৃত্যুর পর অমুক অমুক কাজ হবে। এরপর সে তার হাতের দিকে ইশারা করে বলল ঃ এই হাতে সেগুলোর মধ্য থেকে একটিও আসেনি। অতঃপর সে তার হাতকে লক্ষ্য করে বলল ঃ تبا لكما ما ارى فيكما شيئا مما قال محمد— অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও; মুহাম্মদ যেসব বিষয় সংঘটিত হওয়ার কথা বলে আমি সেগুলোর মধ্যে একটিও তোমাদের মধ্যে দেখি না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক বলেছে।

تباب-এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদ হওয়া। আয়াতে বদ-দোয়ার অর্থে تبت বলা হয়েছে। অর্থাৎ আবূ লাহাব ধ্বংস হোক। দ্বিতীয় বাক্যে وتب-এ বদ-দোয়া

কবুল হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে যে, আবূ লাহাব ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের ক্রোধ দমনের উদ্দেশ্যে বদ-দোয়ার বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আবূ লাহাব যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে تبا বলেছিল, তখন মুসলমানদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তারা তাদের জন্য বদ-দোয়া করবে। আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদ-দোয়ার ফলে সে ধ্বংসও হয়ে গেছে। আবূ লাহাবের ধ্বংসপ্রাপ্তির এই পূর্ব সংবাদের প্রভাবে বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে বিজন জায়গায় ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পচতে শুরু করলে চাকর-বাকরদের দ্বারা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।—(বয়ানুল কোরআন)

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ—তফসীরের সার-সংক্ষেপে ما كسب-এর অর্থ করা হয়েছে ধনসম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা সন্তান-সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه—অর্থাৎ মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিত্র এবং তার সন্তান-সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল। অর্থাৎ সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামান্তর।—(কুরতুবী) একারণে কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে مَا كَسَبَ-এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ লাহাবকে যেমন দিয়েছিলেন অগাধ ধনসম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। অকৃতজ্ঞতার কারণে এদু'টি বস্তুই তার গর্ব, অহমিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন স্বগোত্রকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন তখন আবূ লাহাব একথাও বলেছিল, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা যদি সত্যই হয়ে যায়, তবে আমার কাছে ঢের অর্থবল ও লোকবল আছে। আমি এগুলোর বিনিময়ে আত্মরক্ষা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র আযাব যখন তাকে পাকড়াও করল, তখন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোন কাজে আসল না। অতঃপর পরকালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে ঃ

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ—অর্থাৎ কিয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই সে এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে অগ্নির বিশেষণ ذات لهب বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে।

وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ——আবূ লাহাবের ন্যায় তার স্ত্রীও রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আবূ সুফিয়ানের ভগিনী ও হরব ইবনে উমাইয়ার কন্যা। তাকে উম্মে-জামীল বলা হত। আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই হতভাগীনিও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ শুষ্ককাঠ বহনকারিণী। আরবের বাক-পদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে حَمَّالَة (খড়িবাহক) বলা হত। শুষ্ক কাঠ একত্র করে যেমন কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নিন্দাকার্যটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আবূ লাহাব পত্নী পরোক্ষে নিন্দাকার্যের সাথেও জড়িত ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ -এর এ তফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে ইবনে যায়েদ ও যাহহাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নারী বন থেকে কণ্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাঁর পথে বিছিয়ে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কোরআন حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলে ব্যক্ত করেছে।—(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি জাহান্নামে হবে। সে জাহান্নামে যাক্কুম ইত্যাদি বৃক্ষ থেকে লাকড়ি এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও জুলুম বাড়িয়ে দিত।—(ইবনে কাসীর)

পরোক্ষে নিন্দাকার্য মহাপাপ ঃ রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ জান্নাতে পরোক্ষে নিন্দাকারী প্রবেশ করবে না। ফুযায়েল ইবনে আয়ায (র) বলেন ঃ তিনটি কাজ মানুষের সমস্ত সৎকর্ম বরবাদ করে দেয়, রোযাদারের রোযা এবং অযূওয়ালার অযূ নষ্ট করে দেয়——গীবত, পরোক্ষে নিন্দা এবং মিথ্যা ভাষণ। আতা ইবনে সায়েব (র) বলেন ঃ আমি হযরত শা'বী (র)-র কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই হাদীস বর্ণনা করলাম ঃ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَافِكُ دَمٍ وَلَا مَشَّاءٌ بِنَمِيْمَةٍ وَلَا تَاجِرٌ يُرْبِىْ——অর্থাৎ তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশে করবে না——অন্যায় হত্যাকারী, যে এখানের কথা সেখানে নিয়ে যায় এবং যে ব্যবসায়ী সুদের কারবার করে। অতঃপর আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হাদীসে কথা চালনাকারীকে হত্যাকারী ও সুদখোরের সমতুল্য কিরূপে করা হল? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, কথা চালনা করা এমন গুরুতর কাজ যে, এর কারণে অন্যায় হত্যা ও মাল ছিনতাইও হয়ে যায়।——(কুরতুবী)

مَسَدٍ——فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ -শব্দটি সীন-এর উপর সাকিনযোগে ধাতু।

অর্থ রশি পাকানো, রশি মজবুত করা এবং সীন-এর উপর যবরযোগে সর্বপ্রকার মজবুত রশিকে বলা হয়।—(কামূস) কেউ কেউ আরবের অভ্যাস অনুযায়ী এর অনুবাদ করেছেন খর্জুরের রশি। কিন্তু ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) অনুবাদ করেছেন লোহার তার পাকানো মোটা দড়ি। জাহান্নামে তার গলায় লোহার তার পাকানো বেড়ী পরানো হবে। হযরত মুজাহিদ (র)ও তাই তফসীর করেছেন।—(মাযহারী)

শা'বী, মুকাতিল (র) প্রমুখ তফসীরবিদ একেও দুনিয়ার অবস্থা ধরে নিয়ে অর্থ করেছেন খর্জুরের রশি। তাঁরা বলেন: আবু লাহাব ও তার স্ত্রী ধনাঢ্য এবং গোত্রের সরদাররূপে গণ্য হত। কিন্তু তার স্ত্রী হীনমন্যতা ও কৃপণতার কারণে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বোঝা তৈরী করত এবং বোঝার রশি তার গলায় বেঁধে রাখত, যাতে বোঝা মাথা থেকে পড়ে না যায়। একদিন সে মাথায় বোঝা এবং গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এই তফসীর অনুযায়ী এটা হবে তার অশুভ পরিণতি ও নীচতার বর্ণনা।—(মাযহারী) কিন্তু আবু লাহাবের পরিবারের পক্ষে বিশেষত তার স্ত্রীর পক্ষে এরূপ করা সুদূর পরাহত ছিল। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথম তফসীরই পছন্দ করেছেন।

سورة الاخلاص

সূরা ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৪ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ① اَللّٰهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ③ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ④

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক, (২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি (৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সূরাটি অবতরণের হেতু এই যে, একবার মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্র গুণাবলী ও বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল। আল্লাহ্ এ সূরা নাযিল করে তার জওয়াব দিয়েছেন)। আপনি (তাদেরকে) বলে দিন ঃ তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তা ও গুণে) এক, (সত্তার গুণ এই যে, তিনি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ চিরকাল থেকে আছেন ও চিরকাল থাকবেন। সিফতের গুণ এই যে, তার জ্ঞান, কুদরত ইত্যাদি চিরন্তর ও সর্বব্যাপী)। আল্লাহ্ অমুখা-পেক্ষী (অর্থাৎ তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন এবং সবাই তার মুখাপেক্ষী)। তার সন্তান নেই এবং তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ তিরমিযী, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েতে আছে মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জওয়াবে এই সূরা নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, মদীনার ইহুদীরা এ প্রশ্ন করেছিল। এ কারণে যাহ্হাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ।—(কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল—আল্লাহ্ তা'আলা কিসের তৈরী, স্বর্ণ-রৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জওয়াবে সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরার ফযীলত : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে আরয করল : আমি এই সূরাটি খুব ভালবাসি। তিনি বললেন : এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে।—(ইবনে কাসীর)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তারা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন : এই সূরাটি কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।—(মুসলিম, তিরমিযী) আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে তা তাকে বালা-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট হয়।—(ইবনে কাসীর)

ওকবা ইবনে আমের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমি তোমা-দেরকে এমন তিনটি সূরা বলছি, যা তওরাত, ইঞ্জীল, যবূর, কোরআন সব কিতাবেই নাযিল হয়েছে। রাত্রিতে তোমরা ততক্ষণ নিদ্রা যেয়ো না, যতক্ষণ সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস না পাঠ কর। ওকবা (রা) বলেন : সেদিন থেকে আমি কখনও এই আমল ছাড়িনি।—(ইবনে কাসীর)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ —'বলুন' কথার মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে। 'আল্লাহ্' শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বগুণের আধার ও সর্বদোষ থেকে পবিত্র। احد ও واحد উভয়ের অর্থ এক। কিন্তু احد শব্দের অর্থে এটাও শামিল যে, তিনি কোন এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরী নন, তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোন সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারও তুল্য নন। এটা তাদের সেই প্রশ্নের জওয়াব, যাতে বলা হয়েছিল আল্লাহ্ কিসের তৈরী? এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত সকল আলোচনা এসে গেছে এবং قل শব্দের মধ্যে নবুয়তের কথা এসে গেছে। অথচ এসব আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ—صمد শব্দের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের অনেক উক্তি আছে। তিবরানী এসব উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন : এগুলো সবই নির্ভুল। এতে আমাদের পালনকর্তার গুণাবলীই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু صمد-এর আসল অর্থ সেই সত্তা, যাঁর কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে এবং যাঁর সমান মহান কেউ নয়। সার কথা এই যে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।—(ইবনে কাসীর)

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ—যারা আল্লাহ্র বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা তাদের জওয়াব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য—স্রষ্টার নয়। অতএব, তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ—অর্থাৎ কেউ তাঁর সমতুল্য নয় এবং আকার-আকৃতিতে তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না।

সূরা ইখলাসে তওহীদ শিরকের পূর্ণ বিরোধিতা আছে : দুনিয়াতে তওহীদ অস্বীকারকারী মুশরিকদের বিভিন্ন প্রকার বিদ্যমান আছে : সূরা ইখলাস সর্বপ্রকার মুশরিকসুলভ ধারণা খণ্ডন করে পূর্ণ তওহীদের সবক দিয়েছে। তওহীদ বিরোধীদের একদল স্বয়ং আল্লাহ্র অস্তিত্বই স্বীকার করে না, কেউ অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তাকে চিরন্তন মানে না এবং কেউ উভয় বিষয় মানে, কিন্তু গুণাবলীর পূর্ণতা অস্বীকার করে। কেউ কেউ সবই মানে, কিন্তু ইবাদতে অন্যকে শরীক করে। اَللّٰهُ اَحَدٌ বাক্যে সব ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন হয়ে গেছে। কতক লোক ইবাদতেও শরীক করে না, কিন্তু অন্যকে অভাব পূরণকারী ও কার্যনির্বাহী মনে করে। صمد শব্দে এই ধারণা বাতিল করা হয়েছে। যারা আল্লাহ্র সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে لم يلد বলে জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

سورة الفلق

সূরা ফালাক

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ ৫ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣
وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, (৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, (৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাওয়া ও অপরকে তা শিক্ষা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য তাঁর উপর তাওয়াক্কুল তথা পুরোপুরি ভরসা করা ও ভরসা করার শিক্ষা দেওয়া। অতএব) আপনি (নিজে আশ্রয় চাওয়ার জন্য এবং অপরকে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এরূপ) বলুন, আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করছি সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে, (বিশেষত) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়, রাত্রিতে অনিষ্ট ও বিপদাপদের সম্ভাবনা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। [প্রথমে সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় গ্রহণের কথা উল্লেখ করার পর বিশেষ বিশেষ বস্তুর উল্লেখ সম্ভবত এজন্য করা হয়েছে যে, অধিকাংশ যাদু রাত্রিতেই সম্পন্ন করা হয়, যাতে কেউ জানতে না পারে এবং নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা করা যায়। কবচে ফুঁৎকারদাত্রী মহিলার উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর এভাবেই যাদু করা হয়েছিল, তা কোন পুরুষে করে থাকুক অথবা নারীরা نفثٰت -এর বিশেষ্য نفوس ও হতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়েই শামিল আছে এবং নারীও এর বিশেষ্য হতে পারে। ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর যে যাদু করেছিল, তার

কারণ ছিল হিংসা। এভাবে যাদু সম্পর্কিত সবকিছু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা হয়ে গেল। অবশিষ্ট অনিষ্ট ও বিপদাপদকে শামিল করার জন্য مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ —বলা হয়েছে আয়াতে আল্লাহ্‌কে প্রভাতের মালিক বলা হয়েছে অথচ আল্লাহ্ সকাল-বিকাল সবকিছুরই পালনকর্তা ও মালিক। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত করে যেমন প্রভাতরশ্মি আনয়ন করেন, তেমনি তিনি যাদুরও বিলুপ্তি ঘটাতে পারেন]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম (র) উভয় সূরার তফসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্য এ দুটি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সূরা-দ্বয়ের কার্যকারিতা অনেক। সত্যি বলতে কি মানুষের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। মসনদে আহমদে বর্ণিত আছে, জনৈক ইহুদী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর যাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিবরাঈল আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইহুদী যাদু করেছে এবং যে জিনিসে যাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি গ্রন্থি ছিল। তিনি গ্রন্থিগুলো খুলে দেওয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করেন। জিবরাঈল ইহুদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে চিনতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অভ্যাস তাঁর কোন দিনই ছিল না। তাই আজীবন এই ইহুদীকে কিছু বলেন নি এবং তার উপস্থিতিতে মুখমণ্ডলে কোনরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেন নি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইহুদী রীতিমত দরবারে হাযির হত। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলু-ল্লাহ্ (সা)-র উপর জনৈক ইহুদী যাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেন নি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন : আমার রোগটা কি আল্লাহ্ তা'আলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) দু'ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্যজনকে বলল : তাঁর অসুখটা কি? অন্যজন বলল : ইনি যাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : কে যাদু করল? উত্তর হল, ইহুদীদের মিত্র মুনাফিক লবীদ ইবনে আ'সাম যাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হল : কি বস্তুতে যাদু করেছে? উত্তর হল, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হল, চিরুনীটি কোথায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বরযরওয়ান' কূপের একটি পাথরের নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) সে কূপে গেলেন এবং বললেন : স্বপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান

থেকে বের করে আনলেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ আপনি ঘোষণা করলেন না কেন (যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর যাদু করেছে)? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রোগ মুক্ত করেছেন। আমি কারও জন্য কষ্টের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কষ্ট দিত)। মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই অসুখ ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, কতক সাহাবায়ে কিরাম জানতে পেরেছিলেন যে, এ দুষ্কর্মের হোতা লবীদ ইবনে আ'সাম। তাঁরা একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে আরয করলেন ঃ আমরা এই পাপিষ্ঠকে হত্যা করব না কেন? তিনি তাঁদেরকে সেই উত্তর দিলেন, যা হযরত আয়েশা (রা)-কে দিয়েছিলেন। ইমাম সা'লাবী (র)-র রেওয়ায়েতে আছে জনৈক বালক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাজকর্ম করত। ইহুদী তার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র চিরুনী হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর একটি তাঁতের তারে এগারটি গ্রন্থি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি করে সুঁই সংযুক্ত করে। চিরুনীসহ সেই তার খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে অতঃপর একটি কূপের প্রস্তর-খণ্ডের নিচে রেখে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এগার আয়াতবিশিষ্ট এ দু'টি সূরা নাযিল করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক গ্রন্থিতে এক আয়াত পাঠ করে তা খুলতে লাগলেন। গ্রন্থি খোলা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি অনুভব করলেন যেন একটি বোঝা নিজের উপর থেকে সরে গেছে।—(ইবনে কাসীর)

যাদুগ্রস্ত হওয়া নবুয়তের পরিপন্থী নয় ঃ যারা যাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিস্মিত হয় যে, আল্লাহ্‌র রসূলের উপর যাদু কিরূপে ক্রিয়াশীল হতে পারে। যাদুর স্বরূপ ও তার বিশদ বিবরণ সূরা বাক্বারায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে এতটুকু জানা জরুরী যে, যাদুর ক্রিয়াও অগ্নি, পানি ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণাদির ক্রিয়ার ন্যায়। অগ্নি দাহন করে অথবা উত্তপ্ত করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোন কোন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বর আসে! এগুলো সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পয়গম্বরগণ এগুলোর ঊর্ধ্বে নন। যাদুর প্রতিক্রিয়াও এমনি ধরনের একটি ব্যাপার। কাজেই তাঁদের যাদুগ্রস্ত হওয়া অবান্তর নয়।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ফযীলত ঃ প্রত্যেক মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত লাভ-লোকসান আল্লাহ্ তা'আলার করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কারও অণু পরিমাণ লাভ অথবা লোকসান করতে পারে না। অতএব, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে দিয়ে দেওয়া এবং কাজেকর্মে নিজেকে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়ার যোগ্য করতে সচেষ্ট হওয়া। সূরা ফালাকে ইহলৌকিক বিপদাপদ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা আছে এবং সূরা নাসে পারলৌকিক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে উভয় সূরার অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত আছে। সহীহ্ মুসলিমে ওকবা ইবনে আমের (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, অদ্য রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি এমন

আয়াত নাযিল করেছেন, যার সমতুল্য আয়াত দেখা যায় না অর্থাৎ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ আয়াতসমূহ। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর এবং কোরআনেও অনুরূপ কোন সূরা নেই। এক সফরে রসূলুল্লাহ্ (সা) ওকবা ইবনে আমের (রা)-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করালেন, অতঃপর মাগরিবের নামাযে এ সূরাদ্বয়ই তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এই সূরাদ্বয় নিদ্রা যাওয়ার সময় এবং নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থানের সময়ও পাঠ কর। অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যেক নামাযের পর সূরাদ্বয় পাঠ করার আদেশ করেছেন।—(আবূ দাউদ, নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন রোগে আক্রান্ত হলে এই সূরাদ্বয় পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এই সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারত না। তাই আমি এরূপ করতাম।—(ইবনে কাসীর) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হাবীব (রা) বর্ণনা করেন, এক রাত্রিতে বৃষ্টি ও ভীষণ অন্ধকার ছিল। আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খুঁজতে বের হলাম। যখন তাঁকে পেলাম, তখন প্রথমেই তিনি বললেন ঃ বল। আমি আরয করলাম, কি বলব? তিনি বললেন ঃ সূরা ইখলাছ ও কুল আউযু সূরাদ্বয়। সকাল-সন্ধ্যায় এগুলো তিনবার পাঠ করলে তুমি প্রত্যেক কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।—(মাযহারী)

সার কথা এই যে, যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এই সূরাদ্বয়ের আমল করতেন। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন ঃ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ—فلق-এর শাব্দিক অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য নিশি শেষে ভোর হওয়া। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্র গুণ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্র সমস্ত গুণের মধ্য থেকে একে অবলম্বন করার রহস্য এই হতে পারে যে, রাত্রির অন্ধকার প্রায়ই অনিষ্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে এবং ভোরের আলো সেই বিপদাপদের আশংকা দূর করে দেয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে, তিনি তার সকল মুসীবত দূর করে দেবেন।—(মাযহারী)

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ—আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম (র) লিখেন ঃ شر শব্দটি দু'প্রকার

বিষয়বস্তুকে শামিল করে—এক. প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও বিপদ, যদ্দ্বারা মানুষ সরাসরি কষ্ট পায়, দুই. যা মুসীবত ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে ; যেমন কুফর ও শিরক। কোরআন ও হাদীসে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারদ্বয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেগুলো হয় নিজেই বিপদ, না হয় কোন বিপদের কারণ।

আয়াতের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই আশ্রয় গ্রহণের জন্য এ বাক্যটিই যথেষ্ট ছিল কিন্তু এস্থলে আরও তিনটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছে :

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ—غسق শব্দের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হাসান ও মুজাহিদ (র) غاسق-এর অর্থ নিয়েছেন রাত্রি। وقوب-এর অর্থ অন্ধকার পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই রাত্রি থেকে যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। রাত্রিবেলায় জিন, শয়তান, ইতরপ্রাণী কীট-পতঙ্গ ও চোর-ডাকাত বিচরণ করে এবং শত্রুরা আক্রমণ করে। যাদুর ক্রিয়াও রাত্রিতে বেশী হয়। তাই বিশেষভাবে রাত্রি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় এই :

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ—نفث-এর অর্থ ফুঁ দেওয়া। عقد শব্দটি عقدة—এর বহুবচন। অর্থ গ্রন্থি। যারা যাদু করে, তারা ডোর ইত্যাদিতে গিরা লাগিয়ে তাতে যাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখানে نفاثات স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা نفوس-এরও বিশেষণ হতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে। বাহ্যত এটা নারীর বিশেষণ। যাদুর কাজ সাধারণত নারীরাই করে এবং জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কও বেশী। এছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর যাদুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরাদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে। সেই ঘটনায় ওলীদের কন্যারাই পিতার আদেশে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর যাদু করেছিল। যাদু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, এর অনিষ্ট সর্বাধিক। কারণ, মানুষ যাদুর কথা জানতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে তা দূর করতে সচেষ্ট হয় না। রোগ মনে করে চিকিৎসা করতে থাকে। ফলে কষ্ট বেড়ে যায়।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ—অর্থাৎ হিংসুক ও হিংসা। হিংসার কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর যাদু করা হয়েছিল। ইহুদী ও মুনাফিকরা মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার অনলে দগ্ধ হত। তারা সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে যাদুর মাধ্যমে হিংসার দাবানল নির্বাপিত করার প্রয়াস পায়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি হিংসা পোষণকারীর সংখ্যা জগতে অনেক। এ কারণেও বিশেষভাবে হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

حسد শব্দের অর্থ কারও নিয়ামত ও সুখ দেখে দগ্ধ হওয়া ও তাঁর অবসান কামনা করা। এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আকাশে করা সর্বপ্রথম গোনাহ্ এবং এটাই পৃথিবীতে করা সর্বপ্রথম গোনাহ্। আকাশে ইবলীস আদম (আ)-এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুত্র কাবীল তদীয় ভ্রাতা হাবীলের প্রতি হিংসা করেছে।—(কুর-তুবী) حسد তথা হিংসার কাছাকাছি হচ্ছে غبط তথা ঈর্ষা। এর সারমর্ম হচ্ছে কারও নিয়ামত ও সুখ দেখে নিজের জন্যও তদ্রূপ নিয়ামত ও সুখ কামনা করা। এটা জায়েয বরং উত্তম।

এখানে তিনটি বিষয় থেকে বিশেষ আশ্রয় প্রার্থনার কথা আছে। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথা যুক্ত করা হয়েছে غاسق-এর সাথে اذا وقب এবং حاسد-এর সাথে اذا حسد সংযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় نفاثات-এর সাথে কোন কিছু সংযুক্ত করা হয়নি। কারণ এই যে, যাদুর ক্ষতি ব্যাপক। কিন্তু রাত্রির ক্ষতি ব্যাপক নয় বরং রাত্রি যখন গভীর হয়, তখনই ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। এমনি-ভাবে হিংসুক ব্যক্তি যে পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে প্রবৃত্ত না হয়, সেই পর্যন্ত হিংসার ক্ষতি তার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে সে যদি হিংসায় উত্তেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট হয়, তবেই প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

سورة الناس

সূরা নাস

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ ৬ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۝ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের অধি-পতির, (৩) মানুষের মাবুদের (৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (৬) জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলুন, আমি মানুষের মালিক, মানুষের অধিপতির এবং মানুষের মাবুদের আশ্রয় গ্রহণ করছি তার (অর্থাৎ সেই শয়তানের) অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও পশ্চাতে সরে যায়, (হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলে শয়তান সরে যায়। এখানে উদ্দেশ্য তাই)। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে। (অর্থাৎ আমি যেমন শয়তান জিন থেকে আশ্রয় গ্রহণ করছি, তেমনি শয়তান মানুষ থেকেও আশ্রয় গ্রহণ করছি। কোরআনের অন্যত্র আছে যে, মানুষ ও জিন উভয়ের মধ্য থেকে শয়তান হয়ে থাকে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ফালাকে জাগতিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য

সূরা নাসে পারলৌকিক আপদ ও মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি গুরুতর, তাই এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কোরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ—এখানে ناس-এর দিকে এবং পূর্ববর্তী সূরায় فلق-এর দিকে رب-এর সম্বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সূরায় বাহ্যিক ও দৈহিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য এবং সেটা মানুষের মধ্যে সীমিত নয়। জন্তু-জানোয়ারও দৈহিক বিপদাপদ এবং মুসীবতে পতিত হয়। কিন্তু সূরায় শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এটা মানুষের মধ্যে সীমিত এবং জিন জাতিও প্রসঙ্গত শামিল আছে। তাই এখানে رب শব্দের সম্বন্ধ ناس-এর দিকে করা হয়েছে।—(বায়যাভী)

مَلِكِ النَّاسِ—মানুষের অধিপতি, اِلٰهِ النَّاسِ—মানুষের মাবুদ। এদু'টি গুণ সংযুক্ত করার কারণ এই যে, رب শব্দটি কোন বিশেষ বস্তুর দিকে সম্বন্ধ হলে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের জন্যও ব্যবহৃত হয়; যথা رب الدار গৃহের মালিক। প্রত্যেক মালিকই অধিপতি হয় না। তাই مَلِكِ النَّاسِ বলা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক অধিপতিই মাবুদ হয় না। তাই اِلٰهِ النَّاسِ বলতে হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ মালিক, অধিপতি, মাবুদ সবই। এই তিনটি গুণ একত্র করার রহস্য এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ হিফাযত ও সংরক্ষণ দাবী করে। কেননা, প্রত্যেক মালিক তার মালিকানাধীন বস্তুর, প্রত্যেক রাজা তার প্রজার এবং প্রত্যেক উপাস্য তার উপাসকদের হিফাযত করে। এই গুণত্রয় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে একত্রিত আছে। তিনি ব্যতীত কেউ এই গুণত্রয়ের সমষ্টি নন। তাই আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় সর্বাধিক বড় আশ্রয়। হে আল্লাহ্, আপনিই এসব গুণের আধার এবং আমরা কেবল আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি—এভাবে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার নিকটবর্তী হবে। এখানে প্রথমে رَبِّ النَّاسِ বলার পর ব্যাকরণিক নীতি অনুযায়ী সর্বনাম ব্যবহার করে مَلِكِهِمْ ও اِلٰهِهِمْ বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দোয়া ও প্রশংসার স্থল হওয়ার কারণে একই শব্দকে বার বার উল্লেখ করাই উত্তম বিবেচিত হয়েছে। কেউ কেউ ناس শব্দটির বার বার উল্লেখ করার ব্যাপারে একটি রসালতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন : এ সূরায়

ناس শব্দ পাঁচবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ناس বলে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা বোঝানো হয়েছে। একারণেই এর আগে رب অর্থাৎ পালনকর্তা শব্দ আনা হয়েছে। কেননা অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারাই প্রতিপালনের অধিক মুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় ناس দ্বারা যুবক শ্রেণী বোঝানো হয়েছে। ملك (রাজা, শাসক) শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শাসন যুবকদের জন্য উপযুক্ত। তৃতীয় ناس বলে সংসারত্যাগী, ইবাদতে মশগুল বুড়ো শ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। ইবাদতের অর্থ বাহী ইলাহ্ শব্দ তাদের জন্য উপযুক্ত। চতুর্থ ناس বলে আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বান্দা বোঝানো হয়েছে। وسوسة শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শয়তান সৎকর্মপরায়ণদের শত্রু। তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করাই তার কাজ। পঞ্চম ناس বলে দুষ্কৃতকারী লোক বোঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ—যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য অত্র আয়াতে সেই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। وسواس শব্দটি ধাতু। এর অর্থ কুমন্ত্রণা। এখানে অতিরঞ্জনের নিয়মে শয়তানকেই কুমন্ত্রণা বলে দেওয়া হয়েছে; সে যেন আপাদ-মস্তক কুমন্ত্রণা। আওয়াজহীন গোপন বাক্যের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার আনু-গত্যের আহ্বান করে। মানুষ এই বাক্যের অর্থ অনুভব করে কিন্তু কোন আওয়াজ শুনে না। শয়তানের এরূপ আহবানকে কুমন্ত্রণা বলা হয়।—(কুরতুবী) خناس শব্দটি خنس থেকে উৎপন্ন। অর্থ পশ্চাতে সরে যাওয়া। মানুষ আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করলে পিছনে সরে যাওয়াই শয়তানের অভ্যাস। মানুষ গাফিল হলে শয়তান আবার অগ্রসর হয়। অতঃপর হুঁশিয়ার হয়ে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করলে শয়তান আবার পশ্চাতে সরে যায়। এ কার্যধারাই অবিরাম অব্যাহত থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দুটি গৃহ আছে। একটিতে ফেরেশতা ও অপরটিতে শয়তান বাস করে। (ফেরেশতা সৎ কাজে এবং শয়তান অসৎ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে)। মানুষ যখন আল্লাহ্র যিকির করে, তখন শয়তান পিছনে সরে যায় এবং যখন যিকিরে থাকে না, তখন তার চঞ্চু মানুষের অন্তরে স্থাপন করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।—(মাযহারী)

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ —অর্থাৎ কুমন্ত্রণাদাতা জিনের মধ্য থেকেও হয় এবং মানুষের মধ্য থেকেও হয়। অতএব সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে। এখন জিন শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ তারা অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোন কথা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ শয়তান প্রকাশ্যে সামনে এসে কথা বলে। এটা কুমন্ত্রণা কিরূপে হল? জওয়াব এই যে, মানুষ শয়তানও

কারও সামনে এমন কথা বলে, যা থেকে সেই ব্যক্তির মনে কোন ব্যাপার সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এই সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয় সে পরিষ্কার বলে না। শায়খ ইযযুদ্দীন (র) তদীয় গ্রন্থে বলেন ঃ মানুষ শয়তানের অনিষ্ট বলে নফসের (মনের) কুমন্ত্রণা বোঝানো হয়েছে। কেননা, জিন শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কু-কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে তেমনি স্বয়ং মানুষের নফসও মন্দ কাজেরই আদেশ করে। একারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) আপন নফসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে اللهم اعوذ بك من شر نفسى و من شر الشيطان و شركه —অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং শিরক থেকেও।

শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম ঃ ইবনে কাসীর বলেন ঃ এ সূরার শিক্ষা এই যে, পালনকর্তা, অধিপতি, মাবুদ—আল্লাহ্ তা'আলার এই গুণত্রয় উল্লেখ করে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা মানুষের উচিত। কেননা প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি করে শয়তান লেগে আছে। সে প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে ধ্বংস ও বরবাদ করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। প্রথমে তাকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে এবং নানা প্রলোভন দিয়ে পাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়। এতে সফল না হলে মানুষের সৎকর্ম ও ইবাদত বিনষ্ট করার জন্য রিয়া, নাম-যশ, গর্ব ও অহংকার অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়। বিদ্বান লোকদের অন্তরে সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করে। অতএব, শয়তানের অনিষ্ট থেকে সে-ই বাঁচতে পারে যাকে আল্লাহ্ বাঁচিয়ে রাখেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার উপর তার সঙ্গী শয়তান চড়াও হয়ে না আছে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার সাথেও এই সঙ্গী আছে কি? উত্তর হল ঃ হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য করেন। এর ফলশ্রুতিতে শয়তান আমাকে সদুপদেশ ব্যতীত কিছু বলে না।

হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে আছে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে এতেকাফরত ছিলেন। এক রাত্রিতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সফিয়্যা (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য মসজিদে যান। ফেরার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)ও তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন। গলিপথে চলার সময় দু'জন আনসারী সাহাবী সামনে পড়লে রসূলুল্লাহ্ (সা) আওয়াজ দিলেন, তোমরা আস। আমার সাথে আমার সহধর্মিনী সফিয়্যা বিনতে-হুয়াই (রা) রয়েছেন। সাহাবীদ্বয় সম্ভ্রমে আরয করলেন ঃ সোবহানাল্লাহ্ ইয়া রসূলাল্লাহ্, (অর্থাৎ আপনি মনে করেছেন যে, আমরা কোন কুধারণা করব)। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ নিশ্চয়ই। কারণ, শয়তান মানুষের রক্তের সাথে তার শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। আমি আশংকা করলাম যে, শয়তান তোমাদের অন্তরে আমার সম্পর্কে কু-ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি বলে দিয়েছি যে, আমার সাথে কোন বেগানা নারী নেই।

নিজে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যেমন জরুরী, তেমনি অন্য মুসলমানকে নিজের ব্যাপারে কু-ধারণা করার সুযোগ দেওয়াও দুরস্ত নয়। মানুষের মনে কু-ধারণা সৃষ্টি

হয়—এ ধরনের আচরণ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে গেলে পরিষ্কার কথার মাধ্যমে অপবাদের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া সঙ্গত। সারকথা এই যে, উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করেছে যে, শয়তানী কুমন্ত্রণা অত্যধিক বিপজ্জনক ব্যাপার। আল্লাহ্‌র আশ্রয় ব্যতীত এ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ নয়।

এখানে যে কুমন্ত্রণা থেকে সতর্ক করা হয়েছে, এটা সেই কুমন্ত্রণা, যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে মশগুল হয়। অনিচ্ছাকৃত কুমন্ত্রণা ও কল্পনা, যা অন্তরে আসে এবং চলে যায়—সেটা ক্ষতিকর নয় এবং তজ্জন্য কোন গোনাহ্ হয় না।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর আশ্রয় প্রার্থনার মধ্যে একটি পার্থক্য ঃ সূরা ফালাকে যার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র), তার মাত্র একটি বিশেষণ رب الفلق উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, সেগুলো অনেক বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো প্রথমে مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ বাক্যে সংক্ষেপে এবং পরে তিনটি বিশেষ বিপদের কথা আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নাসে যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা তো মাত্র একটি; অর্থাৎ কুমন্ত্রণা এবং যার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তার তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে দোয়া করা হয়েছে। এথেকে জানা যায় যে, শয়তানের অনিষ্ট সর্ববৃহৎ অনিষ্ট; প্রথমত এ কারণে যে, অন্য আপদ-বিপদের প্রতিক্রিয়া মানুষের দেহ ও পার্থিব বিষয়াদিতে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু শয়তানের অনিষ্ট মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয়কে বিশেষত পরকালকে বরবাদ করে দেয়। তাই এ ক্ষতি গুরুতর। দ্বিতীয়ত দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু না কিছু বৈষয়িক প্রতিকারও মানুষের করায়ত্ত আছে এবং তা করা হয়ে থাকে, কিন্তু শয়তানের মুকাবিলা করার কোন বৈষয়িক কৌশল মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে মানুষকে দেখে, কিন্তু মানুষ তাকে দেখে না। সুতরাং এর প্রতিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র যিকির ও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা।

মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। এই শত্রুদ্বয়ের আলাদা আলাদা প্রতিকার ঃ মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ শত্রুকে প্রথমে সচ্চরিত্র, উদার ব্যবহার, প্রতিশোধ বর্জন ও সবরের মাধ্যমে বশ করার শিক্ষা দিয়েছেন। যদি, সে এতে বিরত না হয়, তবে তার সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করার আদেশ দান করেছেন। কিন্তু শয়তান শত্রুর মুকাবিলা কেবল আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে করার শিক্ষা দিয়েছেন। ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরের ভূমিকায় তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। এসব আয়াতে মানুষের উপরোক্ত শত্রুদ্বয়ের উল্লেখ করার পর মানুষ শত্রুর প্রতিরক্ষায় সচ্চরিত্রতা, প্রতিশোধ বর্জন ও সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান-শত্রুর প্রতিরক্ষায় কেবল আশ্রয় প্রার্থনার সবক দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাসীর বলেন ঃ সমগ্র কোরআনে এই বিষয়বস্তুর মাত্র তিনটি আয়াতই বিদ্যমান আছে। সূরা আ'রাফের এক আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে ঃ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ এর অর্থ

এই যে, ক্ষমা ও মার্জনা, সৎ কাজের আদেশ এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ শত্রুর মুকাবিলা কর। এই আয়াতেই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

এতে শয়তান শত্রুর মুকাবিলা করার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যার সারকথা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করা। দ্বিতীয় সূরা 'কাদ আফলাহাল মুমিনূনে' প্রথমে মানুষ শত্রুর মুকাবিলার প্রতিকার বর্ণনা করেছেন ঃ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ অর্থাৎ মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর। অতঃপর শয়তান শত্রুর মুকাবিলার জন্য বলেছেন ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি আপনার আশ্রয় চাই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের আমার কাছে আসা থেকে। তৃতীয় আয়াত সূরা হা-মীম সিজদায় প্রথমে মানুষ শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য বলা হয়েছে ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ

অর্থাৎ তুমি মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর। এরূপ করলে দেখবে যে, তোমার শত্রু তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে। এ আয়াতেই পরবর্তী অংশে শয়তান শত্রুর মুকাবিলার জন্য বলা হয়েছে ঃ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এটা প্রায় সূরা আ'রাফেরই অনুরূপ আয়াত। এর সারমর্ম এই যে, শয়তান শত্রুর মুকাবিলা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা ছাড়া কিছুই নয়।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতেই মানুষ শত্রুর প্রতিকার ক্ষমা, মার্জনা ও সচ্চরিত্রতা বর্ণিত হয়েছে। কেননা, ক্ষমা ও অনুগ্রহের কাছে নতিস্বীকার করাই মানুষের স্বভাব। আর যে নরপিশাচ মানুষের প্রকৃতিগত যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তার প্রতিকার জিহাদ ও যুদ্ধ ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, সে প্রকাশ্য শত্রু, প্রকাশ্য হাতিয়ার নিয়ে সামনে আসে। তার শক্তির মুকাবিলা শক্তি দ্বারা করা সম্ভব। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান স্বভাবগত দুষ্ট। অনুগ্রহ, ক্ষমা, মার্জনা তার বেলায় সুফলপ্রসূ নয়। যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে তার বাহ্যিক মুকাবিলাও সম্ভবপর নয়। এই উভয় প্রকার নরম ও গরম কৌশল কেবল মানুষ শত্রুর মুকাবিলায় প্রযোজ্য—শয়তানের মুকাবিলায় নয়। তাই এর প্রতিকার কেবল আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসা এবং তাঁর যিকিরে মশগুল হয়ে যাওয়া। সমগ্র কোরআনে তাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এই বিষয়বস্তুর উপরই কোরআন খতম করা হয়েছে।

পরিণতির বিচারে উভয় শত্রুর মুকাবিলার বিস্তর ব্যবধান রয়েছে ঃ উপরে কোরআনী শিক্ষায় প্রথমে অনুগ্রহ ও সবর দ্বারা মানুষ শত্রুর প্রতিরক্ষা বর্ণিত হয়েছে। এতে সফল না হলে জিহাদ ও যুদ্ধ দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে বলা হয়েছে। উভয় অবস্থায় মুকাবিলাকারী মু'মিন কামিয়াবী থেকে বঞ্চিত নয়। সম্পূর্ণ অকৃতকার্যতা মু'মিনের জন্য সম্ভবপর নয়। শত্রুর মুকাবিলায় বিজয়ী হলে তো তার কামিয়াবী সুস্পষ্টই, পক্ষান্তরে যদি সে পরাজিত হয় অথবা নিহত হয়, তবে পরকালের সওয়াব ও শাহাদতের ফযীলত দুনিয়ার কামিয়াবী অপেক্ষাও বেশি পাবে। সারকথা, মানুষ শত্রুর মুকাবিলায় হেরে যাওয়াও মু'মিনের জন্য ক্ষতির কথা নয়। কিন্তু শয়তানের খোশামোদ ও তাকে সন্তুষ্ট করা এবং গোনাহ্ তার মুকাবিলায় হেরে যাওয়া পরকালকে বরবাদ করারই নামান্তর। এ কারণেই শয়তান শত্রুর প্রতিরক্ষার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় নেওয়াই একমাত্র প্রতিকার। তাঁর শরণের সামনে শয়তানের প্রত্যেকটি কলাকৌশল মাকড়সার জালের ন্যায় দুর্বল।

শয়তানী চক্রান্ত ক্ষণভঙ্গুর ঃ উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, তাহলে শয়তানের শক্তিই বৃহৎ। তার মুকাবিলা সুকঠিন। এহেন ধারণা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا — নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। সূরা নহ্‌লে কোরআন পাঠ করার সময় আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ রয়েছে। সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমানদার আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনাকারীর উপর শয়তানের কোন জোর চলে না। বলা হয়েছে ঃ

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ○

অর্থাৎ তুমি যখন কোরআন পাঠ কর, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। যারা মু'মিন ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তাদের উপর শয়তানের জোর চলে না। তার জোর তো কেবল তাদের উপরই চলে যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে ও তাকে অংশীদার মনে করে।

কোরআনের সূচনা ও সমাপ্তির মিল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফাতেহার মাধ্যমে কোরআন পাক শুরু করেছেন, যার সারমর্ম আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর

তাঁর সাহায্য ও সরলপথে চলার তওফীক প্রার্থনা করা। আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সরলপথের মধ্যেই মানুষের যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামিয়াবী নিহিত আছে। কিন্তু এ দুটি বিষয় অর্জনে এবং অর্জনের পর তা ব্যবহারে প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত শয়তানের চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণার জাল বিছানো থাকে। তাই এজাল ছিন্ন করার কার্যকর পন্থা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা কোরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

ইফা—২০১২-২০১৩—প্র/১০(রা)—৫,২৫০

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন

অষ্টম খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন